



বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতায় শীর্ষে

আল ফাতাহ

ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ

বাংলা

আবশ্যিক

প্রবন্ধ • গল্প • কবিতা
বাংলা ভাষার প্রয়োগবিধি

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ

www.alfatahbd.com







আলোকিত মানুষের লক্ষ্যে
শিক্ষার্থীদের কল্যাণে

আল ফাতাহ

ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ

বাংলা

(আবশ্যিক)

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ

[বিটিআইএস/ বিএ/ বিএসএস/ বিবিএস/ বিএসসি]

পরীক্ষা ২০২০

গ্রন্থনায়

এম এ বাতেন
বিএ (অনার্স), এমএ (বাংলা), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
বিএড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), নয়াটোলা এ ইউ এন মডেল,কামিল মাদরাসা, ঢাকা

আর, কে, শাব্বীর আহমদ
এমএম, বিএ (অন্যার্স), এমএ (বাংলা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা), মিছবাহুল উলূম কামিল মাদরাসা, ঢাকা
প্রধান পরীক্ষক, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ভূতপূর্ব প্রভাষক (বাংলা), ঢাকা সিটি কলেজ

সম্পাদনায়
আল ফাতাহ সম্পাদনা পর্ষদ



প্রকাশক
আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স
কর্পোরেট অফিস : জিনিয়া গার্ডেন, ২৬০/১ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭
সেলস সেন্টার : ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ডিস্ট্রিবিউশন : ১৪ প্যারীদাস রোড (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
ফোন : ০২-৫৮৩১৭০৫০, ই-মেইল : alfatahmd@gmail.com

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৯

সার্বিক তত্ত্বাবধান
শরীফ মোঃ ইয়াহইয়া

সমন্বয়
মুত্তালিব বিন দেলওয়ার

সমন্বয় সহকারী
মোঃ আবদুর রহমান, খন্দকার দিপু আহম্মেদ
মোশাররফ কামাল, বজলুর রহমান, জসিম উদ্দিন

প্রচ্ছদ
দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার

অঙ্গসজ্জা
সিরাজুম মুনির মিজান

গ্রাফিক্স
সাগর আহমেদ, মোঃ মাছুম রানা

বর্ণবিন্যাস
বশির আহমদ, এম. শরীফ আহমদ

মুদ্রণ
সানরাইজ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

বাঁধাই
কাউছার এন্টারপ্রাইজ, হৃদয় বুক বাইন্ডিং

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP)
২৯০.০০ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

সভ্যতার ক্রমবিকাশ

সভ্যতার ক্রমবিকাশ আর তথ্যপ্রযুক্তির এ চরম উৎকর্ষের যুগে গতানুগতিক ও সেকেলে ধারার শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করে ইলম অর্জনের পাশাপাশি নিজেকে একজন যোগ্য ও অগ্রসরমান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যেই আল ফাতাহ পাবলিকেশন্সের অনন্য প্রয়াস মাদরাসা শিক্ষার্থীদের বইয়ে সর্বপ্রথম ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তি DIGITAL & ONLINE VERSION. ইতোমধ্যে ডিগ্রি সমমানের ফাযিল স্নাতক পাস ও অনার্স শ্রেণির যুগোপযোগী আধুনিক সিলেবাস প্রণীত হয়েছে। তাই এ পরীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এ স্তরের পরীক্ষার উপযুক্ত ফলাফল ব্যক্তিকে দেবে শিক্ষিত নাগরিকের স্বীকৃতি। ত্বরান্বিত করবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি। সর্বাগ্রে এ দিকটি বিবেচনায় রেখে শুরু হয়েছে আমাদের অগ্রযাত্রা। যার সাফল্যের সোনালি চূড়া স্পর্শের ধারাবাহিকতায় ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের জন্য আল ফাতাহ ফাযিল স্নাতক গাইড সিরিজ-এর আত্মপ্রকাশ।

আল ফাতাহ গাইড সিরিজ রচনাকালে আমরা এর সর্বোচ্চ গুণগত মান অক্ষুণ্ন রাখার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছি। সাথে সাথে লক্ষ রেখেছি প্রশ্নের নম্বর এবং পরীক্ষার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের প্রতিও। সর্বাধিক পয়েন্টভিত্তিক গতিময় ও মাধুর্যপূর্ণ এবং সাবলীল ভাষায় আমরা একে উপস্থাপন করেছি পরিহার করেছি অপ্রাসঙ্গিক ও অযাচিত সকল বিষয়। প্রাসঙ্গিক বিষয়সংশ্লিষ্ট বিখ্যাত গ্রন্থাদি থেকে প্রামাণ্য তথ্যের সমাহার ঘটিয়ে প্রতিটি প্রশ্নোত্তর নির্ভুল ও সহজবোধ্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমাদের এ কার্যক্রমে সর্বোচ্চ সাফল্যের অধিকারী একদল মেধাবী শিক্ষার্থীর পদচারণার পাশাপাশি অভিজ্ঞ পরীক্ষকমণ্ডলীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রচেষ্টা এবং আমাদের নিরলস কর্মসাধনায় প্রকাশিত এ গাইড সিরিজ থেকে সর্বাধিক প্রশ্ন কমন পড়ার ব্যাপারে আমরা দৃঢ় আশাবাদী।

আমাদের এ নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম তখনই সার্থক হবে, যখন শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীগণ এ গাইড সিরিজ থেকে যথাযথ শিক্ষা লাভ করবে এবং সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে।

গাইড সিরিজটির গুণগত মান বৃদ্ধিসহ শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য করতে সচেতন শিক্ষার্থী ও সুধীজনের যে-কোনো গঠনমূলক পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সে মোতাবেক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব ইনশাআল্লাহ।

শুভেচ্ছান্তে

আল ফাতাহ সম্পাদনা পর্ষদ

বাংলা (আবশ্যিক)

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ

পাঠ্যবিষয়

ক. সাহিত্য :

১. নির্বাচিত প্রবন্ধ

ক. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালা ভাষা
খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সভ্যতার সংকট
গ. প্রমথ চৌধুরী : যৌবনে দাও রাজটিকা
ঘ. মোহাম্মদ আকরম খাঁ : বিদায় হজ
ঙ. মোতাহের হোসেন চৌধুরী : সংস্কৃতি-কথা
চ. কাজী নজরুল ইসলাম : রাজবন্দীর জবানবন্দী

২. নির্বাচিত গল্প

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একরাত্রি
খ. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : পুঁই মাচা
গ. আবুল মনসুর আহমদ : হুযুর কেবলা
ঘ. সৈয়দ মুজতবা আলী : পাদটীকা
ঙ. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ : একটি তুলসী গাছের কাহিনী
চ. শামসুদ্দীন আবুল কালাম : পথ জানা নাই

৩. নির্বাচিত কবিতা

ক. আবদুল হাকিম : যে সবে বঙ্গেত জন্মি
খ. লালন শাঁহ : খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত : বঙ্গভাষা
ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান
ঙ. কাজী নজরুল ইসলাম : মোহররম
চ. জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন
ছ. জসীমউদ্‌দীন : এ-গাঁও ও-গাঁও
জ. ফররুখ আহমদ : সাত সাগরের মাঝি
ঝ. শামসুর রাহমান : স্বাধীনতা তুমি

খ. বাংলা ভাষার প্রয়োগবিধি :

১. ভাষাশিক্ষা

ক. বাংলা বানানরীতি : বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম, বানানের অশুদ্ধি সংশোধন।

খ. ভাষারীতি : সাধু, চলিত ও কথ্য

গ. বাংলা ব্যাকরণ (নির্বাচিত প্রসঙ্গ) : শব্দ ও পদ, শব্দগঠন প্রক্রিয়া (বিভক্তি ও বচন, সন্ধি ও সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়)

ঘ. অনুবাদ : ইংরেজি থেকে বাংলা

২. প্রবন্ধ রচনা

মানবণ্টন

		প্রবন্ধ গল্প কবিতা
ক. সাহিত্য		
রচনামূলক প্রশ্ন	: ২টি প্রশ্নের মধ্যে ১টির উত্তর দিতে হবে-	১৫ + ১৫ + ১৫ = ৪৫
ব্যাখ্যা	: ২টি উদ্ধৃতির মধ্যে ১টির ব্যাখ্যা লিখতে হবে-	৫ + ৫ + ৫ = ১৫
খ. বাংলা ভাষার প্রয়োগবিধি		
ভাষাশিক্ষা	: ৫টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টির উত্তর দিতে হবে-	৫ × ৩ = ১৫
অনুবাদ	: ২টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ১টির অনুবাদ করতে হবে-	৫ × ১ = ৫
প্রবন্ধ রচনা	: ৫টির মধ্যে ১টি শিরোনামের ওপর প্রবন্ধ রচনা করতে হবে-	২০ × ১ = ২০
		সর্বমোট = ১০০

বাংলা বানানের কতিপয় সাধারণ নিয়ম

ই-কার ও ঈ-কার-এর ব্যবহার

১। বাংলা ভাষায় দেশি/ অর্ধতৎসম/তদ্ভব শব্দে ই-কার (ি) হয়। যেমন : কুমির, পাখি, বিজলি, গাড়ি, বাড়ি, দেশি, বেশি, খুশি, দামি, চাবি, দাদি, মামি, চাচি, ঝিঙা, চিংড়ি, ভাবি, ভাইজি, গিন্নি, হাতি, হাঁড়ি ইত্যাদি।

২। বিদেশি সকল শব্দে (কতিপয় আরবি শব্দ ব্যতীত) ই-কার (ি) হয়। যেমন : কমিটি, কাবিন, চাবি, লুঙ্গি, কারিগরি, ডিগ্রি, গরিব, উজির, স্পিকার, খরিদ, আলমারি, কুরবানি ইত্যাদি।

৩। জাতি, ভাষা ও দেশবাচক শব্দে সাধারণত ই-কার (ি) হয়। যেমন : বাঙালি, জাপানি, জার্মানি, ফরাসি, তুর্কি, ইরানি, আরবি, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি; ইতালি, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া মালয়েশিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি। ব্যতিক্রম : কাশ্মীর, চীন।

৪। ইক ও -ইত প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার (ি) হয়। যেমন : আত্মিক, আনুমানিক, দৈনিক, কেন্দ্রিক, ধার্মিক, বার্ষিক, সামুদ্রিক, সাময়িক, সাংসারিক; অগণিত, অপমানিত, অনুপ্রাণিত, পরিচিত, প্রত্যাশিত, ব্যথিত, ঘোষিত ইত্যাদি।

৫। আলি ও আবলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দের শেষে ই-কার (ি) হয়। যেমন : সোনালি, মিতালি, খেয়ালি, বর্ণালি; গুণাবলি, প্রশ্নাবলি, শব্দাবলি ইত্যাদি।

৬। তা ও -ত্ব প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ই-কার (ি) হয়। যেমন : অপকারী>অপকারিতা, প্রতিযোগী>প্রতিযোগিতা, মনোযোগী>মনোযোগিতা, সত্যবাদী>সত্যবাদিতা; একাকী>একাকিত্ব, কৃতী>কৃতিত্ব, মন্ত্রী>মন্ত্রিত্ব, স্থায়ী>স্থায়িত্ব, দায়ী>দায়িত্ব ইত্যাদি। ব্যতিক্রম: সতীত্ব।

৭। ঈয় ও –ঈন প্রত্যয়যুক্ত শব্দের মধ্যাংশে ঈ-কার (ী) হয়। যেমন : কেন্দ্রীয়, জাতীয়, জলীয়, পানীয়, আদরণীয়, দেশীয়, পালনীয়, স্মরণীয়; অভ্যন্তরীণ; কুলীন, নবীন, গ্রামীণ, বিশ্বজনীন, সর্বাঙ্গীণ, তৎকালীন, প্রাতঃকালীন, শালীন ইত্যাদি।

৮। স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার (ী) হয়। যেমন: একাকিনী, মানবী, কল্যাণী, তরুণী, বিদুষী, সহচরী, মহীয়সী, ধাত্রী, পাত্রী, গুণবতী, ঘোটকী, ময়ূরী, সুন্দরী, চাতকী, হরিণী, মায়াবিনী, শক্তিমতী, ঋতুমতী, করুণাময়ী, গুণময়ী ইত্যাদি।

৯। ব্যক্তি/কর্তা ও সংখ্যাবাচক তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার (ী) হয়। যেমন : জ্ঞানী, দোষী, গৃহী, ত্যাগী, প্রবাসী, সন্ন্যাসী, সাহসী, বিলাসী, রোগী, শিল্পী; চতুর্থী, দশমী, ষোড়শী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, ষষ্ঠী ইত্যাদি।

১০। শেষে ঈ-কার (ী) বিশিষ্ট পদের সাথে 'গণ' যুক্ত হলে ই-কার (ি) হয়। যেমন : বিজ্ঞানিগণ, মন্ত্রিগণ, বুদ্ধিজীবিগণ ইত্যাদি।

১১। দুটি অর্থপূর্ণ শব্দ একত্র হলে প্রথমোক্ত ঈ-কার (ী) ই-কার (ি) হয়। যেমন : প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিজগৎ, গুণিজন, মন্ত্রিপরিষদ ইত্যাদি।

উ-কার, ঊ-কার ও ও-কার-এর ব্যবহার

১২। তৎসম শব্দে ঊ-কার (ূ) থাকলেও তদ্ভবরূপে উ-কার (ু) হয়। যেমন : কূপ>কুয়ো/কুয়া, ধূলি> ধুলা/ধুলো, নূতন>নতুন, পূজা>পুজো, পূর্ব>পুব, শূকর>শুয়োর, সূত্র > সুতা/সুতো, স্ফূর্তি > ফুর্তি ইত্যাদি।

প্রবন্ধ রচনা

সূচি নির্দেশনা

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা

ক. সাহিত্য

নির্বাচিত প্রবন্ধ

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

বাঙ্গালা ভাষা

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
৩৫।	ধার্মিক আর কালচার্ড মানুষের মাঝে পার্থক্য কী কী? সংস্কৃতির সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক কী? 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে এসব প্রশ্নের উত্তর দাও। অথবা, 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের আলোকে সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক নিরূপণ কর এবং কালচার্ড ও ধার্মিক মানুষের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর।	৬৯
৩৬।	'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে নারীকে কালচারের বা সংস্কৃতির কেন্দ্র বলা হয়েছে কেন? আলোচনা কর। অথবা, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসরণে নারীর প্রতি সংস্কৃতি ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত কর।	৭২
৩৭।	"সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারণা"– মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে উপরিউক্ত মন্তব্যটি বিচার কর। অথবা, সংস্কৃতির সাথে জীবনের মূল্যবোধের সম্পর্ক কী? কীভাবে মতবাদ বা আদর্শ মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিতে পারে? 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।	৭৩
৩৮।	"সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে স্নাত না হলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না।" –মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার কর।	৭৫
	রাজবন্দীর জবানবন্দী	
৩৯।	কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু/মূলভাব নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।	৭৭
৪০।	'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দাও। অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২] অথবা, কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে বিদ্রোহের যে সুর ফুটে উঠেছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী আত্মার মূর্তপ্রতীক। –এ উক্তির আলোকে বিদ্রোহের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।	৭৯
৪১।	'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রেমের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা লেখ। [ফা. প. ২০১৯] অথবা, "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' স্বদেশপ্রেমের একখানা প্রামাণ্য দলিল।" –এ উক্তির আলোকে কবির দেশপ্রেমের বর্ণনা দাও।	৮১
৪২।	'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের যে রাজদ্রোহিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০০৯] অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বস্তুত একজন দেশপ্রেমিক রাজদ্রোহীর আত্মোপলব্ধির দলিল– আলোচনা কর।	৮৪
৪৩।	'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অনুসরণে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলামের কারাবরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনাপূর্বক কবি-মানসের পরিচয় দাও। অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ বর্ণনা কর।	৮৬
৪৪।	'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন ও লেখকের বিদ্রোহী মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।	৮৭

ব্যাখ্যাবলি

বাঙ্গালা ভাষা

নির্বাচিত গল্প

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

একরাত্রি

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
	অথবা, 'দাম চড়িল সব জিনিসের কমিল কেবল জীবনের' –এ উক্তির আলোকে 'পথ জানা নাই' গল্পের মূলকথা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। অথবা, 'পথ জানা নাই' গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।[ফা. প. ১৯৯৯]	২২০
৩০।	'পথ জানা নাই' গল্পের আলোকে গহুরালির চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৯৭, '১৩, '১৬, '১৯] অথবা, "মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে"– 'পথ জানা নাই' গল্প অবলম্বনে অন্তরে বাইরে নিঃস্ব গহুরালির জীবনযন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন কর। [ফা. প. ২০০১, '০৫, '১০] অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পথ জানা নাই' গল্পের গহুরালির চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৯৫] অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।	২২২
৩১।	শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু/সার-সংক্ষেপ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।	২২৩
৩২।	'পথ জানা নাই' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের নামকরণের সার্থকতা যাচাই কর।	২২৫

ব্যাখ্যাবলি

একরাত্রি

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
১।	সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। অথবা, সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকলরকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। অথবা, সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। অথবা, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।	২২৭
২।	পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না।	২২৭
৩।	কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ আদালতের হেডক্লার্ক হইব। অথবা, বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি। অথবা, ইহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা; তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ।	২২৮
৪।	দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। অথবা, কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে, আমি জানিতাম না। অথবা, কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না।	২২৯

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
৫।	নাজির-সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। অথবা, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর-রৌদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম।	২২৯
৬।	পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।	২৩০
৭।	মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব। অথবা, উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।	২৩১
৮।	দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি। অথবা, ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করে।	২৩১
৯।	বেশ বুঝিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অথবা, এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম।	২৩২
১০।	তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল– বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। অথবা, সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল। অথবা, মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।	২৩২
১১।	আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।	২৩৩
১২।	তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। অথবা, সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।	২৩৪
১৩।	সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখভাগিনী হইতে পারিত। অথবা, সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।	২৩৪
১৪।	আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা-দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।	২৩৫
১৫।	আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। অথবা, আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত।	২৩৬

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি	পৃষ্ঠা
৬০।	খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভালো করিতে পারে? অথবা, দেখিস্ বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস্ না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ।	২৬৪
	পাদটীকা	
৬১।	পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অথবা, সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্য-তীর্থ বেদান্ত বাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।	২৬৫
৬২।	এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম।	২৬৫
৬৩।	'অনার্য', 'শাখামৃগ', 'দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না। অথবা, পণ্ডিত মশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে।	২৬৬
৬৪।	তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। অথবা, এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান –এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।	২৬৬
৬৫।	একে তো জীবনভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি। অথবা, বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল।	২৬৭
৬৬।	তারপর লুপ্তদেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। [ফা. প. ২০০৫]	২৬৭
৬৭।	এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণি সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই। অথবা, রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন।	২৬৮
৬৮।	দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে। [ফা. প. ১৯৯৩, '৯৯, '০১, '০৩, '০৯, '১৫, '১৮]	২৬৯
৬৯।	এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না। [ফা. প. ১৯৯৫, '০৭, '১২, '১৬] অথবা, পণ্ডিত মশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে। অথবা, 'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' Silence is golden যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই। [ফা. প. ১৯৯১]	২৬৯

নির্বাচিত কবিতা

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

যে সবে বঙ্গেত জন্মি

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী

১৩। পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি! [ফা. প. ২০১০] ৩৫৭
১৪। মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন ! [ফা. প. ২০১২] ৩৫৭
১৫। ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? [ফা. প. ২০০৭, '১৫, '১৮]
অথবা, স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে–
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? ৩৫৮
১৬। হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি। ৩৫৮
১৭। পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।। ৩৫৯

ঐকতান

১৮। বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী– ৩৬০
১৯। জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।। ৩৬০
২০। আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি–
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক। ৩৬১
২১। কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ। ৩৬১
২২। সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে। ৩৬২
২৩। চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল–
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার। ৩৬২
২৪। মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে। ৩৬৩
২৫। আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।। [ফা. প. ২০০৯, '১৪, '১৫] ৩৬৪
২৬। যে আছে মাটির কাছাকাছি;
সে কবির বাণী-লাগি কান-পেতে আছি।
অথবা, সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে। ৩৬৪

খ. বাংলা ভাষার প্রয়োগবিধি

ভাষাশিক্ষা

ক. বাংলা বানানরীতি

অনুবাদ : ইংরেজি হতে বাংলা ৫২৯

প্রবন্ধ রচনা

ক্রমিক	প্রশ্নাবলি		পৃষ্ঠা
৪৭।	শীতের সকাল		
	অথবা, একটি শীতের সকাল	[ফা. প. ২০১৭]	৬৭১
৪৮।	শরতের সকাল	[ফা. প. ১৯৯৬]	৬৭৩
৪৯।	বাংলাদেশে শরৎ		
	অথবা, বাংলাদেশের শরৎকাল		
	অথবা, শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল	[ফা. প. ১৯৯৯]	৬৭৫
৫০।	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	[ফা. প. ২০০৮, '১৩, '১৯]	
	অথবা, বাংলাদেশের বন্যা		৬৭৬
৫১।	একটি ঝড়ের রাত্রি		৬৮০
৫২।	যুবসমাজের অবক্ষয় ও তার প্রতিকার		
	অথবা, বিক্ষুব্ধ তরুণ		
	অথবা, যুবসমাজের বিপথগামিতা		৬৮১
৫৩।	গ্রামোন্নয়ন ও যুবসমাজ		৬৮৪
৫৪।	দুর্নীতি ও এর প্রতিকার : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ		
	অথবা, দুর্নীতি দমনে বাংলাদেশ সরকার		
	অথবা, দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও বাংলাদেশ সরকার		৬৮৬
৫৫।	সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব বাহিনীর ভূমিকা	[ফা. প. ২০০৫]	৬৯১
৫৬।	বাংলাদেশের উৎসব	[ফা. প. ২০০৮, '১৪]	
	অথবা, বাংলাদেশের লোকজ উৎসব	[ফা. প. ২০১৮]	
	অথবা, উৎসব আনন্দে বাংলাদেশ		৬৯২
৫৭।	ইসলামি অর্থনীতি	[ফা. প. ১৯৯৩]	৬৯৪
৫৮।	বৈদেশিক ঋণ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি		৬৯৬
৫৯।	বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ		
	অথবা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাংলাদেশ		
	অথবা, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ : সমস্যা ও সম্ভাবনা		৬৯৮
৬০।	কৃষির আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	[ফা. প. ২০০৭]	৭০১
৬১।	দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি		৭০৪
৬২।	মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ	[ফা. প. ২০০৫]	
	অথবা, মুক্তবাজার অর্থনীতি		৭০৭
৬৩।	বাংলাদেশের কৃষক	[ফা. প. ২০০০]	
	অথবা, সব সাধকের বড় সাধক		
	অথবা, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষি সমস্যা		৭০৮
৬৪।	গ্যাস সম্পদ : জাতীয় জীবনে উন্নয়নের সোনার কাঠি		
	অথবা, বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ	[ফা. প. ২০০২]	৭১১
৬৫।	বাংলাদেশের নদী	[ফা. প. ২০১২]	
	অথবা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ		৭১৪
৬৬।	জনসংখ্যা ও জনশক্তি	ফা. প. ২০১০]	
	অথবা, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ		
	অথবা, জনসংখ্যা : বোঝা নয়, সম্পদ		৭১৭
৬৭।	অধিক খাদ্য ফলাও		
	অথবা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা		৭১৯




ক. সাহিত্য

নির্বাচিত প্রবন্ধ

- বাঙ্গালা ভাষা
- সভ্যতার সংকট
- যৌবনে দাও রাজটিকা
- বিদায় হজ
- সংস্কৃতি-কথা
- রাজবন্দীর জবানবন্দী

নির্বাচিত গল্প

- একরাত্রি
- পুঁই মাচা
- হুযুর কেবলা
- পাদটীকা
- একটি তুলসী গাছের কাহিনী
- পথ জানা নাই

নির্বাচিত কবিতা

- যে সবে বঙ্গেত জন্মি
- খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
- বঙ্গভাষা
- ঐকতান
- মোহররম
- বনলতা সেন
- এ-গাঁও ও-গাঁও
- সাত সাগরের মাঝি
- স্বাধীনতা তুমি

নির্বাচিত প্রবন্ধ

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

▶২টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে – ১৫ × ১ = ১৫

বাঙ্গালা ভাষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [১৮৩৮-১৮৯৪ খ্রি.]

▶▶ প্রশ্ন : ১ ॥ নব্যপন্থি ও প্রাচীনপন্থিদের মতামত খণ্ডন করে বঙ্কিমচন্দ্র যে উৎকৃষ্ট ভাষারীতির প্রস্তাব করেছেন, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের আলোকে তার বিবরণ দাও। [ফা. প. ২০০০, '১২]

অথবা, বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে কীভাবে সকলের মতের ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করেছেন 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯২, '১৯]

অথবা, সমকালের রক্ষণশীল এবং উগ্র আধুনিক সম্প্রদায়ের অভিমতকে খণ্ডন করে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০২, '০৬]

উত্তর|| উপস্থাপনা : বাংলা গদ্যের উৎকর্ষ সাধনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান অপরিসীম। তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শের সমন্বয় করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী ভাষা ও টেকচাঁদ ঠাকুরের আলালী কথ্য ভাষা নতুনভাবে বিন্যস্ত করে প্রাণস্পর্শী ও সুষমামণ্ডিত ভাষায় রূপান্তরের কৃতিত্ব তার। তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক এবং আধুনিক শিল্পসম্মত সাহিত্যের সার্থক রূপকার। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা গদ্যধারার একটি অনুপম রচনা। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা গদ্যে যথার্থ ভাষা ও শব্দরীতি ব্যবহারের বুদ্ধিবৃত্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া নব্য ও প্রাচীনপন্থিদের মতামত খণ্ডন করে উৎকৃষ্ট ভাষারীতির প্রস্তাব করেছেন।

বাংলা ভাষার ব্যবহার রীতি : পৃথিবীর সব ভাষারই দুটি রূপ রয়েছে– লিখিত ও কথ্য। এ দুটি ভাষার মাঝে ব্যবধান বাংলা ভাষায় অনেক বেশি যা অন্য কোনো ভাষায় লক্ষ করা যায় না।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলা সাহিত্য রচনায় দুটি পৃথক রীতি প্রচলিত ছিল। একটি সাধু ভাষা অন্যটি কথ্য ভাষা, কিন্তু সাধু ভাষা ব্যতীত তখন কোনো গ্রন্থ রচনা হতো না। গ্রন্থ রচনায় কথ্য ভাষা ছিল পরিত্যাজ্য। সংস্কৃত শব্দঘেঁষা সাধু ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য না হলেও তা সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো। গদ্যসাহিত্য তখন সংস্কৃত পণ্ডিতদের একচেটিয়া দখলে ছিল। তাদের ধারণা ছিল, মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা করা যায় না। ফলে যারা সংস্কৃত জানতেন না তাদের পক্ষে সাহিত্য রচনা ছিল অসম্ভব।

প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থি : বাংলা সাহিত্যে শব্দব্যবহার নিয়ে একসময় বাংলা ভাষা সমালোচকগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী, তারা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে নারাজ– এরা প্রাচীনপন্থি। অপরদল অর্থাৎ নব্যপন্থিরা মনে করেন, সংস্কৃতানুকরণ নয়, বরং যে শব্দ বাংলা সমাজে প্রচলিত, যা সকল বাংলা ভাষাভাষী বোঝেন, তা-ই বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে হবে।

নব্যপন্থিদের বিপ্লব : সংস্কৃত শব্দঘেঁষা সাধু ভাষা বাংলা সাহিত্যকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলায় বাংলা কথ্য ভাষাভাষী সমাজে তা অপরিচিত ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে সাধারণের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা কমে আসে এবং নীরস, শ্রীহীন ও দুর্বল বলে পরিগণিত হতে থাকে। তাই রক্ষণশীল সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতদের বিরোধিতা করে প্যারিচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি উপন্যাস রচনা করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে খ্যাত 'আলালের ঘরের দুলাল' সমাজ-আলেখ্য হিসেবে সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি এতে কথ্যভাষা ব্যবহার করে বাংলা সাহিত্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেন, যা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিত। এ সময় থেকেই দুর্বোধ্য বাংলা সাহিত্যের শুষ্ক তরুমূলে জীবনবারি নিষিক্ত হয়ে বাংলা কথ্যগ্রন্থ রচনা শুরু হয়। তিনি যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রমাণ করলেন, সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্য শব্দভাণ্ডার ছাড়াই বাংলা সাহিত্যের স্রোতধারা ঝরনার মতো বহমান।

প্রাচীনপন্থিদের যুক্তি : প্রাচীনপন্থিদের মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে, কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা আদৌ উচিত নয়। তার যুক্তি– "আলালের ঘরের দুলাল' বল, 'হুতোম পেঁচা' বল, 'মৃণালিনী' বল, পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি, কিন্তু পিতা-পুত্রে একত্রে বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না।" প্রাচীনপন্থিদের মতে, "ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃত বাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।"

নব্যপন্থিদের যুক্তি : নব্যপন্থিদের মাঝে নানাজনের নানা মত রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন খুব বাড়াবাড়ি করতে প্রস্তুত; যেমন– শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি 'কলিকাতা রিভিউ'তে বাংলা ভাষা বিষয়ে এক প্রবন্ধে নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তার বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে সুসংহত এবং অনেক ক্ষেত্রে উগ্র। যেমন–

ক. বহুবচনে 'গণ' ব্যবহারে তার আপত্তি।
খ. বাংলা লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না।
গ. বাংলায় সন্ধি তার চক্ষুঃশূল।
ঘ. বাংলায় তিনি 'জনৈক' লিখতে দেবেন না।
ঙ. তিনি রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দের বদলে অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী নন।
চ. মাথাকে 'মস্তক' বা বামনকে 'ব্রাহ্মণ' বলতে তিনি অপছন্দ করেন।
ছ. তিনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের পক্ষে।
জ. সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ (একাদশ, দুইশত) তিনি বাংলায় ব্যবহার করতে দেবেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত : নব্যপন্থিদের অনেকগুলো যুক্তি মেনে নিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাদের গোঁড়ামি মানতে রাজি নন। তার মতে, ভাষা আইন মেনে চলে না। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও প্রচলিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত।

প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মধ্যে সমন্বয় সাধন : বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী। এ বিষয়ে তার বক্তব্য নিম্নরূপ–

ক. প্রাচীনপন্থিরা সংস্কৃতবাদী, তারা সাধু ভাষার পক্ষে। তারা মনে করেন, সাধু ভাষা গ্রন্থ রচনার একমাত্র ভাষা হওয়া উচিত।
খ. অপরপক্ষে নব্যপন্থিরা মনে করেন, কথ্য ভাষাই শুধুমাত্র সাহিত্য বা গ্রন্থ রচনার ভাষা হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র উভয় দলের মতামতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে বলেন, রচনার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য হয়, সে ভাষাই গ্রন্থ রচনার ভাষা হতে হবে। অকারণে প্রচলিত শব্দের উচ্ছেদ সুফলদায়ক নয়। বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রমাণ রেখে গেছেন। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম রচয়িতাও তিনি।

উৎকৃষ্ট ভাষারীতির প্রস্তাব : বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। তাঁর মতে, 'সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ।' অর্থাৎ রচনার প্রধান গুণ হওয়া প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। সর্বোৎকৃষ্ট রচনা সেটি, যার অর্থগৌরব আছে। অর্থাৎ যে রচনা সর্বজনীন, সবাই পড়তে পারে, বুঝতে পারে, তা-ই উৎকৃষ্ট রচনা। তাঁর মতে, গ্রন্থ রচয়িতাকে প্রথমে দেখতে হবে, তিনি যা প্রকাশ করতে চান তা কোন ভাষাভাষী সমাজে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং সুস্পষ্ট। প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দ এমনকি বিদেশি শব্দের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ যেখানে কথ্য ভাষা প্রযোজ্য সেখানে কথ্য ভাষা, যেখানে সাধু ভাষায় ভাব প্রকাশ সহজ সেখানে সাধু ভাষার ব্যবহার করতে হবে। এটাই বাংলা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি হওয়া উচিত।

উপসংহার : বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মতামত খণ্ডনের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট ভাষারীতির প্রস্তাব করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য হলো, যেখানে যে ভাষার শব্দ ব্যবহার করলে সবার বোধগম্য হবে, রচনার সরলতা ও স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাবে, সেখানে সে শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

▸▸ প্রশ্ন : ২ ॥ বাংলা ভাষা সংস্কার প্রসঙ্গে নব্যপন্থিদের বক্তব্য কী ছিল? এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেছেন? 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের আলোকে আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪]

উত্তর।। উপস্থাপনা : ভাষা বহতা নদীর মতোই সতত পরিবর্তনশীল। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যুগ-চাহিদা মিটিয়েই আজকের অবস্থানে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান উল্লেখ করার মতো। প্রাচীনপন্থিদের প্রভাবে বাংলা ভাষা যখন সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে কোনঠাসা হয়ে পড়ছিল, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যে নব্যপন্থিদের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষ করে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করলেন।

নব্যপন্থিদের বক্তব্য : নব্যপন্থি বলতে বোঝায় যারা কথ্য ভাষার প্রবর্তক তাদেরকে। এ দলে রয়েছেন টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

নব্যপন্থিরা গ্রন্থ রচনায় কথ্য ভাষা ব্যবহারে আগ্রহী। তারা সংস্কৃত শব্দ পরিহার করে জনমানুষের বোধগম্য খাঁটি, প্রচলিত ও কথ্য ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে নব্যপন্থিদের মাঝেও ভিন্নমত রয়েছে। নব্যপন্থি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ'তে বাংলা ভাষা বিষয়ে একটি নিবন্ধে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তার অনেক মতামত গ্রহণযোগ্য হলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন–

ক. বাংলায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না।
খ. বহুবচনে 'গণ' শব্দ ব্যবহারে তার প্রবল আপত্তি।
গ. বাংলায় সন্ধি তার চক্ষুঃশূল।
ঘ. বাংলায় তিনি 'জনৈক' শব্দ লিখতে দেবেন না।
ঙ. তিনি রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বদলে অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী নন।

চ. মাথাকে 'মস্তক' কিংবা বামনকে 'ব্রাহ্মণ' লেখা যাবে না।

ছ. তিনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের পক্ষে।

এভাবে তার অনেক অভিমতে বাড়াবাড়ি থাকলেও বাংলা ভাষারীতি প্রণয়নে তিনি অনেক সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত : নব্যপন্থিদের অনেকগুলো যুক্তি মেনে নিলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাদের গোঁড়ামি মানতে রাজি নন। তার মতে, ভাষা আইন মেনে চলে না। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও প্রচলিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য করতে প্রয়াসী। প্রাচীনপন্থিরা সংস্কৃতবাদী, তারা সাধু ভাষার পক্ষে। সাধু ভাষা গ্রন্থ রচনার একমাত্র ভাষা হওয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। অপরপক্ষে নব্যপন্থিরা মনে করেন, কথ্য ভাষাই শুধু সাহিত্য বা গ্রন্থ রচনার ভাষা হতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় দলের মতামতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে বলেন, রচনার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য হয়, সে ভাষাই গ্রন্থ রচনার ভাষা হতে হবে। অকারণে প্রচলিত শব্দের উচ্ছেদ সুফলদায়ক নয়। বাংলা ভাষায় প্রথম শিল্পসম্মত উপন্যাস রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রমাণ রেখে গেছেন। বাংলা ভাষায় তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম রচয়িতাও তিনি।

উৎকৃষ্ট ভাষারীতি সম্পর্কে প্রস্তাব : বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ সরলতা এবং স্পষ্টতা। সর্বোৎকৃষ্ট রচনা সেটি, যার অর্থগৌরব আছে। অর্থাৎ যে রচনা সর্বজনীন, সবাই পড়তে পারে, বুঝতে পারে, তা-ই উৎকৃষ্ট রচনা। তাঁর মতে, গ্রন্থ রচয়িতাকে প্রথমে দেখতে হবে, তিনি যা প্রকাশ করতে চান তা কোন ভাষাভাষী সমাজে সর্বাপেক্ষা প্রচলিত এবং সুস্পষ্ট। তাকে সে ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশি শব্দের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ যেখানে কথ্য ভাষা প্রযোজ্য সেখানে কথ্য ভাষা, যেখানে সাধু ভাষায় ভাব প্রকাশ সহজ সেখানে সাধু ভাষা ব্যবহার করতে হবে। এটাই বাংলা রচনার বিশুদ্ধ রীতি হওয়া উচিত।

উপসংহার : নব্যপন্থি ও প্রাচীনপন্থিদের দ্বন্দ্বে বাংলা ভাষার গতিপ্রবাহ যখন মন্থর হয়ে আসছিল সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অকাট্য যুক্তি পাঠক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। ভাষার ক্রমবিকাশ ও অগ্রগতিতে তাঁর অভিমত সেই সময়ের মতো বর্তমানেও গ্রহণযোগ্য। কারণ, ভাষা বিশাল সমুদ্রের মতো উদারভাবে পরিবর্তনশীলতাকে ধারণ করেই এগিয়ে যায় এবং ক্রমেই তা সমৃদ্ধি লাভ করে।

▸▸ প্রশ্ন : ৩ ॥ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে তিন রকমের বাংলা শব্দ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯০, '০৪]

অথবা, তিন রকমের বাংলা শব্দ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও মতামত তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্যক্ত কর।

অথবা, তিন রকমের শব্দ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত ব্যক্ত কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিনির্মাতা, বাংলা গদ্যরীতির পুরোধা, বাংলা সাহিত্যের সব্যসাচী লেখক সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বাংলা ভাষার সরলতা, স্পষ্টতা, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা এবং কথ্য ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ব্যাপক যুক্তি-প্রমাণ দাঁড় করিয়েছেন। তিনি

বহুমাত্রিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। বাংলা ভাষায় উদ্ধৃত তিন প্রকার শব্দ সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সর্বজনস্বীকৃত।

ভাষা সম্পর্কে প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের দ্বন্দ্ব : নব্যপন্থি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষা বিষয়ক এক নিবন্ধে তিন শ্রেণির বাংলা শব্দের কথা উল্লেখ করেন। তবে বাংলা সাহিত্য রচনার ভাষা কী হবে সে বিষয়ে প্রাচীন ও নব্য ভাষাবিদদের মাঝে দ্বন্দ্ব ছিল। যেমন–

প্রাচীনপন্থিদের অভিমত : প্রাচীনপন্থি অর্থাৎ যারা সংস্কৃতবাদী; এদের মধ্যে রয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এদের মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন। এরা সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচনার পক্ষপাতী। সংস্কৃত শব্দ যতই কঠিন হোক, যতই নীরস ও সর্বসাধারণের কাছে দুর্বোধ্য হোক না কেন, শুধুমাত্র এটাই হবে সাহিত্য রচনার উৎকৃষ্ট ভাষা।

নব্যপন্থিদের অভিমত : নব্যপন্থিরা হলেন কথ্য ভাষার প্রবর্তক। এ দলে রয়েছেন টেকচাঁদ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

নব্যপন্থিরা গ্রন্থ রচনায় কথ্য ভাষা ব্যবহারে আগ্রহী। তারা সংস্কৃত শব্দ পরিহার করে জনমানুষের বোধগম্য খাঁটি, প্রচলিত ও কথ্য ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে নব্যপন্থিদের মাঝেও ভিন্নমত রয়েছে। নব্যপন্থি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ'তে বাংলা ভাষা বিষয়ে একটি নিবন্ধে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ নিবন্ধেই তিনি তিন শ্রেণির বাংলা শব্দের কথা উল্লেখ করেন। তার অনেক মতামত গ্রহণযোগ্য হলেও অনেকক্ষেত্রে তিনি বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন–

ক. বাংলায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না।
খ. বহুবচনে 'গণ' শব্দ ব্যবহারে তার প্রবল আপত্তি।
গ. বাংলায় সন্ধি তার চক্ষুঃশূল।
ঘ. বাংলায় তিনি 'জনৈক' শব্দ লিখতে দেবেন না।
ঙ. তিনি রূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দের বদলে অপরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে অনাগ্রহী।
চ. মাথাকে 'মস্তক' কিংবা বামনকে 'ব্রাহ্মণ' লেখা যাবে না।
ছ. তিনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের পক্ষে।

এভাবে তার অনেক অভিমতে বাড়াবাড়ি থাকলেও বাংলা ভাষারীতি প্রণয়নে তিনি অনেক সারগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন– তিনি বাংলা শব্দ ভান্ডারকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

তিন রকমের বাংলা শব্দ : নব্যপন্থি ভাষাবিদ বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় বাংলা ভাষা বিষয়ে একটি চমৎকার নিবন্ধ লেখেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, বাংলা ভাষার শব্দ মূলত তিন শ্রেণির, যা সর্বজনস্বীকৃত। যথা– অর্ধ-সংস্কৃত, সংস্কৃত ও সংস্কৃত সম্পর্কহীন।

১. **অর্ধ-সংস্কৃত :** এগুলো এমন শব্দ, যা সংস্কৃত থেকে বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

সংস্কৃত শব্দ	রূপান্তরিত শব্দ
গৃহ	ঘর
ভ্রাতা	ভাই
চন্দ্র	চাঁদ
হস্ত	হাত

২. **সংস্কৃত :** এগুলো এমন শব্দ, যা সংস্কৃত থেকে বাংলায় রূপান্তর হয়নি। সংস্কৃতই রয়ে গেছে। যেমন– মেঘ, প্রান্তর, জল ইত্যাদি।

৩. **সংস্কৃত সম্পর্কহীন :** যেসব শব্দের সংস্কৃতের সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই, খাঁটি বাংলা শব্দ, যেমন– ঢেঁকি, ডুলা; বিদেশি শব্দ, যেমন– টেবিল, কলম ইত্যাদি।

শ্যামাচরণ বাবুর অভিমত : তিন শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে শ্যামাচরণ বাবুর মত হলো– রূপান্তরিত, প্রচলিত, সংস্কৃতমূল শব্দের পরিবর্তে কোনো স্থানেই রূপান্তরহীন মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয়। যেমন– মাথার পরিবর্তে 'মস্তক', বামনের পরিবর্তে 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি ব্যবহার করা অনুচিত। সংস্কৃত সম্পর্কহীন শব্দগুলো অত্যন্ত সারগর্ভপূর্ণ এবং আমরা এগুলো অনুমোদন করি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত : প্রথম শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের মত হলো, 'বামন' শব্দটি যেমন প্রচলিত তেমনি ব্রাহ্মণও। 'পাতা' যেমন প্রচলিত পত্রও প্রায় তদ্রূপ প্রচলিত। 'ভাই' শব্দের মতো ভ্রাতাও অনেকখানি প্রচলিত। কাজেই প্রচলিত এসব শব্দ উচ্ছেদে কোনো ফল নেই এবং উচ্ছেদ করা উচিতও নয়। তবে অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে 'গৃহ', মাথার পরিবর্তে 'মস্তক' পাতার পরিবর্তে 'পত্র' এবং তামার পরিবর্তে 'তাম্র' ব্যবহার করা অনুচিত। ভাষার মাধুর্য বাড়ানোর প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কথা হলো, অকারণে প্রচলিত বাংলা শব্দ পরিহার করে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

দ্বিতীয় শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো অভিমত ব্যক্ত করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় শ্রেণির শব্দ সম্পর্কে শ্যামাচরণ বাবুর মত সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন। সেই সাথে সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, তাদের অভ্যাস, এ ধরনের শব্দগুলো তারা নিজেদের লেখা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দেন। এমনকি অন্যের রচনায় এসব শব্দের ব্যবহারও তাদের শেলের ন্যায় বিদ্ধ করে। তাই তিনি মনে করেন, এটা তাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। লেখক আরো মনে করেন, বাংলা যেহেতু এখনো ততটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা নয়, তাই মাঝে মাঝে অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে ভাব প্রকাশ করতেই হবে। এক্ষেত্রে সংস্কৃত থেকে প্রচলিত শব্দ গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু বাংলা শব্দ থাকতেও অকারণে যারা সংস্কৃত শব্দের দ্বারস্থ হয়, তারা অবশ্যই রুচিহীন এবং হীনম্মন্য।

উপসংহার : যেহেতু গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য– গ্রন্থ পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করা, সেহেতু যে শব্দ ব্যবহার করলে মানুষের জন্য বেশি সহজ হয়, অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, সে শব্দই রচনায় ব্যবহার হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে আমরা প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশই স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারি।

▸▸ প্রশ্ন : ৪ ॥ বিষয় অনুসারেই ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত– 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অনুসরণে উক্তিটির সার্থকতা বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১০, '১৪]

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা গদ্যরীতির পুরোধা, ভাষাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তাঁর সময়কালে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মতপার্থক্য নিরসনে উল্লিখিত মন্তব্য পেশ করেছেন। সাহিত্যের ভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিষয়ই হচ্ছে মূল নিয়ামক। কোনো রচনায় বিষয় গুরুগম্ভীর আর কোনো রচনায় বিষয় হালকা রসাত্মক হলে, উভয় ক্ষেত্রে ভাষা এক হতে পারে না। বিষয়ই নির্ধারণ করবে ভাষার প্রকৃতি কেমন হবে। প্রবন্ধকার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এজন্যই ভাষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বাংলা ভাষারীতির বৈচিত্র্য : পৃথিবীর অন্যসব ভাষার মতো বাংলা ভাষারীতিতেও বৈচিত্র্য রয়েছে। বাংলা ভাষার দুটি রীতি রয়েছে– ১. লেখ্য ভাষা, ২. কথ্য ভাষা।

বাংলা গদ্যের আদি রূপ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল সাধু ভাষার ব্যবহার ছিল। যেখানে কথ্য ভাষার কোনো স্থান ছিল না। সাধু ভাষা তখন পুরোপুরি সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ায় নানা অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হতো। ফলে তা মানুষের বোধগম্য হতো না। বঙ্কিমচন্দ্র এ ধরনের সাহিত্যিকদের সংস্কৃত ব্যবসায়ী বলে তীর্যক মন্তব্য করেছেন।

বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার : এ সময় সাহিত্যকে অর্থাৎ বাংলা গদ্যকে মানুষের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। তিনিই প্রথম মানুষের মুখের ভাষা তথা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেন। কথ্য ভাষায় রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। তারপরই এগিয়ে আসেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি রচনা করেন– 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'।

দুটি দলের সৃষ্টি : প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করার পর সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষা আর কথ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। তাদের একদল সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায়, অন্যদল কথ্য ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচনার পক্ষে যুক্তি দেখায়। লেখক তাদের প্রথম দলকে প্রাচীনপন্থি এবং দ্বিতীয় দলকে নব্যপন্থি বলে অভিহিত করেছেন।

প্রাচীনপন্থিদের যুক্তি : প্রাচীনপন্থিরা মনে করেন, মানুষের মুখের ভাষা কখনো সাহিত্যের ভাষা হতে পারে না। সাহিত্যের ভাষা হবে একমাত্র সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষা। তারা কোনোভাবেই কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দিতে নারাজ। তাদের কথা হলো, "যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোনো অধিকার নাই।"

নব্যপন্থিদের যুক্তি : নব্যপন্থিদের মতে, সাহিত্যের ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই তা পড়তে পারে, বুঝতে পারে। তাদের যুক্তি হলো, যাদের জন্য গ্রন্থ রচনা করা হয়, সেই পাঠকরাই যদি বুঝতে না পারে তাহলে এমন রচনার সার্থকতা কোথায়?

বঙ্কিমচন্দ্রের সমন্বয় সাধন : বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনপন্থি এবং নব্যপন্থি দুটি দলের মাঝামাঝি অবস্থান নেন। তিনি যেমনিভাবে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সমালোচনা করেছেন, তেমনি গোঁড়া কথ্য ভাষার পক্ষের ব্যক্তিদেরও সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বাংলা গদ্যের ভাষা এমন হওয়া উচিত যাতে তা সবাই বুঝতে পারে। যেমন তিনি বলেছেন, "ভাষা, সংস্কৃত কিংবা কথ্য যাহাই হউক না কেন তাহা হওয়া উচিত বোধগম্য।"

বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত : বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা, যা পড়ামাত্র সকলে বুঝতে পারে। অর্থাৎ যার অর্থ-গৌরব আছে, সেটাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। গ্রন্থ রচয়িতাকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে তিনি যা বলতে চান তা কোন ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়। প্রয়োজনে ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে-কোনো ভাষারই সহযোগিতা নেওয়া যাবে।

ভাষা নির্বাচনে বিষয়ের গুরুত্ব : বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারেই রচনার ভাষা নির্ধারণ করা উচিত। লেখক যা বলতে চান, তা সুন্দর ও স্পষ্টভাবে বলতে যে ভাষা সহায়ক হবে সে ভাষায়ই তার রচনা প্রকাশ করবেন। টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় যদি কোনো বিষয় প্রকাশ করা সম্ভব না হয় তাহলে বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুর প্রদর্শিত ভাষা

ব্যবহার করতে হবে। তাতেও উদ্দেশ্য সাধন না হলে আরো উপরে যেতে হবে। প্রয়োজনে যে-কোনো বিদেশি ভাষার শব্দও ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপসংহার : কোনো রচনার সার্থকতা নির্ভর করে বিষয় ও ভাষার সর্বজনগ্রাহ্যতার ওপর। হাস্য ও করুণ-রসের জন্য টেকচাঁদি ও হুতোমি ভাষা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বিষয় গম্ভীর ও উন্নত হলে তা সংস্কৃতবহুল ভাষায়ই প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। এতে রচনার বিষয় ও সৌন্দর্য রক্ষা পাবে এবং পাঠক-মনোরঞ্জনেও তা সহায়ক হবে।

▸▸ প্রশ্ন : ৫ ॥ সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী? কীরূপ ভাষাই বা সাহিত্যে ব্যবহার করা উচিত? এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৮]

উত্তর || উপস্থাপনা : অনন্য সাহিত্য প্রতিভার অধিকারী, সব্যসাচী লেখক, বাংলা গদ্য সাহিত্যের পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহারের রূপ, গতিপ্রকৃতি এবং সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে উক্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। একটি রচনা সার্থক শিল্পকর্ম হওয়ার জন্য প্রয়োজন শব্দ বা ভাষার সঠিক বিন্যাস। তাই একটি রচনা বা লেখা সহজ, সর্বজনবোধ্য এবং শিল্পসম্মত করে তোলার নানা কৌশল বর্ণনা করাই প্রবন্ধটির মুখ্য উদ্দেশ্য।

সাহিত্য বলতে যা বোঝায় : Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে– Literature is pieces of writing that are valued as works of art. মূলত লেখনীর মাধ্যমে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না বইয়ের পাতায় জীবন্ত করে তোলাই সাহিত্য।

সাহিত্যের উদ্দেশ্য : বলা হয়– Literature is the mirror of human life. অর্থাৎ, সাহিত্য হলো মানবজীবনের দর্পণ। সমগ্র মানবজীবনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য আবর্তিত হয়। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানের প্রসার ঘটানো। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতিপয় সাহিত্যিকের অভিমত নিচে উপস্থাপন করা হলো :

লেখকের অভিমত : প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "সাহিত্য কী জন্য? গ্রন্থ কী জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না।" লেখকের মতে, যে-কোনো সাহিত্যের উদ্দেশ্য হবে, সবাই তা পাঠ করে যেন সম্পূর্ণ বুঝতে পারে। কোনো গ্রন্থের ব্যাপক পাঠে যত অধিকসংখ্যক ব্যক্তি উপকৃত হবেন, রচনার সার্থকতা ততই বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্রনাথের অভিমত : রবীন্দ্রনাথের মতে, "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" আর এসবের সাধারণ উদ্দেশ্য পাঠককে আনন্দ দান করা।

সাহিত্যে ভাষার ব্যবহার : সাহিত্যে কী ধরনের শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করতে হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো ভাষারই দুটি রূপ রয়েছে– লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষা। লেখ্য ভাষার আবার দুটি রূপ রয়েছে– একটি সাধু অন্যটি চলিত। নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

বাংলা গদ্যে সাধুভাষা : বাংলা গদ্যের প্রথম পর্যায়ে কেবল সাধু ভাষার ব্যবহার ছিল। সেখানে কথ্য ভাষার কোনো স্থান ছিল না। সাধু ভাষা সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ায় নানা অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হতো। ফলে এ সাহিত্য মানুষের বোধগম্য হতো না।

বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার : সাহিত্যকে গণমানুষের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষার গুরুত্ব দিয়ে প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস গ্রন্থ রচনা করেন। এর মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, প্রচলিত ভাষাতেই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। গ্রন্থকারের ভাষায়, "সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।" এ কথ্য ভাষার নাম দেওয়া হয়েছিল 'আলালী ভাষা।' সাধু ও কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ-রীতিই এ ভাষার বিশেষত্ব।

দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি : প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ রচনার সাথে সাথে সাধু বা সংস্কৃত ভাষা এবং কথ্য ভাষার পক্ষ নিয়ে দুটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়; যথা– প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থি।

প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মুখপাত্র : সংস্কৃত ভাষার পক্ষ অর্থাৎ প্রাচীনপন্থিদের মুখপাত্র হলেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়। নব্যপন্থি বা কথ্য ভাষার সমর্থকদের মুখপাত্র হলেন বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের অভিমত : প্রাচীনপন্থি ভাষাবিদগণ সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচনার পক্ষপাতী। তারা নিরঙ্কুশভাবে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে আগ্রহী, তা যতই কঠিন বা নীরস হোক। তাদের মতে, শুধু সাধু ভাষাই হবে সাহিত্য রচনার উৎকৃষ্ট ভাষা। তাদের মতে, "যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধু ভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোনো অধিকার নাই।" নব্যপন্থিদের মতে, সাহিত্যের ভাষা এমন হওয়া উচিত, যাতে সবাই তা পড়তে এবং বুঝতে পারে।

প্রবন্ধকারের অভিমত : প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যপন্থি হিসেবে প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থিদের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করা যাবে না, তা কিন্তু নয়; তবে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হবে। কারণ ভাষা কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না। যেভাবে সাহিত্য রচনা করলে সবাই বোঝে সে ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে হবে।

লেখকের মতে, একজন সাহিত্যস্রষ্টা পাঠককে যা বোঝাতে চান তা যদি সহজ, সাবলীল ও কথ্য ভাষায় বোঝাতে পারেন, এর মাধ্যমে যদি মনের আকুতি প্রকাশ করা যায়, তবে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য ও সংস্কৃতঘেঁষা উচ্চ শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন কী? সরলতা, প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতাই সাহিত্য রচনার প্রধান শর্ত। সুতরাং যে রচনা সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়ার সাথে সাথে যার অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য।

লেখক আরো বলেন, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সাহিত্যিকের উচিত, সে যা বলতে চায় তার সবটুকু বুঝিয়ে বলা, প্রয়োজনে সে আরবি, ইংরেজি, ফারসি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য সকল ভাষার শব্দ গ্রহণ করতে পারবে। যে ভাষা সকলে বোঝে, সর্বমহলে পরিচিত, সে ভাষাই সাহিত্যে স্থান দেওয়া উচিত।

উপসংহার : Literature is the expansion of human character. সাহিত্য হলো মানব চরিত্রের বিকাশ। তাই সাহিত্যের ভাষা হবে ঝরনার মতো প্রবহমান, সহজ, সরল ও সাবলীল, যাতে তা সব মানুষের বোধগম্য হয়। কারণ জটিল শব্দ ব্যবহার করলে তা যদি মানুষ বুঝতেই না পারে তাহলে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

▸▸ প্রশ্ন : ৬ ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ অনুসরণে বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতির পরিচয় দাও এবং তোমার মতে আদর্শ বাংলা রচনারীতি কিরূপ হওয়া উচিত– এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কর।

অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির আলোকে বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে উৎকৃষ্ট বাংলা গদ্যরীতির পথনির্দেশ কর।

অথবা, বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে বিবৃত কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : প্রখ্যাত ভাষাবিদ, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা গদ্যরীতির এক উজ্জ্বল স্মারক। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সংস্কৃতঘেঁষা প্রাচীনপন্থি এবং আধুনিক শিক্ষিত নব্যপন্থিদের মাঝে ভাষার ব্যবহাররীতি নিয়ে যে তুমুল বিরোধ চলছিল, তার সমন্বয় সাধনে এ প্রবন্ধটি একটি মাইলফলক। লেখক বাংলা ভাষার গতিপ্রকৃতি আলোচনা পর্যালোচনা করে বাংলা গদ্যরীতির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন।

বাংলা গদ্যের আদি রূপ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে কেবল সাধু ভাষার ব্যবহার ছিল। সেখানে কথ্য ভাষার কোনো স্থান ছিল না। সাধু ভাষা তখন পুরোপুরি সংস্কৃতঘেঁষা হওয়ায় নানা অপরিচিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হতো। ফলে তা মানুষের বোধগম্য হতো না। বঙ্কিমচন্দ্র এ ধরনের সাহিত্যিকদের 'সংস্কৃত ব্যবসায়ী' বলে তীর্যক মন্তব্য করেছেন।

বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার : এ সময় সাহিত্যকে অর্থাৎ বাংলা গদ্যকে মানুষের বোধগম্য করে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। তিনিই প্রথম মানুষের মুখের ভাষা তথা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেন। কথ্য ভাষায় রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'। তারপরই এগিয়ে আসেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি রচনা করেন– 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করার পর সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষা আর কথ্য ভাষাকে কেন্দ্র করে দুটি দলের সৃষ্টি হয়। তাদের একদল সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায়, অন্যদল কথ্য ভাষায় বাংলা সাহিত্য রচনার পক্ষে যুক্তি দেখায়। লেখক তাদের প্রথম দলকে প্রাচীনপন্থি এবং দ্বিতীয় দলকে নব্যপন্থি বলে অভিহিত করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা : বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত পণ্ডিত অর্থাৎ প্রাচীনপন্থিদের সমালোচনা করে বলেন, "সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল।" তাঁর মতে, "ভাষা, সংস্কৃত কিংবা কথ্য যাহাই হোক না কেন তাহা হওয়া উচিত বোধগম্য।"

সংস্কৃত পণ্ডিতদের নিন্দা : অন্যদিকে প্যারীচাঁদ মিত্র যখন কথ্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন তখন সংস্কৃত পণ্ডিতরা এ ভাষার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ এনে এর নিন্দা করেন।

আদর্শ বাংলা রচনারীতি যেরূপ হওয়া প্রয়োজন : বাংলা ভাষার আদর্শ রচনারীতির ব্যাপারে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে একমত। কারণ তার অভিমত গ্রহণযোগ্য এবং যুগোপযোগী ও যুক্তির মাপকাঠিতে অনুমোদিত। যেখানে যে শব্দ ব্যবহার করলে অধিকাংশ লোকের কাছে সহজ ও বোধগম্য হয় সে ধরনের শব্দই ব্যবহার করা উচিত। তা বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি যে-কোনো ভাষার শব্দই হোক না কেন। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে চলিত রীতিই সকলের নিকট সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার : প্রাচীনপন্থি ও আধুনিক নব্যপন্থিদের অভিমতের সমন্বয়সাধন করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্য রচনার উৎকৃষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য রীতির স্বরূপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, রচনাকে সহজ-সরল ও সাবলীল করার জন্য যে-কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার করা যাবে এবং এটাই হওয়া উচিত বাংলা রচনারীতির আদর্শ। আমরাও তাঁর এ মত সমর্থন করি।

» প্রশ্ন : ৭ ॥ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভিত্তিনির্মাতা, গদ্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ শিল্পী, বাংলা সাহিত্য জগতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের অনন্য উপমা। এ প্রবন্ধে লেখক বাংলা গদ্য সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাষারীতি কী হবে সে সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য অভিমত উপস্থাপন করেছেন। প্রবন্ধটি তিনি এমন এক সময়ে রচনা করেছেন যখন বাংলা গদ্য সাহিত্যে সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষা ব্যতীত কথ্য বা চলিত ভাষা ব্যবহার করা ছিল রীতিমতো ঘৃণ্য।

সাহিত্য বলতে যা বোঝায় : Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে– Literature is the pieces of writing that are valued as works of art. অন্য অর্থে বলা যায়, সাহিত্য হচ্ছে– চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ। মূলত মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে লেখনীর মাধ্যমে বইয়ের পাতায় জীবন্ত করে তোলাই সাহিত্য। তাই সাহিত্যের ভাষা হতে হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল।

বাংলা ভাষারীতির বৈচিত্র্য : পৃথিবীর অন্যসব ভাষার মতো বাংলা ভাষারও দুটি রূপ রয়েছে–১. লেখ্য ভাষা, ২. কথ্য ভাষা।

লেখ্য ও কথ্য ভাষায় প্রভেদ লক্ষ করা যায়, আর এটা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলায় লিখিত ও কথ্যরীতিতে যতটা প্রভেদ লক্ষ করা যায়, অন্য ভাষায় ততটা নয়।

গ্রন্থ রচনার ভাষা : প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যে দুটি পৃথক ভাষারীতি প্রচলিত থাকলেও বাংলা গদ্য সাহিত্য রচনায় সাধু ব্যতীত কথ্য ভাষার ব্যবহার কল্পনাও করা যেত না। সাধু ভাষা সকলের বোধগম্য না হলেও এ ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হতো। গ্রন্থ রচনায় মুখের ভাষা আদৌ গ্রহণযোগ্য ছিল না। গদ্য সাহিত্যে তখন সংস্কৃত পণ্ডিতদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। তারা সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করতো। ফলে এ সাহিত্য সবসময় সাধারণ মানুষের বোধগম্য হতো না।

কথ্য ভাষার বিপ্লব : সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচিত হওয়ার ফলে তা বাংলা ভাষাভাষী সমাজে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। সাধারণের মাঝে এর গ্রহণযোগ্যতা কমে আসে। নীরস, শ্রীহীন ও দুর্বল বলে পরিগণিত হতে থাকে সাধু ভাষা। তাই রক্ষণশীল, সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতদের বিরোধিতা করে প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি সম্পূর্ণ কথ্য ভাষায় তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন। লেখকের ভাষায় "সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।" অর্থাৎ সেদিন থেকে কথ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু হওয়ায় তা সাধারণ মানুষের জন্য সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল হলো। ওই গ্রন্থ রচনা করে প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমাণ করেন, সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্য শব্দভাণ্ডার বাংলা সাহিত্যের মূল উপাদান নয়।

প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থি : প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক কথ্য ভাষার বিপ্লব সূচিত হলে বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান–

১. প্রাচীনপন্থি বা সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী।

২. নব্যপন্থি বা কথ্য ভাষার পক্ষপাতী।

সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতীরা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করতে নারাজ। অন্যদিকে নব্যপন্থি বা কথ্য ভাষার পক্ষপাতীরা মনে করেন, সংস্কৃতানুকরণ নয়; বরং যে ভাষা বাংলা সমাজে প্রচলিত, যা সকল বাঙালি সহজে বুঝতে পারে তা-ই বাংলা সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।

প্রাচীনপন্থিদের বক্তব্য : প্রাচীনপন্থিদের মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে, কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা আদৌ উচিত নয়। তার যুক্তি, এ ভাষায় রচিত গ্রন্থ পিতা-পুত্রে একত্রে বসে অসঙ্কুচিত মুখে কখনো পড়া চলে না। এ ভাষায় গম্ভীরতা নেই বলে পাঠ্য-পুস্তকে এর স্থান অবাঞ্ছনীয়। তার এ অভিমতের কারণ, তিনি ইংরেজি ভাষা জানতেন না। পশ্চিমা জ্ঞানের সাথে তার সম্যক পরিচয় ঘটেনি বিধায় চলিত ভাষা সম্পর্কে তিনি এরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, তিনি (ন্যায়রত্ন মহাশয়) আবাল্য সংস্কারজনিত কারণেই শুধু সাধারণ মুখের ভাষা সাহিত্যে ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন।

নব্যপন্থিদের বক্তব্য : নব্যপন্থিদের মাঝেও বিভিন্ন জনের বিভিন্ন অভিমত ছিল। তাদের অনেকে চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে বেশ আগ্রহী ছিলেন। আবার কেউ কেউ এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। যেমন– নব্যপন্থিদের মুখপাত্র শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 'কলিকাতা রিভিউ'তে বাংলা ভাষা বিষয়ক এক নিবন্ধে নিজ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এতে দেখা যায়–

১. তিনি বাংলা ভাষায় লিঙ্গভেদ মানেন না।

২. বহুবচনে 'গণ' শব্দ ব্যবহারে তার আপত্তি।

৩. বাংলায় সন্ধি তার চক্ষুঃশূল।

৪. তিনি তদ্ভব শব্দ ব্যবহারের পক্ষে।

৫. বাংলায় তিনি 'জনৈক' শব্দ লিখতে দেবেন না।

৬. মাথাকে 'মস্তক' বা বামনকে 'ব্রাহ্মণ' লেখা যাবে না।

৭. তিনি রূপান্তরিত শব্দের বদলে তৎসম শব্দ ব্যবহার করতে নারাজ।

বঙ্কিমের অভিমত ও সমন্বয় সাধন : সংস্কৃতবাদী প্রাচীনপন্থিদের বক্তব্যের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "শুধু সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা চলবে, কথ্য ভাষায় চলবে না"– এ অভিমত ঠিক নয়; বরং কথ্য ভাষায়ও সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। এর ফলে পাঠক রুচি পরিবর্তনের সুযোগ পাবে। নব্যপন্থিদের যুক্তির ব্যাপারে লেখকের অভিমত হলো, সাহিত্যের ভাষা কোনো আইন মেনে চলে না। কাজেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি পরিহার করতে হবে।

প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থি উভয় দলের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিজ্ঞ অভিমত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য মানুষকে জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও পরিচিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। অকারণে প্রচলিত শব্দের উচ্ছেদ অনুচিত এবং তা সম্ভবও নয়। তিনি সাহিত্য রচনায় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। যারা শুধু সংস্কৃতপূজারী তাদেরকে লেখক সংস্কৃত ব্যবসায়ী আখ্যা দিয়েছেন।

বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে লেখকের অভিমত : লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা পড়ামাত্র সকলে বুঝতে পারে, তা-ই উৎকৃষ্ট রচনা। তাই গ্রন্থ রচয়িতাকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, তিনি যা বলতে চান তা কোন ভাষার শব্দ ব্যবহার করলে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুন্দর হবে। প্রয়োজনে ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত ইত্যাদি যে-কোনো ভাষার শব্দের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আর এভাবেই বাংলা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট রচনা নির্মাণ করা সম্ভব।

উপসংহার : সাহিত্য হলো মানব জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাই সাহিত্যের ভাষা হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ঝরনার মতো প্রবহমান, যাতে তা সব মানুষের বোধগম্য হয়। কারণ সাহিত্য যদি মানুষের বোধগম্য না হয় তাহলে সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রবন্ধের মূল বক্তব্যে প্রবন্ধকার এ বিষয়টিই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ৮ ॥ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১৭]
অথবা 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-চিন্তার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।
অথবা, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্থপতি, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণের সৃষ্টি করে। বাংলা রচনাশৈলীর দিকনির্দেশনাপূর্ণ এ প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্য রচনায় এক উজ্জ্বল মাইলফলক। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সংস্কৃতঘেঁষা সাধু ভাষা এবং কথ্য বা চলিত ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নে দুই দলে বিভক্ত প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থিদের মাঝে সমন্বয় সাধন করেন। এছাড়া তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও সুন্দর দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

বাংলা ভাষারীতির বৈচিত্র্য : পৃথিবীর অন্যসব ভাষার মতো বাংলা ভাষারীতিতেও দুটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। একটি লেখ্য ভাষা অন্যটি কথ্য ভাষা। লেখ্য ভাষা ছিল সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষা আর কথ্য ভাষা ছিল চলিত ভাষা। সাধু ভাষা অস্পষ্ট, নীরস ও দুর্বোধ্য। অপরদিকে চলিত রীতি হলো কথা বলার ভাষা, যা সহজ-সরল, স্পষ্ট, সাবলীল এবং সহজেই বোধগম্য। অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য ভাষায় সাহিত্য রচিত হলে পাঠক তার মর্ম উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়, আর তাতে সাহিত্যের মূল্য কমে যায়। পাঠক সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে সবার বোধগম্য সহজ-সরল ভাষায় সাহিত্য রচিত হলে পাঠক সহজেই তার মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে। ফলে এ সাহিত্য পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হয় এবং এর মূল্য অনেক বেড়ে যায়।

বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায় : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে লেখ্য ভাষার রূপ ছিল সাধু ভাষা। বই-পুস্তকে সাধু ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষার চিহ্নও পাওয়া যেত না। তখন অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ বাংলা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সাথে যুক্ত হতো। যে শব্দ আভাঙা সংস্কৃত নয়, সাধু ভাষায় সেসব শব্দের প্রবেশ করার কোনো অধিকার ছিল না।

বাংলা ভাষায় প্রাণের প্রবাহ : বাংলা গদ্য সাহিত্যকে সহজ-সরল, প্রাঞ্জল ও পাঠকের বোধগম্য করে তুলতে সর্বপ্রথম প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্য বা চলিত ভাষায় অর্থাৎ মানুষের মুখের ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে

বুঝিয়ে দেন, শুধু সাধু ভাষাই সাহিত্য রচনার একমাত্র অবলম্বন হতে পারে না। কথ্য ভাষায় এ গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রাণের প্রবাহ আসে। লেখকের ভাষায়, "সেইদিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।" প্যারীচাঁদ মিত্র কর্তৃক 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার পর বাংলা সাহিত্যের পণ্ডিতরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন– ১. প্রাচীনপন্থি বা সাধু ভাষার পক্ষপাতী এবং ২. নব্যপন্থি বা চলিত ভাষার পক্ষপাতী।

নব্যপন্থিদের অভিমত : নব্যপন্থিদের মুখপাত্র শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে–

১. বহুবচনে 'গণ' শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

২. বাংলায় লিঙ্গভেদ করা যাবে না।

৩. বাংলায় সন্ধি তার চক্ষুঃশূল।

৪. বাংলায় তিনি 'জনৈক' শব্দ লিখতে দেবেন না।

৫. ত্ব এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করতে দেবেন না।

নব্যপন্থিদের বিরুদ্ধে লেখকের সমালোচনা : আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র ভাষায় নব্যপন্থিদের বাড়াবাড়ির সমালোচনা করেছেন। লেখকের মতে, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভাষাজনিত সকল গোঁড়ামি পরিত্যাগ করতে হবে এবং ভাষা যেভাবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রাচীনপন্থিদের বক্তব্য : প্রাচীনপন্থিদের মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতে, কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা আদৌ উচিত নয়। তার যুক্তি, এ ভাষায় রচিত গ্রন্থ পিতা-পুত্রে একত্রে বসে অসঙ্কুচিত মুখে কখনো পড়া চলে না। এ ভাষায় গম্ভীরতা নেই বলে পাঠ্য-পুস্তকে এর স্থান অবাঞ্ছনীয়। তিনি ইংরেজি ভাষা জানতেন না এবং পশ্চিমা জ্ঞানের সাথে তার সম্যক পরিচয় ঘটেনি বিধায় চলিত ভাষা সম্পর্কে এরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

প্রাচীনপন্থিদের সম্পর্কে লেখকের অভিমত : লেখকের মতে, প্রাচীনপন্থি সাহিত্যিকগণ সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে কঠিন, অপ্রচলিত, ভারী ও ওজনদার শব্দগুলো বেছে নিয়েছেন; সে শব্দগুলো সাধারণ মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গ্রাম্য বাঙালি নারীরা মনে করে, শোভা বাড়ুক আর নাই বাড়ুক ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হলো। তেমনিভাবে সাহিত্যে সংস্কৃতপন্থিরাও মনে করেন, পাঠক বুঝুক আর নাই বুঝুক, ওজনদার ও কঠিন শব্দ চয়নে সাহিত্য রচনা করলেই তা উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করবে। মূলত তাদের এ ধারণা সঠিক নয়।

ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত : লেখকের মতে, সাহিত্য বা গ্রন্থ পাঠকের বোধগম্য ভাষায়ই প্রণীত হওয়া উচিত। কিন্তু সমসাময়িক কালের লেখকদের সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতাহেতু বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙালি সমাজে অপরিচিত ছিল। তাই টেকচাঁদ ঠাকুর সর্বপ্রথম চলিত ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজি শিক্ষিত। ইংরেজি ভাষারীতির মহিমা তিনি বুঝেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, বাংলা চলিত ভাষায় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা সম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার পর শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হলো।

লেখকের গ্রহণযোগ্য অভিমত : পরিশেষে লেখক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, বিষয় অনুসারেই সাহিত্য রচনায় ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সবাই বুঝতে পারে এবং পড়ামাত্র যার অর্থ বোঝা যায়, যার অর্থ-গৌরব আছে, তা-ই উৎকৃষ্ট রচনা। কারণ

লেখকের মতে, যা বোঝা যায় না, তা থেকে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। অতঃপর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা ও স্পষ্টতার সাথে সৌন্দর্য মেশাতে হবে। লেখককে প্রথমে দেখতে হবে তিনি যা বলতে চান, কোন ভাষায় তা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত করা যায়। যদি তা সহজ-সরল প্রচলিত ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় নিতে হবে? লেখক বলেন, "প্রয়োজনে যাহা ইচ্ছা ব্যবহার করা যাইবে, কিন্তু নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে– যতটুকু বলিবার আছে সবটুকু বলিবে– তজ্জন্য ইংরেজি, ফারসি, আরবি, উর্দু, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে-কোনো ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে। অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।" রচনার সৌন্দর্যের বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। কারণ তা মানবমনের ওপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম– এভাবেই ভাষার সরলতা ও সৌন্দর্য উৎকর্ষ সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার : যে ভাষা জনসাধারণ সহজে বোঝে, তা-ই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত। এতে প্রয়োজনে দেশি, বিদেশি, সংস্কৃত, আলালী বা হুতোমী সকল প্রকার শব্দ স্থান পেতে পারে। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এমন একটি সর্বজনগ্রাহ্য রীতির অবতারণা করেছেন যা সবাই সানন্দে গ্রহণ করতে আগ্রহী হবে এবং এটাই তার ভাষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য।

▸▸ প্রশ্ন : ৯ ॥ "মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল।" –বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে এ উক্তি কেন করলেন বুঝিয়ে দাও এবং এ প্রসঙ্গে বাংলা গদ্যের আদর্শ রীতি সম্পর্কে লেখকের মতামত সংক্ষেপে বিবৃত কর।

অথবা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে প্রাচীনপন্থিদের সমালোচনা করলেন কেন? এ ব্যাপারে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর।

উত্তর|| উপস্থাপনা : Literature is the expansion of human character. অর্থাৎ, সাহিত্য হলো মানব চরিত্রের বিকাশ। আর এ বিকাশ সাধনের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। বাংলা গদ্য সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা, প্রখ্যাত ভাষাবিদ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। বাংলা গদ্যরীতিতে প্রচলিত ধারার উত্তরণ সংস্কৃতপন্থিদের জ্বালার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য উক্তিটিতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সাহিত্য হচ্ছে সুন্দরের প্রতীক, কল্যাণের অগ্রদূত, জনসাধারণের উপকারের উৎস। তাই সাহিত্যে জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে পাঠক এর সুফল লাভে ব্যর্থ হয়। এজন্য সাহিত্যের ভাষা হতে হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল।

আলোচ্য উক্তি : বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন, "মদ্য, মুরগি এবং টেকচাঁদী বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্য গোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল।"

উক্তিটির বিশ্লেষণ : বাংলা লিখিতরীতিকে একসময় সাধু ভাষা এবং কথ্য রীতিকে চলিত ভাষারূপে স্বতন্ত্র ভাষারীতি হিসেবে দেখা হতো। টেকচাঁদ ঠাকুরই (প্যারীচাঁদ মিত্র) প্রথম চলিত ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং সংস্কৃতঘেঁষা সাধু ভাষার মূলে কুঠারাঘাত করেন। ফলে সংস্কৃত পূজারিরা তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন। তাদের ধারণা, যতক্ষণ বাংলা ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল, অক্ষয়কুমারসহ অন্যান্য সংস্কৃতসেবীদের লালন-পালনে ছিল, ততক্ষণ এর ঐতিহ্য বজায় ছিল। যখনই তা আলালীরূপে জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তখনই এর ঐতিহ্য হারিয়ে যায়, আলালী ভাষা হয়ে ওঠে তরুণদের অতি প্রিয়। কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন সংস্কৃতঘেঁষা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মতাত্ত্বিক একটি উপদল। তাদের মতে, সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ

এক ধরনের ঘৃণ্য কাজ। অপরদিকে আলালী ধাঁচের প্রচলিত ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি প্যারীচাঁদ মিত্রের এই অসাধারণ চিন্তাধারাকে স্বাগত জানান। মূলত তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য নতুন প্রাণ পায়, বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং ভাষার শুষ্কতায় জীবনবারি নিষিক্ত হয়।

উক্তিটির তাৎপর্য : সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পাঠককে জ্ঞানদান এবং আনন্দদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও পরিচিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। কারণ সাহিত্যের ভাষা জটিল ও কঠিন হলে পাঠক তা থেকে উপকৃত হতে পারে না। তাই যে ভাষা বাঙ্গালি সমাজে প্রচলিত, যাতে বাঙ্গালির নিত্যকার্য সম্পাদিত হয়, যা বাঙ্গালি মাত্রই বুঝতে পারে, সে ভাষাই সাহিত্য রচনার জন্য উৎকৃষ্ট। বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার হর্তাকর্তা ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিতরা। তাদের জটিল দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সমন্বয়ে রচিত সাহিত্য সাধারণ্যে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তাই এ রীতির মূলে প্রথম আঘাত করেন প্যারীচাঁদ মিত্র তার কথ্য ভাষায় রচিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' দিয়ে। তার এ 'আলালী রীতি'র সাহিত্য রচনা স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃতপন্থিদের মাঝে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

মদ্য ও মুরগি প্রসঙ্গ : টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) ছিলেন আধুনিক ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি ইংরেজি ভাষার প্রচলিত মহিমা বুঝেছিলেন। তখন ইংরেজি শিক্ষিতরা সনাতন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মদ ও মুরগি খাওয়াকে একটি ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করেন। তাদেরই একজন টেকচাঁদ ঠাকুর ইংরেজি ভাষার অনুসরণে কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন বলেই প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে মদ্য, মুরগি ও টেকচাঁদী বাঙ্গালা প্রভৃতি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন।

ভাষারীতি সম্পর্কে প্রাচীনপন্থিদের অভিমত : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইংরেজি শিক্ষিতদের প্রচেষ্টায় এ দেশে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়। অবশ্য তখন সংস্কৃতপন্থিদের একচ্ছত্র দাপট ছিল সাহিত্যাঙ্গনে। সংস্কৃতপন্থিরা সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করতে নারাজ ছিল। তারা জটিল, কঠিন ও দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দকে বাংলা সাহিত্য রচনার প্রধান অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করে। এটা ছিল তাদের চরম গোঁড়ামি। এ কঠিন চ্যালেঞ্জের ভেতর দিয়েই বাংলা সাহিত্যে একসময় চলিত ভাষা প্রভাব বিস্তার করে।

লেখকের বক্তব্য : প্রাচীনপন্থি বা সংস্কৃতঘেঁষা সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনায় আগ্রহীদের বক্তব্যের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, শুধু সাধু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা চলবে, কথ্য ভাষায় চলবে না, এ অভিমত ঠিক নয়; বরং কথ্য ভাষায়ও সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। তাহলে পাঠক রুচি পরিবর্তন করার সুযোগ পাবে। নব্যপন্থিদের যুক্তির ব্যাপারে তার অভিমত হলো, সাহিত্যের ভাষা কোনো আইন মেনে চলে না। কাজেই সাহিত্যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে গোঁড়ামি পরিত্যাগ করা উচিত। প্রয়োজনে যে-কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে হবে।

প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মাঝে সমন্বয়সাধন : প্রাচীন ও নব্যপন্থিদের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে লেখক বলেন, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও পরিচিত, সে ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করা উচিত। অকারণে প্রচলিত শব্দ বাদ দেওয়া উচিত নয়। লেখক যদি এমন ভাষায় বলেন, যা বোঝা যায় না, তবে তা দিয়ে কোনো উপকার লাভ করা যায় না। যে ভাষা পড়ে মানুষ সহজেই বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে তা-ই উৎকৃষ্ট, কিন্তু সংস্কৃতবহুল ভাষায় তা সম্ভব হয় না।

সাহিত্যের-আদর্শ রীতি : বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হবে। কোনো রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন হলো সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সবাই বুঝতে পারে এবং পড়ামাত্র যা বোঝা যায়, যার অর্থগৌরব আছে, তা-ই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। বলার কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বলতে হবে; যতটুকু বলার আছে ততটুকু বলতে হবে। এজন্য প্রয়োজনে ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে-কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার করতে হবে বলে লেখক মনে করেন। কারণ সবার বোধগম্য হওয়ার জন্যই গ্রন্থ রচিত হয়।

টেকচাঁদী বাঙ্গালার প্রভাব : উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মাঝে সংস্কৃতবিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা মদ-মুরগির মতো টেকচাঁদী ভাষাকেও মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। যার ফলে সংস্কৃতপন্থিরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

উপসংহার : যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তার মাধ্যমেই গ্রন্থ রচনা করা উচিত। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনপন্থি ও নব্যপন্থিদের গোঁড়ামি এবং বাড়াবাড়ির সমন্বয়সাধন করেছেন। তিনি বলেছেন, দেশি-বিদেশি, সংস্কৃত সব প্রকারের শব্দই সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, যদি তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়।

▸▸ প্রশ্ন : ১০ ॥ 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রাচীনপন্থিদের যুক্তিগুলো উল্লেখ কর এবং এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মতামত বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৯৬]

অথবা, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের যে মতামতের উল্লেখ করা হয়েছে তার পরিচয় দাও এবং তাদের মতামতের বিরুদ্ধে লেখক যে যুক্তির অবতারণা করেছেন, তা উল্লেখ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা গদ্য সাহিত্যের পুরোধা, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের নবজাগরিত দর্পণস্বরূপ। বাংলা রচনাশৈলীর দিকনির্দেশনাপূর্ণ এ প্রবন্ধটি আধুনিক বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক প্রাচীনপন্থিদের যুক্তিগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে এ সম্পর্কে তাঁর অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক পর্যায় : বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে এমনকি তাঁর সমসাময়িককালেও সাহিত্যের ভাষারীতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। সাধারণ মানুষের ভাষা ছিল প্রাকৃত আর বই-পুস্তকের ভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক যুগে যারা বাংলা ভাষার চর্চা অথবা বাংলা ভাষায় বই-পুস্তক রচনা করতেন, তারা সবাই ছিলেন সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিত। সে সময়ে প্রাকৃত ভাষা লিখিত ভাষার মর্যাদা পায়নি।

বাংলা গদ্যের রূপ পরিবর্তন : বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতদের একচেটিয়া আধিপত্যের কারণে বাংলা সাহিত্য জনসাধারণের কাছে জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তাই প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর বাংলা গদ্যের জটিলতা দূর করার জন্য সর্বপ্রথম সংস্কৃত বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করলেন কথ্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস রচনার মাধ্যমে। কালীপ্রসন্ন সিংহ একই ভাষায় রচনা করেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। এরূপ কথ্যরীতিতে সাহিত্য রচনার ফলে দুটি গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে। যথা–

১. প্রাচীনপন্থি বা সংস্কৃতবাদী।

২. নব্যপন্থি বা কথ্য ভাষার পক্ষাবলম্বনকারী।

প্রাচীনপন্থিদের পরিচয় : বাংলা ভাষায় উক্ত দুই রীতির পক্ষ নিয়ে সমালোচকরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। এদের একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী। তারা সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করতে নারাজ, এদের বলা হয় প্রাচীনপন্থি। প্রাচীনপন্থিদের মুখপাত্র হলেন রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়। তিনি বাংলা ভাষারীতি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেন।

প্রাচীনপন্থিদের যুক্তি : প্রাচীনপন্থিরা ছিল গোঁড়া প্রকৃতির। তারা সাহিত্যের আদর্শ হিসেবে জটিল, অপ্রচলিত, দুর্বোধ্য, ভারী ও ওজনদার শব্দগুলো বেছে নিয়েছেন। তাদের মতে, কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করা যাবে না। কারণ তাদের ভাষায়, 'আলালের ঘরের দুলাল' বল, 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' আর 'মৃণালিনী'ই বল, পত্নী বা পাঁচ জন সমবয়সীর সাথে পাঠ করে আমোদ করা চলে, কিন্তু পিতা-পুত্র একত্রে বসে অসঙ্কুচিত মুখে কখনো পড়া চলে না।

রামগতি ন্যায়রত্নের অভিমত : সংস্কৃতবহুল ও সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার পক্ষে তার যুক্তিগুলো হলো–

১. দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষা হবে বাংলা সাহিত্য রচনার একমাত্র উপকরণ। কারণ এ ভাষার মাধ্যমে পিতাপুত্র একসাথে বসে সাহিত্য পাঠ করা যায়।
২. সংস্কৃত ভাষা গুরুজনের সামনে উচ্চারণ করতে কোনোপ্রকার লজ্জাবোধ হয় না।
৩. বিদ্যালয়ে পুস্তকপাঠের গুরুভার একমাত্র সংস্কৃত ভাষার ওপর প্রযোজ্য হতে পারে।
৪. সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দেশ করতে কোনো অসুবিধা নেই।
৫. কথ্য ভাষা শিক্ষাপ্রদ নয়। এরূপ ভাষা সর্বসমক্ষে পাঠ করতে লজ্জাবোধ হয়।

লেখকের অভিমত : লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শুধু সাধু ভাষায় সাহিত্য রচনা করা চলবে, কথ্য ভাষায় চলবে না– এ অভিমত সঠিক নয়; বরং কথ্য ভাষায়ও সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। তাতে পাঠক রুচি পরিবর্তন করার সুযোগ পাবে।

তিনি বলেন, রচনার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও প্রচলিত, সে ভাষাই গ্রন্থ রচনার ভাষা হতে হবে। অকারণে প্রচলিত শব্দের উচ্ছেদ সুফলদায়ক নয় এবং তা সম্ভবও নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। তাঁর মতে, সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হলো সেটি, যার অর্থগৌরব আছে। যে রচনা সবাই সহজে বুঝতে পারে, তা-ই উৎকৃষ্ট রচনা। গ্রন্থ রচয়িতাকে প্রথমে দেখতে হবে তিনি যা বলতে চান তা কোন ভাষায় সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়। প্রয়োজনে বিদেশি ভাষারও সাহায্য নেওয়া চলবে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যেখানে কথ্য ভাষা প্রযোজ্য সেখানে কথ্য, যেখানে সাধু ভাষায় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেখানে সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষার আশ্রয় নিতে হবে। আর এটাই মূলত বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। লেখকের ভাষায়, "এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।"

উপসংহার : প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনপন্থিদের গোঁড়ামি এবং নব্যপন্থিদের বাড়াবাড়ি দুটিই উপেক্ষা করে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর সুচিন্তিত অভিমতও ব্যক্ত করেছেন, যা অনুসরণ করলে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলা ভাষা আরো শক্তিশালী ও সাহিত্যালঙ্কারে ভূষিত হবে।

সভ্যতার সংকট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ১১ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১৬]
অথবা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য/ মূলভাব তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, "এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে–" উক্তিটির আলোকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূলভাব/ বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী, বাংলা সাহিত্যের Versatile genius বা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লেখক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধ-সংকলন থেকে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। লেখক তাঁর আশিতম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখক কৈশোর ও যৌবনে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মোহাবিষ্ট থাকলেও কালান্তরে জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে এ সভ্যতার গভীর সংকট তিনি মনে-প্রাণে উপলব্ধি করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ইংরেজ শাসন ও সভ্যতার প্রতি লেখকের মনোভাব স্পষ্ট হয়েছে এবং সর্বোপরি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী ও ভোগবাদী সভ্যতার স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু/মূলভাব

সভ্যতার সংজ্ঞা : Oxford Dictionary-তে সভ্যতা বা Civilization-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– A state of human society that is very developed and organized. অর্থাৎ, মানবজীবনের একটি অবস্থান, যেখানে তারা খুব উন্নত এবং সুসংবদ্ধ। সভ্যতার এ সংজ্ঞা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, সভ্যতার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন 'সদাচার'। আর সদাচার হলো, কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে বিখ্যাত ছিল, সে দেশে যে আচার ক্রমান্বয়ে চলে এসেছে, তাকেই বলে সদাচার বা সভ্যতা।

লেখকের আত্মোপলব্ধি : লেখক রবি ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে এমন মত ব্যক্ত করেছেন, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত এবং প্রাচ্য সভ্যতার প্রতি আস্থা ব্যক্ত হয়েছে। জীবনের ক্রান্তিলগ্নে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুস্পষ্টভাবে যে সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন, তা তার জীবনোপলব্ধিজাত। সমগ্র জীবনজুড়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এখানে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে। তার প্রথম জীবনের সাথে শেষ জীবনের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য এবং সর্বোপরি একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানোর প্রয়াস পেয়েছেন তিনি এ প্রবন্ধে।

ব্রিটিশ শাসনে উপমহাদেশের উন্নতি : প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশ শাসন করেছে। এই সুদীর্ঘ শাসনামলে উপমহাদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভূত উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হয়। এটা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাথমিক জীবনের ভাবনা, কিন্তু জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, ইংরেজ শাসনের সাফল্য ও হঠকারিতার মধ্যে কত রহস্য নিহিত রয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈশিষ্ট্য : পাশ্চাত্য বা ইংরেজ সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হলো মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। ইংরেজ চরিত্রের মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধতা রক্ষার এ বৈশিষ্ট্য সর্বদাই ছিল। তাই ইংরেজদের প্রতি প্রীত হয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধায় তাদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথসহ শিক্ষিত ভারতীয়রা। তখনো সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতার মদমত্ততায় তাদের স্বভাব-চরিত্র কলুষিত হয়নি। তাই পৃথিবীর দেশে দেশে ইংরেজ সভ্যতার বিজয়বার্তা খুব সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল।

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব : সেকালে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ছিল দিগন্তবিস্তারী। ভারতবর্ষে তখন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য জানা মার্জিত রুচিবোধের পরিচায়ক ছিল। তখনকার সাহিত্যের আসরগুলো সর্বদা মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গ ভঙ্গে; এখানে প্রতিনিয়তই আলোচনা চলত শেক্সপিয়রের নাটক আর বায়রনের কাব্য নিয়ে। তখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবে ভারতীয়দের অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাবোধ।

সভ্যতার সংকট : প্রবন্ধকার আলোচ্য 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সভ্যতার সংকট বলতে ইংরেজ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতাকে বুঝিয়েছেন। একটি উন্নত সভ্যতা যখন ক্ষমতা মদমত্ততার বশবর্তী হয়ে বিশ্বমানবতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, সে সভ্যতাকে তখন মানুষ শ্রদ্ধা করতে পারে না। ইংরেজ সভ্যতার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে এরূপই ঘটেছিল। ইংরেজরা তাদের উপনিবেশগুলোতে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছিল। তাদের উপনিবেশগুলোতে মানুষকে অত্যন্ত নির্মমভাবে শোষণ করা হয়েছিল। তাদের সভ্যতা ছিল মূলত মানবতাবোধ সংকটে সংকটাপন্ন।

সংকটের অভ্যুদয় : প্রখ্যাত ইংরেজ মনীষী জন ব্রাইটের মুখে যে শাশ্বত বাণী শুনে লেখক মুগ্ধ হয়েছিলেন, এন্ড্রুজের সান্নিধ্যে গিয়ে মহত্ত্বের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসনের হিংস্রতা সেসবকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছিল। ফলে লেখকের মনে ইংরেজদের প্রতি আশৈশব লালিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস মুহূর্তে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি আক্ষেপের সাথে বলেছেন, "জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম ইউরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

শাসনের নামে বঞ্চনা : একদিন যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজরা নিজেদের বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে আসছিল, তার যথোচিত চর্চা থেকে নিঃসহায় ভারতবর্ষ ছিল বঞ্চিত। অথচ জাপান একই শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ বঞ্চনা ও দারিদ্র্য লেখকের চোখের সামনে উদঘাটিত হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ, সভ্য নামধারী ইংরেজকে জগদ্বাসীর কাছে ধিকৃত ও নিন্দিত করেছে।

ইংরেজ শাসনের পরিণতি : ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের যে দুর্গতি সেদিন সৃষ্টি হয়েছিল, সে কেবল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়: তা হলো ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। তাদের কূটকৌশলে ভারতীয় জাতিসত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তারা আমাদের দিয়ে গেল– 'Law and order' যার অপর নাম বলা যায় দারোয়ানি, কিন্তু তারা অপহরণ করে নিয়ে গেল আমাদের সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি আর সাম্য-মৈত্রী।

ইংরেজ শাসনের বেড়াজাল হতে মুক্তি : একটি জাতি কীভাবে সভ্যতার উত্তরণ ঘটায় সে ব্যাপারে লেখক আমাদের প্রতিবেশী আফগানদের দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন।

জরথুস্ত্রীয়ানদের সাথে মুসলমানদের এককালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল, বর্তমান শাসনে তার উপশম হয়েছে। এর কারণ, ইউরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে তারা মুক্ত হতে পেরেছে। শিক্ষা ও সমাজনীতিতে সর্বজনীন উৎকর্ষ সাধন করতে না পারলেও তাদের মধ্যে এর সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন আছে। তাই তারা উন্নতির পথে মুক্তির পথে অগ্রসরমান।

সভ্যতার নগ্নরূপ : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এর বহু আগেই ইংরেজরা কূটকৌশলে ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল। তারা তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য সভ্যদেশ চীনকে নৈতিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করে চীনের একাংশ দখল করে নেয়। জাপান যখন উত্তর চীনকে গ্রাস করে, তখন সভ্য ইংরেজ সে আগ্রাসনের কোনো প্রতিবাদ তো করেইনি; বরং তারাই জাপানকে এ আগ্রাসনে প্ররোচিত করেছিল। ইংরেজ সভ্যতার মানবতাবোধশূন্য নির্মম নগ্নরূপ প্রকট আকার ধারণ করে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে তারা তাদের শাসনক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল ও শত্রুতার জন্ম দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে। মূলত তারা নিজেদের সভ্য জাতি হিসেবে প্রচার করলেও উপমহাদেশে তাদের সভ্যতার নির্মম অমানবিক নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের আশাবাদ : প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শেষে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে একদিন মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশ ঘটবে যা নির্যাতিত-নিপীড়িত ভারতবাসীকে আলোর পথ দেখাবে, পৌঁছে দেবে তাদের মুক্তির দ্বারপ্রান্তে। সমাজের সংগ্রামী জনতা একদিন নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সব বাধা অতিক্রম করে তাদের মহৎ মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হবে। ফিরে পাবে তাদের হারানো গৌরব আর শৌর্য-বীর্য।

উপসংহার : সময়ের প্রয়োজনে একদিন যে সভ্যতার সূচনা হয়েছিল, কালান্তরে তা আজ সংকটাপন্ন। ইংরেজরা আমাদেরকে তাদের শক্তি দেখাতে পারলেও মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী মনোভাবের কারণে সভ্যতা আজ কলুষিত, সংকটাপন্ন। এ সংকট থেকে জাতির মুক্তি ঘটবে, লেখক এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ১২ ॥ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে স্বরূপ তুলে ধরেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসরণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণপূর্বক লেখকের অভিমত ব্যাখ্যা কর।

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনার স্বরূপ আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, নোবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলন হতে চয়ন করা হয়েছে। লেখক তার জীবনসায়াহ্নে আশিতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বীয় উপলব্ধিজাত ভাবনা থেকে প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখক গভীর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

সভ্যতার স্বরূপ : Oxford Dictionary-তে সভ্যতা বা Civilization-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– A state of human society that is very developed and organized.

সভ্যতার এ সংজ্ঞা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, সভ্যতার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল পণ্ডিতগণ তাকে বলেছেন, 'সদাচার'। আর সদাচার হলো কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন।

প্রাচ্য সভ্যতার স্বরূপ

প্রাচ্য সভ্যতার পরিচয় : প্রাচ্য শব্দের অর্থ পূর্ব। ইংরেজিতে প্রাচ্য শব্দের প্রতিশব্দ– Oriental. প্রাচ্য সভ্যতা বলতে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে অবস্থিত দেশসমূহের সভ্যতাকে বোঝায়। পূর্ব গোলার্ধে রয়েছে– ভারত, চীন, জাপান, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে এসব দেশের আর্থ-সামাজিক চিত্র তুলে ধরে প্রাচ্য সভ্যতার যে স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন তা নিচে আলোচিত হলো :

ভারতীয় সভ্যতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রবন্ধে ভারতীয় সভ্যতাকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা হলো, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সভ্যতার যে রূপ প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন 'সদাচার'। সদাচার হলো কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সে নিয়মগুলো সম্বন্ধে প্রাচীনকালের ধারণা ছিল একটি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে বিখ্যাত ছিল, সে দেশের যে আচার ও সংস্কৃতি যুগ পরম্পরায় চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার বা সভ্যতা।

চৈনিক সভ্যতা : পৃথিবীতে চীনাদের মতো সভ্য জাতি বিরল। অধ্যবসায় ও শ্রম, মূলত এ দুটি জিনিসই তাদের উন্নত জাতিতে পরিণত করেছে। চৈনিকরা আত্মবিশ্বাসী জাতি। এত বড় একটি প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজরা স্বজাতির স্বার্থের জন্য বলপূর্বক আফিমবিষে জর্জরিত করে একাংশ আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। সভ্য জাতি হয়েও এ বর্বরতা সংঘটিত করার জন্য তারা এতটুকু কুণ্ঠিত হয়নি।

জাপানি সভ্যতা : ইংরেজরা যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে নিজেদের বিশ্ব কর্তৃত্ব রক্ষা করে আসছে, তার যথোচিত চর্চা থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত ছিল। অথচ জাপান সে যন্ত্রশক্তির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল সম্পদশালী ও সভ্য জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কেননা জাপান পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত ছিল। প্রাবন্ধিক জাপানের সমৃদ্ধি স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, দেখে এসেছেন তাদের সভ্য শাসনের স্বরূপ।

আফগান সভ্যতা : আফগান জাতির মধ্যে শিক্ষা ও সমাজনীতির সর্বজনীন উৎকর্ষ যদিও তখনো ঘটেনি, কিন্তু তাদের মাঝে তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। তার একমাত্র কারণ, সভ্যতা-গর্বিত কোনো ইউরোপীয় জাতি তখন পর্যন্ত আফগানদের পরাভূত করতে পারেনি। এরা তাই উন্নতির পথে, মুক্তির পথে অগ্রসরমান। অথচ ভারতবর্ষ ইংরেজদের মনুষ্যত্ববিবর্জিত নির্মম শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে পড়েছিল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ

পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচয় : পাশ্চাত্য শব্দের অর্থ হলো পশ্চিম দেশীয়, প্রতীচ্য। আর পাশ্চাত্য সভ্যতা হলো, পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা। ইংরেজিতে তাকে Western civilization বলে। পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গড়ে ওঠা সভ্যতাই পাশ্চাত্য সভ্যতা নামে পরিচিত। বিশেষ করে ইংল্যান্ডকে আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার বলা হয়। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও মানবমৈত্রীর

বিশুদ্ধ চর্চা তাদের উন্নত সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত করেছে। লেখক প্রথমদিকে তাদের সভ্যতার এ রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রবন্ধের প্রথমাংশে পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রীত হলেও শেষাংশে তিনি তার মোহভঙ্গের কথা উপস্থাপন করেছেন। একসময় তার পাশ্চাত্য সভ্যতাকে মহৎ ও মহান মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষজীবনে তিনি এ সভ্যতার অসারতা তুলে ধরলেন এভাবে– "এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা-জানি, সে তার সভ্যতার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে, যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতাভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।"

পাশ্চাত্য সাহিত্য : বিশ্বে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত ইংরেজদের ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে জানা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষা প্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গে, শেক্সপিয়রের নাটক ও বায়রনের কাব্য নিয়ে আলোচনায় মুখরিত থাকতো। শিক্ষিত ভারতীয়রা মূলত ইংরেজি সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা : প্রাচীন সদাচারের স্থলে ইংরেজ সভ্যতার আদর্শ ভারতীয়রা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল ইংরেজি শিক্ষা। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবেই দীর্ঘদিনের কুসংস্কার থেকে ভারতবাসী মুক্ত হতে পেরেছিল।

ইংরেজদের মহত্ত্ব : মহত্ত্বে ইংরেজদের খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী। লেখক বলেছেন, "আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজদের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন।" মূলত ইংরেজদের মহত্ত্ব ছিল অতুলনীয়। ইংরেজ সভ্যতা ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বহু দেশকে আলোর পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে রয়েছে ইংরেজ জাতির সীমাহীন অবদান। ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে বহু অসভ্য জাতি সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক দিক : সভ্য শাসনের নাম করে ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতি মানবতাকে বিধ্বস্ত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে এখানে তারা রোপণ করেছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, ভগ্নস্বাস্থ্য– এক কথায়, তাদের আগ্রাসনের আগুনে পুড়ে গেছে ভারতীয় মাটির সম্ভাবনাময় ফসল। তাই প্রাবন্ধিক প্রথম জীবনে ইংরেজকে শ্রদ্ধা করলেও জীবনসায়াহ্নে তার মনে জ্বলে উঠেছে ইংরেজবিরোধী ক্ষোভের আগুন। ইংরেজ সভ্যতার নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যের কারণে গোটা ভারতবর্ষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মূলত ইংরেজ সভ্যতা ছিল মস্ত বড় এক ধোঁকা। তাদের স্বার্থান্বেষী সভ্যতার আবরণের তলে লুকিয়েছিল ফ্যাসিবাদের কলুষিত বীজ, শাসনের নামে শোষণ ও অত্যাচার।

উপসংহার : প্রাচ্য সভ্যতা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকারী হিসেবে পাশ্চাত্যের কাছে চিরঋণী। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব শুধু প্রাচ্যে নয়, সারাবিশ্বেই পড়েছিল সমানভাবে, কিন্তু কালক্রমে তাদের আগ্রাসী ও সাম্রাজ্যবাদী মুখোশ সবার কাছেই প্রকাশ পেয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রীত লেখক সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধির পর তাই ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে।

▸▸ প্রশ্ন : ১৩ ॥ সভ্যতা কী? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসারে ইংরেজ সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১১]

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সভ্যতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন– আলোচনা কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ইংরেজ সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন করেছেন কীভাবে?

উত্তর || উপস্থাপনা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্য জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন। প্রবন্ধকার নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করেছেন এ প্রবন্ধে। তিনি তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোশ উন্মোচনের মাধ্যমে ইংরেজদের কলুষিত নগ্নরূপ অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন।

সভ্যতার সংজ্ঞা : Oxford Dictionary-তে সভ্যতা বা Civilization-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– A state of human society that is very developed and organized. অন্য অর্থে বলা যায়– Advanced stage in social development অর্থাৎ সভ্যতা হচ্ছে, সামাজিক উন্নয়নের উচ্চতর ধাপ। সভ্যতার এ সংজ্ঞা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অবদান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, সভ্যতার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন 'সদাচার'। আর সদাচার হলো, কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে বিখ্যাত ছিল, সে দেশে যে আচার ক্রমান্বয়ে চলে এসেছে, তাকেই বলে সদাচার বা সভ্যতা।

ইংরেজ/ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম জীবনে বিশ্বাস করতেন, আধুনিক সভ্যতা ইউরোপীয়দের দান। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ, মনুষ্যত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখে লেখক মনে করেছিলেন, ইংরেজদের আগমনের ফলে সকল ক্ষেত্রে আমাদের নতুন আশা-উদ্দীপনা জাগ্রত হয়েছে। তাঁর বিশ্বাস জেগেছিল, ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে পরশ পাথরের স্পর্শের মতো আমরাও সভ্য হতে পারব। রবীন্দ্রনাথ গভীর প্রত্যয়ে ইংরেজদের মধ্যে মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো– উদারতা, মানবিকতা, সহনশীলতা, কর্মের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করে তাদের প্রতি প্রীত হয়েছিলেন। কিন্তু শেষজীবনে এসে তা ঘৃণায় রূপলাভ করে। তিনি বলেন, "আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ। তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হলো কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের আলোকে নিচে ইংরেজ বা ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ উপস্থাপন করা হলো।

ইংরেজ সভ্যতার অসারতা : ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে যে সভ্যতার বীজ বপন করেছিল তা ছিল অসারতাপূর্ণ। তাই লেখক তাদের সমালোচনা করে বলেন, "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর-মনের পক্ষে যা

কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।"

ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা : সভ্য শাসনের নামে ইংরেজরা মানবতাকে করেছে বিধ্বস্ত। তারা সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী মনোভাবের কারণে ভারতবর্ষে রোপণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। আসলে ইংরেজ সভ্যতা হলো এক মস্ত বড় ফাঁকি। তাদের সভ্যতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে ফ্যাসিবাদের বীভৎস রূপ। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তারা এত বড় মানবতাবিরোধী নিপীড়ন চালাবে, তা ছিল কল্পনারও অতীত। সভ্যতার ছদ্মাবরণে ইংরেজরা ভারতবাসীর সাথে যা করেছে তা ছিল প্রকারান্তরে বিশ্বাসঘাতকতা।

ইউরোপীয় সভ্যতার বঞ্চনা : ইউরোপীয় সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় তাদের যন্ত্রশক্তির চর্চার প্রভাবে, কিন্তু তারা ভারতবাসীকে এর যথাযথ চর্চা থেকে বঞ্চিত করে। অথচ জাপান-রাশিয়া যন্ত্রশক্তির চর্চা করে উন্নতির স্বর্ণশিখর স্পর্শ করেছে। কারণ তারা ছিল ইংরেজদের কর্তৃত্বমুক্ত। পক্ষান্তরে ইংরেজরা ভারতবাসীকে শোষণ-নিপীড়ন-নিষ্পেষণে নিঃশেষ করেছে।

সভ্যতার নগ্নরূপ : দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। দুই মহাযুদ্ধের প্রায় দেড়শ বছর আগেই ইংরেজরা কূটকৌশলে ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্য তারা সভ্যদেশ চীনকে নৈতিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করে চীনের একাংশ দখল করে। একইভাবে জাপান যখন উত্তর চীনকে গ্রাস করে, তখন সভ্য ইংরেজ সে আগ্রাসনের কোনো প্রতিবাদ করেনি। ইংরেজ সভ্যতার নগ্নরূপ প্রকট আকার ধারণ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের শাসনক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য 'Divide and rule' নীতির মাধ্যমে এ দেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল ও শত্রুতার জন্ম দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে।

ভারতে সাম্প্রদায়িকতার জন্মদাতা ইংরেজ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর ইংল্যান্ড সফর ও ইংরেজি শিক্ষার কারণে এই মোহ গাঢ়তর হয়, কিন্তু বহির্বিশ্বে ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ এবং ভারতবর্ষে Law and order-এর নামে 'Divide and rule' নীতি কার্যকর করে। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে ইংরেজরা সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দেয়, তাদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য।

সংস্কৃতির বিনাশ সাধন : পৃথিবীতে ইংরেজ জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নত ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তারা বহু প্রাচীন মানব জাতি-গোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতিকে গলাটিপে হত্যা করেছে। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সংস্কৃতির রূপান্তরের নামে আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ মূলত তাদের মূল সংস্কৃতিকে বিনাশ করেছিল। তারা তাদের শাসনযন্ত্রকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করতে নিজেদের সংস্কৃতি ও আদর্শ চাপিয়ে দিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জনের চেষ্টায়।

ইউরোপীয় সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন : 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ বর্ণনার মাধ্যমে তাদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। উচ্চমানের সাহিত্য, উন্নত সংস্কৃতি, আধুনিক যন্ত্রশক্তি, মানবতাবোধ প্রভৃতির ধারক-বাহক সেজে ইউরোপীয় ইংরেজরা ভারতবর্ষে জমিদার-ধনিক শ্রেণির সহায়তায় যে অপশাসন ও শোষণ চালিয়েছে, তার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ইংরেজ শাসন ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছে। তারা এদেশে এসেছিল সাম্রাজ্যবাদী শোষণ চালাতে।

সাম্রাজ্য বিস্তারই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। আধুনিক সভ্যতার জয়ঢাক পিটিয়ে, মানবমৈত্রীর দোহাই দিয়ে তারা সভ্যতার মুখে কালিমা লেপন করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত মার্জিত ভাষায় ইউরোপীয়দের মুখোশ খুলে দিয়েছেন এভাবে– "এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত ইউরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।"

উপসংহার : প্রবল প্রতাপশালী ইউরোপীয় সভ্যতার জগদ্দল পাথরচাপায় ভারতবর্ষ যখন নিরুপায় নিশ্চলতার আবর্তে নিপতিত হতে থাকে, তখন থেকেই প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোহভঙ্গ ঘটতে থাকে। সভ্যতার আড়ালে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে নিদারুণ দারিদ্র্য তাকে ব্যথিত করে তোলে। তাই তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইউরোপীয় সভ্যতার মুখোশ মানুষের কাছে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ১৪ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সঙ্কটাপন্ন বিশ্বসভ্যতার মধ্যেও যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮]

অথবা, "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।" উক্তিটি বিশ্লেষণপূর্বক লেখকের মতামত ব্যক্ত কর।

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে লেখকের নবজীবনের যে প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে তা আলোচনা কর।

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসরণে প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশার ভাষাচিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : অসামান্য প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ থেকে প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি সংকলিত হয়েছে। এখানে লেখক ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ও কদর্যরূপ দেখে যেমন হতাশা প্রকাশ করেছেন, তেমনি প্রাচ্য সভ্যতার বিশেষ করে ভারতবর্ষে মানুষের নবজাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ : প্রথমদিকে ইউরোপীয় সভ্যতা লেখককে আকৃষ্ট করলেও পরবর্তীতে তা ঘৃণায় রূপ নেয়। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ইংরেজরা কূটকৌশলে ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল এ সময়ের বহু আগেই। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্য তারা সভ্যদেশ চীনকে নৈতিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করে তার একাংশ দখল করে নেয়। জাপান যখন উত্তর চীনকে গ্রাস করে তখন সভ্য ইংরেজ সে আগ্রাসনের কোনো প্রতিবাদ করেনি। ইংরেজ সভ্যতার নগ্নরূপ প্রকট আকার ধারণ করে ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে তারা তাদের শাসন ও শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এদেশের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল ও শত্রুতার জন্ম দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে। ইংরেজদের এ স্বার্থলোলুপতা প্রত্যক্ষ করেই ভারতবাসী স্বদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নে সচেষ্ট হয়।

প্রাবন্ধিকের মোহভঙ্গ : প্রাবন্ধিক তাঁর জীবনের সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় ইংরেজ জাতির সান্নিধ্যে আসেন। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের রস আস্বাদন করে তৃপ্ত হন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষেই ইংরেজ সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল সারাবিশ্বে। ভারতবাসী মুক্তির ইশারা ইউরোপীয় চিন্তার পথ ধরেই পেয়েছিল। এ দেশবাসী যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে তখনো ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি তাদের বিশ্বাস এতটা অটুট ছিল যে, এ দেশের নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন, "এ বিজিত জাতির স্বাধীনতা বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।" কিন্তু ইংরেজনীতির কদর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে, তাদের

বর্বর আচরণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গ ঘটে। তিনি বলেছেন, "সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক।"

ইংরেজ বিতাড়নের আশাবাদ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর মোহভঙ্গের পর ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে একদিন না একদিন ইংরেজ জাতিকে এ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, কিন্তু সেদিন তারা যে ভারতবর্ষ ফেলে যাবে তা এক লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনার স্তূপ মাত্র। তবুও ভেঙে পড়লে চলবে না। কেননা ভারতবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড তেজ প্রত্যক্ষ করে লেখকের যে বিশ্বাস জন্মেছে, সে বিশ্বাস তিনি অক্ষুণ্ন রাখতে চান। লেখক বলেন, "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।" অর্থাৎ তিনি আশাবাদী ছিলেন, প্রাচ্যের এ দেশটি একদিন জেগে উঠবে এবং সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি ইংরেজদের চিরতরে বিতাড়িত করে স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হবে।

ভারতবাসীর প্রতি প্রত্যাশা : প্রবন্ধকার অবশেষে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এভাবে– পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে হয়তো বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের নির্মল আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যা নির্যাতিত-নিপীড়িত ভারতবাসীকে দেখাবে আলোর পথ, পৌঁছে দেবে তাদের সভ্যতার স্বর্ণশিখরে। সমাজের সংগ্রামী জনতা একদিন নিজেদের জয়যাত্রার অভিযানে সব বাধা পদদলিত করে তাদের মহৎ মর্যাদা ফিরে পাওয়ার জন্য দৃঢ়পদে অগ্রসর হবে। তারা ফিরে পাবে তাদের হারানো গৌরব আর শৌর্য-বীর্য।

নতুন প্রজন্মের কাছে প্রত্যাশা : পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন। সেই বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মানবাত্মার উন্নয়নে, ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণে ভারতীয় দর্শন মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে। তাই লেখক প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন– ভারতের বর্তমান পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করার জন্য নতুন প্রজন্মের তরুণেরা আত্মনিবেদিত হবে এবং জাতির এ দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটাবে। প্রাবন্ধিক আশাবাদ ব্যক্ত করে আরো বলেন, "অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।"

হৃত-মর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা : কোনো জাতি যখন আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে হৃত-মর্যাদা ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়, তখন তার অগ্রযাত্রা কেউ প্রতিহত করতে পারে না। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে সে জাতি অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। লেখক মনে করেন, পরাধীন জাতির মনুষ্যত্বের অন্তহীন পরাভব, প্রতিকারহীন বলে ধারণা করা এক ধরনের অপরাধ। এ অপরাধবোধকে অতিক্রম করে একদিন অপরাজিত জাতির আত্মপ্রত্যয় নিয়ে ভারতবাসী জয়যাত্রা শুরু করবে। এ পথের সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে জাতি তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবে– রবীন্দ্রহৃদয়ে এ প্রত্যাশা বিধিবদ্ধরূপ ধারণ করেছিল।

মহাশক্তির উত্থানের আশাবাদ : মানুষ ও মানবজাতির প্রতি বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস খসে যাচ্ছে মানবতার লাঞ্ছনা দেখে; তাই তিনি কিয়ৎ অবসন্ন, তবে নিরুদ্যম নন। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তিনি সভ্যতা বলতেই চাননি। তাই পাশ্চাত্যের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে তিনি প্রাচ্যে বিশ্বাস আনলেন। কেননা মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। তিনি মানব-ত্রাণকর্তার আবির্ভাবে স্বপ্ন দেখলেন প্রাচ্যের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরে। মহাশক্তি বা মহামানবের আগমনগীতি গাইলেন, (মহামানব কোনো ব্যক্তিমানব নন, নবচেতনায় জাগরিত মহামানব)। বিশ্বে তাদের আগমন কল্যাণবহ। ভারতবর্ষে তার সমসাময়িক ধনীরা সংগ্রামী ও যথার্থ শক্তিশালী নয়। তাই তিনি আশ্রয়

নিলেন অশক্ত দুর্বলের, দারিদ্র্যের। শেষজীবনে তিনি যে মহামানব কামনা করলেন, তার আগমন কোনো বিশেষ শ্রেণি প্রতিষ্ঠার জন্য নয়; বরং মানবত্রাণের জন্য, সভ্যতার যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের জন্য।

উপসংহার : পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার খোলসাবৃত ইংরেজদের হীন-কদর্য বীভৎস রূপ উপলব্ধি করে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি যারপরনাই বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, কামনা করেছেন তাদের অপসারণ। এ ব্যাপারে ভারতবর্ষের সাফল্যের বিষয়েও আশান্বিত হয়েছেন তিনি। কালপরিক্রমায় তাঁর আশার যেমন বাস্তবায়ন ঘটেছে, তেমনি ভারতবাসীও পাশ্চাত্য সভ্যতার শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে।

»» প্রশ্ন : ১৫ ॥ "মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে।" –এই উক্তির আলোকে ইংরেজ সভ্যতার ইতিবাচক দিকসমূহ বিশ্লেষণ কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসরণে ইংরেজ সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো তুলে ধর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসারে ভারতবর্ষে ইংরেজ সভ্যতা আদরণীয় হওয়ার কারণ আলোচনা কর।

অথবা, প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের প্রথম বেলায় ইংরেজ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেন?

উত্তর|| উপস্থাপনা : অসামান্য প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিক, নোবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ থেকে গৃহীত। লেখক তাঁর আশিতম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বীয় উপলব্ধিজাত ভাবনা থেকে প্রবন্ধটি রচনা করেন। লেখক গভীর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এ প্রবন্ধে।

ইংরেজ সভ্যতার ইতিবাচক দিকসমূহ

পাশ্চাত্য সভ্যতা : পাশ্চাত্য শব্দের অর্থ হলো পশ্চিম দেশীয়, প্রতীচ্য। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়– Western. আর পাশ্চাত্য সভ্যতা হলো পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Western civilization. এ অর্থে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গড়ে ওঠা সভ্যতাই পাশ্চাত্য সভ্যতা। বিশেষ করে ইংল্যান্ড আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার বলে স্বীকৃত। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ চর্চা তাদেরকে বিশ্বে উন্নত জাতিতে পরিণত করেছে। লেখক ইংরেজদের এ রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

পাশ্চাত্য সাহিত্য : ইউরোপীয়দের মধ্যে ইংরেজদের ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। তখন ভারতবর্ষে ইংরেজি সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা থাকা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। ভারতীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গ ভঙ্গে, শেক্সপিয়ারের নাটক ও বায়রনের কাব্য নিয়ে আলোচনায় মুখরিত থাকত। শিক্ষিত ভারতীয়দের মাঝে এভাবে ইংরেজি ভাষার কদর বেড়ে যায়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা : প্রাচীন ভারতের সদাচারের স্থলে ইংরেজ সভ্যতার আদর্শ ভারতীয়রা মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিল। ভারতীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল ইংরেজি শিক্ষা। এ শিক্ষার প্রভাবেই ভারতবাসী দীর্ঘদিনের কুসংস্কার থেকে বের হয়ে আসতে পেরেছিল।

যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ : ইংরেজরাই যন্ত্রসভ্যতার চর্চা করে সমৃদ্ধির চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছিল। তারা ভারতবর্ষে এ যন্ত্রসভ্যতা নিজেদের স্বার্থে নিয়ে আসলেও পরবর্তীতে তা

থেকে ভারতবাসীও উপকৃত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, ভারতে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশে ইংরেজদের অপরিসীম অবদান ছিল।

মানবমৈত্রীর পরিচয় : ইংরেজরা বিশ্বে সভ্য জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করেছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যান্ডে। প্রাবন্ধিক মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় পেয়েছিলেন ইংরেজদের চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। কারণ তখনো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

ইংরেজদের মহত্ত্ব : ইংরেজরা তাদের মহত্ত্বের জন্য জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে লেখক বলেছেন, "আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজদের সাথে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন।" ইংরেজ সভ্যতার সংস্পর্শে বহু অসভ্য জাতি সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বহু দেশকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। তাই বলা যায়– আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিমূলে ইংরেজদের অবদান অনেক।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংরেজ মহত্ত্বের প্রভাব : ইংরেজদের মানবমৈত্রী দেখে ভারতবাসী মুগ্ধ হয়েছিল। ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি ছিল তাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, একসময় তারা স্থির করেছিল, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী ইংরেজ জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে। এ বিশ্বাস থেকেই ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী হিসেবে অহিংস আন্দোলন বেগবান হয়েছিল।

ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব : ভারতে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ছিল ব্যাপক। ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়ে তা পাকাপোক্ত করার জন্য ইংরেজরা এখানে ইংরেজি শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

মহৎপ্রাণ এন্ড্রুজ : জীবনের প্রথম প্রহরে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রশংসায় ছিলেন পঞ্চমুখ। অথচ শেষজীবনে এসে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদমত্ততার পরিচয় পেয়ে তিনি ইংরেজ সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস হারান, কিন্তু তার মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তির চরিত্রগুণ আর ঔদার্যের কাছে সবসময় ছিলেন অবনতমস্তক। তাই তিনি বলেন, "দৃষ্টান্তচ্ছলে এন্ড্রুজের নাম করতে পারি। তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রিস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। বস্তুত এন্ড্রুজের মতো মহৎপ্রাণ ইংরেজরাই সারা পৃথিবীতে ইংরেজদের মহত্ত্ব ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজপ্রীতি : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন একটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় পরিবারে, যে কারণে ইংরেজি শিক্ষা-সভ্যতার ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল তার জীবনে। কৈশোর থেকেই ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে তার যোগাযোগ ছিল অত্যন্ত নিবিড়। তাই ইংরেজ সভ্যতার প্রতিও তিনি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি ইংরেজদের মধ্যে মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় খুঁজে পেয়েছিলেন। বিলেত ভ্রমণে গিয়ে ইংরেজদের মহত্ত্বের সাথে সরাসরি পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্যও তার হয়েছিল। ইংরেজ চরিত্রের এসব ইতিবাচক দিক রবীন্দ্রনাথ খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই ইংরেজ সভ্যতার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একই কারণে ভারতবাসীর কাছেও এ সভ্যতা আদরণীয় হয়ে উঠেছিল।

উপসংহার : ইংরেজ সভ্যতা বিশ্বব্যাপী যে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা তাদের চরিত্রের সদগুণাবলির জন্যই। তাদের চরিত্রে মানবমৈত্রীর ও মানবহিতৈষণার যে অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল, তা ছিল তাদের বাহ্যিক রূপ। আর তাদের এ বাহ্যিক রূপের উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মোহভঙ্গ ঘটায় তিনি তাদের সমালোচনা করেন।

» প্রশ্ন : ১৬ ॥ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসরণে ইংরেজ সভ্যতার নেতিবাচক দিকসমূহ আলোচনা কর।

অথবা, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গের কারণ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অবলম্বনে আলোচনা কর।

অথবা, "আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।" –এ উক্তির আলোকে ইংরেজ সভ্যতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের মোহভঙ্গের কারণসমূহ লিপিবদ্ধ কর।

অথবা, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের আলোকে ইংরেজ জাতির প্রতি প্রাবন্ধিকের আক্ষেপের কারণ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি তাঁর সুচিন্তিত সাহিত্য প্রতিভার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ প্রবন্ধে লেখক যেমনিভাবে ইংরেজ সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো ব্যক্ত করেছেন, তেমনিভাবে তাদের নেতিবাচক দিকগুলোও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে এর কঠোর সমালোচনা করেছেন।

ইংরেজ সভ্যতার নেতিবাচক দিক/লেখকের মোহভঙ্গের কারণ

প্রাবন্ধিকের ইংরেজপ্রীতি : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম জীবনে বিশ্বাস করতেন, আধুনিক সভ্যতা ইউরোপের দান। মানবহিতৈষণা ও মানবমুক্তির চিত্তজাগানিয়া সংগীত ইউরোপ থেকেই ধ্বনিত হয়েছে। জগদ্বাসীর মুক্তির ইশারা ইংরেজদের কাছ থেকেই পাওয়া। ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে প্রশস্ততায় তাদের আচার-আচরণে ভারতবাসী মুগ্ধ হয়। মনুষ্যত্বের প্রতি ইংরেজদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখে লেখক মনে করেছিলেন, ইংরেজদের আগমন ভারতবাসীর জন্য শুভ। তাঁর বিশ্বাস জেগেছিল, ইংরেজ জাতির সংস্পর্শে এসে পরশ পাথরের স্পর্শের মতো ভারতবাসীরাও সভ্য হতে পারবে। তিনি ইংরেজদের উদারতা, মানবিকতা, সহনশীলতা, কর্মের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি সদগুণ লক্ষ করে তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন।

প্রাবন্ধিকের মোহভঙ্গ : ইংরেজি সাহিত্যের রস আস্বাদন করে লেখক তৃপ্ত হন, কিন্তু নিভৃতে ইংরেজি সাহিত্যের রসসম্ভোগের মোহময় বেষ্টনী থেকে একদিন লেখককে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ইংরেজ-নীতির কদর্যরূপ প্রত্যক্ষ করে, তাদের বর্বর আচরণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে লেখকের মোহভঙ্গ ঘটে। তাই তিনি বলেন, "সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর-মনের পক্ষে যা কিছু অত্যাবশ্যক, তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসনচালিত কোনো দেশে ঘটেনি।"

ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা : বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইংরেজরা সভ্য শাসনের নামে মানবতাকে বিধ্বস্ত করেছে। ভারতবর্ষে তাদের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কারণে

রোপিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ। আসলে ইংরেজ সভ্যতা হলো একটা মরীচিকা। তাদের সভ্যতার অন্তরালে লুকিয়ে আছে ফ্যাসিবাদের বীভৎস রূপ। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় যাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তারা ভারতে এতবড় মানবতাবিরোধী নিপীড়ন চালাবে, তা ছিল কল্পনার অতীত। সভ্য জাতি সেজে তারা ভারতে অপশাসন কায়েম করে মূলত ভারতবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

ইংরেজদের অপশাসন : প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন ব্রাইটের মুখে যে শাশ্বতবাণী শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এন্ড্রুজের সান্নিধ্যে তার মহত্ত্বের যে পরিচয় পেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসনের হিংস্রতা সেসবকে ম্লান করে দিয়েছিল। ফলে অচিরেই লেখকের মনে ইংরেজদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই তিনি আক্ষেপের সাথে বলেছেন, "জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

বঞ্চনার শিকার ভারতবাসী : ইংরেজরা তাদের যন্ত্রশক্তির বদৌলতে বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে, কিন্তু তা চর্চার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় নিজেদের স্থান করে নেওয়ার সুযোগ থেকে ভারতবাসীকে তারা বঞ্চিত রেখেছে। জাপান, রাশিয়া যন্ত্রশক্তির চর্চা করে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছে। কারণ তারা ছিল ইংরেজদের কর্তৃত্বমুক্ত। পক্ষান্তরে ইংরেজরা ভারতবাসীকে শোষণ, নিপীড়ন ও নিষ্পেষণে নিঃশেষ করেছে। যেমন লেখক বলেছেন, "এই দুই প্রাচ্য দেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই– ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা : ভারতবর্ষ শাসন করতে এসে ইংরেজরা এ অঞ্চলে সভ্যতার যে বীজ বপন করেছিল, তা যে অসারতাপূর্ণ তা একসময় ভারতবাসীর কাছে স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। তারা Law and order-এর নামে Divide and rule কার্যকর করে। তাই ইংরেজি সাহিত্য এবং ইংরেজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম ভক্ত রবীন্দ্রনাথও তাদের কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, "নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদঘাটিত হলো তা হৃদয়বিদারক। অন্ন, বস্ত্র, পানীয়, শিক্ষা, আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর-মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধহয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।" উন্নয়নের নামে ভারতবাসীকে তারা দিয়ে যায়– Law and order যার অপর নাম দারোয়ানি।

দ্বি-জাতিতত্ত্বের উদ্ভব : ইংরেজরা ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে সুকৌশলে ভারতীয় জাতিসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছিল সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপনের মাধ্যমে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের প্রাচীর তুলে দিয়ে গোটা জাতিকে করেছিল বিচ্ছিন্ন। ফলে ভারতের আবহমানকালের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়েছিল। অথচ ইংরেজ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন ছিল ঐক্য ও সম্প্রীতি। প্রাবন্ধিক বলেছেন, "সভ্য-শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন চালিত দেশে।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার নগ্নরূপ : বিশ্বব্যাপী ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে। এর বহু আগেই ইংরেজরা কূটকৌশলে ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার ও চরিতার্থের জন্য তারা সভ্যদেশ চীনকে নৈতিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করে চীনের একাংশ দখল করে নেয়। জাপান যখন উত্তর চীন দখল করে তখন সভ্য ইংরেজ সে আগ্রাসনের কোনো প্রতিবাদ করেনি। মূলত ভারতবর্ষেই ইংরেজ সভ্যতার নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ বেশি ঘটে। ভারতবাসীকে তারা শাসনের নামে নির্মমভাবে শোষণ করেছে। যার ফলে, দারিদ্র্যের কষাঘাতে মানুষ এখানে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়েছে।

লেখকের মর্মপীড়া : লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারাজীবন ইংরেজ সভ্যতা ও সাহিত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকলেও শেষ জীবনে মোহভঙ্গের বেদনায় নীল হয়ে উঠেছেন। ইংরেজরা কৌশলে ভারতীয় জাতিসত্তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, ভারতবাসীকে দারিদ্র্যের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে। ইংরেজরা তাদের শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, কিন্তু মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।

ইংরেজ শাসনের শেষ পরিণতি : ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলে এর অধিবাসীদের মধ্যে সেদিন যে দুর্গতি সৃষ্টি হয়েছিল, সে কেবল অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমাত্র নয়; তা হলো ভারতবাসীর মধ্যে চরম নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ। তাদের কূটকৌশলে ভারতীয় জাতিসত্তা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।

উপসংহার : প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজদের মারাত্মক নেতিবাচক দিক হলো তাদের ক্ষমতা-মদমত্ততা ও আত্মম্ভরিতা, যা তারা ভারতবর্ষে দেখিয়েছে। মূলত প্রবল প্রতাপ আর ক্ষমতার মোহই ইংরেজদের কলুষিত করেছে। মানবমৈত্রীর দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইংরেজরা বিশ্বব্যাপী যে সম্মান অর্জন করেছিল তা পরবর্তীতে ঘৃণায় পর্যবসিত হয়েছে।

▸▸ প্রশ্ন : ১৭ ॥ "মানুষই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল"– আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : অনন্য প্রতিভাধর কবি, সাহিত্যিক ও নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি তাঁর 'কালান্তর' প্রবন্ধ সংকলন থেকে সংগৃহীত। লেখক তাঁর ৮০তম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বীয় উপলব্ধিজাত ভাবনা থেকে প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটি মূলত তাঁর আত্ম-সমালোচনামূলক দলিল হলেও এতে তিনি যে ভাবের ও মানুষের সত্তার বিশ্বাসের কথা বলেছেন তাতে তাঁর দার্শনিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

মানবিকতা ও রবীন্দ্রনাথ : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন মানবিক মূল্যবোধের অধিকারী। প্রথম জীবনে তিনি মনে করতেন, আধুনিক সভ্যতা ইউরোপের দান। মানবহিতৈষণা ও মানবমুক্তির চিত্তজাগানিয়া সংগীত ইউরোপ থেকেই ধ্বনিত হয়েছে। জগদ্বাসীর মুক্তির ইশারা ইংরেজদের কাছ থেকেই পাওয়া। তিনি ইংরেজদের উদারতা, মানবিকতা, সহনশীলতা, কর্মের প্রতি আগ্রহ প্রভৃতি সদগুণ লক্ষ করে তাদের প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু জমিদারি কাজে যখন তিনি নিজ চোখে প্রজাপীড়ন, দুর্দশা, খাদ্যাভাব, অত্যাচার প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর মনোভাবে পরিবর্তন আসার পাশাপাশি ইংরেজপ্রীতিও নিঃশেষ হয়ে যায়। তাঁর মানবিক আবেদন এবং স্নেহবোধ আরো জোরালো হয়ে ওঠে। তিনি বিশ্বাস করেন, এদেশের গণমানুষের জাগরণের মাধ্যমে ইংরেজদের এ অত্যাচার ও উৎপীড়নের অবসান ঘটবে। আর সেই মানুষে বিশ্বাস স্থাপনের কথা 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে উঠে এসেছে।

বিশ্বাস পরিবর্তনের কারণ : 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে দেখা যায়, তৎকালীন ইংল্যান্ড আধুনিক সভ্যতার সূতিকাগার বলে স্বীকৃত ছিল। তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ চর্চা তাদেরকে বিশ্বে উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিল। তাই লেখক ইংরেজদের এ বাহ্যিক রূপের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। ওই সময় লেখক ইংরেজ জাতির প্রতি অনেক বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখাতেন নিতান্তই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে। কিন্তু যেসব কারণে সেই বিশ্বাসের পরিবর্তন হয় তা হচ্ছে–

ক. ইংরেজদের কথিত সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর ভারতবর্ষের বুকে চাপিয়ে দেওয়া, যে কারণে ভারত ছিল কার্যত অচল।

খ. মানবতার চরম লঙ্ঘন ও অধিকৃত ভূখণ্ডে ইংরেজ শাসনের নির্মম চিত্র প্রদর্শন।

গ. নৈতিক শক্তির আঁড়ালে লুক্কায়িত অনৈতিকতা এবং হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ নীতির বহিঃপ্রকাশ।

ঘ. ইংরেজদের কুচক্রী মনোভাব, যেমন– চৈনিকদের মতো প্রাচীন সভ্য জাতিকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা এবং জাপানের চীন আক্রমণকালে দস্যুবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

ঙ. স্পেনের গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানো।

চ. সোভিয়েত রাশিয়া যেখানে তার অধিকৃত অঞ্চলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সম অধিকার নিশ্চিত করেছিল, সেখানে ইংরেজ জাতি তা করেনি; বরং সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করেছিল ভারতীয়দের ঐক্য বিনষ্ট করার লক্ষ্যে।

সর্বোপরি লেখক ইংরেজদের তথাকথিত সভ্যশাসন ও সভ্য আদর্শকে সত্য ও খাঁটি ভেবে যে ভুল করেছিলেন তা শেষ জীবনে এসে পরিবর্তন করতে বাধ্য হন।

রবীন্দ্র-বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল : মানবহৃদয়ই আসল, যাতে নিঃসংকোচে বিশ্বাস রাখা যায়। তাই জীবনসায়াহ্নে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র মানবহৃদয় ছাড়া আর অন্য কোথাও বিশ্বাস করতে চান না। বহির্বিশ্বে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ এবং ভারতে 'ল এন্ড অর্ডার' রক্ষার নামে 'ডিভাইড এন্ড রুল' কার্যকর করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেন। এই অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। তবে এ মানুষ পশ্চিমের ইংরেজ শাসক নয়, এরা পূর্ব দিগন্তের দারিদ্র্য-নিপীড়িত মানুষ। প্রাচ্যের এই মানুষই সভ্যতার সংকটকালে পরিত্রাণদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে বলে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেছেন। এ কারণে প্রথম জীবনের মোহ পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের প্রত্যাশায় প্রাচ্যের মানুষের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস, অবহেলিত এই প্রাচ্যবাসীই একদিন সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে আবির্ভূত হবে, মুক্তির গান শোনাবে। তখন আর ইংরেজ ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস-ভক্তির প্রয়োজন হবে না। এদেশবাসীর কল্যাণেই সেই সূর্য স্বাধীনতা আসবে, মুছে যাবে সব অপমান, লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন-নির্যাতন।

উপসংহার : পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রীত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে সভ্যতার খোলসাবৃত ইংরেজদের হীন কদর্য বীভৎস রূপ উপলব্ধি করে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি যারপরনাই বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। কামনা করেছেন তাদের অপসারণ। আর এ ব্যাপারে আশা রাখছেন ভারতবর্ষের গণমানুষের ওপর। তিনি বিশ্বাস করেন, ভারতবর্ষের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে তাদের স্বাধীনতার লাল সূর্য উদিত হবে। তাই তাঁর বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল ছিল এই ভারতবর্ষের গণমানুষ।

▸▸ প্রশ্ন : ১৮ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের নামকরণে কতটুকু সফল হয়েছেন? বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, অনেক সম্পদের চেয়ে একটি সুন্দর নাম উত্তম। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনন্যসাধারণ সৃষ্টি। তিনি এর নামকরণে কতটা সার্থক হয়েছেন তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

সাহিত্যে নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়– Literature is the mirror of life. অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের মূল ভাববস্তু ফুটে ওঠে। সাহিত্যিকগণ সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকেন। তারা ভাব বা কল্পনার সমুদ্রে অবাধ সন্তরণ করেন। তাই বলে তারা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির উর্ধ্বে নন। রচনার সাথে ন্যূনতম সামাঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সাহিত্যের নামকরণ সার্থক হয় না। সুতরাং একটি শিল্পকর্মকে সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি যথাযথ অনুসরণ করা অপরিহার্য।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু;
- কেন্দ্রীয় চরিত্র;
- নায়ক-নায়িকার নাম;
- স্থান বা কাল।
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা;

'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের নামকরণ

সভ্যতা : সভ্যতার ইংরেজি প্রতিশব্দ Civilization. এ শব্দের ব্যাখ্যায় Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে– Civilization means a state of human society that is very developed and organized. সভ্যতার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, মনু তাকে বলেছেন 'সদাচার'। আর সদাচার হলো, কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ 'ব্রহ্মাবর্ত' নামে বিখ্যাত ছিল, সেদেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে, তাকেই বলে সদাচার বা সভ্যতা।

ইংরেজ সভ্যতা : ইংরেজ বা পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। ইংরেজ চরিত্রে মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় সর্বদাই লক্ষণীয় ছিল। তাই তাদের প্রতি প্রীত হয়ে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ শিক্ষিত ভারতীয়রা। কারণ তখনো সাম্রাজ্যের মদমত্ততায় তাদের স্বভাব-চরিত্র কলুষিত হয়নি। তাই পৃথিবীর দেশে দেশে ইংরেজ সভ্যতার বিজয়বার্তা খুব সহজেই পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু লেখক জীবনসায়াহ্নে এসে তাদের অন্তরালের কলুষিত রূপ প্রত্যক্ষ করেন।

সভ্যতার সংকট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এ প্রবন্ধে সভ্যতার সংকট বলতে ইংরেজ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝিয়েছেন। একটি উন্নত সভ্যতা লালসার বশবর্তী হয়ে যখন

বিশ্বমানবতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন মানুষ সে সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না। ইংরেজ সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তা-ই ঘটেছিল। রিপুর প্রবর্তনায় ইংরেজরা তাদের উপনিবেশগুলোতে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছিল। ইংরেজ সভ্যতার সেই সংকটাপন্ন সময়ের ক-াই লেখক এ প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন।

সংকটের সূচনা : জন ব্রাইটের মুখে যে শাশ্বতবাণী শুনে লেখক মুগ্ধ হয়েছিলেন, এন্ড্রুজের সান্নিধ্যে গিয়ে মহত্ত্বের যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন, ইংরেজ শাসনের হিংস্রতা সেসব প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছিল। ফলে অচিরেই লেখকের মনে ইংরেজদের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাই তিনি আক্ষেপের সাথে বলেছেন, "জীবনের প্রারম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।"

সভ্যতার নগ্নরূপ : দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। এর বহু আগেই ইংরেজরা কূটকৌশলে ভারতবর্ষ দখল করে নিয়েছিল। নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্য তারা সভ্যদেশ চীনকে নৈতিকতাবিরোধী আখ্যায়িত করে চীনের একাংশ দখল করে নেয়। জাপান যখন উত্তর চীন গ্রাস করে, তখন সভ্য ইংরেজ সে আগ্রাসনের কোনো প্রতিবাদ করেনি। বিশেষভাবে ইংরেজ সভ্যতার নগ্নরূপ প্রকট আকার ধারণ করে ভারতবর্ষে। তারা ভারতবর্ষে নিজেদের শাসনক্ষমতা চিরস্থায়ী করার জন্য হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কোন্দল ও শত্রুতার জন্ম দিতে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে।

নামকরণের সার্থকতা : ভারতবাসী ইংরেজদের পরাধীনতার জালে আবদ্ধ হয়েও তাদের স্তুতি গেয়েছে। তাদের হৃদয়ের প্রশস্ততা, জাতিগত মহত্ত্ব, মানবমৈত্রী, সততা, সহিষ্ণুতা, সাম্য, স্বাধীনতাবোধ, মনুষ্যত্বের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় প্রাবন্ধিক নিজেও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার জীবনসায়াহ্নে ইংরেজদের অপশাসন, শোষণ এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী নীতি প্রত্যক্ষ করে বুঝতে পারেন, ইংরেজ সভ্যতা আসলে সভ্যতার ছদ্মাবরণে এক কলুষিত মূর্তি। এদেশের শক্তি ও সম্পদে ইংরেজ পুষ্টি লাভ করেছে। বিনিময়ে এ দেশের মানুষকে করেছে হতদরিদ্র। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাবঞ্চিত ভারতবাসীর প্রতি তারা দেখিয়েছে চরম অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য। ইংরেজ সভ্যতা মূলত মানুষকে শোষণ করার সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতার জনক অভিধায় খ্যাত যে ইংরেজ সভ্যতা একসময় খ্যাতির শীর্ষে অবস্থান করেছিল, তা তাদের সাম্রাজ্য মদমত্ততা আর আগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির লোলুপতায় আজ সংকটের মুখোমুখি। ইংরেজ সভ্যতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ লেখক তার জীবন-সায়াহ্নে এ সভ্যতার চরম সংকট উপলব্ধি করেই রচনা করেছেন তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধের শুরু থেকে শেষ অবধি ছত্রে ছত্রে আলোচিত হয়েছে সভ্যতা, সভ্যতার সংকট, সংকট সৃষ্টির কারণ ও সংকট উত্তরণের উপায় সম্পর্কে। তাই প্রাবন্ধিক মূল বিষয়বস্তুর আলোকে এ প্রবন্ধের নামকরণ করেন 'সভ্যতার সংকট'। সুতরাং এর নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে বলা যায়।

উপসংহার : প্রাবন্ধিক তার 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে ইংরেজ সভ্যতার স্বরূপ উদঘাটনের মাধ্যমে এ সভ্যতা কীভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়েছে এবং কীভাবে এ সংকট মোকাবেলা করা যায়, তার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সুতরাং বলা যায়, প্রবন্ধের 'সভ্যতার সংকট' নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

যৌবনে দাও রাজটিকা

প্রমথ চৌধুরী [১৮৬৮ −১৯৪৬ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ১৯ ॥ প্রমথ চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য/ মূলভাব/ বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর যৌবন-বন্দনার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৭, '১৫, '১৮]

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও মননশীল প্রাবন্ধিক, চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' একটি সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল আলোচিত প্রবন্ধ। প্রবন্ধের প্রতিটি বাক্যে তিনি প্রাণ-প্রাচুর্যের অধিকারী যৌবনের জয়গান গেয়েছেন এবং যৌবনকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলে আখ্যায়িত করে এর ললাটে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। মূলত এটি যৌবনবন্দনামূলক একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে লেখক দেহ ও মনে যৌবনের সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানিয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

মূল বক্তব্য/যৌবন-বন্দনার স্বরূপ

যৌবনের স্বরূপ/ধর্ম : বলা হয়− Youth is the season of hope, enterprise and energy, to a nation as well as an individual. অর্থাৎ যৌবন হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে আশা, উদ্যম ও কর্মশক্তির শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যৌবন মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। যৌবনে মানুষ সুস্থ, সবল, সাহসী ও উদ্যমী থাকে। যৌবনের গতি উচ্ছল, চঞ্চল ও দুর্বার। এ সময়ে মানুষ সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয় এবং আবিষ্কারের নেশায় মত্ত থাকে। যৌবন হলো অফুরন্ত শক্তি ও অবিরাম কর্মক্ষমতার আধার। যৌবনে মানুষের দেহ ও মন ষোলকলায় পূর্ণ থাকে। তাই যৌবনের মধ্যে আছে প্রাণচাঞ্চল্য আর সৃষ্টির প্রেরণা। যৌবনকে বয়সের ফ্রেমে বেঁধে রাখা যায় না। লেখক মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তিকে যৌবন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা : মানবজীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময় যৌবন। যৌবন একদিকে যেমন ভোগ করতে পারে, তেমনি ত্যাগও করতে পারে। কিন্তু বার্ধক্য ভোগ ও ত্যাগ কোনোটাই করতে পারে না। প্রাবন্ধিক যৌবনকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন− দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন। দৈহিক যৌবন ক্ষণস্থায়ী ও সংকীর্ণ, কিন্তু মানসিক যৌবন দীর্ঘস্থায়ী ও প্রশস্ত। দৈহিক যৌবনের লীলাখেলা শুধু ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ, তাই এটি অন্যের দেহে সঞ্চার করা যায় না; কিন্তু মানসিক যৌবন অপরের দেহেও সঞ্চার করা যায়। তাই প্রাবন্ধিক মানসিক যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

যৌবন ক্ষণস্থায়ী : যৌবন ক্ষণস্থায়ী, অনিত্য। এজন্য এর প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণ। তবে এ যৌবন হলো ব্যক্তিগত যৌবন। সামগ্রিকভাবে সমাজের যৌবন নিত্য বা ক্ষণস্থায়ী নয়। সমাজজীবনে যৌবন প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব কিছু নয়। যৌবনকে মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি বিবেচনা করে তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যৌবনে মানুষের সকল ইন্দ্রিয় সবল ও সজাগ হয়ে ওঠে, ফলে সে সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়। যৌবনের সাধনা, সৃষ্টি, ত্যাগ, মহিমা ইত্যাদি ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করে।

প্রকৃত যৌবনের স্বরূপ : প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী প্রকৃত যৌবন বলতে সে শক্তিকে বুঝিয়েছেন, যা অমর অবিনশ্বর। তার মতে, প্রকৃত যৌবন হচ্ছে মনের যৌবন− যা বয়সের

ছকে বাঁধা নয়। কেননা দৈহিক যৌবন অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করা যায় না, কিন্তু মনের চেতনায় যে যৌবন তা লাখো কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। তাই এ মানসিক যৌবন দেশ ও কালের ফ্রেমে বন্দি নয়, তা কালোত্তীর্ণ ও বিশ্বজনীন।

যৌবনবন্দনার স্বরূপ : বলা হয়– Youth is the most important time of human life. কিন্তু তাই বলে যৌবনকে বয়সের মাপকাঠিতে, সময় বা কালের ফ্রেমে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। মনের যৌবনই প্রকৃত যৌবন। যার মনে যৌবন নেই তার দৈহিক যৌবন মূল্যহীন। দেহের যৌবন এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু মনের যৌবন অন্য মনে সঞ্চার করা সম্ভব। তাই সমাজে এ মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবন থেকে ফাগুন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাগুন চিরদিন বিরাজ করে। আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তি হিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহু ব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সে সমাজেরই যৌবন আছে।

প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে যৌবন : প্রবন্ধকার মনে করেন, যৌবন মানবজীবনের সর্বোত্তম ও দুর্লভ সময়। যৌবন মানবজীবনে পূর্ণতা আনে। যৌবন দুরন্ত, শক্তির উৎস, কর্মক্ষম সৃষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ। যৌবনের ধর্ম কেবল ভোগ ও বাসনা নয়; ত্যাগ এবং সৃষ্টিও বটে। যৌবনে সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় এবং সকল অনুভূতি তীক্ষ্ণ থাকায় প্রেরণা হয়ে ওঠে প্রবল। যৌবনই জাতির ললাটে সৌভাগ্য ও সাফল্য বয়ে আনে। যৌবনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ দেশ ও জাতির অসংখ্য কল্যাণ সাধন করতে পারে। লেখক মনে করেন, যৌবন সৃষ্টির গৌরবে ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। তাই প্রবন্ধকার যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর কথা বলেছেন।

প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে দেহ ও মনের যৌবন : দেহ ও মনের যৌবনের পার্থক্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন, "দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ওপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের ওপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।"

বিশ্লেষণ : দেহ ও মন পরস্পর নির্ভরশীল হলেও দেহের ওপর মনের প্রভাব অত্যধিক। সমাজকে সজাগ, সচল ও সজীব করতে হলে মনের যৌবন আবশ্যক। সমাজে নতুন মন ও প্রাণের নিত্য জন্মলাভ একান্ত আবশ্যক। যে যৌবন সমাজে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করে সে মানসিক যৌবনকে লেখক রাজটিকা পরিয়ে দিতে বলেছেন। দেহের যৌবনের স্থায়িত্ব যেহেতু কম ও সীমিত, সেহেতু মনের চিরস্থায়ী যৌবনের পরিচর্যা করাই যুক্তিযুক্ত।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর উপায় : যৌবনে রাজটিকা পরানোর অর্থ হলো, যৌবনকে গুরুত্ব দেওয়া, একে ধরে রাখা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। যৌবনে এ রাজটিকা পরানো যায় কেবল চেতনাগত বিকাশের মাধ্যমে। চেতনাগত বিকাশের মধ্য দিয়েই দৈহিক যৌবন মানসিক যৌবনে পরিণত হয়। কেননা আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে গভীর আন্তঃসংযোগ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানসিক যৌবনের ললাটে যারা রাজটিকা দিতে আপত্তি করেন, তারা হয় জড়বাদী না হয় মায়াবাদী। সাধারণত জড়বাদী ও মায়াবাদীদের পরস্পরবিরোধী

মতবাদের ধারক-বাহক বলে মনে করা হলেও বস্তুত তারা অভিন্ন। যৌবনে রাজটিকা দিতে তারা বিমুখ। কেননা তারা জড়তার পূজারী। এটাই 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের মূল কথা।

উপসংহার : সমাজের প্রত্যেকের উচিত আত্মচেতনায় বলীয়ান হয়ে মানসিক যৌবনকে চাঙ্গা করা। কারণ মানসিক যৌবন না থাকলে ক্ষণস্থায়ী শারীরিক যৌবন অর্থহীন এবং এ যৌবন সমাজের কল্যাণে এতটুকু ব্যয় হবে না। যে সমাজে যৌবন নেই সে সমাজের মেরুদণ্ড নেই। যে সমাজের যৌবন আছে সে সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। তার গতি কেউ রোধ করতে পারে না।

►► প্রশ্ন : ২০ ॥ দেহের যৌবন ও মানসিক যৌবন বলতে কী বোঝ? প্রমথ চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০, '১৩]

অথবা, 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে 'দেহের যৌবন' ও 'মনের যৌবন'-এর পার্থক্য নির্দেশ করে প্রমথ চৌধুরীর মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ সমালোচক ও মননশীল প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' একটি সুপ্রসিদ্ধ ও বহুল আলোচিত প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের প্রতিটি বাক্যে তিনি প্রাণপ্রাচুর্যের অধিকারী যৌবনের জয়গান গেয়েছেন এবং যৌবনকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বলে আখ্যায়িত করে এর ললাটে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। মূলত এটি যৌবন-বন্দনামূলক একটি প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে লেখক দৈহিক ও মানসিক যৌবনের সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানিয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

যৌবনের পরিচয় : বলা হয়– Youth is the most valuable time of life. অর্থাৎ, যৌবন হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যৌবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে প্রাবন্ধিকের মতে, এ যৌবনের দুটি রূপ রয়েছে– দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন। দৈহিক যৌবন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু মানসিক যৌবন দেহের বয়সসীমায় আবদ্ধ নয়। দৈহিক যৌবন সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কিন্তু মানসিক যৌবন এক প্রাণ থেকে কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। আর এটা কোনো সময়সীমায় আবদ্ধ নয়। কারণ দেহের যৌবন ক্ষণস্থায়ী হলেও মনের যৌবন চিরস্থায়ী।

দেহের যৌবন : আমাদের দেশে বয়সের মাপকাঠিতে যৌবনকে চিহ্নিত করা হয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করে যে মানুষ, আমরা তাদের যুবক-যুবতি বলি। প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এ যৌবনকে দৈহিক যৌবন বলে অভিহিত করেছেন।

মানসিক যৌবন : দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবনের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও প্রবন্ধকার এ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। দৈহিক যৌবন হলো ভোগসর্বস্ব, আর মানসিক যৌবন হলো প্রকৃত যৌবন। দেহের যৌবনের কোনো সামাজিক বিকাশ ও স্থায়িত্ব নেই। বয়স ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ যৌবনও শেষ হয়ে যায়। বয়সে যুবক হলেই যে, কারো মধ্যে যৌবনের তেজ ও শক্তি আছে একথা বলা যায় না। এমন অনেক যুবকও আছে যাদের মনের জোর নেই, শক্তি ও সাহস নেই। আবার এমন অনেক প্রবীণ আছে যাদের মনে তেজ আছে, আছে শক্তি ও উদ্যম। বয়সে প্রবীণ হলেও এরা বৃদ্ধ নয়। মানসিক যৌবন কোনো নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। দেহ নিস্তেজ হলেও এ যৌবন অক্ষয় ও শক্তিমান থেকে যায়। মানসিক যৌবন স্থবির সমাজকে সচল ও গতিশীল করে এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। এ মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে যৌবন : যৌবন মানবজীবনের সর্বোত্তম ও দুর্লভ সময়। যৌবন মানবজীবনে পূর্ণতা আনে। যৌবন দুরন্ত, শক্তির উৎস, কর্মক্ষম সৃষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ।

যৌবনের ধর্ম কেবল ভোগ ও বাসনা নয়; ত্যাগ এবং সৃষ্টিও বটে। যৌবনে সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় এবং সকল অনুভূতি তীক্ষ্ণ থাকায় প্রেরণা হয়ে ওঠে প্রবল। যৌবনই জাতির ললাটে সৌভাগ্য ও সাফল্য বয়ে আনে। যৌবনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ দেশ ও জাতির অসংখ্য কল্যাণ সাধন করতে পারে। লেখক মনে করেন, যৌবন হলো সৃষ্টির গৌরবে ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। তাই প্রবন্ধকার যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর কথা বলেছেন।

প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে দৈহিক ও মানসিক যৌবন : দেহ ও মনের যৌবনের পার্থক্য সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন, "দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ওপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের ওপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।"

সমাজজীবনে মানসিক যৌবন : মানবসমাজের মূল হলো ব্যক্তি। বহু ব্যক্তির সমষ্টিই হচ্ছে সমাজ। যদি কোনো সমাজে একাধিক ব্যক্তির মানসিক যৌবন থাকে, তাহলে মনে করতে হবে, সে সমাজ যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন সে সমাজে দৈহিক যৌবনের সাথে সাথে মানসিক যৌবনেরও আবির্ভাব হয়। আর সে সমাজে ব্যক্তি-যৌবনের অবসান হলেও সামাজিক-যৌবন চিরদিন অক্ষত থাকে। সামাজিক জীবনে যৌবন প্রতিষ্ঠার মূল উৎস হলো মানসিক যৌবন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে ফাগুন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না, কিন্তু যে সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা পায় সে সমাজে ফাগুন চিরদিন থাকে।

উপসংহার : সমাজের প্রত্যেকের উচিত আত্মচেতনায় বলীয়ান হয়ে মানসিক যৌবনকে চাঙ্গা করা। কারণ মানসিক যৌবন না থাকলে ক্ষণস্থায়ী দৈহিক যৌবন অর্থহীন এবং এ যৌবন সমাজের কল্যাণে এতটুকু ব্যয় হবে না। যে সমাজে মানসিক যৌবন নেই সে সমাজের মেরুদণ্ড নেই। যে সমাজের মানসিক যৌবন আছে সে সমাজ প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। তার গতি কেউ রোধ করতে পারে না।

▸▸ প্রশ্ন : ২১ ॥ প্রমথ চৌধুরী তার 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটিতে কীভাবে এবং কেন যৌবনকে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

অথবা, "এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।"– এ উদ্ধৃতির অনুসরণে লেখকের যৌবন সম্পর্কীয় মূল বক্তব্য বিবৃত কর।

অথবা, "প্রাণাবেগ তথা মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠাই প্রম ' চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের সারকথা।"– উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, বাংলা চলিতরীতির প্রবর্তক, বিদগ্ধ সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত। এ প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত যৌবনের পরিচয় তুলে ধরে যৌবনে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। প্রাবন্ধিক আলোচ্য প্রবন্ধের প্রতিটি অংশে যৌবনের জয়গান গেয়েছেন এবং সমাজজীবনে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

যৌবনের পরিচয় : বলা হয়– Youth is the most valuable time of life. অর্থাৎ, যৌবন হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তাই যৌবন মানবজীবনের অমূল্য সম্পদ। আমাদের দেশে বয়সের মাপকাঠিতে যৌবনকে চিহ্নিত করা হয়। কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ

করে যে মানুষ, আমরা তাদের যুবক-যুবতি বলি। প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এ যৌবনকে দৈহিক যৌবন বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মনের যে যৌবন তা চিরস্থায়ী। এ মানসিক যৌবনই প্রকৃত যৌবন। প্রবন্ধকার এ যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। কারণ মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে।

যৌবনের ধর্ম : যৌবনে মানুষ সুস্থ, সবল, সাহসী ও উদ্যমী থাকে। যৌবনের গতি উচ্ছল, চঞ্চল ও দুর্বার। এ সময়ে মানুষ সৃষ্টির প্রেরণায় উজ্জীবিত এবং আবিষ্কারের নেশায় মত্ত থাকে। যৌবন হলো অফুরন্ত শক্তি ও অবিরাম কর্মক্ষমতার আধার। অর্থাৎ যৌবনে মানুষের দেহ ও মন ষোলকলায় পূর্ণ থাকে। তবে যারা যৌবনের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেয়, ভাটার সময় তারা হা-হুতাশ করে মরে।

সমাজজীবনে মানসিক যৌবন : মানবসমাজের মূল হলো ব্যক্তি। বহু ব্যক্তির সমষ্টিই হচ্ছে সমাজ। যদি কোনো সমাজে একাধিক ব্যক্তির মানসিক যৌবন থাকে, তাহলে মনে করতে হবে, সে সমাজ যৌবনপ্রাপ্ত হয়েছে। তখন সে সমাজে দৈহিক যৌবনের সাথে সাথে মানসিক যৌবনেরও আবির্ভাব হয়। আর সে সমাজে ব্যক্তি-যৌবনের অবসান হলেও সামাজিক যৌবন চিরদিন অক্ষত থাকে। সামাজিক জীবনে যৌবন প্রতিষ্ঠার মূল উৎস হলো মানসিক যৌবন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে ফাগুন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না, কিন্তু যে সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা পায় সে সমাজে ফাগুন চিরদিন থাকে। এমন যৌবনের কপালেই লেখক রাজটিকা পরাতে চান।

আমাদের সমাজ ও যৌবন : আমাদের সমাজে দৈহিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন বলে মনে করা হয়, কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। কেননা দৈহিক যৌবন সবসময় ভোগবিলাস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ যৌবনে সমগ্র পৃথিবীটা রঙিন বলে মনে হয়, কিন্তু দেহের এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী। আমাদের দেশের মানুষ যৌবনশক্তিকে ভয় করে এবং তাকে মস্তবড় এক ফাঁড়া বলে ভাবে। তাই তারা সাবধানে যৌবনকে এড়িয়ে বার্ধক্যবরণ করার জন্য উন্মুখ থাকে। এদেশে কেউ যৌবন কামনা করে না। তাদের বাসনা, এক লাফে বার্ধক্যে পৌছে যাওয়া। তাদের জীবনগ্রন্থের ভূমিকা আছে, উপসংহার আছে, মাঝে কিছুই নেই। লেখকের মতে, এজন্য প্রাচীন সাহিত্য অনেকাংশে দায়ী।

সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা : আমরা জানি, দেহের যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়, মনের যৌবনই প্রকৃত যৌবন। কারণ দেহের যে যৌবন তা ক্ষণস্থায়ী, আর মনের যৌবন চিরস্থায়ী। যেমন বলা হয়– the youth of the soul is everlasting and eternity is youth - Richter : অর্থাৎ আত্মার যৌবন চিরস্থায়ী এবং নিত্যতাই যৌবন। এখানে মনের যৌবনের কথাই বলা হয়েছে। দেহের যৌবন অপরের দেহে সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু মনের যৌবন লাখো মানুষের মনে সঞ্চার করা যায়। এজন্য সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কোনো সমাজে অধিকাংশ মানুষের যদি মানসিক যৌবন থাকে তাহলে সে সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা পায়। এতে সমাজ উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। এজন্য প্রাবন্ধিক সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়েছেন।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর কারণ : বিশ্বের সব মানুষের মধ্যেই জৈবশক্তির একটি সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া গেলেও মানসিক শক্তির মধ্যে অনেক তফাত দেখা যায়। দেখা যায়, মানসিক শক্তিতে যে জাতি যত বেশি বলীয়ান সে জাতি তত বেশি উন্নত। কোনো জাতি যখন মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখন সে জাতি গৌরবের রাজটিকা ললাটে ধারণ

করতে পারে। প্রবন্ধকার প্রাণধর্মের বিকাশের জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, সমাজকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য যৌবনে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন। কারণ, যৌবনকে উৎসাহিত ও মূল্যায়ন করা না হলে সমাজ জরা-ব্যাধি ও জড়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যৌবনকে রাজটিকা পরালে অর্থাৎ মনের যৌবনের স্বীকৃতি দিলেই সমাজ গতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী হবে।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর উপায় : যৌবনে রাজটিকা পরানোর অর্থ হলো, যৌবনকে গুরুত্ব দেওয়া, একে ধরে রাখা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। যৌবনে এ রাজটিকা পরানো যায় কেবল চেতনাগত বিকাশের মাধ্যমে। চেতনাগত বিকাশের মধ্য দিয়েই দৈহিক যৌবন মানসিক যৌবনে পরিণত হয়। কেননা আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে গভীর আন্তঃসংযোগ বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির যদি সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ আর কর্তব্যবোধের চেতনা থাকে, তাহলে সমাজে আপনা-আপনিই মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা পায়। জড়বাদী ও মায়াবাদীরা যৌবনে রাজটিকা পরাতে আপত্তি করলেও যারা প্রাণাবেগে উচ্ছল তারা চিরকাল যৌবনের রাজ্যেই বিচরণ করবে।

সমাজে প্রাণাবেগ : মানসিক যৌবনের প্রধান উপকরণ হলো প্রাণাবেগ বা চেতনা। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে চৈতন্য জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের সমন্বয়কারী। প্রাণের পায়ের নিচে হচ্ছে জড়জগৎ আর মাথার ওপর মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা। সুতরাং সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে প্রাণাবেগ আনতে হবে।

উপসংহার : যৌবনকে অস্বীকার বা অবহেলা করলে সমাজ গতিহীন হয়ে পড়ে। তাই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর যৌবনকে রাজটিকা পরিয়ে সচল করে তুলতে হবে। সমাজের সবার মাঝে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য লেখক দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কারণ মানসিক যৌবন এক প্রাণ থেকে বহু প্রাণে সঞ্চারিত হয় এবং সমাজ প্রগতির দিকে এগিয়ে যায়।

▸▸ প্রশ্ন : ২২ ॥ 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত যৌবন বলতে কী বুঝিয়েছেন? সমাজের যৌবন রক্ষা করা যায় কী উপায়ে? প্রবন্ধটি অবলম্বনে তা বিশ্লেষণ কর।

অথবা, যৌবনে রাজটিকা পরানোর পক্ষে প্রমথ চৌধুরী কী যুক্তির অবতারণা করেছেন? বিশ্লেষণ কর।

অথবা, প্রমথ চৌধুরী তার প্রবন্ধে যৌবনে রাজটিকা পরানোর কথা কেন বলেছেন? বুঝিয়ে দাও।

অথবা, 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যৌবনকে কীভাবে মূল্যায়ন করেছেন? বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান প্রাবন্ধিক, প্রমিত চলিত রীতির প্রবর্তক, বিদগ্ধ সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' একটি সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে লেখক প্রকৃত যৌবনের পরিচয় তুলে ধরে যৌবনকালকে মানুষের জীবনের সর্বোত্তম সময় বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং একে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি প্রবন্ধের পুরো অংশ জুড়ে প্রকৃত যৌবনের স্তুতি-বন্দনা করেছেন।

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের পটভূমি : আলোচ্য প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদিত বহুল পরিচিত 'সবুজ পত্র' পত্রিকার একটি লেখায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ এক সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথার অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে– যৌবন বসন্ত রোগে আক্রান্ত, তাই তাকে টিকা দিতে হবে। অর্থাৎ যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, তাকে বসন্তের হাত হতে রক্ষা করার

জন্য। প্রমথ চৌধুরী আলোচ্য নিবন্ধে যৌবনে রাজটিকা প্রদানের পক্ষে বেশকিছু চমৎকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। মূলত সত্যেন্দ্রনাথও একই কারণে যৌবনকে রাজটিকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ উপরিউক্ত ব্যঙ্গাত্মক সমালোচকের জবাব দিতে পারেননি, যা প্রমথ চৌধুরী চমৎকারভাবে দিয়েছেন। ফলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সমালোচকের প্যাঁচে পড়ে যে বিপর্যস্ত অবস্থায় পড়েছিলেন তা থেকে প্রমথ চৌধুরী বর্তমান প্রবন্ধের মাধ্যমে তাকে বিপদমুক্ত করে বন্ধুর কাজই করেছেন।

প্রাবন্ধিকের যৌবন-বন্দনা : প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের প্রতিটি অংশে যৌবনের স্তুতি-বন্দনা গেয়েছেন। তিনি সমাজজীবনে যৌবনকে প্রতিষ্ঠা করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং একে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। কারণ প্রকৃত যৌবন ব্যতীত মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হতে পারে না। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেছেন, সমাজে যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে।

যৌবনের পরিচয় : বলা হয়– Youth is the season of hope, enterprise and energy, to a nation as well as an individual. অর্থাৎ যৌবন হচ্ছে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে আশা, উদ্যম ও কর্মশক্তির শ্রেষ্ঠ সময়। যৌবন মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তবে প্রাবন্ধিকের মতে, এ যৌবনের দুটি রূপ রয়েছে– দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন। দৈহিক যৌবন একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আবদ্ধ, কিন্তু মানসিক যৌবন দেহের বয়সসীমায় আবদ্ধ নয়। দৈহিক যৌবন সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায় না, কিন্তু মানসিক যৌবন এক প্রাণ থেকে কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। আর এটা কোনো সময়সীমায় আবদ্ধ নয়। কারণ দেহের যৌবন ক্ষণস্থায়ী হলেও মনের যৌবন চিরস্থায়ী।

প্রকৃত যৌবনের পরিচয় : প্রাবন্ধিকের মতে, দেহের যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়; বরং প্রকৃত যৌবন মনের যৌবন। যৌবন শুধু ভোগের নয়, ত্যাগেরও। যিনি ত্যাগ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার বলেছেন, 'বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পা র না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না।' প্রাবন্ধিক বলেন, প্রকৃত যৌবন হচ্ছে মনের যৌবন, যা বয়সের ছকে বাঁধা নয়। যারা যৌবনকে শুধু ভোগের উপকরণ বলে মনে করে, তাদের ধারণা, যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই তারা যৌবনশক্তিকে জীবনের একটা মস্ত বড় ফাঁড়া বলে মনে করে এবং তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু প্রবন্ধকারের অভিমত হলো– একের দেহের যৌবন অন্যের দেহে সঞ্চার করা না গেলেও একের মনের যৌবন অসংখ্য মানুষের মনে সঞ্চার করা যায়। তাই প্রমথ চৌধুরী মানসিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সমাজের যৌবন রক্ষার উপায় : মানবসমাজ হচ্ছে বহু ব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সে সমাজেরই যৌবন আছে। এ সমাজে দৈহিক যৌবনের সাথে সাথে মানসিক যৌবনেরও আবির্ভাব হয়। এ মানসিক যৌবনকে সমাজে স্থায়ী করতে হলে যৌবনেই নয়, বার্ধক্যেও দেশ আক্রমণ ও অধিকার করতে হবে। যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করার শক্তি আমরা এভাবে সমাজ থেকেই সংগ্রহ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে প্রবন্ধে বলা হয়েছে– রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলো ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ যৌবনকে যথার্থ মূল্যায়ন ও ব্যবহার না করলে, পরিচর্যা না করলে তা নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। তাকে যথাযথ বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে, তবেই সমাজজীবনে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠিত হবে।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর কারণ : বিশ্বের সকল জাতির মধ্যেই জৈবশক্তির একটি সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সকলের মানসিক শক্তির মধ্যে বেশ তারতম্য দেখা যায়। মানসিক শক্তিতে যে জাতি যত বলীয়ান, সে জাতি তত উন্নত। যখন কোনো জাতি মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখন সে জাতি গৌরবের রাজটিকা ললাটে ধারণ করতে পারে। প্রবন্ধকার প্রাণধর্মের বিকাশের জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, সমাজকে সজীব, সচল ও সজাগ রাখা এবং সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাকে পূর্ণতাদানের জন্য যৌবনে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন। কারণ যৌবনকে উৎসাহিত ও মূল্যায়ন করা না হলে সমাজ জরা-ব্যাধি ও জড়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যৌবনকে রাজটিকা পরালে অর্থাৎ মনের যৌবনের স্বীকৃতি দিলেই সমাজ গতিশীল থাকবে।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর যুক্তি : যৌবনে রাজটিকা পরানোর অর্থ সমাজে যৌবন প্রতিষ্ঠা করা। নিচে যৌবনে রাজটিকা পরানোর যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা হলো–

মানসিক যৌবনের দীর্ঘস্থায়িত্ব : মানসিক যৌবন সমাজজীবনে দীর্ঘস্থায়িত্ব পায়। প্রজন্মান্তরে যৌবন সঞ্চারিত হয়। মানসিক যৌবন সমাজকে যৌবনের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তি যৌবন মানসিক যৌবনে রূপ নিলে তা সমাজজীবনে চিরস্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। এ কারণে লেখক মানসিক যৌবনে রাজটিকা পরানোর পক্ষে।

সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি : সমাজের বৃহৎ কল্যাণার্থে সমাজজীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। সামাজিক যৌবনই উন্নতি ও প্রগতির মাধ্যম। সমাজে নিত্য নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে। এসব নতুন প্রাণে যৌবন সঞ্চার করতে পারলেই সমাজের উন্নতি হবে। তাই সমাজে যৌবন প্রতিষ্ঠা বা যৌবনে রাজটিকা পরানো আবশ্যক।

সমাজ থেকে বার্ধক্য দূর করা : দেহের যৌবনের সাথে মনের যৌবনের আবির্ভাব ঘটে। সমাজে মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয় বার্ধক্যকে অধিকার ও আক্রমণ করতে হবে। কারণ বার্ধক্য আর যৌবন একসাথে বিরাজ করতে পারে না। তাই সমাজ থেকে বার্ধক্য দূর করতে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক।

দৈহিক ও মানসিক যৌবনের মূল্যায়ন : বিশ্বের সব মানুষের মাঝেই জৈবশক্তির একটি সাধারণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু সবার মানসিক শক্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। মানসিক শক্তিতে যে জাতি যত বেশি বলীয়ান সে জাতি তত বেশি উন্নত। কোনো জাতি যখন মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখন সে জাতি গৌরবের রাজটিকা ললাটে ধারণ করতে পারে। প্রবন্ধকার প্রাণধর্মের বিকাশের জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, সমাজকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করার জন্য যৌবনে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন। কারণ যৌবনকে উৎসাহিত ও মূল্যায়ন করা না হলে সমাজ জরা-ব্যাধি ও জড়তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যৌবনকে রাজটিকা পরালে অর্থাৎ মনের যৌবনের স্বীকৃতি দিলেই সমাজ গতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী হবে।

উপসংহার : মানবজীবনে যৌবনই সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ সময়। ব্যক্তিগত যৌবন জাতির সমষ্টিগত জীবনপ্রবাহে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে পারে এবং তার মানসিক যৌবন স্থায়ী করতে পারে। যারা শক্তিমত্ত যৌবনকে আপদ ও ফাঁড়া মনে করে যৌবনকে এড়িয়ে চলে, প্রবন্ধকারের মতে তারা সমাজের ক্ষতি করে। এজন্য তিনি তার প্রবন্ধের পুরো অংশ জুড়ে যৌবন-বন্দনা করেছেন এবং সমাজের সার্বিক উন্নয়নকল্পে যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ২৩ ॥ 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী যৌবনের প্রতি এদেশের পণ্ডিতদের যে মনোভাবের কথা বলেছেন, তা আলোচনা কর। প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবনের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

অথবা, প্রমথ চৌধুরী 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটির মধ্যে সংস্কৃত কাব্যের যে দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, "আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী"– 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক ও প্রাবন্ধিক, বাংলা প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি আলোকোজ্জ্বল প্রবন্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি যৌবনের স্তুতি গেয়েছেন এবং আমাদের প্রাচীন সাহিত্যিক যারা তাদের সাহিত্যে যৌবনকে অবমূল্যায়ন এবং সুপ্ত রাখার চেষ্টা করেছেন, তাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি যৌবনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যৌবনচিন্তার তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যিকরা ছিলেন ভোগবাদী। যৌবনকে তারা দেখেছেন ভোগের সামগ্রী হিসেবে। এ কারণে তারা যৌবনের যারপরনাই নিন্দা করেছেন, কিন্তু প্রাবন্ধিক তাদের কথার যুক্তিযুক্ত উত্তর দিয়ে প্রমাণ করেছেন, যৌবনের ললাটেই রাজটিকা পরানো উচিত।

যৌবন সম্পর্কে প্রাচীন পণ্ডিতগণের মনোভাব : যৌবন সম্পর্কে এদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা যৌবনকে মনের বসন্তকাল ও প্রাকৃতিক যৌবন– এ দুটি দিক থেকে বর্ণনা করেছেন। যৌবনে থাকে অফুরন্ত শক্তি, অমিত তেজ। এ শক্তি এবং তেজকেই যেন তারা ভয় পান। যৌবনকে তারা মনে করেন অশোভন ও অবিনীত। তাই তারা একে শাসন করতে চান, কিন্তু লেখক যৌবনের প্রকৃতিকে শাসন করার ক্ষমতা মানুষের নেই বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, বসন্তের নৈসর্গিক প্রভাব থেকে যৌবনকে মুক্ত রাখা দরকার। অন্যথায় যৌবন ও বসন্ত একই দৈবশক্তির দুটি রূপ বলে ধরা পড়তে পারে। এদেশীয় পণ্ডিতরা যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরানোর পরিবর্তে এর পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদা প্রস্তুত। কারণ যৌবনকে তারা একটা মস্ত বড় ফাঁড়া বলে মনে করেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবন : প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে আমরা আমাদের যৌবনকে গোপন করে রাখতে প্রবৃত্ত হই। সংস্কৃত সাহিত্যে দৈহিক যৌবনের বিচিত্র লীলাকলা সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা লক্ষ করা যায়। এ সাহিত্যে যুবক-যুবতি ব্যতীত আর কারো স্থান নেই। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে তাই ভোগ-বিলাসের পৌনঃপুনিক চিত্র ছাড়া অন্য কোনো ছবি পাওয়া যায় না। যুবক-যুবতির লীলাখেলাই তাদের সাহিত্যে, কাব্যে ফুটে উঠেছে। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত, আর এ জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ এবং মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের কবিদের মতে, প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগানো। যযাতি নিজের ভোগবিলাস চরিতার্থ করার জন্য পুত্রদের কাছে যে দৈহিক যৌবন ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা তাদের কাব্যে সে যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

উদাহরণের সাহায্যে সত্যতা প্রমাণ : প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী সুন্দর একটি উদাহরণ টেনে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। তা হলো–

উদয়ন ছিলেন কৌশাম্বির যুবরাজ আর কপিলাবস্তুর যুবরাজ ছিলেন সিদ্ধার্থ। উভয়ে সমসাময়িক, উভয়ই পরম রূপবান এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ। তাদের মধ্যে প্রভেদ

এটুকু, একজন ভোগের আর অন্যজন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব মানুষের আত্মমুক্তির বাণী উচ্চারণ করেছেন মানবের কল্যাণে, আর উদয়ন নারীদের মুগ্ধ করে ভোগের সামগ্রী করে তুলেছেন। কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধ চরিত্রের স্থান নেই, উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত কাব্যে যৌবন : আমাদের বাংলা সাহিত্যের বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে সংস্কৃত কাব্য। আর সংস্কৃত কাব্য হলো যৌবনের কাব্য। স্থূল দৈহিক যৌবনই এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। মনে হয় ফুরিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা যৌবনের প্রতি মুহূর্ত তাড়নাজাত প্রবৃত্তির পেছনে ব্যয় করেছেন; তাদের কাছে যৌবন কেবল ভোগের সামগ্রী। প্রাবন্ধিক বলেন, "সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ।"

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দেহমন : দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন বিগড়ে যায়। এর ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মাঝে শত্রুতা জন্মে। প্রাচীন কাব্যে দেহ ও মনের বিচ্ছেদ ঘটেছিল বলেই একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয়; এক কথায়, একদিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষ শাস্ত্র। মাঝামাঝি আরো কিছু জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। যৌবনের নিন্দা প্রাচীন সমাজের উভয়শ্রেণিই করেছেন। ত্যাগীরা যৌবনের নিন্দা করেছেন, ভোগীরা আরো বেশি করেছেন। কারণ ভোগের পর যখন অবসন্নতা ছড়িয়ে পড়ে তখন নিন্দাই অবলম্বন হয়। স্ত্রীজাতিকে ভোগের সামগ্রী মনে করার ফলে ভোগ-অক্ষম বৃদ্ধরাই নারীনিন্দায় পঞ্চমুখ। রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলেমান স্ত্রীনিন্দার ক্ষেত্রে রাজা। অচরিতার্থ ভোগ বিলাসের পরিণামই এরূপ।

সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার কারণ : প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিতদের ভোগ-লালসার প্রতি লক্ষ করে বলেছেন, সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এ সত্য উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও ধর্ম। তাদের এ ভ্রান্তি ও মনোবিকলনের ফলে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য কাব্যের অঙ্গনে ভোগ-বিলাসের নিরাভরণ রূপই শুধু প্রকাশিত হয়েছে। শরীর ও মন নিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের জীবন, কিন্তু এ মনকে বাদ দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্য শুধু দেহ নিয়ে মেতে উঠেছিল। তাই প্রাবন্ধিক সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা করেছেন।

তবে সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনার অন্য একটি কারণ হলো, সংস্কৃত পণ্ডিতরা দেহের এবং মনের যৌবনকে এক করে দেখেছেন। অথচ দৈহিক ও মানসিক যৌবন সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

যৌবনের প্রকৃতরূপ : যৌবনের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Youth. Oxford Dictionary-তে যৌবনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The time of life when a person is young, especially the time before a child becomes an adult. কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতে, সময়সীমায় আবদ্ধ দৈহিক যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়। মনের যৌবনই হচ্ছে প্রকৃত যৌবন। কারণ মনের যৌবন দৈহিক যৌবনের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নয়, এটা চিরস্থায়ী। তাছাড়া মনের যৌবনকে এক মন থেকে লাখো মনে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

উপসংহার : সংস্কৃত কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতগণ একদেশদর্শী। তারা যৌবনের অন্তর্নিহিত রূপ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই তাদের সাহিত্যও পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হয়ে উঠেছিল। এজন্য প্রাবন্ধিক সংস্কৃত সাহিত্যের সমালোচনা করে প্রকৃত যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। আর তাই তিনি মন্তব্য করেছেন, "আমরা যে যৌবনকে গোপন রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেকাংশে দায়ী।"

প্রশ্ন : ২৪ ॥ "কী উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়।" 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, প্রমথ চৌধুরী কী উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন? আলোচনা কর।

অথবা, প্রমথ চৌধুরী কেন যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন? 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অনুসারে তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সমালোচক ও প্রাবন্ধিক, বাংলা প্রমিত চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি একটি অসাধারণ প্রবন্ধ। যৌবনের মূল্যায়ন, মানসিক যৌবন সমাজে প্রতিষ্ঠাকরণ, যৌবনের বিকৃতি ও অপব্যবহার রোধ এবং একজনের যৌবনতরঙ্গ অন্যের মাঝে সঞ্চারিত করার আহ্বানই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য। স্বদেশের মানুষের যৌবন-বন্দনায় অনাসক্তি দেখে এখানে প্রবন্ধকারের আক্ষেপও ব্যক্ত হয়েছে। প্রাবন্ধিক যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার বিভিন্ন কারণও নির্দেশ করেছেন।

যৌবনের স্বরূপ : যৌবনের ইংরেজি প্রতিশব্দ– Youth. Oxford Dictionary-তে যৌবনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The time of life when a person is young, especially the time before a child becomes an adult. কিন্তু প্রাবন্ধিকের মতে, যৌবন দুই ধরনের। একটি দৈহিক যৌবন, অন্যটি মানসিক যৌবন। দৈহিক যৌবন সময়সীমায় আবদ্ধ, কিন্তু মানসিক যৌবন সময়সীমায় আবদ্ধ নয়। আবার দৈহিক যৌবন একজন থেকে অন্যের মাঝে সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু মনের যৌবন এক প্রাণ থেকে লাখো-কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। তাই মনের যৌবন দৈহিক যৌবন থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী।

প্রকৃত যৌবন : আমাদের দেহের যে যৌবন তা প্রকৃত যৌবন নয়। প্রকৃত যৌবন হলো মনের যৌবন। যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয়; ত্যাগেরও। যিনি ত্যাগ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন, "বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না।" তাই প্রাবন্ধিকের মতে, প্রকৃত যৌবন হলো মনের যৌবন, যা বয়সের ছকে বাঁধা যায় না। যারা যৌবনকে শুধু ভোগের উপকরণ বলে মনে করে, তাদের ধারণা, যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। কারণ চিরস্থায়ী মনের যৌবন সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই নেই। তাই লেখক মানসিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন হিসেবে আখ্যায়িত করে একে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। তার মতে, মানসিক যৌবন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে।

আমাদের সমাজজীবনে যৌবন : আমাদের সমাজে দৈহিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন মনে করা হয়, কিন্তু তা মোটেই ঠিক নয়। কেননা দৈহিক যৌবন সবসময় ভোগবিলাস নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ যৌবনে সমগ্র পৃথিবী রঙিন বলে মনে হয়। তবে দেহের এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী। আমাদের দেশের মানুষ যৌবনশক্তিকে ভয় করে এবং একে মস্তবড় ফাঁড়া বলে মনে করে। আমাদের সমাজব্যবস্থা জরাগ্রস্ত। ফলে তা যৌবনকে ভয় পায় এবং সাবধানে যৌবনকে এড়িয়ে বার্ধক্যবরণ করে নিতে চায়। এদেশে কেউ যৌবন কামনা করে না। তাদের কামনা এক লাফে বার্ধক্যে পৌঁছে যাওয়া। তাদের জীবনগ্রন্থে ভূমিকা আর উপসংহার আছে, মাঝে কিছু নেই।

প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে যৌবন : প্রবন্ধকারের মতে, যৌবন মানবজীবনের সর্বোত্তম এবং দুর্লভ সময়। মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন। যৌবন উচ্ছল, কর্মচঞ্চল, আর সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ। তবে যৌবনের ধর্ম কেবল ভোগ ও বাসনা নয়; ত্যাগ এবং সৃষ্টিও বটে। যৌবনে সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় ও সকল অনুভূতি তীক্ষ্ণ থাকায় প্রেরণা হয়ে ওঠে প্রবল। যৌবনই জাতির ললাটে সৌভাগ্য ও সাফল্য বয়ে আনে। যৌবনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি এবং কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত হয়। প্রাবন্ধিক তাই মনে করেন, যৌবন সৃষ্টির গৌরবে ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। অতএব তিনি যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন।

যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার যৌক্তিকতা : মানুষের দেহের সাথে মনের একটা গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ফলে দৈহিক যৌবন সাময়িক এবং অস্থায়ী হলেও মানসিক যৌবন স্থায়ী। মানসিক যৌবন দ্বারা বার্ধক্যকে জয় করা যায়। সমাজ যেহেতু বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, তাই সামাজিক যৌবনই প্রগতি, উন্নতি ও আত্মবিকাশের মূল কথা। সমাজের গতি-তরঙ্গের সাথে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনই যৌবনের তপস্যা। যারা অলস ও ভীরু, তারা যৌবনের কপালে রাজটিকা পরাতে পারে না। অথচ যৌবনই পারে অসীম আকাশে পাড়ি দিতে, আর মানসিক যৌবনই সমাজের চালিকাশক্তি। এ মানসিক যৌবনলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রাণশক্তি। প্রমথ চৌধুরী এ মানসিক যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেছেন। কী উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তা তিনি সবাইকে ভেবে দেখতে বলেছেন। প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সমাজের বুকে মানসিক যৌবনের অভিষেক উৎসবের দিকনির্দেশ করেছেন।

যৌবনকে সমাজজীবনে অভিষিক্ত করার কারণ : মূলত ব্যক্তিজীবনে যৌবন ক্ষণস্থায়ী হলেও সামাজিক জীবনে যৌবন নিত্য চিরস্থায়ী। তাই সমাজজীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অপরিসীম। যৌবনকে সমাজে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা তথা যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা অপরিহার্য। কারণ সমাজজীবনে দৈহিক যৌবনের পরিবর্তে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করে লাখো প্রাণে তা সংক্রমণ করা যায়। মানসিক যৌবন মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে এবং এভাবে সমাজেরও কল্যাণ সাধিত হবে। কারণ সমাজদেহে যখন যৌবন এসে যায় তখন সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তাই সমাজজীবনে মানসিক যৌবনকে অবশ্যই অভিষিক্ত করতে হবে।

সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা : প্রাবন্ধিকের মতে, দেহের যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়, প্রকৃত যৌবন হলো মনের যৌবন। তাই যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয়। যিনি ভোগকে উপেক্ষা করে ত্যাগ করতে পারেন তিনিই প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। যারা যৌবনকে শুধু ভোগের উপকরণ বলে মনে করেন তাদের ধারণা, যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না। তাই তারা যৌবনের নিন্দা করে থাকেন। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু একের মনের যৌবন অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে সঞ্চারিত করা যায়। তাই প্রবন্ধকার মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।

যৌবনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার উপায় : আমাদের দেহের যৌবন হলো বয়সের গণ্ডিতে আবদ্ধ। এটা ক্ষণস্থায়ীও বটে। তাই দেহের যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়। কারণ এ যৌবন বয়স ফুরিয়ে গেলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু মনের যৌবন সময়ের বা বয়সের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। এটা চিরস্থায়ী যৌবন এবং এ যৌবন এক প্রাণ থেকে লাখো-কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক প্রমথ চৌধুরীও এ যৌবনকে সমাজের

যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে চেয়েছেন এবং এর ললাটে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। যৌবনভয়ে যারা ভীত তিনি তাদের নিন্দা জানিয়ে যৌবনের বন্দনায় মেতে উঠেছেন। প্রাবন্ধিকের অভিমত হলো, যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে পারলে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধিত হবে।

উপসংহার : সমাজজীবনে যৌবনের গুরুত্ব অপরিসীম। একে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা করা সকলের কর্তব্য। কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে সমাজের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি। যৌবন না থাকলে সমাজ জরাগ্রস্ত হয়ে যায়। যে সমাজে যৌবন নেই সে সমাজ মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর ন্যায়, সে তার সমস্ত চালিকাশক্তি হারায়। তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য দৈহিক নয়; বরং মনের যৌবনকে সমাজের সর্বস্তরে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

▸▸ প্রশ্ন : ২৫ ॥ "এ দেশে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল– দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য।" উক্তিটিতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?

অথবা, যৌবন সম্পর্কে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের মনোভাব কেমন তা 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের আলোকে বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যজগতের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, বাংলা সাহিত্যে প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' একটি যৌবন বন্দনামূলক চমৎকার প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধের সর্বত্রই লেখক যৌবনের জয়গান গেয়েছেন এবং যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের দেশের পণ্ডিতগণের যৌবন সম্পর্কে অনীহা ও স্থূল ধারণা সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। যৌবনের অধিকারী হয়েও যারা যৌবনের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় লেখক তাদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটির ব্যাখ্যা

প্রকৃতির যৌবন ও মনের বসন্তের পার্থক্য : ষড়ঋতুর দেশ বাংলাদেশ, তন্মধ্যে বসন্তকে ঋতুরাজ বা শ্রেষ্ঠ ঋতু বলা হয়। আর যৌবনের প্রতীক হিসেবে ধরা হয় এ বসন্ত ঋতুকে, কিন্তু এ বসন্তকে খুব সহজে পাওয়া যায় না, এর জন্য পৌষ মাসের তীব্র শীত অতিক্রম করতে হয়। শীতের জীর্ণতা অতিক্রম করে যেমনিভাবে প্রকৃতি বসন্তের সন্ধান পায়, তেমনিভাবে মানবজীবনও বাল্যকালকে অতিক্রম করে পায় যৌবনের সন্ধান। যৌবনই মানুষের মনের বসন্তকাল; মানবজীবনের শক্তি, সাহস ও জাগরণের প্রতীক। মানুষের মনে যৌবনের ছোঁয়া লাগলেই সে উদ্যমী হয়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশের পণ্ডিতবর্গের কারো কারো ধারণা, মনের বসন্ত ঋতু এবং প্রকৃতির যৌবন দুটোই শাসনযোগ্য। কিন্তু এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে– তা হলো, আসলে প্রকৃতিকে শাসন করা যায় না, তাকে শাসন করার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। কেননা প্রকৃতির ধর্ম মানব ধর্মশাস্ত্র বহির্ভূত। প্রকৃতিকে শাসন করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যৌবনকেও উপেক্ষা করা যায় না, যৌবন তার নিজস্ব গতিতেই প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশের একশ্রেণির পণ্ডিত ব্যক্তি এ সত্য উপলব্ধি করতে পারেন না। তারা আমাদেরকে প্রকৃতির উল্টো পথে চলতে পরামর্শ দেন। এর ফলে আমরা যৌবনের সুফল লাভে রীতিমতো ব্যর্থ হই।

যৌবন সম্পর্কে এদেশের পণ্ডিতগণের মনোভাব : প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী তার 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে যৌবন সম্পর্কে এদেশীয় পণ্ডিতবর্গের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। যৌবনকে তারা বর্ণনা করেছেন মনের বসন্তকাল এবং প্রাকৃতিক যৌবন এ দুটি দিক থেকে।

যৌবনে থাকে অফুরন্ত শক্তি, সাহস ও অমিত তেজ। এ শক্তি, সাহস ও তেজকে তারা যেন ভয় পান। যৌবনকে তারা মনে করেন অশোভন অবিনীত। তাই একে শাসন করতে চান, কিন্তু প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী জানিয়েছেন, যৌবনের অধিকারী প্রকৃতিকে শাসন করার ক্ষমতা মানুষের নেই। তিনি কটাক্ষ করে বলেছেন, বসন্তের নৈসর্গিক প্রভাব থেকে যৌবনকে মুক্ত রাখা দরকার। অন্যথায় যৌবন ও বসন্ত একই দৈবশক্তির দুটি রূপ বলে ধরা পড়তে পারে। এদেশীয় পণ্ডিতরা যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর পরিবর্তে তার পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত। কারণ তারা মনে করেন, যৌবন এক মস্তবড় ফাঁড়া। অথচ যৌবন সর্বদাই সৃষ্টির প্রেরণায় সমুজ্জ্বল। যৌবনই সমাজে সাফল্য আর সমৃদ্ধি এনে দিতে পারে।

রাজটিকার পরিবর্তে রাজদণ্ড প্রয়োগ : লেখকের মতে, আমাদের দেশের লোকেরা যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন– আমাদের দেশে নিয়তই যৌবনকে বাঁকা চোখে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। যৌবনকে মনে করা হয়, একটা মস্তবড় ফাঁড়া। তাই তার কপালে রাজটিকা পরানোর পরিবর্তে তার পিঠে দেওয়া হয় রাজদণ্ড। এমনিভাবে আমাদের দেশের জ্ঞানীগুণীরাও বসন্ত ঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকে অশোভন এবং শাসনযোগ্য মনে করেন। তাই তারা বাল্য থেকে এক লাফে বার্ধক্যে চলে যেতে চান।

পণ্ডিতগণের উক্ত মনোভাবের কারণ : লেখকের মতে, প্রাচীন ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ যৌবন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করেন। পণ্ডিতগণ যৌবনের অবিনীত দীপ্তি ও তেজকে ভয় পান। ফলে যৌবনকে তারা চান শাসনে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, যৌবনের পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে। তারা মনে করেন, মানবজীবনে যৌবন আপদবিশেষ। এজন্য তারা বাল্যকাল থেকে এক লাফে বার্ধক্যে উপনীত হতে চান। তারা কেবল বাল্য ও বার্ধক্যই গ্রহণ করেন; কারণ তাতে যৌবনের শক্তি নেই। যৌবনের শক্তিকে তারা ভয় পান। তারা যৌবনকে এড়িয়ে সমাজজীবন চালিত করতে চান। সমাজের রাজনীতি, ধর্মনীতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, যৌবনকে পণ্ডিতেরা গোপন রাখতে চান, এড়িয়ে চলেন, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ যৌবনের নানারূপ বিকৃতিতে স্পষ্ট।

ত্যাগী মনোভাবের অভাব : আমাদের পণ্ডিতগণের ত্যাগের মনোভাব বিলুপ্ত হয়ে ভোগের মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে মূলত প্রাচীন ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে। তারা ত্যাগের পরিবর্তে ভোগকে জীবনের সবকিছু বলে গ্রহণ করেছেন। আর ভোগের প্রধান অবলম্বন হিসেবে যৌবনকে বেছে নিয়েছেন। তারা মানতে নারাজ, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনের ধর্ম। প্রাকৃতিক যৌবন তথা বসন্ত ঋতু মানুষের শাসন ক্ষমতার বাইরে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের যৌবন শাসনযোগ্য। তাই তারা যৌবনকে শ্রদ্ধা না করে এর অফুরন্ত শক্তি ও তেজকে শাসন করে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান। মূলত যৌবনের শক্তি ও তেজ শুধু ভোগের জন্য নয়, এটা ত্যাগের জন্যও বটে।

উপসংহার : মানবজীবনেও প্রকৃতির বসন্তের মতো একবার যৌবন আসে। তাকে কর্মের মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে। কারণ যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয়, ত্যাগের কাজেও যৌবনের শক্তি উৎসর্গ করা যায়। এক প্রাণের যৌবনকে লাখো প্রাণে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমেই সমাজজীবনে সাফল্য ও সমৃদ্ধি আসবে। এজন্যই লেখক যৌবন সম্পর্কে পণ্ডিতদের মনোভাব পরিহার করে যৌবনে রাজটিকা দেওয়ার কথা বলেছেন।

» প্রশ্ন : ২৬ ॥ "এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর এক মায়াবাদী, কারণ এঁরা উভয়েই একমন।" –এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধানুসারে জড়বাদী ও মায়াবাদীদের মানসিকতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বহুল আলোচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বিদগ্ধ সমালোচক ও মননশীল লেখক প্রমথ চৌধুরীর একটি কালজয়ী প্রবন্ধ। তিনি এ প্রবন্ধে যৌবনের স্তুতি বন্দনা করেছেন এবং বলেছেন, যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরাতে। অন্যদিকে যারা যৌবনের কপালে রাজটিকা পরাতে নারাজ তাদের পরিচয় তুলে ধরে তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন।

প্রবন্ধকারের দৃষ্টিতে যৌবন : প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরীর মতে, যৌবন সর্বোত্তম ও দুর্লভ সময়, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। যৌবন সম্পর্কে বলা হয়– It is the best time of human life. যৌবন দুরন্ত, শক্তির উৎস, কর্মক্ষম সৃষ্টির প্রেরণায় পরিপূর্ণ। যৌবনের ধর্ম কেবল ভোগ ও বাসনা নয়; ত্যাগ এবং সৃষ্টিও বটে। যৌবনে মানুষের সকল ইন্দ্রিয় সক্রিয় থাকে। এ সক্রিয় ইন্দ্রিয় জাতির জন্য এনে দিতে পারে সৌভাগ্য ও সাফল্য। যৌবনশক্তিতে বলীয়ান হয়ে মানুষ দেশ ও জাতির অসংখ্য কল্যাণ সাধন করতে পারে। তাই লেখক যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরাতে প্রস্তুত।

আমাদের সমাজে যৌবন : যৌবনকে আমাদের সমাজে ভয় এবং সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। মনে করা হয়, যৌবন মস্তবড় একটা ফাঁড়া। তাই অনেকে যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরানোর পরিবর্তে এর পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগের পক্ষে। আমাদের দেশের কিছু পণ্ডিত মনে করেন, বসন্ত ঋতু এবং প্রকৃতির যৌবন অশোভন, দুর্বিনীত ও শাসনযোগ্য। তাই তারা বাল্যকাল পেরিয়ে তাড়াতাড়ি বার্ধক্যে পৌঁছে যেতে চান। ফলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারেই তারা যৌবন থেকে হারিয়ে যান। তাদের মিলন ঘটে এক জড়ত্বের সাথে আর এক জড়ত্বের। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন, "আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে আছে ভূমিকা আর শেষে আছে উপসংহার, মাঝে কিছুই নেই।"

জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দৃষ্টিতে যৌবন : জড়বাদী ও মায়াবাদীরা যৌবনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারেনি। তারা যৌবনকে কেবল ভোগের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং এক মস্তবড় ফাঁড়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। অথচ যৌবন শুধু ভোগের নয়, ত্যাগের মহিমায়ও উজ্জ্বল হতে পারে– এ সত্য কথা জড়বাদীরা মানতে নারাজ; বরং তারা যৌবনকে একটি অভিশাপ মনে করে সদা এ থেকে রক্ষা পেতে চায়। ফলে তাদের দেহের জড়তা ও মনের জড়তা এক হয়ে যায় এবং সমাজদেহেও জড়তা নেমে আসে।

জড়বাদী সংস্কৃত পণ্ডিতদের ভুল ব্যাখ্যা : জড়বাদী সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যৌবনের শক্তি, সাহস, প্রাণচাঞ্চল্য ও গতিময়তার নেতিবাচক দিকগুলোকে জনসমক্ষে তুলে ধরে যৌবনকে ধ্বংস ও বিপদের সময় হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী তার 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে তাদের সমালোচনা করে বলেছেন, যৌবন সম্পর্কে আমাদের দেশে ভুল ব্যাখ্যা ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য মূলত সংস্কৃত পণ্ডিতরাই দায়ী। যৌবন সম্পর্কে বিরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তারা আমাদের অহেতুক ভীতির মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। অথচ যৌবনের শক্তি, সাহস ও প্রাণচাঞ্চল্য শুধু নগ্ন ভোগের কাজেই ব্যবহার করা যায় না; বরং এগুলোকে সমাজের উন্নয়নে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মত্যাগের কাজেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এ সত্যটা সংস্কৃত পণ্ডিতগণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তাই তাদের সাহিত্যে উঠে এসেছিল যৌবনের নেতিবাচক দিকগুলো।

মায়াবাদী ও জড়বাদীদের আপত্তি : সৃজনশীল যৌবনের ললাটে রাজটিকা দিতে বিশেষ আপত্তি জড়বাদীদের। জড়বাদীরা জড়ের অর্থাৎ স্থবিরের পূজারী। তাই তারা দেহকে প্রাধান্য দেয়, যৌবনকে প্রাধান্য দিলেও তা দেহের যৌবনকে; মনের যৌবনকে নয়। জড়বাদীরা চায় দেহের জড়তার সাথে মনের জড়তার মিলন। মনের যৌবন জীবনপ্রবাহকে জাগ্রত করে। একজনের মনের যৌবন অন্যজনে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু যারা জড়বাদী তারা মনের পরিবর্তে জড় দেহকে প্রাধান্য দেয়। ফলে তারা মনের যৌবন স্বীকার করে না, স্বীকার করে দেহের যৌবনকে। যে যৌবন ভোগের, ভোগটুকু শেষ হলেই তার জীবনটুকু শেষ; তার বৃদ্ধি নেই, সঞ্চারণ শক্তি নেই, আছে ক্ষয়। মানসিক যৌবনই পরবর্তীতে সমাজের যৌবনকে স্থায়িত্ব দেয়। এ যৌবনকে জড়বাদী ও মায়াবাদীরা ভয় পায়। কারণ জড়বাদী আর মায়াবাদীরা এক ও অভিন্ন। এদের উভয়ের উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ এমনকি সমগ্র বিশ্ব থেকে মানসিক যৌবনের প্রভাব দূর করা। কারণ তাদের বিশ্বাস, স্থিরতায়, জড়তায় ও চলমানতায় তাদের ভয়। এজন্যই মানসিক যৌবনের কপালে রাজটিকা পরাতে জড়বাদী এবং মায়াবাদীদের আপত্তি।

জড়বাদী ও মায়াবাদীদের শঙ্কা : জড়বাদীরা চলমানতাকে আর মায়াবাদীরা বাস্তবতাকে ভয় পায়। এরা সমাজকে কেবল পেছনের দিকে টানে। অগ্রগতি ও প্রগতিকে এরা সহজভাবে নিতে পারে না। কিন্তু যৌবন অগ্রগতি ও প্রগতির ধারক-বাহক। জড়তা ও স্থিরতাকে যৌবন কখনো ঠাঁই দেয় না। যৌবনের স্বভাবই হলো নতুন নতুন সৃষ্টি করা। জড়বাদীরা সৃষ্টির পথে অন্তরায়। অন্যদিকে মায়াবাদীরা কল্পনাবিলাসী। কল্পনার ডানায় ভর করে তারা পুরাতনের জয়গানে মুখরিত। আমাদের দেশের এক শ্রেণির মানুষ যৌবনের কপালে রাজটিকা দেওয়ার পরিবর্তে এর পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে প্রস্তুত। তাদের মতে, যৌবন হলো মস্ত বড় একটা আপদ; যেন কোনোভাবে এটি পার করতে পারলেই বাঁচা যায়। তাই এরা যৌবনকাল এড়িয়ে এক লাফে বাল্যকাল থেকে বার্ধক্যে উপনীত হতে চায়। কেননা যৌবনের অফুরন্ত শক্তি সাহস আর উচ্ছলতাকে তারা ভীষণ ভয় পায়। এরা দেহের যৌবন থেকে দূরে থাকতে গিয়ে মনের যৌবনও হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের দেহের ও মনের জড়তা এক হয়ে যায়। মূলত এরাই জড়বাদী ও মায়াবাদী।

যৌবনের প্রকৃত রূপ : মূলত জড়বাদী ও মায়াবাদীরা যৌবনের প্রকৃতরূপ অনুধাবন করতে পারেনি। প্রাবন্ধিকের মতে, মানুষের মনের যৌবনই হলো প্রকৃত যৌবন। এ যৌবনকে এক প্রাণ থেকে লাখো-কোটি প্রাণে সঞ্চার করা যায়। কিন্তু শারীরিক যৌবনকে তা করা যায় না। তবে শারীরিক যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয় ত্যাগের জন্যও বটে। লেখকের মতে, আমরা যদি সমাজের বেশিরভাগ মানুষের মনে যৌবন এনে দিতে পারি, তাহলে সমাজে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আসবে।

যৌবনে রাজটিকা পরানোর কারণ : লেখকের মতে, মানসিক শক্তিতে যে জাতি যত বলীয়ান, সে জাতি তত উন্নত। কোনো জাতি যখন মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়, তখন সে জাতি গৌরবের রাজটিকা ললাটে ধারণ করতে পারে। প্রবন্ধকার প্রাণধর্ম বিকাশের জন্য, মনুষ্যত্বের গৌরব বৃদ্ধির জন্য, সমাজকে সজীব, সচল ও সজাগ রাখা এবং সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাকে পূর্ণতাদানের জন্য যৌবনে রাজটিকা পরাতে চেয়েছেন। কারণ যৌবনকে উৎসাহিত ও মূল্যায়ন করলে সমাজদেহেও যৌবন নেমে আসবে, সমাজ গতিশীল হবে এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে।

প্রাবন্ধিকের কামনা : লেখক তার প্রবন্ধে যৌবনের প্রশংসা-স্তুতি করার সাথে সাথে সমাজজীবনে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। কারণ যৌবন সবসময়ই নতুন

নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্ভাসিত। দেহের যৌবন শেষ হয়ে গেলেও মনের যৌবন কখনো শেষ হয় না। এটিকে আজীবন ধরে রাখা যায়। তাই মানসিক যৌবনকেই সমাজে প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন লেখক। কারণ সমাজে যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কখনো সমাজের সমৃদ্ধি আসবে না।

উপসংহার : লেখক 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে মানসিক যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। তিনি মনে করেন, এতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়; আপত্তি থাকবে কেবল তাদেরই যারা জড়বাদী ও মায়াবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ। লেখক তাই, জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দলে না ভিড়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বার্থে সবাইকে সমাজজীবনে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ২৭ ॥ প্রমথ চৌধুরী রচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের নামকরণের কারণ ও সার্থকতা আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : যৌবন প্রশস্তিমূলক 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি মননশীল ও বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক, বাংলা সাহিত্যে প্রমিত চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত। উপজীব্য বিষয় নির্বাচনে প্রবন্ধকার সুনিপুণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক রীতি অবলম্বনে প্রাবন্ধিক তার প্রবন্ধের নিগূঢ় তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে প্রবন্ধটির নামকরণ করেছেন 'যৌবনে দাও রাজটিকা'। এ নামকরণে তার রীতি কী ছিল বা এটি রচনার উদ্দেশ্য এবং তা মূল বিষয়বস্তুর সাথে কতটা সঙ্গতি রক্ষা করেছে সে বিষয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

সাহিত্যে নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়- Literature is the mirror of life. অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা, নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যের মূল ভাব ফুটে ওঠে। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন- A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, অঢেল সম্পদের চেয়ে একটি সুন্দর নাম ভালো। সাহিত্যিকগণ সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকেন। তারা ভাব বা কল্পনার সমুদ্রে অবাধ বিচরণ করেন। তাই বলে তারা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির উর্ধ্বে নন। তারা রচনার মূল বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখেই সাহিত্যের নামকরণ করে থাকেন। কারণ তা না হলে সাহিত্যের নামকরণ সার্থক হয় না।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যের নামকরণে লেখক, কবি বা গল্পকারকে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয়-

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- নায়ক-নায়িকার নাম
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা।
- স্থান বা কাল

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের নামকরণের প্রতিপাদ্য : 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে সুসাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী যৌবনের বন্দনা করেছেন, জয়গান গেয়েছেন উদারচিত্তে মুক্তকণ্ঠে। সব জড়তা, স্থবিরতা, জীর্ণতা, দীনতার অবসান ঘটিয়ে তিনি মানসিক যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ প্রবন্ধে তিনি যৌবনের কপালে রাজটিকা পরানোর প্রস্তাব করেছেন। যৌবনের প্রকৃত রূপ, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, গতি ইত্যাদি সুনিপুণভাবে নির্ণয় করে একে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি যৌবনকে দেখেছেন অফুরন্ত প্রাণশক্তি হিসেবে। যৌবনের কপালে তিনি রাজটিকা পরানোর আহ্বান জানিয়েছেন- যা

অবিনশ্বর, স্থায়ী, যে যৌবন দৈহিক নয়– মানসিক; যে যৌবন বয়সের ফ্রেমে বাঁধা নয় বরং তা যুগ ও কালোত্তীর্ণ। তিনি বলেছেন, যৌবন শুধু ভোগের নয়, ত্যাগেরও। সর্বোপরি তিনি যৌবনকে অবহেলা না করে এর যথাযথ মূল্যায়ন ও গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন।

বিষয়বস্তুর আলোকে 'যৌবনে দাও রাজটিকা'

যৌবনের পরিচয় : যৌবনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Youth. Oxford Dictionary-তে যৌবনের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The time of life when a person is young, especially the time before a child becomes an adult. লেখকের মতে, যৌবনকে বয়সের মাপকাঠিতে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। কারণ প্রকৃত যৌবন হলো মনের যৌবন, আর মনের যৌবন কখনো বয়সের ফ্রেমে বন্দি নয়। তাই লেখক এ মানসিক যৌবনকেই সমাজে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং এর ললাটে রাজটিকা পরাবার প্রস্তাব দিয়েছেন।

যৌবনের ধর্ম : যৌবন শক্তি, সাহস, উচ্ছলতা ও প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর। যৌবন সবসময় নতুন নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্যমী। তাই মানুষের যৌবন কেবল ভোগের উপকরণ নয়। যারা যৌবন জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, ভাটার সময় তারা হা-হুতাশ করে মরেন। যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় সব সচল-সবল হয়ে ওঠে। এ সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষ সে প্রেরণা তার সকল অঙ্গে অনুভব করে। প্রমথ চৌধুরী তাই প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরা যৌবনের স্তুতি রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনের ধর্ম।

যৌবনের প্রকৃত রূপ : প্রাবন্ধিকের মতে, দেহের যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়; বরং মনের যৌবনই প্রকৃত যৌবন। যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয়; ত্যাগেরও। যে ত্যাগ করতে পারে তিনিই প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী বলেন, "বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না।" তার মতে, মানসিক যৌবনই প্রকৃত যৌবন। কারণ প্রথমত, এ যৌবন কোনো কাল বা সময়ের ছকে বাঁধা নয়; আশি-নব্বই বছর বয়সী মানুষও মানসিকভাবে যৌবনের অধিকারী হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এ যৌবন এক প্রাণ থেকে লাখো প্রাণে সঞ্চার করা যায়, কিন্তু দৈহিক যৌবনের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। তাই প্রাবন্ধিক মনের যৌবন বা মানসিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সমাজে এ যৌবনের প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন।

নামকরণের সার্থকতা : একটি রচনার নামকরণ তখনই সার্থক হবে যখন শিরোনামে রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভালোভাবে প্রতিফলিত হয়। মূল প্রবন্ধ ভালোভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এর অন্তর্নিহিত ভাববস্তুর আলোকে সুন্দর শব্দ চয়নের মাধ্যমে শিরোনাম প্রস্তুত করতে পারলেই নামকরণ সার্থক হয়। এদিক থেকে বিচার করলে 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটির নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে। কারণ এ প্রবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেখক যৌবনের স্তুতি গেয়েছেন, যৌবনের প্রকৃত রূপ এবং এর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, যৌবনের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন, যৌবনের বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা করেছেন এবং সর্বোপরি যৌবনকে রাজটিকা পরাবার প্রস্তাব করেছেন। সুতরাং এসবের বিচারে 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের নামকরণ সার্থক হয়েছে।

উপসংহার : বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক বুদ্ধিমত্তার সাথে বিশ্লেষণী শক্তি দিয়ে অসংখ্য উপমা ও সমালোচনায় যৌবনের স্বভাবধর্ম, স্বরূপ ও বার্ধক্যের মাঝে পার্থক্য উপস্থাপন করে মানসিক যৌবনকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি ছত্রেই ফুটে উঠেছে যৌবনের প্রশস্তি। তাই বলা যায়, প্রবন্ধটির 'যৌবনে দাও রাজটিকা' নামকরণ যথার্থ, সার্থক, সুন্দর ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

বিদায়-হজ

মোহাম্মদ আকরম খাঁ [১৮৬৮–১৯৬৮ খ্রি.]

» প্রশ্ন : ২৮ ॥ মোহাম্মদ আকরম খাঁ রচিত 'বিদায়-হজ' প্রবন্ধ অনুসরণে মহানবি (স) প্রদত্ত ভাষণটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ১৯৮৪, '৮৬, '৯৭]
অথবা, 'বিদায়-হজ' উপলক্ষে আরাফাতে প্রদত্ত মহানবি (স)-এর ঐতিহাসিক ভাষণের বিবরণ দাও। [ফা. প. ১৯৯৪]
অথবা, মোহাম্মদ আকরম খাঁ তার 'বিদায়-হজ' শীর্ষক প্রবন্ধে হযরতের অভিভাষণ অংশে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর। [ফা. প. ২০০৫]
অথবা, "মুছলমান পাঠকগণ হযরতের এই চরম উপদেশের প্রত্যেক দফার সহিত সমাজের বর্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিবেন"–'বিদায়-হজ' প্রবন্ধ অনুসরণে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৮৯, '০১]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ইসলামি চিন্তাবিদ ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায়-হজ' একটি তথ্যবহুল সুপ্রসিদ্ধ রচনা। এ রচনার মূল প্রতিপাদ্য হলো বিদায় হজের দিন রাসূল (স)-এর আরাফাতের ময়দানের যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ভাষণ। মহানবি (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। বিদায় হজে তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তা মেনে চললে আজও ধরায় শান্তি ফিরে আসবে। এজন্যই জর্জ বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন– I believe if a man like Muhammad (Sm) were to assume the dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem in a way that would bring its much needed peace and happiness.

বিদায় হজের ভাষণের পটভূমি : আরবের লোকেরা যখন দলে দলে ইসলাম গ্রহণ শুরু করল তখন মহানবি (স) মনে করলেন তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে। তাই তিনি হজ পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন। দশম হিজরী সনের ৯ই জিলহজ শুক্রবার আরাফার দিন দুপুরের পর আরাফাতের জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) প্রায় দু'লাখ সাহাবির সমাবেশে যে বিখ্যাত ভাষণ দেন, তাই বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত।

বিদায় হজের ভাষণের মূল বক্তব্য : মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণে যে বক্তব্য প্রদান করেন তার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ–

১. **কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন :** রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর ভাষণের প্রারম্ভেই তাঁর বিরোধীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং জাহেলি যুগের যাবতীয় কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, অনাচার রহিত ও বাতিল ঘোষণা করেন।

২. **শোণিত প্রতিশোধ ও কুসিদ প্রথা বাতিল :** আইয়ামে জাহেলিয়া যুগের মূলমন্ত্র ছিল, 'রক্তের বদলে রক্ত।' রাসূলুল্লাহ (স) এ প্রতিশোধ পদ্ধতি এবং সুদের লেনদেন একেবারে হারাম ও বাতিল ঘোষণা করেন।

৩. **ব্যক্তিই তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী :** রাসূলুল্লাহ (স) সমাজজীবনে হাঙ্গামা চিরকালের জন্য বন্ধের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, ব্যক্তির অপরাধ অন্য কারো ওপর, তার নিকটাত্মীয় বা গোত্রের ওপর চাপানো যাবে না। যে অপরাধ করবে সে-ই তার শাস্তি ভোগ করবে।

৪. **আমীর বা নেতার আনুগত্য করতে হবে :** মহানবি (স) বলেন, নাককাটা কাফ্রি ক্রীতদাসও যদি আমির নির্বাচিত হয়, তবুও তার আনুগত্য করে চলতে হবে।

৫. **ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না :** তিনি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের নিজেদের ধর্মে অবিচল থাকতে হবে, কিন্তু বলপূর্বক অন্যের ওপর নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। ধর্ম নিয়ে রক্তপাতের কারণে ইতঃপূর্বে বহু জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

৬. **কৃতকর্মের জবাবদিহিতা :** রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রত্যেককেই একদিন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে এবং তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৭. **জানমালের নিরাপত্তা :** তিনি বলেন, এক মুসলমানের জানমাল আরেক মুসলমানের জন্য পবিত্র বলে পরিগণিত হবে; যেরূপ আজকের দিন ও মাস পবিত্র। তাই এক মুসলমান কর্তৃক অন্য মুসলমানের জানমালের ক্ষতি করা হারাম।

৮. **মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই :** মহানবি (স) বলেছেন, সব মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। কারণ সব মানুষই আদম হাওয়ার সন্তান, আর তারা মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তাই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা যাবে না।

৯. **মুসলমানরা ভাই ভাই :** নবিজি বলেছেন, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এই আদর্শে বিশ্বাসী আরবের মুসলমানদের মধ্যে এমন সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যা দেখে জনৈক ইংরেজ কবি বলেন–

No distance breaks the tie of blood
Brothers are brothers evermore.

১০. **চারটি চির কল্যাণকর বাণী :** বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) চারটি চির কল্যাণকর বাণী মুসলমানদের সবসময় স্মরণ রাখতে বলেছেন। তা হলো–
ক. কোনোকিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না।
খ. অন্যায়ভাবে নরহত্যা করবে না।
গ. কারো পণ্যদ্রব্য অপহরণ অর্থাৎ চুরি করবে না।
ঘ. কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না।

১১. অত্যাচার করা অনুচিত : মানুষের ওপর অত্যাচার করা যাবে না এবং কারো অসম্মতিতে তার সামান্য ধন-সম্পদও গ্রহণ করবে না।

১২. **দুটি মহান আমানত :** রাসূলুল্লাহ (স) বিশ্ববাসীকে কল্যাণের পথ দেখানোর জন্য দুটি পবিত্র আমানত রেখে যান। একটি হলো পবিত্র কুরআন আর অন্যটি হাদীস শরীফ।

১৩. **নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার :** তিনি বলেন, নারীদের সাথে সদয় ব্যবহার করতে হবে। নারীর ওপর পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষের ওপরও নারীর সমান অধিকার রয়েছে।

১৪. **দাসদাসীর অধিকার :** মহানবি (স) বলেন, তোমরা যেরূপ খাদ্য গ্রহণ কর এবং পোশাক পরিধান কর, তোমাদের দাস-দাসীদেরও অনুরূপ পোশাক ও খাদ্য প্রদান করবে।

১৫. **সুদ খাওয়া হারাম :** তিনি সুদসহ হারাম উপায়ে কোনোকিছু আত্মসাৎ করতে গুরুতরভাবে নিষেধ করেছেন।

১৬. **বাণী প্রচারের দায়িত্ব :** বিদায় হজে মহানবি (স) উপস্থিত মানবমণ্ডলীকে অনাগত মানবমণ্ডলীর কাছে তাঁর এ বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব অর্পণ করেন।

বিদায় হজের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ক. **মহানবির আল্লাহভীতি :** বিদায় হজের ভাষণ শেষ করে মহানবি (স) বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী পৌঁছিয়েছি? আমি কি আমার দায়িত্ব সম্পাদন

করেছি?' তখন উপস্থিত জনতা বলে ওঠে– "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন।" তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, "আল্লাহ, এই লাখো জনতা সাক্ষী থাকলো আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"

খ. **মানবমুক্তির বাণী :** মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ ছিল মানবমুক্তির বাণী। এ ভাষণের প্রতিটি বাণীতেই মানবমুক্তির কথা ঘোষিত হয়েছে।

গ. **অধিকার প্রতিষ্ঠা :** মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, আমীর-ফকির সবার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। এ ভাষণে সবার অধিকারই সমান গুরুত্ব পেয়েছে।

উপসংহার : মহানবি (স) অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবদের মাঝে সভ্যতার আলো জ্বালিয়েছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন বিশ্ব মানবের সুমহান আদর্শ। তাই তাঁর প্রচারিত দ্বীন ইসলাম নিছক ধর্ম নয়, তা মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তিরও অমিয় বাণী। কারণ মহানবি (স)-এর এ ভাষণে মানব জাতির অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

» প্রশ্ন : ২৯ ॥ 'বিদায়-হজ' প্রবন্ধে মহানবি (স)-এর ঐতিহাসিক ভাষণে ইসলামের যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, তা তোমার নিজের ভাষায় ব্যক্ত কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'বিদায়-হজ' প্রবন্ধটি বিশিষ্ট সাংবাদিক, স্বনামধন্য সাহিত্যিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত একটি তথ্যবহুল সুপ্রসিদ্ধ রচনা। এ প্রবন্ধে রাসূল (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ এবং এ ভাষণের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। নিচে প্রশ্নালোকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপস্থাপন করা হলো :

বিদায় হজের ভাষণ : দশম হিজরী সনের ৯ যিলহজ্জ শুক্রবার আরাফার দিন দুপুরের পর আরাফাত ময়দানের জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) প্রায় দু'লাখ সাহাবীর সমাবেশে যে বিখ্যাত ভাষণ দেন, তা-ই বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত।

ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য

মহানবি (স)-এর ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের অন্তর্নিহিত যে সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. **জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা :** রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জানমাল ও ইজ্জত মুসলমানরা আজকের এ হজের দিনের মতোই পবিত্র বলে জানবে। কারো জীবন, ধনসম্পদ ও ইজ্জতের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না।

২. **কৃতকর্মের জবাবদিহিতা :** তাঁর ভাষণে কৃতকর্মের জবাবদিহিতার বিষয়টি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষকে স্মরণ রাখতে হবে, একদিন তাকে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। তখন তাঁর কাছে নিজের কৃতকর্মের কৈফিয়ত দিতে হবে।

৩. **ভ্রাতৃত্ববোধ :** নবিজির ভাষণে ইসলামের মহান ভ্রাতৃত্বের রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, সব মানুষ মিলে এক অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ। তাই জনৈক ইংরেজ কবি বলেন–

No distance breaks the tie of blood
Brothers are brothers evermore.

৪. **নারীর অধিকার :** নবিজির ঐতিহাসিক ভাষণে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি বলেছেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেরূপ অধিকার, স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও সেরূপ অধিকার রয়েছে। তাই নারীদের প্রতি সদয় হতে হবে।

৫. **সব মানুষ সমান :** বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে মানুষে মানুষে ভেদাভেদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। প্রত্যেকেই আদম ও হাওয়া আলাইহিস সালামের সন্তান, আর তারা মাটি থেকে সৃষ্ট; সুতরাং সব আদম সন্তানই মাটি থেকে সৃষ্ট। অতএব তাদের ওপর কারো কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

৬. **দাসদাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা :** মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে দাসদাসীদের অধিকারও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তিনি তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার না করতে এবং তাদেরকে নিজের অনুরূপ খাবার ও পোশাক দিতে বলেছেন।

৭. **গণতন্ত্রের স্বীকৃতি :** ইসলাম কুলমর্যাদা বা বংশগৌরবে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম গণতন্ত্রের মূলনীতি সমর্থন করে। সেজন্য মহানবি (স) যোগ্য খোঁড়া ক্রীতদাসের নেতৃত্বও মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন।

৮. **পাপাচার থেকে দূরে থাকার উপদেশ :** নবিজি (স) বলেছেন, অন্যায়, পাপ, জুলুম ও উৎপীড়ন থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। পাপ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, কখনোই তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না।

৯. **ধর্মের ব্যাপারে উদারনীতি গ্রহণ করতে হবে :** নবিজি (স) বলেছেন, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। মুসলমানদের নিজের ধর্মে অবিচল থাকা চাই, কিন্তু বলপূর্বক অন্যের ওপর নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

১০. **চারটি মহান বাণী :** বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) মুসলমানদের চারটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে বলেছেন। যথা–
ক. কোনোকিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না।
খ. অন্যায়ভাবে আল্লাহর সৃষ্ট মানুষকে হত্যা করবে না।
গ. অন্যের সম্পদ কখনো আত্মসাৎ করবে না।
ঘ. কখনো ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না।

১১. **দুটি আমানত :** বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) বিশ্বমানবতার পথনির্দেশের জন্য দুটি মহান আমানত রেখে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। তার প্রথমটি আল্লাহর বাণী আল কুরআন, দ্বিতীয়টি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস।

উপসংহার : সত্যিই বিদায় হজের দিনে নবিজি (স)-এর ভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক। কারণ এতে সুন্দর ও নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য নারী-পুরুষ, দাস-দাসী, ধনী-গরিব সবার অধিকার সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণ চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : ৩০ ॥ 'বিদায়-হজ' প্রবন্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০১, '০৮]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায়-হজ' একটি তাত্ত্বিক রচনা। দশম হিজরির ৮ যিলহজ্জ শুক্রবার আরাফার দিন দুপুরের পর আরাফাতে জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) প্রায় দু'লাখ সাহাবির সমাবেশে যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক।

নবিজির বিদায় হজের ভাষণ : রাসূলুল্লাহ (স) দশম হিজরির ৮ যিলহজ শুক্রবার আরাফার দিন দুপুরের পর আরাফাতের জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে প্রায় দু'লাখ সাহাবির সম্মুখে যে ভাষণ প্রদান করেন, তা-ই ইতিহাসে বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত।

'বিদায় হজ' প্রবন্ধের গুরুত্ব

১. **মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা :** রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বমানবতাকে আহ্বান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, প্রতিটি মানুষের জীবন ও সম্পদ আজকের হজের দিনের মতোই পবিত্র। তাই কারো জীবন, ধন-সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মানের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। ইসলাম যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তা, সর্বোপরি মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়, মহানবি (স)-এর এ ঘোষণায় তা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২. **ইসলামে নারীর অধিকার :** ইসলামে নারীর পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, নারীকে সুউচ্চ মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। বিদায় হজের দিন তাই রাসূল (স) ঘোষণা করেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যেরূপ অধিকার রয়েছে, স্বামীর ওপরও স্ত্রীর তদ্রূপ অধিকার রয়েছে।

৩. **জবাবদিহিতার ঘোষণা :** বিদায় হজের ভাষণে নবিজি বলেন, প্রত্যেক মানুষই তার কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে দায়ী। প্রতিটি মানুষকেই একদিন তার সৃষ্টিকর্তার সামনে উপস্থিত হয়ে নিজ কাজের কৈফিয়ত দিতে হবে। আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় থাকলে মানুষ পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। ইসলামের এ পরকাল বিশ্বাসকে এখানে জোরদার করা হয়েছে। কৃত অপরাধের জন্য ব্যক্তি নিজেই দায়ী। এতে অন্য কাউকে দায়ী করা যাবে না। রাসূলের এ ঘোষণা দ্বারা ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ঘোষণা উচ্চারিত হয়।

৪. **ইসলাম সাম্যের ধর্ম :** ইসলামই ঘোষণা করেছে, সব মানুষ সমান। মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে তা উচ্চারিত হয়েছে। ভৃত্য দাসদাসীকে সে খাদ্য-বস্ত্রই দিতে হবে, যা তার প্রভু আহার ও পরিধান করে। ইসলাম ভৃত্যদের অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখতে বলেছে। কারণ তারাও আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। রাসূল (স) বিদায় হজের ভাষণে দাসদাসীদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ইসলাম সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী।

৫. **ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ :** ইসলাম ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। তাই রাসূল (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, "নিশ্চয় এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা, আর সকল মুসলমানকে নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ।" ধনী, গরিব, আমীর, ফকির, সব মুসলমান পরস্পরের ভাই। ইসলামের পতাকাতলে মৌলিক অধিকারের দিক থেকে সাদা-কালো, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই সমান। রাসূলের ভাষণে এ মৌলিক অধিকার গুরুত্ব লাভ করেছে।

৬. **পাপাচার থেকে দূরে থাকা :** হযরত মুহাম্মদ (স) সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় রোধ করার লক্ষ্যে তাঁর বিদায় হজের ভাষণে বলেন– অন্যায়, পাপ ও জুলুম-উৎপীড়ন থেকে সর্বদা দূরে থাকতে হবে। পাপ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। কেননা মানুষের প্রতিটি কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে।

৭. **সবারই ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে :** ইসলাম ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলেছে। তাই মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণে ধর্মের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি না করতে এবং কারো ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

অন্যের ওপর বলপূর্বক নিজধর্ম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অতীতে অনেক জাতি ধ্বংস হয়েছে।

৮. **নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ :** মহানবি (স) সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে নেতার প্রতি আনুগত্য বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছেন তাঁর বিদায় হজের ভাষণে। তিনি বলেছেন, নাক-কাটা কোনো কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা মনোনীত হয় তবুও তার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

৯. **শাশ্বত মূলনীতি ঘোষণা :** বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশে ইসলামের চারটি শাশ্বত মূলনীতি ঘোষণা করেন, যা মানব সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। মূলনীতিগুলো হলো–
ক. কোনোকিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক না করা।
খ. অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা না করা।
গ. অন্যের সম্পদ অপহরণ না করা।
ঘ. ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া।

১০. **পরম শান্তির বাণী :** ইসলাম শান্তির ধর্ম। মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে একথা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি মানুষের ওপর অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন। 'রক্তের বদলে রক্ত'– আইয়ামে জাহেলিয়ার এ মূলমন্ত্র তিনি রহিত ঘোষণা করেন। ফলে ইসলাম যে শাশ্বত শান্তির ধর্ম তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

১১. **মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা :** মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ পথনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এ প্রবন্ধে। মহানবি (স) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। আমার পর তোমরা এ দুটি জিনিস অনুসরণ করলে পথহারা হবে না। একটি হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন আর অপরটি হলো সুন্নাহ বা আল হাদিস।

উপসংহার : 'বিদায়-হজ' একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রবন্ধ। কারণ এতে মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ভাষণের নানা গুরুত্বপূর্ণ দিক সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে রাসূল (স)-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাই মোহাম্মদ আকরম খাঁ 'বিদায়-হজ' প্রবন্ধ রচনা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

» প্রশ্ন : ৩৯।। বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬, '১৮]

অথবা, মহানবি (স)-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে ইসলামের যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চারিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১১, '১৪]

অথবা, মহানবির বিদায় হজের ভাষণে ইসলাম ধর্মের কতকগুলো মৌল বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে– সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর।। উপস্থাপনা : মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন একাধারে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক এবং স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক। 'বিদায়-হজ' তাঁর রচিত একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ। এতে মহানবি (স)-এর ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নবিজির বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে ফুটে উঠেছে।

বিদায় হজের ভাষণ : দশম হিজরি সনের ৯ যিলহজ শুক্রবার আরাফাতের জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহানবি (স) প্রায় দু'লাখ সাহাবির সমাবেশে যে বিখ্যাত ভাষণ প্রদান করেন তা-ই বিদায় হজের ভাষণ নামে পরিচিত। এ ভাষণে ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্য : রাসূল (স)-এর বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে ইসলামের যেসব মৌল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো–

১. **ব্যক্তিস্বাধীনতা :** মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণের শুরুতেই বলেন, ইসলামে ব্যক্তিস্বাধীনতা সর্বতোভাবে স্বীকৃত। মানুষের ধন-প্রাণ পরস্পরের কাছে পবিত্র আমানত। এর ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ জঘন্য অপরাধ। কেননা ব্যক্তিস্বাধীনতা ইসলামের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য।

২. **কৃতকর্মের জবাবদিহিতা :** প্রত্যেক মানুষকে তার কৃতকর্মের জন্য একদিন আল্লাহর নিকট কৈফিয়ত দিতে হবে। ইহকালীন জীবন শেষ করে একদিন সব মানুষকে মহান প্রভুর সামনে হাজির হতে হবে। তখন প্রত্যেককে তার নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এটাও ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. **ভ্রাতৃত্ববোধ :** 'মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই'– এ মহান বাণী উদাত্ত কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছে বিদায় হজের বাণীতে। এ ঐতিহাসিক ভাষণে ঘোষিত হয়েছে– সব মানুষ এক আদমের সন্তান। তাই মানুষ পরস্পর ভ্রাতৃবৎ। জনৈক ইংরেজ কবির ভাষায়–

No distance breaks the tie of blood,
Brothers are brothers ever more.

তাই মহানবির উক্তি– "আর সকল মুসলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ (One brotherhood)।"

৪. **নর-নারীর অধিকার :** বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণে মহানবি (স) নর-নারীর অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর চোখে সবাই সমান। নারীর ওপর পুরুষের যেরূপ অধিকার, পুরুষের ওপর নারীরও সেরূপ অধিকার রয়েছে।

৫. **সমঅধিকার :** রাসূলুল্লাহ (স) আরো বলেন, ইসলাম মানুষের সমঅধিকারের পরিপোষক। এ কারণেই নির্দেশ রয়েছে, প্রভু যেরূপ খাদ্য গ্রহণ করবে, যেরূপ পোশাক পরিধান করবে, ক্রীতদাস-দাসীদেরও সেরূপ খাদ্য ও পোশাক দিতে হবে।

৬. **গণতন্ত্রের স্বীকৃতি :** রাসূল (স) বিদায় হজের ভাষণে বলেছেন, নাক-কাটা কৃষ্ণাঙ্গও যদি নেতা মনোনীত হয় তাহলে তার আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে। কারণ ইসলাম কুল-মর্যাদা বা বংশ-গৌরবে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম গণতন্ত্রের নীতিতে বিশ্বাসী।

৭. **ধর্মের ব্যাপারে উদার নীতি ঘোষণা :** নবিজি (স) বিদায় হজের ভাষণে ঘোষণা করেন, ইসলাম শান্তির ধর্ম। তাই নিজের ধর্ম নিজে পালন করতে হবে, অন্যের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বলপূর্বক নিজ ধর্ম গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। অন্যের ধর্মে আঘাত করা কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। রাসূল (স)-এর বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের এ মহান মৌল বৈশিষ্ট্য উচ্চারিত হয়েছে।

৮. **চারটি বিশেষ নীতি :** বিদায় হজের ভাষণে রাসূল (স) চারটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে বলেছেন। সেগুলো হলো–

ক. কোনোকিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না।

খ. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবে না।

গ. অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না।

ঘ. ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না।

এগুলো ইসলাম ধর্মের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

৯. **দুটি আমানত :** রাসূল (স) মুসলিম উম্মাহর পথপ্রদর্শক হিসেবে দুটি মহামূল্যবান বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো পবিত্র কুরআন, আর দ্বিতীয়টি হলো রাসূলের বাণী হাদিস।

১০. **সাম্যের নীতি ঘোষণা :** বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের সাম্যের নীতি ঘোষিত হয়েছে রাসূল (স)-এর পবিত্র জবানে। তিনি বলেছেন, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই. সব মানুষই আল্লাহর বান্দা। তাই গরিব দাসদাসীকে অবহেলা না করে তাদেরকে নিজের মতো খাদ্য-বস্ত্র দিতে বলেছেন।

উপসংহার : নবিজির সেদিনের সে বাণী মরুর হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি মুসলিম জাতির অন্তর থেকে এখনো মুছে যায়নি। মহানবির এ ভাষণে ইসলামের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বিশ্ব মানবতার কল্যাণে মহানবি (স)-এর এ ভাষণ দিক-নির্দেশনা হয়ে থাকবে।

সংস্কৃতি কথা

মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩–১৯৫৬ খ্রি.)

▸▸ প্রশ্ন : ৩২ ॥ মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য/ মূলভাব/বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, "সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।" –এ উক্তির আলোকে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের মূলভাব পর্যালোচনা কর।

অথবা, সংস্কৃতির স্বরূপ কী/বৈশিষ্ট্য কী/কাজ কী? মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ ও শিখা গোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। তিনি যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণধর্মী এবং মুক্তবুদ্ধিদৃপ্ত একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তার প্রবন্ধ সাহিত্য অত্যন্ত রুচিশীল ও পরিচ্ছন্ন। 'সংস্কৃতি কথা' তার অমর সৃষ্টি। এতে তিনি সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিমান লোকের স্বরূপ বিশ্লেষণ, ধর্মের সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক ও বৈপরীত্য নির্ণয় এবং সভ্যতা ও মতবাদের সূক্ষ্ম আলোচনা দৃষ্টান্ত সহকারে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সংস্কৃতি : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture. Oxford Dictionary-তে Culture বলতে বোঝানো হয়েছে– The customs and beliefs, art, way of life. সংস্কৃতি মানে কৃষ্টি, উৎকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদি।

পরিভাষায় কারো মতে, সংস্কৃতি হলো সভ্যতার নির্যাস।

কারো মতে– Culture is to know the best that has been thought and said in the world. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে উত্তমকে জানা, যা পৃথিবীতে বলা ও ভাবা হয়েছে।

কারো মতে– Culture is a complete picture of life. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

প্রবন্ধকার মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, সংস্কৃতি মানে জীবনের Values তথা মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা। সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা, প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; ..... প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

ধর্ম ও সংস্কৃতির স্বরূপ : লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার হলো শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা-সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি।" সাধারণ মানুষ ধর্মের ভেতর দিয়ে এগুলো পেয়ে থাকেন এবং নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আর শিক্ষিত মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কালচারের মাধ্যমে এগুলোর সন্ধান করেন এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নিয়ম-নীতি বা বাইরের বিধি-নিষেধের মধ্যেই জীবন চালনা করেন, কিন্তু কালচার্ড বা সংস্কৃতিমান ব্যক্তি বাইরের ধর্ম নয়; বরং তার ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনার মাধ্যমেই চালিত হয়ে থাকেন।

সংস্কৃতির উদ্দেশ্য : সাহিত্য, শিল্প, সংগীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়– উপায় বা মাধ্যম। সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজেকে অর্থাৎ 'আমিত্ব'-কে পুনর্জন্ম দেওয়া। লেখকের ভাষায়, নিজের ভেতর একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যিনি তা করতে পারেন তিনিই প্রকৃত কালচার্ড বা সংস্কৃতিমান। যারা বাইরের ধর্মকে গ্রহণ করে তারা আল্লাহকে জীবন-প্রেরণারূপে না পেয়ে ঠোঁটের বুলিরূপে পায়। তারা ভেতরের চেতনা না জাগিয়ে শুধু নরকের ভয় অথবা কল্পনার স্বর্গ পাওয়ার মানসে আল্লাহকে স্মরণ ও ধর্মের সাধনা করে। অন্যদিকে সংস্কৃতিমান ব্যক্তি নরকের ভয় বা স্বর্গলাভের আশা ব্যতিরেকেই সব অন্যায় নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি ন্যায় নিষ্ঠুরতাকেও ঘৃণা করে। তারা ভেতরের চেতনায় তাড়িত হয়ে সৌন্দর্যের জন্য, আনন্দের জন্য, মানবকল্যাণের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য সংস্কৃতির সাধনা করে।

সংস্কৃতির কাজ : সংস্কৃতি মানুষের মনের মাঝে একটি নিজস্ব জীবনদর্শনের জন্ম দেয়; সমাজ-মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত করে। শিক্ষা-দীক্ষা ও সৌন্দর্য সাধনার সাহায্যে সে সমাজের বুকে বিচরণ করে নিজেকে গড়ে তোলে। সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে মানুষকে বিশেষভাবে, পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা।

সংস্কৃতি ব্যক্তিতান্ত্রিক : লেখকের মতে, "কালচার সমাজতান্ত্রিক নয়; ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো, এটাই কালচারের আদেশ।" ব্যক্তির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। সে কারণেই আগে ব্যক্তি পরে সমাজ। ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় নদীর সঙ্গে আর সমাজকে সমুদ্রের সঙ্গে। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পূর্ণতা পায়, তেমনি ব্যক্তিও সমাজের মধ্যে খুঁজে পায় আপন জীবনের সার্থকতা। তাই প্রয়োজনে সংস্কৃতিমান ব্যক্তি সমাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। সমাজ দশের মধ্যে এক হওয়ার আর কালচার দশের মধ্যে এগারো হওয়ার আদেশ দেয়। দশের অধিকের মধ্য থেকেই নিজেকে নিজের মতো করে, পূর্ণাঙ্গ সুন্দর করে গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজের সর্বোত্তম সেবার শিক্ষা দেয় সংস্কৃতি।

ধর্ম ও সংস্কৃতির পার্থক্য : নিজের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাকে সীমাবদ্ধ করে ধর্ম বিশ্বাসের সমতা স্থাপন করে মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করতে চায় বলে অনেক সময় ধর্ম কালচারের পরিপন্থী। ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে; মানুষকে বিকশিত করতে নয়। আর কালচারের উদ্দেশ্য জীবনের বিকাশ, পতন বা পাপ থেকে রক্ষা নয়। ধর্ম সাধারণত ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী, কিন্তু কালচার ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনার মাধ্যমে নব জন্মদানের পক্ষপাতী। তাছাড়া ধার্মিকের চেয়ে কালচার্ড লোকের বন্ধন অনেক বেশি। ধর্মের কয়েকটি মোটা বন্ধন থাকলেও অসংখ্য সূক্ষ্ম চিন্তার বাঁধনে ফ্রি থিংকিং বা মুক্তচিন্তার মাধ্যমে মানুষের কালচারের বন্ধন হয় অন্তহীন।

সংস্কৃতির কেন্দ্র নারী : ধর্মের মাঝে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত রয়েছে। তাই কোনো কোনো ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের চোখে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাধনাবলে সংস্কৃতির কেন্দ্র হচ্ছে নারী। নারীকে উৎস করেই শিল্প-সাহিত্য গড়ে উঠেছে। জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা আসে নারী থেকে। নারীর প্রতি অত্যাচার, অবিচারের পরিবর্তে তাকে প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে জীবনকে সুন্দর করে উপভোগ করাই কালচারের ধর্ম। যৌন ব্যাপারে অতিরিক্ত কড়া শাসনের ফলে মানুষ যেন নিষিদ্ধ বস্তুর জন্য আরো বেশি আগ্রহী হয়ে থাকল। সংযম-শিক্ষার পথ হলো প্রেম। যে প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করতে পেরেছে সে-ই সংযমী হতে পেরেছে। আর যে প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না তার কাছে সংযম মানে আত্মপীড়ন।

সংস্কৃতির বিচিত্র পথ : সংস্কৃতিমান মানুষ হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই। কারণ সংস্কৃতির পথ বিচিত্র। প্রত্যেক সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরই পথ আলাদা। যত সংস্কৃতিমান মানুষ, সংস্কৃতির তত পন্থা। তারা প্রত্যেকেই আলাদা মানুষ, স্বতন্ত্র সত্তা। তারা নিজের পথ নিজেই তৈরি করেন। কল্যাণের ব্যাপারে তারা সাম্যকে অস্বীকার করলেও প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, চিন্তার ব্যাপারে বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী। তবে পথের ভিন্নতা থাকলেও লক্ষ্য তাদের একই। সকলেই অমৃত তথা আত্মাকে চায়।

সংস্কৃতিমানদের দৃষ্টিতে প্রগতি ও সভ্যতা : লেখকের মতে, সাধারণ লোকের কাছে প্রগতি আর সভ্যতার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, কিন্তু সংস্কৃতিমান ব্যক্তি তা স্বীকার করে না। সভ্যতা শুধু প্রগতি নয় আরো কিছু। প্রগতির সাথে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সভ্যতা হয় না। সভ্যতা সৃষ্টি করতে হলে চিরন্তনকে স্পর্শ করতে হবে।

সংস্কৃতি উন্নততর জীবনব্যবস্থার নির্মাতা : সংস্কৃতির কাজ হচ্ছে মানুষকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে তার মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। সংস্কৃতি মানুষকে উদার, কর্মপরায়ণ, প্রেমিক ও স্বাতন্ত্র্যবোধের অধিকারী করে গড়ে তোলে। সংস্কৃতি উন্নততর জীবনব্যবস্থার নির্মাতা। সংস্কৃতি সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনালাভে ভালোবাসা শিক্ষা দিয়ে থাকে। সংস্কৃতি তাই উন্নততর জীবনের সোনালি সোপানের দিশা দেয়।

উপসংহার : মানবজীবনকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও প্রগতির সংস্পর্শে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত করার সর্বোত্তম মাধ্যম হলো সংস্কৃতি। ধর্ম ও মতবাদের শৃঙ্খল ডিঙিয়ে মূল্যবোধকে আশ্রয় করে গভীর প্রেম ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উন্মেষে বিচিত্র জীবনধারায় নিজেকে সুন্দর ও সার্থকভাবে গড়ে তোলাই হচ্ছে 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধের মূল উপজীব্য।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৩ ॥ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির সাথে ধর্মের পার্থক্য নিরূপণ কর। [ফা. প. ২০০৯, '১৫, '১৭]

অথবা, "ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত ও মার্জিত লোকের ধর্ম।" –'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসরণে এ উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৭]

অথবা, 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী ধার্মিক ও সংস্কৃতিমান লোকের মধ্যে যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর।। উপস্থাপনা : 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুক্তিবাদী, স্বাতন্ত্র্যধর্মী ও মননশীল লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একটি অনন্য সৃষ্টি। ভাষার উৎকর্ষ, যুক্তি ও চিন্তার শাণিত প্রকাশে তার রচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ প্রবন্ধে তিনি সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে ধর্মের সাথে এর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture. Oxford Dictionary-তে Culture বলতে বোঝানো হয়েছে– The customs and beliefs, art, way of life. সংস্কৃতি মানে কৃষ্টি, উৎকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদি। পরিভাষায়, সংস্কৃতি হলো সভ্যতার নির্যাস। কারো মতে– Culture is to know the best that has been thought and said in the world.

কারো মতে– Culture is a complete picture of life.

ধর্মের সংজ্ঞা : ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion. Oxford Dictionary -তে ধর্মের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– The belief in the existence of a God and activities that are connected with the worship of them.

ধর্ম মানে জীবনাদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধান। স্রষ্টার আরাধনা করা, সত্যান্বেষণ করা, শান্তির পথে থাকা ইত্যাদি ধর্মের মূল কথা। ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে।

সংস্কৃতির রূপ : প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির রূপ সম্পর্কে বলেন, "সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনালাভে ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা– এর নাম হলো সংস্কৃতি।" সংস্কৃতি মানুষকে পূর্ণতা দান করে এবং মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে তার অন্তরে বিশ্বপ্রেমের মহিমা জাগিয়ে তোলে। তাই লেখক সংস্কৃতিকে আলাদা ধর্ম বা উচ্চতর ধর্ম বলেছেন। মূলত সংস্কৃতির কাজ হলো ব্যক্তির ভেতর আমিত্বকে বিকশিত করে উজ্জ্বল করে তোলা।

ধর্মের রূপ : ধর্ম পাপ-পুণ্য, নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান ইত্যাদির কথা বলে মানুষকে সৎপথে চলতে উৎসাহিত করে, ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে থাকতে বলে। ধর্ম শিক্ষা দেয় সৃষ্ট জীবকে ভালোবাসার, পরোপকার করার ও নীতিবোধের। ধর্ম সর্বজনীন মতবাদ প্রকাশ না করে নিজস্ব গণ্ডির আওতায় মানুষের মুক্তি কামনা করে। এভাবে ধর্ম মানুষের স্বাতন্ত্র্যবোধকে আচ্ছন্ন করে।

জীবনের নিয়ন্ত্রণ : মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা সংস্কৃতির মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদের ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনাকেই চালকরূপে গ্রহণ করে। আর ধার্মিকগণ বাইরের চাপে তথা ধর্মীয় নিয়মনীতির মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে। তাই প্রাবন্ধিকের মতে, "তারা আল্লাহকে জীবন প্রেরণারূপে পায় না, পায় ঠোঁটের বুলিরূপে।"

ধর্ম যেখানে শাস্ত্রীয় বাণীর মাধ্যমে সকল অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা থেকে বিরত থাকার কথা বলে, সেখানে সংস্কৃতি জীবনদর্শনের মাধ্যমে অন্যায়-নিষ্ঠুরতা এমনকি ন্যায়-নিষ্ঠুরতা থেকে বিরত রাখে।

জীবনের বিকাশ : ধর্ম চায় মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা আর পতন থেকে রক্ষা করে পূতপবিত্র ও নিষ্কলুষ রাখতে; মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, বৃক্ষটি নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপরদিকে সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে, পদস্খলন-পতন থেকে রক্ষা নয়; বরং জীবনের সর্বোত্তম বিকাশ তথা মনুষ্যত্ব প্রস্ফুটিতকরণ। তাই গোলাপের সঙ্গে যদি দু'একটা কাঁটা এসে যায় তো আসুক, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কি-না।

ইন্দ্রিয় সাধনা : সাধারণত ধর্ম ইন্দ্রিয়সাধনার পরিপন্থী। কারণ ধর্ম বিকাশকে কখনো বড় করে দেখে না। ইন্দ্রিয় অগ্রাহ্য করেই একজন ধার্মিক ঈশ্বরের সন্ধানে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন-সাধনার অপর নাম সংস্কৃতি। ইন্দ্রিয়নিচয়ের মাধ্যমে নবজন্মদানই এর উদ্দেশ্য। তাই সংস্কৃতিমানরা চোখ-কান খোলা রাখেন, তারা কানা ও

কালা হতে চান না। কেননা প্রবন্ধকার বলেন, "চোখ ও কানের প্রতি বেখেয়াল থাকা যে আত্মার প্রতিই বেখেয়াল থাকা, সংস্কৃতিমানরা তা বুঝলেও ধার্মিকদের মাথায় তা সহজে ঢোকে না। তাই তারা শুধু ঈশ্বরের নাম নেয়, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে না।"

সংস্কৃতির কেন্দ্রে নারী : ধর্মে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত হয়েছে। ধর্ম মানুষকে নারী থেকে দূরে রাখে, পাপ থেকে মুক্ত করতে চায়। তাই কোনো কোনো ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের নজরে, আর কোনো কোনো ধর্ম সংগীত, নৃত্য ও শিল্পকলার বিভিন্ন অঙ্গ শোভিত করতে নারীকে নিয়ে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয় তাতে জানিয়েছে ঘোর আপত্তি। অথচ প্রবন্ধকারের মতে, "ইন্দ্রিয়ের সাধনাবলে কালচারের কেন্দ্র নারী।" তাই সংস্কৃতি নারীকে জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করেছে।

যৌন ব্যাপারে ধর্ম ও সংস্কৃতি : ধর্ম যৌন ব্যাপারে বিশেষ কড়াকড়ি এবং নির্দিষ্ট অনুশাসনের মাধ্যমে তাতে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। কিন্তু সংস্কৃতি যৌন ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ না করে বরং প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা ভালো ইত্যাদি নীতিবাক্যে বিশ্বাসী। সংস্কৃতি প্রেম দ্বারা কাম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ব্যভিচার ও বিরোধের অবিচার থেকে মুক্তির কথা বলে।

ধার্মিক ও সংস্কৃতিমান লোকের মাঝে পার্থক্য : ধার্মিক ও সংস্কৃতিমান লোকের মধ্যে পার্থক্য হলো, ধার্মিকের চেয়ে সংস্কৃতিমান মানুষের বন্ধন অনেক বেশি। ধার্মিকের কয়েকটি মোটা বন্ধন আছে, কিন্তু সংস্কৃতিমান মানুষের বন্ধনের অন্ত নেই। অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বন্ধন, যা মুক্তচিন্তার সংস্কৃতির দান। যেখানে মুক্তচিন্তা নেই, সেখানে সংস্কৃতিও নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে যেভাবে আলাদা করে দেখানো হলো তাতে মনে হচ্ছে, ধার্মিক কখনো প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতিমান হতে পারবে না, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়; একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিকও সংস্কৃতিমান হতে পারে। ধার্মিকদের মধ্যেও সংস্কৃতিমান লোক রয়েছে।

উপসংহার : প্রবন্ধকার মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, যা কিছু সুন্দর, মার্জিত, রুচিশীল ও গতিশীল তা-ই সংস্কৃতি। আর যা বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে তা-ই ধর্ম। ধর্ম মানুষকে নৈতিক বাণী শুনিয়ে শৃঙ্খলিত জীবনাচরণে বাধ্য করে, কিন্তু সংস্কৃতি নিজের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা ও আমিত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, উদার মুক্তচর্চা ও গতিশীলতার সংমিশ্রণে সংকীর্ণ জীবন থেকে বৃহত্তর জীবনের দিকে পা বাড়ানোর নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচতে শেখায়।

⏩ প্রশ্ন : ৩৪ ‖ সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্ম, প্রগতি ও সভ্যতার সম্পর্ক কী? 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর।

অথবা, 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসরণে সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

অথবা, 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির সাথে ধর্ম, প্রগতি ও সভ্যতার সম্পর্ক নিরূপণ কর।

উত্তর‖ উপস্থাপনা : মোতাহের হোসেন চৌধুরী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বস্তুনিষ্ঠ, স্বনামধন্য ও সংযমী শিল্পী। 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। মানুষ জন্মগতভাবেই সংস্কৃতিমান প্রাণী। তার দৈনন্দিন কাজ-কর্মের ভেতর দিয়ে প্রতিভাত হয় সংস্কৃতি। ধর্মের অনুশীলন ও প্রগতির ধারক হয়ে মানুষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণধর্মী মননশীল লেখক তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বই তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর যুক্তি ও চিন্তার শাণিত প্রকাশে সংস্কৃতির সাথে ধর্ম, প্রগতি ও সভ্যতার সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture. Oxford Dictionary-তে culture বলতে বোঝানো হয়েছে– The customs and beliefs, art, way of life. সংস্কৃতি মানে, কৃষ্টি, উৎকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদি।

পরিভাষায়, সংস্কৃতি হলো সভ্যতার নির্যাস।

কারো মতে– Culture is to know the best that has been thought and said in the world. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে উত্তমকে জানা, যা পৃথিবীতে বলা ও ভাবা হয়েছে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝে সম্পর্ক : ধর্ম সাধারণ লোকের সংস্কৃতি, আর সংস্কৃতি শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। সংস্কৃতি থেকে মানুষের মধ্যে উন্নততর জীবন-চেতনা, সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ ধর্মের মাধ্যমে এগুলো পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করা এক কথা। উভয়টি এক না হলেও একটির মাঝে অন্যটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা সংস্কৃতির মাধ্যমেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্ম মানুষকে সৃষ্টিকর্তার ভীতিপ্রদর্শনের মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করে। আর সংস্কৃতি জীবনদর্শনের মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা থেকে বিরত রাখে।

ধর্ম বাইরের নিয়মনীতি প্রয়োগে মানুষকে পরিচালিত করতে চায় বলে ধার্মিকগণ আল্লাহকে জীবন প্রেরণারূপে না পেয়ে ঠোঁটের বুলিরূপে পায়। আর সংস্কৃতি ব্যক্তির মাঝে সূক্ষ্ম চেতনা জাগ্রত করে তার ভেতর একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করে।

ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে– জীবনকে বিকশিত করতে নয়। অপরদিকে সংস্কৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পাপ-পতন থেকে রক্ষা নয়। ধর্ম ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী আর ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবনধারণের নাম সংস্কৃতি।

ধর্মে মুক্তচিন্তা বা স্বাধীনতার সুযোগ নেই, কিন্তু সংস্কৃতি মানুষকে সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যুক্ত করে মুক্তচর্চা ও চিন্তার সুযোগ দেয়। সংস্কৃতি ব্যক্তির ভেতরের আমিত্বকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং ব্যক্তিতান্ত্রিকতার ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করে। সুতরাং বলা যায়, সংস্কৃতির সাথে ধর্মের সম্পর্কটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিই উভয়ের স্রষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক।

প্রগতি ও সংস্কৃতি : প্রগতি ও সংস্কৃতির মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির ফসল হলো প্রগতি। কেননা, যে সমাজে সংস্কৃতির চর্চা নেই সে সমাজে প্রগতির দ্বার রুদ্ধ। সংস্কৃতিকে লালনের মাধ্যমেই প্রগতি বিকশিত হয়। সংস্কারমুক্তি প্রগতির পূর্বশর্ত। অন্যদিকে সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির অনিবার্য শর্ত না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। সাধারণ মানুষ সংস্কৃতি ও প্রগতির মাঝে কোনো পার্থক্য না করলেও সংস্কৃতিমান ব্যক্তি উভয়টিকে ভিন্ন চোখে দেখেন। প্রগতি হলো তাদের নিকট জ্ঞানের আর সভ্যতা হলো সৌন্দর্যের ব্যাপার। জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই সংস্কৃতিমান ব্যক্তিরা প্রগতি মনে করে। তবে সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করেই প্রগতি নিজেকে বিকশিত করে। ফলে দেখা যাচ্ছে, উভয়ের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি : সভ্যতা শুধু প্রগতি নয়, আরো কিছু। প্রগতির সাথে সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্পর্ক না হলে সভ্যতা হয় না। সভ্যতা Values তথা মূল্যবোধের ব্যাপার। আর সংস্কৃতি Values-এর ধারণাই দেয়। তাই সভ্যতার সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক অত্যন্ত বেশি। যে সমাজে সংস্কৃতির চর্চা নেই সে সমাজ সভ্য নয়, সে সমাজে কোনোদিন সভ্যতা গড়ে ওঠে না। কারণ সংস্কৃতিচর্চা ব্যতীত সভ্যতা হয় না।

সংস্কৃতির স্বরূপ : প্রাবন্ধিকের মতে, সংস্কৃতি সমাজতান্ত্রিক নয়; ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো– এটাই সংস্কৃতির আদেশ। ব্যক্তির পরিবর্তন হলে সমাজেরও পরিবর্তন হয়। তাই আগে ব্যক্তি তারপর সমাজ। তবে তাই বলে ব্যক্তিকে সমাজবহির্ভূত বলা যায় না। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে তুলনা করা যায় নদীর সাথে আর সমাজকে সমুদ্রের সাথে। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পূর্ণতা পায়, তেমনি ব্যক্তিও সমাজের মধ্যে আপন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়, সমাজের মানুষকে সে আপন করে নেয়। তাই সংস্কৃতিমান ব্যক্তি প্রয়োজনে সমাজের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে। সংস্কৃতি ব্যক্তিসত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মাধ্যমে সমাজের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গড়ে তোলে।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : প্রাবন্ধিকের মতে, ধর্ম, প্রগতি ও সভ্যতার সমন্বয়ই সংস্কৃতি। এর কোনো একটিকে বাদ দিলে সংস্কৃতি আর টিকে থাকতে পারবে না, পঙ্গু হয়ে যাবে। সংস্কৃতি মানে পরিপক্ব হওয়ার সাধনা। সে কারণে জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রেম, প্রগতি ও সভ্যতার সবটারই সমান প্রয়োজন। প্রাবন্ধিক বলেন, সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে ও মহৎভাবে বাঁচা। ধর্মচর্চার মাধ্যমে, কাব্য পাঠের মাধ্যমে, বিচিত্র দেশ জাতির সাহচর্যের মাধ্যমে, মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণ করে তোলার নাম সংস্কৃতি।

উপসংহার : ধর্ম, প্রগতি ও সভ্যতা সংস্কৃতির শাখা। সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে মানুষ সভ্যতা ও প্রগতির দিকে এগিয়ে যায়। ধর্মের অন্ধত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতির পথ ধরে সভ্যতা গড়ে তোলাই সংস্কৃতির কাজ। জীবনের মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং জীবনকে সমৃদ্ধ করাই সংস্কৃতিচর্চার উদ্দেশ্য। মার্জিত, শিক্ষিত ও রুচিবান মানুষের জীবনের অলঙ্কার হলো সংস্কৃতি।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৫ ॥ ধার্মিক আর কালচার্ড মানুষের মাঝে পার্থক্য কী কী? সংস্কৃতির সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক কী? 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে এসব প্রশ্নের উত্তর দাও।

অথবা, 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধের আলোকে সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক নিরূপণ কর এবং কালচার্ড ও ধার্মিক মানুষের মাঝে পার্থক্য আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুক্তিবাদী, বিশ্লেষণধর্মী, মননশীল লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একটি অসাধারণ রচনা। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষই ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক। আত্মার প্রশান্তি ও জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন ধর্ম ও সংস্কৃতি। 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে লেখক ধার্মিক ও সংস্কৃতিমান লোকের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এবং সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক তুলে ধরেছেন।

ধর্ম ও কালচার : ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Religion. Oxford Dictionary-তে এর অর্থ বলা হয়েছে– The belief in the existence of a God. অন্যদিকে সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture. Oxford Dictionary-তে এর অর্থ বলা হয়েছে– The custom and beliefs, art, way of life.

ধর্ম মানে জীবনব্যবস্থা, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবিধানের মাধ্যমে স্রষ্টার আরাধনা করা। আর সংস্কৃতি মানে কৃষ্টি, উৎকর্ষ ইত্যাদি। লেখকের মতে, ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার। আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। মূলত ধর্ম ও কালচার বিপরীতমুখী দুটি সত্তা। একটির উদ্দেশ্য নীতিবোধ শিক্ষা দেওয়া, অপরটির উদ্দেশ্য গণ্ডিমুক্ত হয়ে আত্মমুক্তির কৌশল নির্ণয় করা। ধর্মকে আশ্রয় করে সাধারণ মানুষ সংস্কৃতির পথে এগিয়ে যায়। অপরদিকে শিক্ষিত মার্জিত লোকের কালচারই ধর্ম। ধর্ম একটি আত্মবিশ্বাস, আর

কালচার হলো জীবনের মূল্যবোধ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হওয়া। ধর্ম ও কালচার পরস্পর ভিন্ন হলেও এরা পরস্পরের পরিপূরক। কেননা ধর্মের লক্ষ্য যেমন মানবকল্যাণ, তেমনি কালচারের লক্ষ্যও আত্মবিকাশের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধন।

ধার্মিক ও কালচার্ড মানুষের মাঝে পার্থক্য : যিনি ধর্মের অনুশাসন দ্বারা নিজের জীবনকে পরিচালিত করেন তিনি ধার্মিক। আর যিনি কালচার বা সংস্কৃতিকে নিজের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি কালচার্ড বা সংস্কৃতিমান। 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে ধার্মিক ও কালচার্ড ব্যক্তির মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। নিচে তা উপস্থাপন করা হলো–

১. ধার্মিকগণ ধর্মের মাধ্যমেই নিজেদের সংস্কৃতির অনুসন্ধান করেন এবং এর মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করেন। ধর্ম তাদের জীবনব্যবস্থার চালক হয়ে দাঁড়ায়। আর কালচার্ড বা সংস্কৃতিমানগণ সংস্কৃতিকেই নিজেদের ধর্মরূপে গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন। তারা অন্তরের সূক্ষ্ম চেতনাকে জীবন চালনার চালকরূপে গ্রহণ করেন।

২. ধার্মিকগণ বাইরের নীতিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন বলে তারা আল্লাহকে জীবন প্রেরণারূপে না পেয়ে ঠোঁটের বুলিরূপে পান। আর কালচার্ডগণ ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন বিধায় নিজেদের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে চালিত হন।

৩. ধার্মিকগণ আল্লাহকে স্মরণ করে ইহলোকে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন আর পরকালে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া কিংবা স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে। ইহ ও পরকালে সর্বত্রই তাদের একটা লোভ কাজ করে। অপরদিকে কালচার্ড লোকেরা কোনো ভয় অথবা লোভের বশবর্তী না হয়ে তাদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করে যাবতীয় অন্যায় থেকে বিরত থাকে। তাই তারা সকল অন্যায় ও নিষ্ঠুরতা এমনকি ন্যায়-নিষ্ঠুরতাকেও ঘৃণা করে। দূরের স্বর্গ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অন্তরে পবিত্র অনুভূতি তথা প্রেম সৃষ্টি করে তারা মনের মাঝেই স্বর্গ রচনা করে।

৪. ধার্মিক লোকেরা চিন্তা-ভাবনা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে ধর্মের অনুগামী বিধায় ধর্মের মাঝেই তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করে দেয়। কিন্তু কালচার্ড লোকেরা নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনার বিকাশের মাধ্যমে নিজেকে বিশেষভাবে অনন্য করে, সুন্দর করে গড়ে তোলে। তাই কালচার্ড মানুষ স্বতন্ত্র সত্তা, আলাদা মানুষ।

৫. ধার্মিকগণ মতবাদীদের ন্যায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের ওপর স্টীমরোলার চালাতে ভালোবাসে, কিন্তু কালচার্ড লোকেরা উদার, মুক্তচর্চা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা বিকাশে সহায়ক হয়ে থাকে।

৬. ভয় আর পুরস্কারের লোভ ধার্মিক লোকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে; কিন্তু সংস্কৃতিমান লোকের জীবনে ওসবের বালাই নেই। তারা সবকিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। ধার্মিকের পুরস্কার যেখানে বহুদূরে থাকে, সেখানে সংস্কৃতিমান তার পুরস্কার কাজের সাথে সাথে পেয়ে যায়। কেননা কাজটি সে তার ভালোবাসা থেকে করে বলে সেটা করেই সে আনন্দ লাভ করে। তাই সে ধার্মিকের মতো পরকালীন পুরস্কারের আশায় তাকিয়ে থাকে না।

৭. ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মের যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেকে পাপ-পঙ্কিলতা এবং পতন থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকে– মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে নয়। জীবনের গোলাপ

ফোটানোর দিকে তাদের নজর নেই। অন্যদিকে সংস্কৃতিমান লোকেরা পাপ-পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা নয়; বরং তারা মনুষ্যত্বের বিকাশকেই বড় করে দেখে।

৮. ধার্মিকগণ মনুষ্যত্বের বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে তারা ইন্দ্রিয় সাধনায় ভয় পায়। তাই নব নব সৃষ্টি, প্রগতি ও সভ্যতার ধারক হতে তাদের পিছুটান অনেক বেশি। তারা ইন্দ্রিয়নিচয়ের জাগরণের মাধ্যমে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি না করে শুধু ঈশ্বরের নামই জপ করে। অপরদিকে সংস্কৃতিমান লোকেরা ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনায় রত থাকে। তারা চোখ-কান থাকতে কানা ও কালা হতে চান না; বরং এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আল্লাহর ঐশ্বর্য উপলব্ধি করেন।

৯. ধার্মিক ব্যক্তি ধর্মীয় বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে রক্ষণশীল, অনুদার, অসহিষ্ণু, মুক্তচর্চা ও সংস্কারবিরোধী হয়ে থাকেন; কিন্তু সংস্কৃতিমান লোক এক্ষেত্রে উদার, প্রেমবান, সহিষ্ণু, সংস্কারক ও মুক্তচর্চার ধারক হয়ে থাকেন।

১০. ধার্মিক ব্যক্তি ও সংস্কৃতিমানের মধ্যে অন্য একটি পার্থক্য হলো, ধার্মিকের চেয়ে সংস্কৃতিমান মানুষের বন্ধন অনেক বেশি। ধার্মিকের থাকে কয়েকটি মোটা বন্ধন, আর সংস্কৃতিমানের বন্ধনের কোনো অন্ত নেই। অসংখ্য সূক্ষ্ম চিন্তার বাঁধনে সে আবদ্ধ থাকে।

১১. সংস্কৃতিমান লোক ফ্রি থিংকার অর্থাৎ মুক্ত চিন্তার অধিকারী হয়ে থাকেন। তারা কখনো মতবাদী হতে চান না এবং মতবাদকে তারা যমের মতো ভয় পান, কিন্তু ধার্মিকগণ মতবাদীদের ন্যায় ধর্মীয় গ্রন্থের সহায়তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছন্ন করেন।

১২. ধার্মিক হওয়ার পথ বা পন্থা একটিই, কিন্তু সংস্কৃতিমান হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই। বিচিত্র পথে তারা ধাবিত হন। তাই বলা যায়, যত সংস্কৃতিমান মানুষ, সংস্কৃতির তত পন্থা।

সংস্কৃতির সাথে মূল্যবোধের সম্পর্ক : প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেন, সংস্কৃতি মানে জীবনের Values তথা মূল্যবোধ সম্বন্ধে ধারণা। জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞান জন্মালেই সংস্কৃতি আত্মমুক্তি পায়। জীবনকে বড় করে না দেখে মতবাদকে বড় করে দেখলে মূল্যবোধ ধ্বংস হতে বাধ্য। ধর্ম, আদর্শ ইত্যাদি মানুষের মধ্যে একটি সহজ সেতু নির্মাণ করে, যা তার দলের লোক এবং মতবাদ সম্পর্কে তাকে অন্ধ করে তোলে। নিজের দলের বা মতবাদের লোক হলেই ভালো কিন্তু অপর দলের বা মতবাদের লোক মন্দ– এ ধারণা মূল্যবোধকে সংকুচিত করে। সংস্কৃতির ধর্ম হলো মানুষকে তার কর্ম-বিচারে মূল্যায়ন করা, দল বা আদর্শ বিচারে নয়।

সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির অন্যতম শর্ত। তবে শুধু সংস্কারমুক্ত হলেই সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না। সংস্কৃতিমান হওয়ার অনিবার্য শর্ত হলো মূল্যবোধ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা। সংস্কারমুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মূল্যবোধের সাথেই সংস্কৃতির সম্পর্ক বেশি নিবিড়। মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির চেয়ে কুসংস্কারও ভালো।

উপসংহার : সংস্কৃতিমান ও ধার্মিক লোকের মাঝে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ধার্মিক যেখানে অন্ধ বিশ্বাস, সংকীর্ণ মনোভাবে প্রগতি ও সভ্যতার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে হত্যা করে; সেখানে কালচার্ড ব্যক্তি মুক্তচর্চা, উদার মনোভাব, বর্জন নয় বরং অর্জনের মাধ্যমে বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়ে প্রগতি ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিজেকে মহৎ করে, সুন্দর করে, অনন্য করে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করে বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচতে চায়।

প্রশ্ন : ৩৬ ॥ 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে নারীকে কালচারের বা সংস্কৃতির কেন্দ্র বলা হয়েছে কেন? আলোচনা কর।

অথবা, মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসরণে নারীর প্রতি সংস্কৃতি ও ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে বিভিন্ন যুক্তি, চিন্তা ও উপমার মাধ্যমে নারীকে সংস্কৃতির কেন্দ্র বলে উপস্থাপন করেছেন এবং নারীর প্রতি ধর্ম ও সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। বিশ্বখ্যাত ইংরেজ কবি শেলী বলেছেন, "জয় করে নাও নারী যদি পারো, ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সে-ই সবচেয়ে আনন্দের সামগ্রী, স্বর্গের শ্রেষ্ঠ উপহার। উন্নতিতে পুরুষের উল্লাস ও গর্ব। ক্লেশে তার অবলম্বন ও স্বাচ্ছন্দ্য।"

নারী ও সংস্কৃতি : সমাজ ও সংস্কৃতি এগিয়ে চলার পেছনে সেই আদিমকাল থেকেই নারী অবদান রেখে চলেছে। সভ্যতা বিনির্মাণে প্রগতির প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর কোমল হাতের স্পর্শ ছড়িয়ে আছে। তাই প্রাবন্ধিক নারীকে সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং সর্বপ্রকারের সমৃদ্ধির মূল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সংস্কৃতির কেন্দ্র নারী : ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে সংস্কৃতি মানুষকে পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত করতে চায়। তাই সংস্কৃতি-সাধনা মানেই ইন্দ্রিয়ের সাধনা। ইন্দ্রিয়ের সাধনা করে বলে নারী সংস্কৃতির কেন্দ্র। ইন্দ্রিয়ের জাগরণ, শিহরণ ও নিয়ন্ত্রণের মূলেও নারী। ইন্দ্রিয়ের জাগরণের ওপর মানুষের মন ও আত্মার বিকাশ নির্ভরশীল। আর মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশই কালচার বা সংস্কৃতির মূল উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতির উপাদান : শিল্প, সাহিত্য ও সংগীত সংস্কৃতির উদ্দেশ্য নয়, উপায় বা বাহন। আর নারীর চোখ-মুখ, স্নেহ-প্রীতি ও সৌন্দর্য নিয়েই শিল্প-সাহিত্যের কারবার। কবি নজরুল ইসলামের মতে, নারীই শিল্পীর ও শিল্পকর্মের প্রেরণা। নারীর চোখ-মুখ, সৌন্দর্য-হাসি, প্রেম-প্রীতিই যুগে যুগে শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম দেয়। তাই নারী শিল্প, সাহিত্য তথা সংস্কৃতির বাহন, উপাদান ও উপকরণ। এ সম্পর্কে বিখ্যাত ইংরেজ কবি শেকসপিয়র বলেছেন, "নারী হচ্ছে গ্রন্থ, শিল্প এবং একাডেমি– সমগ্র পৃথিবী যা ধারণ ও লালন-পালন করে।" সংস্কৃতিচর্চায় নারী মমতাময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দ ও সৌন্দর্যের প্রতিমারূপে দেখা দিয়েছে সংস্কৃতিমানের নিকট।

উন্নতি-সমৃদ্ধির মূল : নারী হচ্ছে জীবনের উন্নতি-সমৃদ্ধির পথে চালকস্বরূপ। জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা আসে নারী থেকেই। এ সম্পর্কে কবি বলেছেন, "আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যদি না পাই তপস্বিনী।" জীবনে তপস্যা করতে হলে নারীকে ঘিরেই করতে হয়। সেজন্য সংস্কৃতিমান হতে গেলে নারীই একান্ত কাম্য। জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে নারীকে উপায় বা অবলম্বন করতে হয়। নারীকে বাদ দেওয়ার অর্থই হচ্ছে উন্নতি তথা সংস্কৃতিকে বাদ দেওয়া। সমাজ-সংসার, ব্যক্তিমানস এবং সব উন্নতি ও সমৃদ্ধির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী। যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনিই পুরুষের উৎসাহ-উদ্দীপনার শ্রেষ্ঠ পাথেয়।

নারীকে পর করা মানে সংস্কৃতিকেও দূরে ঠেলে দেওয়া : লেখকের মতে, সংস্কৃতির অলঙ্কার হলো নারী। নারী সৃষ্টির প্রেরণা, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। জীবনের বোধকলি নারীর পরশেই ফোটে। তাই সংস্কৃতিমানরা জীবনের বিকাশে ও সংস্কৃতিচর্চায় নারীকে প্রেরণা, প্রেম ও আনন্দের সামগ্রী মনে করে; কিন্তু বৈরাগীরা নারীকে উপেক্ষা করে বরং সংস্কৃতিকেই অবজ্ঞা করে। কেননা নারীকে উপেক্ষা করা তথা পর করা মানেই সংস্কৃতিকে পর করা। তাই তাদের জীবনে বৃদ্ধি নেই, সমৃদ্ধি নেই, মানসিকতার বিকাশ নেই; তারা

নিঃস্ব, নববুদ্ধি ও প্রীতির স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত। যেমন প্রাবন্ধিক বলেন, "যে জাতি নারীকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা রাখতে চায়, সে জাতি জীবনে মৃত্যুর আরাধনা করে– ইতিহাসের পাতায় সে মরা-জাতির পৃষ্ঠায় নাম লেখায়। তার জীবনে আত্মনির্যাতন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। আর আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই বলে সংস্কৃতিও নেই। কেননা সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ– নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।"

ধর্ম ও নারী : 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী নারী সম্পর্কে ধর্মের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তার মতে, ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত রয়েছে। কোনো কোনো ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের নজরে, আর কোনো কোনো ধর্ম ততটা না গেলেও সংগীত নৃত্যের মারফত নারীকে ঘিরে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েছে তাতে জানিয়েছে ঘোর আপত্তি। সংগীত, নৃত্য ইত্যাদি তাদের কাছে কামেরই আয়োজন, কামের উন্নয়ন নয়। তাই ধর্মের ক্ষেত্রে নারী সূক্ষ্ম উপভোগের সহায় না হয়ে স্থূল ভোগের বস্তু হয়ে আছে। ধর্ম মানুষকে নারী থেকে দূরে থাকতে বলে, কারণ ধর্ম তাকে পাপ ও পদস্খলন থেকে মুক্ত রাখতে চায়। যৌন ব্যাপারে ধর্মের কড়া বাধা বা শাসনের ফলে সেদিকেই মানুষের আকর্ষণ আরো তীব্র হয়ে গেছে। যৌন সম্ভোগ অতিক্রম করে নারীর যে অপরূপ সত্তা আছে– ধর্ম তার নাগাল পেতে দেয় না। ধর্ম প্রেমের মাধ্যমে কাম নিয়ন্ত্রণের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে, নারীর জীবনকে বিভিন্ন বিধিবিধানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে তার বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে তুলেছে। নারীকে ঘিরে হৃদয়তন্ত্রীতে সূক্ষ্ম যে চৈতন্যের উন্মেষ ঘটে, ধর্ম তার স্বাদ থেকে ধার্মিককে বিরত রাখে।

নারীর ব্যাপারে ধর্মের এ দৃষ্টিভঙ্গি হিতে বিপরীত হয়ে দাঁড়ায়। কারণ নিষিদ্ধ বস্তু সাধারণত ভীতি ও অতিরিক্ত আকর্ষণ– এ দুই মনোবৃত্তির সংঘর্ষ বাধিয়ে জীবনের বিকৃতি ঘটায়। তাই প্রাবন্ধিক বলেন, "যৌন ব্যাপার মন্দ, একথা না বলে যদি বলা হতো : প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, তাহলে পৃথিবীর চেহারা হয়তো এতটা কদর্য হতো না।"

উপসংহার : ইন্দ্রিয় জাগরণ, সুর আর সৌন্দর্যের উৎস হিসেবে শিল্প, সাহিত্য, সংগীতের উপাদানরূপে ব্যক্তির সাংসারিক ও মানসিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধির মূল হিসেবে নারী সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু এবং উন্নয়ন ও সুন্দরের চাবিকাঠি হতে পারে। তাই নারীকে ভালোবাসার প্রতীক ও উৎসরূপে গ্রহণ করে তাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সুকুমারবৃত্তির উন্মেষ ঘটালে মানুষ যথার্থ সংস্কৃতিমান হয়ে উঠতে সক্ষম হয়।

►► প্রশ্ন : ৩৭ ॥ "সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারণা"– মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে উপরিউক্ত মন্তব্যটি বিচার কর।

অথবা, সংস্কৃতির সাথে জীবনের মূল্যবোধের সম্পর্ক কী? কীভাবে মতবাদ বা আদর্শ মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দিতে পারে? 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : প্রগতিশীল এবং মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় সংস্কৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি হলো জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা। জীবনেরই অপর নাম সংস্কৃতি। তাই যেখানে সংস্কৃতি যত উন্নত সেখানে জীবন তত উন্নত। আর মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি হয় না। অন্যদিকে মতবাদ বা আদর্শ মূল্যবোধকে ধ্বংস করে।

সংস্কৃতির সংজ্ঞা : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture. Oxford Dictionary-তে culture বলতে বোঝানো হয়েছে– The customs and beliefs, art, way of life.

সংস্কৃতি মানে কৃষ্টি, উৎকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদি। পরিভাষায়, সংস্কৃতি হলো সভ্যতার নির্যাস। কারো মতে– Culture is to know the best that has been thought and said in the world. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে উত্তমকে জানা, যা এ পৃথিবীতে বলা ও ভাবা হয়েছে।

কারো মতে– Culture is a complete picture of life. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

সংস্কৃতির উদ্দেশ্য : সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজেকে অর্থাৎ আমিত্বকে পুনর্জন্ম দেওয়া। লেখকের ভাষায়, নিজের ভেতর একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা। যিনি তা করতে পারেন তিনিই প্রকৃত কালচার্ড বা সংস্কৃতিমান। যারা বাইরের ধর্ম গ্রহণ করে তারা আল্লাহকে জীবন প্রেরণারূপে না পেয়ে ঠোঁটের বুলিরূপে পায়। সৌন্দর্যের জন্য, মানবকল্যাণের জন্য, আত্মবিকাশের জন্য মানুষকে সংস্কৃতিমান হতে হবে। এটা সংস্কৃতির উদ্দেশ্য।

সংস্কৃতির স্বরূপ : অমৃত কামনা তথা আত্মাকে কামনা, সৌন্দর্য কামনা, উচ্চতর জীবন কামনা, এগুলোই সংস্কৃতি। জীবনকে অবলম্বন করেই সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার। জীবনের বাইরে তার কোনো কর্মক্ষেত্র নেই। এর মুখ্য বিষয় মূল্যবোধ। নীতি নয় প্রীতি। তাই অন্তরের মহিমাই এক্ষেত্রে বড়। সংস্কৃতি মানুষকে পূর্ণতা দান করে এবং তার বিবেক জাগ্রত করে অন্তরে বিশ্বপ্রেমের শিখা জ্বালিয়ে দেয়। অনেকে সংস্কারমুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে, কিন্তু তা ঠিক নয়। সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির অনিবার্য শর্ত নয়, অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। যে সংস্কৃতিতে মূল্যবোধ নেই তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা কুসংস্কারের চেয়েও খারাপ।

সংস্কৃতির শিক্ষা : সংস্কৃতি অহমিকা, কূপমণ্ডূকতা, সংকীর্ণতা পরিহার করে সব দেশের সব কালের মানুষের সাথে আত্মীয়তা করার শিক্ষা দেয়। অন্যায় নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে, আনন্দ-প্রেম সৃষ্টি করে, সত্য-সুন্দরকে ভালোবেসে মানুষকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা শিক্ষা দেয়। নিজের ভেতরে স্বর্গ তৈরি করে অপরের সাথে ভোগ ও ভাগ করে চলতে শেখায়। ধর্মীয় শৃঙ্খল দূরে ঠেলে সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের কল্যাণে প্রাণপাত করতে শেখায়। কেবল একটি সুর নয়, বিচিত্র সুর, একটি আদর্শ নয় বৈচিত্র্যের মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করতে এবং প্রেম, সৌন্দর্য ও উচ্চতর জীবন কামনা করতে শেখায়।

সংস্কৃতি ও জীবনের মূল্যবোধ : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। বিবেক-বুদ্ধির পাশাপাশি তার মাঝে লুক্কায়িত আছে সৃষ্টি। ধ্বংস, মননশীলতা, চেতনা ও বিকাশের অনন্য ক্ষমতা। স্বীয় সত্তাকে যথার্থ মূল্যায়ন ও জীবন পরিপূর্ণ করে তোলা মানুষেরই কাজ। জীবন পরিপূর্ণ করে তুলতে হলে অন্তরের মধ্যে মূল্যবোধ জাগ্রত থাকতে হবে। কেননা, মূল্যবোধহীন জীবন তো জীবন হতে পারে না, তা অর্থহীন জীবন। লোভ, লালসা, জিঘাংসা, শঠতা এগুলো মূল্যবোধহীনতার ফসল।

প্রাবন্ধিকের মন্তব্যের মূল্যায়ন : প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "সংস্কৃতি মানে জীবনের Values সম্বন্ধে ধারণা।" তাঁর এ বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। জীবনের বাইরে সংস্কৃতির কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সংস্কৃতিমান হতে হলে জীবনকে জানতে হবে। অন্তরের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করতে হবে। নিজের স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে হবে। নিজের আত্মাকে প্রেম-পুণ্যে পরিপূর্ণ করে তোলাই সংস্কৃতিমান মানুষের কাজ। আর সংস্কৃতি মানুষের আত্মার ক্ষুধা নিবারণের প্রধান উপকরণ। নিজেকে উন্নত করতে হলে সংস্কৃতিচর্চায় রত থাকতে হবে। জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে সংস্কৃতিমান হতে হবে। সুতরাং বলা যায়, সংস্কৃতি মানে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা।

মতবাদ বা আদর্শ দ্বারা মূল্যবোধ ধ্বংসের স্বরূপ : মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধে মতবাদ বা আদর্শের মাধ্যমে কীভাবে মূল্যবোধ ধ্বংস হয় তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে তুলে ধরেছেন। তার মতে, "ধর্মের মতো মতবাদ বা আদর্শও মূল্যবোধ ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার।" অতীতে ধর্ম ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করেছিল, আজ মতবাদ বা আদর্শ মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে। মতবাদীরা নিজের মতবাদ বা আদর্শ জোর করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ধ্বংস করে। ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভার বিকাশকে তারা নিজস্ব মতবাদ চাপিয়ে রুদ্ধ করে। তারা নিজস্ব মতবাদের বুলি আওড়ানোর দীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির চিন্তা-চেতনাকে নিঃশেষ করে। মতবাদীরা তাই ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ ও দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী। অধিকন্তু, এরা ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর।

উপসংহার : সত্য, সুন্দর, প্রেম ও ভালোবাসার মাধ্যমে জ্ঞান ও কল্যাণের পথে আত্মবিস্মৃতির নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি এমন এক ধারণা যা মানুষকে আত্মসচেতন করে। ভালো-মন্দ সম্পর্কে সজাগ করে এবং পরিণামে মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে এক অখণ্ড ও স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করে। মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতিমান হওয়া কখনো সম্ভব নয়। মতবাদ বা আদর্শ মানুষের মূল্যবোধের বিকাশ রুদ্ধ করে দেয় এবং একটা সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখে। সংস্কৃতিমানকে তাই মূল্যবোধ ধ্বংসকারী মতবাদ ও আদর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৮ ॥ "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ-নীরে স্নাত না হলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না।" – মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে মন্তব্যটি বিচার কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : প্রগতিশীল এবং মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধটি তাঁর এক অসাধারণ সৃষ্টি। এ প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ভাষায় সংস্কৃতির বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে, "সংস্কৃতি হলো জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সম্যক ধারণা।" তিনি আরো বলেছেন, "সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থ-নীরে স্নাত না হলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না।" নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

সংস্কৃতির সংজ্ঞা : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ culture. Oxford Dictionary-তে culture বলতে বোঝানো হয়েছে– The customs and beliefs, art, way of life. সংস্কৃতি মানে কৃষ্টি, উৎকর্ষ, চিৎপ্রকর্ষ ইত্যাদি। পরিভাষায়, সংস্কৃতি হলো সভ্যতার নির্যাস।

কারো মতে– Culture is to know the best that has been thought and said in the world.

কারো মতে– Culture is a complete picture of life. অর্থাৎ, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র।

সংস্কৃতির উদ্দেশ্য : সংস্কৃতির উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজেকে অর্থাৎ 'আমিত্ব'-কে পুনর্জন্ম দেওয়া। লেখকের ভাষায়, নিজের ভেতর একজন ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা, অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলি সৃষ্টি করা। কুসংস্কার ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা। প্রেম-পুণ্যে, ভালোবাসায়, উদারতায় নিজেকে মহান করা, শ্রেষ্ঠ করা। নিজের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার বিকাশ সাধন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের নবজন্মদানের মাধ্যমে নিজেকে পরিপক্ব করা।

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য : সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এতে মূল্যবোধ রয়েছে। মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না। সংস্কৃতিতে অন্তরের মহিমাই বড়। দয়া-মায়া-

স্নেহ তথা মহত্ত্বই পূজ্য। আপনার মধ্যে বিশ্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অমৃতের সন্ধানই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষের জীবনে কেবল একটি সুরই সৃষ্টি করে না। বিচিত্র সুরের সংমিশ্রণে জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। কারণ জীবনবীণা একতারা নয়, বহু তারের সমন্বিত রূপ। একটি আদর্শের আলোকে জীবনের সব দেখা যায় না; দেখলে জীবন একপেশে হয়। তাই সংস্কৃতি বৈচিত্র্যের কথা বলে, জীবনবোধের কথা বলে।

সংস্কৃতির শিক্ষা : সংস্কৃতি অহমিকা, কূপমণ্ডূকতা, সংকীর্ণতা পরিহার করে সব দেশের সব কালের লোকের সাথে আত্মীয়তা করার শিক্ষা দেয়। মানুষে মানুষে মিলন, প্রেম-প্রীতির শিক্ষা দেয়, অন্যায় নিষ্ঠুরতা ত্যাগ করে আনন্দ-প্রেম সৃষ্টি, সত্য ও সুন্দরকে ভালোবেসে সুন্দরভাবে বাঁচার নীতিই নয় শুধু; বরং প্রীতিরও শিক্ষা দেয়। সংস্কৃতি মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসতে শেখায়, নিজের ভেতরে স্বর্গ সৃষ্টি করে অপরের সাথে ভোগ ও ভাগ করে চলতে শেখায়। সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের কল্যাণে প্রাণপাত করতে শেখায়; নিজেকে বিশ্বের পানে মেলে ধরে তৃপ্ত হতে শেখায়। কেবল একটি সুর নয় বিচিত্র সুর; একটি বিশেষ আদর্শ নয় বরং বৈচিত্র্যের মাধ্যমে জীবনকে গড়ে তুলতে শেখায়। অমৃত কামনা তথা প্রেম, সৌন্দর্য ও উচ্চতর জীবন কামনা করতে শেখায়।

সংস্কৃতিমান হওয়ার উপায়/পন্থা : প্রবন্ধকারের মতে, "সংস্কৃতিমান হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা পথ নেই, এ বিচিত্র পথ।" এর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি নেই। একেক জন একেক উপায়ে সংস্কৃতিমান হতে পারে। বলা যায়, যত সংস্কৃতিমান তত পথ। সংস্কৃতিমান হওয়ার বিচিত্র পথ সহজে দেখা যায় না। সাধনা, উদারতা আর মহত্ত্ব দ্বারা এ পথ খুঁজে নিতে হয়।

সংস্কৃতিমান হতে হলে মূল্যবোধ আঁকড়ে ধরে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ এবং সভ্যতা ও প্রগতির সাথে সংস্কৃতির প্রেম আর সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে হবে। সবার সাথে আদান-প্রদানে, ভাবে-ভালোবাসায় ধন্য হওয়াই সংস্কৃতিমান হওয়া। সংস্কৃতি সাধনা ঋদ্ধ হওয়ার সাধনা। সেজন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি প্রয়োজন প্রেম-প্রীতির। সংস্কৃতিমান হওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রেমবান হওয়া। সবার প্রেমে সবার স্পর্শে যে পবিত্র হয়, স্নাত হয়, সে-ই তো সংস্কৃতিমান। তাই বলা যায়, সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সবার পরশে পবিত্র হয়ে, সবার চিন্তা-জ্ঞান, ধ্যান-মননে স্নাত হয়েই একজন মানুষ সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতিমান মানুষের স্বাতন্ত্র্য : সংস্কৃতিমান মানুষের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী বলে তার মধ্যে আমিত্ব ফুটে ওঠে। সংস্কৃতিমান মানুষ গোঁড়ামি ও উগ্রতামুক্ত, উদার, আত্মসচেতন ও মহত্ত্বের অধিকারী। মুক্তমনে তিনি সংস্কৃতি সাধনা করেন। অন্ধ আবেগ দিয়ে, হিংসা-বিদ্বেষ দিয়ে তার জীবন চলে না। সংস্কৃতি সাধনা করতে হলে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের অনুশীলন করতে হয়। আর এভাবে সংস্কৃতিমান মানুষ চিন্তা-চেতনায়, কথায় ও কাজকর্মে অন্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে ওঠে।

সংস্কৃতিমানদের প্রত্যাশা : সংস্কৃতিমানদের গভীর প্রত্যাশা হলো অমৃত লাভ করা। প্রাবন্ধিক সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে– "সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা– এরি নাম সংস্কৃতি।" তাই বলা যায়, সংস্কৃতি অত্যন্ত উঁচুস্তরের বিষয়।

উপসংহার : সংস্কৃতি মানে উন্নত জীবন-চেতনা, আনন্দ, সৌন্দর্য ও প্রেম সম্বন্ধে উন্নত ধারণা। সবাইকে বর্জন নয়; বরং সবার কাছ থেকে অর্জনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও প্রগতির সংস্পর্শে সংকীর্ণতা ও স্থবিরতা দূরে ঠেলে ঐশ্বর্যময় প্রেমের তরিতে বিচিত্র জীবনধারা ছুঁয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ, বিকশিত ও সুন্দর করে গড়ে তোলাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। এজন্যই প্রাবন্ধিক বলেছেন, "সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থ-নীরে স্নাত না হলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না।"

রাজবন্দীর জবানবন্দী

কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯-১৯৭৬ খ্রি.]

▶▶ প্রশ্ন : ৩৯ ॥ কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের বিষয়বস্তু/ মূলভাব নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন। তবে শুধু কলম চালনাই শেষ নয়, তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি 'ধূমকেতু মামলা'য় অভিযুক্ত কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য যে লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছিলেন, তা-ই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তার আপসহীন অবস্থানের ঘোষণা ও ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে নিস্পেষিত ভারতবাসীর সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে।

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য : বিভিন্ন শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ধূমকেতু মামলা : তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ওপর অভিযোগ এনেছিল, তিনি 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক কবিতা প্রকাশ করেছেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কবি যখন কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি তখন আদালতে মামলার শুনানি চলছিল। আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি 'ধূমকেতু মামলা'র জবাবে যে বক্তব্যটি লিখিত আকারে পেশ করেছিলেন। তা-ই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী।'

রাজবন্দির ভাষ্য : প্রাবন্ধিক প্রবন্ধের শুরুতেই তার ওপর আনীত অভিযোগ ও বন্দিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চলছিল। তাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বললেই তা হতো রাজদ্রোহ। কবি নিজেই এ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে কবিতা লিখেছিলেন বলেই তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছিল। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘদিন তাকে কারা নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কিন্তু বিদ্রোহী কবি তাতে ভয় না পেয়ে প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন ও বিচারব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

রাজদণ্ড ও ন্যায়দণ্ড : ব্রিটিশদের হাতে ছিল রাজদণ্ড। তাদের বিচারক ছিল বেতনভোগী রাজকর্মচারী, কিন্তু কবি স্রষ্টার দূত। তার কণ্ঠে স্রষ্টার তথা স্বাধীনতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে, সে বাণী সত্যের প্রকাশিকা। নজরুলের পক্ষে ছিল সব রাজার রাজা, সব বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে যিনি সত্য সেই জাগ্রত স্রষ্টা। তার হাতে ন্যায়দণ্ড। তাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রাজা ও রাজদণ্ডকে ভয় পাননি। তিনি যে বিচারকের পানে চেয়ে আছেন তার দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন সবাই সমান। সে আইন বিশ্বমানবের সত্য উপলব্ধি থেকে সৃষ্টি। সে আইন সর্বজনীন সত্যের, সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার।

সত্য নির্ভয় : সত্য স্বয়ং প্রকাশমান। তা কোনো রক্তচক্ষু কোনো রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। কবির হাতে চিরন্তন সত্যের বীণা আর তিনি সত্যের বীণাবাদক। সে বীণায় চিরসত্য ধ্বনিত হয়। কবির বীণায় ধ্বনিত বাণী সব মিথ্যার বিরুদ্ধে, তাই সে বাণী সবার।

সে বাণী রাজবিচারে বিদ্রোহ হতে পারে; কিন্তু ন্যায়বিচারে ন্যায়দ্রোহী ও সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরাপদ, নিষ্কলুষ, অম্লান ও অনির্বাণ সত্যস্বরূপ। নির্বোধ শাসকগোষ্ঠী সে সত্যের বীণা হয়তো ভাঙতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা ভাঙার সাধ্য কার? যে ভাঙতে চায় সেও ঈশ্বরের ক্ষুদ্র সৃষ্টি মাত্র।

সত্য চিরন্তন : মানুষ মরণশীল, কিন্তু সত্য চিরন্তন। রাজা, রাজবিচারক ও আসামি সবাইকে মরতে হবে, কিন্তু সত্য অমর। কোনো কালে কোনো কারণে সত্যের মৃত্যু হয়নি। সত্যের বাণী চিরস্থায়ী। আজ যারা কবিকে রাজদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছে তারা অজ্ঞ নির্বোধ। কারণ তিনি স্রষ্টার নির্দেশেই সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সে সত্যের রক্ষক। আর সৃষ্টিকর্তার সত্য চির অমর। তা কেউ ধ্বংস করতে পারে না। কবি এ অমর সত্যেরই বীণাবাদক।

ব্রিটিশ শোষণ : এ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর এখানকার সবকিছুর ওপর তারা অন্যায় হস্তক্ষেপ চালিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসকদের নিপীড়নে ভারতবাসী নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তাই স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর পক্ষে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে মুক্তির বাণী স্রষ্টার বাণীরূপে ধ্বনিত হয়েছে।

পরাধীনতার জালে বন্দি ভারতবর্ষ : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিক। ব্রিটিশ শাসকরা জোরপূর্বক সত্যকে মিথ্যা, ন্যায়কে অন্যায় এবং দিনকে রাত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত। কিন্তু তাদের অন্যায়কে সত্য বলে তিনি কখনো মেনে নেননি। সত্যের পূজারি কবি পরাধীন ভারতে সত্যের তূর্যবাদকের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কোনো অপশক্তি তাকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি। কোনোকিছুর ভয় তাকে সত্য থেকে পিছপা করতে পারেনি।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : কবি সত্য ও ন্যায়ের প্রবক্তা। তিনি আজীবন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি কোনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। তারপরও রাজার বিচারে তিনি রাজদ্রোহী, তাই তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে কবি ভীত নন। সত্য ও ন্যায়ের জন্য বিদ্রোহ করা তিনি আবশ্যক মনে করেছেন। কোনো ভয়, লোভ, শাস্তি তাকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলতে বিচলিত করেনি। তিনি সর্বদা অন্যায়, অসত্য আর মিথ্যা পদদলিত করেছেন।

শোষণের অবসান অনিবার্য : কবির বিশ্বাস, ব্রিটিশরা যে অহংকারে গা ভাসিয়েছে তা একদিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হবেই। অহংকার একদিন চোখের পানিতে ডুববেই। কারণ, এ চোখের পানি নির্যাতিতের চোখের পানি। তাই শোষকের পতন অনিবার্য। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শাসকগোষ্ঠী একসময় অবশ্যই পরাজয় বরণ করে ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে।

কবির জবানবন্দির স্বরূপ : কবির জবানবন্দি দ্রোহের প্রবল অনুভূতিতে পরিপূর্ণ। জবানবন্দিতে তার ক্ষোভ, ঘৃণা, দ্রোহ মূলত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষকের বিরুদ্ধে এবং নির্যাতিত নিষ্পেষিত দেশবাসীর পক্ষে। ব্রিটিশ শাসকদের শোষণ-নিপীড়ন-নির্যাতনের যাঁতাকল থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে তিনি বহু ত্যাগ স্বীকার করেছেন।

বিষয়ানুগ বক্তব্য : কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার গভীর আত্মবিশ্বাস থেকে ব্রিটিশ আদালতে এক জবানবন্দি পেশ করেছিলেন। তিনি যা অন্যায় ও অসত্য বলে বুঝেছেন তাকে অন্যায় অসত্যই বলেছেন। তিনি কখনো কাউকে তোষামোদ করেননি। অসত্যকে সত্যও বলেননি। তাই তিনি বিদ্রোহের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি।

উপসংহার : প্রবন্ধকার কাজী নজরুল ইসলাম অন্যায়, অসত্য আর মিথ্যার বিরুদ্ধে ছিলেন অটল-অবিচল এবং সদা এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্রস্তুত। কোনোপ্রকার ভয়, লোভ, শঙ্কা তাকে এ পথ থেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। এমনকি মৃত্যুকেও তিনি পরোয়া করেননি। তিনি তার দেশ ও স্বাধীনতাকামী দেশবাসীর মুক্তি কামনায় ছিলেন স্থিরচিত্ত।

⏩ প্রশ্ন : ৪০ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অবলম্বনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নজরুলের বিদ্রোহী সত্তার পরিচয় দাও।

অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১২]

অথবা, কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে বিদ্রোহের যে সুর ফুটে উঠেছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী আত্মার মূর্ত প্রতীক। –এ উক্তির আলোকে বিদ্রোহের মাহাত্ম্য বর্ণনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে একইসাথে বিদ্রোহ ও প্রেম নিয়ে যার আবির্ভাব হয়েছে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তাঁর গল্প, কবিতা ও গানের মাধ্যমে সমাজের নানা অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধটি কবি ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি অবস্থায় রচনা করেন। তিনি প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন 'ধূমকেতু মামলা'য় নিজের জবানবন্দি হিসেবে আদালতে দাখিল করার জন্য। এ প্রবন্ধটি পরবর্তীতে 'ধূমকেতু', 'প্রবর্তক', 'উপাসনা', 'সহচর' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে একদিকে ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণির শোষণের চিত্র অন্যদিকে শোষিত স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের বিদ্রোহী আত্মার চিত্র ফুটে উঠেছে।

প্রবন্ধের সূত্রপাত : বাংলা সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি শুধু গতানুগতিক সাহিত্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তার রচনার মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তৎকালীন 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী কবিতা প্রকাশ করার অপরাধে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। এ মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে কবি আদালতে যে জবানবন্দি দাখিল করেছিলেন তার প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" এভাবে তিনি তার প্রবন্ধ শুরু করেছেন।

রাজবিদ্রোহের স্বরূপ : ব্রিটিশশাসিত ভারতের অধিবাসীরা ছিল শাসকদের দাস। সে সময় ভারতবর্ষে অন্যায়কে অন্যায় বললে অপরাধ হতো। পরাধীন দেশের সব অধিবাসীই দাস। দাসকে দাস বলা এবং অন্যায়কে অন্যায় বলা রাজদ্রোহের শামিল। ব্রিটিশ সরকারের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলাই রাজদ্রোহ। কেননা ব্রিটিশ সরকার ছিল প্রভু আর ভারতবাসী তাদের দাস। প্রভুর দাসত্ব করাই ছিল তাদের ভাগ্যের লিখন। এ অবস্থার বিরুদ্ধে সচেতন কবি, সাহিত্যিক ও পরাধীন নির্যাতিত ভারতবাসী সোচ্চার হলে তা রাজদ্রোহে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ শাসনে রাজদ্রোহ : কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসনের নগ্নরূপ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, "এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না। এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বানানো, এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে?" ব্রিটিশ শোষণ ও নির্যাতনের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কবির মনে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তা-ই তাকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে উৎসাহিত করেছিল। সত্যের অসহায় ক্রন্দনই কবিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, যা শেষপর্যন্ত রাজদ্রোহিতায় পরিণত হয়।

কবির বিদ্রোহের স্বরূপ : কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যায়, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নিছক কোনো জবানবন্দি নয়। এতে ব্রিটিশ শাসকের রক্তচক্ষুকে কটাক্ষ করে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার এ বিদ্রোহ কোনো রাজার বিরুদ্ধে নয়; বরং দেশ, জাতি, ধর্ম, সমাজ যেখানে অন্যায় ও অসত্য দেখেছেন, সেখানেই তিনি বিদ্রোহের আগুন নিক্ষেপ করেছেন। এর মধ্যে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির মূলমন্ত্র নিহিত ছিল। তাই সচেতন ভারতবাসীগণ পরাধীনতার গ্লানি থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে সক্ষম হয়েছিল।

কবির বিদ্রোহের উৎস : কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে সত্য প্রকাশের যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে যন্ত্র হয়তো অপর কোনো অপশক্তি ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু যিনি সত্যের বাণী বাজান, রুদ্রবাণী ফোটান, তাকে ধ্বংস করা যায় না। তিনি নিজেকে মর বলেছেন, কিন্তু যার বাণী প্রকাশ করেছেন তিনি অমর। একজন মারা গেলে অপর একজন তার স্থান দখল করবে, অমর চিরস্থায়ী সৃষ্টিকর্তার সত্য বাণী একদিন প্রকাশ হবেই। একজনের বাঁশি কেড়ে নিলে সে বাঁশির সুর থেমে যাবে না। তিনি বলেন, "দোষ বাঁশিরও নয়, সুরেরও নয়, দোষ আমায় যে বাজান। তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয় আমার বাণীরও নয়, দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজদ্রোহী আমি নই। প্রকৃত রাজবিদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান।"

কবি অপ্রকাশ্যের প্রকাশক : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম শোষণ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে কোনো অন্যায় করেননি। তিনি অধিকারবঞ্চিত মানুষের প্রতি তার পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। যে অপ্রকাশ্য কথাগুলো বলতে সবাই ভয় পায়, তিনি তা নির্ভয়ে প্রকাশ করে দিয়েছেন। রাজার কর্মকাণ্ডের যা কিছু অপ্রকাশ্য তথা অমূর্ত ছিল, তিনি সেগুলো মূর্তিময় করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমি কবি, অপ্রকাশ্য সত্য প্রকাশ করার এবং অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত।

কবির বিদ্রোহী আত্মা : ভারতবর্ষের পরাধীন মানুষগুলোর যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও অপমান কবিকে মর্মাহত করে তুলেছিল। তাই তার বিদ্রোহী আত্মা ব্রিটিশ সরকারের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন কবি তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত দেশবাসীকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদাত্ত আহ্বান জানান। কবির বিদ্রোহী আত্মা তাই ঘোষণা করে–

মহাবিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
অমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

কবির আত্মবিশ্বাস : কবি খুবই আত্মবিশ্বাসী। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাস হারাননি। তিনি ছিলেন প্রবল আত্মপ্রত্যয়ী। এ ব্যাপারে কবি নিজেই বলেছেন, "আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই।"

কবির আত্মোপলব্ধি : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসন-শোষণ, অত্যাচার-অবিচার এবং বিচারব্যবস্থার স্বরূপ দর্শনে কবির আত্মোপলব্ধি ঘটে। তিনি নিজেকে স্বাধীনতাকামী

ভারতবাসীর মুক্তির অগ্রনায়ক হিসেবে আবিষ্কার করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তার আবির্ভাব ঘটেছে অজানা এক অসীম পূর্ণতা নিয়ে। তিনি সত্যের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, তাই তিনি সত্য স্বীকার এবং প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত। কেননা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই তার কাজ। তিনি লোভ ও ভয়-ভীতির বশবর্তী হয়ে অন্যায় অসত্যকে স্বীকার করে সেগুলোকে সত্যের বিপরীতে প্রতিষ্ঠা করতে রাজি হননি।

বিদ্রোহের বীণা : কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নিছক একটি জবানবন্দি নয়। এ প্রবন্ধে কবির বিদ্রোহী বীণা সুর তুলেছে। বেজে উঠেছে ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ শাসক শ্রেণির রক্তচক্ষুকে কটাক্ষ করে বিদ্রোহী বীণা। এ বিদ্রোহী বীণার মূলমন্ত্র ছিল পরাধীনতার গ্লানি থেকে জাতিকে মুক্ত করা। এর প্রতিটি ছত্রে ছড়িয়ে আছে বিদ্রোহের আগুন।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে এক অসীম সাহসী অগ্রনায়ক। অন্যায়, অসত্য আর মিথ্যার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সোচ্চার ছিলেন। তার লেখনীতে ফুটে উঠেছে বিদ্রোহী মানুষের চাওয়া-পাওয়া। কোনোপ্রকার ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা তার মুক্তির সংগ্রাম ও সত্য প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তিনি আজীবন গেয়ে গেছেন মানবমুক্তির গান।

▸▸ প্রশ্ন : ৪১ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রেমের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা লেখ। [ফা. প. ২০১৯]

অথবা, "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' স্বদেশপ্রেমের একখানা প্রামাণ্য দলীল।" –এ উক্তির আলোকে কবির দেশপ্রেমের বর্ণনা দাও।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ ও অনুপম দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। প্রবন্ধের প্রতিটি লাইনে ছড়িয়ে আছে দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তার নিরন্তন আকুতি, বিদ্রোহের আগুন। অত্যাচারী ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বদেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য তার কলম চলেছে বুলেটের মতো। তাই ইংরেজরা তাকে 'রাজদ্রোহী'র মিথ্যা অপবাদে গ্রেফতার করেছিল, কিন্তু তবুও তিনি পিছপা হননি। কোনো ভয়-ভীতি, লোভ-লালসা তাকে সত্যের পথ থেকে সরাতে পারেনি।

জবানবন্দির প্রেক্ষাপট : তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তার বিপ্লবাত্মক কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নির্যাতিত নিষ্পেষিত ভারতবাসী এসব কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে শরীক হতে থাকেন। কবি ছিলেন এ আন্দোলনের অগ্রসৈনিক। 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় (২২শে সেপ্টেম্বর ১৯২২) ব্রিটিশবিরোধী কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখার অপরাধে রাজদ্রোহী আখ্যায়িত করে সরকার তাকে গ্রেফতার এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য ব্রিটিশ বিচারকার্যের কঠোর সমালোচনা করে যে জবানবন্দি রচনা করেন, তা বিভিন্ন পত্রিকায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। তাঁর এই জবানবন্দি পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

কবির বিরুদ্ধে অভিযোগ : কবি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে প্রথমেই বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" পরাধীন দেশে স্বাধীনতার পক্ষে যারা কথা বলে তারাই রাজবন্দি হয়ে থাকে।

পরাধীন ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরেছিলেন, যারা আন্দোলন করেছিলেন তাদের রাজদ্রোহের অপরাধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কবি নিজেও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতিকে পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত করতে বিদ্রোহপূর্ণ লেখা প্রকাশ করেন। এ কারণে রাজবিদ্রোহের অভিযোগ তুলে তাকেও গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

বিদ্রোহের স্বরূপ : কবি কাজী নজরুল ইসলাম নির্যাতিত মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। শুধু লেখনীর মাধ্যমেই নয়, হুগলী জেলে থাকাকালে কয়েদীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ৩৯ দিন অনশন করেছিলেন। তার বিদ্রোহ শুধু রাজার বিরুদ্ধে নয়; বরং সমাজের যেখানেই অন্যায়, অসত্য ও অবিচার রয়েছে সেখানেই তার বিদ্রোহ। তিনি 'বিদ্রোহী' নামের কবিতাটি রচনা করে বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তার বিদ্রোহের স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। কবির ভাষায়–

মহাবিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না।

বিদ্রোহের আধার : কবি কাজী নজরুল ইসলাম রাজদ্রোহে অবতীর্ণ হয়েছিলেন রাজাধিরাজ সৃষ্টিকর্তা মহাপ্রভুর নির্দেশে। তার নির্দেশেই তিনি শোষকের বিরুদ্ধে কলমরূপ তরবারি ধরেছিলেন। তিনি নিজেকে সত্য প্রকাশের যন্ত্র বলেছেন। সে যন্ত্র অপর কোনো শক্তি ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু যিনি সত্যের বাণী বাজান তাকে ধ্বংস করা যায় না। কবি নিজেকে মর বলেছেন, কিন্তু তিনি যার বাণী প্রকাশ করেন তিনি অমর। একজন মারা গেলে অপর কেউ এসে সে স্থান দখল করবে, কিন্তু একদিন না একদিন সত্যের প্রকাশ ঘটবেই। একজনের বাঁশি ছিনিয়ে নিলে সে বাঁশির সুর স্তব্ধ হয়ে যায় না। তিনি বলেছেন, "দোষ বাঁশিরও নয়, সুরেরও নয়; দোষ, আমায় যে বাজায় তার। তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়; দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমি নই, প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান।

সত্যের প্রবেশিকা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ন্যায়, সত্য ও সুন্দরের পূজারি। যা কিছু সত্য ও কল্যাণকর তা প্রকাশ করাই তার ধর্ম। আর এসব কিছুই স্বদেশ, স্বসমাজ ও মানুষের বৃহত্তম স্বার্থ এবং কল্যাণের জন্য নিবেদিত। এদিক থেকে প্রত্যেক কবিই দেশপ্রেমিক। তাই কবি নজরুলের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে, "আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে ন্যায়দ্রোহী, সত্যদ্রোহী নয়।"

বিচারের নামে প্রহসন : তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনব্যবস্থা ছিল মিথ্যা, জুলুম ও প্রহসনমূলক নীতির আশ্রয়স্থল। রাজশক্তি নিযুক্ত বিচারক সত্য বিচারক হতে পারে না। কারণ তার একদিকে থাকে রাজভীতি অপরদিকে থাকে প্রাপ্তির লোভ। তাই এরূপ বিচারক থেকে সঠিক বিচার আশা করা যায় না। কবি বলেছেন, "এমনি বিচার-প্রহসন করে যেদিন খ্রিস্টকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান এমনি নীরবে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের পশ্চাতে।" তিনি যখন আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় একা দাঁড়ান তখন তার সাথে দাঁড়ান স্বয়ং স্রষ্টা।

পরাধীন ভারত : ভারতবর্ষ তখন পরাধীন ছিল। ব্রিটিশরাই ছিল এখানে সব। পরাধীন দেশে রাজা হচ্ছে প্রভু আর প্রজারা সকলে দাস। দাসকে দাস বলা এবং অন্যায়কে অন্যায়

বলা রাজদ্রোহ। সত্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজে মিথ্যা ও অন্যায়ের রাজত্ব চলতে থাকে। পরাধীন ভারতবাসী নিজেদের অধিকার-সচেতন হয়েছে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে। কবি জাতির কাছে প্রশ্ন রেখেছেন- "এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?" কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, আজ ভারতবর্ষ পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ড ভারতের অধীন হতো এবং নির্যাতিত-নিষ্পেষিত ইংল্যান্ডের অধিবাসীগণ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য যদি বর্তমান ভারতবাসীর ন্যায় উদগ্রীব হতো, আর এমন সময় তিনি হতেন বিচারক, তাহলে তিনিও তাদের মতো আচরণ করতেন। তারা তখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলত কবি তা-ই বলেছেন। কবির এ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

নিজের প্রতি কবির বিশ্বাস : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রবল আত্মবিশ্বাসী। নিজের প্রতি তাঁর আস্থা এবং বিশ্বাসই তাকে দেশের স্বার্থে সত্য প্রকাশে সাহস যুগিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে। বিশ্বস্রষ্টার কাছে আত্মনিবেদিত মানুষের কোনো দুর্বলতা থাকে না, কোনো সংকটও থাকে না। তিনি বলেছেন, "আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।" তিনি নিজেকে হীন, সংকীর্ণ, লোভী বা তোষামুদে মনে করেন না। পার্থিব স্বার্থের কাছে নিজের বিবেক জলাঞ্জলি দিতে তিনি রাজি নন। কেননা, কবি অনাগত অবশ্যম্ভাবী মহারুদ্রের তীব্র আহ্বান শুনেছিলেন, তার রক্তচক্ষুর হুকুম বুঝেছিলেন। তাই তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন, "কোনোকিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন প্রভুকে হীন করি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম-উপলব্ধিকে বিক্রয় করি নাই; নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই।" কবির এ আত্মবিশ্বাসই তাঁকে সফলতার চরম শিখরে আরোহণ করিয়েছে।

কবির স্বদেশপ্রেম : তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের সকল অপকর্ম ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন কবি। সৈনিক জীবনে তিনি দেখেছিলেন কামাল আতাতুর্কের সংগ্রাম ও বিজয়, স্বাধীনতার উজ্জীবনী শক্তির প্রকাশ। স্বদেশে ফিরে দেখেছেন প্রহসনের আইনকানুন, যা রাজশক্তিকে বাঁচানোর জন্যই তৈরি হয়েছে। ভারতবাসীর প্রতি নির্মম অবিচার, দুঃসহ নিপীড়ন তাঁকে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী করে তুলেছে। সকল ভয়ভীতি ও হুমকি তুচ্ছ করে তিনি 'ধূমকেতু'র মতো পত্রিকায় লিখে গেছেন অবিরাম। তিনি জানতেন, এ সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়ার শাস্তি তাকে পেতে হবে, প্রথম আঘাত তার বুকেই বাজবে। রাজদ্রোহীর বেশে রাজকারাগারে বন্দি হয়ে কবি প্রমাণ করেছেন, তিনি অন্ধ বিশ্বাসে, লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে অন্যায় অসত্যকে স্বীকার করে নেননি। তার যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়েই তিনি তার বিবেকের আদেশ পালন করেছেন। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন, "আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।" এ ধরনের দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘোষণা কেবল নির্ভেজাল দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব। আর কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন সেই নির্ভেজাল দেশপ্রেমিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপসংহার : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধটি মূলত রাজবিদ্রোহের স্মারকলিপি হলেও এটি দেশপ্রেমের প্রামাণ্য দলিল। দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা ব্যতীত এ ধরনের প্রবন্ধ রচনা করা যায় না। কবি কাজী নজরুলের মাঝে এসব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটেছিল বলেই তিনি নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত জাতিকে উদ্বুদ্ধকারী এমন জবানবন্দি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। সে হিসেবে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' স্বদেশপ্রেমের একটি প্রামাণ্য দলিল।

» প্রশ্ন : ৪২ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের যে রাজদ্রোহিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে তা নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০০৯]
অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বস্তুত একজন দেশপ্রেমিক রাজদ্রোহীর আত্মোপলব্ধির দলিল– আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে একইসাথে প্রেম ও বিদ্রোহ নিয়ে যার আবির্ভাব, তিনি হলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তার গল্প, কবিতা ও গানের মাধ্যমে সমাজের নানা অসত্য ও অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ করেছেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করেছিল। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি 'ধূমকেতু মামলা'য় অভিযুক্ত কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য যে লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছিলেন তা-ই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রাজদ্রোহের অভিযোগ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের সূচনাতেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" কবি তার ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে তৎকালীন শোষক ব্রিটিশ সরকারের মুখোশ উন্মোচন করে রাজশক্তির সমালোচনা করায় তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল। দেশ ও জাতির দুর্দিনে লেখক, কবি ও সাহিত্যিকগণ তাদের লেখনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। কবি নজরুলও সে মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হন।

রাজদ্রোহের কারণ : ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে ক্ষমতার বলে অসত্যকে সত্য, অন্যায়কে ন্যায় বলে ভারতবাসীর ওপর জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার ও নিষ্পেষণের স্টীমরোলার চালিয়েছিল। ব্রিটিশদের এ অনৈতিক ও অমানবিক কর্মের নগ্নরূপ দর্শনে কবির কোমল হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে, তার মনে ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। নিষ্পেষিত ভারতবাসীর কান্না কবিকে বিচলিত করে তোলে। সকল পরাধীন দেশে কবি-সাহিত্যিকগণ শোষণের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির জন্য কলম ধরেন। তাদের লেখনী অসচেতন ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলে। কবি কাজী নজরুল ভারতবর্ষের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রাজরোষের শিকার হয়েছিলেন।

কবির জবানবন্দির মূল সুর : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে একটি প্রামাণ্য দলিল। এতে যে মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে তা ন্যায় ও সত্যের জয়গানে মুখরিত। কবি নির্যাতিত নিষ্পেষিত মানুষের পক্ষে কলম ধরেছিলেন বলে তাকে রাজরোষের শিকার হতে হয়েছে। শত নিপীড়ন চালিয়েও সত্যের পূজারি কবিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। কারণ স্বয়ং স্রষ্টা তাকে সত্যের পথে নিযুক্ত করেছেন। কবি বলেছেন, "সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করিতে পারে না। আমি সেই চিরন্তন স্বয়ংপ্রকাশের বীণা, যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। আমি ভগবানের হাতের বীণা।"

শাসকের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহ : শাসক ও তার শাসনের বিরুদ্ধে কথা বলাই শাসকের দৃষ্টিতে রাজদ্রোহের শামিল। তাদের বিচারে অন্যায় ও মিথ্যার পক্ষে যাদের অবস্থান তারাই দেশপ্রেমিক, আর সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যাদের অবস্থান তারাই রাজদ্রোহী। তাছাড়া শোষক-নির্যাতক-অত্যাচারী শাসকের দৃষ্টিতে অপ্রকাশ্য সত্যকে প্রকাশ করাও রাজদ্রোহিতার শামিল। কবি তাই বলেছেন, "আমি কবি, অপ্রকাশ্য সত্যকে প্রকাশ করার

জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। ভগবানই কবির কণ্ঠে সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহ হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহ নয়। সত্যদ্রোহ নয়।"

রাজবিচার ও ন্যায়বিচারের পার্থক্য : কবির মতে, রাজবিচার আর ন্যায়বিচার এক নয়। কেননা, রাজবিচারকের মধ্যে একদিকে রাজার ভয় অন্যদিকে পুরস্কারের লোভ কাজ করে। তাই সে কখনো ন্যায়বিচার করতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ছিল শোষক ও এদেশের মানুষের সহায়-সম্পদ হরণকারী শাসক, ন্যায়বিচারক নয়। রাজার জুলুম-নির্যাতনের বিপক্ষে যারা কথা বলত তারাই হয়ে যেত রাজদ্রোহী। এটাই তাদের রাজবিচার, কিন্তু ন্যায়বিচারে এসব কাজ ন্যায়দ্রোহী নয়। তাই তারা কবিকে সত্য কথা বলার কারণে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। তাদের এ বিচার কখনো ন্যায়বিচার হতে পারে না।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ : সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাকে কোনো রক্তআঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। সত্য নির্ভয়, সে কাউকে ভয় পায় না। আর কবি সে সত্যের বীণাবাদক। কবির বীণায় সবসময় সত্য ও সুন্দরের কথাই ভেসে ওঠে। কারণ কবিকে বাজান স্বয়ং স্রষ্টা। তাই সত্য অবশ্যই প্রকাশিত হবে, তা কখনো মিথ্যার গহীনে চাপা পড়ে থাকতে পারে না।

রাজবন্দির দেশপ্রেম : কবি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক। দেশ ও জাতির প্রতি তার ছিল অগাধ ভালোবাসা। দেশপ্রেম তাকে ব্রিটিশ শাসকরূপী শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। পরাধীন দেশের বন্দিশালা তার মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির জন্য লেখনীর মাধ্যমে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সাধারণ জনতাকে উজ্জীবিত করেছিলেন। অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের সিংহাসন কাঁপিয়ে দিয়ে তিনি তার দেশপ্রেমের অগ্নিমশাল তুলে ধরেন। শোষকগোষ্ঠীর হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিস্পেষিত হলেও মানুষের কাছে কবি হয়ে উঠলেন দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রতীক।

কবির আত্মোপলব্ধি : দেশ ও জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা কবিকে করেছিল আত্মবিশ্বাসী। এ আত্মবিশ্বাস থেকেই জন্ম নেয় আত্মোপলব্ধি। আত্মোপলব্ধি ছাড়া দেশপ্রেম মূল্যহীন। আত্মোপলব্ধির জোরেই কবি সত্যকে সত্য বলার সাহস পেয়েছেন। নিজেকে চিনতে ও জানতে পারার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধির উন্মেষ ঘটে। তিনি নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন বলেই নিজের সম্পর্কে জন্মেছিল উচ্চ ধারণা। নিজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস কবিকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছিল বলেই তার উপলব্ধি শাণিত হতে পেরেছিল। তাই আত্মোপলব্ধিতে উজ্জীবিত কবি বলেছেন, "আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির, আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।" সুতরাং বলা যায়, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' মূলত একজন দেশপ্রেমিক রাজদ্রোহীর আত্মোপলব্ধির দলিল।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক রাজদ্রোহীর আত্মোপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। অন্ধ বিশ্বাসে, লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে তিনি কখনো মিথ্যাকে স্বীকার করেননি। তাই নির্দ্বিধায় মিথ্যাকে মিথ্যা এবং অন্যায়কে অন্যায় বলেছেন। নিজ উপলব্ধিকে তিনি কোনোকিছুর বিনিময়ে বিসর্জন দেননি। এ আত্মোপলব্ধি কবিকে রাজদ্রোহী হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাই কবি যথার্থই বলেছেন, "এ আমার অহংকার নয়, আত্ম-উপলব্ধির, আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।"

▸▸ প্রশ্ন : ৪৩॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অনুসরণে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলামের কারাবরণের প্রেক্ষাপট বর্ণনাপূর্বক কবি মানসের পরিচয় দাও।

অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' অবলম্বনে কাজী নজরুল ইসলামের সংগ্রামী চেতনার স্বরূপ বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকের শোষণ থেকে মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির জন্য তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তার হুঙ্কারে প্রকম্পিত হয়েছে ব্রিটিশ শাসকের রাজসিংহাসন। তিনি বিদ্রোহপূর্ণ গান, কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সর্বস্তরের মানুষের মাঝে।

কারাবরণের প্রেক্ষাপট : কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন ভারতবর্ষের নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির আন্দোলন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' নামে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কবির সম্পাদিত এ পত্রিকায় বিপ্লবাত্মক গান, কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকলে তিনি রাজরোষের শিকার হন। সরকারবিরোধী এসব প্রকাশনার কারণে কবিকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

'ধূমকেতু' সম্পাদনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' নামক পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বারীন ঘোষ প্রমুখ পত্রিকাটির জন্য আশীর্বাদমূলক বাণী পাঠিয়েছিলেন। এ পত্রিকায় তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র ফুটিয়ে তোলায় পত্রিকাটি সব মহলের হৃদয় জয় করেছিল। এর বিদ্রোহপূর্ণ জ্বালাময়ী সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধাবলি একদিকে যেমন জনগণের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি ব্রিটিশ সরকারের রোষানলেও পড়েছিল।

ধূমকেতু মামলায় কবি : ১৯২২ সালে কবির সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা এবং 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকার কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করে। এ মামলাটিই 'ধূমকেতু মামলা' নামে পরিচিত। ধূমকেতু মামলায় বছরের শেষের দিকে ব্রিটিশ শাসক কবিকে গ্রেফতার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি করে রাখে। ব্রিটিশ রাজবিচারক রাজদ্রোহের অপরাধে তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

রাজবন্দির জবানবন্দি : ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকাবস্থায় ব্রিটিশ আদালতে 'ধূমকেতু মামলা'র শুনানি চলাকালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এ বক্তব্যটি আদালতে দাখিল করেন। তার আদালতে দাখিলকৃত জবানবন্দিটি পরবর্তীতে ধূমকেতু, প্রবর্তক, উপাসনা, সহচর প্রভৃতি পত্রিকায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ বক্তব্য পাঠক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। আত্মপক্ষ সমর্থনের নামে লেখক এ জবানবন্দিতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন।

পরম আত্মবিশ্বাস : কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। তিনি তার বিবেকের বিচারে যা কিছু মিথ্যা, অন্যায় মনে করেছেন তা অকপটে মিথ্যা ও অন্যায় বলেছেন। তিনি কারো তোষামোদ করেননি। প্রশংসা এবং স্বার্থের লোভে কারো পেছনে পোঁ ধরেননি। তাতে তার আত্মোপলব্ধির প্রতি অবিচার হতো, আত্মপ্রসাদকে খাটো করা হতো, ব্যক্তিত্বের অপমান করা হতো। এ সবকিছুর হাতছানি তাকে সত্যের পথ থেকে সরাতে পারেনি। কারণ তিনি সত্যের বীণা। তিনি সত্যের পূজারি কবি। সত্যের পক্ষে আর

মিথ্যার বিপক্ষে কথা বলাই তার স্বভাব। তিনি বলেন, "আমি অন্ধ বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না।"

সত্যের সেবক কবি : কবি ছিলেন সত্যের বাণীবাদক, সত্যের সেবক। তাই তিনি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ বিচারকের আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেননি; বরং তিনি তার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে। এ প্রবন্ধে কবি নিজেকে 'সত্য প্রকাশের যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার দৃষ্টিতে রাজবিচারক অসত্যের প্রতীক। তার বিপরীতে তিনি স্রষ্টা প্রদত্ত সত্যের বাণী প্রচারে বদ্ধপরিকর। অসত্যের বিরুদ্ধে তার এ প্রতিরোধ, প্রতিবাদ কখনো নিস্তব্ধ হবে না। তিনি অপ্রকাশ্য সত্য প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত। তাই শত অত্যাচার-নির্যাতন তাকে সত্যের পথ থেকে সরাতে সক্ষম হয়নি।

কারাবরণ ও কবিমানস : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের যে-কোনো রচনায় কবিত্বের ছোঁয়া লেগেছে। কারণ তিনি মূলত একজন কবি। কারাবরণের সময় তার চিত্ত নির্যাতনের কষ্টিপাথরে আরো শাণিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন, "........ আমার কারাবাসকে– অমৃতের পুত্র আমি, হাসিগানের কলোচ্ছ্বাসে স্বর্গ করে তুলব। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতন লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন। আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন।" কবির এ বক্তব্যের মাধ্যমে তার কারাবাসকালীন অকুতোভয় কবিমানসের দীপ্ত প্রতিফলন ঘটেছে। কারাবাস তাকে আরো বেশি করে রাজদ্রোহী হতে উজ্জীবিত করেছে। সত্যের প্রতি তার কবিমানস আরো বেশি নিবেদিত হয়েছে। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে– "আমি সত্য রক্ষায়, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্বপ্রলয় বাহিনীর লাল সৈনিক।"

উপসংহার : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রতিবাদে ছিলেন অসীম সাহসী, আত্মপ্রত্যয়ী এবং সদা প্রস্তুত। তিনি ছিলেন সত্যের পূজারি। তাই কোনোপ্রকার ভয়, শঙ্কা ও লোভ তাকে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তিনি সব নির্যাতন-নিপীড়ন উপেক্ষা করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তির জয়গান গেয়েছেন। কবি অপ্রকাশ্য সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তবুও তার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি অত্যাচারী ব্রিটিশ রাজশক্তি। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে–

ঐ অত্যাচারীর সত্য পীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়,
সে সত্য আমার ভাগ্যবিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

⏩ প্রশ্ন : ৪৪ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন ও লেখকের বিদ্রোহী মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অন্যায়ের প্রতিবাদে এক অসীম সাহসী অগ্রনায়ক। তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়, জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তোলেন। যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছিল বজ্রের ন্যায় কঠিন, হীরার চেয়ে ধারালো। শত অত্যাচারের মধ্যেও প্রাবন্ধিক তাঁর বিশ্বাস হারাননি, সত্য ও ন্যায় থেকে বিচ্যুত হননি। কেননা তিনি ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে আত্মবিশ্বাসের বলেই তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার চিত্র অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ভাষায় মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপন করেছেন।

বাঙালির দাসত্ব ও অধিকার হরণ : ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ নবাবের পরাজয়ের মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কায়েম হয়। শুরু হয় শোষণ ও নির্যাতন। দাসে পরিণত হয় বাংলার জনগণ। ইংরেজরা এদেশের মানুষের ওপর জোর করে অমানবিক আইন চাপিয়ে দেয়। এখানকার সর্বসাধারণের নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। যার প্রতিবাদে লেখক সোচ্চার হন, জাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাগরণের বাণী তুলে ধরেন। যার ফলে তিনি হন কারাবন্দি এবং রাজবন্দির ভূমিকায় দাঁড়িয়ে হন বিচারপ্রার্থী।

বিদ্রোহী রাজবন্দি : অন্যায়ে আপসহীন প্রাবন্ধিক তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি তাঁর বিপ্লবী বাণী অবলীলায় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হননি। প্রবল আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান রাজবন্দি তাঁর সমগ্র জ্ঞান, স্বাধীন সত্তাকে নিয়োগ করেন দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত করতে। বিশেষ কোনো সাম্রাজ্যের অনিয়ম, শোষণ কিংবা নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ছিল না। তাঁর সংগ্রাম ছিল গোটা বিশ্বসমাজ, সংস্কৃতি এবং যাবতীয় অন্যায় ও অসত্যকে কেন্দ্র করে। বিদ্রোহী লেখক ছিলেন সত্যের পূজারি। তিনি ছিলেন সত্যের পথের নির্ভীক সৈনিক, সত্যই তাঁর কাছে আসল ভগবান। আর তাঁর এই সত্যকে ঘিরেই সব সংগ্রামী মন্ত্র। তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রশমিত হবে না। এটা দমন হওয়ার মতো নয়। কারণ, ভারতবর্ষকে পরাধীন করে তাদের ওপর অন্যায় বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নিতান্তই অন্যায়। সুতরাং সে সত্য একদিন সবার কাছে প্রকাশ পাবে, তাকে তখন রুখবে কে। তাই বন্দির বিশ্বাস, "আমার হাতের বীণা ভাঙলেও সে সুরের মৃত্যু হবে না।" তাঁর সেই অমোঘ বাণী– "রাজবিদ্রোহী আমি নই। রাজবিদ্রোহী স্বয়ং বীণাবাদক ভগবান।"

রাজবিদ্রোহী যেমন ছিলেন আত্মবিশ্বাসী তেমনি ছিলেন সাহসী ও তেজোদীপ্ত। পার্থিব লালসা, মৃত্যুভয়, রাজভয় কোনোকিছুই তাঁকে বিপ্লবের মন্ত্র হতে পৃথক করতে পারেনি। তাই কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "আমি কোনোকিছুর ভয়ে আমার সত্যকে, ভগবানকে হীন করি নাই।" "War is a biological necessity of the first importance" এই আবেদন ছিল প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধের রাজবন্দির আবেদন ছিল দাসত্বের শিকল থেকে ভারতবর্ষ ও মানবতাকে মুক্ত করা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতকে কাঁপিয়ে তোলা, বিপ্লব ও বিদ্রোহের বাণীর কারণে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়।

কবির বিদ্রোহী সত্তা : ভারতবর্ষের পরাধীন মানুষগুলোর যন্ত্রণা, লাঞ্ছনা ও অপমান কবিকে ব্যথিত করে তুলেছিল। তাই তাঁর বিদ্রোহী আত্মা ব্রিটিশ সরকারের শোষণ, নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত দেশবাসীকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে উদাত্ত আহ্বান জানান। কবির বিদ্রোহী আত্মা তাই ঘোষণা করে–

"মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না।"

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : সত্য ও ন্যায়ের প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলাম আজীবন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি কোনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। তারপরও রাজার বিচারে তিনি বিদ্রোহী। তাই তাঁকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তাতে তিনি ভীত নন। সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তিনি

আবশ্যক মনে করেছেন। কোনো লোভ, ভয়, শাস্তি তাঁকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলতে বিচলিত করেনি। তিনি সর্বদা অন্যায়, অসত্য আর মিথ্যা পদদলিত করেছেন।

উপনিবেশ প্রভাব ও বিদ্রোহ দমন : উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমে সহজলভ্য সম্পদ আহরণকে কোনো জাতিই সহজে ছেড়ে দিতে চায় না। তাই ব্রিটিশরাও চাননি এ উপনিবেশ ছেড়ে যেতে। কিন্তু লেখক ঠিক ঐ বাস্তবতার ভিন্ন কল্পনা করতেন। অর্থাৎ ইংল্যান্ড যদি ভারত কর্তৃক শাসিত হতো, তবে তিনি থাকতেন বিচারক এবং তাঁর মতো তাদের বিদ্রোহীর বিচার করানো হতো। তারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন তিনি তাই বলেছেন।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, ভারতবর্ষে আগ্রাসী ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভুত্বের রূপ ধরা পড়ে, যাতে লেখকের রাজবন্দীর মতো হাজারো বিদ্রোহী আত্মা জেলের ঘানি টানতে বাধ্য হয়েছিল। সেই পরাশক্তির হিংস্র থাবা হতে বাদ যায়নি স্বয়ং প্রাবন্ধিকের বিদ্রোহী আত্মাও।

›› প্রশ্ন : ৪৫ ॥ "সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না।" –এ উক্তির আলোকে কবি সত্যের যে মাহাত্ম্য তুলে ধরেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা সাহিত্যাকাশে অসত্য ও শোষণ-বঞ্চনার প্রতিবাদে দ্রোহের বীণায় ঝঙ্কার তোলার মাধ্যমে। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে অন্যায়-অসত্যের প্রতিবাদ করেছেন আর অধিকার-বঞ্চিত, নিপীড়িত ভারতবাসীকে সজাগ-সচেতন করে তুলেছেন। কবি কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকাবস্থায় ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধটি 'ধূমকেতু মামলায়' আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্যাকারে পেশ করেন। এ প্রবন্ধে কবি নিজেকে সত্যের পক্ষে আসামী এবং ব্রিটিশ সরকারকে অসত্যের পক্ষের ফরিয়াদি বলে দাবি করেছেন। তিনি তার বক্তব্যে ঘোষণা করেছেন, "সত্য কখনো রাজদণ্ড দিয়ে নিরোধ করা যায় না।"

মামলার পক্ষ-বিপক্ষ : ধূমকেতু মামলার একপক্ষে ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী রাজার মুকুট আর অন্যপক্ষে ধূমকেতুর শিখা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। মামলার এক পক্ষে রাজা, যার হাতে রাজদণ্ড, আর অন্যপক্ষে চিরসত্য, যার হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আর আসামীর পক্ষে সব রাজার রাজা, সব বিচারকের বিচারক, অনন্তকাল ধরে সদা জাগ্রত সৃষ্টিকর্তা। রাজার পশ্চাতে ক্ষুদ্র, আসামীর পশ্চাতে রুদ্র। রাজার পক্ষের বিচারকের লক্ষ্য স্বার্থ ও অর্থ, আর আসামীর পক্ষের যিনি তার লক্ষ্য অপ্রকাশ্য সত্যকে প্রকাশ।

সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব : পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকেই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তাই সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন। উভয়ের মাঝে কখনো সমঝোতা হতে পারে না। মিথ্যা সর্বদা সত্যকে পরাস্ত করতে চায়, কিন্তু সত্য মিথ্যাকে পদদলিত করে স্বীয় আলো চারদিকে ছড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়। সত্য চির অম্লান ও চির জাগ্রত। সত্য কখনো অসত্যের সাথে আপস করে না। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই তার ধর্ম। আর অসত্য অন্যায়ের বাহক। অন্যায় প্রতিষ্ঠা করাই তার ধর্ম। তাই কবি সত্যের পূজারি আর তার প্রতিপক্ষ রাজা অসত্যের পূজারি।

অপ্রকাশ্য সত্যের প্রকাশ : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অপ্রকাশিত সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, "আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহ হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়। সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ সত্যস্বরূপ।" অসত্য মর আর সত্য অমর।

সত্য প্রকাশের যন্ত্র : কবি নিজেকে সত্য প্রকাশের যন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। এ যন্ত্র অপর কোনো শক্তি ধ্বংস করতে পারে না। ধ্বংস করতে পারলেও যিনি সে যন্ত্র বাজান তাঁকে ধ্বংস করতে পারে না। কবির বীণায় যিনি সুর তোলেন তাঁকে কেউ অবরুদ্ধ করতে পারে না। কবি স্রষ্টার নির্দেশেই সত্যের বীণা বাজান। স্রষ্টাকে ধ্বংস করার শক্তি কারো নেই। কারণ তিনি অনন্ত অমর।

সত্য অপ্রতিরোধ্য : সত্য কেউ কখনো রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। মানুষ মরণশীল। রাজা-প্রজা, শাসক-শোষক-শোষিত সবাইকে মরতে হবে। কবির মতো অনেকেই সত্যের পক্ষে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মরেছে। আবার রাজদ্রোহের অভিযোগকারী অনেক রাজাও মরেছে, কিন্তু সত্য কখনো মরেনি। সত্য কখনো রুদ্ধ করে রাখা যায় না। কারণ, সত্যের যন্ত্র যিনি বাজান সেই স্রষ্টা অমর।

সত্য স্বয়ং প্রকাশ : সত্য স্বয়ং প্রকাশ, তা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাকে কেউ রোধ করতে পারে না। যে বীণায় চিরসত্যের বাণী ধ্বনিত হয় তাকে হয়তো কেউ ইচ্ছে করলে ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু যিনি এ বীণায় সুর তোলেন সে স্রষ্টাকে ভাঙবে কে? তিনি তো চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। তাঁকে ভাঙার বা ধ্বংস করার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি চিরকাল ধরে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তাই সত্য সব বাধা উপেক্ষা করে চিরকাল ধরে প্রকাশিত হবে।

সত্যের প্রতিষ্ঠা ও অসত্যের বিনাশ : সত্য অবিনাশী, কিন্তু মিথ্যা যতই শক্তিশালী হোক তার বিনাশ তথা ধ্বংস অপরিহার্য। অসত্য সর্বদা সত্যের কাছে পরাজিত। যে রাজশক্তি সত্যকে ধ্বংস করতে চায়, সত্যের মূলোৎপাটন করতে চায়, সেও স্রষ্টার এক ক্ষুদ্র সৃষ্টি। যে অহংকারী, খোদাদ্রোহী, অসত্যের প্রতিষ্ঠায় সত্যের বিনাশ সাধন করতে চায়, সে আজ স্রষ্টার ইচ্ছায় আছে, কাল হয়তো থাকবে না, কিন্তু সে যাঁর সৃষ্টি তাঁকেই নাশ করতে চায়। সুতরাং সত্যের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। কেননা সত্য অমর, অক্ষয় ও চিরস্থায়ী।

সত্যের মাহাত্ম্য : সত্যের মাহাত্ম্য অপরিসীম। এটি স্বয়ং প্রকাশিত হয়। কোনো অপশক্তির প্রভাব তার অগ্রযাত্রা রোধ করতে পারে না। সত্যের পূজারি কবি সত্যের জন্য লড়াই করতে গিয়ে রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। রাজশক্তি সত্যের বাণীবাহককে রোধ করতে পেরেছিল ঠিকই, কিন্তু সত্য রোধ করতে পারেনি। সত্যের মাহাত্ম্য অপরিসীম। তার শক্তি অপরিমেয়। সত্যের ক্ষয় নেই, মৃত্যু নেই। কারণ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা সত্যের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং সত্যের মাহাত্ম্য বিনাশ করার শক্তি কারো নেই। সত্য চিরঅম্লান, চিরভাস্বর, চিরবিকাশমান ও চিরজাগ্রত।

উপসংহার : সত্য স্বয়ং প্রকাশ। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ও মিথ্যা পদদলিত করে যুগে যুগে সত্য প্রকাশিত হয়েছে আপন গতিতে। কোনো অপশক্তি কখনো এর গতিরোধ করতে পারেনি। সত্যের পূজারি কবি তার 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে যে সত্যের কথা বলেছেন তা অমর, অক্ষয় ও চিরজাগ্রত। আর যে রাজশক্তি সত্যের গতিরোধ করতে চায় তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

▸▸ প্রশ্ন : ৪৬ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধ অনুসারে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মচেতনার স্বরূপ বর্ণনা কর।

অথবা, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের আত্মচেতনার যে প্রকাশ ঘটেছে, তা তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন সমাজ-সচেতন, দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাকামী সাহিত্যসাধক। তিনি কবিতার পাশাপাশি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেও

অধিকারবঞ্চিত নিপীড়িত মানুষদের সচেতন ও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তিনি কবিতা, গল্প, গান সবকিছুতেই সমাজের অনাচার, অবিচার ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি সমাজের রক্তচক্ষু আর শাসনের নামে শোষণের প্রতিবাদ করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' একটি আত্মজৈবনিক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে একদিকে আছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষকশ্রেণির ভয়ঙ্কর চিত্র আর অপরদিকে অত্যাচারিতের প্রতিবাদী কণ্ঠ।

'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধের পটভূমি : কবি তার জন্মের পর থেকেই প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যক্ষ করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণির শোষণের নানা রূপ। দেশবাসী তাদের নিপীড়নে দিশেহারা। সমাজে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও তাদের ছিল না। কবি এসব দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকায় থাকতে পারেননি। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো পরাধীনতার শিকলভাঙা গান। কবি কর্তৃক সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অনলপ্রবাহী প্রবন্ধমালা। শাসকশ্রেণির স্বার্থে আঘাত লাগায় কবির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপিত হয়। ব্রিটিশ সরকার তাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে। রাজবন্দি হিসেবে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের রাজআদালতে কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখিতাকারে একটি জবানবন্দি পেশ করেন। এ জবানবন্দিতে কবির আত্মসচেতনতার দিকটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

কবির আত্মসচেতনতা : আত্মসচেতন কবি হিসেবে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনন্য। তিনি ছিলেন সমাজ ও রাজনীতি-সচেতন লেখক। তিনি যখনই সাধারণ মানুষের প্রতি শোষকের নিপীড়ন দেখেছেন তখনই তিনি তার জোরালো প্রতিবাদ করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার কারণেই তাকে কারাবরণ করতে হয়েছে, নির্যাতিত হতে হয়েছে, অপরাধী হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কবি যখন রাজবন্দি তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি প্রায় বিশ্ব জুড়ে। সে শাসকশ্রেণির অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তিনি তাদেরই আদালতে রাজদ্রোহের অপরাধে আসামী হিসেবে দণ্ডায়মান। এমন প্রভাবশালী শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে আত্মসচেতনমূলক বক্তব্য কেবল অত্যন্ত সাহসী ও পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠেই ধ্বনিত হতে পারে। কবি বলেন, "আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি। কাহারো তোষামোদ করি নাই। প্রশংসা এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই– সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য-তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে।"

দেশপ্রেমিকের অনুভব : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম দেশপ্রেম ও দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে মুক্তিকামী মানুষের পাশে একজন অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একজন লেখকের সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল অন্যায়-শাসনে ক্লিষ্ট বন্দিসত্তার পীড়িত ক্রন্দন। সে ক্রন্দন কেবল একা কবির নয়; বরং ভারতবর্ষের আর্তপীড়িত আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার। কবিকে বন্দি কিংবা হত্যা করে তা রুদ্ধ করা যাবে না। সত্যের প্রকাশ কখনো রুদ্ধ হয় না। তিনি জানতেন, সত্যের প্রকাশ করতে গিয়ে শত আঘাত আসবে, নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হতে হবে। সে আঘাতও তিনি পেয়েছেন। তাকে কারারুদ্ধ করা হয়, যে জন্য কবি নিজেকে স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে গর্ববোধ করেন।

পরাধীনতার বেদনা/যাতনা : নিজের মাটিতে নিজের আবাসভূমিতে পরাধীনতার জীবন খুবই যন্ত্রণাদায়ক। কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীনতার গ্লানি বা বেদনায় যতটুকু ব্যথিত হয়েছেন, অন্য কোনো বাঙালি কবি সাহিত্যিকের মাঝে তা দেখা যায়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী

শাসকের নিপীড়ন কবির কোমল হৃদয়ে বেদনা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। তাই তিনি 'ধূমকেতু' পত্রিকায় অগ্নিঝরা ভাষায় নিপীড়িত দেশবাসীকে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবিত করে তোলেন এবং মুক্তিকামী মানুষের অগ্রকাতারে একজন সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন।

কবি নজরুল রাজবন্দি : ভারতবর্ষ তখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবাসীর সব ধরনের ব্যক্তিগত ও গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে জগদ্দল পাথরের মতো ভারতবর্ষের বুকে চেপে বসেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধশেষে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে কাজী নজরুল দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কলম ধরেন। বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গান রচনা করে তিনি ভারতবাসীকে জাগিয়ে তোলার মহান ব্রত পালন করেন। তিনি তার এ বিদ্রোহের বাণী প্রচার করার জন্য 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন। এতে শাসকগোষ্ঠী ধূমকেতু ও এর সম্পাদকের ওপর ক্ষিপ্ত হয়। ব্রিটিশদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরায় তাকে রাজদ্রোহী বলে কারাগারে নিক্ষেপ করে অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার।

কারাগারে কবি : কবি কাজী নজরুল ইসলামকে কারাগারে বন্দি করেও ব্রিটিশ সরকার তার বিদ্রোহী চেতনা অবদমন করতে পারেনি; বরং কারানির্যাতনে তা আরো শাণিত হয়ে ওঠে। কারাগারে বসেই তিনি বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গান লিখে চললেন। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো−

লাথি মার ভাঙরে তালা
যত সব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা ফেল উপাড়ি।

রাজদ্রোহ মামলার শুনানিকালে কবি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এক জ্বালাময়ী বক্তব্য আদালতে পেশ করেন। সে বক্তব্যই জনমাঝে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

দুঃসাহসী নজরুল : কবি রাজদ্রোহের অভিযোগে কারাবন্দি হওয়ার পরও তার মানসিকতার কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায়নি। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে তিনি বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। চরম দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করে তিনি ব্রিটিশ আদালতে বিচারকের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করলেন, "বিচারক জানে আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়, ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়, কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দিবে। কেননা সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে অন্যায়ের, সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।" এভাবেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিচারব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

কবির আত্মসচেতনতার স্বরূপ : কবির যৌবনধর্মী মানসের প্রতিবাদী সত্তা, শাসনের নামে কুশাসনের প্রতিবাদ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতের বিক্ষুব্ধ ভাষা ও বিদ্রোহের বাণী জবানবন্দির প্রতি ছত্রে ছত্রে বিধৃত। সত্য প্রকাশ করার জন্যই কবি স্রষ্টা কর্তৃক পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন। সে সত্যবাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়। মহাকবি গ্যাটে বলতেন, "প্রতিভার কাছে আমাদের প্রথম এবং শেষ দাবি সত্যপ্রীতি।" কবি কাজী নজরুল ইসলাম এ দাবি পূরণ করেছেন তার জবানবন্দিতে। তিনি বলেন, "আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য, কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ! এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না।" কবির আত্মা সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। তাই তিনি যা অন্যায় বলে বুঝেছেন তা অন্যায় বলেছেন, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছেন, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছেন। তিনি কাউকে তোষামোদ করেননি এবং প্রশংসা ও প্রসাদের লোভে কারো পিছনে পোঁ ধরেননি। তিনি শুধু রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি; বরং সমাজ, জাতি ও দেশের সব

ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। শত অত্যাচার-অনাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, অপমান-লাঞ্ছনা সত্ত্বেও তিনি সত্য পরিত্যাগ করেননি। তিনি কোনোকিছুর ভয় কিংবা লোভের বশবর্তী হয়ে স্বীয় আত্মচেতনা কারো পদতলে বিসর্জন দেননি।

উপসংহার : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজের আত্মাকে ঋষির আত্মা বলে দাবি করেছেন। তিনি অজানা এক অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ তার অহংকার নয়; বরং এটা তার আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। তিনি রাজভয় বা লোকভয়ে কিংবা কোনো লোভের বশবর্তী হয়ে মিথ্যা ও অন্যায়কে মেনে নিতে পারেননি। কবি নিজেকে ভয় ও শঙ্কাহীন এক অমৃতের পুত্র বলে দাবি করেছেন। এ দাবিই তার আত্মচেতনার স্বরূপ নির্ধারক।

» প্রশ্ন : ৪৭ ॥ 'রাজবন্দীর জবানবন্দি' প্রবন্ধ অবলম্বনে নজরুলের জবানবন্দি আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে কলম ধরেছিলেন। তবে শুধু কলম চালনাই শেষ নয়, তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী নিবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেছিল। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারি 'ধূমকেতু মামলা'য় অভিযুক্ত কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য যে লিখিত বক্তব্য তৈরি করেছিলেন, তা-ই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে অন্যায়, অসত্য, অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন অবস্থানের ঘোষণা ও ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ভারতবাসীর সোচ্চার প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে।

রাজবন্দীর ভাষ্য : প্রবন্ধের শুরুতেই প্রাবন্ধিক তাঁর ওপর আনীত অভিযোগ ও বন্দিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, "আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" তখন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন চলছিল। তাদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বললেই তা হতো রাজদ্রোহ। কবিও এ অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে প্রবন্ধ, কবিতা লিখেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা করা হয়েছিল। রাজবন্দি হিসেবে দীর্ঘদিন তাঁকে কারা-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহী কবি তাতে ভয় না পেয়ে প্রবন্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন ও বিচারব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

সত্য প্রকাশক কবি : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে লেখক সত্য প্রকাশ করেছেন অকুতোভয়ে। কেননা কবির হাতে চিরন্তন সত্যের বীণা আর তিনি সত্যের বীণাবাদক। সে বীণায় চিরসত্য ধ্বনিত হয়। কবির বীণায় ধ্বনিত বাণী সকল মিথ্যার বিরুদ্ধে, তাই সে বাণী রাজবিচারে বিদ্রোহ হতে পারে; কিন্তু ন্যায়বিচারে তিনি ন্যায়দ্রোহী ও সত্যদ্রোহী নন। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে ন্যায়ের দুয়ারে তা নিরাপদ, নিষ্কলুষ, অম্লান ও অনির্বাণ সত্যস্বরূপ। নির্বোধ শাসকগোষ্ঠী সে সত্যের বীণা হয়তো ভাঙতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সার্বভৌম ক্ষমতা ভাঙার সাধ্য কার। রাজা তা ভাঙতে পারবে না। কেননা রাজার ক্ষমতা ক্ষুদ্র আর সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা সীমাহীন। কবির পক্ষে আইন আর সত্য, রাজা দাঁড়িয়ে থাকেন মিথ্যা-ক্ষমতা আর জাত্যাভিমানের বেষ্টনীতে। তাই কবি বলেন– "রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন।"

সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধি : এ প্রবন্ধে লেখক নিজেকে সত্য প্রকাশের যন্ত্র বলেছেন। এ যন্ত্রকে অপর কোনো নির্মম শক্তি ধ্বংস করতে পারে, কিন্তু যিনি বাজান, রুদ্রবাণী ফোটান তাকে ধ্বংস করা যায় না। তিনি নিজেকে মর বলেছেন, কিন্তু যার বাণী তিনি প্রকাশ করেন তিনি অমর। সত্যবাণী প্রকাশক কেউ মারা গেলে, অপর একজন এসে সে স্থান দখল করবে। সৃষ্টিকর্তার বাণী সত্য, একদিন তা প্রকাশ হবেই। একজনের বাঁশি কেড়ে নিলেই সে বাঁশির সুর থেমে থাকবে না। তিনি বলেছেন– "দোষ বাঁশিরও নয়, সুরেরও নয়; দোষ আমার, যে বাজায়; তেমনি যে বাণী আমার কণ্ঠ দিয়ে নির্গত হয়েছে, তার জন্য দায়ী আমি নই। দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়, দোষ তাঁর যিনি আমার কণ্ঠে তার বীণা বাজান। সুতরাং রাজবিদ্রোহী আমিও নই। প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান।" এ সৃষ্টিকর্তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা কোনো রাজার নেই। তাঁর বিদ্রোহ রাজার বিরুদ্ধে নয়, তবে এ বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তিনি যখন আদালতে একা আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ান, তখন পেছনে এসে দাঁড়ান স্বয়ং সত্য-সুন্দরের সৃষ্টিকর্তা। যে রাজনিযুক্ত বিচারক সে সত্য বিচারক হতে পারে না। তার একদিকে থাকে সম্রাটের ভার অন্যদিকে থাকে প্রাপ্তির লোভ। পার্থিব হিসাব-নিকাশের কারণে বিচারক ন্যায়-সত্য জেনেও যে কাউকে শাস্তি দিতে পারে।

সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে : পরাধীন দেশে প্রত্যেকেই দাস। দাসকে দাস বলা এবং অন্যায়কে অন্যায় বলা রাজদ্রোহের শামিল। সত্যকথা, ন্যায়কথা, অত্যাচারিতের পাশে দাঁড়ানো পরাধীন দেশের জন্য অন্যায়। আর যতদিন পর্যন্ত সত্য না জাগবে ততদিন অন্যায় চলতে থাকবে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসী জেগে উঠছে। কবি বলেন, "এই অন্যায় শাসনক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়নক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী?" তিনি এখানে বলেছেন যে, আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ড ভারতের অধীন হতো, নিপীড়িত ইংল্যান্ড অধিবাসীবৃন্দ জন্মভূমি উদ্ধারের জন্য যদি বর্তমান ভারতবাসীর মতো অধীর হতো আর এমন সময় তিনি হতেন বিচারক, তাহলে তিনি তাদের মতো আচরণ করতেন। তারা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন তিনি তা-ই বলেছেন। সারাজীবন কবি ছিলেন অত্যাচারিতের পাশে। দেশমাতৃকার কল্যাণই সবসময় তাঁর ব্রত ছিল। তিনি দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি যেমন সাহিত্যে সংগ্রাম করেছেন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনেও শরীক হয়েছিলেন।

দেশপ্রেমিক : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন পরম দেশপ্রেমিক। তাই তিনি রাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। তিনি জানতেন, এ সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়ার শাস্তি তাঁকে পেতে হবে। প্রথম আঘাত তাঁর বুকেই বাজবে। রাজদ্রোহীর বেশে রাজকারাগারে বন্দি হয়ে কবি প্রণাম করেছেন। তিনি অন্ধ বিশ্বাসে, লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে অন্যায়-অসত্যকে স্বীকার করে নেননি। তাঁর যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়েই তিনি তাঁর বিবেকের আদেশ পালন করেছেন। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন, "আমি এবারকার প্রলয় ঘোষণার সর্বপ্রথম আঘাতপ্রাপ্ত সৈনিক মনে করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি।" এ ধরনের দৃঢ়প্রত্যয়ী ঘোষণা কেবল নির্ভেজাল দেশপ্রেমিকের পক্ষেই সম্ভব। আর লেখক ছিলেন সেই নির্ভেজাল দেশপ্রেমিকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

উপসংহার : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্য প্রকাশে অকুতোভয়। তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিলেন অসীম সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোনোপ্রকার ভয়, লোভ তাঁর পথে বাধা হয়ে সত্য প্রকাশে তাঁকে বিরত করতে পারেনি। তিনি মানুষের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে সদা সত্য-সুন্দরের সৃষ্টিকর্তার বাণী প্রকাশ করেছেন।



নির্বাচিত প্রবন্ধ
ব্যাখ্যাবলি

▶দুটি উদ্ধৃতি দেওয়া থাকবে: যে-কোনো একটির ব্যাখ্যা লিখতে হবে – ৫ × ১ = ৫

বাঙ্গালা ভাষা

⏩ ব্যাখ্যা : ১ ॥ লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি।
অথবা, গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল।

উৎস : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম পুরোধা, সার্থক ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার এখানে বাংলা সাহিত্যে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কৃতবাদী প্রাচীনপন্থি পণ্ডিতদের গোঁড়ামির স্বরূপ তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : যে-কোনো ভাষারই দুটি রূপ থাকে। একটি লিখিত রূপ, অন্যটি কথ্য রূপ। এদের একটি সাধুরীতি, অন্যটি চলিতরীতি। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ভাষায় এ দুটি রূপ বিদ্যমান। সেকালে বাংলা সাহিত্য জগতে সংস্কৃতবাদী পণ্ডিতদেরই একচ্ছত্র দখল ছিল। তারা সংস্কৃতবহুল সাধু ভাষায় পুস্তক রচনা করতো। সে ভাষায় পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হতো। পূর্ণ শব্দ ব্যতীত ভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হতো না। চলিত ভাষা তথা মানুষের মুখের ভাষায় পুস্তক রচনাকে তারা ঘৃণা করতো। তারা ভাবত, লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দই পুস্তক রচনার জন্য উপযুক্ত, যা গ্রাম্য ওইসব মহিলাদের মতো যারা ভারী গহনার গৌরব করে; অথচ তা শোভাবর্ধক হলো কিনা তা বিচার করে না। সংস্কৃত পণ্ডিতদের ধারণাও অনুরূপ। তারা বলত, যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নয়, সাধু ভাষায় প্রবেশ করার তার কোনো অধিকার নেই। অর্থাৎ তাদের মতে, বাংলা রচনার ভাষা হবে একমাত্র পরিপূর্ণ খাঁটি সংস্কৃত ভাষা।

মন্তব্য : বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কৃতের আবশ্যিক ব্যবহার সর্বসাধারণের জন্য দুর্বোধ্য। তাই লেখক প্রাচীনপন্থি এ সংস্কৃতবাদীদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

⏩ ব্যাখ্যা : ২ ॥ এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রবন্ধকার প্রাচীনপন্থি সংস্কৃতবাদী সাহিত্যিকদের দখলদারিত্বের কারণে বাংলা সাহিত্যের যে সৌন্দর্যহানি ঘটেছে তা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সাহিত্যের যে পথচলা তা ছিল আভাঙ্গা সংস্কৃতে পূর্ণ। প্রাচীনপন্থিরা গ্রন্থ রচনায় শুধু সাধু ভাষাই ব্যবহার করতেন। তারা ছিলেন

সংস্কৃতপ্রিয় এবং সংস্কৃতানুসারী। একদিকে তা যেমন ছিল কৃত্রিম তেমনি ছিল দুর্বোধ্য ও জটিল। অথচ সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো মানুষের মননশীলতা গড়ে তোলা। তা না হয়ে শুধু সংস্কৃত-প্রধান বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছে নীরস, শ্রীহীন ও দুর্বল। পাশাপাশি বাংলা সমাজেই বাঙ্গালা ভাষা অপরিচিত হয়ে ওঠে যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য। কেননা, শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গের জন্য যারা গ্রন্থ রচনা করেন তারা কোনোভাবেই প্রশংসার দাবিদার হতে পারেন না। কারণ সাধারণ মানুষ এতে উপকৃত হয় না। অথচ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানদান ও আনন্দদান।

মন্তব্য : সংস্কৃতের এই প্রতিক্রিয়াশীল ও আধুনিকতাবিমুখ ধারণা থেকে উত্তরণে সহজ এবং বোধগম্য ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩ ॥ সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল। [ফা. প. ১৯৯৩, '৯৯, '০৩, '১১, '১৪]
অথবা, সেই দিন হইতে সাধু ভাষা এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু সুসাহিত্যিক, বাংলা গদ্যজগতের দিকপাল, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : টেকচাঁদ ঠাকুর রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতিতে যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, প্রবন্ধকার এখানে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে যারা গ্রন্থ প্রণয়ন করতেন তারা ছিলেন সংস্কৃতপ্রিয় এবং সংস্কৃতানুসারী। গ্রন্থ রচনায় সংস্কৃতঘেঁষা সাধু ভাষার প্রচলন ছিল সর্বত্র। ফলে বাংলা সাহিত্য নীরস, শ্রীহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাংলা ভাষা দিন দিন সমাজে দুর্বোধ্য ও অপরিচিত হয়ে ওঠে। টেকচাঁদ ঠাকুর সর্বপ্রথম এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি ছিলেন ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। প্রচলিত ইংরেজি ভাষার মহিমা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। বাংলা ভাষায়ও তিনি অনুরূপ প্রচলিত কথ্য ভাষায় গ্রন্থ রচনায় উদ্যোগী হন। অবশেষে তিনি কথ্য ভাষায় রচনা করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস। আর সেদিন হতে সংস্কৃত ও কথ্যভাষার সংমিশ্রণে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা আরম্ভ হয়। যার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন গতি আসে।

মন্তব্য : Literature is the expansion of human character. সাহিত্য হলো মানব-চরিত্রের বিকাশ। তাই সাহিত্যের ভাষা যে সহজ-সরল এবং পাঠকের বোধগম্য হতে হবে, এ সত্য উপলব্ধি করে টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন।

⏩ ব্যাখ্যা : ৪ ॥ যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্যসকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা। [ফা. প. ২০০৫]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তিনির্মাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষার রূপ সম্বন্ধে উদ্ভূত বিতর্কের প্রেক্ষিতে কথ্য ও ব্যবহারিক বাংলাকেই সত্যিকার অর্থে বাংলা বলে আখ্যায়িত করেন এক পক্ষ। আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার তাদের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা ভাষার গদ্যরীতির বিকাশের একপর্যায়ে সাধু, চলিত, সংস্কৃতনির্ভর ও প্রচলিত এবং কথ্যরীতি ইত্যাদি ভাষারীতির সৃষ্টি হয়। এর পক্ষে-বিপক্ষে ব্যাপক লেখালেখিও শুরু হয়। একপক্ষের মতে, বাংলা ভাষা মূলত সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং যে গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত অন্য শব্দ ব্যবহার করা হয় তা তাদের বিবেচনায় ঘৃণাযোগ্য। অপরপক্ষ উদারনীতিতে বিশ্বাসী। তারা গোঁড়া সংস্কৃতবাদী নয়। তাদের মতে, যে ভাষা বাংলা সমাজে প্রচলিত, যাতে বাংলার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মতৎপরতা সম্পাদিত হয়, যা সব ধরনের বাংলাভাষীগণের নিকট বোধগম্য, তা-ই বাংলা ভাষা। তাদের মতে, এটিই প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থে ব্যবহার-উপযোগী ভাষা। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এ মতেরই সমর্থক।

মন্তব্য : সাহিত্য যেহেতু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট, সেহেতু সাহিত্য এমন ভাষায় রচনা হওয়া দরকার যে ভাষা সর্বসাধারণ বোঝে। যে ভাষায় সবাই কথা বলে, সে ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।

ব্যাখ্যা : ৫ ॥ "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, "ভাইরে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিত্তি-নির্মাতা, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রবন্ধকার ভাষার সৌন্দর্য বিনির্মাণে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা, সঠিক শব্দ চয়নই ভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে।

বিশ্লেষণ : ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করতে হলে উপযুক্ত শব্দ প্রয়োগ অপরিহার্য। বিষয় ও পরিবেশ অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করলে রচনা অধিকতর মধুর, স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়। বাংলা ভাষায় শুধু সংস্কৃত ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করলেই ভাষা রসাল এবং মধুর হয় না। তাই লেখক অপ্রয়োজনে সংস্কৃত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন। তবে বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার জন্য সংস্কৃত শব্দই নয়; বরং অন্য যে-কোনো ভাষার শব্দও বাংলার সাথে ব্যবহার করা যাবে। লেখক ভাষার কৃত্রিমতার একটি উদাহরণ দিয়েছেন এভাবে– আমরা সাধারণত 'ভ্রাতঃ' শব্দটি ব্যবহার করি না, 'ভাই' বা 'ভাইরে' বলি। ভ্রাতঃ উচ্চারণ করলে হাস্য, ব্যঙ্গ, নাটকীয়তা ও কৃত্রিমতার সুর পাওয়া যায়। আর 'ভাই' বা 'ভাইরে' বলার মধ্য দিয়ে আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। তাই ভাষায় প্রাণবন্ত ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা দরকার; যা মনপ্রাণ ছুঁয়ে ভাব প্রকাশ করে।

মন্তব্য : ভাষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হলে অবশ্যই শব্দচয়নে দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও প্রাণবন্ত করতে প্রচলিত শব্দ এমনকি যে-কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার যুক্তিসংগত।

ব্যাখ্যা : ৬ ॥ আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ।

অথবা, আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : দুর্বোধ্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ সংস্কৃত ভাষা যে সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথা প্রবন্ধকার এখানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে সংস্কৃত লেখকগণ সাহিত্যে জটিল বাক্যবিন্যাসে বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট ও অস্পষ্ট করে তুলেছিলেন। সে সময়কার পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, মুখের ভাষায় সাহিত্য রচনা করা যায় না, রচনা করা উচিত নয়। পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সাহিত্যের সাথে তাঁদের তেমন পরিচয় ছিল না। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা ছিল সংস্কৃত ঘেঁষা। রক্ষণশীল সংস্কৃতবাদীরা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত কথ্যভাষায় গ্রন্থ রচনা হতে দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং এর তীব্র সমালোচনা করেন। প্রবন্ধকার উভয়বিদ রচনার সমালোচনা করেন। একদিকে যেমন তিনি সংস্কৃতজ্ঞদের বাড়াবাড়ির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন, অপরদিকে তিনি আলালী ভাষা সব ক্ষেত্রেই সাহিত্যে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে হয়ে ওঠেন চরম বিরোধী। তাঁর মতে, "হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই।" তাই তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন, আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যা বুঝতে পারা যায় না, তা থেকে কিছু শিক্ষালাভ হয় না, তা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও প্রচলিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করা উচিত।

মন্তব্য : সহজ-সরল ভাষাই মানুষ বুঝতে পারে, তাই সবার বোধগম্য ভাষায়ই গ্রন্থ রচনা করা উচিত। আর এটাই যে-কোনো ভাষার উৎকৃষ্ট রচনারীতি।

» ব্যাখ্যা : ৭ ॥ কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পণ্ডিতেরা সেই মত মূর্খ। [ফা. প. ১৯৯৫]
অথবা, ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা গদ্যসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার আলোচ্যাংশে বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের সাথে সম্পর্কশূন্য শব্দাবলি বর্জন করে সংস্কৃতপ্রিয় লেখকরা যে মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছেন, সে বিষয়ে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, সংস্কৃতের সাথে সম্বন্ধশূন্য যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে, সেগুলো বজায় থাকা উচিত। কিন্তু সংস্কৃতপ্রিয় লেখকরা এ শ্রেণির শব্দাবলি তাদের রচনায় পুরোপুরি বর্জন করেন। এমনকি অন্যের রচনায়ও সেসব শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে দেখলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাদের মনোভাবকে চরম মূর্খতা বলেই মনে করেন। তিনি বলেন, যদি কোনো ধনবান ইংরেজের তহবিলে হালি আর বাদশাহী দু'রকমের মোহর থাকে এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যাভিমানবশে হালি মোহরগুলো রেখে ফারসি লেখা মোহরগুলো ফেলে দেয়, তবে সবাই তাকে বলবে ঘোরতর মূর্খ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যেসব লেখক সংস্কৃতের সাথে সম্বন্ধ নেই এমনসব শব্দ বাংলা ভাষা থেকে বর্জন করতে চান, তারাও সেই ইংরেজের মতোই মূর্খ।

মন্তব্য : মূল্যবান সামগ্রীমাত্রই আদরণীয়। বাংলা ভাষায় দেশি-বিদেশি শব্দ ব্যবহার করতে কোনো দোষ নেই। সংস্কৃত পণ্ডিতরা দেশি-বিদেশি শব্দ পরিহার করে মূলত মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন।

» ব্যাখ্যা : ৮ ॥ ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই-মণ্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায়– মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনন্য সৃষ্টি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : সংস্কৃত ভাষার মুখপাত্র ন্যায়রত্ন মহাশয় কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যেয় উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ন্যায়রত্ন মহাশয় কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনার চরম বিরোধিতা করেছেন। এর পক্ষে তিনি যুক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন, আলালের ঘরের দুলাল, হুতোমপেঁচা, মৃণালিনী প্রভৃতি গ্রন্থ স্ত্রী বা পাঁচজন বয়সীর সাথে পাঠ করে আমোদ করা যায়; কিন্তু পিতা-পুত্র একত্রে বসে অসংকুচিত মুখে কখনই ওসব পড়া যায় না। ঐ ভাষায়ই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যা গুরুজনের সম্মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জাবোধ হয়। তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন, আলালী ভাষায় লিখিত কোনো পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দেশ করতে পারা যাবে কি? বোধ হয়, পারা যাবে না। কেননা, এ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়। এজন্যই তাঁর প্রশ্ন, এরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা উচিত কিনা? এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তিনি আলোচ্য চমৎকার উক্তিটি করেন– "ফলারে বসে অনবরত মিঠাই মন্ডা খেলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না।" অর্থাৎ বিদ্যাসাগরীয় রচনা শ্রবণে একরূপ বিতৃষ্ণা দেখা দিলে স্বাদ পরিবর্তনের জন্য টেকচাঁদী ভাষার প্রয়োজন রয়েছে।

মন্তব্য : সংস্কৃতঘেঁষা সাহিত্য সর্বদা সবার হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।

⏩ ব্যাখ্যা : ৯ ॥ যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই, জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই, ... ততই গ্রন্থের সফলতা।

অথবা, যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত –ততই গ্রন্থের সফলতা।

অথবা, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম স্থপতি, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : গ্রন্থকারের যথার্থ সফলতা যে একমাত্র জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চিত্তোন্নতি এবং গ্রন্থ প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্যও তাই; সে বিষয়টিই এখানে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ এবং তার কল্যাণ সাধন। তাই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি করা। আর জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হলে গ্রন্থের বিষয়বস্তু পাঠককে সহজভাবে বুঝতে হবে। কোনো গ্রন্থের ভাষা যদি দুর্বোধ্য হয় তাহলে বিষয়বস্তু বোঝা কঠিন হয়। সবার বোধগম্য ভাষায় গ্রন্থ রচনা করাই উত্তম। দু'চারজন শিক্ষিত লোকের জন্য গ্রন্থ রচিত হলে তার আবেদন সর্বব্যাপী হতে পারে না। এতে সাধারণ মানুষেরও উপকার হয় না। শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য যারা গ্রন্থ রচনা করেন তারা কোনোমতেই প্রশংসা পেতে পারেন না। কারণ সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হয় না। অথচ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও পরহিতসাধন করা। একজন গ্রন্থকারের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা মানবিক উৎকর্ষ সাধন। আর সেজন্যই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য সে ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। এতে গ্রন্থের সফলতা আসবে। কিন্তু গ্রন্থের ভাষা যদি দুর্বোধ্য হয় তাহলে সাধারণ মানুষ তা পড়ে অনুধাবন করতে পারবে না।

মন্তব্য : যেহেতু Literature is the expansion of human character এবং গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো, সেহেতু পাঠকের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে সহজ-সরল ভাষায় সাহিত্য রচনা করা উচিত।

» ব্যাখ্যা : ১০ ॥ জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু আধুনিক বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলতে গিয়ে জ্ঞানার্জনে সবার অধিকার সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : গ্রন্থ রচনা করা হয় মানুষের কল্যাণের জন্য, জ্ঞানের সার্বিক উন্নতি ও পুষ্টি সাধনের জন্য। তাই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধি করা। আর এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সহজভাবে উপস্থাপন করতে হবে। কারণ কোনো গ্রন্থের ভাষা যদি দুর্বোধ্য হয় তাহলে বিষয়বস্তু বোঝা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অতএব সবার বোধগম্য সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থ রচনা করাই উত্তম। দু'চারজন শিক্ষিত লোকের জন্য গ্রন্থ রচিত হলে তার আবেদন সর্বব্যাপী হতে পারে না। শুধু পণ্ডিত ব্যক্তিদের জন্য যারা গ্রন্থ রচনা করেন তারা কোনোমতেই প্রশংসা পেতে পারেন না। কারণ সাধারণ মানুষ তাতে উপকৃত হয় না। অথচ গ্রন্থ রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনে পরহিতসাধন। পরের উপকারের জন্যই গ্রন্থ রচনা হয়ে থাকে। গ্রন্থের ভাষা যদি দুর্বোধ্য হয় তাহলে তা পাঠ করে জনসাধারণের উপকার হতে পারে না। আর হতে পারে না বলেই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সাধারণ লোকের অধিকারের প্রতি লক্ষ রাখা গ্রন্থকারের একান্ত কর্তব্য।

মন্তব্য : গ্রন্থ রচনার প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া, সেহেতু গ্রন্থ রচনা করতে হবে এমন ভাষায় যাতে সব মানুষ তা পড়ে বুঝতে পারে।

» ব্যাখ্যা : ১১ ॥ অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস-নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

উৎস : উদ্ধৃতাংশটুকু সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রবন্ধকার ভাষায় অহেতুক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের ফলে ভাষার স্বকীয়তা বিনষ্ট হওয়ার দিকটি বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা ভাষায় তিন ধরনের শব্দ প্রচলিত। প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ যার বাংলায় রূপান্তর হয়েছে। যথা– গৃহ হতে ঘর, ভ্রাতা থেকে ভাই। দ্বিতীয়, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যার রূপান্তর হয়নি। যথা– জল, মেঘ, সূর্য। তৃতীয়, যেসব শব্দের সংস্কৃতের সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রথম শ্রেণির শব্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধকার বলেন, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোনো স্থানেই অরূপান্তরিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। যেমন– 'মাথা'র পরিবর্তে 'মস্তক', 'বামন'-এর পরিবর্তে 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি ব্যবহার করা অনুচিত। 'ঘর' প্রচলিত আছে বলে 'গৃহ' শব্দের উচ্ছেদ করতে হবে, অথবা 'মাথা' শব্দ প্রচলিত আছে বলে 'মস্তক' শব্দের উচ্ছেদ করতে হবে, এমন ক্ষেত্রেও ভাষার আপন স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, মূল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে ভাষার মাধুর্য বৃদ্ধি পায়। 'ভ্রাতৃভাব' এবং 'ভাইভাব', 'ভ্রাতৃত্ব' এবং 'ভাইগিরি' এতদুভয়ের তুলনায় বোঝা যায়, কেন 'ভ্রাতৃ' জাতীয় শব্দাবলি বাঙালির বজায় রাখা উচিত। অন্যদিকে লেখক বলেন, আমরা সাধারণত ভ্রাতঃ শব্দটি ব্যবহার করি না, 'ভাই' বা 'ভাইরে' বলি। ভ্রাতঃ উচ্চারণ করলে হাস্য, ব্যঙ্গ, নাটকীয়তা ও কৃত্রিমতার সুর পাওয়া যায়। আর 'ভাই' বা 'ভাইরে' বলার মধ্যে প্রচুর আন্তরিকতা ফুটে ওঠে। তাই ভাষায় প্রাণবন্ত ও সহজবোধ্য শব্দ ব্যবহার করা দরকার; যা মনপ্রাণ ছুঁয়ে ভাব প্রকাশ করে।

মন্তব্য : ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও প্রাণবন্ত করতে যে-কোনো ভাষার শব্দ ব্যবহার করা যাবে। আর তাই বিষয় অনুসারে ভাষারীতি ব্যবহার করা উচিত। এতে ভাষার সৌন্দর্য, স্বকীয়তা ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

➧ ব্যাখ্যা : ১২ ॥ কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।

অথবা, কথন এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন।

অথবা, এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখনো সিদ্ধ হইতে পারে না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু আধুনিক বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচয়িতা, সুসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : লেখ্য ও কথ্য ভাষা চিরদিন স্বতন্ত্রই থাকবে– এ বক্তব্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রবন্ধকার এখানে লিখন ও কথনের উদ্দেশ্য চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা নিয়ে দু'দল সমালোচকের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের একপক্ষ ঘোর সংস্কৃতানুসারী, এরা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ধৃত শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের বিপক্ষ দলও চরমপন্থি। এরা কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করে তুলতে প্রয়াসী ছিলেন। প্রবন্ধকার এ দু'দলের মতামত ও গ্রন্থ রচনায় তাদের অনুসৃত ভাষারীতির সমালোচনা করে বলেন, তিনি 'হুতোমী' ভাষাকে বাংলা লেখ্য ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে নন। আর এমনটি করা কখনো ঠিকও নয়। কেননা লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার রূপ সব সময়ই আলাদা হবে। কোনো লোক হাজার চেষ্টা করেও এ দু'ভাষাকে কখনো এক করতে বা একই প্লাটফর্মে দাঁড় করাতে পারবে না। এর পেছনে অবশ্য যথার্থ যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। কথোপকথনের বা পরস্পরের ভাব বিনিময়ের মৌখিক ভাষা হচ্ছে কথ্য ভাষা, আর লিখনের ভাষা হচ্ছে লেখ্য ভাষা। যেহেতু কথোপকথনের উদ্দেশ্য লেখার উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন, তাই এ দু'য়ের ভাষাও থাকবে ভিন্ন উদ্দেশ্যানুসারী ও স্বতন্ত্র।

মন্তব্য : কেবল গুরুগম্ভীর বাক্য রচনা করলেই ভাষার ঐশ্বর্য বাড়ে না। আবার মুখের ভাষা হুবহু সাহিত্যে ব্যবহার করাও অযৌক্তিক। লেখ্য ও কথ্য ভাষার উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষাদান করা এবং পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন করা। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা যেমন সহজ-সরল হওয়া প্রয়োজন, তেমনি মার্জিত এবং রুচিশীল হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

➧ ব্যাখ্যা : ১৩ ॥ বিষয় অনুসারেই ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। [ফা. প. ২০১৬]

অথবা, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

অথবা, রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা।

অথবা, তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্যবিশিষ্ট করিবে– কেননা, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প।

অথবা, ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। [ফা. প. ১৯৮৯]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের দিকপাল, আধুনিক বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচয়িতা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে চয়নকৃত।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার আলোচ্যাংশে ভাষা ব্যবহারে প্রাচীনপন্থিদের গোঁড়ামি এবং নব্যপন্থিদের বাড়াবাড়ি– এতদুভয়ের সমালোচনা করে যুক্তিগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রাচীনপন্থিরা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে একমাত্র সাধু ভাষা ও আভাঙ্গা সংস্কৃতকেই অবলম্বন মনে করেন। অপরদিকে নব্যপন্থিরা সাধু ভাষাকে গ্রন্থ রচনায় কাছে ঘেঁষতে দিতেও রাজি নন। তারা মনে করেন, কথ্য ভাষাই হবে একমাত্র গ্রন্থ রচনার ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র উভয় দলের গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ির সমর্থন না করে বরং উভয়ের মাঝে সমন্বয়সাধন করেছেন। বঙ্কিমের মতে, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য হলো সর্বসাধারণকে জ্ঞানদান। কাজেই যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য ও প্রচলিত, সে ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করা উচিত। তিনি আরো মনে করেন, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সর্বোৎকৃষ্ট রচনা হলো সেটি, যার সরলতা ও স্পষ্টতা আছে। অসুন্দর ও দুর্বোধ্য ভাষা মানুষকে পীড়িত করে। তাছাড়া মানুষের ওপর অসুন্দরের প্রভাব কম। অসুন্দর কখনো মানব হৃদয়ে স্থায়ী আসন পেতে পারে না। রচনা সারগর্ভ, অর্থবহ ও সুন্দর হলে তা চিরকাল মানবচিত্তে প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু ভাষা ও ভাবের মিলনে সৌন্দর্য চিত্তরাজ্যে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। মানুষের মনের ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে না পারলে মূল্যবান কথাও নীরস হয়ে যায়। কাজেই গ্রন্থকে সর্বজনবোধ্য করে তোলার স্বার্থে এবং রচনার মান অনুসারে ভাষায় সাধু, চলিত বা বিদেশি শব্দ ব্যবহার করা চলে। এতে ভাষার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং রচনাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। আর এটাই হলো বাংলা রচনার আদর্শ রীতি।

মন্তব্য : গ্রন্থ তথা রচনার বিষয়ের মান অনুসারেই ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারণ করা কর্তব্য। কেননা সহজ, সরল ও সুন্দর বাক্য অনায়াসেই মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। অসুন্দর কোনোকিছুই মানব-মনে স্থায়ী আসন পায় না– ক্ষণকাল রূপ নেয় মাত্র।

» ব্যাখ্যা : ১৪ ॥ স্থূলকথা, সাহিত্য কী জন্য? গ্রন্থ কী জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রূপকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রবন্ধকার সাহিত্য রচনার মানদণ্ড কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা গদ্যের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্য রচনায় শব্দ প্রয়োগ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে উদার মতের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সাহিত্য রচনায় যে-কোনো ভাষার শব্দ স্থান পেতে পারে। ভাব প্রকাশে সহায়ক সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, ইংরেজি সব ভাষার শব্দই সাহিত্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাংলা শব্দ থাকতে তদ্বাচক অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করা অনুচিত। তাই তিনি রামগতি ন্যায়রত্ন এবং শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়াবাড়িকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। চলিত ভাষাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন এ কারণে যে, এ ভাষায় সাহিত্য রচিত হলে অধিকাংশ লোকে তা বুঝবে। তাঁর মতে, বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে প্রয়োজনে মহাজন সংস্কৃতের কাছ থেকে শব্দ ধার করতে হবে। যেসব সংস্কৃত শব্দ লোকের বোধগম্য, সেগুলো পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। শব্দসম্ভারে ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে অন্য ভাষার শব্দ অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। তবে অকারণে কঠিন শব্দ ব্যবহার করে ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তোলা উচিত নয়।

মন্তব্য : সবার বোধগম্য ভাষায়ই সাহিত্য রচনা করা উচিত। কারণ সাহিত্য বা গ্রন্থ সীমিত কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য নয়। আর এটাই যে-কোনো উৎকৃষ্ট রচনারীতির আদর্শ হওয়া উচিত।

সভ্যতার সংকট

ব্যাখ্যা : ১৫ ॥ আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এখানে লেখক জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে তার বিস্তীর্ণ জীবনের নানা ক্ষেত্রে উদ্‌ঘাটিত উপলব্ধি তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যেমন মানুষের চিন্তাচেতনা পরিণত হয়, তেমনি কখনো কখনো বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে এর পরিবর্তনও ঘটে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তন, নিজস্ব পর্যবেক্ষণ সবকিছুই ব্যক্তিজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ সভ্যতার সাথে প্রথম পরিচিত হন ইংরেজি শিক্ষা ও দর্শনের মাধ্যমে। এই শিক্ষা ও দর্শন ছিল মানবতাবাদী। বাস্তবে ইংরেজ চরিত্রে এই মানবতাবাদ শেষপর্যন্ত আর টিকে থাকেনি। ভারতবর্ষে যারা শাসক হিসেবে ছিলেন, তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ এবং শোষণ-নির্যাতন, স্বার্থের জন্য আদর্শ বিসর্জন ইত্যাদি দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বাস তিল তিল করে নষ্ট হয়ে যায়। তাই আশি বছর বয়সে তিনি জীবন-পাতা উল্টিয়ে পেছন দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। জীবনের বিস্তীর্ণ ভূমি আজ তার সম্মুখে অবারিত প্রসারিত।

মন্তব্য : দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত জীবনে লেখক প্রথম জীবনের ভাবনার সাথে শেষ জীবনের বাস্তবতার গরমিল লক্ষ করে গোটা জীবনক্ষেত্রকে নিজের উপলব্ধিতে মেলে ধরেছেন।

ব্যাখ্যা : ১৬ ॥ আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে– সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দুঃখের কারণ আছে।
অথবা, পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংকটের ফলে লেখকের নিজের জীবনে ও ভারতীয় সমাজে বিশ্বাসের যে চিড় ধরেছে তার করুণ অভিব্যক্তি ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার জীবনের শেষ বেলায় এসে ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে বেদনাবিধুর হয়ে যান। আশিতম তথা জীবনের শেষ জন্মবার্ষিকীতে প্রাবন্ধিকের সামনে সমগ্র জীবনের বিস্তীর্ণতা প্রসারিত ছিল। অতীত জীবনকে বর্তমানের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়ে তিনি অনুভব করেছেন– নিজের জীবনের এবং সমগ্র দেশের মনোবৃত্তি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে। এ বিচ্ছিন্নতার মধ্যে একটা গভীর দুঃখের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। জীবনের শুরুতে তিনি যা দেখেছেন এবং ভেবেছেন, বর্তমানকালের দেখা ও ভাবনার সাথে তার দুস্তর ব্যবধান। জীবনের শুরুতে পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষে তার ও দেশবাসীর মধ্যে ইংরেজদের প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মেছিল, কিন্তু আজ সে সভ্যতার কদর্য, স্বার্থান্ধ রূপ উপলব্ধি করে তিনি এবং তার দেশ সেই সভ্যতা বর্জন করতে বাধ্য হচ্ছে। তার বিশ্বাস

একেবারে দেউলে হয়ে গেছে। এ বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা রবীন্দ্রনাথকে কষ্ট দিয়েছিল। অতীত থেকে বর্তমানের এ বিচ্ছিন্নতা তার কাছে গভীর দুঃখের কারণ বলে মনে হয়েছে।

মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আশৈশব লালিত বিশ্বাস একসময় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এ বিশ্বাসভঙ্গের ফলে সৃষ্ট বেদনায় তিনি এবং তার দেশবাসী সমানভাবে ব্যথিত।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১৭ ॥ তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়।

উৎস : উদ্ধৃত অংশটুকু বাংলা সাহিত্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক ইংরেজ সভ্যতায় আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন ভারতীয়দের ইংরেজি শেখার ইচ্ছা ও এ নিয়ে তাদের গর্বিত হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : ভারতবর্ষে ইংরেজরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে এলেও পরবর্তীতে তারা এদেশের শাসনক্ষমতা দখল করে নেয়। শাসনকার্য পরিচালনা করার কাজে প্রয়োজন পড়ে এদেশীয় লোকের। তাদের দিয়ে নিম্নশ্রেণির কেরানিগিরি করানোর জন্য ইংরেজি ভাষা শেখানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ইংরেজরা তাই এদেশে ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। এর মাধ্যমে তারা একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে তোলার প্রয়াস পায়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দিতে গিয়ে তারা ভারতবাসীকে পরিচয় করায় ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে। সাহিত্য ও দর্শনসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচয় ঘটে এদেশবাসীর। ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি তখন এত উন্নত ছিল যে, তা চর্চা ও উপভোগ করাটা সুরুচি, উন্নত মানসিকতা এবং গৌরবের বিষয় ছিল। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করলে তখনকার দিনে তা বাস্তবিকই আভিজাত্যপূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করতো।

মন্তব্য : লেখক শেষজীবনে ইংরেজ সভ্যতার সমালোচনা করলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের কাছে যে ভারতবাসী ঋণী, তা স্বীকার করেছেন অকপটে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১৮ ॥ তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।

অথবা, সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যের দ্বারাই প্রশস্ত হবে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু যুগশ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে লেখক ইংরেজদের উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তাদের প্রতি ভারতবাসীর যে প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : ইংরেজদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রভাবে ভারতের শিক্ষিত শ্রেণির লোকেরা ইংরেজদের অন্ধভক্তে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজদের বাহ্যিক মানবতাবোধ ও লৌকিক ঔদার্য দেখে তারা হয়েছিল মোহাচ্ছন্ন। এমনকি ভারতীয়রা তাদের নিজের দেশ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মন্ত্রটুকুও পেয়েছিল ইংরেজ কর্তৃক। অথচ তাদের দেশ অধিকৃত ছিল ইংরেজ দ্বারা। তাছাড়া আরো বিস্ময়ের ব্যাপারে হলো, তারা ইংরেজদের প্রতি এতটাই মুগ্ধ ছিল যে, তারা মনে করেছিল, ইংরেজরাই তাদের ঔদার্যে স্বাধীনতা দিয়ে যাবে। এ বিশ্বাসের ফলেই গান্ধীজি সশস্ত্র আন্দোলনের পরিবর্তে অহিংস আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন

এবং ভারতের শিক্ষিত শ্রেণিও এতে সমর্থন যুগিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতে, এ ধরনের অন্ধ মোহ দ্বারা সমগ্র জাতি যে আচ্ছন্ন ছিল তা তার নিজের এবং তার জাতির জন্য দুঃখজনক।

মন্তব্য : ইংরেজদের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস জন্মেছিল অতিমাত্রায়। এ অধিক বিশ্বাস ও আশা অবশেষে তাদের সুদীর্ঘ বঞ্চনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ১৯ ॥ এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংল্যান্ডে।
অথবা, যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংল্যান্ডে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার প্রথম জীবনে ইংরেজ চরিত্রে যে ঔদার্য উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন জীবন-সায়াহ্নে তার বিপরীত ও স্বার্থান্বেষী রূপ লক্ষ করে প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখক অল্প বয়সে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন, ইংরেজ চরিত্র। তাদের শিক্ষা, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতাবোধ, মহত্ত্ব ইত্যাদি সদগুণ দেখে তিনি হয়েছিলেন মোহমুগ্ধ। ইংল্যান্ডবাসী মানবতাবোধকে স্থান দিয়েছিল সবার ওপরে। অন্যায়-অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে তারা ছিল সোচ্চার। তাই লেখক ইংল্যান্ডকে দেখেছেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের আশ্রয়স্থল হিসেবে। যারা দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও স্বজাতির মুক্তির জন্য জীবনপণ করেছিলেন, তারাও ইংল্যান্ডকে আদর্শ মনে করেছে অকুণ্ঠ চিত্তে। এমনকি ভারতীয়রাও একসময় ইংরেজকে হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল ইংরেজ চরিত্রের উৎকর্ষ বিবেচনা করেই, কিন্তু লেখক জীবন-সায়াহ্নে ইংরেজ চরিত্রের কলুষিত বীভৎস রূপটি উপলব্ধি করেছেন। তখন ইংরেজ চরিত্রের অতীত চিত্র তার মানসে ভেসে ওঠে।

মন্তব্য : ইউরোপীয় সভ্যতা যে একসময় বিশ্বব্যাপী আদরণীয় ছিল, তা তাদের উন্নত চরিত্রের জন্যই। তাদের মহৎ চরিত্রের জন্য ইংল্যান্ড ছিল অসহায় অত্যাচারিতের আশ্রয়স্থল।

⏩ ব্যাখ্যা : ২০ ॥ মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম।
অথবা, তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে লেখক ইংরেজ চরিত্রের যে রূপ দেখে মুগ্ধ এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়েছিলেন, তা ব্যক্ত করেছেন তার চমৎকার শব্দ গাঁথুনির মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ : ইউরোপীয় সভ্যতা একসময় বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল। ইউরোপীয় সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতার জনক বলা হয়। ভারতকে তারা শাসন-শোষণ করলেও একসময় যে মানবতাবোধ দেখিয়েছে তাতে ভারতবাসী তাদের কাছে ঋণী। তাদের হাতেই জন্ম নিয়েছে আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা। সুতরাং মানবমৈত্রীর এই যে বিরল দৃষ্টান্ত, তা উপস্থাপন করা কেবল ইংরেজদের মতো সভ্য জাতির পক্ষেই সম্ভব। তাদের চৈতন্যে প্রভাবিত হয়ে এদেশের মানুষ স্বাধীনতা, সাম্য, শান্তি, সৌহার্দ, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশপ্রেম– এক

কথায় সর্বৈব মানব মহিমাবোধ লাভ করেছিল। ভারতের প্রতি ইংরেজ স্বভাবের এই দাক্ষিণ্য তখনো পর্যন্ত তাদের আগ্রাসী মনোভাব ও সাম্রাজ্যবাদী মদমত্ততার বিষবাষ্পে কলুষিত হয়নি। ইংরেজ চরিত্রের কদর্য রূপ উন্মোচিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত লেখকও তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে হৃদয়ের উচ্চাসনে আসন দিয়েছিলেন ইংরেজদের।

মন্তব্য : মানবমৈত্রীর যে বিশুদ্ধ পরিচয় লেখক ইংরেজ চরিত্রে দেখেছিলেন, শেষপর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য মদমত্ততায় তা কলুষিত হয়েছে। শ্রদ্ধাবনত রবীন্দ্রনাথ তাদের প্রতি হয়েছেন বীতশ্রদ্ধ।

➧ ব্যাখ্যা : ২১ ॥ এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শ্লাঘার বিষয় ছিল না।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের প্রতি ভারতীয়দের নির্ভরশীলতা যে প্রশংসনীয় ছিল না, তা তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখক অল্প বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং দর্শনের সাথে পরিচিত হওয়ার সাথে সাথে বিখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান জন ব্রাইটের বক্তৃতা শোনারও সৌভাগ্য হয়েছিল তার। বিভিন্ন সভা সমাবেশে তিনি তার যে বক্তব্য শুনতে পেয়েছিলেন তাতে ছিল ইংরেজদের শাশ্বত সভ্যতার বাণী। জন ব্রাইটের সে বক্তব্যে হৃদয়ের যে ব্যাপ্তি ছিল তা সকল জাতিগত ও কালগত সংকীর্ণতা অতিক্রম করতে সক্ষম ছিল। রবীন্দ্রনাথও এ ইংরেজ মনীষীর বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেন। এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল সেদিনের যুব রবীন্দ্র মানসে। ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়াটাকে যখন রবীন্দ্রনাথ গৌরবের বিষয় বলে মনে করেছেন তখনো তার উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে যে, বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রতি এরূপ নির্ভরশীলতা, এটা ভারতীয়দের জন্য মোটেও প্রশংসার বিষয় নয়। এর মধ্যে প্রশংসার বিষয় যেটুকু ছিল তা হলো, ভারতের আবহমানকালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে রূপ সেদিন ফুটে উঠেছিল, তাকে স্বীকৃতি দিতেও ভারতীয়রা কুণ্ঠিত হয়নি।

মন্তব্য : কোনো জাতির জন্যই পরনির্ভরশীলতা গৌরবের বিষয় নয়। পরনির্ভরকারীকে কেউ পছন্দও করে না। তাই ইংরেজ সভ্যতার ওপর ভারতবাসীর যে নির্ভরশীলতা ছিল তা লেখক সমর্থন করেননি।

➧ ব্যাখ্যা : ২২ ॥ মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভাণ্ডারের সম্পদ নয়।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার এখানে এই চমৎকার দর্শন দিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ গুণাবলি কোনো একক ব্যক্তি বা জাতির নিজস্ব সম্পদ নয়; বরং তা সমগ্র মানব জাতির সম্পদ।

বিশ্লেষণ : লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়সে ইংল্যান্ডে গিয়ে সেখানকার উন্নত শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন। বিখ্যাত পার্লামেন্টারিয়ান জন ব্রাইটের মুখে তিনি বিভিন্ন সভায় যে বক্তব্য শুনেছিলেন তাতে ইংরেজের চিরকালের শাশ্বত বাণী ছিল। সেসব বক্তব্যের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমা অতিক্রম করে হৃদয়ে যে প্রভাব বিস্তার

করেছিল, তা লেখক আজীবন ভোলেননি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সে স্মৃতি তার মনে পড়ে। এর মধ্যে এতটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমানকালের অভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখা গিয়েছিল, তা বিদেশিদের আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও তাকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করার শক্তি ভারতীয়দের ছিল। এ ব্যাপারে কোনো কুণ্ঠা বা সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কারণ মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেষ্ঠ গুণাবলি, তা সংকীর্ণভাবে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সে গুণাবলি কোনো কৃপণের বা কোনো যক্ষের ভাণ্ডারের সম্পদ নয়। তা সব মানুষের, সব দেশের, সব জাতির অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য সম্পদ। তাই ইংরেজি সাহিত্য ও ইংরেজ সভ্যতার যে প্রভাব ভারতীয়দের ওপর পড়েছিল, তা আজও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল।

মন্তব্য : সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ গুণাবলিকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সবার জন্য অবারিত করে দেওয়ার মধ্যেই সর্বজনীন কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৩ ॥ এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে দার্শনিক মনু কর্তৃক প্রদত্ত সভ্যতার সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : মনু ছিলেন প্রাচীন ভারতের একজন খ্যাতিমান দার্শনিক ও পণ্ডিত। তার রচিত 'মনুসংহিতা' মানুষের অবশ্য পালনীয় আচার-আচরণ সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে 'সদাচার' বলে যে শব্দটি পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সভ্যতা শব্দটির মিল রয়েছে। Civilization-এর বাংলা প্রতিশব্দ সভ্যতা। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত, মনু তাকে বলেছেন সদাচার। এগুলো কিছু সামাজিক আচার-আচরণের সমষ্টি। সেই আচার-আচরণগুলো ভারতের সরস্বতী ও দৃশদ্বতী এ দুটি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত 'ব্রহ্মাবর্ত' নামক বিখ্যাত অঞ্চলের মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল। পর্যায়ক্রমে চলে আসা এ অঞ্চলের মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি হচ্ছে সদাচার। এই সদাচার কতকগুলো ভিত্তি বা প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা বা অবিচারই থাক না কেন, একে সদাচার বলা হয়েছে। সদাচারের যে আদর্শ মনু একদা ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কালক্রমে তা লোকাচারে রূপ নিয়েছিল। রবীন্দ্রজীবনের প্রথম ভাগে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এই লোকাচারের প্রতি প্রবল বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। আর আদর্শ হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিল ইউরোপীয় সভ্যতাকে।

মন্তব্য : দার্শনিক মনু কর্তৃক সংজ্ঞায়িত সদাচারই মূলত Civilization বা সভ্যতার যথার্থ প্রতিশব্দ। এটা ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের সর্বমহলে গৃহীত সভ্যতা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৪ ॥ সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিতরূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

অথবা, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ চরিত্রের অধঃপতিত বীভৎস রূপ তার সুন্দর শব্দগাঁথুনি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈশব থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। একদিকে যেমন তিনি সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তেমনি ইংল্যান্ডে গিয়ে ইংরেজ সভ্যতার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ও ঘটে। প্রথম জীবনে ইংরেজদের যে সভ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন তার কারণে তিনি তাদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। তবে জীবনের শেষ বেলায় যখন তিনি ইংরেজদের সাম্রাজ্য মদমত্ততার পরিচয় পান, তখন তার বিশ্বাসে ধস নামে। জীবনের শেষবেলায় এসে তিনি প্রথম বেলার ইংরেজ আদর্শের সঙ্গে মেলাতে পারেননি। কারণ, তখন রিপুর তাড়নায় তাদের মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় কলুষিত হয়ে পড়েছে। ইংরেজদের শাসন-শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হলো বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। এককালের চারিত্রিক উৎকর্ষে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ছিল যে ইউরোপ্ তা আগ্রাসী নখদন্ত বিকশিত করে বিশ্বব্যাপী বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে বর্বর রূপ পরিগ্রহ করে। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনে ইংরেজরা ভারতীয়দের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের বিশ্বাস শেষজীবনে এসে অবিশ্বাসে পরিণত হয়।

মন্তব্য : ইংরেজদের মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনকে আলোড়িত করলেও শেষজীবনে তাদের সভ্যতার নগ্নরূপ তাকে মর্মাহত করেছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৫ ॥ অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীরমনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি।

অথবা, যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি।

অথবা, অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয়দের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও অভাবের কথা বর্ণনা করে ইংরেজ সভ্যতার অসারতা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাহ্যত ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসেছিল বাণিজ্য করতে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উর্বর ক্ষেত্র পেয়ে তারা ভারতে স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসেছিল। সুযোগ বুঝে একসময় তারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। এরপর প্রায় দু'শ বছর তারা শাসন করে ভারতীয়দের। ভারতের জনসাধারণ একসময় ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল। এদেশের অনেক নাগরিক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে তা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিল। ইংরেজদের প্রতি ভারতীয়দের বিশ্বাস এতটাই গভীর ছিল যে, একসময় এদেশের স্বাধীনতার সাধকগণ ভেবেছিলেন, ইংরেজদের দাক্ষিণ্যের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। রবীন্দ্রনাথও ইংরেজদের আন্তরিক শ্রদ্ধা দিয়ে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন, কিন্তু একসময় সে শ্রদ্ধা তাদের সাম্রাজ্য-মদমত্ততার কারণে বীতশ্রদ্ধা ও

ক্ষোভে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসী রূপ যখন ভারতবাসীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে তখন তারা ইংরেজ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পেল। ভারতবর্ষে তারা শাসনের নামে শোষণ চালিয়েছিল। তাদের অত্যাচারে ভারতবাসী অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়েছে। অথচ দীর্ঘদিন ধরে ভারতবাসী সভ্য ইংরেজদের পুষ্টিসাধনে শক্তি ও সম্পদের যোগান দিয়েছে। মূলত ইংরেজদের সভ্যতা ছিল স্বার্থপরতায় বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত। তারা ভারতবাসীকে নিদারুণ অবজ্ঞায় মানবেতর জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের নিষ্ঠুর বিকৃতরূপ কল্পনাও করতে পারেননি। মূলত সভ্য নামধারী ইংরেজদের সভ্যতা ছিল একটি মুখোশ। তারা সভ্যজাতি সেজে অন্য জাতিকে শোষণ করেছে। লেখক বিলম্বে হলেও ইংরেজদের এরূপ অত্যাচার এবং স্বার্থান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদীরূপ দর্শনে খুব ব্যথিত ও মর্মাহত হয়েছেন।

মন্তব্য : ইংরেজরা ভারত উপমহাদেশে তাদের অপশাসন প্রতিষ্ঠা করে দীর্ঘদিন এই অঞ্চলের মানুষের ওপর শোষণ-নিপীড়নের স্টিমরোলার চালিয়েছিল, লুট করেছিল এদেশের সম্পদ, হত্যা করেছিল এদেশের অসংখ্য মানুষকে যা রবীন্দ্রনাথকে তার জীবনসায়াহ্নে বেদনার্ত করেছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৬ ॥ ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজদের শাসন-শোষণের ফলে ভারতীয় শৌর্যবীর্য দলিত-মথিত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষণ : ইংরেজরা দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় ছিল। ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে ভারতবাসী একে তাদের জন্য আশীর্বাদ মনে করেছিল। ইংরেজ চরিত্রে মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় পেয়ে তারা মুগ্ধ হয়েছিল। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উৎকর্ষে আবিষ্ট হয়ে তারা অন্তর থেকে ইংরেজদের গ্রহণ করেছিল। তখন ভারতবর্ষে বিদ্যালাভের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। তাই ইংরেজি ভাষার ভেতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। সে সময় ইংরেজদের ঔদার্যের প্রতি ভারতের স্বাধীনতার সাধকদের এত গভীর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, তারা স্থির ধরে নিয়েছিলেন, ইংরেজদের দাক্ষিণ্য দ্বারাই একদিন তাদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু তাদের সে বিশ্বাস কর্পূরের ন্যায় উবে যায়। কারণ বিশ্বজুড়ে ইংরেজদের যে আধিপত্য ছিল, তা নৈতিক শক্তিবলে নয়; বরং যন্ত্রশক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রবন্ধকার প্রথম জীবনে ইংরেজদের যে মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছিলেন, আসলে তা সঠিক ছিল না। সদগুণ দিয়ে সারাবিশ্বে তাদের প্রভাব বিস্তার হয়নি, যে যন্ত্রশক্তি দিয়ে ইংরেজ জাতি তার সভ্যতাকে উঁচুতে টেনে তুলেছিল তার মূল চালিকাশক্তি ছিল ভারতবর্ষের মতো কলোনীগুলো। নতুন নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজার সৃষ্টিতে তারা হিংস্র শক্তির আশ্রয় নিত। অতঃপর শোষণের মাধ্যমে সর্বস্ব লুটে নিতে দ্বিধা করতো না।

মন্তব্য : ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আড়ালে ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যাঁতাকলে নিষ্পেষিত করে নিঃশেষ করেছে।

ব্যাখ্যা : ২৭ ॥ ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্য শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য তথা ইংরেজ সভ্যতার যাঁতাকলে নিষ্পেষিত ভারতীয়দের নির্মম পরিণতির কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা দখল করে ইংরেজরা প্রথমেই এর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। তারপর বিনষ্ট করে এর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। প্রায় দু'শ বছর ধরে এভাবে ভারতীয়দের ওপর নিষ্ঠুর শাসন-শোষণ চালিয়ে ভারতীয়দের পৌরুষকে দলিত-মথিত করে। একসময় জ্ঞান-বিজ্ঞান, মানবতা ও সভ্যতায় ইউরোপ ছিল আদর্শ, কিন্তু এ আদর্শ যে ইউরোপীয়দের একার তা নয়। ইউরোপ শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগামী হলেও অনেকক্ষেত্রে তারা আমাদের আদর্শের কাছে মন্দীভূত। তাদের সে আদর্শ, সভ্যতা আমাদের সমাজেও আছে, তবে ভিন্ন নামে ভিন্ন রূপে। আমাদের সমাজে এ সভ্যতার রূপ সদাচার নামে পরিচিত। সমাজে এগুলো কতকগুলো সামাজিক নিয়মের বন্ধনে প্রচলিত রয়েছে। চরিত্র মানুষকে মহৎ, উদার ও প্রগতিশীল করে। আর রিপু তাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। ইংরেজদের ক্ষেত্রে ঠিক তা-ই ঘটেছে। তাই তারা সভ্যতার নামে ভারতীয়দের ওপর যে অপশাসন চাপিয়ে দিয়েছে তার ভারে ভারত হয়েছে ন্যুব্জ। ফলে জাপান, চীন, রাশিয়া ও আফগানরা যখন উন্নতি ও মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, ভারতবর্ষ তখন ইংরেজ শাসন-শোষণের নিগড়ে উপায়হীন নিশ্চলতার মধ্যে পড়ে রয়েছিল।

মন্তব্য : ইংরেজ শাসন-শোষণ ভারতবাসীদের বুকে দুর্বহ বোঝার মতো চেপে বসেছিল। স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর উপায়ও তারা খুঁজে পাচ্ছিল না।

ব্যাখ্যা : ২৮ ॥ সভ্য শাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়, সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য কবি ও সাহিত্যিক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ফলে এখানকার জনসাধারণের মাঝে যে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা আবেগমিশ্রিত বাক্যে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : ইংরেজরা সভ্যজাতি হিসেবে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হলেও তারা ভারতবর্ষে শাসনের নামে অপশাসন ও শোষণ চালিয়েছিল। লেখক প্রথম জীবনে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাই তার ইংরেজপ্রীতি ছিল গভীর। এছাড়া তিনি ইংরেজ চরিত্রে মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধতার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু একসময় তিনি দেখতে পেলেন, ইংরেজদের সভ্যতা-বিবর্জিত শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে ভারতীয়রা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে জর্জরিত হয়ে পড়েছে। ভারতে জীবনযাপন হয়ে উঠেছে দুর্বিষহ। ইংরেজরা নিজেদের ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে গিয়ে ভারতীয়দের নিঃস্ব করে দিচ্ছিল। ইংরেজরা কেবল শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতবর্ষে

তাদের আধিপত্য দীর্ঘায়িত করার লক্ষ্যে সুকৌশলে ভারতীয়দের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের বীজ বপন করেছিল। তাদের প্ররোচনায় এ অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম পরস্পর শত্রুতে পরিণত হয়। উদ্ভব হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের। অনন্তকাল ধরে চলে আসা একজাতিতত্ত্বের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার উদয় হয়। ভারতীয়দের মাঝে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ শাসন-শোষণ আরও তীব্রতর হয়। ফলে দেখা দেয় চরম দরিদ্রতা। কিন্তু তার চেয়েও ব্রিটিশ সৃষ্ট ভারতীয়দের চরম আত্মবিচ্ছেদ ভারতের বুকে অশান্তির দাবানল জ্বেলে দেয়।

মন্তব্য : ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণের চেয়ে আবহমানকালের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ধ্বংসের মাধ্যমে সৃষ্ট জাতিগত বিভেদ ভারতকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

➧ ব্যাখ্যা : ২৯ ॥ ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্য জগতের প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব, নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধি ও সামর্থ্যের বিচারে ভারতীয়দেরকে জাপানিদের সাথে তুলনা করতে গিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : জাপান আধুনিক বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তি ও ধনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জাপানের অবস্থা ভারতবর্ষের চেয়ে খুব বেশি ভালো ছিল না। তারা তাদের মেধা, মনন ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। সমৃদ্ধি এবং উন্নতির জন্য তারা নিজেদের সম্পদ ও সামর্থ্য স্বাধীনভাবে কাজে লাগিয়েছে। অথচ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবাসী নিজেদের দরিদ্রতার করালগ্রাস হতে মুক্ত করতে সমর্থ হয়নি। তারা বুদ্ধি ও সামর্থ্যে জাপানের তুলনায় হীন নয়, কিন্তু তারা দেশের মানুষের উন্নতি ও কল্যাণে স্বাধীনভাবে কোনোকিছু করতে পারেনি। ভারতবাসী সামর্থ্যবান হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পড়ে ক্রমশ নিঃস্ব হয়েছে। জাপানের তুলনায় ভারতের এই যে অনগ্রসরতা ও নিঃস্বতা, তা যে ভারতীয়দের বুদ্ধি বা সামর্থ্যের দৈন্য তা নয়; বরং ভারতবর্ষ যেমন সভ্য নামসর্বস্ব বর্বর ইংরেজ শাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, জাপান তদ্রূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির দুঃশাসন থেকে মুক্ত ছিল।

মন্তব্য : ইংরেজদের শাসন-শোষণের কারণেই পরাধীন ভারতের উন্নতি ও কল্যাণ সম্ভব হয়নি। অন্যথায় ভারত জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ; যা জাপানের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়।

➧ ব্যাখ্যা : ৩০ ॥ সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। [ফা. প. ২০১৭, '১৮]

অথবা, সে তার পরিবর্তে দণ্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু নোবেল বিজয়ী বাংলা সাহিত্যিক; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চমৎকার শব্দগাঁথুনির মাধ্যমে সভ্যতার মুখোশ পরিহিত ইংরেজ জাতির স্বরূপ উদঘাটন করেছেন।

বিশ্লেষণ : ইংরেজরা প্রায় দু'শ বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছিল। এ দীর্ঘ সময়ে তারা এখান থেকে বিপুল ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের ঐশ্বর্য ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে তারা সারাবিশ্বে কর্তৃত্ব রক্ষা করেছে, তার যথোচিত ব্যবহার থেকে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত রেখেছে। ইউরোপীয় স্বাতন্ত্র্য ও জাতিসত্তাকে স্বাধীন রাখতে তাদের বীরেরা যখন প্রাণপাত করেছে, তখন একই সময়ে তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের কঠোর হস্তে দমন করেছে। এরা আমাদের অনেক কিছুই অপহরণ করেছে তা আমরা জানি, কিন্তু দেওয়ার মধ্যে যা দিয়েছে তা হলো 'Law and order' বা বিধি এবং ব্যবস্থা, যার অপর নাম দারোয়ানি। বস্তুত এ 'Law and order' তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিল ভারতীয়দের শায়েস্তা করাকে বৈধতা দিতে। ইংরেজরা তাদের শক্তির মদমত্ততা আমাদের দেখিয়েছে, কিন্তু মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক সবচেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, সেই সভ্যতার সুনির্মল প্রস্রবণে অবগাহন করার সুযোগ তারা ভারতবাসীকে দেয়নি। ইংরেজরা শক্তি দিয়ে ভারতকে পদানত করে রেখেছে। আর মুক্তিকে রেখেছে সুদূরপরাহত করে।

মন্তব্য : ইংরেজ সভ্যতা ভারতবাসীকে 'Law and order'-এর মাধ্যমে তাদের শক্তিমত্তার দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়েছে, কিন্তু এ শক্তি কাজে লাগিয়ে তারা ভারতবাসীকে মুক্তির সন্ধান দিতে পারেনি।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩১ ॥ আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অথবা, এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু স্বনামখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক মহৎ হৃদয় ইংরেজ মনীষী জন ব্রাইট, এন্ড্রুজ প্রমুখের চারিত্রিক মাহাত্ম্যের বর্ণনা করেছেন তার চমৎকার শব্দগাঁথুনির মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্প বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে গিয়েছিলেন। তখন তিনি জন ব্রাইটের মতো মানবতাবাদী রাজনীতিবিদদের বক্তব্য শুনে মুগ্ধ ও বিমোহিত হয়েছিলেন। তার বক্তব্যে ছিল ইংরেজদের চিরন্তন শাশ্বত বাণী, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজরা সভ্য শাসনের নামে নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনার কলঙ্কজনক ইতিহাস সৃষ্টি করে ইংরেজ জাতির চরিত্রকে কলুষিত করেছিল। তারা এখানে Law and order-এর নামে মূলত দারোয়ানি কায়েম করে ভারতবাসীর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। এসব কারণে রবীন্দ্রনাথের আশৈশব লালিত ইংরেজপ্রীতিতে চিড় ধরে। তিনি ইংরেজদের আচার-আচরণ ও মন-মানসিকতার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে সৌভাগ্যক্রমে জন ব্রাইট, এন্ড্রুজ প্রমুখ ইংরেজ মনীষীর সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয় লেখকের। এসব ইংরেজ মনীষীর মাঝে যে মহত্ত্ব তিনি দেখেছেন, কোনোদিন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি তা দেখতে পাননি। এসব মনীষী তার বিশ্বাসকে ইংরেজদের প্রতি আমৃত্যু বেঁধে রেখেছিল। এ বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের বাণী সারাবিশ্বে জ্ঞান ও সভ্যতার আলো ছড়িয়েছে। এদের মধ্যেই লেখক যথার্থ মানবতার পরিচয় পেয়েছেন। কারণ এদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য, হৃদয়ের প্রশস্ততা তাকে মুগ্ধ-মোহাচ্ছন্ন করেছিল। ইংরেজ চরিত্রের সে দুর্মোচনীয় প্রভাব রবীন্দ্রনাথের পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করেছে। তাই শেষ জীবনে তিনি ইংরেজ সভ্যতার চরম সংকটকালেও এদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন।

মন্তব্য : ইংরেজদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতনের দিনেও তাদের মহৎ হৃদয় মনীষীদের মহত্ত্ব ইংরেজদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসকে বেঁধে রেখেছিল।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩২ ॥ আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকল প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন।

অথবা, এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তাহলে পাশ্চাত্য জাতি সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার ইংরেজদের প্রতি আশৈশব লালিত বিশ্বাসভঙ্গের পর ইংল্যান্ডের মহৎ হৃদয় মনীষীদের স্মরণ করে এ উক্তি করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর প্রীতি এবং শ্রদ্ধাবোধ ছিল। এ কারণে ইংরেজ সভ্যতায় তিনি ছিলেন মোহাচ্ছন্ন, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজরা তাদের সভ্য শাসনের নামে শাসন-শোষণে আর নিপীড়নে ভারতবাসীকে নিষ্পেষিত করেছিল। তারা সাম্রাজ্য মদমত্ততায় মানবতাকে লাঞ্ছিত, পদদলিত করেছিল। তবে ইংরেজ মনীষী জন ব্রাইট ও এন্ড্রুজ তাকে এ চিত্ত-বিপর্যয় থেকে কিছুটা হলেও উদ্ধার করেছিলেন। তিনি এন্ড্রুজের মাঝে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রিস্টানকে, যথার্থ মানুষকে দেখতে পেয়েছিলেন। ইংরেজদের প্রতি লেখকের বিশ্বাস যখন একেবারে উবে যেতে বসেছিল, সে সময় এন্ড্রুজের মহত্ত্ব তার সন্দিগ্ধ চিত্তে ইংরেজকে কিছুটা হলেও রক্ষা করেছিল। জন ব্রাইট ও এন্ড্রুজের মতো মহৎপ্রাণ ইংরেজকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, ইংরেজ জাতিকে এরা সকল প্রকার বিপদ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন। তিনি যদি এদের না দেখতেন বা না জানতেন, তাহলে পাশ্চাত্য জাতি সম্পর্কে তার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ ও প্রতিকার খুঁজে পেত না, কেউ ইংরেজকে শ্রদ্ধা করতো না। জন ব্রাইট ও এন্ড্রুজের মতো মহাত্মাগণ ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন বলেই ইংরেজ সভ্যতার প্রতি লেখকের প্রীতি কাজ করেছিল।

মন্তব্য : সাম্রাজ্য আর সম্পদের লালসায় ইংরেজদের চারিত্রিক ও নৈতিক অধঃপতনের সময়ও রবীন্দ্রনাথ জন ব্রাইট, এন্ড্রুজ প্রমুখ মনীষীর মহত্ত্বের ওপর শ্রদ্ধা হারাননি; বরং তাদের মহত্ত্ব তাকে সংকটের সময় সান্ত্বনা যুগিয়েছিল।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৩ ॥ ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃপ্তকণ্ঠে তার প্রাণের আকুতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটিয়ে ইংরেজরা ভারতের শাসন ক্ষমতা দখল করেছিল। এরপর প্রায় দু'শ বছর তারা ভারতবর্ষকে শোষণ করে। ইংরেজদের আগমনকে অনেকেই ভারতবর্ষের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে করেছিল। এমনকি তাদের সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়ে অনেক শিক্ষিত ভারতীয় নিজেদের

ইংরেজ আদলে গড়ে তোলায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অচিরেই ইংরেজরা মানবতার বুকে পদাঘাত করে নিষ্ঠুর বর্বরতায় ভারতীয়দের ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে শুরু করে। ইংরেজদের সীমাহীন লুণ্ঠনে ভারতের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা অগ্রাহ্য করা হয়। তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শাসন-শোষণে গোটা ভারতবর্ষ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। চরিত্র মানুষকে মহৎ, উদার ও প্রগতিশীল করে, রিপু তাকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে। ইংরেজদের ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন, চরম প্রসব-বেদনার পর যেমন সুন্দর ফুটফুটে নবজাতকের আগমন ঘটে, তেমনি ইংরেজদের শোষণ-বঞ্চনায় পিষ্ট ভারতেও ইংরেজ বিতাড়নের মাধ্যমে স্বাধীনতার অভ্যুদয় ঘটবে। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনে ভারতভূমি একদিন না একদিন স্বাধীন হবে।

মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজমুক্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার বাস্তবায়ন হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। ভারতবর্ষের জনসাধারণ একদিন এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিল।

» ব্যাখ্যা : ৩৪। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবিঠাকুর ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি আশৈশব লালিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারিয়ে এ খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে ইংরেজদের মানবতা, উদারতা, শ্রমসহিষ্ণুতা, মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সদগুণ দেখে অকুণ্ঠচিত্তে ইংরেজ সভ্যতার প্রতি প্রীত-মুগ্ধ ছিলেন। ইংরেজদের প্রতি জেগেছিল তার অকুণ্ঠ বিশ্বাস ও ভালোবাসা, কিন্তু দীর্ঘ পথপরিক্রমায় জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি ইংরেজ সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতা ও নিষ্ঠুরতার বিকৃতরূপ অবলোকন করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তারা লোভের প্রাধান্যে, যন্ত্রশক্তির প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা ধন-সঞ্চয় করেছে। আমাদের দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে মানুষের শ্রম ও সম্পদ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে, আর আমাদের ক্রমান্বয়ে শোষণ করেছে। মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার অভাবে এ দেশের মানুষ কঙ্কালসার। যন্ত্র চালানোর শক্তি শেখালে এ দেশের মানুষ উন্নত হতে পারত, কিন্তু তা তারা করেনি। সে সমৃদ্ধি অর্জন করেছে জাপান, রাশিয়া, পারস্য প্রভৃতি দেশ। কেননা তারা ব্রিটিশ সভ্যতার পক্ষছায়ার আবরণমুক্ত ছিল। মূলত ইংরেজ সভ্যতার রক্ততৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে ভারতবর্ষ হয়েছিল কঙ্কালসার। তবে জীবনের প্রথমভাগে ইংরেজের মধ্যে চারিত্রিক উদারতা ও জাতিগত প্রশস্ততা দেখে, বিশেষ করে জন ব্রাইট ও এন্ড্রুজের মতো দু'চার জন মনীষীর হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখে তাদের প্রতি প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস কিছুটা রয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের বর্বরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের সভ্যতার মজ্জা থেকে মানুষকে অত্যাচার-নির্যাতনের মহামারী বের হয়ে সমগ্র মানবাত্মাকে পীড়িত করেছে। ফলে সামান্য যে বিশ্বাসটুকু তাদের প্রতি লেখকের ছিল, সেটুকুও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়।

মন্তব্য : ইংরেজদের প্রতি লেখকের আশৈশব লালিত শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিশ্বাস তাদেরই সংকীর্ণ মানসিকতা এবং স্বার্থপরতার কারণে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৫ ॥ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। [ফা. প. ২০০৯, '১৪, '১৫, '১৮]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যজগতের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে সে বিশ্বাস প্রাচ্যের ওপর প্রতিস্থাপন করেছেন। সেটা ব্যক্ত করতেই উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখক তার প্রথম জীবনে ইংরেজ ও ইংরেজ সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইংরেজদের মানবতাবোধে মুগ্ধ লেখক তাদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। এছাড়া পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিও তার মনের প্রবল আকর্ষণ ছিল। এ কারণে আজন্ম লালিত ইংরেজপ্রীতি তাকে প্রথম জীবনে পাশ্চাত্যাভিমুখী করে তুলেছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের বর্বরতা প্রত্যক্ষ করে তার ইংরেজ ভক্তিতে চিড় ধরে। ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে সমগ্র ভারতবাসীসহ রবীন্দ্রনাথও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তাই তিনি জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে ত্রাণকর্তার প্রত্যাশা করেছিলেন। তার ধারণা, কোনো এক মহামানব এ প্রাচ্যের দিগন্ত থেকেই বিশ্বমানবের মুক্তির বার্তা ঘোষণা করবেন। ইংরেজদের প্রতি বিশ্বাস হারিয়েছেন বলে লেখক সব মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাননি। কারণ তার দর্শন হলো, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই তিনি এ বিশ্বাস রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হবে, তা এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে আরম্ভ হবে। আর সেই প্রাচ্য সভ্যতার আলোয় আলোকিত হবে গোটা বিশ্ব।

মন্তব্য : প্রাবন্ধিক ইংরেজদের কার্যকলাপে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের অমানবিক শাসন-শোষণের কবল থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করার জন্য একজন মহামানবের আবির্ভাবের প্রত্যাশা করেছেন। তিনি মানুষের ওপর কখনো বিশ্বাস হারান না। কারণ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৬ ॥ আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে।

অথবা, আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে।

অথবা, অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে প্রাচ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে পূর্বদিগন্ত থেকে মানবমুক্তির বিজয়বার্তা ঘোষিত হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আলোচ্যাংশে।

বিশ্লেষণ : প্রাবন্ধিক তার প্রথম জীবনে ইংরেজ ও ইংরেজ সভ্যতাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। এর কারণ, ইংল্যান্ডের বিস্তৃত ভূমি থেকেই একদিন মানবমুক্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও সংকীর্ণ স্বার্থের কারণে ইংরেজরা নিজেদের সে খ্যাতি বেশিদিন ধরে রাখতে পারেনি। তাদের নৃশংস ব্যবহারে মানবতা

লজ্জিত হয়েছে বারবার। অথচ দেশ ও জাতির মুক্তি বয়ে আনবে আশায় প্রাবন্ধিক যে সভ্যতাকে একদিন বাহুবেষ্টনীতে বিশ্বাসে জড়িয়ে ধরেছিলেন, আজ সে সভ্যতা বিকৃত, সংকটাপন্ন। ইংরেজদের এ সভ্যতায় মানবমুক্তির উপাদান নেই। তাই বলে প্রাবন্ধিক আশাহত হননি। ইংরেজ সভ্যতার রাহুগ্রাসমুক্ত এক মানবীয় সভ্যতার স্বপ্ন দেখেন তিনি। ইংরেজদের ক্ষমতার মদমত্ততা দেখেও প্রাবন্ধিক মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। কেননা পৃথিবীর সবগুলো মানুষ একসাথে বর্বর, স্বার্থপর ও অমানবিক হয়ে উঠতে পারে না। প্রাবন্ধিকের দৃঢ় বিশ্বাস, ঝড়-ঝঞ্ঝার মহাপ্রলয়ের পর মেঘমুক্ত আকাশে যেমন সোনালি সূর্যের নির্মল আত্মপ্রকাশ ঘটে, তেমনি ইংরেজ শাসন-শোষণে জর্জরিত ভারতবর্ষেও ভাস্করসম মহামানবের আগমনে একদিন স্বাধীনতার সূর্য হাসবে। প্রাচ্যের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত পর্ণকুটিরেই সে পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন পালিত হবে। যে প্রবল প্রতাপে, দম্ভে ও অহংকারে ইংরেজ মানবতাকে চূর্ণ করে চলেছে, তার ক্ষমতা যে অপ্রতিহত নয় তা প্রমাণিত হবে। সূর্যোদয়ের দেশ থেকে সূর্য উদিত হয়ে যেমন সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে, তেমনি প্রাচ্যভূমি থেকেই নিঃস্বার্থ-নির্লোভ সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে মহামানব আবির্ভূত হয়ে সমগ্র বিশ্বমানবকে শোনাবে চরম আশ্বাসের বাণী। পৃথিবীতে গড়ে উঠবে নব সভ্যতা। প্রাচ্যের এই মানুষগুলো বঞ্চিত-লাঞ্ছিত হলেও পরাজিত নয়। এই অপরাজিত মানুষগুলো অচিরেই তাদের মহৎ মর্যাদা ফিরে পাওয়ার পথে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে।

মন্তব্য : মানুষ এক অপরাজিত শক্তি। মানবের ত্রাণকর্তার দায়িত্ব নিয়ে কোনো না কোনো সময় মহামানবের আবির্ভাব ঘটে– লেখকের চিন্তা-চেতনায় এ দৃঢ় বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৭ ॥ মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। [ফা. প. ২০১২]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু নোবেল বিজয়ী বাংলা সাহিত্যিক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে, মানুষ এবং মনুষ্যত্বের পরাজয় শাশ্বত বা চরম নয়।

বিশ্লেষণ : ভারতবর্ষে একদিন বাণিজ্যের উদ্দেশ্য নিয়ে এসে ইংরেজরা এখানকার শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নেয়। তখন ইংরেজ সভ্যতার মহত্ত্ব ও ঔদার্যের কারণে ভারতীয়রা ইংরেজ শাসনকে আশীর্বাদ মনে করে তাদেরকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। ইংরেজদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষে মুগ্ধ হয়েছিল ভারতবাসী, কিন্তু অচিরেই তাদের সভ্যতার মুখোশ খুলে যায়। নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্য দিয়ে তাদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র উন্মোচিত হয়। তারা ভারতীয়দের উন্নতির পথ রুদ্ধ করে দিয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় এ দেশের ওপর চেপে বসে। এবার ভারতীয়দের উপলব্ধি জাগ্রত হলো। একদিন যে ভারতবাসী ইংরেজের মানবতাবোধের পরিচয় পেয়ে তাদের স্বাগতম জানিয়েছিল; তারাই আজ বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। আশৈশব ইংরেজ অনুরাগী রবীন্দ্রনাথও ইংরেজদের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে পরিত্রাণের পথ সন্ধান করতে থাকেন। তিনি অপরাজিত ভারতবাসীর জয়যাত্রার সাফল্য কামনা করে নিজের ভুল স্বীকার করেন। তিনি মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহীন পরাজয়কে চরম বলে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, মানুষের পরাজয়– মনুষ্যত্বের পরাভব অন্তহীন, প্রতিকারহীন নয়। পরাজয়কে অন্তহীন ও

প্রতিকারহীন মনে করা অপরাধ। লেখক মনে করেন, ভারতবর্ষের এ পরাজয় স্থায়ী নয়। এ পরাজয়কে জয় করার মতো শক্তি ও সাহস ভারতীয়দের আছে।

মন্তব্য : মানুষ ও মনুষ্যত্বের পরাভব কখনো অন্তহীন ও প্রতিকারহীন হতে পারে না। তাই প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস, ভারতবাসীর বিজয়ও সুনিশ্চিত।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৮ ॥ এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি ও প্রাবন্ধিক বিশ্বকবিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত 'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে প্রকাশ করেছেন যে, প্রবল প্রতাপশালী কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা কখনো স্থায়ী নয়।

বিশ্লেষণ : প্রবল প্রতাপশালী ইংরেজ জাতি একসময় স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে সারাবিশ্বে নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল। ভারতবাসী একসময় ইংরেজকে সভ্যজাতি হিসেবে মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু তারা সে বিশ্বাসের মূল্য দেয়নি। তাদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শাসন-শোষণে ভারতবর্ষের মাটিতে বিচারের বাণী নীরবে-নিভৃতে কেঁদে মরেছিল। তারা ক্ষমতার মদমত্ততায় মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করে। আত্মম্ভরিতার দাপটে তারা মানুষকে করেছে অবমূল্যায়ন, আর মানবতাকে দেখিয়েছে বৃদ্ধাঙ্গুলি। তাদের শিল্প-সাহিত্যে যে ঔদার্য ও মহত্ত্বের উপকরণ আছে, তাকে তারা কলুষিত করে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছিল। প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশৈশব ইংরেজভক্ত ছিলেন, কিন্তু তার জীবন সায়াহ্নে বিশ্বমানবতার প্রতি ইরেজদের চরম অবজ্ঞা ও ঔদাসীন্য প্রত্যক্ষ করে তিনি অতিশয় মর্মাহত হন। সভ্যতার মুখোশধারী ইংরেজ জাতির অমানবিক কর্মকাণ্ডে তার সমস্ত বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে যায়। তাই জীবনের শেষ বেলায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, প্রবল প্রতাপশালীর ক্ষমতাও চিরকাল টিকে থাকে না। ক্ষমতার মদমত্ততা ও আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তা প্রমাণিত হওয়ার দিন ঘনিয়ে এসেছে। প্রকৃতই প্রাবন্ধিকের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবতায় রূপ নিয়েছিল। অচিরেই সারাবিশ্বে ইংরেজ জাতির আধিপত্য নস্যাৎ হয়ে যায়।

মন্তব্য : যত বড় ক্ষমতাশালী জাতি-গোষ্ঠীই হোক না কেন, তারা যদি অন্য জাতির ওপর আধিপত্য কায়েম করে শাসন-শোষণে মত্ত হয়, নিষ্ঠুরতায় লিপ্ত হয়, তবে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

যৌবনে দাও রাজটিকা

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৯ ॥ শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু মননশীল প্রাবন্ধিক, চলিত গদ্যরীতির জনক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার মানবজীবনে যৌবনের প্রভাব, প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও সার্থকতা বিশ্লেষণ করেছেন তার সুন্দর শব্দ গাঁথুনির মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ : বাংলাদেশের প্রকৃতি ছয়টি ঋতুচক্রে বাঁধা। তন্মধ্যে বসন্তকেই শ্রেষ্ঠঋতু বা ঋতুরাজ বলা হয়। আর এ ঋতুকে যৌবনের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু এ

ঋতুরাজ বসন্তকে পেতে হলে পৌষ-মাঘের তীব্র শীত অতিক্রম করতে হয়। শীত অতিক্রম করে প্রকৃতি যেমন বসন্তের সন্ধান পায়, তেমনি মানবজীবনও বাল্যকে অতিক্রম করে পায় যৌবনের সন্ধান। যৌবনই মানুষের মনের বসন্তকাল। যৌবনকালই হচ্ছে মানবজীবনের শক্তি, সাহস ও জাগরণের প্রতীক। মানুষের মনে যৌবনের ছোঁয়া লাগলেই সে শক্তিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমাদের দেশের জ্ঞানীদের মধ্যে এ ধারণা বিদ্যমান যে, মনের বসন্ত ঋতু এবং প্রকৃতির যৌবনকাল– দুটিই শাসনযোগ্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিকে শাসন করা যায় না। শাসন করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে যৌবনকেও উপেক্ষা করা যায় না, যৌবন তার নিজস্ব গতিতেই প্রবাহিত হয়। আমাদের দেশের একশ্রেণির জ্ঞানী ব্যক্তি এ শাশ্বত সত্য মানতে নারাজ। তারা আমাদেরকে প্রকৃতির উল্টো পথে চলার পরামর্শ দেন। ফলে আমাদের যৌবনের বাল্যাবস্থা কিছুতেই দূর হতে চায় না। দূর হলেও তা একলাফেই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়।

মন্তব্য : মানব জীবনেও প্রকৃতির বসন্তের মতো একবার যৌবনকালে বসন্ত ধরা দেয়, সে যৌবনকে মূল্যায়ন করে জাতির স্বার্থে নিয়োজিত করাতেই যৌবনের সার্থকতা নিহিত।

►► ব্যাখ্যা : ৪০ II এ দেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক এদেশীয় একশ্রেণির পণ্ডিত ব্যক্তির সমালোচনা করেছেন, যারা যৌবন সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করে থাকেন।

বিশ্লেষণ : যৌবন মানুষের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান একটি সময়। শক্তি, সাহস আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও চঞ্চলতা যৌবনের ধর্ম। যৌবন সবসময় সৃষ্টির উল্লাসে মাতোয়ারা। তবে এটা হচ্ছে মানুষের দৈহিক যৌবন, যা সময়ের ছকে বন্দি। লেখকের মতে প্রকৃত যৌবন হলো মনের যৌবন, যা সময়ের ছকে বন্দি নয়। তাই ভোগবিলাসই শুধু যৌবনের ধর্ম নয়; ত্যাগও যৌবনের অন্যতম ধর্ম। কিন্তু এদেশীয় কিছু পণ্ডিত তাদের সাহিত্যে যৌবনকে ভোগের এক ভীষণ মূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তারা মনে করেন, যৌবন মস্ত বড় একটি ফাঁড়া। তাই তারা বাল্যকাল পেরিয়ে একলাফে বার্ধক্যে পৌছে যেতে চান। তারা যৌবনের কপালে রাজটিকা দেওয়ার পরিবর্তে এর পিঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সবসময় প্রস্তুত থাকেন। কারণ তারা মনে করেন, যৌবন বলগাহীন এবং এটি কেবলই ভোগের কাল। এটি সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে পারে। তাই তারা একে শায়েস্তা করতে চান।

মন্তব্য : যৌবনকে নেতিবাচক মনোভাবে গ্রহণ না করে; বরং তাকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করলেই জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হবে। যৌবনকে শায়েস্তা করার মানসিকতা ত্যাগ করে এর কপালে রাজটিকা পরাতে হবে।

►► ব্যাখ্যা : ৪১ II যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে।

অথবা, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া– কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যে প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক আমাদের দেশের একশ্রেণির পণ্ডিতের যৌবন সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার কথা তুলে ধরেছেন এবং সেইসাথে ভ্রান্ত ধারণার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশ্লেষণ : বলা হয়– Youth is the best time of human life. Then there is freshness and vigour in mind and body. যৌবনে দেহে অফুরন্ত শক্তি ও সাহস সঞ্চার হয়। হৃদয়ও সেইসাথে বিশাল ও উদার হয়ে ওঠে। যৌবন আপন প্রবাহে গতিশীল, কিন্তু আমাদের দেশের কতিপয় পণ্ডিত যৌবনকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখেননি। যৌবনের এ অফুরন্ত শক্তিকে সেইসব পণ্ডিত খুব ভয় পান। কারণ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবনকে কেবল ভোগের কাল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তারা যৌবনকে একটা মস্ত বড় ফাঁড়া হিসেবে গ্রহণ করে এ থেকে বাঁচার প্রাণপণ চেষ্টা করে। তারা যৌবনশক্তিকে এড়িয়ে চলে, তাকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। যৌবনশক্তির বলে মানুষ আবেগে উন্মত্ত হয়ে ওঠে বলে একে তারা ভয় পান। বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের মনে জোর ও প্রাণ নেই, তাই সমাজে তারা নিরাপদ, কিন্তু যুবকের মনে শক্তি ও সাহস আছে বলে যত বিপত্তি তার বেলায়। তাই এ শ্রেণির পণ্ডিতরা যৌবনকে আপদ মনে করে এ থেকে দূরে থাকতে চান এবং তাড়াতাড়ি বাল্যকাল পেরিয়ে বৃদ্ধকাল কামনা করেন।

মন্তব্য : যৌবনশক্তিকে ভয় পেলে দেশ ও জাতির উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। কারণ যৌবনের এ শক্তি শুধু ভোগের জন্য নয়; বরং ত্যাগের জন্যও বটে। তাই আমাদের যৌবনকে ভয় পেলে চলবে না; বরং একে সমাজদেহে লালন করতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪২ ॥ আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো। [ফা. প. ২০০৯, '১১, '১৫]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক, বাংলা সাহিত্যে প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী আমাদের দেশের শিক্ষানীতি ও সমাজনীতির সমালোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : যৌবনের বিভিন্ন দিকের আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক আমাদের দেশের শিক্ষানীতি ও সমাজনীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, আমাদের দেশের শিক্ষানীতি যথার্থ শিক্ষা গ্রহণের অনুকূলে নয়। এর প্রমাণ আমাদের দেশে অহরহ পাওয়া যায়। শিক্ষানীতিতে ইঁচড়ে পাকা অবস্থা বিদ্যমান। তেমনি সমাজজীবনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। আমাদের দেশের পণ্ডিতরা যৌবনকে ধরে রাখতে চান না। তাই তারা বাল্যকাল থেকে লাফ দিয়ে বার্ধক্যে উপনীত হতে চান। আমাদের দেশের সাহিত্যে কেবল যৌবনের ভোগের রূপটিকে ভালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে, ত্যাগের রূপটিকে নয়। অন্যদিকে আমাদের সমাজনীতিও যৌবনের অনুকূলে নয়। সেখানে জাগ দিয়ে তথা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর অবস্থা বিরাজমান। কীভাবে বাল্যাবস্থা পাড়ি দিয়ে একলাফে বার্ধক্যে পৌঁছা যাবে তার প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বত্র। অথচ সমাজের উন্নয়নের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সমাজদেহে যৌবনকে লালন করা। তাতেই সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হবে।

মন্তব্য : অপরিণামদর্শী শিক্ষাব্যবস্থা ও অসুস্থ সমাজব্যবস্থা জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলের পরিবর্তে ধ্বংস ও অকল্যাণ নিয়ে আসে। তাই সমাজজীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের শিক্ষানীতি এবং সমাজনীতির পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।

⏩ ব্যাখ্যা : ৪৩ ॥ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে, ভিতরে কিছু নেই।

অথবা, এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে; অন্ত আছে, শুধু মধ্য নেই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বাংলা সাহিত্যে প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক আমাদের সমাজের নানা অসঙ্গতি এবং মানুষের নানা ভ্রান্ত ধারণা অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : যৌবন মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মূল্যবান সময়। জীবনের মধ্যবর্তীকাল এ যৌবনেই মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। যৌবন হলো প্রকৃতির বসন্তের ন্যায়। বসন্তের আগমনে প্রকৃতির সর্বাঙ্গ যেমন শিউরে ওঠে, তেমনি মানবজীবনে যৌবনের আগমনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তরেন্দ্রিয়সমূহ সজাগ, সবল ও কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেমন আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু আছে মধ্য; তদ্রূপ তারই অংশীভূত মানবজীবনের তিনটি অধ্যায়ের প্রথম ও শেষ অধ্যায় তথা শৈশব ও বার্ধক্য থাকে নির্জীব, নিষ্প্রাণ। এ সময় দেহ-মনে কোনো চঞ্চলতা ও প্রাণময়তা থাকে না। আর মধ্যবর্তী অধ্যায় তথা যৌবনে মানুষের অসাড় দেহেও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অথচ আমাদের জীবনে এ যৌবনের অস্তিত্ব ফলপ্রসূ আকারে লক্ষ করা যায় না। কারণ আমরা যৌবনকে অবহেলা ও উপেক্ষা করি। আর এজন্য দায়ী সংস্কৃত সাহিত্য। সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ নর-নারীর উঠতি বয়স তথা যৌবনকে নানা কামরসাত্মক আলোচনায় সীমাবদ্ধ করে সমাজের মধ্যে যৌবনের ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। প্রকৃত যৌবনকে তারা গোপন করেছেন। তাই আমরা যৌবনকে এড়িয়ে বাল্য থেকে একলাফে বার্ধক্যে পৌঁছে যেতে চেষ্টা করি। ফলে জীবন থেকে বাদ পড়ে যায় সবচেয়ে মূল্যবান মধ্যপর্ব যৌবনকাল। এ যেন ঠিক একটা অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মতো- যার ভূমিকা এবং উপসংহার আছে, কিন্তু মূল কথা নেই। একটি গ্রন্থের ভূমিকা এবং উপসংহার যত ভালোই হোক না কেন, মূল অংশ বা মধ্যপর্ব না থাকলে তা কিছুতেই সম্পূর্ণ গ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। তেমনি যৌবনকে বাদ দিয়ে জীবনের বাল্য ও বার্ধক্যের ওপর যতই গুরুত্ব আরোপ করা হোক, বাল্য ও বার্ধক্য যত সুন্দরই হোক না কেন, মূলকথা বা মধ্যপর্বহীন গ্রন্থের মতোই সে জীবন থেকে যাবে অসম্পূর্ণ। সে জীবন জাতীয় স্বার্থে কোনো অবদান রাখতে পারবে না।

মন্তব্য : জীবনের মধ্যভাগ যৌবন বাদ দিয়ে জীবনের পূর্ণতা কল্পনা করা যায় না। যৌবনের ধর্ম যেমন সৃষ্টির, তেমনি ধ্বংসেরও। এর সাফল্য ও ব্যর্থতা নির্ভর করে উপযুক্ত ব্যবহারের ওপর।

⏩ ব্যাখ্যা : ৪৪ ॥ যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিইনি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : যৌবনকাল যথাযথ বিকশিত হতে না পেরে কীভাবে তা বিকৃতরূপ ধারণ করে মানবদেহে মিশে থাকে, সে সম্পর্কে প্রাবন্ধিক আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। কারণ যৌবন মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়।

বিশ্লেষণ : বলা হয়– Youth is the best time of human life. জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ সময় যৌবনকালকে যথাযথ মূল্যায়ন করা না হলে তা বিকৃতরূপ ধারণ করে উল্টো আমাদের ঘাড়েই চেপে বসে। যৌবনের এরূপ বিকৃত পরিণাম সম্পর্কে আমরা অবগত নই বলে জীবনচলার পথে প্রায়ই আমাদের হোঁচট খেতে হয়। স্বাভাবিক সত্যকে বিকশিত হওয়ার পথ তৈরি করে না দিলে তা বিকৃত পথে প্রকাশ পায়। তেমনি যৌবনকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা না হলে কিংবা তাকে শাসনের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখলে তা বিকৃতরূপে সমাজজীবনকে কলুষিত করে তোলে। যৌবনের বিকৃতি প্রকাশের ফলে ব্যক্তিজীবন যেমন অনাচার ও কলঙ্কে ভরে ওঠে, তেমনি সমাজজীবনেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ বিকাশের জন্য যৌবনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যৌবনের বিকাশ ও মূল্যায়ন সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি বলে বাল্যবিবাহ, অকালমৃত্যু, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতি আমাদের সমাজকে নানা সমস্যার সম্মুখীন করে তুলেছে। তাই সমাজজীবনকে সুন্দর, পরিপাটি ও কলুষমুক্ত রাখতে যৌবনকে সমাজে বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

মন্তব্য : যৌবন হলো প্রবহমান শক্তি। তাই জীবনের প্রবাহ আটকে রাখলে বা তাকে জীবন থেকে গোপন করে রাখলে তা বিকৃতরূপ ধারণ করে প্রকাশ পাবে। তাই আমাদের উচিত যৌবনের প্রবাহে বাধার সৃষ্টি না করে এর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪৫ ॥ রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য।

অথবা, গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধের অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক এটাই তুলে ধরতে চেয়েছেন যে, জোর করে কোনো সত্য বা বাস্তব বিষয় গোপন করে রাখলে তার ফল শুভ হয় না। কারণ তখন সেটা বিকৃতরূপ ধারণ করে।

বিশ্লেষণ : যৌবনকাল আমাদের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। তথাপি একশ্রেণির লোক যৌবনকালকে ভোগের উপাদান মনে করে এবং এর অমিত তেজ দেখে একে ভয় পায়। তাই তারা যৌবনকালকে নানাভাবে গোপন রাখতে চায়। এরা বাল্যকাল পেরিয়ে একলাফে বার্ধক্যে পৌঁছে যেতে আগ্রহী। তারা যৌবনকালকে একটি ফাঁড়া বলে মনে করে, কিন্তু প্রাবন্ধিক যুক্তিসহকারে বলেন, যৌবনকালকে রুদ্ধ বা বদ্ধ রাখলে এর ফল ভালো হয় না। কারণ যে-কোনো পদার্থকে রুদ্ধ বা বদ্ধ রাখলে তার প্রাকৃতিক গুণাবলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি। তাই লেখক বলেন, গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যৌবনকালকেও গোপন করে রাখলে তা বিকৃতরূপে কুপথে প্রকাশিত হবে। তাই বাল্যকাল ও বার্ধক্যের মাঝখানে যৌবনকে অবশ্যই স্বীকার ও মূল্যায়ন করতে হবে এবং বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। কেননা, কোনো সত্য বিষয় লুকিয়ে রাখলে তার পরিণাম কখনো শুভ হয় না। এটি একসময় প্রকাশিত হবেই; বরং গোপন করে রাখার চেষ্টা করলে তা বিকৃতরূপে প্রকাশিত হবে।

মন্তব্য : কখনো সত্য ও সুন্দর জিনিস গোপন করা বা এর প্রকাশ রুদ্ধ করে রাখা ঠিক নয়। কারণ এর পরিণাম কখনো শুভ হয় না। তাই যৌবনকালকে অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে এবং এর প্রকাশ কখনো রুদ্ধ বা বদ্ধ করা যাবে না।

➤ ব্যাখ্যা : ৪৬ ॥ কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে– Literature হচ্ছে Criticism of life, ইংরেজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক, প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও সমালোচক, প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের মাঝে তুলনা করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে উঠে এসেছে জীবনের সমালোচনা, অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবনের ভোগবিলাসের রমরমা চিত্র উঠে এসেছে।

বিশ্লেষণ : প্রত্যেক ভাষা ও সাহিত্যেরই নিজস্বতা আছে। যেমন– ইংরেজি সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয় জীবন সম্পর্কে সমালোচনা, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য যৌবনের আলোচনায় ভরপুর। সেখানে আছে ভোগবিলাসের রমরমা চিত্র। তাই প্রবন্ধকার বলেছেন, ইংরেজি সাহিত্যে জীবনের সমালোচনা প্রাধান্য পায়। যেমন কোনো ইংরেজ লেখক বলেছেন– Literature is criticism of life অর্থাৎ, সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা। প্রবন্ধকার কোনো কোনো সংস্কৃত পণ্ডিতের যৌবন সম্পর্কে খণ্ড ধারণার সমালোচনা করতে এ অংশটুকুর অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে জীবনের খণ্ড অংশ তথা শুধু যৌবন সম্পর্কে রমরমা আলোচনা করা হয়েছে; পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন, মানবজীবনে যৌবনের গুরুত্ব ও প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো আলোচনা স্থান পায়নি। জীবনের অন্যান্য দিক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে সেখানে।

মন্তব্য : সংস্কৃত সাহিত্যে যুবক-যুবতির ভোগবাদী মনোভাব ব্যতীত আর কারো স্থান নেই। তাই লেখক সমাজে যৌবনের বিকৃত ব্যবহার, অবমূল্যায়ন ইত্যাদির জন্য সংস্কৃত সাহিত্যিকদের দায়ী করেছেন। কারণ এর ফলে যৌবন সম্পর্কে মানুষের মনে বিরূপ ধারণা জন্মেছে।

➤ ব্যাখ্যা : ৪৭ ॥ যে যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা ভাষার প্রথিতযশা সাহিত্যিক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রাবন্ধিক প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতদের যৌবনপ্রীতির স্বরূপ সুন্দরভাবে উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে আলোচ্য উক্তির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : যৌবনকাল মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। যৌবনে মানুষের দেহ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থাকে। সংস্কৃত সাহিত্যে মানুষের এ দৈহিক যৌবনের রূপগুণ রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্য। দীর্ঘদিন যাবৎ এ সাহিত্য পৃথিবীর এ অঞ্চলের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ সাহিত্যে যৌবনকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদিকে মানুষও সে সাহিত্য পড়ে যৌবনে ভোগবিলাসে মত্ত থাকে। ভোগবাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া যৌবনের আর কোনো ব্যবহার সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় না। পুরাণে বর্ণিত রাজা যযাতি যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তিনি যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। আপন পুত্রদের কাছে তিনি যৌবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার জরা আপন দেহে ধারণ করে নিজের

যৌবন পিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন। ভোগবাদী যযাতি সে যৌবন গ্রহণ করে পুনরায় ভোগলালসায় মত্ত হয়ে যান। ভোগের নিমিত্ত যে যৌবন যযাতি আপন পুত্রের কাছে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন, সংস্কৃত কাব্যে সে যৌবনেরই গুণকীর্তন করা হয়েছে। মূলত দেহের এ যৌবন প্রকৃত যৌবন নয়; বরং মনের যৌবনই হলো প্রকৃত যৌবন, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে এ যৌবন নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি।

মন্তব্য : সংস্কৃত কবি সাহিত্যিকরা দৈহিক যৌবনের পূজারি। এজন্য তারা মানসিক যৌবন সম্পর্কে অন্ধ ছিলেন। তাই তাদের সাহিত্যে কেবল যৌবনের খণ্ডিত রূপ– কামলীলা, প্রেমলীলা ইত্যাদির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

ব্যাখ্যা : ৪৮ ॥ সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম।

অথবা, বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না। [ফা. প. ২০১৯]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এখানে যৌবনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার পাশাপাশি যৌবন সম্পর্কে সংস্কৃত কবি-সাহিত্যিকদের ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃত সাহিত্য মানুষের দৈহিক যৌবনের প্রেমলীলায় ভরা। তাই সংস্কৃত সাহিত্যকে বলা হয় যৌবনের সাহিত্য। যুবক-যুবতি, কপোত-কপোতী ছাড়া সে সাহিত্যে আর কারো স্থান নেই। এ সাহিত্যে শুধু ভোগবাদী যৌবনের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। ভোগের চিত্র বা আলোচনা ছাড়া সংস্কৃত কাব্য বা নাটকে ত্যাগ ও অন্য কোনো জীবনদর্শনের ছবি খুঁজে পাওয়া যায় না। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন আর কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে রূপেগুণে ও শক্তিতে অনন্য এবং সমসাময়িক। তবে তাদের জীবনের দর্শন ছিল ভিন্ন। উদয়ন যেখানে ছিলেন ভোগের অবতার, সিদ্ধার্থ সেখানে ছিলেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। অন্যদিকে সিদ্ধার্থের জীবনের ব্রত ছিল মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং মোহ নাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। সংস্কৃত সাহিত্যিকগণ সমসাময়িক এ দুই যুবরাজের মধ্যে উদয়নের জীবনব্রতকেই যৌবনের ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে তার গুণকীর্তন করেছেন। ফলে উদয়নের কথা অধিকার করেছে সংস্কৃত সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান। পক্ষান্তরে বুদ্ধ চরিত্রের কোনো স্থান হয়নি সংস্কৃত সাহিত্যে। বুদ্ধ যেহেতু ত্যাগের বাণী শুনিয়েছেন সবাইকে, তাই যৌবনের পূজারি সংস্কৃত কবি-সাহিত্যিকগণ বুদ্ধের জীবনদর্শনকে তাদের কাব্যাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেননি। আর এখানেই সংস্কৃত কবিগণ যৌবনধর্মের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সত্য উপেক্ষা করে গেছেন। তারা শুধু ভোগকেই যৌবনের ধর্ম ভেবেছেন, আর ত্যাগকে ভেবেছেন বার্ধক্যের ধর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভোগের মতো ত্যাগও যৌবনের ধর্ম। ত্যাগ বার্ধক্যের ধর্ম হতে পারে না। কারণ বার্ধক্য যদি কিছু গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে তা কোনোকিছু বর্জনও করতে পারে না।

মন্তব্য : যৌবন যেমনিভাবে ভোগ করতে পারে ঠিক তেমনি ত্যাগও করতে পারে, কারণ দুটিই যৌবনের ধর্ম। অন্যদিকে বার্ধক্য ভোগও করতে পারে না, ত্যাগও করতে পারে না।

» ব্যাখ্যা : ৪৯ ॥ আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু সুসাহিত্যিক, প্রমিত গদ্য চলিতরীতির প্রবর্তক ও প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সংস্কৃত কাব্য, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি যৌবনের রমরমা আলোচনায় মুখর। প্রবন্ধকার এ সত্য গোপন না করে সাহসের সাথে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করাকে সুনীতি হিসেবে আলোচ্যাংশে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্লেষণ : সত্য কখনো গোপন থাকে না। তথাপি সত্য গোপন করে রাখার চেষ্টা কখনো সুনীতি হতে পারে না। আর সত্য প্রকাশ করা দোষের কিছু নয়; বরং এটি অত্যন্ত উত্তমকাজ। প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এ কথাই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তবে তিনি এ অভিমতের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য শুধু যৌবনের রমরমা আলোচনায় ভরপুর। তাতে জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা বা অন্য কোনো ভালো জীবন-দর্শনের লেশমাত্র নেই। শুধু যুবক-যুবতির লীলাই তাতে স্থান পেয়েছে। অন্য কোনো আলোচনা তাতে দেখা যায় না। লেখক আরো বলেন, সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বয়কট করা বা তার সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আমি এর সমালোচনা করিনি; বরং শুধু সত্য কথা প্রকাশ করার জন্য তার আলোচনা করেছি। কারণ সত্য প্রকাশ করা দুর্নীতি নয়।

মন্তব্য : সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা করে প্রাবন্ধিক অকপট সত্য প্রকাশে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কাউকে হেয় করা তার উদ্দেশ্য নয়। আর অকপট সত্য প্রকাশ করা সুনীতির পরিচায়ক বটে।

» ব্যাখ্যা : ৫০ ॥ যাঁরা স্ত্রী জাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ, এর প্রমাণ জীবন ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়।

অথবা, এ শ্রেণির লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

অথবা, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা বাংলা সাহিত্যিক, প্রখ্যাত সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন, ভোগবাদীরা দৈহিক যৌবনের পূজারি। তারা নারীদের ভোগের সামগ্রী মনে করেন, কিন্তু তারাই যৌবন ফুরিয়ে গেলে নারীদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হন।

বিশ্লেষণ : যারা স্ত্রীজাতিকে কেবল ভোগবিলাসের সামগ্রী মনে করেন তারাই যে যৌবন ফুরিয়ে গেলে স্ত্রীর নিন্দায় ওস্তাদ হয়ে ওঠেন, এর প্রমাণ সমাজ ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। চরম ভোগবিলাস চরিতার্থ করতে না পেরে এরা শেষ বয়সে স্ত্রী জাতির ওপর গায়ের ঝাল ঝাড়েন। লেখকের মতে, যারা এমন করেন তারা মানসিক যৌবনের অধিকারী নন; ফলে তাদের দৈহিক যৌবন অতি দ্রুতগতিতে ফুরিয়ে যায়। তারা ভোগ করতে না পেরে স্ত্রী-জাতির প্রতি ক্ষিপ্ত থাকেন। যারা স্ত্রী-জাতিকে মাল্যচন্দন হিসেবে ব্যবহার করেন, তারা স্ত্রীলোক বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাকে মাল্য চন্দনের মতো ধুলায় নিক্ষেপ করেন এবং পদদলিত

করতেও সংকুচিত হন না। প্রথম বয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষ বয়সে জীবন তেতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণির লোকের হাতে শৃঙ্গার শতকের পরেই বৈরাগ্য শতকের গান রচিত হয়। একই কারণে যারা যৌবনকে কেবল ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাদের মুখে যৌবনের নিন্দা লেগেই থাকে। যারা যৌবন-জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন তারা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের ওপর তাদের রাগের কারণ হলো– তা সহজে ফুরিয়ে যায়। তাই বলা যায়, যৌবনকে যারা ভোগ-লালসার ক্ষেত্র বলে মনে করেন তারাই যৌবনের নিন্দায় পঞ্চমুখ।

মন্তব্য : যৌবনকে যারা কেবল ভোগের সামগ্রী হিসেবেই গ্রহণ করে, যৌবন ফুরিয়ে গেলে তাদের কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক। তাই তারা যৌবনের নিন্দায় পঞ্চমুখ থাকে। কারণ বাহ্যিক ভোগবিলাস শেষে তারা নিজেরা তখন যৌবনশূন্য।

ব্যাখ্যা : ৫১ ॥ যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

উৎস : সংকলিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু সুসাহিত্যিক, প্রখ্যাত প্রবন্ধকার ও সাহিত্য সমালোচক এবং বাংলা প্রমিত গদ্য চলিতরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আমাদের দৈহিক যৌবনকে স্থায়ী করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক এ উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখকের মতে যৌবন দু'রকম। একটি দৈহিক যৌবন, অন্যটি মানসিক যৌবন। দৈহিক জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মনের যৌবন দীর্ঘস্থায়ী। দৈহিক যৌবনের কাজ উপভোগ করা। দৈহিক যৌবন অন্যের দেহে সঞ্চার করা যায় না। তাই এটি ক্ষণস্থায়ী এবং বয়সের ছকে বাঁধা। ভোগবিলাসীরা এ যৌবন পেতে উদগ্রীব। যৌবনকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই হয়তো একদিন একে পেছনে টেনে এনে কৈশোরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিজের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্যই যৌবন শৈশবের ওপর আক্রমণ করে। প্রাচীনকালের বাল্যবিবাহ বা গৌরীদানের মূলে হয়তো যৌবনের এ মেয়াদ বাড়ানোর ইচ্ছেটাই প্রবল ছিল। যৌবনে যে নারীকে ভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখে তার সুধা পান করেছে, সে-ই আবার বিগত যৌবনে নারী জাতির ওপর ঝাল ঝেড়েছে। কারণ তার আর ভোগ করার ক্ষমতা নেই। যারা যৌবনকে কেবল ভোগের কাল মনে করে তারাই শেষে যৌবনকে নিন্দা করে। কারণ তারা যৌবনকে ধরে রাখতে পারে না। যৌবন একবার গত হলে আর ফিরে আসে না। এমনকি যে যযাতি তার সন্তান পুরুর কাছ থেকে যৌবন ভিক্ষা নিল, তারও যৌবনের ওপর অভিযোগ, তা অনিত্য। যৌবন যে ক্ষণস্থায়ী তার আক্ষেপ এ দেশের কাব্য ও সংগীতে সুস্পষ্ট। তাই এ ক্ষণস্থায়ী যৌবনকে স্থায়ী করার চেষ্টা সেসব মানুষের অদম্য, যারা যৌবনকে শুধু ভোগসর্বস্ব মনে করে।

মন্তব্য : যৌবন মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়, কিন্তু এ যৌবন ক্ষণস্থায়ী। এটি বয়সের ফ্রেমে বাঁধা। বয়স ফুরিয়ে গেলে যৌবনও ফুরিয়ে যায়। তাই একে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য মানুষের চেষ্টা চিরন্তন।

ব্যাখ্যা : ৫২ ॥ জীবনের গতিটি উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্য জগতের অন্যতম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার সুন্দর শব্দচয়নের মাধ্যমে আমাদের সমাজে যৌবনকে স্থায়ী করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টার সমালোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ সময় হলো যৌবনকাল, কিন্তু আমাদের দেশে ও সমাজে যৌবনকাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। কারণ এখানে শারীরিক যৌবনকেই প্রকৃত যৌবন বলে মনে করা হয়, আর তাই শারীরিক যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করার নানা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। লেখক মনে করেন, আমাদের সামাজিক মূল্যবোধে যৌবনের প্রকৃত স্থান নেই। যৌবন এখানে কেবলই ভোগের সামগ্রী। সমাজে যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য কিছু ভ্রান্ত চেষ্টা পরিচালিত হয়। যেমন বাল্যবিবাহ প্রথা শুরু হওয়ার কারণ যৌবনকে ধরে রাখার অপচেষ্টা। প্রাবন্ধিকের মতে, যৌবনের মতো এরূপ শক্তিকে যে বাল্যবিবাহ দিয়ে বাড়ানো সম্ভব নয়, তা অনেকেরই অজানা। আমাদের সমাজ এমন অবুঝ আর অজ্ঞ যে, এখানকার মানুষ প্রকৃত যৌবনকে বুঝতেই পারেনি। এমনকি তারা তা বুঝতেও নারাজ। লেখক প্রমথ চৌধুরী আমাদের সমাজের এ ভ্রান্ত প্রচেষ্টা ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর এদিকে লক্ষ করেই তিনি বলেছেন, জীবনের গতিকে উল্টো দিকে ফেরাবারও একটা আর্ট আছে।

মন্তব্য : আমাদের সমাজব্যবস্থায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে গতি উল্টো দিকে প্রবাহিত হয়। যেমন যৌবনকে ধরে রাখার জন্য উল্টো পথ বেছে নিয়ে ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। এর কারণ, আমরা প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে বা অনুধাবন করতে পারি না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৩ ॥ দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র।

অথবা, একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই, কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের একজন মননশীল প্রাবন্ধিক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক আমাদের দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবনের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করে মানসিক যৌবনকে প্রকৃত যৌবন বলে অভিহিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবনের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও প্রবন্ধকার এ দুটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। দৈহিক যৌবন হলো ভোগসর্বস্ব, আর মানসিক যৌবন হলো প্রকৃত যৌবন। দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবনের মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও দুটি স্বতন্ত্র। দেহের যৌবনের কোনো সামাজিক বিকাশ ও স্থায়িত্ব নেই। বয়স ফুরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এ যৌবনও শেষ হয়ে যায়। বয়সে যুবক হলেই কারো মধ্যে যৌবনের তেজ ও শক্তি আছে এ কথা বলা যায় না। এমন অনেক যুবক আছে যাদের মনের জোর নেই, শক্তি ও সাহস নেই। আবার এমন অনেক প্রবীণ আছে যাদের মনে তেজ আছে, আছে শক্তি ও উদ্যম। বয়সে প্রবীণ হলেও এরা বৃদ্ধ নয়, আর মানসিক যৌবন কোনো নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ নয়। দেহ নিস্তেজ হলেও এ যৌবন অক্ষয় ও শক্তিমান থেকে যায়। মানসিক যৌবন স্থবির সমাজকে সচল ও গতিশীল করে এর উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। এ মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একজনের দেহের যৌবন অন্যজনের দেহে সংক্রমিত করা যায় না, কিন্তু একজনের মনের যৌবন লাখো মানুষের মনে সঞ্চারিত করা যায়। সুতরাং যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে,

সে সমাজই প্রকৃত যৌবনের অধিকারী। দেহের যৌবন ভোগের আর মনের যৌবন ত্যাগ ও কর্মের।

মন্তব্য : দেহের যৌবন ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য। আর মানসিক যৌবন সৃষ্টিশীল ও দীর্ঘস্থায়ী। দেহের যৌবন অন্যের মাঝে সংক্রমণ করা না গেলেও মনের যৌবন সংক্রমণ করা যায়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৪ ॥ কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়।

অথবা, সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক ও প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় উক্তির মাধ্যমে প্রবন্ধকার যৌবনের ধর্ম এবং প্রাণের ধর্ম ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশ্লেষণ : জড় পদার্থের প্রাণ নেই, প্রাণীরই প্রাণ আছে। তাই প্রাণই প্রাণীর জীবনপ্রবাহ রক্ষা করে। পাশাপাশি নতুন নতুন অনুপ্রেরণা দান করে তাকে গতিশীলও রাখে। দেহ ও মনের মধ্যে এক আন্তঃসম্পর্ক বিদ্যমান। প্রাণশক্তিই জীব ও জড়ের মাঝে সংযোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে জড় ও চৈতন্যের মিল দেখা যায় না। প্রাণের পায়ের নিচে জড়জগৎ আর মাথার ওপর মনোজগৎ, কিন্তু এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও প্রাণের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে যা সবার কাছে প্রত্যক্ষ নয়। তা হলো জীবনের পরিবর্তনশীলতা। প্রাণ প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে। জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে এসে প্রাণের বিচিত্র প্রকাশ ঘটে। প্রাণ নিজের নিয়মে নিজেকে গড়ে তোলে, নিত্যনতুন রূপ ধারণ করে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণ অধোগতিপ্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিংবা উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। প্রাণ জড় পদার্থ নয় বিধায় সে প্রকৃতিকে নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর করে তোলে, সাজিয়ে তোলে নানা রূপে। প্রাণের প্রকৃত ধর্ম হলো সে কোনো বিশেষ রূপ বা রসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। কেননা প্রাণ পুরাতনকে, জড়তাকে আশ্রয় করে থাকতে চায় না। তাই প্রাণের প্রধান ধর্ম যৌবন।

মন্তব্য : গতি ও পরিবর্তনশীলতাই জীবন। নব নব রূপান্তরের মাধ্যমে প্রাণের বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে, কিন্তু প্রাণের ধর্ম সমাজের সবার কাছে একইভাবে ধরা দেয় না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৫ ॥ মনকে প্রাণের পরিণতি ও জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার প্রাণের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জড়, মন ও প্রাণের সংযোগ সম্পর্কে সুন্দর মতামত উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রাণ থাকলে যেমন প্রাণী হয়, তেমনি মন থাকলেই মানুষ হওয়া যায়। সব প্রাণীরই প্রাণ আছে, কিন্তু সব প্রাণীর মন নেই। মন আছে শুধু মানুষের। মন বলতে মানুষের বোধশক্তিরই একটি বিশেষ দিককে বোঝায়। মনবিহীন মানুষ জড় পদার্থের মতো। জড় পদার্থের অবস্থিতি আছে কিন্তু বিকাশ নেই। এ জড়তা হলো প্রাণের বিকৃতিরই

অন্য একটা রূপ। জরাগ্রস্ত মানুষ প্রাণের বিস্তার ঘটাতে পারে না। কারণ নতুনকে সে বরণ করতে চায় না, কিন্তু প্রাণের ধর্ম পুরাতনকে আঁকড়ে ধরা নয়; নতুনকে স্বাগত জানানো। প্রাণের পরিণতি উন্নত একটি মন তৈরি করে। প্রাণের স্বাভাবিক গতি মনোজগতের দিকে। প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাগ্রস্ত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়। বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন– প্রাণীজগৎ রক্ষার জন্য নিত্যনতুন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং তার জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগৎ এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্যনব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন মানসিক যৌবন। তাই বলা হয়, মনই হলো প্রাণের পরিণতি।

মন্তব্য : মন সজীব ও সচল আর জড় পদার্থ নির্জীব ও গতিহীন, মন প্রাণের পরিণতি এবং জড়তা প্রাণের বিকৃতি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৬ ॥ পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা।

অথবা, মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক– প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি –এই বিশ্বাস।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সাহিত্য সমালোচক, বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক বার্ধক্য এবং মানসিক যৌবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে প্রাণশক্তিকে দৈবশক্তি হিসেবে বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : যৌবন ও বার্ধক্যের সাধারণ মাপকাঠি হলো বয়স, কিন্তু প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী সে কথা বিশ্বাস করেন না। তিনি মনে করেন, পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য বা জড়তা, আর নতুনকে বরণ করা যৌবনের ধর্ম। বয়সে বৃদ্ধ হলেই কেউ বৃদ্ধ হয়ে যায় না, যদি তার মধ্যে মানসিক যৌবন থাকে। যৌবনের অগাধ প্রাণশক্তি আছে বলে পরিবর্তনকে সে অতি সহজেই ধারণ করতে পারে, কিন্তু বার্ধক্য এ পরিবর্তনশীলতাকে ভয় পায়। তাই জীর্ণ ও পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে সে নিজেকে বাঁচাতে চায়। প্রকৃতপক্ষে যুবক বা বৃদ্ধ যে-ই হোক না কেন, তার মধ্যে প্রাণশক্তি থাকতে হবে। প্রাণশক্তিকে দৈবশক্তি হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে। যার যত প্রাণশক্তি আছে তার তত দৈবশক্তি আছে– এ বিশ্বাস যদি স্বীয় মনে লালন করা যায়, তাহলে কারো মনে বয়সের ভারে বৃদ্ধ হওয়ার বেদনা থাকবে না। আবার বয়স কম হলে কেউ নিজেকে যুবক বলে দাবি করতে পারবে না। যৌবন হচ্ছে এক সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন শক্তি। যৌবন যার মধ্যে আছে তার শক্তি অপরিসীম; সে পুরাতনকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে না ধরে নব নব শতাব্দীতে নব নব সৃষ্টি দিয়ে, আবিষ্কার দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে ধরণিকে সমৃদ্ধ করে। পক্ষান্তরে বার্ধক্য পুরাতনকে আঁকড়ে থাকে, সৃষ্টিবিমুখ হয় এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। যৌবন ও বার্ধক্যের এ পার্থক্য অনস্বীকার্য।

মন্তব্য : যার মধ্যে যৌবন আছে তার মধ্যে দৈবশক্তিও আছে। আর অমিত প্রাণশক্তিই একজন বৃদ্ধকে মানসিক যৌবনে এবং এর অভাবে যুবককে বৃদ্ধে পরিণত করে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৭ ॥ যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও বাংলা প্রমিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী মানসিক যৌবনের প্রশংসা করেছেন এবং সমাজেও এ যৌবন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন।

বিশ্লেষণ : সমাজ রাষ্ট্রের একক। আর ব্যক্তি সমাজের একক। যদি কোনো সমাজে একাধিক ব্যক্তির মানসিক যৌবন থাকে তবে বুঝতে হবে, সে সমাজে যৌবন আছে। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ মানসিক যৌবনের অধিকারী, সে সমাজেই প্রকৃত যৌবন বিদ্যমান। সমাজে দেহের যৌবনের সাথে সাথে মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। তখন ব্যক্তির দৈহিক যৌবনে ভাটা পড়লেও সামাজিক যৌবনে কখনো ভাটা পড়ে না, তা অটুট থাকে। সামাজিক জীবনে যৌবন প্রতিষ্ঠার উৎস হলো মানসিক যৌবন। যে সমাজ মানসিক যৌবনপ্রাপ্ত হয় সে সমাজে ফাগুন চিরদিন বিরাজ করে। অর্থাৎ যে সমাজে মানসিক যৌবন যত বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে, সে সমাজের উন্নতি ও ঐশ্বর্য তত বেশি স্থায়িত্ব লাভ করে। এভাবে সমগ্র জীবনপ্রবাহে যৌবনকে সংক্রমিত করা যায়। আর এ মানসিক যৌবন সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করাই মানবজীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। একাধিক মানুষের সমন্বয়ে সমাজ গড়ে ওঠে। যে সমাজের অধিবাসীরা মানসিক যৌবনের অধিকারী, সে সমাজজীবন অধিক কর্মমুখর এবং সে সমাজেই উন্নতি ও সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগে। আসল কথা হলো, মানসিক যৌবন সমাজে একবার প্রতিষ্ঠা পেলে তা সহজে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। তাই প্রাবন্ধিক মনে করেন, সমাজকে দ্রুত উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সমাজজীবনে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

মন্তব্য : দৈহিক যৌবন শুধু ভোগের জন্য নয়, আর মানসিক যৌবন তো নয়ই; যৌবনের এ উভয় দিককেই আমরা ইচ্ছে করলে ত্যাগে ব্যাপৃত করতে পারি। তাহলেই সমাজে এবং রাষ্ট্রে শান্তি-সমৃদ্ধি আসবে।

ব্যাখ্যা : ৫৮ ॥ ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, স্বনামধন্য সাহিত্য সমালোচক ও বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য প্রবন্ধাংশে প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী আমাদের সমাজজীবনে মানসিক যৌবনের প্রভাব ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রবন্ধকারের মতে যৌবন দু'প্রকার– একটি হলো দৈহিক যৌবন অন্যটি মানসিক যৌবন। দৈহিক যৌবন সময়ের ফ্রেমে বাঁধা, তাই এটি ক্ষণস্থায়ী। সময় শেষ হলেই এ যৌবন ফুরিয়ে যায়, কিন্তু মানসিক যৌবন সময়ের বা কালের ছকে বন্দি নয়, তাই এটি দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে দৈহিক যৌবন একবার আসে এবং তা একসময় বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু সমাজে মানসিক যৌবন একবার প্রতিষ্ঠা করা গেলে তা আর কখনো ফুরিয়ে যাবে না। কারণ মানসিক যৌবন ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে প্রবহমান বলে তা দীর্ঘস্থায়ী। তাই প্রবন্ধকার বলেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না, কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করে। ব্যক্তিগত জীবনে যৌবনের প্রভাব সাময়িক, কিন্তু সমগ্র সমাজে এ যৌবন দীর্ঘস্থায়ী। তাই সমাজের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কর্মমুখরতার জন্য সামাজিক দেহে যৌবন অত্যাবশ্যক।

মন্তব্য : দৈহিক যৌবন ক্ষণস্থায়ী। তাই এটা একবার ফুরিয়ে গেলে শত চেষ্টা করেও ফিরিয়ে আনা যায় না, কিন্তু মানসিক যৌবন দীর্ঘস্থায়ী, এর কোনো মৃত্যু নেই। সমাজদেহে এ যৌবন চিরস্থায়ীভাবে বিরাজ করতে পারে।

» ব্যাখ্যা : ৫৯ ॥ এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন তাকে জড়ই বলো আর চৈতন্যই বলো, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বিরচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক যৌবন বন্দনামূলক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার আলোচ্যাংশে জড়বাদী ও মায়াবাদী ব্যক্তিদের সমালোচনা করে তাদের একই গোত্রভুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : পৃথিবীতে জড়বাদী ও মায়াবাদী– এ দুটি সম্প্রদায় সর্বত্র বিরাজমান। তারা উভয়েই যৌবনকে স্বাগত জানাতে কুণ্ঠিত। মায়াবাদীরা জীবনকে মায়া বলে অভিহিত করে। আর জড়বাদীরা জীবনকে জড় বস্তু মনে করে। তাই তারা জীবনের প্রাণচঞ্চলতাকে অনাবশ্যক বলে মনে করে। তারা মনে করে, স্থিরতা ও জড়তাই হচ্ছে জীবনের বৈশিষ্ট্য। জীবন যে আসলে জড় নয়; প্রাণশক্তির বিকাশ ঘটিয়ে জীবনকে যে সচল করা যায়, একথা তারা মানতে নারাজ। জড়বাদী এবং মায়াবাদীরা যে জড় ও চৈতন্যের কথা বলে, ভিন্ন নামে আখ্যায়িত হলেও তা প্রকৃত প্রস্তাবে একই জিনিস, উভয়ের বৈশিষ্ট্যই এক। জড়বাদীরা পৃথিবীর কোনোপ্রকার পরিবর্তনশীলতা সমর্থন করে না। আর মায়াবাদীরা পৃথিবীকে মায়া বা মোহ বলে মনে করে। তারা কেউ বিশ্বের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। পৃথিবীর প্রতি এ অনাসক্ত মনোভাব তাদের স্থির এক জড়জীবনের দিকে নিয়ে চলে।

মন্তব্য : জড়বাদী ও মায়াবাদী উভয়েই এক ও অভিন্ন, যদিও নামে ভিন্ন মনে হয়। তারা যৌবনকে জীবনের একটা ফাঁড়া বা অভিশাপ মনে করে তা থেকে দূরে থাকতে চায়। তাদের এ ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে লেখক যৌবনের ললাটে রাজটিকা পরাবার প্রস্তাব করেছেন।

বিদায় হজ

» ব্যাখ্যা : ৬০ ॥ সকলেই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সকলের মুখে একই 'লাব্বায়েক' ধ্বনি। [ফা. প. ২০০৬, '১৯]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রাবন্ধিক এখানে একক মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয় দিয়ে অভিন্ন ধ্বনির মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ ইবাদত পালন প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) যখন দশম হিজরীতে মক্কায় উপস্থিত হন, তখন তাঁর সাথে প্রায় দু'লাখ অনুসারী ছিলেন। তাঁরা কাবা প্রদক্ষিণ করার সময় আবেগ-আপ্লুত স্বরে উচ্চারণ করছিলেন– 'লাব্বায়েক' প্রভু হে! আমি হাজির। হজের সময়ে একখণ্ড সাদা চাদর ও একখণ্ড তহবন্দ ছাড়া আর কোনো বস্ত্র পরিধানের নিয়ম নেই। পা খালি, মাথা খালি। আমীর, গরিব, জ্ঞানী, মূর্খ সবাই এক আদমের সন্তান। সেদিন সবাই মিলে যেন তাঁদের মহান স্রষ্টা এক আল্লাহর কাছে প্রণতি জানাতে একই কথা ও সুরের মূর্ছনায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল। ইসলামের সাম্যব্যবস্থা প্রার্থনার জগতেও সক্ষম সক্রিয়। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। সাম্যের এ অনুপম দৃশ্য একান্তই ইসলামের; ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিতকরণে অনন্য উৎসের। একই ধ্বনি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আকাশবিদারী আওয়াজ তুলে তারা একই প্রভুর মহিমা প্রকাশ করে।

মন্তব্য : হজ মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের মহাসম্মেলন। প্রতিবছর লাখ লাখ মুসলমান হজ পালন করতে কাবা শরিফে যায়। তাই ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলোর মধ্যে হজ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬১ ॥ ইহা ছাড়িয়া দিলে হজের মূল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হইয়া যায়। [ফা. প. ১৯৯০]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক হজের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর সুন্দর শব্দ চয়নের মাধ্যমে।

বিশ্লেষণ : মহানবি (স) বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের মহান আদর্শ সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের জয়গান গেয়েছেন। হজের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলমানরা একত্রিত হয়। লাখ লাখ মুসলিমের পদধ্বনিতে কেঁপে ওঠে কাবা প্রাঙ্গণ। কারণ হজ মুসলিমদের মহামিলনের নাম। কাজেই এখানে এসে যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে। কে কোন বংশের, কোন দেশের ওটা কোনো পরিচয় নয়। কেননা রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। তাই সবাই একই পতাকাতলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ অন্যতম। হজের মূল উদ্দেশ্যগুলোর অন্যতম হলো মুসলমানদের মধ্যে সাম্য ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা। তাই ভ্রাতৃত্বের চর্চা না হলে হজের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

মন্তব্য : ইসলামে প্রাণহীন ইবাদত অনুষ্ঠানের কোনো গুরুত্ব নেই। তাই হজের যে সকল ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুফল রয়েছে, সেগুলোর চর্চা না হলে হজ পালনের কোনো মূল্য থাকে না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬২ ॥ মূর্খতা-যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত-মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হইয়া গেল। [ফা. প. ১৯৯৩]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন, মহানবি (স) তাঁর বিদায় হজের ভাষণে জাহেলিয়া যুগের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস এবং অনাচারের মূলোৎপাটন করেছেন।

বিশ্লেষণ : মহানবি (স) দশম হিজরি সনের ৯ যিলহজ শুক্রবার আরাফার দিন দুপুরের পর আরাফাতের জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দু'লাখ সাহাবির সমাবেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, সেটাই 'বিদায় হজের' ভাষণ নামে পরিচিত। বিদায় হজের ভাষণে মহানবি (স) জাহেলিয়া যুগের বর্বরতা, কুসংস্কার এবং যাবতীয় অন্ধ বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেন। তিনি ঘোষণা করেন, ইসলামে বর্বরতা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। রাসূলের এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলামের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

মন্তব্য : অনাচার, কুসংস্কার আর বর্বরতার কারণে সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। তাই ইসলাম এগুলো পরিহার করতে জোর তাগিদ দিয়েছে।

» ব্যাখ্যা : ৬৩ ॥ সাবধান। ধর্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদিগের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। [ফা. প. ২০০২, '১০]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বিশিষ্ট সাংবাদিক, স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক ও প্রথিতযশা সাহিত্যিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক যে বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হলো, মহানবি (স) ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি না করতে জোর তাগিদ দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : Islam is the complete code of life. তাই ইসলাম অন্যের ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেছে। শান্তির দূত রাসূল (স) বিদায় হজের ভাষণে সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দৃঢ়চিত্তে এক অখণ্ড ভ্রাতৃসংঘ গড়ে তোলার আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, ইসলামকে সত্য জেনে নিজ ধর্মে অবিচল থাকো।" যার ইচ্ছা সে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করবে। এজন্য কারো ওপর জোর-জবরদস্তি করা যাবে না। এছাড়া ইসলাম উদারনীতির অনুসারী। এ নীতি বিসর্জনপূর্বক বাড়াবাড়ি করে পৃথিবীর অনেক জাতি পূর্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই নবিজি ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

মন্তব্য : ধর্ম প্রচারে সহিষ্ণুতা অবলম্বন একান্ত কর্তব্য। এ ব্যাপারে অহেতুক বাড়াবাড়ি, জোর করে কারো ওপর ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা কঠোর অপরাধ।

» ব্যাখ্যা : ৬৪ ॥ নিশ্চয়ই এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভ্রাতা, আর সকল মুসলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। [ফা. প. ১৯৯২]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, স্বনামধন্য সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক ইসলামের মৌল বৈশিষ্ট্যের অন্যতম ভ্রাতৃত্বের স্বরূপ চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : হযরত মুহাম্মদ (স) বিদায় হজে আরাফাতের ময়দানে মানবকল্যাণের মৌলনীতি ব্যাখ্যা করে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এ ভাষণে ইসলামের অনেক মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্নিহিত ভাব ও সৌন্দর্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তার অন্যতম হলো ইসলামি ভ্রাতৃত্ব। ইসলামই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পৃথিবীর যে-কোনো দেশে যে-কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভাই ভাই। তারা সবাই একই আদর্শের সন্তান। আদর্শগত দিক দিয়ে তাদের সবার মাঝে রয়েছে অবিচ্ছেদ্য মিল। তাই বলা যায়– No distance breaks the tie of blood, brothers are brothers evermore.

মন্তব্য : ইসলামের মহান শিক্ষা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ বাস্তবায়ন বর্তমান বিশ্বে একান্ত প্রয়োজন। বৈষম্যহীন, সুন্দর, শান্তিময়, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বিকল্প নেই।

» ব্যাখ্যা : ৬৫ ॥ যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিবর্তে নিজকে অন্য বংশের বলিয়া প্রচার করে তাহার উপর আল্লাহর, তাঁহার ফেরেশতাগণের ও সমগ্র মানব জাতির অনন্ত অভিসম্পাত। [ফা. প. ১৯৯৩, '৯৯]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বিশিষ্ট সাংবাদিক, স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এখানে বিদায় হজ উপলক্ষে রাসূলের বাণীতে আত্মপরিচয় গোপন করে মিথ্যা পরিচয়ে যে ব্যক্তি নিজের মর্যাদা বাড়াতে চায়, তার পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : বিদায় হজের ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এ ভাষণে মহানবি (স) সুন্দর সুশীল সমাজ গঠনে বেশকিছু প্রয়োজনীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আদর্শ রাষ্ট্র, পরিবার ও সমাজ গঠনে এ ভাষণের অবদান অপরিসীম। রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবারের পাশাপাশি ব্যক্তির আত্মোন্নয়নের প্রয়োজন সর্বাধিক। প্রত্যেক মানুষকে মনে রাখতে হবে, সে সৃষ্টির সেরা জীব। বংশ নয়, কর্মের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে হবে। যারা হীনম্মন্যতাবশত আত্মপরিচয় গোপন করে বংশ পরিচয় লুকিয়ে নিজেকে অন্য বংশের পরিচয় দিয়ে গৌরব অনুভব করে, তারা অভিশপ্ত। যে নিজের সংস্কৃতি, বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতির চর্চা করে, সেও অনুরূপ অভিশপ্ত। তার প্রতি আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানবজাতির ঘৃণা ও অভিশাপ বর্ষিত হবে।

মন্তব্য : আত্মপরিচয় গোপন করা হীনম্মন্যতার পরিচায়ক। যারা এ রকম হীনম্মন্যতা প্রদর্শন করে তারা ইহ ও পরকালে অভিশপ্ত।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৬ ॥ হযরতের বদনমণ্ডল ক্রমশঃই স্বর্গের পুণ্যপ্রভায় দীপ্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে ক্রমশঃই দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রবন্ধকার আকরম খাঁ আলোচ্যাংশে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম ধর্ম প্রচারে হযরতের মনোশান্তি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : হযরত মুহাম্মদ (স)-কে সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে বলেছিলেন, যেদিন একজন নয়, দু'জন নয়, দলে দলে লোক ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে, সেদিনই ইসলাম ধর্মের পূর্ণতা আসবে। ৯ জিলহজ তারিখে মুহাম্মদ (স) আরাফাতের ময়দানে ভাষণদানকালে সে দৃশ্য দেখতে পেলেন। সেদিন হযরত এক একটি পদ উচ্চারণ করছিলেন আর অযুত কণ্ঠে অনুসারীরা সে পদের প্রতিধ্বনি করে যেতে লাগলেন। এ দৃশ্য দেখে হযরতের বদনমণ্ডল স্বর্গের পুণ্য আভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। তাই তিনি আল্লাহর কাছে প্রশ্ন রাখেন, "হে আল্লাহ! আমি কি তোমার বাণী ঠিকমতো পৌছে দিয়েছি?" লাখো কণ্ঠে ধ্বনি উঠল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

মন্তব্য : সৃষ্টিকর্তার দেওয়া প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে পালন করার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে বিদায় হজের দিন হযরতের বদনমণ্ডল স্বর্গের পুণ্য আভায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৭ ॥ এই সরল সহজ এবং স্পষ্ট অনাবিল পয়গামটির উপর টীকা-টিপ্পনি করার আবশ্যক নাই। [ফা. প. ২০০৭]

উৎস : চয়নকৃত অংশটুকু মোহাম্মদ আকরম খাঁ বিরচিত 'বিদায় হজ' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিদায় হজে প্রদত্ত মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ভাষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট, সে প্রসঙ্গে লেখক এ মন্তব্য করেছেন।

বিশ্লেষণ : দশম হিজরির জিলকদ মাসের পাঁচদিন বাকি থাকতে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) যথারীতি প্রস্তুত ও সজ্জিত হয়ে কসওয়া নামক বিখ্যাত উষ্ট্রীর ওপর আরোহণ করে হজের উদ্দেশ্যে পবিত্র বায়তুল্লাহ শরিফ গমন করেন এবং ৯ জিলহজ শুক্রবার আরাফার দিন জাবালে রহমত পাহাড়ের শীর্ষে দাঁড়িয়ে দু'লাখ সাহাবির সমাবেশে যে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, সেটাই বিদায় হজের ভাষণ নামে খ্যাত। মহানবির সেদিনের সে বাণী সমগ্র আরবের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়ে মরুর হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি মুসলিম জাতির অন্তরে এখনো দোলা দিচ্ছে। যুগযুগ ধরে মুসলমানগণ এ বাণী স্মরণ করছে। তাঁর এ বাণী মুছে যাওয়ার নয়। কারণ হযরতের এ নির্দেশনাবলি প্রতিটি মানুষেরই অন্তরের কথা। এতে মানবাধিকার ও সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থার বাস্তবচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিচিত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানবাধিকারের এ মহান বাণী শুধু মুসলমান নয়, বিশ্বের সব মানুষের জন্য এক অমূল্য দলিল। এ ভাষণের বাণীগুলো এত সহজ, সরল এবং স্পষ্ট যে, সহজেই এটা বোধগম্য হয়। তাই এর ব্যাখ্যার জন্য কোনো টীকা-টিপ্পনি দেওয়ার দরকার পড়ে না।

মন্তব্য : মহানবি (স) প্রদত্ত বিদায় হজের ভাষণ একাধারে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মুক্তির অমিয় বাণী, ইসলাম ধর্মের মৌল বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক। এ ভাষণ পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

সংস্কৃতি কথা

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৮ ॥ ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম। [ফা. প. ২০১০]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু যুক্তিবাদী ও মননশীল লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্মের ভিন্নতা এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন।

বিশ্লেষণ : সাধারণ মানুষ ও শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম এক নয়। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্ম ও সংস্কৃতির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তারা ধর্মের মাধ্যমে উন্নত জীবন, সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকে। তারা ধর্মের মাধ্যমেই জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং একে জীবনের চালিকাশক্তিরূপে গ্রহণ করে। তাই ধর্মই তাদের সংস্কৃতি। তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা মানে সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত করা। অন্যদিকে শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম হলো সংস্কৃতি। তারা সংস্কৃতির মাধ্যমেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং একেই জীবন বিকাশের চালিকাশক্তিরূপে গ্রহণ করে। তাদের ওপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে তাদের ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনা নষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম মানুষকে বিভিন্ন নীতিবিধান দ্বারা আবদ্ধ করে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ স্থবির, পঙ্গু করে দেয়। অন্যদিকে সংস্কৃতি মানুষকে উদার, নিরহংকার, মুক্তচর্চায় বিশ্বাসী হওয়ার শিক্ষা দেয়। সংস্কৃতি প্রেম-ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেকে বিকশিত করতে শেখায়। তাই বলা যায়, ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটি পৃথক সত্তা।

মন্তব্য : সাধারণ মানুষ ধর্মকে অবলম্বন করে সংস্কৃতি চর্চা করে থাকে, আর শিক্ষিত মার্জিত লোক সংস্কৃতি চর্চাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

›› ব্যাখ্যা : ৬৯ ॥ সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয়– উপায়।
অথবা, উদ্দেশ্য নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করা।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিমান, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : কালচার বা সংস্কৃতি শিক্ষিত, মার্জিত ও আলোকপ্রাপ্ত মানুষের আত্মার খোরাক। সাহিত্য, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি উপকরণকে ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। সংস্কৃতিমান মানুষ নিজের মনের তাগিদেই সাহিত্য, সংগীত বা শিল্প নির্মাণ করে। সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করে নিজের উপলব্ধি প্রকাশ করে। গীতিকার বা গায়ক সংগীত রচনা বা পরিবেশন করে মনের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শিল্পী শিল্প নির্মাণ করে তার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলে। এভাবে এগুলোর মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি বিকশিত হয়। অনেকে এগুলোকে সংস্কৃতির উদ্দেশ্য বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু প্রবন্ধকার যুক্তির নিরিখে এগুলোকে সংস্কৃতির উপায় বা বাহন হিসেবে স্থান দিয়েছেন। আর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশকে তথা নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আল্লাহ সৃষ্টি করাকে কালচারের উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা প্রেম-পুণ্যে, আনন্দ-ভালোবাসায়, শিক্ষা-দীক্ষায় নিজের স্বতন্ত্র সত্তাকে বিকশিত করা তথা নিজের ভেতরে 'আমিত্ব' জাগিয়ে তোলাই সংস্কৃতির কাজ। যে তা করতে পেরেছে সে-ই 'কালচার্ড' উপাধি পেতে পারে। সে-ই সূক্ষ্ম চেতনাকে নিজের জীবন পরিচালনার চালকরূপে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তারা ধর্মের অনুশাসন ছাড়াই যাবতীয় অন্যায়, নিষ্ঠুরতা, এমনকি ন্যায়-নিষ্ঠুরতাকেও ঘৃণা করে এবং নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র রাখে।

মন্তব্য : সাহিত্য, শিল্প ও সংগীত সংস্কৃতির সেরা উপাদান। এগুলোর চর্চার মাধ্যমে নিজের ভেতরে 'আমিত্ব' জাগিয়ে তুলে সংস্কৃতির যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হতে হবে।

›› ব্যাখ্যা : ৭০ ॥ নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো, এ-ই কালচারের আদেশ।
অথবা, কালচার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম। ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।
অথবা, একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা কাল্‌চারের উদ্দেশ্য।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু স্বনামধন্য প্রাবন্ধিক, সংস্কৃতিমান, যুক্তিবাদী ও মননশীল ব্যক্তিত্ব মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক কালচার বা সংস্কৃতির স্বরূপ অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

বিশ্লেষণ : সৃষ্টিগতভাবে মানুষ সংস্কৃতিমান প্রাণী। মানুষের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। প্রগতির বিকাশ ও সভ্যতার উন্নয়নে সংস্কৃতির গুরুত্ব সীমাহীন। সংস্কৃতি মানে জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা। উন্নততর জীবন, সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সংস্কৃতি ব্যক্তিতান্ত্রিক। আগে ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, তারপর সমাজের কল্যাণ। নিজের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই কালচার্ড মানুষ সমাজের কথা ভাবে এবং প্রয়োজনে সমাজের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকে। তাই সংস্কৃতি– নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো ইত্যাদির আদেশ দিয়ে থাকে। তবে এগুলো অর্জনে

সমাজ ত্যাগ করে নয়; বরং সমাজ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সবার মাঝে নিজেকে অনন্য করে, সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে নির্দেশ দেয়। সংস্কৃতি ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের ন্যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ওপর আঘাত হানে না। সংস্কৃতি মানুষকে মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতা প্রদান করে, মানুষের ভেতর মূল্যবোধের জন্ম দেয়। মানুষ তখন সংস্কৃতির জোরেই নিজেকে ভালো পথে পরিচালিত করে।

মন্তব্য : সংস্কৃতি একটি স্বতন্ত্র উচ্চস্তরের ধর্ম। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ আর মতবাদের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে সংস্কৃতি মুক্তচর্চা ও স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তিকে মহান করে, সুন্দর করে বাঁচতে এবং বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়ে নিজের আমিত্বকে প্রস্ফুটিত করতে শেখায়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭১ ॥ নইলে প্রাণ পাবে কোত্থেকে? ব্যক্তি তো নদী, সমাজ সমুদ্র।
অথবা, সমুদ্রের সঙ্গে যোগ-যুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে?

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতিমান, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সুস্থ, সুন্দর, মার্জিত, সংস্কৃতিপূর্ণ সমাজ গঠনে সমাজ থেকে শক্তি সঞ্চয় করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

বিশ্লেষণ : Man can not live alone. সমাজ ছাড়া মানুষ একাকী বসবাস করতে পারে না। আবার মানুষ ছাড়া সমাজ অচল। মানুষ তার একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে সুস্থ-সুন্দর জীবন বিকাশের জন্যই সমাজে বসবাস করে। একটি সুস্থ-সুন্দর, সাবলীল সমাজ গড়ে ওঠে মার্জিত সংস্কৃতিমান মানুষদের নিয়ে। সমাজে বসবাসরত মানুষের উন্নত জীবনযাপনের উপায় হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মূলমন্ত্র হচ্ছে নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো এবং বিচিত্র করো। তাতে সমাজে নিজেকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, সেটা কোনো বিষয় নয়; বরং সমাজ তোমার কাছ থেকে উপকৃত হবে। কেননা সুন্দর মানুষ দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়া সম্ভব। তাই সংস্কৃতির মূল চারণভূমি সমাজ। এজন্য প্রবন্ধকার ব্যক্তিকে নদীর এবং সমাজকে সমুদ্রের সাথে তুলনা করেছেন। কেননা নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পূর্ণতা পায়, তেমনি ব্যক্তিও সমাজের মধ্যেই খুঁজে পায় আপন জীবনের সার্থকতা। সমাজে বেড়ে উঠে তা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করে, অনন্য করে, স্বতন্ত্র করে গড়ে তোলে।

মন্তব্য : ব্যক্তি থেকেই সমাজের সৃষ্টি। নদী ক্ষুদ্র হলেও অনেকগুলো নদী আছে বলে সমুদ্র গতিশীল। তাই সমাজ-উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যক্তির উন্নয়ন। ব্যক্তির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭২ ॥ জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক মানুষের সূক্ষ্ম চেতনার বিকাশ ও প্রতিভার উন্মেষে সমাজের চেয়ে ব্যক্তির অবদানের গুরুত্ব অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানুষ সামাজিক জীব। তাই তাকে নিজের প্রয়োজনে সমাজে মিলেমিশে বাস করতে হয়। সমাজে বাস করতে হলে সমাজের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

মানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং তাতেই বিকাশ লাভ করে; কিন্তু শ্রেষ্ঠ, অনন্য, স্বতন্ত্রধর্মী ব্যক্তিকে সমাজের বিধিবিধানে আবদ্ধ রাখা যায় না। সমাজ সামষ্টিকভাবে কল্যাণের কথা বলে বিধায় এতে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য গৌণ বিষয়। সমাজ একপেশে ও সামাজিক বিধানাবলির মাধ্যমে মানুষের চূড়ান্ত বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সমাজের আদেশ হচ্ছে– দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যধর্মী, বিবেকবাদী, শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অভিলাষী ব্যক্তি যখন নিজেকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করতে, পূর্ণাঙ্গ বিকশিত করতে, সভ্যতা ও প্রগতির উন্নতি সাধনে লিপ্ত হয়, তখন সমাজ সামাজিক বিধি লঙ্ঘনের অজুহাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রগতি, প্রেম, আনন্দ আর সৌন্দর্যের সংস্পর্শে গড়ে তোলে। সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়; বরং নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশে নিজের দিকে তাকিয়ে তার পথচলা। নিজের চিন্তাচেতনা, ভাবনা ও নিজের কল্পনার পূর্ণ বিকাশ সাধনের মাধ্যমে নিজেকে অসাধারণ, শ্রেষ্ঠ ও আলাদা সত্তারূপে প্রকাশই তার আরাধনা। তাই সমাজের মধ্য থেকে নিজেকে উঁচুস্তরের মর্যাদায় আসীন, নিজেকে অনন্য শ্রেষ্ঠ বিবেকবাদী করতে সর্বাগ্রে নিজের আত্মার বিকাশ করতে হবে। সমাজ নয়, নিজের সুপ্ত প্রতিভার ওপরই নির্ভর করতে হবে।

মন্তব্য : সমাজ অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নয়; বরং সমাজে থেকেই নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ, অনন্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনধারার কর্ণধার করে গড়ে তুলতে হবে।

➧ ব্যাখ্যা : ৭৩ ॥ ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ওসবের বালাই নেই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন, ধার্মিক ও সংস্কৃতিমান মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় ভিন্ন উপাদানে ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

বিশ্লেষণ : সাধারণ মানুষ ও সংস্কৃতিমান মানুষের জীবনদর্শন ও জীবনাচরণে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণ লোকের সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরে থেকে তথা ধর্মীয় বিধি-বিধানের অনুসরণে। তারা ইহকালে সুখ-শান্তি এবং পরকালে দোযখের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে অথবা বেহেশতে যাওয়ার পথ সুগম করতে ধর্মের অনুসরণ করে। পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে পরকালের সুখ- শান্তির আশায়, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়। তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে একদিকে ভয়, অন্যদিকে পুরস্কারের লোভ। ফলে একজন ধার্মিক স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রিত নয়। তাকে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভয় আর লোভের দ্বারাই সে তাড়িত। মানবকল্যাণ, সুন্দর, প্রেম, ভালোবাসা এসবই স্রষ্টার উদ্দেশে নিবেদিত, নিজের স্বাতন্ত্র্য সত্তার বিকাশ তার নিকট মুখ্য বিষয় নয়। অপরদিকে সংস্কৃতিমান মানুষ নিজের ভেতর ঈশ্বর সৃষ্টি করে নেয়। তারা যা করে তা ভালোবাসার তাগিদেই করে, সেখানে লোভ আর পুরস্কারের উদ্দেশ্য থাকে না। তারা সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনা লাভে ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা শেখে। তাই সংস্কৃতিমান ব্যক্তি তার পুরস্কার কাজ করার সাথে সাথে হাতে হাতেই পেয়ে যায় এবং সে নিজেই তার স্বর্গ তৈরি করে নেয়।

মন্তব্য : একজন ধার্মিক ব্যক্তি পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ হয়, যার বাহ্যিক রূপ ধর্ম পালন। আর সংস্কৃতিমান ব্যক্তি সত্য, সুন্দর, আনন্দ, প্রেম-ভালোবাসা এবং মানবকল্যাণের মানসে সংস্কৃতি চর্চা করে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৪ ॥ সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক সংস্কৃতিমান ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ দিকটি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখকের মতে, ধার্মিক ব্যক্তিগণ জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন ভয় এবং পুরস্কারপ্রাপ্তির আশায়। ধর্ম মানুষকে ভালো করতে চায় চারদিকে রীতির আদেশ-নিষেধের জাল সৃষ্টি করে, কিন্তু সংস্কৃতিমান মানুষের পাপ-পুণ্যের বালাই নেই। সংস্কৃতিমান মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয় আত্মার সূক্ষ্ম চেতনা আর প্রেম-ভালোবাসা দ্বারা। সে ভালোবাসায় কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। বিনা লাভে, বিনা আশায়, সত্যকে, সৌন্দর্যকে, ভালো লাগাকে ভালোবাসাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি মানুষকে সুন্দরের স্বপ্ন দিতে পারে। ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে একটি জাতিকে। সংস্কৃতি ব্যক্তির ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগিয়ে তাকে করে তোলে অনন্য, অসাধারণ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ব্যক্তিকে বিকশিত করার মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতিকে করে বিকশিত, আলোকিত ও প্রগতির ধারক। বিনির্মাণ করে একটি সুন্দর, উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ। এভাবে সংস্কৃতিমান তার নিজের স্বর্গ নিজেই তৈরি করে নেয়। অর্থাৎ সে নিজে কোনো ভালো কাজ করে, কল্যাণের কাজ করে গভীর আনন্দ পায়। মনের গভীরে অনুভব করে অগাধ সুখ, এটাই তার স্বর্গ।

মন্তব্য : জীবনকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত করার অনন্য মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি সাধনা। সংস্কৃতিমান ব্যক্তি সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে নিজের ভেতরের সূক্ষ্ম চেতনাকে জাগরিত করে। ফলে সংস্কৃতিমান ব্যক্তি ভালো কাজ করে পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ অনুভব করে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৫ ॥ ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক ধর্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, সাথে সাথে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যকার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের ব্যাপারটাও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মানুষকে সব অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও পাপকার্য থেকে দূরে সরিয়ে জীবনকে সুন্দর, মার্জিত ও কলুষমুক্ত করার নির্দেশ দেয়। ধর্মের গুণেই মানুষ পাপের চরম সীমায় পৌঁছে না; অধঃপতনের সোপান বেয়ে নরকের পথে অগ্রসর হয় না। ধর্ম দোজখের শাস্তি আর বেহেশতের পুরস্কারের আশ্বাসের মাধ্যমে মানুষের জীবনকে শৃঙ্খলিত করে, পার্থিব পাপাচার আর কামাচার থেকে রক্ষা করে। তাই ধর্ম মানুষের জীবনে একটি বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে ধর্ম মানুষের বিকাশকে বড় করে দেখে না। এক্ষেত্রে কালচার মানুষকে পূর্ণরূপে

বিকশিত করার শিক্ষা দেয়, কিন্তু পাপ-পতন থেকে রক্ষা করতে পারে না। মনুষ্যত্বের বিকাশই কালচারের প্রধান উদ্দেশ্য। কালচারের সংস্পর্শে মানুষ উন্নত জীবনবোধে আগ্রহী, রুচিশীল, মার্জিত ও আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। এটি ব্যক্তির ভেতরে 'আমিত্ব' জাগিয়ে তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে। জীবনকে গোলাপের মতো ফুটিয়ে তোলার জন্য ধর্মের কোনো উদ্দেশ্য নেই, শুধু তাকে পাপ-পতন থেকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য। অন্যদিকে জীবনের পূর্ণ বিকাশে পথের কাঁটা দূরীকরণই কালচারের উদ্দেশ্য। জীবনবৃক্ষের ফুল ফোটানোই তার কাম্য।

মন্তব্য : ধর্ম নিয়ম-নীতির মাধ্যমে মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও তার পরিপূর্ণ বিকাশ ধর্মের মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতির চর্চা করা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৬ ॥ জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, বৃক্ষটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। [ফা. প. ২০১২]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত বিশ্লেষণধর্মী সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : ধর্ম মানুষের জীবনের একটি আবশ্যকীয় বিষয়। মানুষের পথচলায় ধর্মের ভূমিকা সীমাতীত। ধর্মের বন্ধন ভাঙার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশের ক্ষমতা মানুষের নেই। ধর্ম মানুষকে সার্বিক কল্যাণের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থাকে অন্ধকার পথ থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে। ধর্মহীন মানুষ অনাচার-কদাচার আর পাপাচারের অন্ধ গলিতে থাকে। তাই ধর্ম মানুষের পতনকে, পাপকে বিদূরিত করে তাকে স্বর্গীয় মোহনায় নিয়ে যায়। তবে ধর্মের সাথে কালচারের স্রোত জীবনকে আরো বিকশিত করে। ধর্ম মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা করে দান করে নিষ্কলুষ, পরিচ্ছন্ন জীবনবিধান। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে ব্যক্তির জীবন হয় সুন্দর, মার্জিত এবং পবিত্র। কালচার সেই সুন্দর জীবন বৃক্ষটিতে ফুল ফোটায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে। অর্থাৎ জীবন যদি একটি গোলাপ গাছ হয়; তবে সে গাছে ফুল ফোটানোর দায়িত্ব ধর্মের নয়; বরং ধর্মের কাজ হচ্ছে গোলাপ গাছটিকে পরিচ্ছন্ন রাখা। আর সেই পরিচ্ছন্ন গাছে ফুল ফোটায় সংস্কৃতি।

মন্তব্য : ধর্মের সাথে কালচারের বিরোধ নেই; বরং জীবনের সৌন্দর্যকে আরো সুন্দরময় করা, তাকে শিল্পের রূপ দেওয়াই হলো সংস্কৃতির কাজ। তাই একজন মানুষকে পরিপূর্ণ বিকশিত হতে হলে ধর্মের পাশাপাশি সংস্কৃতিও থাকতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৭ ॥ মনুষ্যত্বের বিকাশই সবচেয়ে বড় কথা, চলার পথে যে স্খলন-পতন তা থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা নয়।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রাবন্ধিক মনুষ্যত্বের বিকাশকে সংস্কৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্লেষণ : উন্নত জীবন চেতনা, সুন্দর ও সত্যের সাধনা হলো সংস্কৃতি। এ সাধনা করতে গিয়ে পতন আসতে পারে, স্খলন আসতে পারে। এ পতন-স্খলন থেকে রক্ষা পাওয়া

সংস্কৃতিচর্চার উদ্দেশ্য নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনই সংস্কৃতির লক্ষ্য। নিজের চিন্তাভাবনা, কল্পনা বিকাশের মাধ্যমে নিজের ভেতর একটা ব্যক্তিগত বা নিজস্ব দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য। তাই সংস্কৃতির সাধনা মানে ripe তথা পরিপক্ব হওয়ার সাধনা। অপরদিকে লেখকের মতে, ধর্ম মানুষকে পাপ ও পতন থেকে রক্ষা করতে চায়, কিন্তু মানুষকে বিকশিত করতে চায় না। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে ধর্মের নজর নেই, জীবনটাকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু সংস্কৃতি জীবনের সামগ্রিক দিক দিয়েই বিকশিত হওয়ার পক্ষপাতী। গোলাপের সাথে যদি দু'একটা কাঁটা এসেই যায় তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই। দেখার বিষয় হলো, ফুল ফুটল কিনা। জীবনকে বিকশিত করতে হলে কাঁটার আঘাত সইতেই হবে। গোলাপের সৌরভের তুলনায় তা সংগ্রহে কাঁটার আঘাত তো তেমন মারাত্মক কিছুই নয়। তাই জীবনকে বিকশিত করার, জীবন নামক বৃক্ষে ফুল ফোটানোর জন্য সংস্কৃতির সাধনা আবশ্যক।

মন্তব্য : সংস্কৃতি মানুষের মনে মনুষ্যত্বের আলো জ্বালিয়ে দেয়। চলার পথে স্খলন-পতন থেকে মানুষকে রক্ষা করার কোনো তাগিদ দেয় না। জীবনকে ripe তথা পরিপক্ব করাই তার কাজ।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭৮ ॥ নিজের কাছ থেকে ষোল আনা আদায় করে না নিতে পারলে সে খুশি হয় না।

অথবা, সে চায় নিজের সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু যুক্তিনিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধির ধারক ও সুসাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : এখানে প্রবন্ধকার সংস্কৃতিমান মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতি মানবজীবনেরই অঙ্গ। জীবনের বাইরে এর কোনো স্থান নেই। তবে সংস্কৃতের একটা ধর্ম আছে। একটা উন্নততর জীবনদর্শন সৃষ্টি করাই সংস্কৃতির লক্ষ্য। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে, তারা আল্লাহকে জীবনের প্রেরণার উৎসরূপে নয়, ঠোঁটের বুলিরূপে পায়। বস্তুত ইহলোকে সুখ লাভের উদ্দেশ্যে এবং পরকালে স্বর্গ লাভের আশায় আল্লাহকে স্মরণ করার মধ্যে একধরনের পাওয়ার লোভ কাজ করে। সংস্কৃতিমান লোক মনে করে এটা ইহলোক ও পরলোকের প্রতি একটা ইতর লোভ। সংস্কৃতিমান লোক নিজের মনের মাঝেই একটা ঈশ্বর তৈরি করে নেয়। ফলে এ দেবতার বিরুদ্ধাচরণ তারা কখনো করতে পারে না। সে নিজ সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে নিজেকে প্রসারিত করে দিতে উদগ্রীব। কোনোপ্রকার সামাজিক সমস্যার অজুহাতে সে নিজের ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখতে চায় না। একজন সংস্কৃতিমান লোক আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ছাড়া কখনো তুষ্ট হতে পারে না। তাই প্রথমে সে নিজের তাগিদেই নিজেকে প্রকাশ করে, বিকশিত করে এবং পরিপূর্ণ সত্তায় জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

মন্তব্য : প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রকৃত রূপসত্তা উদঘাটিত হয়। সমাজে এজন্য প্রয়োজন ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭৯ ॥ অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবন সাধনারই অপর নাম কালচার।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণধর্মী ও প্রগতিশীল লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে বলা হয়েছে, ইন্দ্রিয়নিচয়ের সমন্বয়ে গঠিত মানবদেহ। আর কালচার বা সংস্কৃতি এ ইন্দ্রিয় সাধনার ভেতর দিয়েই তার পথ বেছে নেয়।

বিশ্লেষণ : প্রত্যেক মানুষের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক– এ পাঁচটি ইন্দ্রিয় রয়েছে। এগুলোর সাহায্যে মানুষ সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বিষাদ অনুভব করে। কণ্টকাকীর্ণ মানবজীবনের বিকাশ একমুখী নয়, নানামুখী। এ নানামুখী বিকাশকে সফল করে তুলতে হলে ইন্দ্রিয় সাধনার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। কারণ প্রতিটি ইন্দ্রিয়ই এক একটি আলোর প্রদীপ। এ প্রদীপ ইন্দ্রিয়ের চারপাশের অন্ধকার দূর করে, অর্থাৎ ব্যক্তির চতুর্মুখী জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে। চোখ দিয়ে যা কিছু দেখার দেখে, কান দিয়ে শোনে, ত্বক দিয়ে অনুভব করে। এমনি করে মন ও আত্মার সঙ্গে যুক্ত করে এ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগিয়ে জীবন বিকাশের যে প্রত্যাশা, কালচার বা সংস্কৃতি মূলত তাই। ধর্ম জীবনের বিকাশকে বড় করে দেখে না বলে ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থি। আর ইন্দ্রিয়কে অচল করে দেওয়া মানে জীবনের গতি স্তব্ধ করে দেওয়া। তাই কালচার বা সংস্কৃতি ইন্দ্রিয়নিচয়ের সচল রাখার মাধ্যমে জীবন বিকশিত, মার্জিত ও সুন্দর করার পক্ষপাতী।

মন্তব্য : রূপ-রস-গন্ধে ভরপুর এ পৃথিবীর ঐশ্বর্যকে উপভোগ করতে, জীবনকে সত্য, সুন্দরের পথে বিকশিত করতে অবশ্যই সংস্কৃতিমান হতে হবে। আর সংস্কৃতিমান হতে হলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাধনার মাধ্যমে জীবনের গতি সচল রাখতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮০ ॥ তাই তারা শুধু ঈশ্বরের নাম নেয়, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃতিমান ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণধর্মী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক ধর্মের সে সকল অন্ধ অনুসারীর স্বরূপ তুলে ধরেছেন, যারা ঈশ্বরের আরাধনা করে অথচ তাঁর ঐশ্বর্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে না।

বিশ্লেষণ : ধর্ম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, অন্তরের জিনিস। একে বাইরের আদেশ হিসেবে গ্রহণ করলে এর প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। তাই ধর্মকে যারা বাইরের আদেশ হিসেবে গ্রহণ করে তারা ঈশ্বর বা আল্লাহর ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তাদের ঈশ্বর অন্তরে নয়, ঊর্ধ্ব আকাশে। তারা অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন এবং ইহকালে সুখ ও পরকালে সম্ভোগ ইত্যাদি স্থূল লোভের বশবর্তী হয়ে ধর্ম পালন করে। তারা বিপদাপদে মুখে মুখে ঈশ্বরের নাম জপলেও তাঁর ঐশ্বর্যের দ্যুতি লাভে বঞ্চিত হয়। কেননা ঈশ্বরের মহিমা লাভ করতে হলে অন্তরে যে তাঁর গুণাবলি ধারণ করতে হয় সে সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তারা ধর্মের বাহ্যিকতা প্রকাশের মাধ্যমে একে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করে এবং স্রষ্টার দেওয়া ইন্দ্রিয়নিচয়ের সঠিক ব্যবহারের পথ রুদ্ধ করে। ফলে তারা ঈশ্বর যে আত্মার অনিন্দ্য অন্দরে অবস্থান করে তা বুঝতে পারে না। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে হলে অন্তরে তাঁর গুণাবলি ধারণ করতে হবে। বিচিত্রভাবে বাঁচার মধ্য দিয়ে সে গুণ অর্জিত হয় এবং অন্তর বিকশিত হয়, সুন্দর হয় স্রষ্টার যথার্থ মহিমা।

মন্তব্য : ঈশ্বরের প্রকাশ বাইরে নয়, অন্তরের মধ্যে। তাই ঈশ্বরের মহিমা ও ঐশ্বর্য উপলব্ধি করতে হলে আত্মিক সাধনার মাধ্যমে আপন মনে তার গুণাবলি ধারণ করতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮১ ॥ বৈরাগীরা নারীকে পর করে, সংস্কৃতিকেও পর করে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য রুচিশীল ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণধর্মী ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সমাজ ও সংস্কৃতিতে নারীদের ভূমিকা বা গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন, সাথে সাথে বৈরাগীদের সমালোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : আবহমানকাল থেকে নারী-পুরুষের যৌথ প্রয়াসে প্রগতির পথ ধরে সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ অব্যাহত রয়েছে। অথচ বৈরাগীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে উপেক্ষা করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে নারী বিষবৎ। তারা নারীকে নির্দিষ্ট পরিমণ্ডলে আবদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। নারীকে তারা ভোগের সামগ্রী মনে করেন। কিন্তু বিশ্বসংসারে নারীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ নারীই শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু। জীবনের বোধকলি নারীর পরশেই ফোটে। জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা নারী থেকেই আসে। ভোগের চেয়ে প্রেম ও আনন্দ বড়। তাই সংস্কৃতিমানরা নারীকেই প্রেম ও আনন্দের সামগ্রী মনে করেন। তারা যৌনতা ও কামপরায়ণতার উর্ধ্বে ঠাঁই দেন নারীকে। তাদের কাছে নারী হচ্ছে সৃষ্টির প্রেরণা, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। তাই কবির কণ্ঠে শোনা যায়, "আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যদি না পাই তপস্বিনী।" পুরুষের তরবারি বিজয়ী করতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। নারীকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি তার ক্ষেত্র প্রসারিত, বিকশিত, আকর্ষণীয়, মনোহারী ও আনন্দময়ী করেছে। তাই নারীকে অবজ্ঞা করা মানে সংস্কৃতিকেই অবজ্ঞা করা।

মন্তব্য : নারী সংস্কৃতির অলঙ্কার, সংস্কৃতির কেন্দ্র। তাই প্রকৃত সংস্কৃতিমান হতে হলে নারীকে কখনো দূরে ঠেলে দেওয়া যাবে না। কারণ নারী না হলে সংস্কৃতি অর্থহীন হয়ে পড়বে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৮২ ॥ যেখানে ফ্রি-থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, বিশ্লেষণধর্মী ও যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ফ্রি-থিংকিং বা মুক্ত চিন্তার গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : মুক্তচর্চা, মুক্তচিন্তা প্রগতির বাহক, সংস্কৃতির ধারক। যে সমাজে মুক্তচিন্তা-চর্চা অবরুদ্ধ সে সমাজের গতিশীলতা ও উন্নতি অসম্ভব। যেখানে মুক্তচিন্তার অবকাশ নেই সেখানে গৌরবদৃপ্ত কাজের আশা করা যায় না। চিন্তার বৈচিত্র্যের কারণেই দেশে দেশে মানব সভ্যতা বিকাশ লাভ করে আসছে। চিন্তার স্বাধীনতার ফলেই ব্যক্তির স্বকীয়তার উন্মেষ ঘটে, মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়, কিন্তু ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শ মানুষের মুক্তচিন্তা ও স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। ফলে সমাজ সভ্যতা, প্রগতি ও উন্নতি থেকে পিছিয়ে পড়ে। চিন্তা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে সমতা স্থাপন করে মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করতে চায় বলে ধর্ম সংস্কৃতির পরিপন্থি। তাই ধর্ম ও মতবাদের উর্ধ্বে উঠে যে ব্যক্তি মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তিই যথার্থ কালচার্ড। সে ফ্রি-থিংকিং বা মুক্তবুদ্ধির দ্বারা বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়ে সত্যকে ভালোবাসে, সৌন্দর্যকে ভালোবাসে। বিনা লাভে ভালোবাসে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে সে ভালোবাসে। নিজের চিন্তাভাবনা, কল্পনার বিকাশের মাধ্যমে নিজেকে বিশেষভাবে অনন্য করে গড়ে তোলে। আর এর নামই কালচার বা সংস্কৃতি। এগুলো ফ্রি-থিংকিং-এরই অবদান।

মন্তব্য : ফ্রি-থিংকিং বা মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা কালচারের প্রাণ। একে অবরুদ্ধ করা হলে সংস্কৃতি, প্রগতি, সভ্যতা সবই মুখ থুবড়ে পড়বে। সুতরাং যেখানে মুক্তবুদ্ধির চর্চা আছে সেখানে সংস্কৃতিও গড়ে উঠবে।

» ব্যাখ্যা : ৮৩ ॥ মতবাদী ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী, অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর।
অথবা, ধর্মের সমস্ত দোষ মতবাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক মতবাদী ও ধার্মিকদের তুলনামূলক স্বরূপ উন্মোচন করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানবমুক্তি, মানবকল্যাণ ও মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে ধর্ম ও মতবাদের আবির্ভাব হয়েছে। এদের উভয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তবে এরা উভয়েই জীবনের মূল্যবোধের টুঁটি চেপে ধরে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার ওপর হস্তক্ষেপ করে। ধার্মিক ব্যক্তিরা ধর্মশাস্ত্রের কতিপয় নীতি আঁকড়ে ধরে অতি সংকীর্ণ জীবনযাপন করে। মতবাদীরাও ঠিক একই রকম। কারো সাথে মতবাদগত মিল থাকলে তাকে আপন লোক হিসেবে মেনে নেওয়া হয় এবং অন্য মতবাদের লোকদের কঠোর সমালোচনা করা হয়। অথচ এ হীন মনোবৃত্তি থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না। মতবাদী আর ধার্মিকের মধ্যে প্রভেদ অল্প। মতবাদীরা ধার্মিকের মতোই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী। অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর ও সংকীর্ণ। ধার্মিক ব্যক্তি তার নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ বলে জানে, অপর ধর্মকে সে সহ্য করতে পারে না। মতবাদীরাও তেমনি বিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের অন্ধ অনুকরণ করে। প্রেম-প্রীতির দ্বারা জগৎকে সুন্দর করার সাধনা মতবাদীদের নয়। আপন মতবাদকে অন্যের ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার উন্মত্ততায় সে অধীর।

মন্তব্য : ধর্মান্ধতা আর মতবাদ দুটোই মানুষের আত্মচেতনাকে অবরুদ্ধ করে, নিষ্ঠুর করে তোলে। ধর্ম ও মতবাদ উভয়টি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অস্বীকার ও মুক্তবুদ্ধিচর্চার দ্বার অবরুদ্ধ করে।

» ব্যাখ্যা : ৮৪ ॥ দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু মননশীল সাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : সাধারণ লোকের ধর্ম সম্বন্ধে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রবন্ধকার আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : ধর্ম সাধারণ মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটি মানুষকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, নিষ্ঠুরতা ও পাপকার্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। তাই ধর্ম মানুষের জীবনে একটি বড় শক্তি হিসেবে কাজ করে। তবে ধর্ম মানুষের বিকাশকে বড় করে দেখে না। আর সংস্কৃতি, শিক্ষার আলো মানুষের মনোবৃত্তিকে বিকশিত করে তোলে। যেখানে মানুষের উন্মুক্ত মনের বিচরণ রয়েছে সেখানে সে আপন সত্তাকে গভীরভাবে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজেকে মহৎ করে তুলতে পারে। এটাই শিক্ষার ধর্ম, এটাই কালচার। সংস্কৃতিমান লোক চায় আপন সত্তার সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। আর এজন্য শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা তার মনঃপুত নয়। কারণ তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যান-কল্পনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়। ধর্ম চায় দশের মধ্যে এক হতে তথা সমাজের মানুষরূপে পরিগণিত হতে। সাধারণ লোকের কৃষ্টিও সেদিকে।

কিন্তু কালচার মানুষকে সমাজে দশের মাঝে এগারো হতে শিক্ষা দেয়। কালচার চায় সমাজে নিজের সত্তাকে আপন মহিমায় উদ্ভাসিত করে দশের মধ্য থেকে নিজেকে নিজের মতো করে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে।

মন্তব্য : সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে। তাই দশের মধ্যে এক হওয়া সমাজের লক্ষ্য। কিন্তু নিজেকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চাই স্বতন্ত্র সত্তায় দশের মাঝে এগারো হয়ে ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা। এটাই কালচারের ধর্ম।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৫ ॥ অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা এই তো সংস্কৃতি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সর্বোৎকৃষ্ট জীবন-ভাবনা এবং অমৃত সাধনাই যে সংস্কৃতি, আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক এ সত্য অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন সাহিত্যিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, সংস্কৃতির জন্ম হয় বিভিন্ন রকমের মহৎ কামনার ফসল হিসেবে। যেমন– অমৃতকে কামনা, প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা প্রভৃতি। এসব কামনার প্রতিটিই মানুষের জীবনকে সুন্দর করে, মার্জিত করে, রুচিসম্মত করে, উন্নততর করে। মানুষ যদি এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ গুণের অধিকারী হয়, তাহলে তার মধ্যে সৃষ্টিশীল মানসিকতার জন্ম হয়। এ মানসিকতার নামই মূলত সংস্কৃতি। কেননা সংস্কৃতিমান মানুষ স্বীয় হৃদয়ে সূক্ষ্ম চেতনাবোধ জাগ্রত করে মানবিক কল্যাণে নিজেকে বিকশিত করে। সে অন্তরের সূক্ষ্ম চেতনাকেই জীবনের চালকরূপে গ্রহণ করে। তার চেতনাবোধই তাকে সর্বপ্রকার হিংসাত্মক, নিষ্ঠুর, অসুন্দর, অকল্যাণকর ও অমানবিক কাজ থেকে বিরত রাখে। এজন্য প্রতিটি মানুষের উচিত জীবনের বিকাশ সাধন করতে অমৃতকে কামনা করা, সুন্দরকে কামনা করা। এ কামনা যার মাঝে থাকে সে ব্যক্তিজীবনে অবশ্যই নিজেকে অনন্য করে, অনেকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করে, অসাধারণ করে, মানবতার কল্যাণকামী ও বিশ্বপ্রেমিকরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

মন্তব্য : সংস্কৃতি মানুষকে সত্য, সুন্দর, মার্জিত ও উন্নততর জীবনের দিশা প্রদান করে। তাই হিংসা-বিদ্বেষের উর্ধ্বে সংস্কৃতির পথ ধরেই মানবজীবনে কল্যাণময় সৌন্দর্য চেতনা, উন্নততর জীবন ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৬ ॥ স্কেপটিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এতো এক রকম অবিসংবাদিত সত্য।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু যুক্তিবাদী প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : মুক্তবুদ্ধি বা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাবন্ধিক সত্যকে গ্রহণ করে সভ্যতা গড়ে তোলার পক্ষে মত ব্যক্ত করে আলোচ্যাংশের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কল্যাণ ও মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য মানুষ সামাজিক নীতি ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছে। আসলে নীতি ও আদর্শ এক নয়। বহু ধর্ম, বহু মত; এক ধর্ম অন্য ধর্মকে সহ্য করে না। এক মতবাদী অন্য মতবাদীর ওপর চড়াও হয়। এমনি করে মানবসমাজে হিংসা-

বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতার জন্ম হয়। ফলে মানুষের মাঝে নিছক চিন্তা, দল, স্বার্থ এবং স্বধর্ম শ্রেষ্ঠতর– এ অহংকার জন্ম নেয়। এজন্যই সভ্যতার বিকাশ মুক্তচিন্তা ও স্বাধীন চিত্তবৃত্তির ওপর নির্ভরশীল। নিছক ধর্মচিন্তার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থেকে আত্মাকে মুক্ত করতে না পারলে সত্য সহজ পথের বিকাশ লাভ করতে পারে না। সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছে এক উদার আলোকের সহজ বিকিরণের রশ্মিজালে। অন্যায়, অবিচার, জুলুম, নির্যাতন, হিংসা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং ধর্মবিশ্বাস এবং তার অপব্যবহার মানুষের উদার মহৎ হৃদয়-ধর্মকে খণ্ডিত করে। এ থেকে মুক্ত হয়ে উদার হৃদয় দিয়ে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটাতে পারলেই সভ্যতা বিকাশ লাভ করবে।

মন্তব্য : আত্মাই মানুষকে পরিচালিত করে। আত্মার উন্নতিই মানুষকে সুন্দর ও সুশীল করে। সভ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আত্মাকে উদার হতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৭ ॥ যা নিয়ে বাঁচা যায়, আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, বিশ্লেষণধর্মী, প্রগতিশীল লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক মানুষের বেঁচে থাকার উপাদানের সাথে তার চিন্তার বিকাশের উপাদানের তুলনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানুষ তার শারীরিক বৃদ্ধি ও বেঁচে থাকার তাগিদে নানা খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে, কিন্তু তাই বলে খাদ্যই মানুষের জীবনের সবকিছু নয়। কারণ মানুষ খাদ্য গ্রহণের জন্য বাঁচতে চায় না, বাঁচতে চায় জীবনকে সুন্দরভাবে বিকশিত করার জন্য। আর সে মহান লক্ষ্যে বাঁচার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন, কিন্তু মানুষের মনের বা আত্মার যে চাহিদা, তার সাথে সাধারণ খাদ্যের তুলনা হয় না। আত্মার খোরাক হলো প্রেরণা, উৎসাহ, ভালোবাসা ইত্যাদি। আত্মার এরূপ খোরাক বলবর্ধক খাদ্যে পাওয়া যায় না। মানুষের আত্মার এসব খোরাক যুগিয়ে দেয় সংস্কৃতি। সংস্কৃতি প্রেরণা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, শিল্প-সাহিত্য দিয়ে মানুষের সুপ্ত মন জাগ্রত করে তোলে। মানুষকে আত্মসচেতন, রুচিসম্পন্ন, মার্জিত, জ্ঞানী ও মহৎ করে তোলে। তবে মানুষ কেন মহৎ হতে চায়, তার কারণ আজও রহস্যময়। এটা অন্তরের উপলব্ধির বিষয়। এজন্যই সংস্কৃতিমান ব্যক্তি চান মানবমনের ক্ষুৎপিপাসার জগৎটি তৈরি হোক সাধারণ ক্ষুৎপিপাসার উর্ধ্বে। তাই প্রাবন্ধিক বলেছেন, যা নিয়ে বাঁচা যায় আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না।

মন্তব্য : নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই মানুষকে বেঁচে থাকা উচিত। কারণ বেঁচে থাকার উপাদানগুলো তাকে আপন ভুবন থেকেই গ্রহণ করতে হয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৮ ॥ যে বিনা কারণে নিজেকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দিতে তার তিলমাত্রও বাঁধে না।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আত্মপীড়ন থেকে যে অপরকে পীড়া দেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে লেখক এখানে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : নীতিবিদগণ মানুষকে সংযম শিক্ষা দিতে স্বর্গলাভের লোভ দেখান। তাই মানুষ স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সর্বস্বতার প্রতি ঝুঁকে পড়ল। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলার মতো পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হলো না। কোনো জিনিসের জন্য প্রতীক্ষা করাই সংযম। মানুষ যদি প্রেমের জন্য অপেক্ষা করতে শেখে তাহলে ভিন্নতর সংযমের দরকার হয় না। আর আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে সংযম সফল হয় না, আত্মপীড়ন নিষ্ঠুরতার শামিল। একমাত্র নিষ্ঠুর ব্যক্তিই আত্মাকে বঞ্চিত করতে পারে। যে বিনা কারণে নিজেকে দুঃখ দেয়, সে অপরকে দুঃখ দিতে সংকোচবোধ করে না। নিষ্ঠুরতার সাথে যে কর্ম সাধিত হয়, তার মূলে আছে আত্মপীড়ন। আর আত্মপীড়ন বা আত্মবঞ্চনা থেকে উদগ্রতার জন্ম হয় এবং সেই উদগ্র পিপাসা নিবৃত্ত করার বাসনাকে উদ্দীপ্ত করেই মনুষ্যত্বের মুখে কালিমা লেপন করে থাকে।

মন্তব্য : আত্মাকে বঞ্চিত করার অর্থ দুঃখ পাওয়া। যে নিজেই দুঃখ পায়, সে অপরকে দুঃখ দিয়ে ব্যথা পায় না। এভাবেই তার দ্বারা সমাজ কলুষিত হয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৮৯ ॥ সভ্যতা শুধু প্রগতি নয়, আরো কিছু।
অথবা, প্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সভ্যতা হয় না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, যুক্তিবাদী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রশ্নোল্লিখিত উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে প্রগতির সাথে তার পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রগতি ও সভ্যতাকে অনেকে সমার্থক ভাবতে পারে। সাধারণ মানুষ এ দুটোর মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। তারা এ দুটো বিষয়কে মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মনে করে। কারণ প্রগতি মানে উত্তরোত্তর পরিবর্তন। শুধু জ্ঞানের ক্ষেত্রেই এ পরিবর্তনশীলতা, অবধারিত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়। তাই জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই তারা প্রগতি বলে মনে করে। প্রকৃতির ওপর মানুষের বিজয়ে যে সমৃদ্ধি অর্জিত হয়, তার বিতরণকেই তারা প্রগতি ভাবে, কিন্তু সভ্যতা শুধু প্রগতি নয়। সভ্যতা আরো অনেক বেশি কিছু। সভ্যতার আরেক নাম– Creation of life. প্রগতির সাথে সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সভ্যতা হয় না, কিন্তু সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাপারটা হলো শিল্পের ব্যাপার। কারণ শিল্প হলো সৌন্দর্য ও প্রেমের অভিব্যক্তি। শিল্প ও সৌন্দর্য চিরন্তন, তাই অপরিবর্তনশীল। আর এ কারণেই তা প্রগতির বিষয় নয়, পুরোপুরি সভ্যতার বিষয়। ফুলের সৌরভ, মায়ের ভালোবাসা, নদীর সৌন্দর্য, শিশুর হাসি প্রভৃতি কখনো নতুন বা পুরাতন হতে পারে না, এসব চিরন্তন। আর এ চিরন্তনের স্পর্শ না পেলে সভ্যতা সৃষ্টি হয় না। কেননা সভ্যতা মূল্যবোধের ব্যাপার। তাই জীবনে সোনা ফলাতে হলে প্রগতিকে চলতে হবে সভ্যতার দিকে মুখ করে। তা না হলে তার কাছ থেকে বড় কিছু আশা করা যায় না। সুতরাং প্রেম ও সৌন্দর্য ছাড়া প্রগতি যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি প্রগতি ছাড়া সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না।

মন্তব্য : সভ্যতা ও প্রগতির বিকাশে মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃত মানুষ ও সংস্কৃতিমান। উভয়টি পরস্পরের পরিপূরক হলেও উভয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান। আর প্রগতি সভ্যতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯০ ॥ সংস্কারমুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, যুক্তিবাদী ও বিশ্লেষণধর্মী প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতি ও সংস্কারমুক্তির স্বরূপ এবং মূল্যবোধকে সংস্কৃতির আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতি মুক্তচিন্তার শাণিত ফসল। নিজে বাঁচা, নিজেকে মহান, সুন্দর, বিচিত্র করা সংস্কৃতির কাজ। নিজের ভেতর স্বধর্ম সৃষ্টি করা এর উদ্দেশ্য। সংস্কৃতি মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও প্রগতির সংস্পর্শে বিকশিত হয়। প্রথাগত চিন্তা বা সংস্কারের আবর্তে তা বন্দি হতে চায় না। তাই অনেকে সংস্কারমুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে এবং উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না, কিন্তু তা সত্য নয়। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হবে। সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির একটি শর্তমাত্র, তাও অনিবার্য শর্ত নয়। সংস্কৃতির জন্য অনিবার্য শর্ত হলো মূল্যবোধ। সংস্কারমুক্তি ছাড়া সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি হয় না। যে সংস্কৃতিতে মূল্যবোধ নেই তা কোনো সংস্কৃতিই নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে কুসংস্কারও এর চেয়ে ভালো। যৌনসর্বস্বতার মতো খারাপ দর্শন আর দ্বিতীয়টি নেই। অর্থগৃধ্নুতাও তেমনি একটি নিকৃষ্ট ব্যাপার। এসব বিষয়ের প্রতি উদারতাকে কেউ কেউ সংস্কারমুক্তি বলে মনে করতে পারেন, কিন্তু এ নব সংস্কারমুক্তির পশ্চাতে কোনো মূল্যবোধ নেই। জীবনের জন্য তা কোনো দিক থেকেই কল্যাণকর হতে পারেনি। এ কারণেই মূল্যবোধহীন সংস্কৃতি সংস্কৃতির সংজ্ঞায় পড়ে না; বরং কামের চেয়ে প্রেম বড়, ভোগের চেয়ে বড় উপভোগ– সংস্কৃতির জন্য এ সংস্কার বেশি প্রয়োজন। এ সংস্কার না জন্মানো পর্যন্ত সংস্কৃতি হয় না। সূক্ষ্ম জীবনবোধের প্রতি যে আকর্ষণ তা থেকেই মূল্যবোধ জন্মায়। সংস্কারমুক্তি থেকে তা জন্মায় না। সুতরাং মূল্যবোধই সংস্কৃতির প্রাণ।

মন্তব্য : সংস্কারমুক্তিই সংস্কৃতি নয়; সংস্কৃতির জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধ। সে মূল্যবোধেই কালচার্ড মানুষের জন্ম হয়। মূল্যবোধহীন সংস্কৃতি প্রাণহীন দেহতুল্য।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯১ ॥ 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে' স্নাত না হলে সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু যুক্তিবাদী ও দার্শনিক প্রবন্ধকার মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : সুন্দরের আরাধনাই হচ্ছে সংস্কৃতি আর সংস্কৃতি যে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে লাভ করা যায়, সেকথা ব্যক্ত করতে গিয়ে লেখক আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : সৃষ্টিগতভাবে মানুষ সংস্কৃতিমান প্রাণী। মানুষের সার্বিক কর্মকাণ্ডের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। প্রগতির বিকাশ ও সভ্যতার উন্নয়নে সংস্কৃতির গুরুত্ব সীমাহীন। সবার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আত্মশুদ্ধির যে সাধনা তাকেই লেখক সংস্কৃতি বলেছেন। সংস্কৃতিমান হওয়া মানে প্রেম হওয়া। লেখক সংস্কৃতি সাধনায় প্রেমের গুরুত্বকে অপরিহার্যরূপে দেখেছেন। হিংসায় উন্মত্ততা আসে, হৃদয়ে ক্ষোভ জাগে এবং এতে মনুষ্যত্ব বিধ্বস্ত হয়। মনুষ্যত্বের অপমান মানুষের মহিমা বিকাশের পরিপন্থি। সব মানুষের স্পর্শ

লাভ করে জীবন এক অনাবিল সহযাত্রী হতে পারলে তবেই সংস্কৃতিমান হওয়া সম্ভব। কাউকে ঘৃণা করে, হৃদয়ে ক্ষুদ্র অনুভূতি জাগিয়ে রেখে জীবনকে মাধুর্য দান করা যায় না। সবাইকে ভালোবাসা এবং সে ভালোবাসার প্রসারেই সংস্কৃতি প্রাণ পায়। সংস্কৃতিমান হতে হলে প্রেমের পসরা খুলে জীবনকে আরো সুন্দর ও সার্থক করে গড়ে তুলতে হবে।

মন্তব্য : অহংকার, ঘৃণা, হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করে সব মানুষের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মহৎ শিক্ষাই সংস্কৃতির শিক্ষা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯২ ॥ কামের চেয়ে প্রেম বড়, ভোগের চেয়ে উপভোগ, এ সংস্কার না জন্মালে সংস্কৃতি হয় না।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু সুখ্যাত সাহিত্যিক, বিশ্লেষণধর্মী ও মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতি যে কাম নয় প্রেম, ভোগ নয় উপভোগের পথ ধরে আসে, তা তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : জীবনকে পবিত্র, সুন্দর, মহৎ ও বিচিত্র করে তোলার নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মূলে থাকে প্রেম, সৌন্দর্য ও অমৃতে ভরা উচ্চতর জীবনের কামনা। সংস্কৃতিমান মানুষ তাই কাম-গন্ধে ভরা স্থূলতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। প্রেমের শক্তিতে মহীয়ান হয়ে তারা ভোগের চেয়ে উপভোগকে বড় করে দেখে। নারীকে তারা কখনো স্থূল যৌনতার প্রতীক হিসেবে ছোট করে দেখে না– দেখে পুরুষের চলার পথে উৎসাহ ও প্রেরণাদাত্রী হিসেবে, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরক ও উচ্চতর জীবনের সহায়ক হিসেবে। তারা ভোগকে তুচ্ছ এবং উপভোগকে বড় করে দেখে। কেননা উপভোগ মানুষের চিত্তে আনন্দ দেয়। আবার কামের চেয়ে প্রেমকে বড় করে দেখে। কেননা মানব-হৃদয়ে প্রেমের আধিক্য থাকলে কাম তাকে দগ্ধ করতে পারে না। প্রেম দিয়ে অতি সহজেই সবকিছু জয় করা যায়। মনীষিগণ প্রেমের মাধ্যমেই পৃথিবী জয় করেছেন। কারণ ভোগে তৃপ্তি নেই, আছে ক্লান্তি। কামভোগ মানুষের আয়ুবল ক্ষীণ করে দেয়। তাই সংস্কৃতিমান ব্যক্তির কাছে কামভোগ মুখ্য নয়, প্রেমই বড়। যার অন্তরে এ চেতনার জাগরণ হবে, বুঝতে হবে সেখানে সংস্কৃতির আগমন দ্রুততর হচ্ছে।

মন্তব্য : সংস্কৃতির মূল আশ্রয়ই প্রেম। প্রেম পবিত্রতার, মহত্ত্বের, সরলতার প্রতীক। প্রেমবান হওয়া মানেই সংস্কৃতিমান হওয়া। হৃদয়ে এ সংস্কার না জন্মালে তা আর যাই হোক সংস্কৃতি হতে পারে না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯৩ ॥ সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।

[ফা. প. ২০০৮, '১৬]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের যুক্তিবাদী ও মননশীল ব্যক্তিত্ব এবং প্রথিতযশা সাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য সুন্দর উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতির অর্থ চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতি আমাদের জীবনেরই অঙ্গ। জীবনের বাইরে এর কোনো স্থান নেই। যেখানে সংস্কৃতি যত উন্নত, সেখানে জীবন তত উন্নত। সংস্কৃতি হচ্ছে উন্নততর জীবন-

ভাবনা ও নিজের চিন্তাচেতনা, কল্পনার বিকাশ সাধন। নিজের ভেতরে আমিত্ব সৃষ্টি করা, স্বধর্ম সৃষ্টি করা তথা আত্মার বিকাশ ঘটানোর নামই সংস্কৃতি। অমৃত কামনা তথা প্রেম কামনা, সৌন্দর্য কামনা, উচ্চতর জীবন কামনা– এসবই সংস্কৃতি। বিচিত্র দেশ, বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে, বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়ে বাঁচা, নিজেকে বিকশিত করা, আনন্দ প্রেম দ্বারা উপভোগ করা, নিজেকে উপলব্ধি করা, বিশ্বের বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচার নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি ব্যক্তিকে সুন্দর করে, মার্জিত করে, অনন্য করে, মহৎ করে, সমাজে বিকশিত করে, তাই সংস্কৃতিমান হওয়া সবারই কাম্য হওয়া উচিত। সংস্কৃতি মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এটি মনুষ্যত্বের চরম বিকাশের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রগতির ধারক হয়ে দাঁড়ায়। এটি ধর্ম, মতবাদ বা আদর্শের বিধি-বিধানের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে মানুষকে আপন সত্তায় মহীয়ান হতে শেখায়, সুন্দরভাবে সার্থকভাবে বাঁচতে শেখায়।

মন্তব্য : সংস্কৃতিমান মানুষ মানেই স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল এক বিকশিত মানুষ। প্রেম-পুণ্য, ভালোবাসায় ভরপুর এক মহৎ মানুষ। সংস্কৃতিমান ব্যক্তি ধর্মীয় শৃঙ্খল আর মতবাদের নাগপাশ কাটিয়ে বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯৪ ॥ প্রেমের তাগিদে বিচিত্র জীবনধারায় যে স্নাত হয়নি সে তো অসংস্কৃত।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের বিশ্লেষণধর্মী, মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী বিরচিত 'সংস্কৃতি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক সংস্কৃতিমান মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রেমের আবশ্যকতার কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানুষ সৌন্দর্যের পূজারী, সত্যের অনুসন্ধানী। সে নিজেকে বিকশিতকরণে, উন্নততর জীবনের সন্ধানে সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। জীবনকে ripe তথা পরিপক্ব করতে সংস্কৃতির অবদান সন্তানের কাছে মায়ের অবদানের সমতুল্য। সংস্কৃতিকে করায়ত্ত করতে হলে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা হচ্ছে প্রেম। প্রেম মানুষকে উদার করে, সহনশীল করে, রুচিবান করে তার জীবনকে সুন্দর হতে সাহায্য করে। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই মানুষ সুন্দরভাবে, মহৎভাবে, বিচিত্রভাবে বাঁচে। প্রেম দ্বারা মনীষিগণ বিশ্ব জয় করেছেন। তাই সংস্কৃতিমান হতে গেলে জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন আয়ত্ত করতে হয়, তার চেয়ে বেশি করে আয়ত্ত করতে হয় প্রেমময় হওয়ার সাধনা। তাকে মানবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেমে প্রেমময় হতে হয়। এর ফলে নিজের জীবনে ক্ষুদ্র তুচ্ছ লোভ, পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তির লোভ তার থাকে না। তার থাকে মানুষকে ভালোবাসার লোভ। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা, বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসার লোভ। প্রেমময় হওয়াই সংস্কৃতিমান হওয়ার প্রধান শর্ত। প্রেমের অন্বেষণে তাকে বিচিত্র দেশ ও জাতির জীবনধারায় স্নাত হতে হয়। বর্জন নয় অর্জনের মাধ্যমে সবার পরশে স্নিগ্ধ হয়ে জীবনকে এগিয়ে নিতে হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে হয়। তাহলেই প্রেমময় তথা সংস্কৃতিমান হওয়া যায়।

মন্তব্য : প্রেমময় হওয়া মানেই সংস্কৃতিমান হওয়া। হৃদয়ে এ সংস্কার না জন্মালে কখনোই সংস্কৃতিমান হওয়া যায় না। তাই বিচিত্র জীবনধারায় স্নাত হয়ে অন্তরে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে পশুত্বকে দূর করার মাধ্যমে যথার্থ সংস্কৃতিমান হওয়া সম্ভব।

রাজবন্দীর জবানবন্দী

» ব্যাখ্যা : ৯৫ ॥ আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত ভগবান।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু ব্রিটিশবিরোধী লেখকদের অগ্রনায়ক, বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক ব্রিটিশ সরকারের আদালতের বিচারককে কটাক্ষ করে আত্মপক্ষ সমর্থনপূর্বক সৃষ্টিকর্তাকে তার পক্ষের সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : ১৯২২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এ পত্রিকায় ব্রিটিশবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করে। এ মামলা 'ধূমকেতু মামলা' নামে পরিচিত। এ মামলায় কবিকে গ্রেফতার করে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কারাগারে বন্দি থাকাবস্থায় কবি ধূমকেতু মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে লিখিতাকারে একটি অগ্নিঝরা বক্তব্য দাখিল করেন। এটিই পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নামে প্রকাশিত হয় এবং পাঠকমহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কবি তার অনলবর্ষী জবানিতে বলেন, "আমার ওপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত। এক ধারে রাজার মুকুট; আর ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরেকজন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।" তিনি রাজার পক্ষকে কটাক্ষ ও সমালোচনা করে বলেন, রাজার পক্ষে নিযুক্ত আছে রাজবেতনভোগী রাজ অনুগ্রহপুষ্ট রাজকর্মচারী বিচারক। তার কাজ রাজাকে সন্তুষ্ট করা। যেহেতু এ বিচারক রাজার কাছ থেকে বেতন নেয়, সেহেতু সে বিচারের ক্ষেত্রে রাজা যা চায় তা-ই করে, কিন্তু কবির পক্ষে আছেন সকল রাজার যিনি রাজা, সকল বিচারকের যিনি বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে যিনি অক্ষয় সত্য রাজাধিরাজ, সেই সর্বশক্তিমান জাগ্রত স্রষ্টা। তাঁর বিচারে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই।

মন্তব্য : ব্রিটিশ সরকারের আদালতের বিচারক সরকারের বেতনভুক্ত রাজকর্মচারী। সে রাজার অনুগ্রহে প্রতিপালিত। তাই রাজার হুকুম পালন করাই তার কাজ। সে রাজাকে সন্তুষ্ট করতে চায় পুরস্কার পাওয়ার লোভে। তাই তার থেকে কখনো ন্যায়বিচার আশা করা যায় না।

» ব্যাখ্যা : ৯৬ ॥ আমার বিচারককে কেউ নিযুক্ত করেন নাই। এ মহাবিচারকের দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-নির্ধন, সুখী-দুঃখী, সকলে সমান।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংগ্রামী কবি ও প্রাবন্ধিক বিদ্রোহী কবিখ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক রাজাধিরাজ, সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক মহান সৃষ্টিকর্তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিদ্রোহী কবি ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে কারাবন্দি থাকাবস্থায় আদালতে দাখিল করার জন্য এ জবানবন্দিটি রচনা করেন। তিনি তখন 'ধূমকেতু' মামলায় কারাগারে বন্দি ছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ মামলায় তাকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মামলার বিচারকার্য যখন চলছিল তখন কবি আত্মপক্ষ সমর্থন করে এ জবানবন্দিটি লিখেন। এ মামলার বিচারক ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বেতনভোগী রাজকর্মকর্তা। তার ওপর কবির কোনো বিশ্বাস বা আস্থা ছিল না। কারণ রাজার নিয়োগকৃত বিচারক নিরপেক্ষ নয়। তাই তিনি ব্রিটিশ বিচারকের সমালোচনা করে বলেন, তার নিজ পক্ষের বিচারক স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান। এ বিচারককে কেউ নিযুক্ত করে না। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টিতে রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, ছোট-বড়, সাদা-কালো সবাই সমান। তাই তার বিচার সর্বদা নিরপেক্ষ। ব্রিটিশ রাজার নিয়োগকৃত বিচারক নিরপেক্ষ নয়, কারণ তার একদিকে থাকে রাজার ভয়, অন্যদিকে থাকে লোভ।

মন্তব্য : সৃষ্টিকর্তা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তার কাছে কোনো ইতরবিশেষ নেই; বরং সবাই তার কাছে সমান। তিনি কারো প্রতি কোনোপ্রকার পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯৭ ॥ রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। [ফা. প. ২০১৩]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রবন্ধকার বোঝাতে চেয়েছেন, শাসকের বাণী জনমানসে স্বল্প সময়ের জন্য সাড়া জাগায়, যা বুদ্বুদের ন্যায়, কিন্তু যে কবি কিংবা মানুষ কথা বলে কল্যাণের পক্ষে, সত্যের পক্ষে, নির্যাতিতের পক্ষে, তার কথা তরঙ্গমুখর সমুদ্রের ন্যায় সঞ্চরণশীল।

বিশ্লেষণ : লেখক, সাহিত্যিক ও কবিগণ সবসময় মানুষের কথা বলেন, জীবনের কথা বলেন, রাজকার্যের সুবিধা-অসুবিধা, শুভাশুভ তাদের বিবেচ্য নয়। কবিরা খেলা করেন মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও মুক্তি নিয়ে। তারা একে রূপায়িত করেন কবিতা ও গানে। কবি নজরুল ইসলামও তাই করেছিলেন। নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও অধিকারের কথাই তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। মানুষের কথা বলতে গেলে তা অনেক সময় শাসকের বিরুদ্ধে চলে যায়। তিনিও সে কাজটিই করেছিলেন। রাজার ভয় বা পুরস্কারের লোভ তাকে দমিয়ে রাখতে পারেনি, মানুষের কথা বলতে গিয়ে কবি রাজদ্রোহী সাব্যস্ত হয়ে রাজার নির্দেশে বন্দি হন, কিন্তু তাতেও এতটুকু দমে যায়নি তার কণ্ঠ। তিনি জেলে বন্দি থেকেও লিখেছেন ব্রিটিশ রাজশক্তিবিরোধী কবিতা, গান, প্রবন্ধ; গেয়েছেন সত্যের জয়গান। সমুদ্রকে যেমন বাঁধ দিয়ে আটকানো সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি নির্যাতনের মাধ্যমে কবির লেখনীকেও স্তব্ধ করা সম্ভব নয়।

মন্তব্য : কবি রাজশক্তিকে মোটেও ভয় করেন না। রাজা অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে আর কবি সর্বদা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। তাই কবি মানসিকভাবে রাজার চেয়ে অনেক শক্তিশালী।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯৮ ॥ আমি কবি, অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র, ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতকারী বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক নিজের প্রবল আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে নিজেকে স্রষ্টা প্রেরিত সত্যের সেবক বলে দাবি করেছেন।

বিশ্লেষণ : 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম কারাগারে বন্দি হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকাবস্থায় তিনি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নিবন্ধটি লিখে আদালতে দাখিল করেন। এ প্রবন্ধে কবি নিজেকে সত্যের সেবক বলে দাবি করে ব্রিটিশ বিচারককে মিথ্যার সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তার নিজের অবস্থানের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় কবি অনিবার্য সত্য প্রকাশ করেছেন। কবিমাত্রই সত্যের সেবক। সত্য প্রকাশ করা যে-কোনো কবির নৈতিক দায়িত্ব। ব্রিটিশ শাসকরা পরাধীন ভারতবাসীকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে রেখেছিল। মিথ্যার সেই আবরণ ছিন্ন করার সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। সত্য প্রকাশের মহান দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। সেজন্য তার কোনো দুঃখ নেই। কারণ তিনি মনে করেন, তিনি কবি– অপ্রকাশ সত্য প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্যই তিনি স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন। অর্থাৎ তার ধারণা এবং বিশ্বাস, স্রষ্টাই তাকে সত্য প্রকাশের এবং অমূর্তকে মূর্তিদানের দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই কবি তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেতন।

মন্তব্য : কবি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত একজন দূত। তিনি সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের রোষানলে পড়ে অনেক নির্যাতনের শিকার হয়েও সত্যের পথ থেকে সরে দাঁড়াননি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯৯ ॥ সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না। [ফা. প. ২০০৮]
অথবা, আমি সেই চিরন্তন স্বয়ম- প্রকাশের বীণা, যে বীণায় চির-সত্যের বাণী ধ্বনিত হয়েছিল।
অথবা, আমি ভগবানের হাতের বীণা।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক, ভারতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নায়ক কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম নিজেকে স্রষ্টার হাতের বীণা বলেছেন এবং স্বয়ংপ্রকাশ সত্যের কতিপয় বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার অভিযোগে কারাবরণ করতে হয়েছিল কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। এ ধূমকেতু মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে কবি আদালতে যে জবানবন্দি দাখিল করেছিলেন, তা-ই পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকায় 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এ জবানবন্দিতে কবি নিজেকে স্রষ্টা নির্দেশিত সত্যের সেবক বলে দাবি করেছেন। সত্য কখনো গোপন থাকে না। তা একদিন না একদিন আপনা আপনিই প্রকাশিত হবে। কোনো রাজশক্তির রক্তচক্ষু সত্যের প্রকাশ দমিয়ে রাখতে পারে না। কবি নিজেকে সত্যের স্বয়ংপ্রকাশের বীণা বলে অভিহিত করেন। এ বীণায় স্রষ্টা চিরসত্যের বাণী প্রকাশ করেন। কবি বলেছেন, তিনিই সেই চিরন্তন সত্য প্রকাশের বীণা। রাজশক্তি এ বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু যিনি

বীণা বাজান সেই স্রষ্টাকে কেউ কখনো ভাঙতে পারেন না। তিনি অমর, তিনি চিরঞ্জীব। তাই সত্যকে কখনো বিনাশ বা ধ্বংস করা যায় না। তেমনি ব্রিটিশদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ করায় তারা কবির ওপর শত নির্যাতন চালালেও সত্যকে তারা কোনোদিন রুদ্ধ করতে পারেনি।

মন্তব্য : সত্য অবশ্যই স্বয়ংপ্রকাশ। যুগে যুগে ইতিহাসের পাতায় আমরা তাই দেখেছি। কোনো শক্তি সত্যকে চেপে রাখতে পারে না। শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে সত্য আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়ে যায়। তেমনি ব্রিটিশদের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনিও জনগণের সামনে প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল।

» ব্যাখ্যা : ১০০ ॥ নির্বোধ মানুষের অহংকারের আর অন্ত নাই, সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু অহঙ্কার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু ভারতবর্ষে ব্রিটিশবিরোধী লেখকদের অগ্রনায়ক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমালোচনা করে তাদের অহংকার চূর্ণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : ভারতবর্ষে যখন ব্রিটিশদের আধিপত্য চলছিল, তখন তাদের অহংকারের অন্ত ছিল না। তারা ক্ষমতার দাপটে পরাধীন ভারতবাসীর ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রাবন্ধিক ব্রিটিশদের এসব নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তার সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার অপরাধে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কোলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় কবি ধূমকেতু মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য এ প্রবন্ধটি রচনা করেন। এ প্রবন্ধে কবি সরকারকে মিথ্যার প্রতীক হিসেবে আখ্যায়িত করে নিজেকে সত্যের সেবক বলে দাবি করেন। সরকার ক্ষমতার দাপটে ধরাকে সরাজ্ঞান করে চরম অহংকারী হয়ে উঠেছিল। তারা সৃষ্টিকর্তাকে তোয়াক্কা করে না; তাই তারা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে চায়, কিন্তু কবির মতে, এরা অত্যন্ত নির্বোধ। কারণ এমন একদিন আসবে যখন তাদের অহংকার সত্যের দাবানলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মন্তব্য : নির্বোধ মানুষ তাদের দুষ্কর্ম ও দুর্বলতা ঢাকার জন্য অহংকার প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু এ অহংকারই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ তারা তা অনুধাবন করতে পারে না।

» ব্যাখ্যা : ১০১ ॥ আমি মরব, রাজাও মরবে।

অথবা, কেননা আমার মতন অনেক রাজবিদ্রোহী মরেছে, আবার এমনি অভিযোগ আনয়নকারী বহু রাজাও মরেছে।

অথবা, কিন্তু কোনো কালে কোনো কারণেই সত্যের প্রকাশ নিরুদ্ধ হয়নি –তার বাণী মরেনি।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু ভারতে ব্রিটিশ শাসনবিরোধী শক্তিমান কবি ও লেখক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক বলতে চেয়েছেন, মানুষ মরণশীল হলেও সত্য শাশ্বত, অমর ও চিরন্তন।

বিশ্লেষণ : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করায় তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ ওঠে। পরবর্তীতে তাকে এ অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার কারারুদ্ধ করে, কিন্তু কবিকে কারারুদ্ধ করে সরকারবিরোধী বক্তব্য থেকে বিরত রাখা যায়নি। তিনি কারাগারে বন্দি থাকাবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে জবানবন্দি রচনা করেন, তাতে তিনি সবার মরণশীলতার প্রসঙ্গে এ উক্তিটি করেন। রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত তিনি আর যিনি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তারা কেউ চিরজীবী নন। তাদের প্রত্যেককেই একসময় এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। মানুষ মরণশীল। কবি এবং রাজা সবাই এ দলে। কোনো কালে কোনো দিন সত্য চাপা থাকেনি। সত্য তার আপন মহিমা নিয়ে প্রকাশ পাবেই। আর অত্যাচারী– সে যত শক্তিশালীই হোক তার বিনাশ অপরিহার্য। কবি সত্য প্রকাশের জন্য লড়ছেন। কবি জানেন, তার একদিন মৃত্যু হবে এবং রাজারও মৃত্যু হবে। সুতরাং রাজা যদি তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন তাতেও তিনি সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হবেন না। কারণ তিনি স্রষ্টার সত্য প্রকাশের বীণা।

মন্তব্য : Man is mortal. অর্থাৎ, মানুষ মরণশীল। পৃথিবীতে কেউ চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না। সবাইকে একদিন মরতে হবে। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী উভয়েই মরবে, কিন্তু সত্য অমর। তার কোনো মৃত্যু বা ধ্বংস নেই।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১০২ ॥ সুর আমার বাঁশির নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশি সৃষ্টির কৌশলে।
অথবা, অতএব দোষ বাঁশিরও নয়, সুরেরও নয়, দোষ আমার, যে বাজায়।
অথবা, দোষ আমারও নয়, আবার বীণারও নয়, দোষ তাঁর– যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক বোঝাতে চেয়েছেন, যিনি সত্যের বীণা বাজান, সুর তোলেন, প্রকৃতপক্ষে সে সুর তার নয়; বরং সৃষ্টিকর্তাই তার কণ্ঠে সত্যের সুরের ঝঙ্কার তোলেন।

বিশ্লেষণ : সত্যের সাথে যোগ রয়েছে পরম সত্তার, পরম শক্তিমানের। সে সত্য মনুষ্যকুলে যিনি ধারণ করবেন, তার যোগ ঘটবে মহাশক্তির সাথে, মহাসত্যের সাথে। স্রষ্টার অংশীভূত হয়ে যান তিনি। তখন তার কণ্ঠ শুধু নিজের কণ্ঠ থাকে না, সে কণ্ঠ হয়ে যায় লাখো কোটি প্রাণের কণ্ঠ, স্রষ্টার কণ্ঠ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ আদালতে দাঁড়িয়ে এ কথাগুলো বলেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ বিচারককে চিরসত্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত রাজ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কারণ সত্য প্রকাশের দায়ে কাউকে দণ্ডিত হতে হবে, এমন বিচার তিনি মানতে চাননি। তাই তিনি বলতে চেয়েছেন, স্রষ্টা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েই তিনি সত্য বলায় উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন, তার বীণায় প্রলয়ের সুর তুলেছিলেন, নটরাজের ত্রিতাল সুর। যে সুরের তাণ্ডবলীলায় টালমাটাল প্রায় রাজশক্তি। যে কারণে কবি আজ অবরুদ্ধ এবং বিচারের কাঠগড়ায়। কবি আরো বলেছেন, প্রকৃত অর্থে এ বীণা তার নয়, এ সুরও তার নয়। এ বীণা তার হাতে তুলে দিয়ে, তার কণ্ঠে সুর তুলে অন্য কেউ বাজিয়ে নিচ্ছেন। সুতরাং দোষ কবির নয়; বরং যিনি বাজিয়ে নিচ্ছেন সেই মহাশক্তিরই দোষ। অতএব অভিযুক্ত করা উচিত তাকে, কবিকে নয়।

মন্তব্য : কবি ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের পূজারী। তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সত্যের বীণার সুর। কবির কণ্ঠের এ সুর কেউ ধ্বংস করতে পারে না; কারণ কবিকে বাজান স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১০৩ ॥ তাঁহাকে বন্দী করবার মতো পুলিশ বা কারাগার আজও সৃষ্টি হয় নাই।
অথবা, রাজবিদ্রোহী আমি নই, প্রধান রাজবিদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দিবার তো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত সংগ্রামী কবি, ব্রিটিশ শাসনবিরোধী লেখক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ব্যাখ্যেয় উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক স্রষ্টার মহাশক্তির বর্ণনা এবং রাজবিদ্রোহের পক্ষ সমর্থনপূর্বক রাজশক্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় লেখার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল। ব্রিটিশ বেতনভোগী বিচারক কবিকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এ মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে কবি আদালতে একটি জবানবন্দি দাখিল করেন। এ জবানবন্দিই পরবর্তীতে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি এ জবানবন্দিতে নিজেকে সত্যের পূজারী এবং বিচারককে মিথ্যার প্রতিভূ বলে আখ্যায়িত করেছেন। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক তিনি। তিনি হলেন সত্যের বীণাবাদক। তাই মিথ্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বীণা বাজিয়ে জাতিকে জাগ্রত করার দায়িত্ব তার। আর এ গুরুদায়িত্ব তাকে দিয়েছেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তাকে যদি রাজবিদ্রোহী বলা হয় তাহলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও রাজদ্রোহী। আর তাকে যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে সে শাস্তি সৃষ্টিকর্তারও প্রাপ্য। অতএব সৃষ্টিকর্তাকে বন্দি করে শাস্তি দিতে হবে, কিন্তু তাকে বন্দি করার বা শাস্তি দেওয়ার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা নেই। তাকে বন্দি করার মতো পুলিশ বা কারাগার আজও তৈরি হয়নি। সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান। কবি তার নির্দেশেই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন।

মন্তব্য : স্রষ্টা রাজাধিরাজ। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সকল ক্ষমতার উৎস। তাকে বন্দি করার বা শাস্তি দেওয়ার শক্তি কোনো রাজার নেই।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১০৪ ॥ আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। [ফা. প. ২০০৭]
অথবা, উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্য তরবারী, ভগবানের আঁখিজল।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় উক্তির মাধ্যমে প্রাবন্ধিক তার বিদ্রোহের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, তার বিদ্রোহ কোনো রাজার বিরুদ্ধে নয়; বরং তার বিদ্রোহ মিথ্যা, অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে।

বিশ্লেষণ : কবি নিজেকে সত্যের সেবক বলে দাবি করেছেন। তার কণ্ঠে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার বাণী ধ্বনিত হয়। এ বাণী সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। কবির কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পায়

নিখিলের পীড়িত আত্মার আর্তচিৎকার। প্রাবন্ধিক কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্যপথের পথিক। ন্যায়ের পক্ষে তিনি ছিলেন অবিচল। তাকে শাসকগোষ্ঠী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, কিন্তু লেখক তার বিদ্রোহের বাণীকে বলেছেন সৃষ্টিকর্তার বাণী, তার উচ্চারিত নিয়ম-কাঠামোকে বলেছেন সর্বজনীন সত্য আইন, যে আইন সার্বভৌমিক সৃষ্টিকর্তার। প্রশ্নোদ্ধৃত অংশটুকু দ্বারা তিনি নিজের ওপর আনীত অভিযোগের সমালোচনা করেছেন। তার ওপর অভিযোগ যারা এনেছেন তারা শাসক। তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রযন্ত্র। এ রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক তিনি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজার পক্ষে যারা কাজ করেন তারা রাজবেতনভোগী সরকারি কর্মচারী। আর তিনি স্রষ্টার বীণা বাদক। তার কণ্ঠ দিয়ে স্রষ্টা যুগে যুগে সত্য প্রকাশ করেন। সত্যের প্রকাশ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। নির্যাতিত ও নিপীড়িতদের পাশে এসে কবি তাদের শক্তি ও সাহস জোগান। রাজার ক্ষমতা ক্ষুদ্র আর সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা রুদ্র। কবির পক্ষে রয়েছে আইন ও সত্য, রাজা দাঁড়িয়ে থাকেন মিথ্যা-ক্ষমতা আর জাত্যাভিমানের ওপর। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অপরাধ নয়। সৃষ্টিকর্তা সর্বদা ন্যায়ের পক্ষে। তিনি অন্যায় সহ্য করেন না। তাই তিনি কবিকে সত্যের তরবারি হাতে ধরিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য এবং অপ্রকাশ সত্য প্রকাশ করার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য প্রেরণ করেছেন। কবির কণ্ঠে স্বয়ং স্রষ্টা সাড়া দেন। বিচারের সময় তিনি কাঠগড়ায় কবির পেছনে এসে দাঁড়ান। সুতরাং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অর্থহীন। তার বিদ্রোহ কোনো রাজার বিরুদ্ধে নয়; বরং সকল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে।

মন্তব্য : অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর রাজদ্রোহ এক নয়। স্রষ্টা স্বয়ং সর্বদাই সত্যের পক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ১০৫ ॥ আজ এই আদালতে আসামির কাঠগড়ায় একা আমি দাঁড়িয়ে নেই, আমার পশ্চাতে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবানও দাঁড়িয়ে।

অথবা, যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক, বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সৃষ্টিকর্তা যে সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের সমর্থক, এখানে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন নিপীড়িত আর্তমানবতার কবি। দেশ ও মানুষের প্রতি অগাধ ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধে শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে শাণিত ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন। এতে তাকে রাজবিদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি করে রাখা হয়। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক কবিতা ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে তার ওপর ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন চালায়। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে তিনি জেলখানায় বসে যে জবানবন্দি রচনা করেন তা-ই পরবর্তীতে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শিরোনামে তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি ছিলেন সত্যের পূজারি। অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে তিনি কারাবরণ করেছেন। আদালত এবং সরকার তার প্রতিপক্ষ, কিন্তু সত্য সুন্দর স্রষ্টা সবসময় তার পক্ষে

আছেন। তাই বিচারকের আদালতে আসামির কাঠগড়ায় তিনি একা দাঁড়িয়ে নেই। তার সাথে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা দাঁড়িয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, যুগে যুগে যারা সত্যের সৈনিক হিসেবে অন্যায় ও মিথ্যার বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন, স্রষ্টা তাদের পেছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। স্রষ্টা কখনো অন্যায়-অসত্যকে সমর্থন করেন না। তিনি অন্যায়ের বিপক্ষে এবং ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। কবি সেই সত্যের সৈনিক। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ভিত্তিহীন।

মন্তব্য : সৃষ্টিকর্তা কখনো অন্যায়, অসত্য সমর্থন করেন না। তিনি সবসময়ই ন্যায় ও সত্যের পক্ষে। তাই তিনি সত্যের পক্ষের সৈনিকদের সাথে থাকেন সবসময়।

⏩ ব্যাখ্যা : ১০৬ ॥ সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক, পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্ভীক কলম সৈনিক কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে প্রাবন্ধিক রাজ বিচারকের স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে তাকে রাজভৃত্য বলে অভিহিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : রাজা তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিজের মতো করে আইন তৈরি করেন। আইন তার স্বার্থে চলে, তার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয়। সেখানে বিচারাসনে যে অধিষ্ঠিত সে রাজার বেতনভোগী রাজ কর্মচারী। সে ন্যায়ের নয়; সে আইনের। সে ইচ্ছে করলেই স্বাধীনভাবে কিংবা ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করতে পারে না। তাকে স্বার্থের কাছে, কর্তার কাছে, রাজার কাছে মাথা নত করতে হয়। রাজার হুকুম পালন করাই তার উদ্দেশ্য। কারণ তার সামনে থাকে রাজার নির্দেশনামা। এজন্য সে ইচ্ছে করলেও ন্যায়ের পক্ষে রায় দিতে পারে না। তাকে রায় দিতে হয় রাজার ইচ্ছে-অনিচ্ছে, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কথা মাথায় রেখে। বিচারক জানেন, যাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, তিনি সত্য কথা বলেছেন, ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বিচারক ন্যায়ের পথে রায় দিতে অক্ষম।

মন্তব্য : ব্রিটিশ বিচারক ছিল সাম্রাজ্যবাদী সরকারের গোলাম, রাজ বেতনভোগী কর্মচারী। তার পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব নয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ১০৭ ॥ তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন, তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামী কবি ও লেখক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক 'ধূমকেতু মামলা' পরিচালনাকারী বিচারককে মৃত্যু ও পরকালের ভয় প্রদর্শনপূর্বক তাদের পারস্পরিক বয়সের বিষয় উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি কাজী নজরুল ইসলাম মুক্তির অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় লেখার অপরাধে কবিকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারি কবি নজরুল ইসলাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে দাখিল করার জন্য লিখিত আকারে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাতে আদালতের বিচারক সম্পর্কে আলোচ্য অভিমত ব্যক্ত করেন। কবি জানতে পেরেছিলেন, যে বিচারক তার বিচার করছে

সেও একজন কবি। এটি ছিল নজরুলের জন্য আনন্দের খবর। বিদ্রোহী কবির বিচার করছে একজন বিচারক কবি। এ বিচারক কবি ছিলেন প্রবীণ। তাকে হাতছানি দিচ্ছিল বেলাশেষের শেষ খেয়া অর্থাৎ মৃত্যু। আর কবিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল নতুন জীবনের রক্ত উষার নব-শঙ্খ। বিচারককে ডাকছে মরণ আর আসামিকে ডাকছে জীবন। একজন অস্ত-তারা আর একজন উদয়-তারা। এ দুই বিপরীত মেরুর কবির মিলনের ব্যাপারে কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সন্দিহান। নিজস্ব অনুভূতি ও আবেগ দ্বারা তাড়িত হয়ে কবি এ আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন। তার বিচারকও তার মতো একজন কবি– এটি জেনে তিনি যেমন যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন, তেমনি উভয়ের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার আশাভঙ্গ হতেও বিলম্ব হয়নি।

মন্তব্য : রাজাকর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারক প্রবীণ হলেও সে তোষামোদকারী ও প্রবীণ। আর কবি নবীন, তোষামোদশূন্য ও আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী। কবির আদর্শ, কল্যাণকর্ম ও স্বাধীনতার সোপান রচনায় উৎসর্গীকৃত। সুতরাং অস্তায়মান তারা এবং উদীয়মান তারার মিলন কখনোই সম্ভব হয় না। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

➧ ব্যাখ্যা : ১০৮ ॥ কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে, এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। [ফা. প. ২০১৪, '১৭]

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক রাজশক্তির ভয় দেখিয়ে শাসকরা যে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায় ও দিনকে রাত হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাদের কঠিন পরিণতি তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। তারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করে জগদ্দল পাথরের ন্যায় শাসনক্ষমতায় চেপে বসে। তারা অন্যায়, অত্যাচারে লিপ্ত হয়ে প্রায় দু'শ বছর শাসন করেছে এ দেশকে। ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করে কবি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় ব্রিটিশ শাসনবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে রাজদ্রোহের অভিযোগে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। ব্রিটিশদের দুঃশাসনের প্রতি কটাক্ষ করে কবি এর স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, যা সত্য প্রকাশের পথে অন্তরায়, যা ন্যায়ের বিপক্ষে, তা সমাজে কখনোই স্থায়ীরূপ ধারণ করতে পারে না। তাদের ক্ষমতার সিংহাসন একদিন উল্টে যাবেই। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের অবসান সম্পর্কে প্রাবন্ধিক যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটেছে।

মন্তব্য : সত্য চিরকাল মিথ্যাকে পদদলিত করে স্বীয় বিজয় পতাকা উড়িয়েছে। মিথ্যা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু সত্য অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী।

➧ ব্যাখ্যা : ১০৯ ॥ আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার।

অথবা, আমায় ভয় দেখিয়ে, মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে বলা হয়েছে, নিখিল বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মার আর্তচিৎকারের প্রতিধ্বনিই কবির প্রলয় হুঙ্কার।

বিশ্লেষণ : পৃথিবীব্যাপী ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট মানুষের বুকফাটা ক্রন্দনে বাতাস ভারাক্রান্ত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসার অভাবে তারা মৃতপ্রায়। এসব কান্নাই শোষণ, বঞ্চনার শিকার মানুষের একমাত্র সাথি। শোষক ও অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর কবলে পড়ে তারা তাদের অধিকার, মর্যাদা এমনকি ন্যূনতম চাহিদা থেকেও বঞ্চিত। তারা অবহেলিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত। এ লাঞ্ছিত মানবাত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার কবিকে বিচলিত করে তার বিবেককে ব্যথিত করেছে। পরাধীনতার কারণেই তাদের এ করুণ অবস্থা। তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে মানবতার বাণী। তাদের বোঝাতে হবে স্বাধীনতার সুফল। সকল স্তরের জনতাকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। সম্মিলিত প্রলয় হুঙ্কারে রাজশক্তিকে পরাজিত করে আদায় করে নিতে হবে হারানো অধিকার ও মর্যাদা তথা স্বাধীনতা। তাহলে প্রতিষ্ঠিত হবে মানবতার বাণী, সাম্য ও ন্যায়বিচার। কবি তার হৃদয়ে তুলে নিয়েছেন নিখিল আত্মার যন্ত্রণা-চিৎকার আর কণ্ঠে তুলে নিয়েছেন প্রলয় হুঙ্কার। কোনো রাজশক্তি ভয় দেখিয়ে বা চোখ রাঙিয়ে তাকে থামাতে পারবে না। এ দেশের নিপীড়িত মানবাত্মার সাথে নিজেকে একাকার করে প্রলয় হুঙ্কারে ফেটে পড়েছিলেন তিনি। তাকে রাজশক্তি কোনো ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে থামাতে পারেনি। তাই রাজদ্রোহী হিসেবে কারাগারে তাকে বন্দি হতে হয়েছে, কিন্তু তাতেও কবির হুঙ্কার থামেনি। যুগে যুগে এমনিভাবে মহামানবের প্রলয় হুঙ্কারে অত্যাচারী রাজশক্তি ধ্বংস হয়।

মন্তব্য : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে যে প্রলয় হুঙ্কার উঠেছিল তা তার একার নয়; বরং তা সর্বকালের সর্বযুগের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও অধিকারবঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণা-চিৎকার।

⏩ ব্যাখ্যা : ১১০ ॥ সে সময় এই বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যা বলতেন, আমিও তাই এবং তেমনি করে বলছি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু ব্রিটিশবিরোধী কলম সৈনিক, বাংলা সাহিত্যাকাশের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে বলা হয়েছে, ব্রিটিশ বিচারককে কবির আসনে এবং কবিকে বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত করলে বিচারক কবির জবানবন্দিই অনুসরণ করতেন।

বিশ্লেষণ : ভারত আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন-শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এ শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য এ দেশের সাধারণ জনতা উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, কিন্তু অত্যাচার-নির্যাতনের খড়গ চালিয়ে ব্রিটিশ সরকার তাদের সোচ্চার কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে। তাই কবি সে অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। সে অপরাধে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু আজ ভারত পরাধীন না হয়ে যদি ইংল্যান্ডই ভারতের অধীন হতো এবং নিরস্ত্র ব্রিটিশ নাগরিকবৃন্দ জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য বর্তমান ভারতবাসীর ন্যায় আন্দোলন করতো, আর এ পটভূমিতে কবি যদি হতেন একজন ভারতীয় বিচারক এবং তার মতোই রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দি হয়ে এ ব্রিটিশ বিচারক আসামির কাঠগড়ায় আসত, তখন এ বিচারক আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে

যা বলত কবিও আজ তাই বলছেন। পরাধীন দেশের কবি, সে যে দেশেরই হোক না কেন, সর্বদা তার দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য কথা বলেন। দেশ ও জাতির জন্য লেখনী ধারণ করাই কবি ও লেখক সাহিত্যিকদের কর্তব্য। সে কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করতে গিয়ে কবি রাজদ্রোহের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয়েছেন।

মন্তব্য : পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য কবি সাহিত্যিকদের দেশ ও নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একান্ত কর্তব্য। যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকগণ এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

⏩ ব্যাখ্যা : ১১১ ॥ আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামোদ করি নাই, প্রশংসা এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক নিজের আত্মবিশ্বাস ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীনতার উল্লেখপূর্বক অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি কখনো আত্মবিশ্বাস হারাননি। ভারতবর্ষের দুঃখ-দুর্দশায় ব্যথিত হয়ে তিনি লেখনী ধারণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হন। কিন্তু পরম আত্মবিশ্বাসে তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তিনি প্রশংসা ও প্রসাদের লোভে কখনো কাউকে তোষামোদ করেননি। যা অন্যায় বলে মনে করেছেন তা অন্যায় বলেছেন, যা অত্যাচার বলে মনে করেছেন তা অত্যাচার এবং মিথ্যাকে অকপটে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন আপসহীন। তিনি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করে ক্ষান্ত হননি; বরং সমাজের ও দেশের যেখানেই তিনি অন্যায় অসত্য দেখেছেন সেখানেই বিদ্রোহ করেছেন। তিনি কখনো আত্মবিশ্বাস হারাননি। অর্থাৎ কোনো লোকভয় কিংবা রাজভয় তার বিদ্রোহী কণ্ঠ স্তব্ধ করতে পারেনি। সত্য প্রকাশে তিনি ছিলেন নির্ভীক সৈনিক। তাই কারানির্যাতনও তার পথরোধ করতে পারেনি।

মন্তব্য : কবি ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। তিনি তোষামোদকে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন সত্যের সেবক। তাই সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে কখনো কার্পণ্য করেননি।

⏩ ব্যাখ্যা : ১১২ ॥ আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই– সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বিদ্রোহী কবিখ্যাত, ব্রিটিশবিরোধী কলম সৈনিক কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক নিজের বিদ্রোহের স্বরূপ ও ব্যাপ্তি বোঝাতে চেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কবি নজরুল ইসলাম নিজেকে পরম আত্মবিশ্বাসী বলে দাবি করেছেন। বস্তুত তার আত্মবিশ্বাস ছিল আকাশচুম্বী। পরম আত্মবিশ্বাসের কারণেই তিনি সকল প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন। যে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে সেই রাজদ্রোহের পক্ষে তিনি কারাগারে

বসেও অকাট্য যুক্তি তুলে ধরে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। শাসকদের সহানুভূতি লাভের জন্য কবি আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি অন্যায়কে অন্যায় বলেছেন, মিথ্যাকে মিথ্যাই বলেছেন। কাউকে তিনি তোষামোদ করতে যাননি। তার বিদ্রোহ কেবল রাজার বিরুদ্ধেই নয়; বরং সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জাতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এবং দেশের অধঃপতনের বিরুদ্ধে। যেখানে তিনি অন্যায়, অসত্য ও অবক্ষয় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখেছেন সেখানেই তার সত্যের তরবারি গর্জে উঠেছে। এ কারণে তাকে ঘরে-বাইরে বিদ্রূপ, অপমান ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু কোনোকিছুর ভয়ে তিনি কখনো মিথ্যার সাথে আপস করেননি, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেননি, অত্যাচার সমর্থন করেননি।

মন্তব্য : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্যের সেবক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সর্বদা বজ্রকণ্ঠ। তাই তিনি সত্যের প্রশ্নে রাজা, দেশ, সমাজ ও জাতির সাথে কখনো আপস করেননি।

➧ ব্যাখ্যা : ১১৩ ॥ আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা, আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশবিরোধী কলম সৈনিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য ব্যাখ্যেয় উক্তিটিতে প্রাবন্ধিকের আত্মগৌরব ও আত্ম-অহংকারের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্লেষণ : কবি সত্যের পূজারি। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সৃষ্টিকর্তার বাণী। এ বাণী সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। কবির কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পায় নিখিলের আর্ত-পীড়িতের আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। তিনি ছিলেন সত্যপথের পথিক, ন্যায়ের পক্ষে অটল অবিচল। তাকে শাসকগোষ্ঠী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, কিন্তু লেখক তার বাণীকে বলেছেন সৃষ্টিকর্তার বাণী, তার উচ্চারিত নিয়ম-কাঠামোকে বলেছেন সর্বজনীন সত্যের আইন, যে আইন সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তার। কবি তার ওপর আনীত অভিযোগের সমালোচনা করে বলেছেন, তার ওপর অভিযোগ আনয়নকারীরা হচ্ছে রাষ্ট্রের শাসক। তাদের হাতে রয়েছে রাজযন্ত্র। তিনি রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজার পক্ষে যারা কাজ করেন তারা রাজবেতনভোগী আর তিনি হলেন সৃষ্টিকর্তার বীণাবাদক। তার কণ্ঠ দিয়ে সৃষ্টিকর্তা সত্য প্রকাশ করেন। তাই সত্যের প্রকাশ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তিনি নির্যাতিত-নিপীড়িত দেশবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে তাদের শক্তি ও সাহস যোগান। রাজার ক্ষমতা ক্ষুদ্র আর সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা রুদ্র। কবির পক্ষে রাজাধিরাজ চিরসত্য সৃষ্টিকর্তা। আর রাজার পক্ষে মিথ্যা ও অন্যায়ের পূজারি রাজ-অনুগ্রহে লালিত বিচারক।

মন্তব্য : সমাজ-সচেতন কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের বলে বলীয়ান। তাছাড়া তিনি ছিলেন সত্যের সৈনিক, আত্মম্ভরী-অহংকারী। এ অহংকার তাকে সত্যের পূজারিতে পরিণত করেছে।

➧ ব্যাখ্যা : ১১৪ ॥ এ আমার অহঙ্কার নয়, আত্ম-উপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশবিরোধী কলম সৈনিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে পরিপূর্ণ সত্যের সেবক বলে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে যে অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মানোর কথা বলেছেন তা হচ্ছে তার আত্মোপলব্ধি এবং আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সত্যের সরল স্বীকারোক্তিজাত। কবির কণ্ঠে স্রষ্টার বাণী ধ্বনিত হয়। এ বাণী সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের পক্ষে। কবির কণ্ঠ দিয়ে প্রকাশ পায় নিখিলের আর্ত-পীড়িত আত্মার যন্ত্রণাচিৎকার। কবি কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সত্যপথের পথিক, ন্যায়ের পক্ষে অবিচল। তিনি সত্যের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে কথা বলায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে; কিন্তু কবি তার বাণীকে বলেছেন, স্রষ্টার বাণী এবং তার উচ্চারিত নিয়ম-কাঠামোকে বলেছেন, সর্বজনীন সত্যের আইন, যে আইন সার্বভৌমিক ভগবানের। কবি তার ওপর আনীত অভিযোগের সমালোচনা করে বলেছেন, তার ওপর অভিযোগ আনয়নকারীরা রাষ্ট্রের শাসক। তাদের হাতে রয়েছে রাজযন্ত্র। তিনি এ রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত। রাজার পক্ষে যারা কাজ করেন তারা রাজবেতনভোগী সরকারি কর্মচারী। আর তিনি হলেন নিখিল বিশ্বের প্রভুর বীণাবাদক। যুগে যুগে তার কণ্ঠ দিয়ে বিশ্বপ্রভু সত্য প্রকাশ করেন। কবির কণ্ঠে সর্বদা সত্য ধ্বনিত হয়। নির্যাতিত-নিপীড়িত দেশবাসীর পাশে এসে কবি তাদের শক্তি-সাহস যোগান। রাজার ক্ষমতা ক্ষুদ্র আর প্রভুর ক্ষমতা রুদ্র। কবির পক্ষে রয়েছে সত্য, রাজা দাঁড়িয়ে থাকেন মিথ্যা-ক্ষমতা আর জাত্যাভিমানের ওপর। তাই তিনি বলেন, "রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র। আমি কবি, অপ্রকাশ সত্য প্রকাশ করিবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।" কবির কণ্ঠে নিখিল বিশ্বের প্রভু সাড়া দেন। বিচারের সময় তিনি কাঠগড়ায় এসে পেছনে দাঁড়ান। বিচারক যদি বিশ্ব প্রভুকে দেখতে পেত, তাহলে সে ভয়ে কেঁপে উঠত।

মন্তব্য : কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন পরম আত্মবিশ্বাসী। আত্মবিশ্বাস তাকে সত্যের বাহক হতে সাহায্য করেছে। তাই তিনি নিজেকে অসীম ও পূর্ণ ভেবে গর্ববোধ করছেন।

» ব্যাখ্যা : ১১৫ ॥ আমি অন্ধ-বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয়ে বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না।

অথবা, তাহলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রবন্ধকার স্বীয় আত্মোপলব্ধির আলোকে নিজের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আদালতে বিচারকের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন বটে, তবে আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি সর্বদা সত্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ এবং নিজেকে মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। প্রবল আত্মোপলব্ধি থেকেই কবি নিজেকে বিদ্রোহের বীণা এবং স্রষ্টার প্রেরিত সত্যের সেবক হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, স্রষ্টা তাকে প্রেরণ করেছেন মিথ্যাকে ধ্বংস করার জন্য। তার আত্মা সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা, তাকে ধ্বংস করা গেলেও স্রষ্টাকে ধ্বংস করা যাবে না। কারণ তিনি অক্ষয় অমর। তাই সত্যের পথ কেউ কোনোদিন রুদ্ধ করতে পারেনি এবং কখনো পারবে না। এগুলো কবির অহংকার নয়; বরং আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের

চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। ফলে কবি অন্ধ বিশ্বাসে, লাভের লোভে এবং রাজভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারেন না। তিনি অন্যায়-অত্যাচার সম্পর্কে পুরোপুরি আপসহীন। মিথ্যা, অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতন, নিপীড়ন তার পক্ষে মেনে নেওয়া বা প্রশ্রয় দেওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ তিনি সত্য ও ন্যায়ের সেবক।

মন্তব্য : প্রবন্ধকার ছিলেন সত্যের সেবক। তাই তিনি সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন। তাকে রাজভয়, লোকভয় বা কোনোপ্রকার লোভ সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১১৬ ॥ আমার এই দেহ-মন্দিরে জাগ্রত দেবতার আসন বলেই তো লোকে এ মন্দিরকে পূজা করে, শ্রদ্ধা দেখায়।

অথবা, কিন্তু দেবতা বিদায় নিলে এ শূন্য মন্দিরের আর থাকবে কী? একে শুধাবে কে?

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ব্রিটিশবিরোধী কলম সৈনিক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রবন্ধকার গর্বের সাথে নিজের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার কথা প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য এ ধরায় প্রেরিত হয়েছিলেন। এ কারণে তার জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। শাসন-শোষণ, অত্যাচার-অবিচার, নির্যাতন, জুলুম, নিষ্পেষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে কবিতা ও গান লিখে কবি বাঙালি জনসাধারণের মন জয় করে তাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন গড়েছিলেন। তার কবিতা ও গান দেশপ্রেমিক পাঠকমহলকে আকৃষ্ট করেছিল। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় সরকারবিরোধী কবিতা এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করার অপরাধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার কবিকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি কারাগারে থাকাকালীন ব্রিটিশ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে আদালতে যে জবানবন্দি দাখিল করেছিলেন, উদ্ধৃত অংশটুকু তারই অন্তর্গত। এ জবানবন্দিতে কবি নিজেকে স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত সত্যের সেবক বলে দাবি করেছেন। তিনি অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কিংবা লাভের লোভে অথবা রাজভয় কিংবা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকৃতি দেননি। কবি অন্যায়-অত্যাচারকে মেনে নেননি। যদি তাই করতেন তাহলে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা তাকে ত্যাগ করতেন। তার দেহমন্দিরে সত্য ও সুন্দরের জাগ্রত দেবতা অবস্থান করতেন বলেই মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করতো এবং ভালোবাসত।

মন্তব্য : কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং দেশ ও জাতির মুক্তির লক্ষ্যে কলম ধারণ করেছিলেন বলে পরাধীন ভারতবাসী কবিকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করতো। যদি তিনি সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায়ের পথ অবলম্বন করতেন, তাহলে কেউ তাকে ভালোবাসত না। শ্রদ্ধা করতো না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১১৭ ॥ আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি।

উৎস : সংকলিত অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সমুজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে প্রাবন্ধিক নিজেকে সত্যের পথের সামান্য সৈনিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশ্লেষণ : কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিচলিত হয়ে ওঠেন। তাই তিনি তার সম্পাদিত পত্রিকা 'ধূমকেতু'তে ব্রিটিশবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করেন। ফলে তিনি রাজদ্রোহে অভিযুক্ত হয়ে কারা-অন্তরীণ হন। তাকে ব্রিটিশ বিচারক এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কবি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ছিলেন আপসহীন। তিনি যা ভালো ও সত্য বলে বুঝেছেন তা-ই প্রকাশ করেছেন। কোনোপ্রকার রাজভয়, লোকভয় তাকে সত্য প্রকাশ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কারণ তিনি যে বাণী প্রচার করেছেন তা স্বয়ং স্রষ্টার বাণী। তাকে হয়তো ধ্বংস করা যাবে, কিন্তু স্রষ্টাকে ধ্বংস করার শক্তি কারো নেই। তিনি চিরন্তন অমর অক্ষয়। স্রষ্টা কবিকে এ ধরায় পাঠিয়েছেন অগ্রদূত তূর্যবাদক হিসেবে। আর কবি তার সাধ্যানুযায়ী সে দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি মনে করেন তার ক্ষমতা খুবই কম। তিনি সামান্য সৈনিক, তবুও স্রষ্টাপ্রদত্ত দায়িত্ব যথাযথ পালনের চেষ্টা করেছেন।

মন্তব্য : কবি তার সীমিত ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন ছিলেন। তিনি মনে করতেন, স্রষ্টা তাকে সত্যের বাহক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১১৮ ॥ চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে নির্যাতিত লোহাকে মণিকাঞ্চনে পরিণত করবার শক্তি ভগবান আমায় না চাইতেই দিয়েছেন।
অথবা, আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই। কেননা ভগবান আমার সাথে আছেন।

উৎস : বক্ষ্যমাণ অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের অনন্য প্রতিভা বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি অত্যাচার-নির্যাতনের হাতিয়ারকে আনন্দের পরশমণি দিয়ে মণিকাঞ্চনে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : শোষকের আতঙ্ক বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্যায়, অসত্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কলম ধারণ করেছিলেন বলে তাকে রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৯২২ সালে অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'তে সরকারবিরোধী কবিতা ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করার অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতার করে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। কবি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি; বরং তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে নিজের কৃতকর্ম সমর্থন করেছেন। কারানির্যাতনে তিনি এতটুকু বিচলিত হননি, তার বিদ্রোহাত্মক মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়নি। চিরশিশু প্রাণের উচ্ছল আনন্দের পরশমণি দিয়ে তিনি সরকারের নির্যাতন-লোহাকে সোনায় পরিণত করে নিয়েছিলেন। আর তাকে এ শক্তি যুগিয়েছিলেন স্বয়ং নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা। স্রষ্টার সাথে ছিলেন বলে কবির ভয় ছিল না, দুঃখ ছিল না। স্রষ্টা যার সাথে থাকেন তার আবার ভয় কীসের। যারা সত্যের সেবক, স্রষ্টা তাদের সাথেই থাকেন। শত অত্যাচার-নির্যাতনে তারা ভেঙে পড়েন না। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম সেই কাতারের মানুষ। তাই কারাগারে থেকেও তিনি অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন।

মন্তব্য : যারা সত্যের সৈনিক তারা কখনো অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন না, কোনো রক্তচক্ষুকে ভয় পান না। কারণ স্রষ্টা তাদের সাথেই থাকেন।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

▶২টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে – ১৫ × ১ = ১৫

একরাত্রি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১-১৯৪১ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ১ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' গল্পের মূল বক্তব্য/ বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

অথবা, "ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই, সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবালডিও হই নাই, আমি এক ভাঙা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল– আমার আয়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।" – এ উক্তির আলোকে 'একরাত্রি' গল্পের মূল বক্তব্য আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' তাঁর অনন্য সৃষ্টি 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত একটি অসাধারণ ছোটগল্প। এ গল্পে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমকে গল্পকার ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সংকীর্ণ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে এক দেহাতীত প্রেমের ঘটনাকে উপজীব্য করে গভীর ভাব-ব্যঞ্জনায় নির্মিত হয়েছে আলোচ্য গল্পটি। গল্পটি একজন কথকের ভাষ্যে রচিত হয়েছে। কথক নিজেই গল্পের নায়ক। নিচে গল্পটির মূল বক্তব্য উপস্থাপন করা হলো।

গল্পের মূল বক্তব্য/বিষয়বস্তু : 'একরাত্রি' গল্পটি কথকের ভাষ্যে রচিত। এতে নায়কের নাম গোপন রাখা হয়েছে। বস্তুত গল্পকার নিজেই গল্পের নায়ক। এটি শুরু হয়েছে নায়কের বাল্যস্মৃতি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে।

নায়কের পরিচয় : গল্পের নায়কের পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিল। গ্রামের পাঠশালায় সে পড়ালেখা করে। পিতার পরিকল্পনা ছিল লেখাপড়া শেষে তাকে জমিদারির গোমস্তাগিরিতে লাগিয়ে দেওয়ার; কিন্তু নায়ক ছিল কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী। সে লেখাপড়া শিখে কালেক্টরের নাজির হতে চায়।

নায়িকার পরিচয় : 'একরাত্রি' গল্পের নায়িকার নাম সুরবালা। সে ছিল নায়কের প্রতিবেশী এবং ছেলেবেলার খেলার সাথি। একসাথে তারা পাঠশালায় যেত। তবে সুরবালা ছিল নায়কের চেয়ে সাত বছরের ছোট। সমাজে সুরবালার রূপের প্রশংসা ছিল।

নায়ক ও সুরবালার সম্পর্ক : নায়ক প্রতিবেশী সুরবালার সাথে বাল্যকালে বউ-বউ খেলত এবং একই পাঠশালায় লেখাপড়া করতো। যেমন গল্পে এসেছে– "সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ-বউ খেলিয়াছি।" সুরবালার মা নায়ককে খুব আদর-যত্ন

করতো। এ অধিকারবলে সে সুরবালার প্রতি কর্তৃত্ব খাটাত। অন্যদিকে সুরবালাও নায়কের সকল প্রকার আদেশ-নিষেধ পালন করতো।

নায়কের কলকাতা গমন : একই পাড়ার নীলরতনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নায়ক শৈশবেই আদালতজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে তার গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান : নায়কের লেখাপড়া ঠিকমতোই চলছিল। পাশাপাশি নায়ক স্বদেশি আন্দোলনেও জড়িয়ে পড়ে। দেশোদ্ধারে আদর্শ নেতা হওয়ার নেশায় বিভোর থাকে সে। বিখ্যাত নেতা মাটসীনি গারিবালডি তার স্বপ্নের নায়কে পরিণত হয়। ছোটবেলার খেলার সাথি সুরবালাকে সে বেমালুম ভুলে যায়। এমন সময় পরিবারের পক্ষ থেকে সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে নায়ক তার পিতাকে জানিয়ে দেয়, লেখাপড়া শেষ না করে সে বিয়ে করবে না। নেতা হওয়ার স্বপ্নই তাকে জেঁকে ধরে।

সুরবালার বিয়ে : নায়ক সুরবালাকে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে নোয়াখালীর সরকারি উকিল রামলোচন বাবুর সাথে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায়।

বিপর্যস্ত নায়ক : নায়ক কলকাতায় মাধ্যমিক পাসের পর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এমন সময় তার পিতার মৃত্যু হয়। গোটা পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে তার ওপর। পিতৃবিয়োগে শোকবিহ্বল নায়ক দিশেহারা হয়ে পড়ে। এভাবে তার জীবনে ছন্দপতন শুরু হয়।

নায়কের চাকরিলাভ : বিধবা মাতা ও দুবোনের ভরণপোষণের জন্য নায়ক দেশোদ্ধারের মহান ব্রত ত্যাগ করে চাকরির সন্ধানে বের হয়। অনেক চেষ্টার পর নোয়াখালী জেলার একটি এন্ট্রান্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি পায়; শুরু হয় তার নতুন জীবন।

সুরবালার পুনরুত্থান : নায়কের থাকার ব্যবস্থা হয় স্কুলঘরের একটি কামরায়। স্কুলের অনতি দূরে একটি বাড়িতে উকিল রামলোচন বাবু সুরবালাকে নিয়ে বসবাস করেন, তা নায়ক আগেই জানতে পেরেছে। প্রথমে সুরবালার কাছাকাছি অবস্থান নায়কের কাছে ভাবনার বিষয় মনে না হলেও একপর্যায়ে তার নিস্তরঙ্গ হৃদয়সমুদ্রে অলক্ষ্যে সুরবালার পুনরুত্থান মহাসমুদ্রের তরঙ্গ কল্লোল সৃষ্টি করে।

বাধার প্রাচীর : একদিন নায়কের রামলোচন বাবুর বাসায় বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়। বৈঠকখানায় তারা ভারতবর্ষের দুরবস্থা নিয়ে গল্প করছিল। এমন সময় পাশের ঘরে চুড়ির টুংটাং শব্দ, শাড়ির একটু খসখসানি এবং পায়েরও একটু আওয়াজ শুনতে পায়। নায়ক বুঝতে পারে সুরবালা জানালার ফাঁক দিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকে দেখছে। নায়কের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে সুরবালার সাথে ঘুরে বেড়ানো সেই শৈশবকালের নানা স্মৃতি। সুরবালার জন্য তার মন হাহাকার করে ওঠে, কিন্তু স্বামী-সংসার নামক সামাজিক বন্ধনের কাছে নায়কের শত আশা-আকাঙ্ক্ষা বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

নায়কের অনুভূতি : সেদিন রামলোচনের বাসা থেকে ফিরে আসার পর নায়কের জীবনে এক নতুন অনুভূতি জাগ্রত হয়। বিগত জীবনের সব ভুল বুঝতে পেরে সে অনুতপ্ত হয়। যে সুরবালাকে সে ইচ্ছে করলেই পেতে পারত, আজ তাকে চোখে দেখার অধিকারটুকুও তার নেই। নিজের প্রশ্নবাণেই আজ সে জর্জরিত। সুরবালা আজ তার কেউই নয়, কিন্তু সুরবালা তার কী না হতে পারত। তার সব সুখ-দুঃখের সাথি হয়ে সুরবালা যে তার কাছে থাকতে পারেনি, সে তার নিজেরই ভুলে। এখন নীরবে সুরবালার স্মৃতিচারণ ছাড়া তার আর করার কিছুই নেই।

অনন্ত রাত্রির উদয় : বিপর্যস্ত নায়কের সমগ্র অন্তর জুড়ে এখন শুধুই সুরবালা। ইতোমধ্যে এক সোমবার সকাল থেকেই সমগ্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চারদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা। নায়কের মনে পড়ে, মোকদ্দমার কাজে রামলোচন কিছুদিন যাবৎ বাড়িতে নেই। এ দুর্যোগের রাতে ঘরে সুরবালা একা। সুরবালাকে সাহায্য করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রাত একটা-দেড়টার দিকে বানের জল ধেয়ে আসলে আত্মরক্ষার জন্য সুরবালা পুকুর পাড়ে আসে। নায়কও ঘর থেকে বেরিয়েছে সুরবালাকে সাহায্য করতে। প্রলয়ংকর সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে নায়ক আবার কাছে পায় সুরবালাকে। অন্ধকারে তারা দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। তারা খুব কাছাকাছি হলেও বিচ্ছেদের যোজন দূরত্ব তাদের নির্বাক করে রাখে।

নায়কের আত্মোপলব্ধি : নায়ক অবশেষে জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে উপলব্ধি করতে পারে– "মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।" 'একরাত্রি' এমনি একজন অস্থিরচিত্ত নায়কের কাহিনি।

উপসংহার : 'একরাত্রি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অনবদ্য গল্প। যার শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে, আবেগ-উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে না পেরে গল্পের নায়ক যেমন পরে অস্থির হয়ে মরে, বেশিরভাগ মানুষের স্বভাবই এমন। তাই সুস্থির মনে, ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করতে হবে।

➧ প্রশ্ন : ২ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পে বর্ণিত প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।
অথবা, "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্প একটি অপরিণত প্রেমের উপাখ্যান" – আলোচনা কর।
অথবা, "বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয়" – উক্তিটি 'একরাত্রি' গল্পের সাথে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ? তা আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের রচয়িতা বিশ্বকবি খ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' একটি অসাধারণ ছোটগল্প। গল্পটি তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি মূলত প্রেমের গল্প হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমকে গল্পকার একটি ভিন্ন মাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। রসঘন বাক্যালংকারে গল্পের প্রতিটি লাইন হয়ে উঠেছে রোমান্টিকতায় ভরপুর। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

প্রেমের স্বরূপ : প্রেমের ইংরেজি প্রতিশব্দ Love. Oxford Dictionary-তে Love সম্পর্কে বলা হয়েছে– A strong feeling of affection. মূলত প্রেম মানবজীবনের এক মৌলিক ও প্রবল অনুভূতি। প্রেমের মধ্যে একটি মানবহৃদয় অন্য একটি মানবহৃদয়ের সন্ধান পায়। আবার প্রেমের বেদনা মানুষকে রিক্ততার অতলান্তে নিক্ষেপ করে। প্রেম একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি হলেও সমাজ-সংসারের প্রথা-পদ্ধতি দ্বারা ব্যক্তির অনুভূতি প্রভাবিত ও রূপায়িত হয়। প্রেমে আছে মিলনের নিবিড় আনন্দ আর বিরহের মর্মচ্ছেদী গভীর যন্ত্রণা। মানবিক চর্চার উৎকৃষ্ট প্রবাহে মানুষের সহজাত আকর্ষণে সমগ্র চেতনা পরিব্যাপ্ত হলে কামনা-বাসনা প্রশমিত করে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। এ প্রেম মানবজীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত সম্পদ, বেঁচে থাকার অবলম্বন। প্রেমে মিলনের চেয়ে বিরহই অধিক বলে প্রেম এত মধুর।

'একরাত্রি' গল্পে প্রেমের স্বরূপ : প্রেমের গল্প 'একরাত্রি'র রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চৈতন্যে প্রেমসত্তার অর্ধেক বাস্তবতা আর অর্ধেক কল্পনা। 'একরাত্রি' গল্পে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রাপ্তি নয় বরং প্রাপ্তির প্রত্যাশা, মিলন নয় বরং মিলনাকাঙ্ক্ষাই শাশ্বত রূপ পেয়েছে। যে প্রেম বুভুক্ষিত দৃষ্টিতে দেহের চারপাশে ঘুরে মরে, ব্যক্তি মানুষের বাস্তব দেহমন যার ভিত্তি, সেই আবেগময় আত্মহারা মানুষের সাধারণ প্রেম 'একরাত্রি' গল্পের প্রেম নয়। এ গল্পে দেখা যায়, প্রেম অসীম, অনন্তের ধন, আত্মার সম্পদ, তাকে দেহের সীমানায় ধরা যায় না। তা অনুভূতিলব্ধ গুপ্ত প্রেম, যার প্রকাশ ঘটেছে বহু বিলম্বে। কৈশোরের এক জোড়া বালক-বালিকা পরস্পরের কাছাকাছি থেকেও একে অন্যকে প্রেমে আবদ্ধ করতে পারেনি। তাই যৌবনে নায়ক নায়িকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আর নায়িকার বিয়ে হয়ে যায় এক উকিল বাবুর সাথে। জীবনের উত্থান-পতনের সিঁড়ি বেয়ে নায়ক একদিন সুদূর নোয়াখালীর এক ছোট শহরে গিয়ে নায়িকা সুরবালার প্রতিবেশী হয়েছে। নায়কের অবচেতন মনে বাল্যকালে যে প্রেমের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, তা ফুলে ফলে বিকশিত হয়েছে। এখন সারাক্ষণই নায়কের মনে সুরবালার ছবি ভেসে ওঠে।

গল্পে প্রেমের উন্মেষ : কথকের ভাষ্যে রচিত 'একরাত্রি' গল্পে প্রেমের উন্মেষ ঘটে গল্পের কথকের জবানিতে এভাবে– 'সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি এবং বউ-বউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা বড় যত্ন করিতেন এবং আমাদের দু'জনকে একত্র করিয়া আপনা-আপনি বলাবলি করিতেন, আহা, দুটিতে বেশ মানায়।" সেই ছোট বয়সে এ কথার মর্মার্থ নায়ক না বুঝলেও সে এটুকু উপলব্ধি করেছিল, সুরবালার প্রতি অন্যান্যের চেয়ে তার কিছু বেশি অধিকার আছে। এ অধিকার বলেই সে সুরবালার প্রতি কর্তৃত্ব খাটাত। আর সুরবালাও তা মেনে নিত। এভাবেই নায়কের মনে প্রেমের অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল।

বিপর্যস্ত প্রেম : মানবসমাজ একটা জটিল ভ্রান্তির জাল। এখানে মানুষের আশা-নিরাশা, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির মধ্যে চলছে বিরামহীন দ্বন্দ্ব। 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে সুরবালার সাথে বিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। নায়ক দেশোদ্ধারের কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকায় নোয়াখালীর সরকারি উকিল রামলোচনের সাথে সুরবালার বিয়ে হয়। সেদিন দেশোদ্ধারের আদর্শের মোহে নায়ক সুরবালার বিয়ের সংবাদকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল। তারপর যথারীতি স্বপ্নভঙ্গ হয় তার। নাজির, সেরেস্তাদার, মাটসীনি গারিবালডি কিছুই সে হতে পারল না; হলো নোয়াখালীর এন্ট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। একদিন চরম ঔদাসীন্যে সুরবালার যে প্রেম সে উপেক্ষা করেছিল, আজ আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হৃদয়ে সেই সুরবালার স্মৃতি মহাসমুদ্রের ঢেউ তুলে দিয়েছে। সুরবালাকে কেন্দ্র করে একটা অসঙ্গত-অন্যায় চিন্তা নায়কের মন-প্রাণ বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

রোমাঞ্চকর আবহ : নায়ক সুরবালার অনেক কাছাকাছি অবস্থানের কারণে মন থেকে তার চিন্তা মুছে ফেলতে পারে না। যতই মুছে ফেলতে চায় ততই তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢল ঢল সুরবালার দু'খানি চোখের কথা নায়কের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। তার মনে হয়, সহসা তার হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টি দ্বারা চেপে ধরল, আর বেদনায় তার ভেতরটা টন টন করে উঠল। নায়ক উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাসায় ফিরে এলেও সে ব্যথাটা লেগেই রইল। কোনো কাজেই সে মন বসাতে পারছিল না। একদিন এক দুর্যোগময় রাত দুজনার মিলনের পথ সৃষ্টি করে দিল। গভীর রাতে প্লাবন যখন জনপদ গ্রাস করছে তখন সুরবালার স্বামী ঘরে অনুপস্থিত। এ দুর্যোগ থেকে সুরবালাকে

রক্ষার্থে নায়ক পা বাড়ায়। সুরবালাও আত্মরক্ষার্থে পুকুর পাড়ে আসে। দুজন পরস্পর মুখোমুখি হয়। এ আকস্মিক উপস্থিতির মধ্যে জন্ম নেয় এক রোমাঞ্চকর আবহ।

অনন্ত প্রেম : 'একরাত্রি' গল্পে সুরবালার সাথে নায়কের মিলন হয়েছিল এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে। এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে তারা কাছাকাছি এসেছিল। বিশ্বাসে ভালোবাসায় তারা ছিল শান্ত সমাহিত। আকস্মিক সান্নিধ্যে দুজনেই নির্বাক হতবিহ্বল চিত্তে অনন্ত প্রেমের আস্বাদ লাভ করেছিল। সে প্রেমের অনির্বচনীয়তা এখন শুধু স্মৃতির মাঝেই আবদ্ধ। এ প্রেম নায়িকাকে ঘর থেকে টেনে বের করার পরিবর্তে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, কিন্তু নায়কের হৃদয়ে তার জন্য অনন্ত প্রেমের আসন চিরতরে পাকা হয়ে গেল।

বিরহ-বিচ্ছেদ : 'একরাত্রি' গল্পে মূলত যা ফুটে উঠেছে তা হলো, বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। পরস্পরকে দূরে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে বিরহের মাঝে তারা প্রেমের সার্থকতা খুঁজে পায়। কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে গল্পের নায়কের মনে যে প্রেম বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়নি, নায়িকার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সে প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে, কিন্তু তখন প্রেম নিবেদনের পাত্রীটি নায়কের নাগালের বাইরে। তাকে হাজার চেষ্টা করে স্পর্শ করা দূরে থাক, এক নজর দেখার অধিকারও নায়কের নেই। না পাওয়ার এই বেদনা যেন হৃদপিণ্ডকে কঠিন মুষ্ঠি দ্বারা চেপে ধরার মতো।

শাশ্বত প্রেম : একটা শাশ্বত প্রেমের কাহিনি অঙ্কিত হয়েছে 'একরাত্রি' গল্পে। এ প্রেম অপার্থিব সৌন্দর্যের নিবিড় অনুভূতি, এক অনির্বচনীয় আনন্দ রস। এ রসসিক্ত হয়ে নায়ক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রেম আস্বাদন করেছে। এ গল্পের প্রেম দেহের ঊর্ধ্বচারী বলে মিলনের আবেগ, উত্তেজনা, চাঞ্চল্য প্রকাশ অপেক্ষা স্থির, স্নিগ্ধমধুর জ্যোতি বিকিরণ করেছে। এ প্রেম শাশ্বত, চিরন্তন।

উপসংহার : 'একরাত্রি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমান্টিক চেতনায় দেহাতীত প্রেমের এক চিরন্তন শাশ্বত ভাষাচিত্র এঁকেছেন। এটি একটি অপরিণত প্রেমের উপাখ্যান। নায়কের মন যখন প্রেমে ষোলোকলায় পূর্ণ হয়েছে, তখন নায়িকা সুরবালা অন্যজনের ঘরনি। তাকে এক নজর দেখার অধিকারও এখন আর তার নেই, কাছে থেকেও সে এখন অনেক দূরে। তাই বলা যায়– বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।

▸▸ প্রশ্ন : ৩ ॥ একটি সার্থক ছোটগল্পের নিদর্শন হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পটির বিচারবিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০০৭]

অথবা, ছোটগল্প কাকে বলে? ছোটগল্প হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পের সার্থকতা ও শিল্পমূল্য বিচার কর।

অথবা, "ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' একটি আদর্শ গল্প" – আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের একটি আলোচিত ও জনপ্রিয় শাখা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ছোটগল্পের এক সার্থক রূপকার। ছোটগল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সংগীত তথা বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় অসাধারণ অবদান রাখলেও ছোটগল্পের জন্যই তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। 'একরাত্রি' শীর্ষক ছোটগল্পটি তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত একটি অসাধারণ ছোটগল্প। নিচে প্রশ্নালোকে এর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা : ছোটগল্প শব্দটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়, একটি 'ছোট' অপরটি 'গল্প'। গল্প সম্পর্কে তেমন কোনো মতভেদ না থাকলেও ছোটগল্প নিয়ে সাহিত্য

সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে ছোটগল্প সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যিকদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

ক. ছোটগল্পের সংজ্ঞায় H. G. Wells বলেন, "ছোটগল্প ১০ হতে ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত।"

খ. E. A. Poe বলেন, "ছোটগল্প তাকেই বলে, যে গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়।"

গ. প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক W. H. Hudson বলেন– A short story must contain only one theme informing idea and that idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of mind.

ঘ. প্রমথ চৌধুরীর মতে, "আকৃতিতে ছোট হলেই ছোটগল্প হবে না। তাকে ছোট হতে হবে এবং সর্বোপরি গল্প হতে হবে।"

ঙ. Rudyard Kipling -এর মতে, "ছোট গল্প হচ্ছে চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো। এক সুনির্দিষ্ট বস্তুর উপর তার আলো কেন্দ্রীভূত থাকবে। অনাবশ্যক প্রাপ্তির বিষয়কে তা কিছুতেই ভারাক্রান্ত করে তুলবে না।"

ছোটগল্পের স্বরূপ : বাংলা সাহিত্যের গদ্য শাখার এক অপূর্ব সংযোজন হলো ছোটগল্প। এটি আকারে যেমন ছোট তেমনি এর কাহিনিও একমুখী। ছোটগল্পের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন–

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল–
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি,
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ–
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।

ছোটগল্পের সার্থকতা : ছোটগল্পের আয়তন সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এর আরম্ভ যেমন আকস্মিক, শেষও তেমনি ব্যঞ্জনাময়। ছোটগল্পের ভাষা সহজ-সাবলীল। দু'একটি চরিত্রের ইঙ্গিতময় প্রকাশে ছোটগল্প অনন্য। জীবনের খণ্ডাংশকে গল্পকার যখন রসঘন করে উপস্থাপন করতে পারেন তখন তার সার্থকতার প্রতিফলন ঘটে।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য : ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য হলো, এটা এমন একধরনের রচনা যার মধ্যে জীবন আছে, জীবনের সুখ-দুঃখ আছে, কিন্তু জীবনের বিস্তৃতি নেই। আকারে ছোট বলে এখানে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটে না। এতে অনাবশ্যক কথা, তত্ত্ব বা উপদেশমূলক ভাষ্য ইত্যাদি বর্জিত হয়। এ ধরনের গল্প পড়ে পাঠকের কাছে মনে হয় গল্প শেষ হয়নি, যেন আরো কিছু একটা রয়ে গেছে।

'একরাত্রি' গল্পের বৈশিষ্ট্য : রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ ছোটগল্পের মধ্যে 'একরাত্রি' অনন্য। এ গল্পে মানুষের সমগ্র জীবনের কোনো রহস্য উন্মোচিত হয়নি; বরং বৃহৎ জীবনের একখণ্ড অনুভূতিকে রোমান্টিকতায় চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মানব-মানবীর প্রেম এখানে উচ্ছ্বসিত নয়; বরং সংযত। কাছে পাওয়াটাই প্রেমের পরিণতি নয়, না পাওয়ার মধ্যেই এর শাশ্বত রূপ আছে– এ সত্য 'একরাত্রি' গল্পে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

ছোটগল্প হিসেবে 'একরাত্রি' : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর গল্প রচনা সম্পর্কে নিজে বলেছেন, "কোনো একটি তুচ্ছ ঘটনা দেখিয়াই আমি গল্প রচনা আরম্ভ করিয়া দেই। সমস্ত প্লটটি ভাবিয়া লইবার জন্য গোড়াতেই মাথা ঘামাইতে বসি না। তাহাতে গল্প লেখা যেমন অগ্রসর হয়, গল্পের প্লটটিও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করে।" ছোটগল্পের আয়তন ছোট এবং এতে জীবনের খণ্ডাংশ চিত্রিত হলেও থাকবে আবেদনের গভীরতা। রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে সেই গভীরতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন– 'একরাত্রি' গল্পের আয়তন ছোট। এর নায়ক একজন সাধারণ ব্যক্তি। গল্পের কথক নিজেকে নায়কের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে নিজের জীবনের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেছেন। গল্পটি উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত হলেও আয়তনের গণ্ডিতে লেখক তাকে ছোটগল্পের গোত্রভুক্ত করে দিয়েছেন। 'একরাত্রি' গল্পে একজন সাধারণ মানুষের জীবনের কিছু উপলব্ধি আবেগময় করে তুলে ধরা হয়েছে। এ গল্পে বর্ণনার ঘনঘটা পরিলক্ষিত হয় না। তত্ত্ব ও উপদেশ এ গল্পে একেবারেই অনুপস্থিত। গল্পটি পড়ে একধরনের অতৃপ্তি পাঠককে তৃষ্ণার্ত করে। এদিক থেকেও 'একরাত্রি' ছোটগল্প হিসেবে সার্থক সৃষ্টি।

গল্পের শিল্পরস : গল্পটিতে বাঙালি সমাজ ও পরিবারের দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষোভ, গভীর দুঃখ-বেদনা, সুখ ও আনন্দের সমাবেশ ঘটেছে। স্বল্প পরিসরে 'একরাত্রি' গল্পে একজোড়া নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা উপস্থাপিত হয়েছে রসময়ভাবে। গল্পের নায়ক-নায়িকা পূর্বপরিচিত, পরস্পরের প্রত্যাশিত। সময়ের প্রবাহে দুজন দুজগতের বাসিন্দা হলেও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ একটি রাতে তাদের মন ও হৃদয়ের বিচিত্র ভাব ও অনুভূতিকে ব্যঞ্জনাময় করে নানা রূপ ও রসে চিত্রিত করেছে। লেখক জীবনের এই দুর্লভ দিকটি একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুপম রসব্যঞ্জনায় প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন 'একরাত্রি' গল্পে।

গল্পের শিল্পমূল্য : 'একরাত্রি' শীর্ষক গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত একটি অনবদ্য ছোটগল্প, যার শিল্পমূল্য অনেক উঁচুমানের। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সংগীত আবহ ধ্বনিত হয়েছে। একদিন ইচ্ছে করলেই গল্পের নায়ক সুরবালাকে কাছে পেতে পারত, কিন্তু সুরবালাকে অগ্রাহ্য করে নাজির, হেডক্লার্ক, গারিবালডি হতে চাওয়ায় সুরবালাকে পাওয়া হয়নি নায়কের। দেশপ্রেমের মোহাচ্ছন্নতায় অন্ধ নায়ক নিজেই বিরহের বীজ বপন করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নায়কের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের স্বপ্নও পূরণ হয়নি, সে হয়েছে একটা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার। আগে সুরবালাকে পাওয়া তার জন্য সহজলভ্য ছিল, এখন কোনোভাবেই তা সম্ভব নয়, কারণ সে এখন অন্যের ঘরনি। কিন্তু সুরবালা নায়কের কাছে দুষ্প্রাপ্য হওয়া মাত্রই শুরু হয় নায়কের অনুশোচনার দিন। সুরবালার স্মৃতিগুলো দিন দিন নায়কের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করতে থাকে। লেখক মিলনাকাঙ্ক্ষাবর্জিত একটি প্রেমকে এক রাত্রির ক্ষণিকপ্রাপ্তির মাধ্যমে সার্থক করে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন।

'একরাত্রি' গল্পের সার্থকতা : উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' একটি উৎকৃষ্ট ছোটগল্প। গল্পকার একটি রাতকে এ গল্পে মানবজীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছেন। গল্পে কাহিনি ও ঘটনার কোনো আড়ম্বর নেই। স্বল্প পরিসরে দুটি মানব-মানবী এক বৃন্তে এসে প্রকৃতির কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছে। প্রকৃতিই তাদের পৃথক করে যার যার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছে। নায়ক এ রাতে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। 'একরাত্রি' গল্পটি ছোট হলেও এখানে রয়েছে নায়ক ও সুরবালার জীবনের বিশেষ মুহূর্তের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। এটি

একটি পরিকল্পিত শিল্পকর্ম। এ গল্পে ঘটনার শুরু এবং উপসংহারে চমৎকার নাটকীয়তা রয়েছে। সুতরাং রচনার ছন্দময়তা, চরিত্র-চিত্রণ, কাহিনির আঙ্গিক, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা সব মিলিয়ে 'একরাত্রি' একটি সার্থক ছোটগল্প।

উপসংহার : সংজ্ঞা বা রীতি-প্রকৃতি অনুসারে 'একরাত্রি' একটি সার্থক ছোটগল্প। রোমান্টিক প্রেমের গল্প হিসেবেও এটি শিল্পোত্তীর্ণ। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ছোটগল্পের মধ্যে 'একরাত্রি' নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। তাই শিল্প সার্থকতায় এটি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও স্থান পাওয়ার যোগ্য। 'একরাত্রি' সত্যিকার অর্থেই একটি আদর্শ সার্থক ছোটগল্প।

⏩ প্রশ্ন : ৪ ॥ "রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল, সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার"– এ উক্তির অনুসরণে 'একরাত্রি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্প অবলম্বনে এর কেন্দ্রীয়/নায়ক চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' গল্পের এন্ট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের চরিত্র বর্ণনা কর।

উত্তর|| উপস্থাপনা : 'একরাত্রি' ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তি সাহিত্যিক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ গল্পটি তাঁর একটি অসাধারণ সৃষ্টি। এ গল্পের নায়ক তথা এন্ট্রান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের চরিত্রটি গল্পকার বিভিন্ন আঙ্গিকে চমৎকার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এটাই গল্পের প্রধান পুরুষ চরিত্র। গল্পকার এ চরিত্রের মাধ্যমে প্রেম-বিরহের অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত এক স্কুল মাস্টারের রোমান্টিক জীবনের ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন।

নায়কের পরিচয় : 'একরাত্রি' গল্পটি কথকের ভাষায় রচিত। গল্পে নায়কের নাম বলা হয়নি। তবে নায়কের নাম অজ্ঞাত থাকলেও তার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিল। গ্রামের পাঠশালায় সে পড়ালেখা শুরু করে। পিতার পরিকল্পনা ছিল লেখাপড়াশেষে তাকে জমিদারির গোমস্তাগিরিতে লাগিয়ে দেওয়ার, কিন্তু নায়ক ছিল কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

সুরবালার সাথে নায়কের সম্পর্ক : সুরবালা নায়কের প্রতিবেশী। সুরবালার বয়স নায়ক থেকে সাত বছর কম। প্রতিবেশী হওয়ায় তার সাথে ছোটবেলা থেকেই সখ্য গড়ে ওঠে। তারা একসাথে পাঠশালায় যেত, বউ-বউ খেলত। সুরবালার মা নায়ককে খুব আদর-যত্ন করতেন। আর এ অধিকার বলে নায়ক সুরবালার ওপর নানা অধিকার খাটাত। সুরবালাও তা মেনে নিত।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী নায়ক : গল্পের নায়ক ছিল উচ্চাভিলাষী। পিতার গোমস্তাগিরির প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। নায়কের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে গল্পকার তার জবানিতে বলেছেন, "আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল– কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।"

নায়কের কলকাতা গমন : নিজের পাড়ার নীলরতনের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নায়ক শৈশবেই আদালতজীবী হওয়ার লক্ষ্য স্থির করে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সে বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় তার গ্রামের এক পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠে। সেখানে যথানিয়মে তার লেখাপড়া চলতে থাকে।

শিক্ষানুরাগী নায়ক : গল্পে নায়কের চরিত্রে শিক্ষানুরাগের পরিচয় বিধৃত হয়েছে। সে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে প্রথমদিকে আর্থিক অসুবিধায় পড়লেও পরে বাবার সাহায্যে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবেই সে এন্ট্রান্স (মাধ্যমিক) পাস করে এবং ফার্স্ট আর্টস (উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষার সময় পিতার মৃত্যুজনিত কারণে তার লেখাপড়ার সমাপ্তি ঘটে।

নায়কের দেশপ্রেম : নায়ক কলকাতায় লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। দেশোদ্ধারে আদর্শ নেতা হওয়ার নেশায় বিভোর থাকে সে। বিখ্যাত নেতা মাটসীনি গারিবালডি তার স্বপ্নের নায়কে পরিণত হয়। সে বেমালুম ভুলে যায় ছেলেবেলার খেলার সাথি সুরবালাকে। এ সময় পরিবারের পক্ষ থেকে সুরবালার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে তাও তার কাছে অগ্রাহ্য হয়। লেখাপড়া শেষ করে দেশোদ্ধারকেই সে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। গল্পে নায়কের দেশপ্রেম এভাবে ব্যক্ত হয়েছে- "কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব।"

নায়কের জীবন-সংগ্রাম : পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে নায়কের সব স্বপ্ন ভেঙে গেল। অবশেষে নিয়তি তাকে টেনে নিল নোয়াখালীর ভাঙা একটা স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের জীবনে। বাস্তবতার মুখামুখি হয়েই নায়ক স্কুল শিক্ষকের পদ নিতে বাধ্য হয়। কেননা বাড়িতে সে ছাড়াও তার মা এবং দুটি বোনের ভরণপোষণের ভার তার কাঁধে এসে পড়ে। নায়কের হৃদয়ে দেশপ্রেমের রঙিন স্বপ্ন ছিল। শিক্ষকতার মাধ্যমে ছাত্রদের দেশপ্রেমের চেতনায় গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সে কাজ শুরু করে। কিন্তু হেড মাস্টারের অনীহা এবং ছাত্রদের উদাসীনতায় সে হতাশ হয়।

নায়কের প্রেমানুভূতি : স্কুলে চাকরি নেওয়ার পর স্কুলেরই একটি কক্ষে নায়কের থাকার ব্যবস্থা হয়। সে জানতে পারে, স্কুলের নিকটেই সুরবালা তার উকিল স্বামী নিয়ে বসবাস করছে। সুরবালার স্বামী রামলোচন বাবুর সাথে পরিচয় হওয়ার পর নায়ক একদিন তার বাসায় বেড়াতে যায়। বৈঠকখানায় গল্প করার সময় সে অনুভব করে, পাশের ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে সুরবালা তাকে নিরীক্ষণ করছে। তার চুড়ির শব্দ, শাড়ির খসখসানি এবং পায়ের শব্দ অনুভূত হলেও সামনে আসেনি কখনো। এতে নায়কের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। নায়কের মনে প্রেমানুভূতি জাগ্রত হয়। নায়ক রামলোচনের বাড়ি থেকে নিজের অবস্থানস্থলে ফিরে আসে, কিন্তু সুরবালার চিন্তা তার মন থেকে দূর হয় না। সে আপন মনেই বলতে থাকে, "রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল, সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না।"

নায়ক চরিত্রের অদূরদর্শিতা : 'একরাত্রি' গল্পে নায়ক চরিত্রের অদূরদর্শিতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। পিতার মৃত্যুতে তার সকল উচ্চাশার গুড়ে-বালি হলে আত্মসমালোচনায় সে দগ্ধ হতে থাকে। সুরবালাকে উপেক্ষা এবং দেশপ্রেমের রঙিন স্বপ্ন তার কাছে বাতুলতা মনে হয়। যে সুরবালাকে সে সহজেই লাভ করতে পারত, আজ সে দুর্লভ এমনকি দুর্লক্ষ্য, তার সাথে একটি কথা বলার অধিকারও তার নেই। সুরবালাকে সে হারিয়েছে মূলত তার অদূরদর্শিতা এবং দেশপ্রেমে মোহাচ্ছন্ন হওয়ার কারণে। অথচ সে আজ নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে ক্ষতবিক্ষত হয়।

নায়কের চারিত্রিক মাহাত্ম্য : গল্পে নায়কের চারিত্রিক মাহাত্ম্যও ফুটে উঠেছে। নায়ক সুরবালাকে কাছে পাওয়ার জন্য অস্থির হলেও অধৈর্য হয়নি। নিজের দোষেই যে সে তাকে

হারিয়েছে, এই অনুশোচনার অনলে পুড়ে সে ছাই হতে লাগল। দুর্যোগপূর্ণ এক রাতে ঝড় শুরু হলে বান ডাকে। সুরবালাকে রক্ষা করতে নায়ক ঘর থেকে বের হয়ে আসে। রামলোচন বাবু সেদিন বাসায় ছিলেন না। তাই সুরবালাকে সাহায্য করার জন্য তার মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। নির্জন-নিস্তব্ধ পরিবেশে দুটি নর-নারী মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি। ঝড় থেমে গেলে, জল কমে এলে উভয়ে যার যার বাড়ি চলে যায়। সুরবালাকে নিবিড়ভাবে গ্রহণের সুযোগকেও নায়ক কাজে লাগায়নি। কারণ, সে এখন পর-স্ত্রী, তাই সমাজে প্রচলিত আচার ও রীতিনীতিকে সে বড় করে দেখেছে। এতে তার মহানুভবতা এবং চারিত্রিক সৌন্দর্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারের মাঝে প্রেম, শিক্ষানুরাগ, দেশাত্মবোধ, উদ্যম, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের সমাবেশ ঘটেছে। তবে তার অদূরদর্শিতা গল্পটিতে বিষাদ-বিরহ নিয়ে এসেছে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমে ব্যর্থ হলেও নিজের সুখের জন্য নায়ক অন্যের সুখের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াননি। এতে তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

⏩ প্রশ্ন : ৫ ॥ "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক-নায়িকার মধ্যে মিলন না ঘটলেও তাদের শাশ্বত প্রেম এক রাতের পরম প্রাপ্তিতে সার্থকতা লাভ করেছে" – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, "মিলনাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বগত যে প্রেম, 'একরাত্রি' গল্পে সেই প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে" – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, "রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' গল্পে শাশ্বত প্রেম এক রাতের পরম প্রাপ্তিতে সার্থকতা লাভ করেছে"– আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০]

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে সার্থক ছোটগল্পের রূপকার, নোবেল বিজয়ী কবি ও সাহিত্যিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' শীর্ষক গল্পটি তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি **'গল্পগুচ্ছ'** গ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমকে গল্পকার ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। সংকীর্ণ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে এক দেহাতীত প্রেমের ঘটনাকে উপজীব্য করে গভীর ভাবব্যঞ্জনায় নির্মিত হয়েছে তাঁর এ গল্পটি।

গল্পের নায়কের পরিচয় : 'একরাত্রি' গল্পটি কথকের ভাষায় রচিত। এতে নায়কের নাম বলা হয়নি। তবে নায়কের নাম অজ্ঞাত থাকলেও তার পিতা চৌধুরী-জমিদারের নায়েব ছিল। গ্রামের পাঠশালায় সে লেখাপড়া করে। পিতার পরিকল্পনা ছিল লেখাপড়াশেষে তাকে জমিদারির গোমস্তাগিরিতে লাগিয়ে দেওয়ার; কিন্তু নায়ক ছিল কিছুটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

নায়িকার পরিচয় : নায়িকা ছিল নায়কের প্রতিবেশী। তার নাম সুরবালা। সে নায়কের ছেলেবেলার খেলার সাথি ছিল। তারা একসাথে স্কুলে যেত। সমাজে সুরবালার রূপের প্রশংসা ছিল। সে ছিল নায়কের চেয়ে সাত বছরের ছোট।

নায়ক-নায়িকার বাল্যপ্রেম : প্রতিবেশী হওয়ায় বাল্য বয়সে নায়ক সুরবালার সাথে বউ-বউ খেলত, একসাথে স্কুলে যেত। সুরবালার মা নায়ককে খুব আদর-যত্ন করতো। এ অধিকারবলে সে সুরবালার প্রতি কর্তৃত্ব খাটাত এবং সুরবালাও একান্ত অনুগতা হয়ে তার সব ফরমায়েশ পালন করতো। কিন্তু পরবর্তীতে নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠায় বিভোর হয়ে কলকাতায় যায়। সেখানে একপর্যায়ে সে স্বদেশি আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। স্বদেশপ্রেমে আপ্লুত হয়ে ছোটবেলার খেলার সাথি সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায় রামলোচন বাবু নামে এক উকিলের সাথে।

নায়কের আত্মোপলব্ধি : নায়ক একদিন ইচ্ছা করলেই যে সুরবালাকে পেতে পারত, সেই সুরবালাকে সে অবহেলার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছে। আজ যখন সুরবালা নাগালের বাইরে রামলোচন বাবুর ঘর করছে, তখন নায়কের আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। জীবনের প্রয়োজনের মুহূর্তে সুরবালা নায়ক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আজ সে অন্যের ঘরনি, সেখানে নায়কের অধিকার নেই। এসব কথা চিন্তা করে তার চিত্ত ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

নায়ক-নায়িকার চিত্তচাঞ্চল্য : একদিন নায়ক রামলোচন বাবুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। এ সময় পাশের ঘরে চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের খস্‌খসানি, পায়ের শব্দ নায়ককে সচকিত করে তোলে। তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ে, "বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি।" বেদনায় তার হৃদয় টনটন করে ওঠে। ওদিকে সুরবালাও জানালার ফাঁক দিয়ে শৈশবের খেলার সাথিকে নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করে। তার অব্যক্ত ধ্বনি গুমরে মরে। নায়ক পরে বাসায় ফিরে গেলেও কোনোকিছুতেই তার চিত্তচাঞ্চল্য কমে না।

মিলনের পথে বাধার দেওয়াল : স্বপ্নভগ্ন হৃদয়ে সুরবালার পুনরাগমনে নায়কের মনের বাগানে আবার প্রেমের কিশলয়গুলো সতেজ হয়ে ওঠে, কিন্তু বাধাগ্রস্ত হয় সামাজিক অনুশাসনের প্রাচীর। মিলনের পথের এ প্রাচীর সম্পর্কে নায়কের বিবেক বলে ওঠে– "তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে, এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না।" নায়ক আরো ভাবে– "সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত।" বস্তুত সুরবালা তার অনেক কিছুই হতে পারত। অথচ আজ সে অন্যের। গোটা দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়ে কিনা তাকে রামলোচন বাবু নিয়ে গেল। এ মন্ত্রই আজ নায়ককে সুরবালা থেকে যোজন যোজন দূরে রেখেছে।

একরাতের পরম প্রাপ্তি : নায়ক রামলোচন বাবুর বাড়ি যাওয়ার পর থেকে সুরবালা তার সমগ্র হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে। সে সারাক্ষণই সুরবালাকে নিয়ে ভাবতে থাকে. অবশেষে এক দুর্যোগপূর্ণ রাত নায়ককে সুরবালার সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। প্রচণ্ড ঝড়-বন্যা এলে নায়ক সুরবালাকে সাহায্য করতে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। সে সময় সুরবালাও ঘর থেকে বের হয়ে পুকুর পাড়ে একটা ঢিবির ওপর দাঁড়ায়। এখানেই তাদের দু'জনের দেখা হয়ে যায়। তারা দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে অন্যকে অনুভব করে, কিন্তু কেউ কিছুই বলে না। নায়কের নিকট এখন এ রাতই তার জীবনের পরম প্রাপ্তি।

শাশ্বত প্রেমের সার্থকতা : নায়ক যখন বাল্যসাথি সুরবালাকে দেখার জন্য, পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল, সেই সুরবালা প্রেমের সার্থকতা খুঁজে পেল মিলনের মধ্যে নয়, বিচ্ছেদের মধ্যে। যখন ঝড় থেমে গেল, জল নেমে গেল, তখন নায়ক মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ অনুভব করল। মিলনাকাঙ্ক্ষাবর্জিত শাশ্বত প্রেমে সার্থক প্রেমিক কামনা-বাসনার উর্ধ্বে থেকে বলেছিল, "আমার আয়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"

উপসংহার : শাশ্বত প্রেমের মহিমায় নির্মিত 'একরাত্রি' গল্পে নায়ক-নায়িকার মিলন না ঘটলেও প্রবল বিচ্ছেদ-ব্যথিত মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ লাভ করেছে। মিলনাঙ্ক্ষাবর্জিত কামনা-বাসনার উর্ধ্বে যে প্রেম, সেটাই শাশ্বত ও অমর প্রেম। 'একরাত্রি' গল্পে এ ধরনের প্রেমই নায়ক-নায়িকার এক রাত্রির দেহাতীত মিলনে সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

» প্রশ্ন : ৬ ॥ "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে, 'একরাত্রি' গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি" – সাহিত্য সমালোচকের এ উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একজন সার্থক ছোটগল্পের রূপকার। তাঁর গল্পে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি প্রেম ও প্রকৃতিকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। তাই ছোটগল্প রচনায় তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। 'একরাত্রি' তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এতেও প্রকৃতি ও প্রেম একাকার হয়ে ধরা পড়েছে।

'একরাত্রি' গল্পে প্রেম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'একরাত্রি' গল্পে এক শাশ্বত প্রেমের ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন। গল্পের নায়ক-নায়িকা প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে খেলার সাথি ছিল ছোটবেলা থেকেই। বাল্য বয়সে তাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুজন খুব কাছাকাছি অবস্থানের পরও কৈশোর-প্রেম পরস্পরকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। সে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে অনেক পরে। কৈশোরে নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহে নায়িকা সুরবালাকে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করে। আর পারিবারিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রামলোচন বাবু নামে এক উকিলের সাথে নায়িকার বিয়ে হয়ে যায়। অনেকদিন পর নায়ক তার জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে একদিন সুদূর নোয়াখালীর এক স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে সুরবালার প্রতিবেশী হয়। আর এখানেই নায়কের বাল্য বয়সের অনুদ্গত সুপ্ত প্রেম মঞ্জরিত হয়ে পাপড়ি মেলে বিকশিত হয়েছে।

গল্পে প্রকৃতির বর্ণনা : 'একরাত্রি' গল্পের শুরুতে প্রকৃতির কোনো বর্ণনা না থাকলেও প্রকৃতির আবির্ভাব ঘটেছে– নায়ক যে স্কুলগৃহে বসবাস করতো তাকে কেন্দ্র করে। নায়ক বলেছে, "স্কুলঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি, নারিকেল এবং মাদারের গাছ এবং স্কুলগৃহের প্রায় গায়ে লাগা দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিম গাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।"

প্রকৃতির সক্রিয়তা : নায়ক একদিন রামলোচন বাবুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে সুরবালার নীরব অস্তিত্বের সন্ধান পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়েছে। এতে তার হৃদয়কোণে নতুনভাবে প্রেমের উন্মেষ ঘটে। সুরবালার জন্য তার চিত্তচঞ্চলতা বেড়ে যায়। নিজের কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে নায়ক প্রকৃতির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বলেছে, "দুপুরবেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন গুন করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ-ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিম গাছের পুষ্পমঞ্জরির সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত– কী ইচ্ছা করিত জানি না।" প্রকৃতি এখানে সক্রিয় হয়ে যেন নায়কের সাথে একাকার হয়ে গেছে।

গল্পে প্রকৃতির প্রভাব : 'একরাত্রি' গল্পে প্রকৃতির একটা বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গল্পের নায়কের ভাষায়, জীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রি উদয় হয়েছিল, সে-ও এক ঝড়ের রাত। সেই ঝড়ের রাতে নায়ক তার বাল্যবয়সের প্রণয়িনীকে পাশে পেয়ে অনন্ত প্রেমের আস্বাদ লাভ করেছে।

প্রকৃতির আয়োজন : 'একরাত্রি' গল্পে প্রেমের যে প্রকাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে প্রকৃতি পরিপূর্ণ আয়োজন করেছে। নায়কের জবানিতে বিবৃত হয়েছে– "বেলা দশটা হইতে টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেডমাস্টার সকাল-সকাল স্কুল ছুটি দিলেন। খণ্ড খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কী মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।" সুতরাং 'একরাত্রি' গল্পে নায়ক-নায়িকার মিলনে প্রকৃতি বিশাল আয়োজন করেছিল।

প্রকৃতির ভূমিকা : নায়ক ও সুরবালার মিলনের জন্য নিসর্গের কাছাকাছি তাদের আনতে প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। রাত একটা-দেড়টা হবে, বানের ডাক শোনা গেল। নায়ক ঘর ছেড়ে সুরবালার বাড়ির দিকে চলল। পুকুর পাড়ে যেতে না যেতেই হাঁটুজল। পুকুর পাড়ের একটা অংশ দশ-এগারো হাত উঁচু হবে। পাড়ের উপরে নায়ক যখন উঠল, ঠিক বিপরীত দিক থেকে আর একটি লোকও উঠল। তাই দেখা যায়, প্রকৃতিই দু'জনকে একত্র করেছে।

প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় নায়ক-নায়িকার প্রেমানুভূতি : 'একরাত্রি' গল্পে প্রকৃতি সুরবালাকে নায়কের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে সুপ্ত প্রেমের উন্মেষকে আত্মতৃপ্তির ব্যঞ্জনায় মহিমান্বিত করে তুলেছে। নায়কের ভাষায়, "আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।" নায়কের প্রেমানুভূতি রাতের সাথে, অন্ধকারের সাথে, প্রলয়ের সাথে, প্রকৃতির নীরব-নিস্তব্ধতার সাথে একাকার হয়ে গেছে।

'একরাত্রি' গল্পে প্রেম ও প্রকৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'একরাত্রি' গল্পে প্রেমের যে শাশ্বত চিত্র এঁকেছেন সে প্রেম প্রকৃতিকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। মহাপ্রলয়ের রাতে নায়ক-নায়িকা জনশূন্য প্রান্তরে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। প্রকৃতিসৃষ্ট এরূপ পরিবেশ ছাড়া তাদের স্বাভাবিক মিলন সম্ভব ছিল না। সমাজের দেওয়াল অতিক্রম করে বিবাহিতা সুরবালার সংসার ভেঙে তাকে এতটা কাছাকাছি পাওয়া নায়কের ইচ্ছাও ছিল না, আর এটি সম্ভবও হতো না। প্রকৃতিই নায়ক-নায়িকার প্রেমের সেতুবন্ধ রচনা করে দিয়েছে এবং এভাবেই প্রেম ও প্রকৃতিকে একাকার করে দিয়েছে।

উপসংহার : 'একরাত্রি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রেমের গল্প হলেও প্রেমের পথ প্রকৃতিকে আশ্রয় করে সুগম হয়েছে। প্রকৃতির প্রতিকূলতায় প্রেম আনুকূল্য লাভ করেছে। সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে প্রেম ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ধরা দিয়েছে।

▸▸ প্রশ্ন : ৭ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৬, '১৮]

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা, "আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল" – এ উক্তির আলোকে 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

অথবা, "আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি" – উক্তিটির আলোকে 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের শিল্পনৈপুণ্য আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক রূপকার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'একরাত্রি' গল্পটি তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এটি তাঁর অসাধারণ সৃষ্টি। এ গল্পে মানব-মানবীর শাশ্বত প্রেমকে গল্পকার ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করেছেন। সংকীর্ণ কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে এক দেহাতীত প্রেমের ঘটনাকে উপজীব্য করে গভীর ভাবব্যঞ্জনায় নির্মিত হয়েছে গল্পটি। এর নামকরণের ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়– Literature is the mirror of life. অর্থাৎ সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়ে

সাহিত্যের মূল ভাববস্তু ফুটে ওঠে। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। সাহিত্যিকগণ সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকেন। তারা ভাব বা কল্পনার সমুদ্রে অবাধ সন্তরণ করেন। তাই বলে তারা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির উর্ধ্বে নন। রচনার সাথে সামঞ্জস্য না রেখে নামকরণ করলে তা সার্থক হয় না। সুতরাং একটি শিল্পকর্মকে সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে এগুলোর প্রকৃত ভাববস্তু ফুটে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- নায়ক-নায়িকার নাম
- স্থান বা কাল
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা

'একরাত্রি' গল্পের নামকরণ : আলোচ্য 'একরাত্রি' ছোটগল্পটির নামকরণ করা হয়েছে গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কাহিনি বা ঘটনা কোনোকিছুকেই বিবেচনা না করে নায়কের জীবনের একটি রাতের উপলব্ধি থেকে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে।

'একরাত্রি' গল্পের বিষয়বস্তু : মানবমনের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে 'একরাত্রি' গল্পে। এ গল্পে নায়কের মনে যে সুপ্ত প্রেম অবরুদ্ধ হয়েছিল, এক রাতে নায়িকার পুনরাবির্ভাবে তা জাগ্রত হয়ে উঠেছে। যে সুরবালাকে নায়ক প্রথম জীবনে এতটুকু গুরুত্ব দেয়নি, সেই একটি বিশেষ রাতকে আশ্রয় করে নায়কের সবকিছু আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। নায়কের কাছে সে রাত অবিস্মরণীয় এক রাত যা স্মৃতির পাতায় অম্লান।

এক রাতের পরম প্রাপ্তি : নায়ক রামলোচন বাবুর বাড়িতে যাওয়ার পর থেকেই সুরবালাকে নিয়ে সব সময় ভাবনায় পড়ে থাকে, উন্মুখ হয়ে থাকে তাকে এক নজর দেখতে। অবশেষে এক ঝড়ের রাত তাকে সে সুযোগ করে দিল। সুরবালাকে সাহায্য করার জন্য নায়ক ঘর থেকে বের হয়ে দেখতে পায় সুরবালাও ঘর থেকে বের হয়ে ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নীরব নিথর রাতে তারা দুজন কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। একে অন্যকে অনুভব করে, কিন্তু কোনো কথা বলে না। নায়কের জীবনে এ রাত ছিল পরম প্রাপ্তির রাত।

'একরাত্রি'র মাহাত্ম্য : মানুষের জীবনে সময়ের অবিরাম গতিধারায় কত রাত আসে কত রাত যায়। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যায় অতীতের দিনরাতগুলো। এর মধ্যে কারো কারো জীবনে কিছু কিছু মাহেন্দ্রক্ষণ উঁকি দিয়ে যায়, যা আজীবন হৃদয়ে দোলা দেয়। স্মৃতির পাতায় অম্লান হয়ে থাকে। 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের জীবনেও এমন একটি রাতের আবির্ভাব ঘটেছিল। এ রাতের নীরব নিস্তব্ধ অন্ধকারে সে বাল্যসাথি সুরবালাকে কাছাকাছি অনুভব করে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এই একটি রাত ছিল তার জীবনের সবচেয়ে মাহাত্ম্যপূর্ণ ক্ষণ।

একটি অনন্ত রাতের উদয় : বিপর্যস্ত নায়কের সমগ্র অন্তর জুড়ে এখন শুধুই সুরবালা। ইতোমধ্যে এক সোমবার সমগ্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। চারদিকে দুর্যোগের ঘনঘটা। নায়কের মনে পড়ে, এ দুর্যোগের রাতে ঘরে সুরবালা একা। সুরবালাকে সাহায্য করার কথা

তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে অনুভূত হলেও দ্বিধাদ্বন্দ্বে সে সুরবালার কাছে যেতে পারে না। রাত একটা-দেড়টার দিকে বানের জল ধেয়ে এলে আত্মরক্ষার জন্য সুরবালা পুকুর পাড়ে আসে। নায়কও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সুরবালাকে সাহায্য করতে। প্রলয়ংকরী সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে নায়ক আবার কাছে পায় তার সুরবালাকে। অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। খুব কাছাকাছি থেকেও বিচ্ছেদের যোজন দূরত্ব তাদের নির্বাক করে রাখে। ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেলে দু'জনেই ফিরে যায় আপন আপন নীড়ে। একটি অনন্ত রাতের স্মৃতি রয়ে যায় নায়কের সমগ্র হৃদয়-মন জুড়ে।

নামকরণের সার্থকতা : গল্পকার এ গল্পে একটি বিশেষ রাতকে নায়কের তুচ্ছ জীবনের চরম সার্থকতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ রাতেই নায়ক মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পেয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতার গ্লানি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শিক্ষা, রাজনীতি, সংসার কোনো ক্ষেত্রেই নায়ক সার্থক হতে পারেনি। একদিন যাকে হাত বাড়ালেই পাওয়া যেত, সেই সুরবালাও এখন অধরা। সে একটি বিশেষ রাতে ক্ষণিকের জন্য নায়কের কাছে এসেছিল। আর এই একটি রাতই তার সারাজীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা। সুতরাং দেখা যায়, গল্পের সমগ্র অবয়ব জুড়ে যে কাহিনি আবর্তিত হয়েছে তা সমাপ্তি লাভ করেছে এক রাতের এক আবেগঘন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে। এক রাতের তাৎপর্যের মধ্যে গল্পের মূলসুর বাঁধা রয়েছে। তাই গল্পকার তাঁর এ গল্পের নামকরণ করেছেন 'একরাত্রি'।

উপসংহার : বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট শিল্পকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র এক স্কুল মাস্টারের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ একটি রাতের মহিমাকে নির্ভর করেই মূলত গল্পটি নির্মিত হয়েছে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, গল্পের 'একরাত্রি' নামকরণ শিল্পসম্মত ও সার্থক হয়েছে।

পুঁই মাচা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮৯৪–১৯৫০ খ্রি.]

» প্রশ্ন : ৮ ॥ 'পুঁই মাচা' গল্পের মূলভাব/মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।
অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁই মাচা' গল্পের মূল সুর/মূলভাব তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর || উপস্থাপনা : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-বিশ্লেষণ, প্রকৃতি বর্ণনা ও করুণ রসাত্মক রচনা পাঠক হৃদয়কে সহজেই আকৃষ্ট করে। 'পুঁই মাচা' গল্পটিও একটি করুণ রসাত্মক ছোটগল্প। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'পুঁই মাচা' গল্পের কাহিনি। এখানে বাঙালি পরিবারের অভাব-অনটনক্লিষ্ট জীবনের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে।

গল্পের মূলভাব/মূল বক্তব্য/মূল সুর

সহায়হরির সংসার : সহায়হরি চাটুয্যে নিম্নবিত্ত এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। স্ত্রী অন্নপূর্ণা এবং চার মেয়ে ক্ষেন্তি, পুঁটি, রাধী ও লক্ষ্মীকে নিয়ে তার সংসার। সহায়হরি উদাসীন অসচেতন প্রকৃতির মানুষ। তার জীবিকা অর্জনের সুনির্দিষ্ট কোনো অবলম্বন ছিল না। তাদের বড় মেয়ে ক্ষেন্তির আশীর্বাদের পর বিয়ে ভেঙে যায়। সেও বাবার মতো উদাসীন,

অসচেতন। আর ছোট মেয়েগুলোর সংসার সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই নেই। তবে গৃহকর্ত্রী অন্নপূর্ণা খুবই সংসার সচেতন। সংসারের দায়দায়িত্ব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনিই গুরুত্বের সাথে পালন করেন।

সহায়হরির উদাসীনতা : সহায়হরি চাটুয্যে একজন অসচেতন উদাসীন মানুষ। সংসারের কোনো দায়দায়িত্ব পালন করেন না তিনি। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গল্প-গুজব করেন আর মাছ শিকার করে সময় কাটান। সংসারের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে কিংবা কীভাবে সংসার চলছে, এ ব্যাপারে তার কোনো চিন্তা নেই। বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স পনেরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে। একবার আশীর্বাদ হওয়ার পর বিয়ে ভেঙে যায় তার। এ নিয়ে আশেপাশে নানা গুজব রটলেও সেদিকে সহায়হরির কোনো খেয়াল নেই। সমাজপতিরা তাকে চণ্ডীমণ্ডপে ডেকে নিয়ে একঘরে করার হুমকি দিলেও তার উদাসীনতার ঘোর কাটে না।

সহায়হরির সন্তানপ্রেম: 'পুঁই মাচা' গল্পে হতভাগ্য সহায়হরি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সমাজ-সংসার সম্পর্কে উদাসীন হলেও সহায়হরি সন্তানদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দরদি। তিনি তার কন্যাদের ভালো খাওয়ানোর জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে কিংবা চুরি করতেও দ্বিধা করেননি। বড় মেয়ে ক্ষেন্তির প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা। অভাবের কারণে আদরের মেয়ে ক্ষেন্তিকে চল্লিশোর্ধ পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় তার হৃদয় ব্যথায় ভরে উঠেছিল।

অন্নপূর্ণার মাতৃহৃদয় : সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণা এক আদর্শ মাতার প্রতিচ্ছবি। তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে চরম অভাব-অনটনের মাঝেও সংসার আগলে রেখেছেন। সন্তানদের শাসন ও ভালোবাসায় বড় করে তুলেছেন। রায়দের ফেলে দেওয়া পুঁইশাক তুলে আনার জন্য প্রথমে ক্ষেন্তিকে বকা দিয়েও পরে তা-ই কুড়িয়ে এনে রান্না করে নিজ হাতে মেয়েকে খাইয়েছেন। তিনি পুঁইশাকের চচ্চড়ি, নারকেলের পিঠা ইত্যাদি তৈরি করে মেয়েদের খাওয়াতেন।

সন্তান বাৎসল্য : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের অন্যতম উপকরণ হলো সন্তান বাৎসল্য। সহায়হরি অন্নপূর্ণা দম্পতির সহজ-সুন্দর ও গভীর সন্তান-বাৎসল্য গল্পটিকে মহিমান্বিত করেছে। তাদের দারিদ্র্যের সংসারে অনেক কিছুরই অভাব ছিল। কিন্তু স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার অভাব ছিল না। চারটি মেয়ে মা-বাবার স্নেহ-ভালোবাসা পেয়ে অনেক না পাওয়াকে ভুলেছিল। এ ব্রাহ্মণ দম্পতির সন্তান-বাৎসল্য পাঠককে মুগ্ধ করে।

সামাজিক সম্পর্ক : 'পুঁই মাচা' গল্পে কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, সহায়হরি যে সমাজে বাস করতো সে সমাজের মানুষের মাঝে ছিল পারস্পরিক ভালোবাসা। সামাজিক সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। পরস্পর পরস্পরের প্রতি ছিল অত্যন্ত উদার। এজন্য সহায়হরি অনায়াসে তারক খুড়োর কাছ থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে চান। সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণা দুর্গাদের বাড়ি গিয়ে নবান্ন মেখে দিয়ে আসেন। খেদিদের বাড়ি গিয়ে ক্ষেন্তি পাটিসাপটা পিঠা খেয়ে আসে। রায় কাকার বাড়ি থেকে পুঁইশাক চেয়ে আনে ক্ষেন্তি।

সামাজিক জটিলতা : কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'পুঁই মাচা' গল্পে সমাজ-বাস্তবতার এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ব্যাপক কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। সহায়হরি চাটুয্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। বিবাহযোগ্য কন্যাকে যথাসময়ে বিয়ে দিতে না পারায় সমাজপতিরা তাকে একঘরে করার ভয় দেখান। সমাজপতি কালীময় ঠাকুর সহায়হরিকে ডেকে শাসিয়ে দেয়। এসব সামাজিক অনুশাসনের ফলে সহায়হরি

ক্ষেন্তিকে চল্লিশোত্তর এক চামারের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পণের আড়াইশ টাকা বাকি থাকায় ক্ষেন্তিকে তারা বাপের বাড়ি যেতে দেয়নি। অবশেষে ক্ষেন্তি সমাজের বলি হয়ে বছর পূর্ণ না হতেই মৃত্যুর সুধা পান করে।

কিশোর মনস্তত্ত্ব : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান উপকরণ হচ্ছে কিশোর মনস্তত্ত্বের পরিচর্যা। এ গল্পে ক্ষেন্তি, পুঁটি, রাধী ও লক্ষ্মী নামের চার শিশু-কিশোরী আছে। তারা একই পরিবারের সহোদরা বোন। ক্ষেন্তি সবার বড়। সে একটু অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়ে; বিশেষভাবে সে পুঁইশাক ও পিঠা খেতে পছন্দ করে। মা এ কথা জানে বলে ক্ষেন্তিকে খাবার সময় পুঁইশাক ও পিঠা বেশি দেয়। ক্ষেন্তি সহজ-সরল কিশোরী বালিকা। মা-বাবাকে সে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। তার মাঝে কৈশোরের চপলতা জাজ্বল্যমান। পুঁইশাক খেতে ভালোবাসে বলে সে স্ব-উদ্যোগে বোনদের নিয়ে পুঁই মাচা তৈরি করে। শিশু-কিশোরদের এসব মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো গল্পকার নিপুণভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন।

ক্ষেন্তির স্বপ্ন : ক্ষেন্তি জন্মগ্রহণ করে সহায়হরির দরিদ্র সংসারে। পুঁইশাক ভালোবাসে বলে সে নিজেই বাড়ির খোলা জমিতে একটি শাক-সবজির বাগানের পরিকল্পনা করে। সেখানে পুঁইগাছ লাগানোর জন্য ক্ষেন্তি প্রথমেই একটি দুর্বল পুঁই চারা সংগ্রহ করে। অন্যান্য শাক-সবজির চিন্তা এখনো তার মনের মাঝেই লালিত রয়েছে। তার বিশ্বাস, এ পুঁই গাছ একদিন বড় হবে এবং পর্যাপ্ত শাক হবে, কিন্তু পুঁই গাছ বড় হলেও ক্ষেন্তি তার শ্বশুর বাড়ি থেকে ফিরে আসতে পারেনি। তার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়।

নিষ্ঠুর যৌতুকপ্রথা : 'পুঁই মাচা' গল্পে লেখক দীর্ঘদিনের সামন্ততন্ত্রের ফসল অভিশপ্ত যৌতুকপ্রথার বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছেন। শ্বশুরের অর্থলিপ্সাই ক্ষেন্তিকে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। পণের টাকা দিতে না পারায় ক্ষেন্তি চিরমমত্বের পিতৃগৃহে আর ফিরে আসতে পারেনি। বাবার দারিদ্র্যের কারণে ক্ষেন্তিকে শ্বশুর বাড়িতে নানা দুর্নাম সহ্য করতে হয়েছে। ক্ষেন্তির বসন্ত হলে তার গহনাগুলো খুলে রেখে দূর সম্পর্কীয় পিসির হাতে তুলে দিয়েছে। দরিদ্র পিতার কন্যা ক্ষেন্তিকে অবশেষে অযত্ন অবহেলায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

বেদনাদায়ক স্মৃতি : ক্ষেন্তির বিয়ের পর এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। দরিদ্র পিতা সহায়হরি বিয়ের পর ক্ষেন্তিকে আনতে গিয়ে পণের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তাকে আনতে পারেনি। প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের কাছে এ দুঃখবোধ প্রকাশ করতে গিয়েই সহায়হরি তার পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ তোলেন। এরপর যখন পৌষ-পার্বণ আসে তখন পিঠা বানাতে গিয়েই অন্নপূর্ণার কথা মনে পড়ে। তার সবই আছে, শুধু পিঠাপাগল মেয়েটি নেই। খেতে বসে হঠাৎ করেই পুঁটি বলে ওঠে, "দিদি পিঠা বড় ভালোবাসতো।" সাথে সাথেই কেঁপে ওঠে অন্নপূর্ণা। তার দৃষ্টি চলে যায় উঠানের কোণের দিকে, যেখানে ক্ষেন্তির লাগানো পুঁই গাছের শীর্ণ চারাটি মাচা জুড়ে বেড়ে উঠেছে।

উপসংহার : 'পুঁই মাচা' একটি সংবেদনশীল হৃদয়বিদারক সামাজিক ছোটগল্প। লেখক অত্যন্ত স্বচ্ছ অনুভূতি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সহায়হরির পরিবারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার চিত্র মনোরমভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পটিতে এদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক দুর্গতি, স্নেহের প্রাবল্য, অন্ধ ধার্মিকতা, স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজের হৃদয়হীন অনুশাসন প্রভৃতি ফুটে উঠেছে।

» প্রশ্ন : ৯ ॥ 'পুঁই মাচা' গল্পটি সন্তান বাৎসল্যের প্রামাণ্য দলিল– আলোচনা কর।
[ফা. প. ২০১৮]

অথবা, "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পটি সন্তান বাৎসল্যের একখানা প্রামাণ্য দলীল।" – উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০০৯, '১৫]

অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' গল্প অবলম্বনে অন্নপূর্ণার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, "অন্নপূর্ণা এক সর্বংসহা শাশ্বত জননীর প্রতিমূর্তি" –এ উক্তির আলোকে 'পুঁই মাচা' গল্প অবলম্বনে অন্নপূর্ণা চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'পুঁই মাচা' গল্পে সহায়হরি চাটুয্যে ও অন্নপূর্ণার মধ্যে সন্তান বাৎসল্যের যে প্রাবল্য দেখা যায়, তার বিবরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে শরৎ-পরবর্তী শ্রেষ্ঠ লেখকদের অন্যতম। তাঁর জীবন-বিশ্লেষণ, প্রকৃতি বর্ণনা ও করুণ রসাত্মক রচনা পাঠক হৃদয়কে সহজেই আকৃষ্ট করে। 'পুঁই মাচা' গল্পটিও তাঁর একটি করুণ রসাত্মক ছোটগল্প। এ গল্পে তিনি নিম্নবিত্ত বাঙালির অনটনক্লিষ্ট পারিবারিক জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। সহায়হরি চাটুয্যের সংসারজীবন তুলে ধরতে গিয়ে তিনি সহায়হরি ও তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার সন্তান বাৎসল্যের প্রাবল্যকে মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপন করেছেন।

অন্নপূর্ণার পরিচয় : সন্তানবৎসল বাঙালি মায়ের প্রতীক অন্নপূর্ণা ছিলেন হতভাগ্য দরিদ্র সহায়হরি চাটুয্যের স্ত্রী। সহায়হরি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তিনি অসচেতন প্রকৃতির উদাসীন মানুষ। অন্নপূর্ণা গ্রাম-বাংলার স্নেহময়ী, পতিপরায়ণা, কর্তব্য সচেতন জননীর বাস্তব প্রতিমূর্তি। অন্নপূর্ণার চার মেয়ে– ক্ষেন্তি, পুঁটি, রাধী ও লক্ষ্মী। তিনি তার সন্তানদের খুব আদর-স্নেহ করতেন। দায়িত্বহীন স্বামীর অভাব-অনটনের সংসারে সন্তানদের নিয়ে তিনি অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটালেও সন্তানদের প্রতি তার স্নেহ-মমতার কমতি ছিল না।

শাশ্বত বাঙালি গৃহবধূ : 'পুঁই মাচা' গল্পে অন্নপূর্ণা এক চিরন্তন শাশ্বত বাঙালি গৃহবধূ। তিনি বাঙালি গৃহবধূর মতোই গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম, সন্তান লালন-পালন ইত্যাদি সম্পন্ন করতেন। নিজ হাতে রান্না করে স্বামী ও সন্তানদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন। পৌষ-সংক্রান্তির সময় বিভিন্ন প্রকারের পিঠাপুলি তৈরি করে মেয়েদের তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতেন।

সমাজসচেতন অন্নপূর্ণা : সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণা সমাজসচেতন এক বাঙালি রমণী। অন্নপূর্ণার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমাজসচেতনতা। তার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির আশীর্বাদ হওয়ার পর বিয়ে হয়নি। এ কারণে সমাজের বিভিন্ন মহলে সমালোচনার যে ঝড় উঠেছিল, অন্নপূর্ণা তার খবর রাখতেন। তাড়াতাড়ি ক্ষেন্তিকে বিয়ে দিতে না পারলে সমাজে তাদের যে একঘরে করে রাখা হবে সে সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন। তাই ক্ষেন্তির বিয়ের ব্যাপারে তিনি স্বামী সহায়হরিকে বারবার তাগিদ দিতেন।

আত্মসম্মানবোধসম্পন্না অন্নপূর্ণা : অন্নপূর্ণা ছিলেন আত্মসম্মানবোধসম্পন্না গৃহবধূ। ক্ষেন্তি তার ছোট বোনকে সাথে নিয়ে পাড়ার রায়দের পাকা পুঁইশাকের ডাঁটা খাওয়ার জন্য নিয়ে আসায় অন্নপূর্ণার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লেগেছে। তিনি ওগুলো ফেলে দেওয়ার হুকুম দিয়ে ক্ষেন্তিকে ভর্ৎসনা করেন। মানুষের ফেলে দেওয়া জিনিস কুড়িয়ে আনা বা কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না।

ধৈর্যশীলা : অন্নপূর্ণা একজন ধৈর্যশীলা রমণী। অভাব-অনটনে, বিপদে-আপদে তিনি কখনো ধৈর্যচ্যুত হননি। স্বামীর উদাসীনতা-অসচেতনতায় তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কিন্তু হৈ-চৈ করে

পরিবেশ নষ্ট করেননি। তিনি তার স্বামীকে নরম ভাষায় বুঝিয়েছেন, এবং এতে অন্নপূর্ণার চরম ধৈর্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কোমল হৃদয়া অন্নপূর্ণা : আত্মসম্মানবোধের আড়ালে অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয় ফল্গুধারার ন্যায় প্রবাহিত হয়েছিল। এটা ছিল তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেয়েদের আনা পুঁইশাকের ডাঁটা ফেলে দেওয়ার পর অন্নপূর্ণার মনটা ক্ষেন্তির জন্য কেঁদে ওঠে। ক্ষেন্তি যে অতি কষ্ট করে খাওয়ার জন্য শাকগুলো এনেছিল, সে স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেননি। তাই সবার অলক্ষে তিনি ফেলে দেওয়া শাকের কিছুটা কুড়িয়ে এনে রান্না করে ক্ষেন্তিকে খেতে দিয়েছিলেন, যা ছিল তার কোমল হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ।

সৎস্বভাবের অন্নপূর্ণা : অন্নপূর্ণা ছিলেন একজন সৎস্বভাবের বাঙালি গৃহবধূ। অন্যায় ও অসত্যকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দিতেন না। স্বামী সহায়হরি ও মেয়ে ক্ষেন্তি বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলু চুরি করে আনলে তিনি তা সমর্থন করেননি; বরং তিনি উভয়কে গালমন্দ ও তিরস্কার করেছেন। অন্নপূর্ণা স্বামীর উদ্দেশে বলেছেন, "চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এককাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বলো না। আমি সব জানি।" অন্যায় কর্মে মেয়েকে জড়ানো সম্পর্কে অন্নপূর্ণা স্বামীকে তিরস্কার করে বলেন, "তোমার তো ইহকালও নেই, পরকালও নেই, চুরি, ডাকাতি, যা ইচ্ছা কর, কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কীসের জন্য?"

সন্তানবৎসল অন্নপূর্ণা : অন্নপূর্ণা একজন সহজ-সরল ও মমতাময়ী জননী। স্বামীর অভাব-অনটনে জর্জরিত সংসারটিকে এ মহীয়সী নারী বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন। সৃষ্টিকর্তা তাকে পরীক্ষা করার জন্যই হয়তো চার-চারটি মেয়ের মা করেছেন। মেয়েগুলোকে তিনি ঠিকমতো অন্ন-বস্ত্র দিতে না পারলেও তাদের প্রতি তার মায়া-মমতার অন্ত ছিল না। অন্নপূর্ণা কন্যাদের একদিকে যেমন শাসনে রেখেছেন, অন্যদিকে আদর-যত্নও করেছেন। বড় কন্যা ক্ষেন্তির ভোজনপটুতাকে কখনো তিনি তিরস্কার করেননি; বরং সহজ-সরল এ মেয়েটাকে সর্বদা প্রশ্রয়ের চোখে দেখেছেন। ক্ষেন্তির প্রতি তার দুর্বলতা ছিল অনেক। অন্নপূর্ণা মেয়েদের ভালো খাওয়াতে না পারলেও নারকেল কোরা, নারকেলের পিঠা, ময়দার গোলা, পুঁই শাকের চচ্চড়ি ইত্যাদি খেতে দিতে কার্পণ্য করতেন না। সর্বোপরি মেয়েদের লালন-পালনে কখনো অবহেলা দেখাননি তিনি।

সহায়হরির সন্তান বাৎসল্য : দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহায়হরি চাটুয্যের চারটি কন্যা বৈ কোনো পুত্রসন্তান ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি কন্যাদের ভালোবাসতে কার্পণ্য করেননি। তিনি তার কন্যাদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি কন্যাদের একটু ভালো খাওয়ানোর জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে কিংবা চুরি করতেও দ্বিধা করেননি। সহায়হরি কন্যাদের খাওয়ানোর জন্য তারক-খুড়োর কাছে খেজুরের রস চেয়ে আনতে গিয়েছিলেন। বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে এনেছেন। সর্বোপরি তার বুকটা ছিল কন্যাদের জন্য ভালোবাসায় ভরপুর।

অন্নপূর্ণার সংবেদনশীলতা : দরিদ্র সহায়হরি চাটুয্যের স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছিলেন একজন সংবেদনশীলা রমণী। স্বামী ও কন্যাদের প্রতি তার তীব্র ভালোবাসা ছিল। কন্যা ক্ষেন্তির মৃত্যুর পর তিনি বুকে পাথরচাপা দিয়ে শোক সংবরণ করেন। ক্ষেন্তির মৃত্যুর পরবর্তী পৌষ-সংক্রান্তিতে পিঠা বানাতে বসে হঠাৎ করে ক্ষেন্তির লাগানো পুঁইশাকের মাচার প্রতি তার চোখ চলে যায়। তিনি মনের অজান্তেই বলে ফেলেন, মেয়েটার পুঁইশাকের প্রতি অনেক লোভ ছিল। ক্ষেন্তির লাগানো পুঁই মাচা আছে, অথচ সে আজ নেই। মেয়ের অনুপস্থিতি তার কোমল হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলেছে।

অন্নপূর্ণা শাশ্বত জননী : অন্নপূর্ণা গ্রাম-বাংলার সর্বংসহা এক শাশ্বত জননী। আবহমানকাল থেকে অন্নপূর্ণার ন্যায় সৎস্বভাববিশিষ্ট জননীরা বাংলাদেশের পরিবারগুলোকে অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়ে লালন করে আসছেন। এদের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে হাজার হাজার সুখী পরিবারের। এরা নিজেদের সবটুকু বিলিয়ে দিয়ে পরিবার পরিজনকে সুখী করার আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। তাই এ রমণীদের কীর্তি শাশ্বত, অন্নপূর্ণা তাদেরই অন্যতম।

সন্তানবাৎসল্যের প্রামাণ্য দলিল : মানুষের হৃদয়ে সন্তান-বাৎসল্যের ধারা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই প্রবাহিত হয়ে আসছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পে এর প্রাধান্য অত্যধিক। গল্পটিতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ দম্পতির হৃদয়ের রক্তক্ষরণ তাদের মহান পিতামাতায় পরিণত করেছে। সন্তানদের ভালোভাবে লালন-পালনের ক্ষমতা না থাকলেও এরা কখনো সন্তানদের গায়ে কাঁটার আঁচড় লাগতে দেননি। বিবাহযোগ্য কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে পাত্রস্থ করার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সচেষ্ট ছিলেন। সন্তানদের শাসন করার পাশাপাশি সোহাগ-যত্ন করতেও কার্পণ্য করেননি। দারিদ্র্য, অসহায়ত্ব, সামর্থ্যহীনতা পদে পদে বাধাগ্রস্ত করলেও সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা আপন কর্তব্যে অনড় থেকেছেন।

উপসংহার : সহায়হরির দরিদ্র ঘরের ঘরনি অন্নপূর্ণা ছিলেন গ্রাম-বাংলার একজন আদর্শ নারী, সার্থক স্ত্রী এবং সন্তানবৎসল জননী। তার মাঝে সব গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। অভাবী সংসার, স্বামীর উদাসীনতা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় কর্তব্যে অনড় ছিলেন। তিনি সব সময় কন্যাদের পর্যাপ্ত যত্ন প্রদানে সচেষ্ট থাকতেন। সর্বোপরি তিনি তার সন্তানদের অপরিমেয় অকৃত্রিম ভালোবাসা দিয়েছেন, যা একজন বাঙালি নারীর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

▸▸ প্রশ্ন : ১০ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের নামকরণ কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? আলোচনা কর।

অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের নামকরণ কি যুক্তিযুক্ত হয়েছে? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা, "বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির স্মৃতি পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।"– এ উক্তির আলোকে 'পুঁই মাচা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা যাচাই কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : 'পুঁই মাচা' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিরন্তন চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ ছোটগল্প। তাঁর এ ছোটগল্পটির নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বলা হয়– Literature is the mirror of life. আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। তাই সাহিত্যের নামকরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

নামকরণের রীতি : সাহিত্যে নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেছেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। মূলত নামকরণের মধ্য দিয়েই রচনার মূলভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তেমনি 'পুঁই মাচা' নামকরণের মধ্য দিয়ে 'পুঁই মাচা' গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ ভাব ফুটে উঠেছে।

নামকরণের ভিত্তি : সাহিত্যিকগণ নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো নিজেদের সাহিত্যকর্মের নামকরণ করেন না; বরং এর একটা সুনির্দিষ্ট ভিত্তি রয়েছে। সাধারণত নামকরণের ক্ষেত্রে

যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় তা হলো–

- গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য
- প্রধান চরিত্র
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- মূলভাব বা রচনার বিষয়বস্তু
- স্থান, কাল বা নায়ক-নায়িকার নাম

'পুঁই মাচা' গল্পের নামকরণ : বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পটিতে ক্ষুদ্র একটি পুঁই মাচা বিশাল স্থান দখল করে আছে। এ পুঁই মাচার সাথে জড়িয়ে আছে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত একটি পরিবারের জীবন-যন্ত্রণা এবং ভোজনপটু পুঁইশাকপ্রিয় একটি মেয়ের স্মৃতি। সে আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তার অস্তিত্বের স্বাক্ষরস্বরূপ রয়ে গেছে পুঁই মাচাটি। পুঁই ডাঁটার লাবণ্যময় নধর দেহের সাথে সেই মেয়েটির অবুঝ-অবোধ মনের স্নিগ্ধতা একাকার হয়ে গেছে। এ কারণে লেখক গল্পটির নাম দিয়েছেন 'পুঁই মাচা'।

পুঁইশাক পরিচিতি : পুঁই বাংলার সর্বজনপরিচিত সবুজ-শ্যামল সুস্বাদু একটি শাক। গ্রামবাংলার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই বাঁশের কঞ্চি দ্বারা তৈরি মাচায় পুঁইশাক চাষ করা হয়। এ শাক খেতে সুস্বাদু এবং এতে অধিক খাদ্যপ্রাণ আছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি পুঁইশাক খেতে খুবই পছন্দ করতো। অন্যের ফেলে দেওয়া পুঁইশাক কুড়িয়ে আনায় সে মায়ের বকুনি খেয়েছে বটে; কিন্তু তবুও তার পুঁইপ্রীতি কমেনি। বাড়ির উঠানের এক পাশে কিছু জায়গা পরিষ্কার করে ক্ষেন্তি একটি পুঁই মাচা তৈরি করেছিল। ক্ষেন্তি তার পুঁইক্ষেতে পুঁতেছিল শীর্ণকায় একটি পুঁই চারা। এ পুঁই মাচাটির স্মৃতিই পরবর্তীতে গল্পের একটি বিশেষ স্থান দখল করেছে।

পুঁই মাচার গুরুত্ব : পুঁই মাচা গ্রামবাংলার একটি অতি সামান্য বিষয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে পুঁই মাচা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পুঁই মাচা এ গল্পে হয়ে উঠেছে এক অসামান্য বস্তু। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষেন্তির সাথে পুঁই মাচার গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

ক্ষেন্তি ও পুঁই মাচা : সহায়হরি চাটুয্যের বড় মেয়ের নাম ক্ষেন্তি। সে ছিল ভোজনপটু। পুঁইশাক তার খুবই প্রিয়। একবার অরন্ধনের পূর্বদিন পুঁইশাক রান্না হলে ক্ষেন্তি তার মা অন্নপূর্ণাকে বলেছিল, সে একাই অর্ধেক খাবে। পুঁইশাকপ্রিয় এ মেয়েটি একদিন ওপাড়ার রায়দের ফেলে দেওয়া অর্ধ পাকা পুঁই ডাঁটার বোঝা বাড়িতে আনার কারণে মায়ের বকুনি খেয়েছিল। তার মা রাগ করে ছোট মেয়েকে পুঁই ডাঁটাগুলো ফেলে দিতে বলেছিলেন। পরে অন্নপূর্ণা মেয়ে ক্ষেন্তির কথা ভেবে গোপনে তার কিছু অংশ রান্না করে তাকে খেতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ক্ষেন্তি তাদের বাড়ির উঠানের এক কোণে মাচা তৈরি করে শীর্ণকায় একটি পুঁইচারা রোপণ করে। কিন্তু পুঁই মাচাটি যখন লাবণ্যময় নধর ডগায় ভরে উঠল, তখন ক্ষেন্তি আর বেঁচে নেই।

পুঁই মাচার প্রভাব : সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তি অত্যন্ত যত্ন করে তার বাগানে খুবই শীর্ণকায় একটি পুঁই চারা লাগিয়েছিল। পুঁইভক্ত ক্ষেন্তি খুব চেষ্টা-সাধনা দ্বারা তার আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রিয় পুঁই চারাটি বাঁচিয়ে তুলেছিল। একসময় গাছটি অনেক বড় হয়, কচি নধর পুঁই শাকে ভরে ওঠে সমগ্র মাচা, কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! যার একান্ত শ্রম ও সাধনায় এ পুঁই গাছটি; সেই ক্ষেন্তি আজ নেই। বছর ঘুরে আবার পৌষ-পার্বণ ফিরে এসেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি ক্ষেন্তি। সে আজ আর পিঠা খেতে চাচ্ছে না। ফিরে দেখছে না তার নিজের হাতে লাগানো পুঁই মাচাটি। তাই এ পুঁই মাচাটি অন্নপূর্ণা ও বোনদের হৃদয়ে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল।

গল্পের মূল কাহিনি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি নামের ভোজনবিলাসী একটি মেয়ে। সে মায়ের প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত, শান্ত অথচ বাবার প্রশ্রয়ে সদা চঞ্চলা বালিকা। ঘরে তার মন বসে না। বনে-বাদাড়ে, ফল-ফলাদির গাছতলায় তার ঘোরাফেরা। পিতা সহায়হরি নিজেও কন্যার মতোই উদাসীন। পুঁই শাকের প্রতি ক্ষেন্তির আলাদা একটা লোভ রয়েছে। সে প্রতিবেশী রায়দের ফেলে দেওয়া পুঁইশাক কুড়িয়ে এনেছে। এজন্য সে মায়ের বকুনিও খেয়েছে। অবশ্য মেয়ের প্রতি গভীর দরদবোধ থেকে পরবর্তীতে মা সেগুলোর কিছু অংশ রান্না করে তাকে খেতে দিয়েছে। সে উঠানে একটি পুঁইগাছ রোপণ করেছিল, কিন্তু গাছটি বড় হওয়ার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায়। শ্বশুরালয়ের পরিবেশ তার জন্য অনুকূল ছিল না। একপর্যায়ে বসন্ত রোগে সে মারা যায়। ক্ষেন্তির পরিবারের সবাই তার অকাল মৃত্যুতে বেদনাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তবুও তার সব স্মৃতি ধারণ করে রাখে তার লাগানো পুঁই গাছটি।

নামকরণের সার্থকতা : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' গল্পটির বিচার বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, গল্পের পুরো অবয়বে রয়েছে এদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক দুর্গতি, স্নেহের প্রাবল্য, অন্ধ ধার্মিকতা ও স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অনুশাসন। এ সবই গল্পকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। পুঁই ডাঁটার আড়ালে আমরা চিরন্তন হয়ে থাকতে দেখি এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষেন্তিকে। রস সিঞ্চনে যেমন পুঁই ডাঁটা বেড়ে ওঠে, ঠিক তেমনি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ক্ষেন্তির প্রতি সদয় থাকলে ক্ষেন্তিও বেড়ে উঠত সতেজ জীবনে; অকালে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হতো না তাকে। এ গল্পের শেষ স্তবকের মাধ্যমে নামকরণের সার্থকতা পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে। "যেখানে বাড়ির সেই লোভী মেয়েটির স্মৃতি পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁই গাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে।" সুতরাং বলা যায়, গল্পের অন্তর্নিহিত ভাবের সাথে 'পুঁই মাচা' নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

উপসংহার : সুন্দর নামকরণের মধ্য দিয়ে কোনো বিষয়ের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই নামকরণ হচ্ছে একটি শিল্প। জীবনের প্রতিকৃতি জীবনের মাধ্যমেই দেখিয়েছেন লেখক। সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা দম্পতির আদরের মেয়ে ক্ষেন্তির সেবা-যত্নে বেড়ে ওঠা পুঁই গাছটি হারিয়ে যাওয়া একটি জীবনস্মৃতি হিসেবে সবার হৃদয়পটে জাগরূক থেকেছে। সুতরাং এ গল্পের নামকরণ 'পুঁই মাচা' যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

⏩ প্রশ্ন : ১১ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'পুঁই মাচা' গল্প অবলম্বনে ক্ষেন্তির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, "ক্ষেন্তির ভোজনপটুতা তার স্বভাবসুন্দর অকৃত্রিম কৈশোর-চাপল্যের পরিচায়ক" – এ উক্তিটি অবলম্বনে 'পুঁই মাচা' গল্পের ক্ষেন্তির চরিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, ছোটগল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁই মাচা' গল্পটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী সামাজিক ছোটগল্প। এ গল্পে তিনি সমাজ বাস্তবতার পাশাপাশি কিশোর মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। 'পুঁই মাচা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তি। তাকে কেন্দ্র করেই গল্পটির অন্যান্য চরিত্র গড়ে উঠেছে। এ গল্পে লেখক ক্ষেন্তির চরিত্র অত্যন্ত করুণ রসাত্মক এবং চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক্ষেন্তির পরিচয় : 'পুঁই মাচা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষেন্তি সহায়হরি চাটুয্যের বড় মেয়ে। তার বয়স পনেরো বছর। বিবাহযোগ্য হলেও ক্ষেন্তির শিশুসুলভ আচরণের সমাপ্তি ঘটেনি।

সে সারাদিন ছোট বোন দুটোকে নিয়ে গ্রামময় ঘুরে বেড়ায়। এ কারণে মা অন্নপূর্ণার বকুনি খায় সে। বিয়ের বয়স হলেও এখনো ক্ষেন্তির বিয়ে হয়নি। অবশ্য একবার আশীর্বাদ হওয়ার পরও পাত্রের চরিত্রদোষের কারণে বিয়ে দেওয়া হয়নি।

ক্ষেন্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : সাধারণ গ্রাম্য দরিদ্র বালিকার ভোজনপটুতা, উদারপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধের অভাব, এমনকি পিতার প্রশ্রয়ে প্রলোভনের বশে চুরি করার প্রবণতাও ক্ষেন্তির মধ্যে রয়েছে। তারপরও তার মধ্যে অদম্য প্রাণশক্তি, শৈশব-চাপল্যের চিরন্তন প্রতীক। ঝরনার চঞ্চলতা ও প্রাণোচ্ছল খেয়াল-খুশিতে পূর্ণ কিশোরী। ক্ষেন্তি কখনো মায়ের শাসনে শঙ্কিতা, আবার কখনো বাবার প্রশ্রয়ে চঞ্চলা হরিণী। বিয়ের সাথে সাথে তার আবাল্য বেড়ে ওঠা পরিবারের সাথে অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতায় বিচ্ছেদ দেখা দেয়।

নিরীহ প্রকৃতির ক্ষেন্তি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের সহায়হরি চাটুয্যের বড় কন্যা ক্ষেন্তি ছিল নিরীহ প্রকৃতির এক গ্রাম্য বালিকা। তার স্বভাব ছিল গোবেচারা ধরনের। তাকে হাজারো গালমন্দ রাগারাগি করলেও সে এর প্রতিবাদ করতো না। ও পাড়ার রায়দের ফেলে দেওয়া পুঁইশাক তুলে আনার কারণে মা অন্নপূর্ণা যখন তাকে গালমন্দ করেন, তখনও ক্ষেন্তি একজন অপরাধীর ন্যায় চুপচাপ থেকেছে। আবার বাপের সাথে বরোজপোতার জঙ্গল থেকে আলু চুরি করে আনার অপরাধে মা যখন তাকে ভর্ৎসনা করেছেন, তখনো সে টুঁ-শব্দ করেনি। সংসারের অভাব-অনটনের প্রভাব ক্ষেন্তির ওপরও পড়েছিল। তার সহজ-সরল মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, কুড়িয়ে পাওয়া পুঁইশাক কিছুটা হলেও খাদ্যাভাব মেটাবে এবং এতে তার মা খুশি হবে। সংসারের কাছে তার কোনো দাবি ছিল না। নিরীহ প্রকৃতির কারণেই অযত্ন, অবহেলা ও বিনা চিকিৎসায় শ্বশুর বাড়িতে ক্ষেন্তিকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে।

পিতৃ-অনুগত ক্ষেন্তি : ক্ষেন্তি ছিল তার পিতা সহায়হরি চাটুয্যের একান্ত অনুগত। পিতাকে সে যেমন ভালোবাসত তেমনি মান্য করতো। এ কারণে সে পিতার প্রশ্রয়ে লালিত হয়েছে। বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলু চুরি করে আনার প্রস্তাবে ক্ষেন্তি বিনা আপত্তিতে পিতার অনুগামী হয়েছে। কাজটা গর্হিত কিনা তা বিচার করার প্রয়োজনীয়তা তার কাছে ছিল একান্তই গৌণ। এভাবেই ক্ষেন্তি তার পিতার প্রতি সব ক্ষেত্রেই আনুগত্য প্রদর্শন করেছে।

মাতৃভীতু ক্ষেন্তি : বাবা সহায়হরির সাথে ক্ষেন্তির বেশ সখ্য থাকলেও মায়ের প্রতি ছিল তার ভীষণ ভয়। রায় কাকার বাড়ি থেকে পুঁইশাক কুড়িয়ে আনার পর মা রাগান্বিত হয়ে সেগুলো ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিলে ক্ষেন্তি ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এক বারের জন্যও 'না' শব্দটি উচ্চারণ করার সাহস পায়নি। অবশেষে খাওয়ার সময় পাতে পুঁই চচ্চড়ি দেখে খুশি হলেও ভয়ে সে মায়ের চোখের দিকে তাকাতে সাহস করেনি।

ভোজনপটু ক্ষেন্তি : গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি ছিল অধিকমাত্রায় ভোজনপটু মেয়ে। সে খেতে ভালোবাসত, বিশেষ করে পুঁইশাকের চচ্চড়ির প্রতি তার খুব লোভ ছিল। খাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো লাজলজ্জার বালাই ছিল না। পিতা সহায়হরি ও মা অন্নপূর্ণা তার এ ভোজনপটুতাকে সব সময়ই প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন। ক্ষেন্তি পুঁইশাক, পিঠা ও আমসত্ত্ব খেতে খুবই পছন্দ করতো। সে একসঙ্গে আঠারো-উনিশটা পিঠা খেতে পারতো। এভাবে খেতে তার একটুও লজ্জা বা সংকোচ অনুভব হতো না।

পুঁইভক্ত ক্ষেন্তি : 'পুঁই মাচা' গল্পের প্রধান চরিত্র ক্ষেন্তি পুঁইশাক খেতে খুব পছন্দ করতো। গত অরন্ধনের পূর্বদিন বাড়িতে পুঁইশাক রান্না হলে ক্ষেন্তি সংকোচ লজ্জার তোয়াক্কা না করে

মাকে বলেছিল, সে একাই অর্ধেক খাবে। তার এ পুঁইপ্রীতির কারণে একদিন সে বোনদের নিয়ে ওপাড়ার রায়দের ফেলে দেওয়া পাকা পুঁইশাকের ডাঁটার বোঝা কুড়িয়ে এনে মায়ের বকুনি খেয়েছিল। সেদিনই পুঁইশাক রান্না হলে সে অতি আগ্রহের সাথে তা খেয়েছিল। এরপর ক্ষেন্তি উঠানের এক কোণে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করে মাচা বেঁধে একটা শীর্ণকায় পুঁই চারা রোপণ করেছিল। তার মৃত্যুর পর এ পুঁই গাছটি তারই স্মৃতি পাতায় পাতায়, শিরায় শিরায় ধারণ করে বিস্তার লাভ করেছিল।

অপরিচ্ছন্ন ক্ষেন্তি : মা অন্নপূর্ণার দৃষ্টিতে ক্ষেন্তি ছিল অপরিচ্ছন্ন। পৌষ-সংক্রান্তিতে পিঠা বানানোর সময় অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য নিতে রাজি হননি। কারণ সে যেখানে-সেখানে বসে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, মাথার চুল এলোমেলো, তার কাপড়-চোপড় স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্ন নয়। অবশেষে ক্ষেন্তির আগ্রহ ও অনুরোধে অন্নপূর্ণা তার হাত-পা ধুইয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিয়ে তাকে নারকেল কোরাতে দিয়েছিলেন।

সত্যবাদী ক্ষেন্তি : ক্ষেন্তির চমৎকার একটা গুণ হলো, সে কখনো মিথ্যা কথা বলত না। সব সময় সত্য কথা বলত। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি। বরোজপোতার জঙ্গল থেকে চুরি করে আনা মেটে আলু সম্পর্কে পিতা সহায়হরি অন্নপূর্ণার কাছে মিথ্যা বলেছিলেন, কিন্তু সত্যবাদী ক্ষেন্তি মায়ের প্রশ্নের উত্তরে মিথ্যা বলতে পারেনি।

ক্ষেন্তির ভগ্নিপ্রীতি : ক্ষেন্তি তার বোনদের খুব ভালোবাসত। সে ছিল মূলত স্নেহময়ী একটা মেয়ে। ক্ষেন্তি কিছুটা উদাস-অসচেতন প্রকৃতির হলেও ছোট বোনদের প্রতি ছিল তার প্রবল স্নেহ-মমতা ও অকৃত্রিম ভালোবাসা। তাই সে ছোট বোন রাধী ও পুঁটিকে নিয়ে খেলা করেছে এবং পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে। বোনদের সাথে নিয়ে প্রতিবেশীর বাড়ি হতে পুঁইশাক চেয়ে এনেছে। নিজের বাড়িতে শাক-সবজির বাগান করেছে। সে কখনো বোনদের সাথে রাগারাগি করতো না।

সহজ-সরল ক্ষেন্তি : সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তি ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল স্বভাবের মেয়ে। বিশেষত খাওয়ার ব্যাপারে তার লজ্জা-শরমের বালাই ছিল না। ছোট বোনদের ময়দার গোলা খেতে দেখে ক্ষেন্তি অবোধ শিশুর মতো লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। অন্নপূর্ণা তা দেখে ক্ষেন্তির জন্য খানিকটা গোলা তুলে রেখেছিলেন। আবার নারকেল কোরানো শেষ হলে সে মাকে বলেছে, "মা, নারকেল কোরা একটু নেবো?" মা সম্মতি দেওয়ার সাথে সাথে ক্ষেন্তি এক থাবা নারকেল কোরা হাতে নিয়ে তৃপ্তি সহকারে খাওয়া শুরু করেছিল। সে প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে পাটিসাপটা পিঠা খেয়েছে। এমনি সহজ-সরল প্রকৃতির মেয়ে ছিল ক্ষেন্তি।

ধৈর্যশীলা ক্ষেন্তি : ক্ষেন্তি ছিল অসীম ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক। মায়ের গালমন্দ, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং সমাজপতিদের গঞ্জনা সে নীরবে সহ্য করেছিল। ক্ষেন্তিকে বিয়ে দেওয়ার সময়ও পিতামাতার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সে কোনো প্রতিবাদ করেনি।

সংসার উদাসীন ক্ষেন্তি : স্বভাব-চরিত্রে ক্ষেন্তি ছিল পিতার মতোই উদাসীন ও অসচেতন প্রকৃতির। সমাজ-সংসারের প্রতি তার কোনো খেয়াল ছিল না। তার বয়স যে কৈশোরের কোঠা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তার বিয়ে নিয়ে যে মা-বাবা এত চিন্তিত, সমাজে তাকে নিয়ে যে নানা ধরনের দুর্নাম রটতে পারে, সে ব্যাপারে তার কোনো অনুভূতিই ছিল না।

হতভাগিনী ক্ষেন্তি : জন্মই ছিল যেন ক্ষেন্তির আজন্ম পাপ। সে ছিল এক হতভাগিনী ব্রাহ্মণ কন্যা। প্রথম যখন তার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তখন আশীর্বাদ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বিয়ে ভেঙে

গিয়েছিল। এ কারণে পাড়ার মানুষ তাকে 'উচ্ছুগগু' করা মেয়ে বলে অভিহিত করতো। গরিব ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেওয়ায় পিতামাতা তাকে উপযুক্ত পাত্রে বিয়ে দিতে পারেনি। অনন্যোপায় হয়ে সহায়হরি চাটুয্যে চল্লিশোর্ধ্ব পাত্রের সাথে ক্ষেন্তির বিয়ে দিয়েছিলেন। পণের টাকা বাকি থাকার কারণে ক্ষেন্তিকে আর বাপের বাড়িতে আসতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে হতভাগিনী ক্ষেন্তি অযত্ন, অবহেলা ও বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

উপসংহার : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁই মাচা' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র ক্ষেন্তি। ক্ষেন্তির মাধ্যমে লেখক দারিদ্র্যের করালগ্রাসে নিঃশেষিত সহজ-সরল গ্রামীণ একটি মেয়ের স্নিগ্ধ শান্তরূপ চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তিনি ক্ষেন্তিকে উপলক্ষ করে কৌলীন্য প্রথাবিড়ম্বিত পরিবারব্যবস্থার দারুণ অসহায়তার চিত্রাঙ্কন করতে চেয়েছেন এ গল্পে।

▸▸ প্রশ্ন : ১২ ॥ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁই মাচা' গল্পে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা আলোচনা কর।

অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্প অবলম্বনে তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১২]

উত্তর|| উপস্থাপনা : 'পুঁই মাচা' গল্পে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও সমাজসচেতন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পটিতে সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজব্যবস্থার বাস্তব করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে নিম্নবিত্ত সহায়হরি ও তার পরিবারের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজের স্বরূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন সমাজব্যবস্থা : 'পুঁই মাচা' গল্পটিতে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চমৎকার চিত্র ফুটে উঠেছে। সহায়হরি চাটুয্যে, স্ত্রী অন্নপূর্ণা এবং চার মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। অভাব-অনটনের সংসার হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি ভালোভাবেই তাদের জীবন কাটছিল। বড় মেয়ের নাম ক্ষেন্তি, বয়স পনেরো। কিন্তু এ বয়সই ক্ষেন্তির জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। এ বয়সের মেয়ের বিয়ে না হলে ব্রাহ্মণের জাত যায়। তাই মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার জন্য সমাজপতিদের পক্ষ থেকে সহায়হরির ওপর আদেশ নেমে আসে। সমাজপতিদের কঠোর শাসনে সহায়হরি মণিগাঁয়ের শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে ঠিক করতে বাধ্য হন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়, তখন বিয়ে ভেঙে দেন; কিন্তু এটা সমাজপতিরা সহজে মেনে নেয়নি। সমাজের কর্তাব্যক্তিরা মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উপর্যুপরি চাপ দিচ্ছিল। এমনকি বিয়ে না দিলে তারা সহায়হরিকে একঘরে করার হুমকি দেয়। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে সহায়হরি তার আদরের মেয়ে ক্ষেন্তিকে চল্লিশোর্ধ্ব এক পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হন।

সামাজিক সম্পর্ক : তৎকালীন সমাজের সামাজিক বন্ধন অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর ছিল। বিশেষ করে সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা যে গ্রামে বসবাস করতো সে গ্রামে। ওপর শ্রেণির লোকেরা কিছুটা ঈর্ষাপরায়ণ হলেও সাধারণ মানুষ ছিল পরস্পরের ঘনিষ্ঠজন। সহায়হরি তাই তারক-খুড়োর কাছ থেকে রস আনার জন্য স্ত্রীর কাছে ঘটি চেয়েছিলেন। আবার ক্ষেন্তি খেদিদের বাড়িতে গেলে খুড়িমা তাকে পিঠা খেতে দিয়েছিল। এভাবে সেই সমাজের মানুষেরা পরস্পর খাবার-দাবার ও জিনিস-পত্র আদান-প্রদান করতো। একে অন্যকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতো।

সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা : 'পুঁই মাচা' গল্পে সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা দম্পতির সংসারের বর্ণনায় তৎকালীন সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ফুটে উঠেছে। সহায়হরির পূর্বপুরুষ পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে, কিন্তু আজ সে অবস্থা নেই। দারিদ্র্যের কষাঘাতে এখন সহায়হরির সংসার জর্জরিত। আর্থিক দুরবস্থার কারণে আদরের মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়ের যৌতুকের আড়াইশ টাকা বাকি থাকায় সহায়হরি মেয়েকে নাইয়র আনতে পারেনি। বিয়ের সময় সে যে গেল, আর এল না। মৃত্যু তাকে ডেকে নিয়ে যায়। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সহায়হরি অন্যের নিকট থেকে নির্লজ্জের ন্যায় এটা-সেটা চেয়ে আনত। দু'পয়সা বাকি ছিল বলে গয়া পিসি ক্ষেন্তিকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে পারেন না। খাওয়ার লোভে পিতা-কন্যা মিলে বরোজপোতার বন থেকে মেটে আলু চুরি করে। পৌষ-সংক্রান্তিতে অন্নপূর্ণা মেয়েদের পিঠার আবদারে সামান্য একটু করে গোলা হাতে দেয়। সহায়হরির পরিবারের এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজের আর্থিক দুরবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।

তৎকালীন সমাজে যৌতুক মহামারী : যৌতুকপ্রথার কষাঘাতে তৎকালীন সমাজ ছিল জর্জরিত। সহায়হরি মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়েতে যৌতুক দিতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। তবুও আড়াইশ টাকা বাকি থাকার কারণে মেয়ে ক্ষেন্তিকে বরণ করে নিতে হয়েছিল দুর্বিষহ জীবন। যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এক বছর সহায়হরি মেয়েকে দেখতে যেতে পারেননি। অতঃপর স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে মেয়েকে দেখতে গেলে শাশুড়ি অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। বেয়াইকে ছোটলোক বলে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দেন। সহায়হরির আদরের কন্যা ক্ষেন্তি অবশেষে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূর সম্পর্কের এক পিসির বাড়িতে। শাশুড়ি শয্যাশায়িনী ক্ষেন্তির শরীর থেকে গহনাপত্র খুলে রাখেন। কিন্তু ক্ষেন্তি বসন্ত রোগ থেকে মুক্তি না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

জঘন্য সমাজব্যবস্থা : আশীর্বাদ হওয়ার পর যৌক্তিক কারণে ক্ষেন্তির বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় সমাজপতিরা বাবা সহায়হরিকে একঘরে করার হুমকি দেয়। সমাজশক্তির একটি পাষাণরূপ দৃঢ় কাঠামো, একটা নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রণার অভিব্যক্তি এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং কতটা মনুষ্যত্ব বিবর্জিত ছিল এ সমাজ তার প্রমাণে পাওয়া যায়। বৃহত্তর মানবজীবন, মানুষের প্রেম-প্রীতি ও আবেদন এ সমাজে অর্থহীন। যে সামাজিক রোগ ক্ষেন্তিকে গ্রাস করেছে তার উৎস সমাজের গভীর শেকড়ে প্রোথিত ছিল।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ : 'পুঁই মাচা' গল্পের মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দু সমাজের নানা কুসংস্কার ফুটে উঠেছে। ছুঁলেই জাত যাবে, অপবিত্র হবে– এরকম একটা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজে। এছাড়া বর্ণভেদপ্রথা মেনে চলা হতো রীতিমতো। যৌক্তিক কারণে আশীর্বাদ করা মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেলেও তাকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'উচ্ছুগ্‌গু' করা মেয়ে বলে। পৌষ-সংক্রান্তির সময় প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কুসংস্কারের আসল রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উপসংহার : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এটা বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি, প্রথানির্ভর, অন্ধ ধর্মভিত্তিক ও স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজের নির্মম অনুশাসনে পিষ্ট একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের করুণ আর্থিক দুর্গতি থেকে সে সমাজের বাস্তব অবস্থা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

▸▸ প্রশ্ন : ১৩ ॥ অসহায় দরিদ্র পিতা হিসেবে সহায়হরির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
অথবা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্প অবলম্বনে সহায়হরির চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
অথবা, অসহায় দরিদ্র পিতা হিসেবে 'পুঁই মাচা' গল্পে বর্ণিত সহায়হরির চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর|| উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পুঁই মাচা' বহুলপঠিত একটি সার্থক ছোটগল্প। এ গল্পের দরিদ্র পিতা ব্রাহ্মণ সহায়হরি চাটুয্যে চরিত্রটি লেখকের অনন্য সৃষ্টি। গ্রামবাংলার সহজ-সরল, আত্মভোলা, উদাসীন প্রকৃতির স্নেহপ্রবণ পিতার এক বাস্তব প্রতিমূর্তি দরিদ্র পিতা সহায়হরি চাটুয্যে। নিচে সহায়হরির চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

স্নেহপ্রবণ সহায়হরি : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পটির পিতৃচরিত্র সহায়হরি গ্রাম্যসমাজের একজন স্নেহপ্রবণ দরিদ্র পিতা। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সত্ত্বেও সে উদার ও স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয়ের অধিকারী। স্ত্রী অন্নপূর্ণার প্রতিও রয়েছে তার সহমর্মিতা।

সহায়হরির পিতৃহৃদয় : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পে এক হতভাগ্য পিতার পিতৃহৃদয়ের মর্মান্তিক রক্তক্ষরণ ঘটেছে। সহায়হরি চাটুয্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সমাজ-সংসার সম্পর্কে উদাসীন হলেও তিনি সন্তানদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত মমত্ববোধসম্পন্ন। তিনি মানুষের নিকট থেকে চেয়ে, ধার করে কিংবা প্রয়োজনে ছোটখাট চুরি করেও সন্তানদের মুখে খাবার তুলে দিতে দ্বিধা করেননি। বড় মেয়ে ক্ষেন্তির প্রতি তার ছিল গভীর ভালোবাসা। অভাবের কারণে আদুরে কন্যা ক্ষেন্তিকে চল্লিশোর্ধ্ব পাত্রের কাছে বিয়ে দিতে বাধ্য হওয়ায় তার কোমল হৃদয় ব্যথায় ভেঙে পড়েছিল।

সন্তান-বৎসল সহায়হরি : সহায়হরি চাটুয্যের কোনো পুত্র নেই; চার কন্যার জনক তিনি। কন্যাদের তিনি পুত্রবৎ ভালোবাসেন। তাকে দেখা যায়, কন্যাদের জন্য তারক খুড়োর কাছ থেকে রস চেয়ে আনতে। বড় মেয়ে ক্ষেন্তিকে নিয়ে তিনি বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলু খুঁড়ে আনতে যান। আবার তিন বোন মিলে যখন ও-পাড়ার রায়দের পুঁইশাকের বোঝা কুড়িয়ে আনে এবং স্ত্রী যখন এ কারণে মেয়েদের ভর্ৎসনা করে, তখন সহায়হরি বলে ওঠেন, "তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে বলে ...... তুমি আবার ...... বরং ......।" দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারে মেয়ের জন্য পাত্র জোগাড় করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অনেক চেষ্টা তদবিরের পর সহায়হরি শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সঙ্গে বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। পাত্রের চরিত্রহীনতার কথা জানতে পেরে মেয়ের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা চিন্তা করে ক্ষেন্তির বিয়ের আশীর্বাদ হওয়া সত্ত্বেও সহায়হরি সে বিয়ে ভেঙে দিয়ে মেয়েকে রক্ষা করেছিলেন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সহায়হরির সন্তান-বাৎসল্যের কাছে হার মেনেছিল।

সহায়হরির ঔদাসীন্য : বিভূতিভূষণের 'পুঁই মাচা' গল্পের সহায়হরি একজন অসচেতন পিতা, উদাসীন মানুষ। সংসারের কোনো দায়দায়িত্ব তিনি পালন করতেন না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গল্প-গুজব করে আর মাছ শিকার করে সময় কাটান তিনি। সংসারের কোথায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, কিংবা কীভাবে সংসার চলছে, এ ব্যাপারে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স পনেরো ছাড়িয়ে যাচ্ছে, একবার আশীর্বাদ হয়ে বিয়ে ভেঙে গেছে; এতে আশেপাশে নানা গুজব রটে, তবু সহায়হরির টনক নড়ে না। এমনকি সমাজের কর্তাব্যক্তিরা একবার তাকে ডেকে নিয়ে একঘরে করার হুমকি দিলেও তার উদাসীনতার ঘোর কাটেনি।

সমাজ অসচেতন সহায়হরি : 'পুঁই মাচা' গল্পের সহায়হরি খুবই সমাজ অসচেতন ব্যক্তি। সমাজ-সংসারের প্রতি তার এক প্রকার অবজ্ঞা ও অনীহা লক্ষ করা যায়। সামাজিক কোনো মূল্যবোধ তার ভেতর প্রভাব ফেলেনি। তিনি তারক খুড়োর কাছ থেকে খেজুর রস চেয়ে আনতে লজ্জা পান না। সমাজের কৌলীন্য প্রথানির্ভর কুসংস্কার তার কোনো কোনো কাজের জন্য অবজ্ঞায় সোচ্চার। সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তির আশীর্বাদ হওয়ার পর বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় সমাজপতিরা তার পরিবারকে একঘরে করে রাখার হুমকি দিলেও তিনি এ ব্যাপারে কর্ণপাত করেননি।

ধৈর্যশীল সহায়হরি : সহায়হরি চাটুয্যে এক ব্রাহ্মণ পরিবারের অসহায় কর্তা। তার চার মেয়ে। মেয়েদের ঠিকমতো ভরণপোষণ করার ক্ষমতা সহায়হরির নেই। মানুষের কাছ থেকে এটা-সেটা চেয়ে এনে তিনি মেয়েদের খাওয়াতে চান, কিন্তু স্ত্রী অন্নপূর্ণা এটা একেবারেই পছন্দ করেন না। স্বামীর এ বেলেল্লাপনাকে তিনি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন, কিন্তু সহায়হরি স্ত্রী অন্নপূর্ণার তিরস্কারের কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবে সহ্য করতেন। তিনি অন্নপূর্ণাকে কখনো মন্দ কথা বলেননি। চরম ধৈর্যের সাথে তিনি স্ত্রী অন্নপূর্ণার সকল ভর্ৎসনা ও তিরস্কার অবোধ শিশুর ন্যায় মেনে নিয়েছেন।

উপসংহার : লেখক তাঁর শিল্পীহৃদয়ের অনুভূতির প্রাবল্যে ব্রাহ্মণ সহায়হরি চাটুয্যের চরিত্রালেখ্য নির্মাণ করেছেন। দারিদ্র্য তাকে মিথ্যাচারী করলেও কপট করেনি। স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সহায়হরি নিজেকে সন্তানের আদর্শ পিতা হিসেবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

হুযুর কেবলা

আবুল মনসুর আহমদ [১৮৯৮-১৯৭৮ খ্রি.]

›› প্রশ্ন : ১৪ ॥ আবুল মনসুর আহমদ রচিত 'হুযুর কেবলা' গল্পের মূল বক্তব্য/ মূলভাব আলোচনা কর।

অথবা, 'হুযুর কেবলা' গল্পের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' একটি সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প। তাঁর রচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থে তিনি আমাদের বাঙালি সমাজের ভণ্ডামি ও অন্ধ বিশ্বাসের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। 'হুযুর কেবলা' এ গ্রন্থেরই একটি অন্যতম গল্প। এ গল্পে লেখক ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির চিত্র পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত কারো কারো পীরালির অন্তরালে যে কদর্য ভণ্ডামি ও স্বার্থলোলুপতা লুকিয়ে থাকে, গল্পকার তা পাঠকের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভণ্ড পীরের ভণ্ডামির ছবি অঙ্কন করে সমাজ থেকে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাই মূলত গল্পকারের প্রয়াস।

'হুযুর কেবলা' গল্পের পটভূমি : কথিত পীরপ্রথার পটভূমিতে 'হুযুর কেবলা' গল্পটি রচিত হয়েছে। এমদাদ নামক এক নাস্তিকমনা যুবক নাস্তিক্য পরিত্যাগ করে আস্তিক হতে গিয়ে এক ভণ্ড পীরের মুরিদ হয়। এক সুফী সাহেব তাকে 'পীরের মুরিদ হওয়া ছাড়া ইবাদতে ফল পাবে না' বলে পীরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এমদাদ সরল বিশ্বাসে পীর সাহেবের পদতলে নিজেকে সমর্পণ করে। পীরের বক্তব্য ও কেরামতির কথা শুনে সে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এমদাদ ভক্তিরসে বিগলিত না হয়ে যদি প্রথম থেকেই যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী তীক্ষ্মমন দিয়ে হুযুরের কথাবার্তা ও কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করে দেখত, তবে এ ভণ্ডামিপূর্ণ পীরপ্রথার নগ্নরূপ তার চোখের সামনে শুরুতেই প্রকাশ পেত।

হুযুর কেবলার পরিচয় : 'হুযুর কেবলা' গল্পের কেন্দ্রীয় বা প্রধান চরিত্র হলো হুযুর কেবলা। কিন্তু গল্পের কোথাও তার নামধাম বা বিস্তারিত পরিচয় গল্পকার ব্যক্ত করেননি। শুধু বলা হয়েছে, তিনি একজন বড় মাপের কামেল পীর। বয়সে প্রবীণ। তার মুখে মেহেদিরঞ্জিত দাড়ি। তার মুরিদের সংখ্যা অনেক। একটি একতলা বড় বাড়িতে বসবাস করেন। তার অন্দরমহলে কয়েকটি পাকা ঘর। যে বৈঠকখানায় বসে তিনি মুরিদদের উদ্দেশে ওয়াজ নসিহত করেন সেটিও আটচালা ঘর। সেখানে মুরিদরা দলে দলে গিয়ে পীর সাহেবের মহব্বত আদায়ের চেষ্টা করেন। পীর সাহেব সহজ-সরল মুরিদদের সামনে অনবরত কুরআন-হাদিস আওড়ান এবং নানা ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা বলে তাদেরকে মুগ্ধ করার চেষ্টা করেন।

হুযুরের ছলনা/প্রতারণা : এমদাদ পীর সাহেবের দরবারে আসার পর তাকে বিস্মিত করার জন্য পীর সাহেব সুফী সাহেবকে কয়েকটি অনুমাননির্ভর কথা বলেন। তিনি সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, সুফী সাহেব যাকে হেদায়াত করার জন্য তার কাছে নিয়ে এসেছেন, তা তিনি ঐশীশক্তি দ্বারা পূর্বেই জানতে পেরেছেন। অল্প কিছু সময়ে সাত হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে বলে তিনি যুক্তি দেখান। যেমন– চোখ বুজে পীর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কত বৎসর এইখানে বসিয়া আছি?' কেউ একজন বলল, কয়েকঘণ্টা মাত্র। পীর সাহেব বললেন, এখানে বসার পর তার রুহ সাত হাজার বছর ঘুরে এসেছে। তার পর্যায়ে যখন মুরিদরা পৌছাবে তখন তারা সবই বুঝতে পারবে। মুরিদরা পীর সাহেবের এসব প্রতারণা ধরতে পারেনি।

এমদাদের পীরভক্তি : এমদাদ প্রথম প্রথম পীর সাহেবের ছলনা কিছুই ধরতে পারেনি। না পেরে অন্ধের মতো তাকে ভক্তি করতে শুরু করে। সে প্রথম লতিফা যিকরে-জলি শুরু করে। দিন-রাত পীরের নির্দেশ মতো চোখ বুজে 'এলহু' 'এলহু' যিকর করতে থাকে। অনাহার ও অনিদ্রায় তার চোখ দুটি কোটরের মধ্যে প্রবেশ করে। তার শরীর দুর্বল ও মন অস্থির হয়ে ওঠে। তথাপি এমদাদ পীর সাহেবের প্রতি ভক্তিকে অটল রাখার জন্য সাধ্যাতীত চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে।

পীরের ভোজনপটুতা : বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য এমদাদ যখন অস্থির হয়ে পড়ে, তখন দূরবর্তী এক স্থান থেকে মুরিদদের কাছ থেকে পীর সাহেবের দাওয়াত আসে। হুযুর প্রচুর খাদ্যসামগ্রী নিয়ে বিশাল বজরায় চড়ে মুরিদানের উদ্দেশে রওয়ানা হন। মুরিদালয়ে পৌছানোর পর হুযুরকে রাজকীয় অভ্যর্থনা দেওয়া হলো। বিভিন্ন বাড়িতে বিরাট বিরাট ভোজ চলতে লাগল। ভালো ভালো খেয়ে এমদাদের চেহারায় পূর্বের চেকনাই ফিরে এল। এর পূর্বে হুযুরের ভোজনশক্তি দেখার সৌভাগ্য হয়নি এমদাদের। এবার সে ভাগ্য লাভ করে এমদাদ বুঝতে পারল, পীর সাহেবের রুহানী শক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন, তার হজম শক্তি তার চেয়ে অনেক বেশি।

হুযুরের নারী-আসক্তি : পীর সাহেবের আস্তানায় সন্ধ্যাবেলায় পুরুষদের মজলিস বসত। রাতে এশার নামাজের পর অন্দরমহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হতো। হুযুরের নারী-আসক্তি ছিল প্রবল। তাই নারীদের মজলিসে ওয়াজ করার প্রতি তিনি অধিক আগ্রহী ছিলেন। বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের প্রতি পীর সাহেবের আলাদা নজর ছিল। মেয়েদের মজলিসে ওয়াজ করার সময় হুযুর ঘন ঘন কলিমনের দিকে তাকাতেন। এছাড়া ওয়াজ করার সময় পীর সাহেবের দেহে প্রায়ই জযবা আসত। তখন মুরিদগণ কালো মখমল দিয়ে পীর সাহেবের চোখ-মুখ ঢেকে দিত এবং মেয়েরা পীরের হাত-পা টিপে দিত। প্রকৃত অর্থে এসবই ছিল নারীসঙ্গলিপ্সু পীর সাহেবের ভণ্ডামি।

পীর সাহেবের ভণ্ডামি : পীর সাহেবের কুনজরে পড়েছিল রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমন। তাই তিনি তাকে বিয়ে করার জন্য তার প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীনের সাথে গোপনে কুপরামর্শ করেন। সে কুপরামর্শ অনুযায়ী সুফী সাহেবের মাধ্যমে একদিন মোরাকাবায় বসে রাসুল (স)-এর নাম ভাঙিয়ে পীর সাহেবের প্রতি কলিমনকে বিয়ে করার নাটকীয় আদেশ দেওয়া হয়। রজব ও কলিমন শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের ভণ্ডামির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এমদাদ পীর সাহেবের কুমতলব বুঝতে পারে এতদিনে। সে এই ভণ্ড পীরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার কৌশল খুঁজতে থাকে।

পীরের মুখোশ উন্মোচন : সমাজের মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ধর্ম-ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে থাকে। এরা কুরআন, হাদিস ও আল্লাহর রাসুলের দোহাই দিয়ে মানুষকে ঠকায় এবং নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে। পীরপ্রথার নামে ভণ্ডামি যদিও ইসলাম স্বীকার করে না, তথাপি এক শ্রেণির মানুষ ধর্মের নামে ভণ্ডামি করে অশিক্ষিত, সহজ-সরল, ধর্মভীরু মানুষদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব এদেরই একজন। গল্পকার আবুল মনসুর আহমদ এ ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন আলোচ্য গল্পে।

উপসংহার : দুনিয়াতে ধর্মের নামে ভণ্ডামি করার মতো জঘন্য গর্হিত কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। পীরপ্রথা ধর্ম-ব্যবসায়ীদের একটি ধারালো অস্ত্র। এর সাহায্যে তথাকথিত পীরেরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে অসহায় মানুষকে ঠকায়। সরল ধর্মপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ এদের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে সর্বস্ব হারায়। তাই এসব ভণ্ড পীরদের সমাজ থেকে উৎখাত করতে এমদাদের মতো প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রয়োজন।

⏩ প্রশ্ন : ১৫ ॥ ছোটগল্প কাকে বলে? ছোটগল্প হিসেবে 'হুযুর কেবলা' গল্পের সার্থকতা প্রতিপন্ন কর।

অথবা, ছোটগল্পের সংজ্ঞা দাও। আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্পের শিল্পমূল্য বিচার কর।

অথবা, ছোটগল্প বলতে কী বোঝ? ছোটগল্প হিসেবে আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পটির সার্থকতা মূল্যায়ন কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'হুযুর কেবলা' নামক সমাজ সংস্কারমূলক ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের অনন্য সৃষ্টি। তিনি তাঁর 'আয়না' গল্পগ্রন্থে আমাদের বাঙালি সমাজের ভণ্ডামি ও অন্ধ বিশ্বাসের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। 'হুযুর কেবলা' এ গ্রন্থের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এ গল্পে লেখক ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির চিত্র পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরালির অন্তরালে যে কদর্য ভণ্ডামি ও স্বার্থলোলুপতা লুকিয়ে থাকে, গল্পকার তা পাঠক সম্মুখে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকারের চমৎকার উপস্থাপন গল্পটিকে সার্থক ও শিল্পসুন্দর একটি ছোটগল্পে স্থান করে দিয়েছে।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা : ছোটগল্প শব্দটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়, একটি 'ছোট' অপরটি 'গল্প'। গল্প সম্পর্কে তেমন কোনো মতভেদ না থাকলেও ছোটগল্প নিয়ে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যিকদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো−

ক. ছোটগল্পের সংজ্ঞায় H. G. Wells বলেন, "ছোটগল্প ১০ হতে ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত।"

খ. E. A. Poe বলেন, "ছোটগল্প তাকেই বলে, যে গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়।"

গ. প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক W. H. Hudson বলেন– A short story must contain only one theme informing idea and that idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of mind.

ঘ. প্রমথ চৌধুরীর মতে, "আকৃতিতে ছোট হলেই ছোটগল্প হবে না। তাকে ছোট হতে হবে এবং সর্বোপরি গল্প হতে হবে।"

ঙ. Rudyard Kipling -এর মতে, "ছোটগল্প হচ্ছে চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো। এক সুনির্দিষ্ট বস্তুর ওপর তার আলো কেন্দ্রীভূত থাকবে। অনাবশ্যক প্রাপ্তির বিষয়কে তা কিছুতেই ভারাক্রান্ত করে তুলবে না।"

ছোটগল্পের স্বরূপ : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত **'বর্ষা যাপন'** কবিতায় ছোটগল্পের স্বরূপ, প্রকৃতি ও সংজ্ঞা সম্পর্কে বলেছেন–

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তার দু'চারটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়েও হইল না শেষ।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য, স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এ কবিতাংশে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাংলা ছোটগল্প এ নির্দেশনা মেনে চলেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

ছোটগল্প হিসেবে 'হুযুর কেবলা' : ছোটগল্পের আলোচ্য সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' একটি আদর্শ ও সার্থক ছোটগল্প। আপাতদৃষ্টিতে এর আকার একটু বড় মনে হলেও বিষয়বস্তুর বিচারে তা তত বড় নয়। গল্পে একটি নির্দিষ্ট বিষয়– পীরপ্রথার মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে যেটুকু অবয়ব প্রয়োজন, গল্পকার তার বাইরে যাননি; বরং প্রয়োজনীয় কাহিনি ও চরিত্রের সমন্বয় ঘটিয়েছেন সার্থকভাবে।

আলোচ্য গল্পের কাহিনি : 'হুযুর কেবলা' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ যে কাহিনি নির্মাণ করেছেন, তার প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য তাকে কিছুটা আড়ম্বরতার আশ্রয় নিতে হয়েছে; কিন্তু তা সীমা ছাড়িয়ে যায়নি। কাহিনিটি সুসংগঠিত। গল্পকার সমাজের একটি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর ক্ষুরধার লেখনি ও তীক্ষ্ণ সমাজদর্শন ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করেছে সার্থকভাবে।

'হুযুর কেবলা' গল্পের চরিত্র : 'হুযুর কেবলা' গল্পের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে গল্পকার মিতব্যয়িতার পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্পে দুটি প্রধান চরিত্রকে আশ্রয় করে কাহিনি নির্মাণ করা হয়েছে। এর একটি এমদাদ ও অন্যটি পীর সাহেব। বাকি চরিত্র সুফী সাদুল্লাহ এবং প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন। মুরিদরা একেবারেই গৌণ। কলিমন ও রজব রয়েছে সম্পূর্ণ নেপথ্যে। দুটি প্রধান চরিত্রকে আশ্রয় করে একটি মজবুত কাহিনি নির্মিত হয়েছে সুকৌশলে। তাদেরকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে গল্পের মূল উপজীব্য।

গল্পের শিল্পমূল্য : সমাজের অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে 'হুযুর কেবলা' একটি ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প। এ গল্পে সহজ-সরল ধর্মভীরু মানুষের অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার ও

ভণ্ডামিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ সাহিত্যের খুব একটা উন্নতি হয়নি। তার কারণ, ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন। এ প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল আবুল মনসুর আহমদের মধ্যে। কাজী নজরুল ইসলাম এ সম্পর্কে বলেছেন, "আবুল মনসুরের ব্যঙ্গের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে যখন হাসায় তখন সে ব্যঙ্গ, কিন্তু যখন কামড়ায় তখন সে হয় সাপ। আর সে কামড় গিয়ে যার গায়ে বাজে, তার মুখের ভাব হয় সাপের মুখের ব্যাঙের মতোই।" আবুল মনসুর আহমদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পেছনে অশ্রু আছে। রজব ও কলিমনের অশ্রু তার প্রমাণ। আর এমদাদের হাতে প্রহৃত পীরকে মনে হয় সাপের মুখের ব্যাঙ। সুতরাং 'হুযুর কেবলা' একটি সার্থক ব্যঙ্গাত্মক গল্প। এর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অন্তরালে লুক্কায়িত গভীর বেদনা গল্পটিকে সুন্দর ও অনন্য করে তুলেছে।

ছোটগল্প হিসেবে 'হুযুর কেবলা'র সার্থকতা : 'হুযুর কেবলা' গল্পের কাহিনি ব্যঙ্গাত্মক এবং সুসংগঠিত। কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদ আলোচ্য গল্পে পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্পে চরিত্রের আধিক্য ও ঘটনার ঘনঘটা নেই। প্রয়োজনীয় দুটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গল্পটি পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। গল্পটির পরিবেশকল্পনাও বেশ মজবুত। পড়া শেষ হলে পাঠকচিত্ত বেদনাকাতর হয়ে ওঠে। ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীদের ধরাশায়ী করে গল্পকার সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এ গল্পে। এ শাস্তি পাঠকের প্রত্যাশিত হলেও ভণ্ড পীরের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি না হওয়ায় গল্পের শেষে পাঠকের মনে অতৃপ্তি থেকে যায়– যা ছোটগল্পেরই বৈশিষ্ট্য।

উপসংহার : 'হুযুর কেবলা' বাংলা সাহিত্যের একটি সার্থক ছোটগল্প। এর শিল্পমূল্য সাহিত্য সমালোচকদের দ্বারা স্বীকৃত। রসবিচারেও 'হুযুর কেবলা' কথিত পীরপ্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের সরল ধর্ম-বিশ্বাসকে পুঁজি করে যারা স্বার্থ হাসিল করে এবং মানুষকে ঠকায়, তাদের মুখোশ উন্মোচন করাই এ গল্পের মূল উপজীব্য। সুতরাং বলা যায়, 'হুযুর কেবলা' একটি সার্থক ছোটগল্প।

▸▸ প্রশ্ন : ১৬ ॥ আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্প অবলম্বনে পীর সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'হুযুর কেবলা' গল্প অবলম্বনে পীর সাহেবের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১২]
অথবা, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে হুযুর কেবলার চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : 'হুযুর কেবলা' গল্পে স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। এ গল্পে বাঙালি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীর্ঘদিনের যে অন্ধত্ব, কুসংস্কার, অন্ধভক্তি, ভণ্ডামি ও বঞ্চনা লুকিয়ে আছে, লেখক কঠোর ভাষায় তার সমালোচনা করে প্রতিবাদের ভূমিকা পালন করেছেন। গল্পের মূল চরিত্র এক ভণ্ড পীর ও প্রতিবাদী যুবককে আশ্রয় করে লেখক এ গল্পটি রচনা করেছেন। এর কাহিনিতে পীর সাহেবের ভণ্ডামির জ্বলন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে।

পীর সাহেবের/হুযুর কেবলার পরিচয় : এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হুযুর কেবলা, কিন্তু গল্পের কোথাও গল্পকার তার নাম বা বিস্তারিত পরিচয় ব্যক্ত করেননি। শুধু বলা হয়েছে, সে একজন বড় মাপের কামেল পীর। বয়সে প্রবীণ। তার মুখে মেহেদিরঞ্জিত দাড়ি। তার মুরিদের সংখ্যা অনেক। একটি একতলা বড় বাড়িতে হুযুর কেবলা বসবাস করেন।

তার অন্দরমহলে কয়েকটি পাকা ঘর। যে বৈঠকখানায় বসে তিনি মুরিদদের উদ্দেশে ওয়াজ নসিহত করেন সেটিও আটচালা ঘর। সেখানে মুরিদরা দলে দলে গিয়ে পীর সাহেবের মহব্বত আদায়ের চেষ্টা করেন। পীর সাহেব সহজ-সরল মুরিদদের সামনে অনবরত কুরআন-হাদিস আওড়ান এবং নানা ধরনের উদ্ভট কথাবার্তা বলে তাদের মুগ্ধ করার চেষ্টা করেন।

প্রতারক : 'হুযুর কেবলা' গল্পে পীর সাহেব একজন প্রতারক ও ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি যে-কোনো ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হতেন না। তার কয়েকজন বিশ্বস্ত মুরিদ ছিল, যারা তার সকল কুকর্মের দোসর। পীর সাহেব প্রতারণামূলক কেরামতি প্রদর্শন করে গ্রামবাংলার অজ্ঞ মূর্খ মুরিদদের অবাক করে তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা আদায়ের চেষ্টা করেন। এমদাদের আগমন সম্পর্কে সুফী সাহেবের কাছ থেকে পূর্বে অবহিত হয়ে পীর সাহেব মজলিসে উপস্থিত মুরিদদের সামনে প্রকাশ করলেন যে, আধ্যাত্মিক শক্তি বলেই তিনি এমদাদ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এটা ছিল তার প্রতারণার একটা নমুনা।

ধর্ম-ব্যবসায়ী : পীর সাহেব ছিলেন চূড়ান্ত ধর্ম-ব্যবসায়ী। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে আশ্রয় করে ব্যবসায় করা। তাই সুযোগ বুঝে তিনি মানুষকে ঠকাতেন, সর্বনাশ করতেন, এমনকি সর্বস্বান্ত করতেও দ্বিধা করতেন না। সাধারণ মানুষের ধর্মানুরাগের সুযোগ নিয়ে তিনি তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করে তার ধর্ম ব্যবসায় চালিয়ে গেছেন। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষেরা সাধারণত পীর সাহেবের মাধ্যমে তাদের আত্মার মুক্তি কামনা করে, পরকালের শান্তি আকাঙ্ক্ষা করে। সাধারণ মানুষের এ ধর্মভয়কে পুঁজি করে তিনি তার ব্যবসার প্রসার ঘটান। তার ধর্ম-ব্যবসার নমুনা হলো তার পাকা বাড়িঘর বৈঠকখানা ইত্যাদির প্রাচুর্য।

ভোজনবিলাসী : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব ছিলেন আরামপ্রিয় ও ভোজনবিলাসী। ঘি, সরু চাল, মুরগি, খাসি ইত্যাদি ছিল তার নিত্যদিনের খাওয়ার তালিকা। আর অম্বুরি তামাক না হলে তো তার দিনই কাটত না। ভক্তরা সব সময় তার খেদমতে রত থাকত। হাত-পা টিপে দিত। সফরে বের হওয়ার সময় তিনি সৌখিন বজরা করে নদীপথে বের হতেন। প্রকাণ্ড বজরায় এক মণ ঘি, আড়াই মণ তেল, দশ মণ সরু চাল, তিনশ মুরগি, সাত সের অম্বুরি তামাক এবং তেরো জন শাগরেদ নিয়ে পীর সাহেব মুরিদানের বাড়িতে রওয়ানা হতেন। হুযুর কেবলার এ শান-শওকত দেখে সহজেই তার বিলাসী জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়।

কেরামতি দেখানো : সাধারণত গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষেরা কেরামতিতে বিশ্বাসী। তাই পীর সাহেব মুরিদদের উদ্দেশে কেরামতি প্রদর্শন করতেন। তিনি সুফী সাহেবের সাথে এমদাদকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখেও এমন একটা ভাব করেছেন যেন ঐশীশক্তি মারফত তাদের আগমনের কথা জানতে পেরেছেন। তিনি সুফীকে বলেছেন, সে কারো তদবিরে এসেছে। চোখ বুজে ধ্যানের ভান করে তিনি ঘোষণা করলেন, "সে এ ঘরেই হাজির আছে দেখিতেছি।" এসব কুদরতি ও কেরামতি দেখে এমদাদ বিস্মিত হয়। তার মনে হলো পীর সাহেবের মুখ থেকে এক প্রকার জ্যোতি বের হচ্ছে।

রিয়াকারী : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব ছিলেন অতি প্রদর্শনেচ্ছুক ব্যক্তি। ওয়াজ করার সময় পীর সাহেবের দেহে প্রায়ই জযবা আসত। এ জযবাকে মুরিদরা ফানা ফিল্লাহ বলত। ফানা ফিল্লাহর সময় পীর সাহেব 'জ্বলে গেলাম' 'পুড়ে গেলাম' বলে চিৎ হয়ে শুয়ে চিৎকার করতেন। এ সময় পীর সাহেবের রূহ নাকি আলমে খালক থেকে আলমে আমরে

পৌঁছে যেত। সেখানকার নূরের জালওয়া পীর সাহেবের চোখে সহ্য হতো না বলে তিনি এরূপ চিৎকার করতেন। তাই জযবার সময় একখণ্ড কালো মখমল দিয়ে তার চোখ-মুখ ঢেকে দিয়ে হাত-পা টিপে দেওয়ার অসিয়ত ছিল। এসবই ছিল পীর সাহেবের রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা।

পীর সাহেবের নারী-আসক্তি : নারীলোভী ভণ্ড শয়তান ছিল পীর সাহেব হুযুর কেবলা। মহিলা মুরিদদের প্রতি তার ছিল মাত্রাতিরিক্ত নেক নজর। মেয়েদের সামনে ওয়াজ করার জন্য তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। তাই পুরুষদের মজলিসের চেয়ে তিনি মহিলাদের মজলিসে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র থাকতেন এবং বেশি সময় কাটাতেন। তার এক মুরিদের পুত্রবধূ (রজবের স্ত্রী) কলিমন ছিল অপূর্ব সুন্দরী। পীর সাহেব কলিমনকে বিয়ে করার জন্য এক কূট পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি নাটকীয় কৌশলে মোরাকাবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সেখান থেকে তার জন্য কলিমনকে হালাল করে নেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মহানবির আত্মার সাথে তামাশা করতেও দ্বিধা করেননি। বিবেক, বুদ্ধি, মানবতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পীর সাহেব তার নারী-আসক্তিকে চরিতার্থ করেছেন। কলিমনের আর্তনাদ, রজবের বুকফাটা কান্না কোনোকিছুকেই তিনি পরোয়া করেননি। নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে তিনি ধর্ম, রাসুল, কিতাব প্রভৃতিকে ব্যবহার করেছেন। তার এ নারী-আসক্তি তাকে বিবেকবর্জিত অমানুষে পরিণত করেছিল।

চতুর ও ধূর্ত : অতি চতুর ও ধূর্ত লোক ছিলেন পীর সাহেব। রজবের স্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করার জন্য তিনি চাতুর্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার দুই খলিফার সাথে গোপনে কুপরামর্শ করে পীর সাহেব যে মোরাকাবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন শিক্ষিত সচেতন এমদাদ ছাড়া অন্য কেউ তা বুঝতে পারেনি। স্বীয় কামলোলুপতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তার এ সর্বোচ্চ চাতুর্য জয়যুক্ত হয়েছিল। পীর সাহেব কলিমনকে বিয়ে করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবেই তিনি তার কামনা বাসনা পূর্ণ করতেন শঠতা ও ধূর্ততার সাথে।

মিথ্যুক ও হঠকারী পীর : পীর সাহেব ছিলেন চরম মিথ্যুক ও হঠকারী। মিথ্যা আর হঠকারিতার আশ্রয় নিয়েই হুযুর কেবলা অজ্ঞ মুরিদদের ধর্মভীতিতে মাতাল করে তুলতেন। সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টার অতি নিকটবর্তী হয়েছেন বলে তিনি দাবি করতেন। তাই তিনি বলেছেন, এলমে লাদুন্নি হাসিল করার পূর্বেই তিনি একবার লওহে মাহফুযে উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত সায়েরে নাযাবীর ফয়েয হাসিল না হওয়ায় আরশে মুয়াল্লার পর্দা তার চোখের সামনে থেকে উঠে যেতেই তিনি নূরে ইযদানী দেখে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর মুরিদদের সামনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর তিনি জানালেন, তার রূহ তামাম দুনিয়া ঘুরে সাত হাজার বছর কাটিয়ে আবার তার দেহে এসে প্রবেশ করেছে। এ সময়ে কত বাদশার ওফাত হয়েছে, কত সালতানাত মিসমার হয়েছে, কত লড়াই হয়েছে, এটা তার পরিষ্কার মনে আছে। অধিক শুনলে মুরিদদের কলব ফেটে যাবে বলে উল্লেখ করে তিনি বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করেন। তার এসব উক্তি ছিল বড় ধরনের মিথ্যাচার, যা অশিক্ষিত মুরিদরা বুঝতে অক্ষম হয়।

লম্পট পীর সাহেব : পীর সাহেব কেবলা ছিলেন লম্পট চরিত্রহীন একটা মানুষ। নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি দুটি তরুণ প্রাণকে দুঃখময় জীবনে ঠেলে দেন, রজবকে ঘরছাড়া করেন, কলিমনকে বিয়ে করেন। বৃদ্ধ বয়সেও প্রবল নারী-আসক্তির কারণে রাসুল-এর আত্মার দোহাই দিয়ে তিনি এমন অমানবিক ঘটনা ঘটালেন। তার মতো ভণ্ডের কামলোলুপতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রহৃত হয় এমদাদ।

উপসংহার : 'হুযুর কেবলা' গল্পে পীর সাহেব একজন নারীলোভী ভণ্ড প্রতারক মানুষ। ধর্ম-ব্যবসায়ী এ ভণ্ড পীর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভণ্ড খলিফার অভিনয়কে রাসুল-এর আত্মা বলে প্রচার করেছেন। মানুষের সরলতা, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি অর্থোপার্জন ও কামলালসা চরিতার্থ করেছেন। এরা আমাদের সমাজের মানুষরূপী শয়তান। বেশিরভাগ মানুষেরই ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এ ধরনের প্রবণতা বর্তমান সমাজেও অব্যাহত রয়েছে।

▸▸ প্রশ্ন : ১৭ ॥ আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্প অবলম্বনে এমদাদের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

অথবা, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে এমদাদ চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্পটি আবুল মনসুর আহমদের অনবদ্য সৃষ্টি। গল্পটির সবটুকু জুড়ে যদিও এক ভণ্ড পীর বিরাজ করেছে, তবু এর কাহিনি নিয়ন্ত্রণ করেছে এমদাদ নামক এক প্রগতিশীল যুবক। গল্পের কাহিনি শুরু এমদাদকে দিয়ে এবং শেষও হয়েছে এমদাদকে ঘিরেই। তাই এ গল্পে এমদাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নিচে এমদাদ চরিত্রের বিভিন্ন দিক আলোচিত হলো–

এমদাদের পরিচয় : গল্পকার এমদাদের পিতৃপরিচয় বিস্তৃতভাবে এ গল্পে তুলে ধরেননি। তবে আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, সে ছিল সচ্ছল পরিবারের সন্তান, কিন্তু তার মা-বাবা, ভাই-বোন কেউ ছিল না। আত্মীয় বলতে ছিল শুধু বিধবা এক ফুফু। এমদাদ উত্তরাধিকারসূত্রে বেশকিছু তালুকপ্রাপ্ত হয়েছিল। সে কলকাতায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়ত। তখন সে ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলাফত আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পরবর্তীতে ফুফুকে ফেলে সে আধ্যাত্মিক জীবনের সন্ধানে ঘর থেকে বের হয়।

নাস্তিক এমদাদ : কলেজের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এমদাদ ছিল নাস্তিক্যমনা। সে ধর্ম, খোদা, রাসুল কিছুই মানত না। এমদাদ খোদার আরশ, ফেরেশতা, অহি, রাসুলের মিরাজ নিয়ে সর্বদা হাসি-ঠাট্টা করতো। কলেজ ম্যাগাজিনে সে মিল, হিউম, স্পেন্সার ও কোমতের ভাব চুরি করে খোদার অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য প্রবন্ধ লিখেছিল। এমদাদ এভাবে নিজেকে পুরোদস্তুর নাস্তিক হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল।

আস্তিক এমদাদ : অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় এমদাদ এবার খেলাফত আন্দোলনের সৈনিক হয়ে গেল। নাস্তিক্য ত্যাগ করে সে আস্তিকে পরিণত হলো। কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরে মুখে দেড় ইঞ্চি ঝাঁকড়া দাড়ি রেখে মাথায় গোলটুপি পরে চটি জুতা পায়ে দিয়ে এমদাদ যেদিন গ্রামে ফিরল, সেদিন রাস্তার বহুলোক তাকে সালাম দিল। সে নিয়মিত নামাজ পড়তে লাগল। বিশেষ করে নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়ল। বাঁশের কঞ্চি কেটে নিজ হাতে তসবিহ বানিয়ে অষ্টপ্রহর টিপতে টিপতে আঙুলের মাথা ক্ষয় করে ফেললেও ইবাদতে মনোযোগী হতে পারল না। শেষ পর্যন্ত এমদাদ এক পরিচিত সুফী সাহেবের শরণাপন্ন হলো।

এমদাদের পরিবর্তন : এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। সে বিলেতি পোশাক ও অন্যান্য জিনিস পরিত্যাগ করে স্বদেশী আন্দোলনের সৈনিক হিসেবে দেশি জিনিসপত্র ব্যবহার করতে লাগল। পোশাক ও অন্যান্য ধর্মীয় উপকরণ ব্যবহারের কারণে লোকজন তাকে সালাম দিতে লাগল।

ধর্মভীরু এমদাদ : এমদাদ হুযুর কেবলার সান্নিধ্যে এসে অত্যন্ত ধার্মিক হয়ে যায়। ধর্মকর্মে আরও ব্যাপক মনোনিবেশের জন্য সে সুফী সাদুল্লাহর মাধ্যমে পীর সাহেবের মুরিদ হয়। এছাড়া সে অন্য কোনো উপায় খুঁজে পেল না। অসহায়ের মতো সুফীর নিকট ধরা গলায় বলল, 'কি হইবে আমার তাহা হইলে সুফী সাহেব?' পীর সাহেবের সংস্পর্শে এসে সে তার অলৌকিক সব কাণ্ডকারখানায় যারপরনাই মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত হলো। নিয়মিত ধর্মচর্চা করা ও পীরের সান্নিধ্যে থাকাই একদা নাস্তিক এমদাদের নিত্যদিনের কাজে পরিণত হলো। সে এখানে এসে যেন আত্মার শান্তি খুঁজে পেল। পীর সাহেবের মুখে শোনা আরবি ও ফারসি কথাগুলো তাকে বিমোহিত করে। সে দিবানিশি দুই চোখ বুজে পীরের নির্দেশমতো 'এলহু' 'এলহু' যিকির করতে থাকে।

মুরিদ হিসেবে এমদাদ : এমদাদ বহু চেষ্টা করেও ইবাদতে নিবিষ্ট হতে পারছিল না। ঘুম তাকে তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত রাখে। অগত্যা এমদাদ এক সুফী সাহেবের কাছে তার অশান্তি অসুবিধার কথা খুলে বলে। সুফী সাহেব সবকিছু শুনে বললেন, 'পীর না ধরে কেউ রূহানিয়াৎ হাসিল করতে পারে না।' এমদাদ একজন কামেল পীরের সন্ধান চাইলে সুফী সাহেব তাকে নিজের পীরের কাছে নিয়ে যায়। এমদাদ পীর সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার কিছু বুযুর্গিপূর্ণ কথাবার্তা শুনে আশ্চর্য হয়ে কোনো দ্বিধা না করে পীরের মুরিদ হয়।

পীরভক্ত এমদাদ : এমদাদ মুরিদ হওয়ার পর পীরের নির্দেশে যিকরে জলি আরম্ভ করল। সে দিনরাত দুই চোখ বুজে 'এলহু' 'এলহু' যিকির করতে থাকে। অনাহার-অনিদ্রায় এমদাদের চোখ দুটি মাথার মধ্যে প্রবেশ করল, তার শরীর নিতান্ত দুর্বল, মন অত্যন্ত অস্থির হয়ে গেল, তবু এমদাদ পীর সাহেবের প্রতি অটুট ভক্তি রেখে চলছিল।

এমদাদের অস্থিরতা : এমদাদ অনেক চেষ্টা করেও নিজের অন্তরকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করতে পারল না। অর্ধাহার, অনাহার ও অনিদ্রায় তার শরীর-মন দুই-ই দুর্বল ও অস্থির হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, আর কিছুদিন গেলে তার রূহ বস্তুতই জিসম থেকে আজাদ হয়ে আলমে আমরে চলে যাবে। তাই এমদাদ বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে।

মুরিদানে গমন : বাড়ি যাওয়ার জন্য এমদাদ যখন অস্থির হয়ে উঠল তখন দূরবর্তী স্থানের মুরিদরা পীর সাহেবকে দাওয়াত দেয়। এমদাদও তার সফরসঙ্গী হয়। সেখানে রাজকীয় খাবার খেয়ে এমদাদের দেহের চেকনাই ফিরে এল। এমদাদ লক্ষ করল, সুস্বাদু খাবার-দাবার ও নারীর প্রতি পীর সাহেবের আসক্তি বেশি। সেখানে যে মোড়লের বাড়িতে পীর সাহেব আস্তানা গেড়েছিল, সে মোড়লের ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের প্রতি পীর সাহেবের চোখ পড়ে। এ ব্যাপারটি এমদাদের কাছে খুবই সন্দেহজনক ও আপত্তিকর বলে মনে হয়। পীর সাহেবের মোরাকাবার আসরে পাতানো খেলার ভণ্ডামি সে ধরে ফেলে।

প্রতিবাদী এমদাদ : মোরাকাবার আসর বসিয়ে হুযুর যে তার কাম-লালসা চরিতার্থ করার ফন্দি আঁটছেন, এমদাদ তা বুঝতে পারে। সে নিজেই মোরাকাবায় বসতে চাইলে পীর সাহেব তাকে বারণ করে। প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দীন মোরাকাবায় বসার পর এমদাদ প্রশ্ন করতে চাইলে তাকে উপহাসের পাত্র হতে হলো। এরপর বদরুদ্দীনের দেহে রাসুলের আত্মা আনয়নের মতো বেদাতি কাজ করে হুযুর তার বাসনা পূর্ণ করেন। বদরুদ্দীন রাসুলের আত্মা সেজে হুযুরকে বলেন, রজবের স্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করে শরীয়তের নির্দেশ পালন করতে। এমদাদ এসব কুকীর্তি বুঝতে পেরে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাহসী এমদাদ : রজবকে কাঁদিয়ে তার স্ত্রী কলিমনকে কৌশলে বিয়ে করে নারীলোলুপ পীর সাহেব। এমদাদ দুঃসাহসের সাথে এর প্রতিবাদ করে। সে বিয়ের আসরে হুযুরের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলে– "রে ভণ্ড শয়তান, নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?" এজন্য শাগরেদ মুরিদরা এমদাদকে প্রহার করতে শুরু করলে সে তাদের মূর্খ বলে গালি দেয়। সে হুযুর কেবলার মুখোশ জনগণের সামনে খুলে দেয়।

উপসংহার : 'হুযুর কেবলা' গল্পে এমদাদ একটি অনুসন্ধানী, প্রতিবাদী ও সাহসী চরিত্র। সে সঠিক পথের দিশা লাভ করতে গিয়ে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ী নামধারী পীরদের খপ্পরে পড়েছে। যদিও শেষপর্যন্ত সে নিজে পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু ভণ্ড প্রতারক ও নামধারী পীরদের মুখোশ উন্মোচন করতে এটা তার সুবর্ণ সুযোগ ছিল। এমদাদ অসাধারণ এক সত্যবাদী চরিত্র। বর্তমান যুগে এমদাদের মতো সাহসী প্রতিবাদী চরিত্র বিরল।

⏩ প্রশ্ন : ১৮ ॥ 'হুযুর কেবলা' নামক ব্যঙ্গাত্মক গল্পে আবুল মনসুর আহমদ ধর্ম ব্যবসায়ীদের কপটতা ও নীচতার যে ছবি এঁকেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্প অবলম্বনে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কপটতা ও ভণ্ডামি আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' একটি সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যঙ্গাত্মক ছোটগল্প। তাঁর রচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থে তিনি আমাদের বাঙালি সমাজের ভণ্ডামি ও অন্ধ বিশ্বাসের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। 'হুযুর কেবলা' এ গ্রন্থের একটি অন্যতম সার্থক ছোটগল্প। এ গল্পে লেখক ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির চিত্র পাঠক সমক্ষে তুলে ধরেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরালির অন্তরালে যে কদর্য ভণ্ডামি ও স্বার্থলোলুপতা লুকিয়ে থাকে, গল্পকার তা পাঠককে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ভণ্ড পীরের কপটতা ও নীচতার ছবি অঙ্কন করে সমাজ থেকে এদের প্রভাব প্রতিপত্তি নির্মূল করাই ছিল গল্পকারের উদ্দেশ্য।

ধর্ম ব্যবসায় : উপমহাদেশের জনগণ চিরকালই সহজ, সরল, অকপট, ধর্মভীরু ধর্মপ্রাণ। উপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে এ সমাজে মানুষের মনে ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধে আছে। একশ্রেণির ধর্ম ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যুগ যুগ ধরে নিজেদের হীন স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। ধর্মের নামে অধর্মের ব্যবসায় খুবই লাভজনক, এতে পুঁজি লাগে না, ঝুঁকিও থাকে না। অবৈজ্ঞানিক কারামতি ও কুদরতি এ ব্যবসার মূলধন। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতার সুযোগে এ ব্যবসায় মেতে ওঠে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা। বিশেষ করে অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে ধর্ম ব্যবসায়ী এ পীরদের অপ্রতিহত দাপট যুগ যুগ ধরে বহাল রয়েছে। আলোচ্য 'হুযুর কেবলা' গল্পে তেমনি এক ভণ্ড প্রতারক দাগাবাজ ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কাহিনি সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

ধর্মের নামে প্রতারণা : আমাদের সমাজে একশ্রেণির ভণ্ড প্রতারকচক্র ধর্মের নামে মানুষকে প্রতারিত করে চলেছে। 'হুযুর কেবলা' গল্পে এ প্রতারণার একটি নমুনাচিত্র উপস্থাপন করেছেন লেখক। এ গল্পের তথাকথিত পীর সাহেব তার চেহারা, কথা ও অভিনয়ের মাধ্যমে মুরিদদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যা বলেন, মুরিদরা অকুণ্ঠচিত্তে তা বিশ্বাস করে। এ সুযোগে কামলালসা চরিতার্থ করার জন্য রাসুলের মতো মহামানবকে নিয়ে তিনি তামাশা করেছেন। সহজ-সরল মুরিদের সাথে প্রতারণা করে আরেক জনের বউকে নিজের জন্য হালাল করেছেন।

কপটতার স্বরূপ : 'হুযুর কেবলা' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ একটি মোরাকাবা অনুষ্ঠানের চিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় কপটতার মুখোশ উন্মোচন করেছেন। পীর সাহেব মুরিদানে

গিয়ে যে বাড়িতে আস্তানা গেড়েছিলেন, সেই বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে দেখে তার চতুর্থ বিয়ের স্বাদ জাগে। এ সাধ চরিতার্থ করতে তিনি কপটতার আশ্রয় নেন। তার দুই বিশ্বস্ত খলিফার সাহায্যে সুকৌশলে মোরাকাবা অনুষ্ঠান আয়োজনের নামে প্রধান খলিফার দেহে রাসুলের আত্মা আনার নামে তামাশা করেন। অন্য খলিফার নির্দিষ্ট প্রশ্নের শেখানো উত্তরের মাধ্যমে কলিমনকে হুযুরের জন্য হালাল বলে প্রধান খলিফা রায় দেয়। গ্রামের অশিক্ষিত অজ্ঞ মানুষেরা এ কপটতা বুঝতে না পেরে তার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে রজব তার সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। জয় হয় কপটতার। এভাবেই মানবতার পরাজয় ঘটে ধর্মীয় কপটতার কাছে।

ধর্মের ভুল ব্যাখ্যাকারী : সাধারণ মানুষ পীর সাহেবের আচার-আচরণ ও আদেশ-নির্দেশকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ বলে মেনে নেয়। ফলে সে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে দিব্যি তার ব্যবসায় চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ধর্মের অপব্যাখ্যা করে সে বিয়ে করে মুরিদের পুত্রের সুন্দরী স্ত্রীকে। এভাবেই সে তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করে এবং ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে সহজ-সরল মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

ধর্মের অবমাননা : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আত্মাকে নিয়ে তামাশা করেছেন পীর সাহেব। এতে ইসলাম ধর্ম ও তার মহান প্রচারককে অবমাননা করা হয়েছে। মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে নীচতা ও কপটতার মাধ্যমে এসব অপকর্ম করে তথাকথিত পীর সাহেবরা। অথচ ইসলামে ভণ্ড পীরপ্রথার কোনো স্থান নেই। যারা পীর সেজে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করে তারা ধর্মের চরম অবমাননা করছে।

পীরের নীচতা : গল্পকার 'হুযুর কেবলা' গল্পে ধর্ম ব্যবসায়ীদের নীচতার নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। স্বার্থ হাসিলের জন্য এরা কত নিচে নামতে পারে তা এ গল্পের হুযুর কেবলার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। মুরিদের পুত্রবধূ কলিমনকে দেখে পীর সাহেবের কামলালসার উদ্রেক হলে তিনি তাকে পাওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে ওঠেন এবং সহজ-সরল মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে এক পাতানো মোরাকাবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে তিনি তার প্রধান খলিফার দেহে মহানবি (স)-এর আত্মা হাজির করানোর মতো ধৃষ্টতা দেখান। এর মাধ্যমে কলিমনকে নিজের জন্য হালাল করে নেন। এতে পীর সাহেবের চরম নীচতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

পীরের ভণ্ডামি : উপমহাদেশের ধর্মান্ধ মানুষ ধর্মের নামে জীবন দিতেও প্রস্তুত। ধর্মের কথায় এরা পাগলপারা হয়ে ওঠে। এদের এ ধর্মীয় অনুভূতিকে আশ্রয় করে ভণ্ড পীরেরা ভণ্ডামি চালিয়ে যায় নির্বিবাদে। সাধারণ মানুষ তাদের এসব কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তাকে ধর্মীয় বাণী বলে বিশ্বাস এবং অনুসরণ করে।

ধর্মভীরু মানুষের মূঢ়তা : ধর্মভীরু অশিক্ষিত মানুষের মনে সর্বদা এক প্রচ্ছন্ন মূঢ়তা বিদ্যমান। এ মূঢ়ত র কারণেই সহজ, সরল, অশিক্ষিত মানুষ ধর্ম ব্যবসায়ীদের কথাবার্তাকে সত্য বলে মনে করে। তাই পীর সাহেব যখন মানুষের দেহের মধ্যে রাসুলের আত্মা আনার মতো একটা অসম্ভব বেদাতি কাজ করলেন, তখন কেউ আপত্তি পর্যন্ত করল না। আর সেই ভণ্ড পীরের কথিত খলিফা মহানবি (স)-এর আত্মা সেজে যখন হুযুরের জন্য কলিমনকে হালাল বলে ঘোষণা করে; তাও তারা সহজেই মেনে নেয়। এর কারণ, ইসলাম ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা।

ধর্মের বেসাতির পরিণাম : সৃষ্টির প্রারম্ভিককাল থেকে যে ধর্মের বেসাতি শুরু হয়েছে, এর শেষ কোথায় আমাদের জানা নেই। তবে এর পরিণাম যে ভালো নয় তা দিবালোকের মতো

সত্য। ধর্ম নিয়ে যারা বেসাতি করে তারা মানুষ নামের কলঙ্ক। সাময়িকভাবে এরা স্বার্থসিদ্ধির পথ বাতলে নিতে সক্ষম হলেও পরকালে এদের রেহাই নেই। মানুষের ধর্মভীরুতাকে ব্যবহার করে যে জঘন্য কাজে এরা লিপ্ত হয়, তা মানবতাবিরোধী। আমাদের দায়িত্ব এসব ভণ্ড ব্যক্তিদের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করা। ধর্মান্ধ মানুষকে সচেতন করে তুলে এ ভণ্ড পীরদের প্রতিরোধ করতে না পারলে ধর্মের বেসাতির অবসান হবে না। সমাজ যদি জেগে ওঠে, মানুষ যদি সচেতন হয় তবে ধর্মের বেসাতির পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা এ ধর্ম ব্যবসায়ীরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে।

প্রতিবাদী যুবক এমদাদকে নির্যাতন : সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে প্রতারণা করে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থ হাসিল করে। তারা তাদের চারদিকে অশিক্ষিত মূর্খ মানুষদের নিয়ে ধর্মের নামে এক অদৃশ্য আবরণ তৈরি করে। পীর সাহেব রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করার ষড়যন্ত্রস্বরূপ খলিফার মাধ্যমে রাসুলের আত্মা হাজির করে। তখন শিক্ষিত প্রতিবাদী সাহসী যুবক এমদাদ তার ভণ্ডামি বুঝতে পেরে এর বিরোধিতা করে। এমদাদ ভণ্ড পীরকে হামলা করলে পীরের অনুসারীরা তাকে পাগল আখ্যায়িত করে প্রহার করতে করতে গ্রাম থেকে বের করে দেয়। এতে পীরের মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়।

উপসংহার : 'হুযুর কেবলা' গল্পে আবুল মনসুর আহমদ ধর্ম ব্যবসায়ীদের কপটতা, ভণ্ডামি, প্রতারণা, ধর্মের অবমাননা ও নীচতার যে ছবি এঁকেছেন, তা আমাদের সমাজের নিত্যদিনকার চিত্র। মানুষকে সুশিক্ষিত বিশেষ করে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে এ ভণ্ড পীরেরা সমাজের মানুষকে এভাবে প্রতারিত করতে পারবে না। তাই বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে পীর নামধারী ভণ্ড প্রতারকদের সমাজ থেকে উৎখাত করতে হবে।

⏩ প্রশ্ন : ১৯ ॥ আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে আলোকপাত কর। [ফা. প. ২০১৭]

অথবা, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১৫]

অথবা, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে তৎকালীন মুসলিম সমাজের অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং ধর্মব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে– আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]

অথবা, "আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য কেবল ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের মুখোশ উন্মোচন করাই নয়, বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্ধত্ব ও কুসংস্কার নির্দেশ করাও।" –আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৭, '১৪]

অথবা, 'হুযুর কেবলা' গল্প অবলম্বনে গ্রাম-বাংলার অজ্ঞ মানুষদের ধর্ম বিশ্বাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

অথবা, আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্পের মূল প্রতিপাদ্য আলোচনা কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক ও প্রখ্যাত রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' গল্পটি একটি সমাজ-সংস্কারমূলক ঐতিহাসিক রচনা। এ গল্পে লেখক একদিকে সমাজের ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন, অন্যদিকে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেসব কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অপব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে তা চোখে আঙুল দিয়ে সমাজস্থ লোকদের দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ভণ্ড ধর্ম

ব্যবসায়ীদের প্রতিহতকরণ এবং কুসংস্কার, অন্ধত্ব ও গোঁড়ামির মূলোৎপাটন করাই হচ্ছে এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য।

বাঙালি মুসলিম সমাজের অবস্থা : চিরদিনই বাঙালি মুসলিম সমাজ সহজ-সরল, অকপট ও ধর্মপ্রাণ। কিন্তু ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত শিক্ষার অভাবে তাদের মধ্যে ধর্মান্ধতার শিকড় গেড়ে বসেছে। এক শ্রেণির ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ী সাধারণ মানুষের এই অজ্ঞতার সুযোগে যুগ যুগ ধরে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মের কথায় পাগল হয়ে ওঠে। প্রকৃত ধর্ম শিক্ষার অভাবে তারা ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ বিচার ও বিবেচনাশক্তি নষ্ট করে বসে। ফলে তারা ভণ্ড প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে স্বর্বস্ব হারায়।

ধর্মের নামে ব্যবসা : পীর-দরবেশ সেজে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে ব্যবসায় গড়ে তোলে। এ ব্যবসার অজুহাতে তারা নিজেদের অনেক অবৈধ বাসনা পূরণ করে এবং অঢেল সম্পদ গড়ে তোলে। আলোচ্য গল্পে লেখক ধর্ম-ব্যবসার কলাকৌশল ও ধর্ম-ব্যবসায়ীদের লাম্পট্যের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্য মানুষের মঙ্গল করা নয়; বরং নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা।

ধর্মের নামে প্রতারণা : 'হুযুর কেবলা' গল্পটি ধর্মের নামে প্রতারণার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অসংখ্য মুরিদের বদৌলতে হুযুর কেবলা অসীম ক্ষমতাশালী। এ ক্ষমতার দাপটে তিনি সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা চালিয়ে নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করেন। তাকে সমাজের শোষক ও লম্পট বললে অত্যুক্তি হবে না। এমদাদ নামক এক যুবক ব্যক্তিগত জীবনে হতাশাগ্রস্ত হয়ে এ হুযুর কেবলার শরণাপন্ন হয়। পীর সাহেবের চেহারা ও শান শওকত দেখে প্রথমত সে ভক্তিতে গদগদ হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে সে বুঝতে পারে, হুযুর কেবলা নামেই কথিত পীর; মূলত ভণ্ড, লম্পট, দুশ্চরিত্র এবং প্রতারক ও প্রবঞ্চক। সে ধর্ম নিয়ে ব্যবসায় করে, সাধারণ সহজ-সরল মানুষের সাথে প্রতারণা করে নিজের স্বার্থ হাসিল করে। এমদাদ বুঝতে পারে, সে একজন ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ী। আল্লাহ, রাসুল, কুরআন, হাদিস ও শরীয়তের দোহাই দিয়ে পীর সাহেব নিজের স্বার্থ হাসিল করে।

ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব বয়সে বৃদ্ধ। তার তিন স্ত্রী বর্তমান। তিনি মুরিদদের ছলনার মাধ্যমে মোহাবিষ্ট করেন। সহজ-সরল মুরিদরাও হুযুর যা বলেন তা বিনা বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করেন। পীর সাহেবের নারী-আসক্তি ছিল খুব বেশি। মুরিদানের বাড়িতে গিয়ে তিনি পুরুষের মজলিসের চেয়ে নারীদের মজলিসে যেতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। মেয়েদের মজলিসে প্রায়ই পীর সাহেবের জযবা আসত। এটা ছিল তার অভিনয় ও চরম ভণ্ডামি। কারণ পীর সাহেবের জযবা আসলে মেয়েরা তার হাত-পা টিপে দিত, যা প্রকৃত অর্থে ইসলামসম্মত কাজ নয়।

পীর সাহেবের প্রতারণা : নারীদের মজলিসে ওয়াজ করার সময় পীর সাহেবের নজর পড়ে রজবের স্ত্রী কলিমনের ওপর। পীর সাহেব সেই থেকে কলিমনকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তিনি তাকে নিজের জন্য হালাল করার ফন্দি করতে থাকেন। অবশেষে তার ঘনিষ্ঠ দুই খলিফার সাথে গোপনে শলাপরামর্শ করে এক মোরাকাবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সুফী সাহেবের অচেতন দেহে হুজুর রাসুলের আত্মা আনার কথা বলে তাকে দিয়ে কলিমনকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। উপস্থিত সবাই এ ঘটনা বিশ্বাস করে প্রস্তাব সমর্থন করে। রজব তার স্ত্রীকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। অন্ধ পীর ভক্তদের সহযোগিতা ও সমর্থনে কলিমনের সাথে পীর সাহেবের বিয়ে হয়ে যায়।

ধর্মান্ধতা : আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষার অভাবে এখনো অন্ধকার যুগে রয়ে গেছে। তারা যুক্তির বদলে আবেগকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তাদের ধর্মবিশ্বাস পরিণত হয় ধর্মান্ধতায়। তাই পীরপ্রথার নামে ধর্ম ব্যবসায়ীরা মুসলিম সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মুসলমানদের প্রতারিত করে ফায়দা হাসিল করে। এসব ভণ্ড পীর নিজেকে আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতার প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় দেয়। ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ, অশিক্ষিত মুসলমানগণ তাদের ফেরেশতা জ্ঞানে গ্রহণ করে। এরা ধর্মের নামে যা বলে এবং যা করে, মুরিদরা তাই মেনে নিয়ে নিজেদেরকে তাদের পদতলে সমর্পণ করে ধন্য হয়।

সমাজে বিরাজমান কুসংস্কার : কুসংস্কার একটি সামাজিক অভিশাপ। 'হুযুর কেবলা' গল্পে বাঙালি মুসলমানদের কুসংস্কারপ্রীতির চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ভণ্ডপীরপ্রথা অনৈসলামিক সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এটা এখনো সমাদৃত হয়ে আসছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে এক শ্রেণির ভণ্ড পীর খুবই তৎপর। এ গল্পে তেমনি এক লম্পট চরিত্রহীন পীরের অপকর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কুসংস্কার যে সমাজে যত বেশি বিদ্যমান সে সমাজে মানবতা তত বেশি লাঞ্ছিত হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজ এখনো কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পায়নি। সে কারণেই রজবদের ভাগ্য হয় বিড়ম্বিত আর কলিমনরা হয় তালাকপ্রাপ্তা। এমদাদের মতো প্রতিবাদী সাহসী যুবকরা পাগল আখ্যা পেয়ে প্রহৃত হয়। 'হুযুর কেবলা' গল্পে ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করতে গিয়ে লেখক সাধারণ মানুষের অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

ধর্মান্ধতার প্রতিফল : ধর্মান্ধতা যে মানুষকে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে আবুল মনসুর আহমদ তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। একদল ধর্মান্ধ মানুষ লম্পট নারীলোলুপ পীরকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেছে। এ ভণ্ড পীর রাসুল (স)-এর আত্মা নিয়ে তামাশা করেছে। নিজ কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্য এক দম্পতির ঘর ভেঙেছে। কেউ এর প্রতিবাদ করেনি; বরং জোরপূর্বক তাদের তালাকের ব্যবস্থা করেছে অন্ধ পীরভক্তরা। অন্ধত্ব তাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তারা ভুলেও পীর সাহেবের ভণ্ডামি ধরতে পারেনি এবং ধরার মনোবৃত্তিও জাগেনি।

কুসংস্কারের কুফল : মুসলমান সমাজে কুসংস্কার এমনভাবে দানা বেঁধে আছে যে, এর বিরুদ্ধে কেউ প্রশ্ন তুললেই তাকে অপমানিত এমনকি সমাজচ্যুত হতে হয়। এমদাদ শেষ পর্যন্ত পীর সাহেবের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে মোরাকাবা আসরের রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছিল, কিন্তু পীর সাহেব তাকে কৌশলে বিরত রেখেছিল। এমদাদ কলিমনের বিয়ে মেনে না নিয়ে পীরকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কেউ তার পক্ষ নেয়নি। অন্ধ পীরভক্তি সবাইকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, তাই তারা এমদাদকে পাগল আখ্যা দিয়ে বেদম প্রহার করে গ্রামছাড়া করে। এসব কুসংস্কারের বেড়াজালেই গ্রামের অশিক্ষিত মানুষগুলো আটকা পড়ে আছে। কুসংস্কার যেন অক্টোপাসের ন্যায় সমাজকে আঁকড়ে ধরে আছে। অশিক্ষার কারণে এ মানুষগুলো সংস্কারকে ভয় পায়।

উপসংহার : 'হুযুর কেবলা' গল্পে দক্ষ গল্পকার ধর্ম-ব্যবসায়ীদের তীব্রভাবে কটাক্ষ করেছেন। এ ভণ্ডামি ও কুসংস্কার দূর না হলে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই লেখক সমাজের বুক থেকে ধর্ম-ব্যবসায় নামক ভণ্ডামি ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীভূত করার নিমিত্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছেন।

▶▶ প্রশ্ন : ২০ ॥ আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর।
অথবা, বিষয়বস্তুর বিচারে আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণ কি যুক্তিযুক্ত? আলোচনা কর।
অথবা, আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর|| উপস্থাপনা : 'হুযুর কেবলা' আবুল মনসুর আহমদের একটি অনুসন্ধানী ও সমাজ-সংস্কারমূলক গল্প। এ গল্পে উপমহাদেশের সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশেষত মুসলিম সমাজে পীর-দরবেশের আড়ালে যে ভণ্ড ধর্ম ব্যবসায় এবং অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার লুকিয়ে আছে, তা তিনি সমাজের মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। ধর্ম-ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়ের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য নানা ধর্মঘনিষ্ঠ নাম ধারণ করে থাকে। যেমন– 'হুযুর কেবলা', 'মুর্শিদ কেবলা', 'পীর বাবা', 'খাজা বাবা', 'অলীকুল শিরোমণি', 'দয়াল বাবা', 'কেবলা বাবা', 'সুফী সম্রাট' ইত্যাদি। আলোচ্য গল্পের পীর সাহেবও 'হুযুর কেবলা' নাম ধারণ করে তার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল।

নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়ে থাকে– Literature is the mirror of life. অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যকর্মের মূল ভাববস্তু ফুটে ওঠে। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. সাহিত্যিকগণ সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকেন। তারা ভাব বা কল্পনার সমুদ্রে অবাধ সন্তরণ করেন। তাই বলে তারা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির ঊর্ধ্বে নন। রচনার সাথে ন্যূনতম সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সাহিত্যের নামকরণ সার্থক হয় না। সুতরাং একটি শিল্পকর্মকে সার্থক করে তুলতে নামকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- স্থান বা কাল
- নায়ক-নায়িকার নাম।

'হুযুর কেবলা' শব্দযুগলের অর্থ : 'হুযুর কেবলা' যুগল শব্দের হুযুর শব্দের আভিধানিক অর্থ– মহাশয়, মহোদয়। আর কেবলা শব্দের অর্থ– স্থূলবুদ্ধি বা বোকা। কিন্তু এ গল্পে কেবলা শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ সম্মানিত। তাই হুযুর কেবলা অর্থ দাঁড়ায় সম্মানিত মহোদয়। গল্পকার এক ভণ্ড পীরকে তার গল্পে 'হুযুর কেবলা' হিসেবে বিশেষ উদ্দেশ্যে হাজির করেছেন। এ কারণে তিনি গল্পের নামকরণ করেছেন 'হুযুর কেবলা'। অবশ্য এ পীরের মুরিদরা তাকে হুযুর কেবলা বলেই সম্বোধন করতো।

'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণ : আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণ করা হয়েছে মূলত গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রকে কেন্দ্র করে। গল্পকার এ গল্পে এক ভণ্ড ব্যক্তিকে 'হুযুর কেবলা' সাজিয়ে প্রধান চরিত্র হিসেবে তুলে ধরে তার ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করেছেন। বাঙালি মুসলিম সমাজের ওপর এসব পীর হুযুরের প্রচণ্ড প্রভাব বিদ্যমান। এরা সরলপ্রাণ মুসলমান এবং তাদের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে। এজন্য গল্পকার পীরপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন 'হুযুর কেবলা' গল্পে এবং গল্পের নামকরণেও এ শব্দযুগলকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে 'হুযুর কেবলা' : গল্পের সবটুকু স্থান জুড়ে আছেন 'হুযুর কেবলা'। তিনি কাহিনির কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছেন। তাকে কেন্দ্র করে যেমন কাহিনি গড়ে উঠেছে, তেমনি এমদাদ, সুফী সাদুল্লাহ, সুফী বেলায়েতপুরী প্রমুখ চরিত্র তাকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছে। এ গল্পের 'হুযুর কেবলা' একজন তথাকথিত কামেল পীর। তিনি এবং তার মুরিদরা এ গল্পের শুরু, মধ্য ও শেষভাগে অবস্থান করছেন। তাকে ছাড়া কাহিনি গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। তার কপট ও ভণ্ড চরিত্র এ গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই হুযুর কেবলাকে সমধিক গুরুত্ব দিয়ে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে 'হুযুর কেবলা'।

গল্পের 'হুযুর কেবলা'র ভূমিকা : আবুল মনসুর আহমদের এ ব্যঙ্গাত্মক গল্পে হুযুর কেবলার ভূমিকাই প্রধান। ধর্মের ব্যাপারে বিভ্রান্ত এমদাদকে হুযুরের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। এমদাদ পীর সাহেবের কেরামতি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে তার মুরিদ হয়। এরপর গল্পে যা কিছু ঘটেছে তার মূলে রয়েছেন 'হুযুর কেবলা'। তিনি মুরিদানে গেলে তাকে রাজকীয় অভ্যর্থনা প্রদান করা হয়। নিজের কাম-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি এক তরুণ দম্পতির দুটি জীবনকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দেন। সচেতন এমদাদ এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাগল আখ্যা পায় এবং প্রহৃত হয়। সমাজের ধর্মান্ধ মানুষের সহযোগিতায় হুযুরের কোনো ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকেনি। তিনি যখন যা চেয়েছেন তা-ই পেয়েছেন। এ গল্পে তার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

'হুযুর কেবলা'র চরিত্র : 'হুযুর কেবলা' দুশ্চরিত্র লম্পট প্রকৃতির লোক। তার রূহানী শক্তি যতই থাকুক না কেন, ভোজন ও হজম শক্তি তার চেয়ে বেশি। তিনি একজন স্বার্থান্বেষী ভণ্ড পীর। মানুষকে ঠকানো ও প্রতারণা করাই তার নিত্যদিনের স্বভাব। মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেছেন। তিনি কৌশলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করেছেন। ভণ্ড পীর রাসুলের আত্মাকে নিয়ে তামাশা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। নিজের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য তিনি ধর্মের অপব্যাখ্যা করেছেন। গল্পকার ভণ্ড পীরের এমন চরিত্রের কারণেই ব্যঙ্গ করে তাকে 'হুযুর কেবলা' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নামকরণের সার্থকতা : একটি গল্পের নামকরণ তখনই সার্থক হবে যখন শিরোনামে গল্পের অন্তর্নিহিত প্রতিপাদ্য বিষয় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হবে। যুক্তি, উপমা, ভাষা ও চিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে মূল শিরোনামে লিপিবদ্ধ বিষয় ফুটিয়ে তুলতে পারলে রচনা এবং নামকরণ সার্থক হয়। সেদিক থেকে 'হুযুর কেবলা' গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে বলা যায়। কারণ গল্পকার 'হুযুর কেবলা' শব্দযুগল ব্যঙ্গার্থে ব্যবহার করেছেন। এ গল্পের পীর সাহেবের যে চরিত্রমাহাত্ম্য, তাতে তাকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরার প্রশ্নই আসে না। মুসলিম সমাজে প্রচলিত পীরপ্রথাকে বিদ্রূপ কটাক্ষ করার উদ্দেশ্যে তিনি তথাকথিত এ কামেল পীরকে 'কেবলা' বলে উপহাস করেছেন, যিনি আত্মস্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না। নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তিনি রজব কলিমনের সুন্দর-সুখী দাম্পত্য জীবন ধ্বংস করে দিয়েছেন। এ হুযুর কেবলা সমাজের জীবন্ত অভিশাপ। তার ভণ্ডামির মুখোশ উন্মোচন করে প্রকৃত রূপ তুলে ধরা এবং সমাজের অধিবাসীদের সতর্ক করার নিমিত্ত গল্পকার এ গল্পের নামকরণ করেছেন 'হুযুর কেবলা'। তাই বলা যায়, 'হুযুর কেবলা' নামকরণ সার্থক, সুন্দর, যুক্তিযুক্ত ও শিল্পসম্মত হয়েছে।

উপসংহার : পীর সাহেব তার মুরিদানদের কাছে 'হুযুর কেবলা' তথা সম্মানিত মহোদয় সাজার চেষ্টা করেছেন। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে গল্পকার এ গল্পের নামকরণ করেছেন 'হুযুর কেবলা'। সেজন্য বলা যায়, 'হুযুর কেবলা' নামকরণে আবুল মনসুর আহমদ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

পাদটীকা

সৈয়দ মুজতবা আলী [১৯০৪ - ১৯৭৬ খ্রি.]

প্রশ্ন : ২১ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্পে যে নির্মল সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০০৬, '১১]

অথবা, "এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।"–যে কাহিনির স্মৃতি অবলম্বন করে এ নিস্তব্ধতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি বর্ণনা দাও।

অথবা, "মূলত একজন রম্যরচয়িতা হলেও জীবনের বেদনাসিক্ত মুহূর্ত চিত্রণে সমান পারদর্শী সৈয়দ মুজতবা আলী"–'পাদটীকা' গল্প অনুসরণে এ কথার যথার্থতা বিচার কর। [ফা. প. ১৯৯৬, '০২]

অথবা, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তা বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৪]

অথবা, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তার পরিচয় দাও। [ফা. প. ১৯৯২]

উত্তর || উপস্থাপনা : 'পাদটীকা' নামক অসাধারণ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত রম্যলেখক, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত। এ গল্পে লেখক তাঁর সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের আগমনের ফলে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়। ফলে তখন থেকে সংস্কৃত পণ্ডিতদের জীবনে নেমে আসে নানা দুর্ভোগ।

স্কুলের পণ্ডিত মশাই : গল্পকার যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। স্কুলে তিনি বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি ঘুমাতেন টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে।

পণ্ডিত মশাইয়ের ব্যবহার : লেখককে পণ্ডিত মশাই খুব স্নেহ করতেন। তাই সর্বদা তার প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতেন। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ছাড়া তিনি সম্বোধন করতেন না লেখককে। পণ্ডিত মশাইয়ের গায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম। মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং হাঁটু-জোকা ধুতি পরতেন। তার গায়ে যে দড়ি প্যাঁচানো থাকত, অজ্ঞরা তাকে চাদর বলে অভিহিত করতো। ক্লাসে এসে একটা অজুহাত নিয়ে বকতে শুরু করতেন। আর যেদিন অজুহাত খুঁজে পেতেন না, সেদিন কৃৎ-তদ্ধিত আলোচনা করে এ মূর্খদের বিদ্বান করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কথা বলতেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চলাফেরা : পণ্ডিত মশাই সব সময় খালি গায়ে স্কুলে আসতেন। সেবার লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি একটি ফুলহাতা গেঞ্জি পরেন এবং অনভ্যাসের কারণে নানা বিপত্তির শিকার হন। লাট সাহেব ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি বিগলিত হয়ে বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সালাম করেন।

শিক্ষকজীবনের নির্মমতা : তিনদিন ছুটির পর পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসেছেন। লেখককে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লাট সাহেবের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল তার তিনটি ঠ্যাং আছে, যেটির জন্য মাসিক খরচ পঁচাত্তর টাকা। আর পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে। পণ্ডিত মশাইয়ের পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে, তিনি তাদের সাক্ষী রেখে আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন। ক্লাসের সেই নিস্তব্ধতা হিরণ্ময় ছিল না, সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি ভুলবার নয়।

'প্যাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা : ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। এদেশের অভিভাবকরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃত বাদ দিয়ে সন্তানদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করে। ইংরেজির প্রতি মানুষের ঝোঁকপ্রবণতার কারণে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কদরও কমতে থাকে।

শিক্ষক জীবনের পরিচয় : গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের জীবন, সে সময়ের শিক্ষক জীবনের চিরন্তন চিত্র। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও শিক্ষকসমাজ সবার নিকট অবহেলিত উপেক্ষিত। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করে অনেকেই সমাজের উঁচু স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি।

সমকালীন শিক্ষায় রাজনৈতিক প্রভাব : ইংরেজরা তাদের শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এদেশের মানুষ দেশীয় আদর্শে শিক্ষিত হোক তা চায়নি। তাই মাদরাসা এবং হিন্দুদের টোল উভয়ই ইংরেজদের দৃষ্টিতে অবহেলিত ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ইংরেজরা এসব প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞার চোখে দেখে।

সমকালীন শিক্ষায় অর্থনৈতিক প্রভাব : ইংরেজদের আগমনের পর এদেশের মানুষ বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সংস্কৃত বাদ দিয়ে ইংরেজি শিখতে সন্তানদের উৎসাহিত করে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যই তারা ইংরেজি শিখতে আকৃষ্ট হয়।

নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি ও নির্মম সত্য : সংস্কৃতের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল বক্ষ্যমাণ গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তার তীব্র অনীহা। টোল প্রথা উচ্ছেদের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশ পড়াতেন তিনি। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভের কারণে ক্লাসে যতটা পড়াতেন তার চেয়ে বকতেন বেশি, আর দুই পা টেবিলের ওপর রেখে ঘুমাতেন। জীবনের ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বেঁচেছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক পণ্ডিত মশাই। তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা, যা কিনা লাট সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের সমান। কুকুরের একটি পায়ের সাথে নিজেকে তুলনা করে তিনি আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখেন। এভাবে গল্পকার 'পাদটীকা' গল্পে রসাত্মক বর্ণনাভঙ্গিতে এক নির্মম সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

উপসংহার : সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক সমাজের দুর্দশার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। রসাত্মক রচনার আড়ালে তিনি যে নির্মম সত্য প্রকাশ করেছেন তা সত্যি মর্মান্তিক, যা পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করে।

►► প্রশ্ন : ২২ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'পাদটীকা' গল্প অনুসরণে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

অথবা, সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০০৮]

অথবা, সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০০০]

অথবা, 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯৪, '৯৮]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত রম্যলেখক সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' একটি অসাধারণ গল্প। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে টোল শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতগণ যে দুরবস্থার

শিকার হয়েছিলেন, 'পাদটীকা' গল্পের পণ্ডিত মশাই তাদেরই প্রতিনিধি। সৈয়দ মুজতবা আলী আলোচ্য গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র

১. **পণ্ডিত মশাইয়ের পরিচয় :** পণ্ডিত মশাই ছিলেন পণ্ডিত সমাজের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বংশানুক্রমে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক-বাহক। লেখক পণ্ডিত মশাইয়ের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "পণ্ডিত মশাইয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটুজোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত– অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর।" এ বর্ণনা তৎকালীন একজন পণ্ডিতের যথার্থ পরিচয়।

২. **প্রাচীনপন্থি ও আত্মগর্বী :** ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্রাচীনপন্থী, তিনি আত্মগর্বীও বটে। সবাইকে তিনি গো-মূর্খ, অকালকুষ্মাণ্ড ভাবতেন। এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষককেও তিনি তেমন কোনো গুরুত্ব দিতেন না।

৩. **গোঁড়া ও অলস :** শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই ছিলেন গোঁড়া। প্রাচীনের প্রতি তার আকর্ষণ আর নতুনের প্রতি অবহেলা ও ঘৃণা ছিল খুবই প্রবল। ক্লাসে পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি টেবিলের উপর পা তুলে ঘুমাতেন।

৪. **বাংলা ভাষা বিদ্বেষী :** বাংলা ভাষার প্রতি চরম বিদ্বেষী মনোভাব ছিল পণ্ডিত মশাইয়ের। তিনি বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। যেমন কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি, সমাস ইত্যাদি। লেখক একদিন বাংলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখি-জাগা' ব্যবহার করেছেন বিধায় পণ্ডিত মশাই তার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন।

৫. **প্রাচীন সংস্কৃতের ধারক :** পণ্ডিত মশাই ছিলেন প্রাচীন সংস্কৃতের অন্ধভক্ত। তার চিন্তা-চেতনা, চাল-চলনে আধুনিকতার নামগন্ধও ছিল না। সাহিত্যে খাঁটি বাংলা বা চলিত ভাষার ব্যবহার তিনি একদম পছন্দ করতেন না।

৬. **অবহেলিত পণ্ডিত মশাই :** ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান টোলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। যার কারণে পণ্ডিত মশাই বাধ্য হয়ে স্কুলে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। স্কুলে তিনি বেতন পেতেন সবার চেয়ে কম, কিন্তু অবহেলা ও উপহাস পেতেন সবার চেয়ে বেশি।

৭. **শ্রদ্ধাকাঙ্ক্ষী :** লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শন করতে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি একেবারে বিগলিত হয়ে যান এবং বারবার লাট সাহেবকে সালাম করেন। সামান্য শ্রদ্ধা পেলেই পণ্ডিত মশাই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতেন।

৮. **পরোপকারী :** পণ্ডিত মশাইয়ের বাড়ি নদীর ওপারে। নৌকা করে তিনি নদী পার হতেন। নৌকা ছিল তার নিজের। কিন্তু প্রায়ই অন্য লোকদেরও নৌকায় লিফট দিতেন তিনি। ছাত্রদের গালাগালি করলেও তিনি তাদের প্রতি ছিলেন খুবই আন্তরিক।

৯. **শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত মশাই :** পণ্ডিত মশাই শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার পর দেহের ওপরের অংশে প্যাঁচানো চাদরখানা টেবিলে রেখে কটমটিয়ে ছাত্রদের দিকে তাকাতেন। অতঃপর দু'চারটি সংস্কৃত শব্দ পড়িয়ে টেবিলের ওপর পা রেখে ঘুমাতেন। শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত মশাইয়ের এ ধরনের আচরণ খুবই দৃষ্টিকটু ছিল।

১০. **শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই :** শিক্ষক হিসেবে পণ্ডিত মশাই ছিলেন গোঁড়া প্রকৃতির। তিনি পেশায়ও আন্তরিক ছিলেন না। ক্লাসে তিনি ঠিকমতো পাঠ না দিয়ে ঘুমাতেন এবং ছাত্রদের গালিগালাজ করতেন।

১১. **সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি :** লাট সাহেবের আগমনের কারণে স্কুল ছুটি থাকায় তিনদিন পর পণ্ডিত মশাই স্কুলে এসে ক্লাসে ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, লাট সাহেবের সাথে আর কে কে এসেছিল? ছাত্ররা যথার্থ উত্তর দিতে পারেনি। লাট সাহেবের সাথে তার কুকুর এসেছিল এবং কুকুরের এক ঠ্যাং ছিল না। ছিল তিন ঠ্যাং। এসব পর্যবেক্ষণ করেছেন পণ্ডিত মশাই।

১২. **ধৈর্য ও সহনশীলতা :** পণ্ডিত মশাইয়ের অর্থনৈতিক দৈন্যের কোনো সীমা ছিল না। মাত্র পঁচিশ টাকায় তিনি আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার লালন-পালন করতেন। তার গোটা পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের একটি ঠ্যাংয়ের সমান। অর্থাৎ পঁচিশ টাকা বেতন যে তার জীবনে কতো তুচ্ছ– এ বোধ তার মাঝে লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণার জন্ম দিয়েছে সত্যি, তবুও তিনি ধৈর্যচ্যুত হননি। কারণ তিনি বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই ধৈর্যশীল ছিলেন।

উপসংহার : সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র অঙ্কন করেছেন নিপুণ শৈল্পিক তুলিতে। পণ্ডিত মশাই চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সময়ের শিক্ষকদের জীবনের এক করুণ দিক তুলে ধরেছেন।

›› প্রশ্ন : ২৩ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর। [ফা. প. ২০০৪]

উত্তর॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত রম্যলেখক, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীর 'পাদটীকা' নামক অনন্য সাধারণ গল্পটি তার 'চাচাকাহিনী' গ্রন্থ থেকে উৎকলিত। এ গল্পে তৎকালীন সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকজীবনের করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। নিচে 'পাদটীকা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করা হলো :

সাহিত্যে নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়– Literature is the mirror of life. আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যকর্মের মূলভাব ফুটে ওঠে। তাই প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth.

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য;
- কেন্দ্রীয় চরিত্র;
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা;
- স্থান ও কাল;
- নায়ক-নায়িকা, কেন্দ্রীয় চরিত্রের নাম ইত্যাদি।

'পাদটীকা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা

'পাদটীকা' নামকরণ : 'পাদটীকা' গল্পের নামকরণে গল্পকার সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম পদ্ধতিটিই অনুসরণ করেছেন। অর্থাৎ গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুসারে গল্পটির নামকরণ করেছেন 'পাদটীকা'।

'পাদটীকা'র পরিচিতি : পাদটীকার ইংরেজি প্রতিশব্দ Foot note. জটিল প্রবন্ধের শেষে পৃষ্ঠার নিচে বিশ্লেষণমূলক লিখিত টীকাকে 'পাদটীকা' বলা হয়। আলোচ্য 'পাদটীকা' গল্পে গল্পকার 'পাদ' অর্থ পা এবং 'টীকা' অর্থ বিশেষ বিশ্লেষণ; এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং 'পাদটীকা' অর্থ দাঁড়ায় পায়ের বিশেষ বিশ্লেষণ।

'পাদটীকা' গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য : ব্রিটিশ শাসনামলে সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান টোলসমূহ বন্ধ হয়ে গেলে সংস্কৃত পণ্ডিতগণ দারিদ্র্য ও হতাশার মধ্যে দিনাতিপাত করেন। গল্পে এ হতাশার চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। লেখক যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন এবং স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি ঘুমাতেন দুই পা টেবিলে তুলে।

পণ্ডিত মশাই লেখককে খুব স্নেহ করতেন। তাই সর্বদা কটুবাক্য বর্ষণ করতেন তার প্রতি। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ছাড়া তিনি সম্বোধন করতেন না লেখককে। পণ্ডিত মশাইয়ের গাত্রবর্ণ ছিল শ্যাম। মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন এবং হাঁটুজোকা ধুতি পরতেন। গায়ে যে চাদর তিনি ব্যবহার করতেন তা দড়ি বলে ভ্রম হতো। ক্লাসে এসে একটা অজুহাত নিয়ে বকতে শুরু করতেন। আর যেদিন কোনো অজুহাত খুঁজে পেতেন না সেদিন কৃৎ-তদ্ধিত আলোচনা করে মূর্খদের বিদ্বান করার প্রচেষ্টায় ব্যর্থতার কথা বলতেন।

পণ্ডিত মশাই সারাজীবন খালি গায়ে স্কুলে আসতেন। সেবার লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি একটি ফুলহাতা গেঞ্জি পরেন এবং অনভ্যাসের কারণে নানা বিপত্তির শিকার হন। লাট সাহেব ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি বিগলিত হয়ে লাট সাহেবকে বারবার সালাম জানান।

তিনদিন ছুটির পর পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসে বললেন, লাট সাহেবের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল সেটির তিনটি ঠ্যাং আছে। সেই কুকুরের জন্য মাসিক খরচ পঁচাত্তর টাকা। আর পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে। পণ্ডিত মশাই জানতে চাইলেন, তার পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ছাত্ররা বুঝতে পেরেছে, তিনি তাদের সাক্ষী রেখে আত্মঅবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন! ক্লাসের সেই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি কখনো ভুলবার নয়।

নামকরণের সার্থকতা যাচাই : মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক পণ্ডিত মশাই জীবনের ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বেঁচেছিলেন। তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা, যা কিনা লাট সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের খরচের সমান। কুকুরের একটি পায়ের সাথে নিজেকে তুলনা করে তিনি আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখলেন এবং সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন শিক্ষক জীবনের দুরবস্থার চিত্র। অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ রেখেই গল্পকার এ গল্পের নামকরণ করেছেন 'পাদটীকা'। সুতরাং এ নামকরণ সার্থক হয়েছে।

উপসংহার : 'পাদটীকা' গল্পের নামকরণে সৈয়দ মুজতবা আলী অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে সংস্কৃত পণ্ডিতদের প্রতি অবহেলার চিত্র তিনি কুকুরের একটি পায়ের সাথে তুলনা করে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে তিনি আলোচ্য গল্পের নামকরণে যথার্থ সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

⏩ প্রশ্ন : ২৪ ॥ সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্পের মূল বক্তব্য/ সার-সংক্ষেপ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, 'পাদটীকা' গল্পের মর্মকথা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : 'পাদটীকা' নামক অসাধারণ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য রম্যলেখক ও সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' নামক গ্রন্থের

অন্তর্গত। এ গল্পে লেখক তার সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষক জীবনের করুণ পরিচয় বিধৃত করেছেন। হাস্যরসাত্মকভাবে তিনি একটি নির্মম সত্য এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন।

স্কুলের পণ্ডিত মশাই : গল্পকার যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই ছিলেন সংস্কৃত ভাষার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের শুধু সংস্কৃত অংশটুকুই পড়াতেন। পড়ানোর চেয়ে বকতেন বেশি এবং তার চেয়েও বেশি টেবিলের ওপর পা রেখে ঘুমাতেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের ব্যবহার : লেখককে পণ্ডিত মশাই খুবই স্নেহ করতেন। তাই সর্বদা তার প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করতেন। অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ছাড়া তিনি সম্বোধন করতেন না লেখককে। পণ্ডিত মশাইয়ের গায়ের রং ছিল শ্যাম। মাসে একদিন দাড়ি-গোঁফ কামাতেন। হাঁটুজোকা ধুতি পরতেন। তিনি গায়ে যে চাদর ব্যবহার করতেন তা দড়ি বলে ভ্রম হতো। ক্লাসে এসে একটা অজুহাত নিয়ে বকতে শুরু করতেন। আর যেদিন অজুহাত খুঁজে পেতেন না সেদিন কৃৎ-তদ্ধিত আলোচনা করতেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের চলাফেরা : পণ্ডিত মশাই সব সময় খালি গায়ে স্কুলে আসতেন। সেবার লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এলে তিনি একটি ফুল হাতা গেঞ্জি পরেন এবং অনভ্যাসের কারণে নানা বিপত্তির শিকার হন। লাট সাহেব ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করায় তিনি বিগলিত হয়ে যান।

শিক্ষক জীবনের নির্মমতা : তিনদিন ছুটির পর পণ্ডিত মশাই ক্লাসে এসে লেখককে বললেন, লাট সাহেবের সাথে যে কুকুরটি এসেছিল সেটির তিনটি ঠ্যাং ছিল। কুকুরটির জন্য মাসিক খরচ হতো পঁচাত্তর টাকা। পণ্ডিত মশাইয়ের আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চলে মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে। পণ্ডিত মশাই জানতে চান, তার পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ ঘৃণা, লজ্জা ও তিক্ততায় বিকৃত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা বুঝতে পারে, তিনি তাদের সাক্ষী রেখে আত্মঅবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন।

'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা : ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে সংস্কৃত শিক্ষা প্রায় বিলুপ্ত হতে থাকে। এ দেশের অভিভাবকরা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে সংস্কৃত বাদ দিয়ে সন্তানদের ইংরেজি শিখতে উৎসাহিত করে। ইংরেজির প্রতি মানুষের এ প্রবণতার কারণে পণ্ডিতদের কদর কমতে থাকে। আলোচ্য গল্প 'পাদটীকা'য় এমনই একজন পণ্ডিত মশাইয়ের করুণ জীবনচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

শিক্ষক জীবনের বাস্তব চিত্র : পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনের করুণ চিত্র শিক্ষক জীবনের চিরন্তন সত্য। অতীতকাল থেকে শুরু করে বর্তমানেও শিক্ষকসমাজ সবার নিকট অবহেলিত, উপেক্ষিত। পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে অনেকেই সমাজের উঁচুস্তরে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু পণ্ডিত মশাইয়ের জীবনযাত্রার কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। বর্তমানেও অন্যান্য চাকরিজীবীদের তুলনায় শিক্ষকরা বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অবহেলিত। 'পাদটীকা' গল্পটি শিক্ষক জীবনের দুরবস্থার জীবন্ত ভাষাচিত্র।

নির্মম সত্যের প্রকাশ : সংস্কৃতের প্রতি অগাধ আস্থা ছিল পণ্ডিত মশাইয়ের। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তার তীব্র অনীহা। টোলপ্রথা বন্ধ হওয়ার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কুলে বাংলা ব্যাকরণের সংস্কৃত অংশ পড়াতেন তিনি। শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি তীব্র ক্ষোভের কারণে ক্লাসে যতটা পড়াতেন, তার চেয়ে বেশি বকতেন আর ঘুমাতেন দুই পা টেবিলের ওপর তুলে। জীবনের ওপর প্রবল বিতৃষ্ণা নিয়ে বেঁচে ছিলেন মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক পণ্ডিত

মশাই। তার মাসিক বেতন ছিল মাত্র পঁচিশ টাকা, যা কিনা লাট সাহেবের কুকুরের একটি পায়ের খরচের সমান। কুকুরের একটি পায়ের সাথে নিজেকে তুলনা করে তিনি আত্ম-অবমাননার নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখলেন। এভাবে গল্পকার 'পাদটীকা' গল্পে লেখক রসাত্মক বর্ণনাভঙ্গিতে এক নির্মম সত্য উদ্ঘাটন করেছেন।

উপসংহার : সুলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী 'পাদটীকা' গল্পে সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকসমাজের দুর্দশার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন। লঘু পরিহাসের আড়ালে যে নির্মম সত্য তিনি প্রকাশ করেছেন তা সত্যিই মর্মান্তিক।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ [১৯২২-১৯৭১ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ২৫ ॥ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১১, '১৩, '১৯]
অথবা, 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার যে ছবি ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে আলোকপাত কর।
অথবা, "জীবনের গভীর তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় করে প্রকাশের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মুন্সিয়ানা রয়েছে।" 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' অনুসরণে উক্তিটির তাৎপর্য বিচার কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার, 'লালসালু' উপন্যাসের অমর স্রষ্টা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক। তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপ ফুটে উঠেছে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তার 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি সংকলিত হয়েছে। এ গল্পে জীবনের গভীর তাৎপর্য ইঙ্গিতময় করে প্রকাশের ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মুন্সিয়ানার প্রকাশ ঘটেছে হিরণ্ময় আলোকদ্যুতিতে।

গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার চিত্র : সমাজ হচ্ছে মানুষের সংঘবদ্ধ জীবন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গিলক্রাইট বলেন, "কিছুসংখ্যক ব্যক্তি একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বসবাস করলে সমাজ গঠিত হয়।" সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন, Society is a system of relationship in and through which we live. অর্থাৎ, যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি, তার গঠিত রূপই হলো সমাজ। মোটকথা, সমাজ হলো Web of social relationship বা পারস্পরিক সামাজিক সম্বন্ধজাল। সাহিত্য এ সমাজেরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করে কখনো কবিতায়, কখনো উপন্যাসে, কখনো বা গল্পে। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' নামক আলোচ্য গল্পটিতে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সমকালীন সমাজবাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

দেশভাগের গল্পময় চিত্র : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য আলাদা দুটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়– একটি ভারত অপরটি পাকিস্তান। পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে ভারতে, ভারতের মুসলমানরা আসছে পাকিস্তানে। এ উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধি এ গল্পের চরিত্র মোদাব্বের, মতিন, আমজাদ ও কাদেরসহ আরও অনেকে।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বিনষ্ট : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার কারণে মূলত হিন্দু-মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। যারা ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে গিয়েছিল তারা ছিল সেখানে উদ্বাস্তু। আবার যারা পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে গিয়েছিল

তারাও সেখানে ছিল উদ্বাস্তু। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' মূলত সেসব উদ্বাস্তুদের গল্প, যারা মাথা গোঁজার জন্য দখল করে নিয়েছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি।

সামাজিক বন্ধনের চিত্র : ভারত থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব বাংলায় আসা মোদাব্বের, মতিন, কাদের, ইউনুস, হাবিবুল্লাহ, মকসুদ মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে বেছে নেয় রাস্তার পাশে অবস্থিত পরিত্যক্ত একটি দোতলা বাড়ি। এখানে এসে তারা কলকাতার আবদ্ধ জীবনের স্মৃতি পেছনে ফেলে যেন মুক্তির আনন্দে নেচে ওঠে। আচার-আচরণ ও রুচির ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা পারস্পরিক সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই এ বাড়িতে গাদাগাদি করে থাকতেও তারা আনন্দ পায়।

আনন্দ-বেদনার কাব্য : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' তৎকালীন উদ্বাস্তু মানুষের আনন্দ-বেদনার কাব্য। এ গল্পের চরিত্রগুলো ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের অধিকারী হয়েও একত্র হয়েছে আনন্দ-বেদনার মেলবন্ধনে। পালাক্রমে তারা রান্না করে, রাজনৈতিক আড্ডায় মেতে ওঠে, হারমোনিয়াম নিয়ে গানের আসর বসায়। এভাবে পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে ওঠে।

সাম্প্রদায়িক মানসিকতা : কলকাতা থেকে কিছু মুসলমান উদ্বাস্তু দেশ বিভাগের ফলে পূর্ব বাংলায় আসে। নিজেদের আবাসভূমি ভিটে-মাটি ছেড়ে এসে পূর্ব বাংলায় আশ্রয়ের কোনো জায়গা তাদের ছিল না। যার ফলে তাদের সবার মনে হিন্দুদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ কাজ করছিল। তাদের ধারণা, গোঁড়া হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কারণেই তারা ভিটে-মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। এদের ভেতর মোদাব্বের কিছুটা গোঁড়া প্রকৃতির। ফলে সে আশ্রয় নেওয়া বাড়িটিতে একটি তুলসী গাছের সন্ধান পেয়ে সেটি উপড়ে ফেলতে চায়। হিন্দুয়ানি নিদর্শনের প্রতি তার এ ঘৃণা তৎকালীন সমাজের মানুষের সাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরে।

প্রকৃতির প্রতি মমতা : মোদাব্বের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চাইলেও অন্যরা উৎসাহ দেখায় না; বরং তুলসী গাছের উপকারিতা বর্ণনা করে তারা গাছটির প্রতি যত্ন নিতে শুরু করে। প্রকৃতির প্রতি মমতার কাছে হার মানে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটিতে তুলসী গাছটি যেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি চিত্রও এ গাছটিকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। মতিনের কল্পনায় ভেসে ওঠে এক গৃহকর্ত্রীর ছবি– যে দিনান্তে এ তুলসীতলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাত। আজ হয়তো সে আশ্রয়ের সন্ধানে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে।

তৎকালীন সমাজের বামপন্থি রাজনীতি : তৎকালীন সমাজে বামপন্থি রাজনীতির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু ব্রিটিশশাসিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কোনো অবদান রাখতে না পারায় তাদের প্রতি মানুষ আস্থাশীল থাকতে পারেনি। বামপন্থি কর্মী মকসুদ যেন তারই প্রতিনিধি।

উদ্বাস্তু জীবনের প্রতিচ্ছবি : এ গল্পে একটি তুলসী গাছ যেন উদ্বাস্তু জীবনের প্রতীক। অযত্ন-অবহেলায় তখনকার উদ্বাস্তুরা যেন আলোচ্য গল্পের তুলসী গাছটির মতোই অসহায়, আশ্রয়হীন, যত্নহীন হয়ে পড়ে। শুষ্কপ্রায়, মৃতপ্রায় তুলসী গাছটি যেন সেইসব অসহায় মানুষের প্রতীক।

উপসংহার : সমকালীন বাস্তবতায় আশ্রয়হীন উদ্বাস্তু মানুষের বাস্তবানুগ ছাপচিত্র 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি। লেখক এ গল্পে জীবনের গভীর তাৎপর্যকে ইঙ্গিতময় করে প্রকাশ করেছেন তার নিজস্ব শৈল্পিক ভঙ্গিতে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেশবিভাগে বিপন্ন মানবতার বাস্তবচিত্র অঙ্কনে পারঙ্গমতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন এ গল্পটিতে।

▸▸ প্রশ্ন : ২৬ ॥ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে একের পর এক যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটেছে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দাও।

উত্তর॥ উপস্থাপনা : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্য জগতের দেদীপ্যমান অমর কথাশিল্পী, বহুমুখী প্রতিভাবান লেখক। তিনি শুধু একজন সফল ঔপন্যাসিকই নন; সার্থক ছোটগল্পকার হিসেবেও সমান খ্যাতিমান। 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গ্রন্থ থেকে উৎকলিত হয়েছে। এ গল্পে লেখক আপন দক্ষতায় বেশকিছু নাটকীয় ঘটনা একের পর এক বুনন করেছেন।

নাটকীয় ঘটনাসমূহ

প্রারম্ভিক নাটকীয়তা : গল্পের শুরুটাই নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। যেমন– 'ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা।' এ রকম নাটকীয় বর্ণনাগুণে সমৃদ্ধ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পটি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করে।

পরিত্যক্ত বাড়ি দখল : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরপরই কয়েকজন উদ্বাস্তু মুসলমান নাটকীয়ভাবে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে। কলকাতার ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাসে অভ্যস্ত এসব উদ্বাস্তু এরকম খোলামেলা একটি বাড়ি দখল করতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হয়।

বাড়ি নিয়ে স্বপ্ন : পরিত্যক্ত বাড়িটি যারা দখল করেছে তাদের একজন মতিন। সে স্বপ্নবিলাসী মানুষ। সে ভাবে, এতবড় বাড়িটাতে খালি জায়গায় বাগান করা যেতে পারে। মৌসুমী ফুল, গন্ধরাজ, হাসনাহেনা, গোলাপের বাগান করলে মন্দ হতো না। যাতে অফিস থেকে ফিরে সেখানে বসে খোশগল্প করা কিংবা সন্ধ্যারাতে জোছনা উপভোগ করা যায়।

নাটকীয় ঘটনার নায়কেরা : পরিত্যক্ত বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছিল অনেকেই। যেমন– মতিন, আমজাদ, কাদের, বদরুদ্দীন, ইউনুস, হাবিবুল্লাহ, মকসুদ, মোদাব্বের প্রমুখ। এদের নিয়েই আবর্তিত হয়েছে গল্পের কাহিনি। কাহিনির মূলকেন্দ্রে রয়েছে একটি তুলসী গাছ।

তুলসী গাছের সন্ধান : রোববার সকালে নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজন করার সময় উঠানের প্রান্তে রান্না ঘরের পেছনে ঠেকানো আধহাত উঁচু ইটের তৈরি মঞ্চের ওপর একটি তুলসী গাছের অস্তিত্ব আবিষ্কার করে মোদাব্বের।

গাছটিকে ঘিরে নাটকীয়তা : মোদাব্বের গাছটি দেখার পরপরই 'হিন্দুয়ানি' উপকরণ হওয়ার কারণে সেটি উপড়ে ফেলতে চায়, কিন্তু নিজে সক্রিয় হয় না। মতিনের মনে কাজ করে মমতাময় স্মৃতিকাতরতা। যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়? ইউনুসের সর্দি সর্দি ভাব। সে বলে– "থাক না এটা। আমরা তো তা পূজা করতে যাচ্ছি না; বরঞ্চ ঘরে তুলসী গাছ থাকা ভালো। সর্দি-কফে তার পাতার রস বড়ই উপকারী।" এনায়েত মৌলবি মানুষ, সেও তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে আগ্রহী নয়। এভাবে বেঁচে যায় তুলসী গাছটি।

বাড়িতে পুলিশের আগমন : উদ্বাস্তুদের দখল করা পরিত্যক্ত বাড়িটিতে হঠাৎ আগমন ঘটে পুলিশের। এসেই নোটিশ দেয়– চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ছাড়তে হবে সবাইকে। এটাই সরকারের হুকুম বলে তারা জানায়।

বাড়ি দখলকারীদের প্রতিক্রিয়া : বাড়ি ছাড়ার কথা শুনে প্রথমে তাদের মাথায় খুন চেপে বসে, তবে ঠান্ডা হতেও দেরি লাগে না। তখন তাদের সবার একটাই চিন্তা– কোথায় যাবে

তারা? পরদিন মোদাব্বের এসে জানায়, বাড়িতে আরও সাতদিন থাকা যাবে। তখন তারা কিছুটা স্বস্তি পায়, কিন্তু পুরাপুরি দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারেনি।

বাসিন্দা পরিবর্তনের প্রভাব : এক হিন্দু পরিবারই একসময় বাড়িটির মালিক ছিল। যাদের স্মৃতিচিহ্ন একটি তুলসী গাছ। তারা যখন ছিল তখন এ তুলসীতলে প্রতিদিন সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বলত। তারা উদ্বাস্তু হওয়ার সাথে সাথে তুলসী গাছটিও অযত্নে অবহেলায় শুকিয়ে যায়। আবার যখন মুসলমান উদ্বাস্তুরা বাড়িটি দখল করে, তখন তাদের কারো কারো যত্নে আবার সতেজতা ফিরে পায়। কিন্তু সরকার বাড়িটির দখল নিলে গাছটির জীবন আবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, যেভাবে পড়েছে উদ্বাস্তুদের জীবন। মানুষের জীবনের নাটকীয় পরিবর্তনের সাথে তুলসী গাছটিও একাত্ম হয়ে ওঠে।

সর্বশেষ কাহিনি : অবশেষে উদ্বাস্তুরা বাড়িটি ত্যাগ করে চলে যায়। যেমনি ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমনি ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। খালি বাড়িটিতে রইল কেবল কিছু স্মৃতিচিহ্ন– খবরের কাগজের ছেঁড়া পাতা, সিগারেটের টুকরো, কাপড় ঝুলানোর পুরানো দড়ি, একটি ছেঁড়া জুতার গোড়ালি। অবশেষে তুলসী গাছটিও আবার শুকিয়ে আসে।

উপসংহার : দেশ বিভাগের নাটকীয় রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের শিকার হয় অসহায় মানুষ। তারা নিজভূমে পরবাসী হয় শুধু ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে বিপন্ন হয় সাধারণ মানুষের জীবন। নাটকীয় ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে লেখক কুশলী হাতে সেসব অসহায়-উদ্বাস্তু মানুষের প্রতীক হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন একটি তুলসী গাছকে।

▸▸ প্রশ্ন : ২৭ ॥ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'কে সার্থক ছোটগল্প বলা যায়? এ ব্যাপারে তোমার মতামত যুক্তিসহ লিপিবদ্ধ কর।
অথবা, ছোটগল্প হিসেবে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী'র শিল্পমূল্য ও সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' বাংলা সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, অমর কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর এক অসাধারণ সৃষ্টি। গল্পটি তার 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গল্পগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। গল্পটিকে সার্থক ছোটগল্প বলা যায় কি না, নিচে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

ছোটগল্পের সংজ্ঞা : ছোটগল্প শব্দটিকে দুটি অংশে ভাগ করা যায়, একটি 'ছোট' অপরটি 'গল্প'। গল্প সম্পর্কে তেমন কোনো মতভেদ না থাকলেও ছোটগল্প নিয়ে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে সাহিত্য সমালোচক ও সাহিত্যিকদের কয়েকটি সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো–

ক. ছোটগল্পের সংজ্ঞায় H. G. Wells বলেন, "ছোটগল্প ১০ হতে ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত।"
খ. E. A. Poe বলেন, "ছোটগল্প তাকেই বলে, যে গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়।"
গ. প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক W. H. Hudson বলেন– A short story must contain only one theme informing idea and that idea must be worked out to its logical conclusion with absolute singleness of mind.
ঘ. প্রমথ চৌধুরীর মতে, "আকৃতিতে ছোট হলেই ছোটগল্প হবে না। তাকে ছোট হতে হবে এবং সর্বোপরি গল্প হতে হবে।"
ঙ. Rudyard Kipling -এর মতে, "ছোট গল্প হচ্ছে চোরা লণ্ঠনের আলোর মতো। এক সুনির্দিষ্ট বস্তুর ওপর তার আলো কেন্দ্রীভূত থাকবে। অনাবশ্যক প্রাপ্তির বিষয়কে তা কিছুতেই ভারাক্রান্ত করে তুলবে না।"

ছোটগল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতার ভাষায় বলেছেন–

ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

সুতরাং ছোটগল্পের আয়তন সম্পর্কে কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এর আরম্ভ যেমন আকস্মিক, শেষও তেমনি ব্যঞ্জনাময়। ছোটগল্পের ভাষা সহজ, গতিশীল। একটি চরিত্রের ইঙ্গিতময় প্রকাশে ছোটগল্প অনন্য। এসব দৃষ্টিতে বিচার করলে 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের শিল্প-সার্থকতা লক্ষ করা যায়।

গল্পের সার্থকতা/শিল্পমূল্য বিচার

গল্পের বিষয়বস্তু : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়। হিন্দুদের জন্য ভারত, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। ভারত থেকে মুসলমানরা পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ভারতে পাড়ি জমায়। এসব মানুষ দেশভাগের রাজনীতির শিকার হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে। আলোচ্য গল্পটি উদ্বাস্তু জীবনের বেদনাঘন জলছবি।

কলকাতা থেকে ঢাকায় আগত কয়েকজন মুসলমান উদ্বাস্তু হিসেবে থাকার জন্য একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে। অবশ্য জোর করে নয়, খালি পেয়ে নিজেদের আবাসন সমস্যার সমাধান হিসেবে তারা এ পথ বেছে নেয়। আপাতত সমস্যার সমাধানে ওরা কয়েকজন– মতিন, মোদাব্বের, হাবিবুল্লাহ, মকসুদ, কাদের, আমজাদ মিলেমিশে থাকে, খায় এবং আনন্দে মেতে ওঠে।

এরই মাঝে একদিন মোদাব্বেরের চোখে পড়ে একটি তুলসী গাছ। তুলসী গাছটি হিন্দুয়ানি প্রতীক হিসেবে সেটিকে উপড়ে ফেলতে চায় সে, কিন্তু অন্য কেউ তাতে সায় দেয় না। মতিন একটু কল্পনাপ্রবণ। সে কল্পনায় দেখতে পায়, কিছুদিন আগেও এই তুলসী গাছের নিচে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালানো হতো। আজ কোথায় সে হিন্দু গৃহিণী? উদ্বাস্তু হয়ে হয়তো কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবার অজান্তে তাদেরই একজন তুলসী গাছের যত্ন নেওয়া শুরু করে। ফলে তুলসী গাছটা সতেজ শ্যামল হয়ে ওঠে।

একসময় পরিত্যক্ত বাড়িটি রিকুইজিশন করে সরকার। বের করে দেওয়া হয় উদ্বাস্তুদের। অনিশ্চিত জীবনের পথে পা বাড়ায় তারা। একইভাবে অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে তুলসী গাছটিও। এভাবে জীবনের গভীর তাৎপর্য ইঙ্গিতময় করে প্রকাশ করেছেন লেখক।

গল্পের নাটকীয়তা : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে নাটকীয় মোড় রয়েছে। মূলত ছোটগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে গল্পটির শুরুতে ও শেষে আছে চমৎকার নাটকীয়তা। যেমন শুরুতে আছে– 'ধনুকের মতো বাঁকা কংক্রিটের পুলটির পরেই বাড়িটা।' শেষে আছে– 'যেমনি ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতোই উধাও হয়ে যায়।'

চরিত্রগুলোর সজীব সক্রিয়তা : এ গল্পে অনেকগুলো চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, কিন্তু সবক'টি চরিত্রই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এবং চরিত্রগুলো অহেতুক ভিড় করে ছোটগল্পের

মূল রসকে ব্যাহত করেনি; বরং চঞ্চল প্রাণময়তায় সাবলীল গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে গল্পকে সার্থক করে তুলেছে।

ভাষাশৈলী : ভাষাশৈলীর বিচারেও এটি একটি অসাধারণ ছোটগল্প। ভাব, ভাষা, শব্দালংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সংলাপ এবং তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাবোধ গল্পটিকে সুখপাঠ্য ও সুন্দর করেছে।

উপসংহার : ছোটগল্পের যতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তার সবগুলোই 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে রয়েছে। তাই এটিকে একটি সার্থক ছোটগল্প বলা যায় নিঃসন্দেহে। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্পটির ভাষা, চরিত্র সৃষ্টি এবং কাহিনির উপস্থাপনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ২৮ ॥ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সাহিত্যে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ নামকরণের মধ্য দিয়েই কোনো রচনার আলোচ্য বিষয়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। মনোরম ও আকর্ষণীয় নামের ছোঁয়ায় পাঠকের মন আলোড়িত হয়, আগ্রহ জন্মে রচনাটি পড়ার। এসব কারণে যে-কোনো গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ইত্যাদির নামকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব দিক বিবেচনা করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর অসাধারণ ছোটগল্প 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের নামকরণ করেছেন।

সাহিত্যে নামকরণের রীতি : বলা হয়– Literature is the mirror of life অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মাধ্যমেই সাহিত্যকর্মের মূলভাব পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এজন্য প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অনেক সম্পদের চেয়েও উত্তম। আলোচ্য বিষয়ের সাথে ন্যূনতম সামঞ্জস্য না থাকলে সাহিত্যের নামকরণ সার্থক হয় না। সুতরাং একটি শিল্পকর্মকে সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি যথাযথ মেনে চলতে হয়।

নামকরণের ভিত্তি : বিভিন্ন রচনা, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদির নামকরণের মাধ্যমে এর অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যথা–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- নায়ক-নায়িকার নাম
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- স্থান বা কাল।

আলোচ্য গল্পের নামকরণের প্রতিপাদ্য : 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পের নামকরণটি রূপক। এ রূপকের অন্তরালে গল্পকার একটি অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপস্থাপন করেছেন। তুলসী গাছ এখানে রূপক সাংকেতিক অর্থে প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে।

গল্পের বিষয়বস্তু : ব্রিটিশশাসিত ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট। দেশ স্বাধীন হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে (হিন্দুদের জন্য ভারত, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান)। ঢাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। দেশ বিভাগের পরপরই পাকিস্তানে বসবাসরত হিন্দুরা ভারতে আর ভারতে বসবাসরত মুসলমানরা কেউ পশ্চিম পাকিস্তানে কেউ বা পূর্ব পাকিস্তানে পাড়ি জমায়। এরকম উদ্বাস্তুদের কয়েকজন কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি দখল করে বসবাস শুরু করে।

মোদাব্বের, মতিন, মকসুদ, আমজাদসহ কয়েকজন উদ্বাস্তু একসঙ্গে থাকে, খায়দায়, গান গায়। সুখ-দুঃখের আনন্দময় জীবনের আসর পাতে একসঙ্গে নিরাশ্রয় এ মানুষগুলো। একদিন মোদাব্বের বাড়িতে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার করে। তুলসী গাছটি হিন্দুয়ানি চিহ্ন হিসেবে উপড়ে ফেলতে চায় সে, কিন্তু অন্যদের হস্তক্ষেপে তা আর উপড়ে ফেলা হয় না; বরং তাদের মধ্যে একজন গাছটির যত্ন নেয়। গাছটির প্রতি এবং এ বাড়িটি ফেলে যাওয়া হিন্দু পরিবারের প্রতি মমতায় ভরে ওঠে ওদের মন। একসময় পুলিশ এসে বাড়িটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করে। তখন তুলসী গাছটিও যত্ন না পেয়ে শুকিয়ে আসে। গাছটি হয়ে ওঠে হাজার হাজার আশ্রয়হীন, যত্নহীন উদ্বাস্তু মানুষের প্রতিচ্ছবি।

নামকরণের সার্থকতা : বেঁচে থাকার জন্য আশ্রয় দরকার, সেবা দরকার। উদ্বাস্তু জীবনে যা সম্ভব নয়। হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের প্রতীক তুলসী গাছটি রূপক অর্থে গল্পের প্রধান অংশ দখল করে নিয়েছে। তুলসী গাছের মতোই উদ্বাস্তুরা দেশভাগের পর অবহেলিত ও নিগৃহীত হয়েছে। গল্পকার তুলসী গাছের মাধ্যমে সমাজের একটি বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন নির্মোহ চিত্তে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, আলোচ্য গল্পের নামকরণ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' যথার্থ ও সঠিক হয়েছে।

উপসংহার : আলোচ্য গল্পে তুলসী গাছটি প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, নান্দনিকভাবে বেড়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সমগ্র গল্পের কাহিনি ও বক্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু। তাই গল্পটির নামকরণ 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' কৌতূহলোদ্দীপক, চিত্তাকর্ষক, আকর্ষণীয়, যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

পথ জানা নাই

শামসুদ্দীন আবুল কালাম [১৯২৬-১৯৯৭ খ্রি.]

▸▸প্রশ্ন : ২৯ ॥ বিংশ শতাব্দীর বণিক-সভ্যতা একটি নিস্তরঙ্গ সরল গ্রামকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছে তা শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পথ জানা নাই' গল্প অবলম্বনে আলোচনা কর। [ফা. প. ১৯৯০]

অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্প অনুসরণে তথাকথিত নগর-সভ্যতার ভয়াবহ দিকগুলোর একটি চিত্র অঙ্কন কর। [ফা. প. ২০০৩]

অথবা, 'দাম চড়িল সব জিনিসের কমিল কেবল জীবনের' –এ উক্তির আলোকে 'পথ জানা নাই' গল্পের মূলকথা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

অথবা, 'পথ জানা নাই' গল্পে শামসুদ্দীন আবুল কালাম বর্তমান নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। –উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৯৯]

উত্তর || উপস্থাপনা : মননশীল কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' গল্পটি বহুল আলোচিত একটি ছোটগল্প। গল্পটিতে বিংশ শতাব্দীর বণিক-সভ্যতা একটি নিস্তরঙ্গ শান্ত গ্রামকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছে তার বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। 'মাউলতলা' নামক একটি অনুন্নত পল্লিগ্রামের পটভূমি নিয়ে এটি রচিত। বিশ শতকের ইউরোপীয় বণিক-সভ্যতা বিশ্বের অনেক শান্ত, নিবিড় অঞ্চল যেমন গ্রাস করেছে, তেমনি শহর থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন এই 'মাউলতলা' গ্রামেও এসেছে তার থাবা। নিচে এ বিপর্যয়ের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো :

গল্পের পটভূমি : দক্ষিণ বাংলার একটি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা গ্রাম 'মাউলতলা'। এ গ্রামকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে 'পথ জানা নাই' গল্পের পটভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ গ্রামটি ছিল ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়। বহির্জগতের সাথে যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন

ছিল এ গ্রামটির। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মাধ্যমে অনেক রাজশক্তির বিলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু মাউলতলার নিস্তরঙ্গ জীবনে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। সেখানে জীবনযাত্রার একান্ত নিজস্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ রীতি-পদ্ধতি বিরাজমান ছিল।

গহুরালিদের জীবনে নগর-সভ্যতার ছোঁয়া : জোনাবালি মাউলতলা গ্রামের সন্তান। তরুণ বয়সে সে কীভাবে যেন শহরে গিয়েছিল। চল্লিশ বছর পর গ্রামে ফিরে আসার সময় নিয়ে আসে অনেক সম্পদ ও ঐশ্বর্য। মাউলতলার নিস্তরঙ্গ জীবন তাকে ব্যথিত করে। তাই উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে গ্রামের মানুষের মনে স্বপ্নের বীজ বপন করে সে। অনেক বাধা-বিপত্তির পর গ্রাম এবং শহরের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে একটি সড়ক নির্মিত হয়। এভাবে গ্রামের কৃষক গফুর আলী ওরফে গহুরালিদের জীবনে লাগে নগর-সভ্যতার ছোঁয়া।

উৎকট নগর-সভ্যতা : মাউলতলা গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর একে একে এ গ্রামের অধিকাংশ পুরুষই শহর ঘুরে আসে। ঘুরে আসে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সহজ-সরল গ্রামীণ কৃষক গহুরালিও। শহরের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, ঘরবাড়ি এবং শহরবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি দেখে গহুরালি শহরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার একই সাথে ব্যথিত হয় শহরের মানুষের মধ্যে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার অভাব অবলোকন করে। এমনকি এক বারাঙ্গনার চটুল আহ্বানে এগিয়ে গিয়ে প্রতারণার শিকার হয় গহুরালি। মূলত শহর-সভ্যতা এরকমই মেকি, ছলনা আর প্রতারণায় ভরপুর।

গ্রামীণ জীবনে জটিলতা : মাউলতলার শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনে নানা জটিলতার আগমন ঘটে নবনির্মিত সড়কের পথ ধরে। সাদামাটা গ্রামীণ জীবনে নানা কূটবুদ্ধির চর্চা হতে থাকে। মামলা-মকদ্দমা, খুন-জখম শুরু হয়। হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। লেখকের ভাষায়, "এই পথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানীতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিল কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল। এই সড়কেরি চারিদিকে প্রচুর গলি-ঘুঁজিরও সৃষ্টি হইল। অনেক বাঁক, অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল।"

মাউলতলা ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে চালের দাম বাড়ে। শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। লেখকের ভাষায়, "চালডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার।"

বিপর্যস্ত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা : মাউলতলার সাথে শহরের সংযোগ রক্ষাকারী সড়কের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব প্রবেশ করল মাউলতলা গ্রামে। মাউলতলার শান্ত নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনে উন্নয়নের চেয়ে বেশি বিপর্যয় সৃষ্টি হলো, খুন, জখম, মারামারি, মামলা-মকদ্দমা হয়ে দাঁড়াল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মন্বন্তরের ফলে আর্থিক দিক দিয়ে মাউলতলা হলো বিপর্যস্ত।

নৈতিক বিপর্যয় : মাউলতলা গ্রাম শহরের ছোঁয়ায় নৈতিক দিক থেকেও বিপর্যস্ত হলো। গ্রামে আধুনিকতার নামে শুরু হলো ঘুষ, দুর্নীতি, অনাচার। এরই ফলে শহরের বাবুর্চিখানার কর্মচারী লুৎফরের সাথে উধাও হয়ে যায় আসগরউল্লাহর সোমত্ত কন্যা কুলসুম। যুদ্ধফেরত ইউসুফ বয়ে আনে দুরারোগ্য যৌনব্যাধি, তাতে মৃত্যুবরণ করে তার স্ত্রী। এভাবে নানাবিধ নৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় মাউলতলার সহজ-সরল নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন।

অন্তরে-বাইরে নিঃস্ব গহুরালি : তরিতরকারি, কাঠ, মুরগি ইত্যাদি নানা জিনিস কিনতে মিলিটারির দালাল আসে গ্রামে। এদের একজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে গহুরালির। গহুরালি মনে করেছিল, এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে মন্বন্তরের সময় তার অন্নাভাব দূর হবে।

কিন্তু অন্নাভাব তো দূর হলোই না; বরং একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল তার জীবনসঙ্গিনী হাজেরা নেই। সে মিলিটারির দালালের হাত ধরে পালিয়ে গেছে শহরের পথে। গহুরালি মন্বন্তরে নিঃস্ব হয়েছিল বাইরে, এবার হলো অন্তরে।

উপসংহার : নগর-সভ্যতা মানুষকে সাময়িক ধন-সম্পদ, সুখ-ঐশ্বর্য দিলেও নৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। শহুরে নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়া গ্রামীণ শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে। সমাজ-সচেতন গল্পকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ চিরন্তন সত্যই তার নিপুণ লেখনীতে পরিস্ফুট করেছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ৩০ ॥ 'পথ জানা নাই' গল্পের আলোকে গহুরালীর চরিত্র বিশ্লেষণ কর।
[ফা. প. ১৯৯৭, '১৩, '১৬, '১৯]

অথবা, "মন্বন্তরে গহুরালী নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে"– 'পথ জানা নাই' গল্প অবলম্বনে অন্তরে-বাইরে নিঃস্ব গহুরালীর জীবন-যন্ত্রণার চিত্র অঙ্কন কর।
[ফা. প. ২০০১, '০৫, '১০]

অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালামের 'পথ জানা নাই' গল্পের গহুরালীর চরিত্র বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ১৯৯৫]

অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের প্রধান বা কেন্দ্রীয় চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, প্রথিতযশা গল্পকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গফুর আলী ওরফে গহুরালি। লেখক অত্যন্ত নিপুণ শৈল্পিক তুলিতে গহুরালির চরিত্র বিকশিত করেছেন আলোচ্য গল্পে। একই সাথে তার জীবন-যন্ত্রণার আলেখ্যও রচনা করেছেন।

গহুরালির চরিত্র

১. **গহুরালির পরিচয় : শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গহুরালি দক্ষিণ বাংলার এক অনুন্নত গ্রাম মাউলতলার অধিবাসী। নিজের সামান্য জমিজমা চাষ করে সে। পরিবারে তার একমাত্র জীবনসঙ্গিনী হাজেরা ছাড়া আর কেউ নেই।**

২. **অশিক্ষিত :** গহুরালি অশিক্ষিত এক গ্রাম্য কৃষক। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়নি সে। প্রাচীনকালের চিন্তা-চেতনাতেই তার জীবন সীমাবদ্ধ ছিল। শহর সম্পর্কে সে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। নতুন সড়ক নির্মাণে তার জমির প্রয়োজন হলে সে জোনাবালিকে উত্তর দিয়েছিল, "মোডে পাঁচকুড়া আমার ভুঁই, হের দুই কুড়াই সড়কে খাইলে আমি খামু কী?"

৩. **যুক্তি অনুসারী :** গহুরালি সড়ক নির্মাণে জমি না দিতে চাইলে জোনাবালি তাকে নতুন সড়ক নির্মাণে কী কী সুবিধা আছে, সেসব যুক্তি প্রদর্শন করলে সে সহজেই রাজি হয়ে যায়।

৪. **মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী :** নতুন জীবনের প্রত্যাশায় গহুরালি মনে মনে ঠিক করে রাস্তার জন্য জমি দেবে। এ ব্যাপারে সে স্ত্রীকেও বোঝায়, "অতোশতো ভাবতে গেলে কী আর দ্যাশের-দশের কাম হয়? সকলেরই মঙ্গলের জন্য যে কাম তার লইগ্যা সকলেরই কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।"

৫. **নতুন জীবনের প্রত্যাশী :** জোনাবালির যুক্তি-পরামর্শে প্রভাবিত হয়ে এক নতুন জীবনের প্রত্যাশায় গহুরালির মনপ্রাণ ভরে ওঠে। তার মনে হলো– "তাহার চেয়ে সম্মুখে যে নয়া-জীবনের হাতছানি তাহাকে বরণ করিয়াই দেখুক না এবার।"

৬. **ভাগ্য পরিবর্তন প্রত্যাশী :** হতদরিদ্র এক পিতার সন্তান ছিল জোনাবালি, কিন্তু সে শহরে গিয়ে নিজের অনেক উন্নতি করেছে। অনেক ধনসম্পদের মালিক হয়েছে দরিদ্রের ছেলে হয়ে যদি জোনাবালি ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে তাহলে সে (গহুরালি) পারবে; এ প্রত্যাশায় গহুরালি সড়কের জন্য জমি দান করে।

৭. **সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন :** গহুরালি সড়কের মাধ্যমে এক নতুন, উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনে স্বপ্নে বিভোর ছিল। তার স্বপ্নের দিগন্ত– "সবুজ বনানীর সীমারেখায়, কাশবনে উদ্দাম ইশারায় সে দিগন্ত যেন কোন সুদূর স্বপ্ন-রাজ্যে হারাইয়া গিয়াছে।" স্ত্রীকে সে বোঝাল– "এ কী কেবল সড়ক! একটা নোতুন জীবনেরো রাস্তা।"

৮. **শহর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা :** জোনাবালির প্রচেষ্টায় নতুন সড়ক নির্মিত হওয়ার পর একে একে গ্রামের সব পুরুষই শহর ঘুরে এলো। গহুরালিও ঘুরে এল। শহরবাসীর আত্মকেন্দ্রিকতা, উগ্র আধুনিকতা ও প্রাণহীনতা তাকে মর্মাহত করে। শহরবাসীর দৃষ্টি সম্পর্কে তার অভিমত হলো, "সে দৃষ্টিতে মায়া নয়, মমতা নয়, আত্মীয়তার শুভ ইঙ্গিতও নয়, শুধু তাচ্ছিল্যমাখা বলিয়াই বোধ হইয়াছে তাহার।"

৯. **সহজ-সরল :** গহুরালি গ্রামের সহজ-সরল এক কৃষক। সরলতা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জোনাবালির কথায় সহজেই সে নিজের পাঁচকুড়া জমি থেকে দুই কুড়া দান করে দেয় সড়ক নির্মাণের জন্য। শহরে গিয়ে সরল বিশ্বাসে বারাঙ্গনা কর্তৃক প্রতারণার শিকার হয়। মিলিটারির দালালকে বিশ্বাস করে স্ত্রী হাজেরাকে হারায়।

১০. **পরিশ্রমী :** অনেক পরিশ্রমী লোক ছিল গহুরালি। স্ত্রী-সংসার নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করার জন্য সে তরিতরকারি শহরে নিয়ে বিক্রি করে। তার পরিশ্রমের ফলেই মোটামুটি সচ্ছলতা ফিরে আসে পরিবারে। এমনকি খড়ের ঘরে টিনের চাল উঠাতে সক্ষম হয়।

১১. **বিশ্বাসপ্রবণ :** সহজ-সরল মনের গহুরালি সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাউলতলা গ্রাম যখন মন্বন্তরে বিপর্যস্ত, তখন মিলিটারীর ঠিকাদারের এক দালালের সাথে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে গহুরালির। তার মাধ্যমে আয়-উপার্জনের একটা আশাও ছিল তার সরল মনে। তার এ বিশ্বাসপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে ঠিকাদারের দালাল তার প্রিয়তমা স্ত্রী হাজেরাকে ফুসলিয়ে শহরে নিয়ে যায়। মন্বন্তরে গহুরালি বাইরে নিঃস্ব হয়েছিল, এবার নিঃস্ব হলো অন্তরে।

উপসংহার : গহুরালি সহজ-সরল, বিশ্বাসপ্রবণ গ্রাম্য নিরক্ষর কৃষকদের প্রতিনিধি। তার চোখে ছিল নতুন জীবনের স্বপ্ন, কিন্তু নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা তার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। স্বপ্নভঙ্গের পাশাপাশি অন্তরে-বাইরে নিঃস্ব হয়েছে গহুরালি। গহুরালির জীবনযন্ত্রণার একটি নিখুঁত ভাষাচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে 'পথ জানা নেই' গল্পে।

⏩ প্রশ্ন : ৩১ ॥ শামসুদ্দীন আবুল কালাম রচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের মূল বক্তব্য, বিষয়বস্তু/সার-সংক্ষেপ তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর || উপস্থাপনা : 'পথ জানা নাই' নামক অসাধারণ ছোটগল্পটি বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত আলোচ্য গল্পে নগর-সভ্যতার কুপ্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উল্লেখপূর্বক এর প্রতি তীব্র কটাক্ষ ও অনীহা প্রকাশ করা হয়েছে।

'পথ জানা নাই' গল্পের মূল বক্তব্য

১. **গল্পের পটভূমি মাউলতলা :** দক্ষিণ বাংলার একটি সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা গ্রাম মাউলতলা। এ গ্রামটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে 'পথ জানা নাই' গল্পের কাহিনি।

২. **মাউলতলার সহজ-সরল জীবন :** এ মাউলতলা গ্রামটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ছিল বহির্জগতের সাথে সম্পর্কশূন্য মধ্যযুগীয় ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়। রাজনৈতিক বহু উত্থান-পতনের মাধ্যমে রাজশক্তির বিলুপ্তি ঘটেছিল, কিন্তু মাউলতলার নিস্তরঙ্গ জীবনে তার কোনো প্রভাব পড়েনি।

৩. **নগর-সভ্যতার স্পর্শ :** তরুণ জোনাবালি মাউলতলা গ্রামের সন্তান। সে তরুণ বয়সে ভাগ্যান্বেষণে শহরে পাড়ি জমায়। চল্লিশ বছর পর গ্রামে ফিরে আসে। সাথে নিয়ে আসে অনেক ধন-সম্পদ এবং নগর-সভ্যতার ছোঁয়া। সে সকলের সহযোগিতায় গ্রামের উন্নয়নকল্পে গ্রাম ও শহরের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে একটি সড়ক নির্মাণ করে। এভাবে গ্রামের কৃষক গফুর আলি ওরফে গহুরালিদের জীবনে লাগে শহরের ছোঁয়া বা নগর সভ্যতার স্পর্শ।

৪. **নগর-সভ্যতার উপকরণ :** শহরের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর একে একে মাউলতলা গ্রামের অধিকাংশ পুরুষই শহর ঘুরে আসে। ঘুরে আসে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সহজ-সরল গ্রামীণ কৃষক গহুরালিও। শহরের রাস্তাঘাট, দোকানপাট, বাড়িঘর এবং শহরবাসীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি আকৃষ্ট করে গহুরালিকে। আবার একই সঙ্গে সে ব্যথিত হয় শহরের মানুষের সহানুভূতিহীনতা ও আন্তরিকতার অভাব অবলোকন করে। এমনকি এক বারাঙ্গনার মুগ্ধকর আহ্বানকে আন্তরিকতা ভেবে প্রতারণার শিকার হয় গহুরালি। তখন সে ভাবে, মূলত উৎকট নগর সভ্যতার প্রধান উপকরণ হলো প্রতারণা।

৫. **গ্রামীণ জীবনে জটিলতার আগমন :** মাউলতলার শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনে নানা জটিলতার আগমন ঘটে নবনির্মিত সড়ক ধরেই। সাদামাটা গ্রামীণ জীবনে নানা কূটবুদ্ধি চর্চা হতে থাকে। মামলা-মকদ্দমা, খুন-জখম শুরু হয়, হিংসা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়। লেখকের ভাষায়, "এই পথে শহরের ফৌজদারী দেওয়ানীতেও ছুটাছুটি শুরু হইল ধীরে ধীরে। শাদামাটা সরল জীবনে আসিতে লাগিল কূটবুদ্ধি আর কৌশলের দড়িজাল। এই সড়কের চারিদিকে প্রচুর গলি-ঘুঁজিরও সৃষ্টি হইল। অনেক বাঁক, অনেক মোড়। মাউলতলা জটিল হইয়া উঠিল।"

৬. **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মাউলতলা :** ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। চাল-ডালের দাম বাড়ল। শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। লেখকের ভাষায়–"চাল-ডালের দাম বাড়িল। দাম চড়িল সব জিনিসের কমিল কেবল জীবনের। ধীরে ধীরে এই সড়ক বাহিয়াই আসিল মন্বন্তর। আসিল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজার আর দুর্নীতির উত্তাল জোয়ার।"

৭. **বিপর্যস্ত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা :** শহরের সাথে সংযোগকারী সড়কের মাধ্যমে নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব প্রবেশ করল মাউলতলা গ্রামে। মাউলতলার শান্ত সুনিবিড় নিস্তরঙ্গ জীবনে লাগল উন্নয়নের চেয়ে বেশি বিপর্যয়ের স্পর্শ। খুন, মারামারি, মামলা-মকদ্দমা হয়ে দাঁড়ালো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

৮. **নৈতিক বিপর্যয় :** মাউলতলা নৈতিক দিক থেকেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। গ্রামটিতে আধুনিকতার নামে শুরু হলো ঘুষ, দুর্নীতি, বেহায়াপনা, রোগব্যাধি ও অনাচার। যেমন– শহরের বাবুর্চিখানার কর্মচারী লুৎফরের সাথে উধাও হয়ে যায় আসগরউল্লাহর

সোমত্ত মেয়ে কুলসুম। গহুরালির স্ত্রী হাজেরা পালিয়ে যায় এক মিলিটারির দালালের হাত ধরে। যুদ্ধ ফেরত ইউসুফ বয়ে আনে দুরারোগ্য যৌনব্যাধি, তাতে মৃত্যুবরণ করে তার স্ত্রী। এভাবে নানাবিধ নৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয় মাউলতলা।

৯. **অন্তরে-বাইরে নিঃস্ব গহুরালি :** মিলিটারির দালালরা তরিতরকারি, কাঠ, মুরগি ইত্যাদি কিনতে আসে গ্রামে। এদেরই একজনের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে গহুরালির। গহুরালি মনে করেছিল, এর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখলে মন্বন্তরের সময় তার অন্নাভাব দূর হবে, কিন্তু অন্নাভাব তো দূর হলোই না; বরং একদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে দেখল, তার জীবনসঙ্গিনী হাজেরা নেই। সে মিলিটারির দালালের হাত ধরে পালিয়ে গেছে শহরের পথে। গহুরালি মন্বন্তরে নিঃস্ব হয়েছিল বাইরে, এবার হলো অন্তরে।

উপসংহার : নগর-সভ্যতা মানুষকে ধন-সম্পদ, সুখ-ঐশ্বর্য দিলেও নৈতিক ও মানবিক উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি; বরং নাগরিক সভ্যতার ছোঁয়া গ্রামীণ শান্তিপূর্ণ জীবনকে বিপর্যস্ত করে দেয়। সমাজ সচেতন গল্পকার শামসুদ্দীন আবুল কালাম এ চিরন্তন সত্যই তুলে ধরেছেন 'পথ জানা নাই' ছোটগল্পে।

» প্রশ্ন : ৩২ ॥ 'পথ জানা নাই' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।
অথবা, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' গল্পের নামকরণের সার্থকতা যাচাই কর।

উত্তর || উপস্থাপনা : শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' একটি বিখ্যাত ছোটগল্প। লেখক এ গল্পের একটি সুন্দর নামকরণ করেছেন, যা গল্পটির কাহিনিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। নামের মাধ্যমে যথার্থভাবে গল্পের মূল বক্তব্যের একটি দিক ফুটে উঠেছে। নিচে প্রশ্নালোকে আলোচ্য গল্পের নামকরণের সার্থকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

নামকরণের গুরুত্ব : সাহিত্যশিল্পের দর্পণ হলো নামকরণ। নামকরণের মাধ্যমে শিল্পীর রুচিবোধ ফুটে ওঠে। তাই নামকরণ যথার্থ সুন্দর ও সার্থক হওয়া আবশ্যক। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন– A beautiful name is better than a lot of wealth.

নামকরণের ভিত্তি : সাহিত্যিকগণ একটি সুন্দর ও সার্থক নামকরণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করেন–

- কেন্দ্রীয় চরিত্র;
- বিষয়বস্তু, স্থান;
- কাহিনির পরিণতি বা আবেগ।
- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য;
- রূপক বা প্রতীকী নামকরণ;

আলোচ্য গল্পের নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সূত্রটি অনুসরণ করে এর নাম ও রচনার মাঝে এক নিপুণ শৈল্পিক সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।

নামকরণের সার্থকতা

১. **নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় মাউলতলা :** মাউলতলা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি শান্ত নিভৃত পল্লি। নগরকেন্দ্রিক আধুনিক সভ্যতার আলো এখানে কোনোদিনই পৌঁছায়নি। এখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে অনাবিল আনন্দে বসবাস করেছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বণিক সভ্যতা বিশ্বের অনেক অঞ্চলকে যেমন গ্রাস করেছে, তেমনি শহর থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন এই মাউলতলা

গ্রামেও তার থাবা বিস্তার করেছে। এ গ্রামের শহর-ফেরত যুবক 'জোনাবালি' মাউলতলাবাসীকে আধুনিকতার দিকে, শহরের দিকে তথা সভ্যতার দিকে নিতে চাইল। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল শহরের সাথে সংযোগের জন্য একটি সড়ক। প্রথমত কেউ এ প্রস্তাবে রাজি হয়নি, এমনকি গহুরালিও রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাব মেনে নিতে আগ্রহী ছিল না। পরে জোনাবালির যুক্তিতে সে বুঝতে পারল, এ কেবল একটি সড়কই নয়; বরং নতুন জীবনের রাস্তা। তাই সে রাস্তার জন্য নিজের অল্প জমির প্রায় অর্ধেক অংশই দিতে রাজি হলো। সকলের প্রচেষ্টায় নির্মিত হলো সড়ক। সেইসাথে মধ্যযুগীয় অবস্থান থেকে মাউলতলা গ্রামটি উঠে আসল আধুনিক নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায়।

২. **শহরের উপকরণ বারবণিতা :** নতুন রাস্তা দিয়ে গহুরালি শহরে যায়। কিন্তু সেখানকার মানুষের কোনো আন্তরিকতা নেই, মেহমানদারি নেই, সৌজন্যবোধ নেই, যা দেখে সে মর্মাহত হলো। এরই মাঝে এক বারবণিতার মায়াময় আহ্বানে সে কিছুটা শান্তি পেতে চেয়েছিল, কিন্তু সে যখন তার সত্যিকার রূপ দেখল, তার টাকাকড়ি সব রেখে তাড়িয়ে দিল, তখন বুঝতে পারল, শহরের অন্যতম উপকরণ এ বারবণিতা। অর্থের বিনিময়ে এখানে ঘৃণিত সেবা পাওয়া যায়।

৩. **সড়ক তৈরির কুফল :** সড়ক নির্মিত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত মাউলতলা গ্রামবাসী কোনো কিছুর অভাব উপলব্ধি করেনি। এবারে যুদ্ধ ও মন্বন্তরের কারণে গ্রামের সবাই দিশেহারা। এ পথ ধরে ইতঃপূর্বে সরকারি কর্মচারীদের ঘুষের হাত প্রসারিত হয়েছে, অন্যদিকে মামলা-মকদ্দমা, মারামারি-হানাহানি চিরস্থায়ী স্থান করে নিয়েছে। মানুষের শান্তির ঘরে আগুন লেগেছে। গহুরালির সংসারেও এসেছে অর্ধাহার, অনাহার। আগের মতো এখন তার আয় নেই। যেমন লেখকের ভাষায়, "দাম চড়িল সব জিনিসের কমিল কেবল জীবনের।" ধীরে ধীরে এ সিঁড়ি বেয়ে মন্বন্তর প্রবেশ করে মাউলতলা গ্রামেও। গ্রামের মানুষের মন থেকে প্রেম-ভালোবাসা তিরোহিত হয়, নৈতিক চরিত্রে আসে চরম অধঃপতন। গহুরালির স্ত্রী হাজেরা মিলিটারির দালালের হাত ধরে পালিয়ে যায়। আসগরউল্লাহর সোমত্ত কন্যা কুলসুম উধাও হয়ে যায় শহরের বাবুর্চিখানার কর্মচারী লুৎফরের সাথে, আগে যা কোনোদিন কল্পনাও করা যায়নি।

৪. **স্ত্রী হারিয়ে নিঃস্ব গহুরালি :** গহুরালি ঘটনাচক্রে বন্ধুত্ব করে শহরের মিলিটারীর কোনো এক দালালের সাথে। উদ্দেশ্য আয়ের একটা পথ করা, কিন্তু একদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে গহুরালি তার সহজ-সরলা, পতিভক্তিপরায়ণ স্ত্রী হাজেরাকে আর খুঁজে পেল না। পরে জানতে পারল, হাজেরা সেই দালালের সাথে পালিয়েছে। এ ঘটনার অনুভূতি ব্যক্ত করতে লেখক বলেন, "মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে।" সে অনুভব করল, এ রাস্তা তৈরি না হলে তার এত বড় ক্ষতি হতো না।

৫. **'পথ জানা নাই' কথার তাৎপর্য :** এ গল্পের জোনাবালি মাউলতলাবাসীকে একটি সুখ-সমৃদ্ধির সন্ধান দিতে চেয়েছিল। শহরের সাথে তাই তারা সংযোগ সড়ক স্থাপন করেছিল, কিন্তু যে পথে তাদের শান্তি আসবে, সুখ আসবে, আসবে সমৃদ্ধি, সে পথ তাদের জানা নেই।

উপসংহার : মানুষ সবসময় উন্নতির পথ খোঁজে, জ্ঞানের পথে ধাবিত হয় এবং সভ্যতার অনুসরণ করে। মাউলতলা গ্রামের লোকেরাও খুঁজেছিল সমৃদ্ধির পথ, শান্তির পথ। কিন্তু যে পথে সত্যিকারের শান্তি আসবে, সমৃদ্ধি আসবে সে পথ কারো জানা নেই। এ পথের দিশা একমাত্র স্রষ্টার হাতে। তাই লেখকও তার গল্পের নাম দিয়েছেন 'পথ জানা নাই।'

নির্বাচিত গল্প



ব্যাখ্যাবলি

▶২টি উদ্ধৃতি দেওয়া থাকবে: যে-কোনো ১টির ব্যাখ্যা লিখতে হবে – ৫ × ১ = ৫

একরাত্রি

▸▸ ব্যাখ্যা : ১ ॥ সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম, তাহা নহে।

অথবা, সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফরমাশ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত।

অথবা; সুরবালার প্রতি যে সর্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবি ছিল, সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

অথবা, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য সে আমার বিশেষরূপ অবহেলার পাত্র।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, সার্থক ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে গল্পের নায়িকা সুরবালার প্রতি শৈশবে নায়কের দাবি ও অধিকার খাটানো এবং নায়িকার সহিষ্ণু মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক এবং নায়িকা সুরবালা একে অন্যের প্রতিবেশী। সুরবালা অপেক্ষা নায়ক সাত বছরের বড় হলেও তাদের সম্পর্ক ছিল সমবয়সীর মতো। দু'জন একসাথে পাঠশালায় যেত এবং অবসরে বউ বউ খেলত। সুরবালাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা নায়ককে খুব আদর-যত্ন করতেন। আর দু'জনকে একত্র করে আপনি-আপনি বলাবলি করতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।" নায়ক বয়সে তখন ছোট হলেও কথাটার অর্থ একরকম বুঝতে পারত। নায়ক মনে করতো, সুরবালার প্রতি অন্যের চেয়ে তার বেশি দাবি আছে। আর এ বিশ্বাসের জন্য সে অধিকারমদে মত্ত হয়ে তার প্রতি শাসন ও উপদ্রব করতো। কেননা তার মনে হতো, সুরবালার প্রতি এ অধিকার তার আছে। প্রতিদানে সুরবালাও সহিষ্ণুতার সাথে তার সবরকম ফরমাশ খাটতো, উপদ্রব সহ্য করতো এবং শাস্তি গ্রহণ করতো। নায়ক বিশ্বাস করতো, সুরবালা কেবল তারই প্রভুত্ব স্বীকার করার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেছে এবং এ কারণেই সুরবালা তার বিশেষ অবহেলার পাত্র ছিল।

মন্তব্য : কারো সাথে যখন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন সে সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাপ্ত অধিকার খাটালে তার প্রতি সহিষ্ণু মনোভাব দেখানোই সম্পর্কের দাবি। 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক-নায়িকার ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২ ॥ পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু বর্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্যের কোনো গৌরব ছিল না।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ, ছোটগল্পের স্বকীয় ধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' নামক অনবদ্য গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এখানে সুরবালার রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে নায়কের নিস্পৃহ মনোভাব ফুটে উঠেছে নায়কের নিজ কণ্ঠে।

বিশ্লেষণ : প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে গল্পের নায়ক-নায়িকা একসাথে পাঠশালায় যেত এবং অবসরে দু'জন বউ বউ খেলত। সুরবালাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা নায়ককে খুব আদর-যত্ন করতেন। তিনি দু'জনকে একত্র করে আপনা-আপনি বলাবলি করতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।" তখন নায়ক অনেক ছোট থাকলেও কথাটির অর্থ বুঝতে পারত। সুরবালার প্রতি যে নায়কের অন্যদের চেয়ে বেশি অধিকার রয়েছে, এ ধারণা তার মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। সে অধিকারমদে মত্ত হয়ে সুরবালার প্রতি শাসন কর্তৃত্ব খাটাত। সুরবালাও আনুগত্যের সাথে ফরমাশ খাটতো এবং নীরবে সবরকম শাস্তি মাথা পেতে নিত। সুরবালা ছিল অপরূপ সুন্দরী। সমাজে তার রূপের প্রশংসা ছিল, কিন্তু নির্বোধ বালক নায়কের কাছে সে সৌন্দর্যের কোনো গুরুত্ব ছিল না। কারণ রূপ-সৌন্দর্যের মূল্য বোঝার মতো বয়স ও জ্ঞানের অভাব ছিল কিশোর নায়কের। তার ধারণা ছিল, সুরবালা কেবল তারই প্রভুত্ব স্বীকার করতে পৃথিবীতে এসেছে। যে কারণে কিশোরী সুরবালার রূপগুণ নায়কের কাছে গুরুত্ব পায়নি এবং সুরবালা নায়কের কাছে অবহেলার পাত্র ছিল। মোদ্দাকথা, যে কারণেই হোক তার রূপের কোনো কদর নায়কের কাছে ছিল না।

মন্তব্য : একজন পুরুষের কাছে নারীসত্তার রূপের গুরুত্ব কতখানি তা বোঝার মতো পরিপক্বতা নায়কের ছিল না। এজন্যই সুরবালার রূপ-সৌন্দর্য নায়কের চোখ এড়িয়ে যায়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩ ॥ কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি তো জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হইব।

অথবা, বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশি।

অথবা, ইঁহারা আমাদের বাংলাদেশের পূজ্য দেবতা, তেত্রিশ কোটির ছোটো ছোটো নূতন সংস্করণ।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত অসাধারণ ছোটগল্প 'একরাত্রি' থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে তৎকালীন সমাজের আদালতজীবীদের মর্যাদা-সম্মান বোঝাতে এ উক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়কের পিতা ছিলেন চৌধুরী জমিদারের নায়েব। তিনি জমিদারির কাজ ভালোই বুঝতেন। নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করতেন। তার ইচ্ছে ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে জমিদারের গোমস্তাগিরিতে লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু গল্পের নায়ক ছিল উচ্চাভিলাষী। তার জীবনের লক্ষ্য ছিল কালেক্টারের নাজির না হতে পারলেও অন্তত জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হবে। এজন্য সে পাড়ার নীলরতনকে আদর্শ মনে করতো। সেও নীলরতনের মতো কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে লেখাপড়া করার কল্পনা করতো। তার এ উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছনে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ যুগিয়েছে বাংলাদেশের তৎকালীন আদালতজীবীদের সুযোগ-সুবিধা, সম্মান ও ক্ষমতা। নায়ক ছোটবেলা থেকে দেখে এসেছে, তার পিতা আদালতের কর্মচারীদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য কীভাবে পরিশ্রম করতেন এবং তাদের কীরূপ সম্মান দেখাতেন। আদালতের কর্মচারীরা তার পিতার কাছে দেবতুল্য ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেবতাকেও হার মানাত। আদালতের প্রত্যেক কর্মচারী যেন তেত্রিশ কোটি দেবতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ। সিদ্ধিদাতা গণেশের স্থানে লোকেরা আজ এদের বসিয়ে পূজা করে। নানা উপচারে, উপাদানে এদের সন্তুষ্ট

রাখতে মানুষ সবসময় ব্যস্ত থাকে। নায়কের বালক হৃদয়ে এ বিষয়টি গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তাই সে ব্যাখ্যেয় উক্তিটি করেছে।

মন্তব্য : তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় আদালতজীবীদের একটি বিশেষ মূল্যায়ন এখানে ফুটে উঠেছে। বাংলার মানুষ তখন তাদের দেবতার মতো সম্মান করতো।

» ব্যাখ্যা : ৪ ॥ দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণবিসর্জন করা যে আশু আবশ্যক, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না।

অথবা, কিন্তু কী করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে, আমি জানিতাম না।

অথবা, কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোনো ত্রুটি ছিল না।

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : নায়কের স্বদেশপ্রেম তাকে দেশোদ্ধারের আন্দোলনে যোগ দিতে এবং এজন্য প্রাণবিসর্জন দিতে উদ্বুদ্ধ করা প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তির অবতারণা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসে। তার বাসনা ছিল কালেক্টারের নাজির অথবা অন্তত জজ আদালতের হেডক্লার্ক হওয়া। প্রাথমিক অবস্থায় অসুবিধায় পড়লেও পরে পিতার আর্থিক আনুকূল্যে সে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে থাকে। এ সময় শহরে রাজনৈতিক নেতাদের ভাষণ শুনে তার জীবনের পরিকল্পনা বদলে যায়। সে নিয়মিত মিটিং-মিছিল, সভা সমিতিতে যোগ দিতে থাকে। দেশের জন্য কিছু একটা করতে পারা তার কাছে সবচেয়ে জরুরি বলে মনে হয়। আজীবন বিয়ে না করে পরাধীন ভারতের সেবা করা তার কাছে আশু কর্তব্য হিসেবে প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে। এজন্য সে এ কাজে কোমর বেঁধে নামে। কলকাতার ইঁচড়ে পাকা ছেলেদের মতো তার দেশপ্রেম ঠুনকো ছিল না। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হওয়ার জন্য সে প্রয়োজনে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসে। প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম জানা না থাকলেও সে উৎসাহের সাথে প্রাণ বিসর্জনের পথ খুঁজতে থাকল। কড়া রোদ মাথায় নিয়ে চাঁদা আদায়, বিজ্ঞাপন বিলি, সভাস্থলে বেঞ্চি চৌকি সাজানো, দলপতির বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে কোমর বেঁধে মারামারি করা ইত্যাদি কাজে যোগ দিয়ে সে বাল্যসাথি সুরবালাকেও অবলীলায় ভুলে যায়।

মন্তব্য : কলকাতায় লেখাপড়া করার সময় নায়কের মধ্যে যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার কথায় ও কাজে।

» ব্যাখ্যা : ৫ ॥ নাজির-সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

অথবা, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর-রৌদ্রে টো-টো করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতাম।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব, ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : নায়ক ছোটবেলায় যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতায় এসেছিল তা পরিবর্তন করে অবশেষে তার দেশোদ্ধারে সচেষ্ট হওয়ার প্রসঙ্গ এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'একরাত্রি' গল্পের নায়ক ছোটবেলায় নাজির-সেরেস্তাদার হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কলকাতায় পাড়ি জমায়। কারণ নায়ক দেখেছে, কালেক্টার বা আদালতের কর্মচারীরাই সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত, কিন্তু কলকাতায় এসে সময় ও প্রেক্ষাপট বদলের সাথে সাথে তার জীবনের উদ্দেশ্যও পাল্টে যায়। কলকাতার নেতাদের বক্তৃতায় প্রভাবিত হয়ে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা তিরোহিত করে সে নিজের জীবন দেশের জন্য বিলিয়ে দেওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেয়। ইতালির একত্রীকরণ ও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বনকারীদের উৎসাহিত করার জন্য মাট্‌সীনি গারিবাল্‌ডি যে উত্তেজক বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে প্রভাবিত হয়ে গল্পের নায়কও গারিবালডির মতো নেতা হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়। তাই সে দেশোদ্ধারের কাজে সভা-সমিতির জন্য ঘুরে ঘুরে চাঁদা আদায় করে বেড়ায় দুপুরের রোদে। নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। সে যে কলকাতায় এসেছিল নাজির–সেরেস্তাদার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে, সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। স্বীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলে তখন দেশোদ্ধারই তার কাছে মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

মন্তব্য : সময় ও অবস্থাভেদে মানুষের জীবনের লক্ষ্যও পরিবর্তিত হতে পারে। এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই গল্পের নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিবর্তে অবশেষে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মোৎসর্গের পথ বেছে নেয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬ ॥ পতিত ভারতের চাঁদা-আদায়কার্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ, বাংলা ছোটগল্পের স্বকীয় ধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' নামক ছোটগল্প থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে নায়কের কর্তব্যনিষ্ঠার কাছে প্রেমিকার বিয়ের সংবাদও যে নিতান্ত তুচ্ছ ছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : গল্পে বর্ণিত সুরবালা ছিল নায়কের বাল্যকালের খেলার সাথি। তারা একসাথে পাঠশালায় যেত এবং অবসরে বউ বউ খেলত। সুরবালা নায়কের বিভিন্ন ফরমাশ খাটতো এবং নানান উপদ্রব নীরবে সহ্য করতো। নায়ক মনে করতো, সুরবালার জন্মই হয়েছে তার হুকুম পালন করার জন্য এবং অন্যদের চেয়ে সুরবালার ওপর তার অধিকার বেশি। নায়ক যে অধিকার খাটাত, সুরবালাও তা স্বাভাবিক মনে করে তার ফরমাশ খাটতে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকত। এভাবে তাদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে; কিন্তু নায়ক জজ-আদালতের নাজির– সেরেস্তাদার বা হেডক্লার্ক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলকাতায় পালিয়ে যায়। সেখানে সে লেখাপড়া শেখার জন্য এলেও অল্পদিনের মধ্যেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে এবং পরাধীন ভারতের জন্য আত্মবিসর্জন দেওয়ার মানসে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সে সভা-সমাবেশে যোগদান, বিজ্ঞাপন বিলি, সভামঞ্চে বেঞ্চি-চৌকি সাজানো এবং পরাধীন ভারতের জন্য চাঁদা আদায় ইত্যাদি কাজে নিজেকে সর্বদা ব্যস্ত রাখে। এমনি এক সময় তার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হয়ে সুরবালার সাথে তার বিয়ে ঠিক করেন। খবর পেয়ে নায়ক পিতাকে জানিয়ে দেয়, বিদ্যালাভ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করবে না। অবশেষে উকিল রামলোচন বাবুর সাথে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায়। এ সংবাদ নায়ককে এতটুকু বিচলিত করল না। কারণ সে তখন স্বদেশী আন্দোলনের চাঁদা আদায়ের কাজে এমনভাবে মগ্ন ছিল যে, এ সংবাদ তার কাছে অতি তুচ্ছ বলে বিবেচিত হলো।

মন্তব্য : নায়ক দেশোদ্ধারের ভাবনায় এতটা আবেগাপ্লুত ছিল যে, বাল্যপ্রেমের যবনিকাপাত তার কাছে গুরুত্ব পায়নি। আজীবন বিয়ে না করে দেশের স্বার্থে জীবন দিতে সে তখন বদ্ধপরিকর।

»» ব্যাখ্যা : ৭ ॥ মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

অথবা, উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক-একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক-একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক রূপকার নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : শিক্ষকতার পাশাপাশি নায়কের ছাত্রজীবনের দেশোদ্ধারের স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে আলোচ্যাংশে।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়ক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় লেখাপড়া করতে গিয়েছিল। স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে আদালতের সেরেস্তাদার বা তেমন কিছু একটা হবে। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে নায়কের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন হয়েছে। পরাধীন দেশের মানুষকে জাগিয়ে তুলে দেশমাতৃকার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়ে সে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেছে। ম্যাটসীনি গারিবাল্‌ডির মতো দেশের মানুষকে জাগিয়ে তোলার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছে। আত্মসুখের চেয়ে দেশের জন্য আত্মবিসর্জনই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার সেই উদ্দেশ্যের সামনেও বিপর্যয় নেমে এল। বাবার মৃত্যুতে সংসারের হাল ধরতে হলো তাকে। অনেক চেষ্টায় সে নোয়াখালীর একটি ছোট্ট শহরে এন্ট্র্যান্স স্কুলের সেকেন্ড মাস্টারি পেয়ে গেল। শিক্ষকতাকে সে তার জন্য উৎকৃষ্ট পেশা হিসেবে বোধ করল। কেননা শত বিপত্তির মধ্যেও তার মাঝে দেশসেবার যে মহান ব্রত জাগ্রত হয়েছিল এক্ষণে তা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারের মাধ্যমে ছাত্রদেরকে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত করার সুযোগ ঘটেছে। তার ধারণা ছিল, উপদেশ-উৎসাহ দিয়ে ছাত্রদেরকে ভাবী ভারতের এক-একজন সেনাপতিতে পরিণত করতে পারবে।

মন্তব্য : নায়ক তার দেশাত্মবোধের আদর্শ বাস্তবায়নে শিক্ষকতা পেশাকে নিজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত বলে মনে করে। কারণ শিক্ষাঙ্গনই দেশপ্রেমিক নাগরিক গড়ার উপযুক্ত স্থান।

»» ব্যাখ্যা : ৮ ॥ দেখিলাম, ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগ্‌জামিনের তাড়া ঢের বেশি।

অথবা, ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যালজেব্রার বহির্ভূত কোনো কথা বলিলে হেডমাস্টার রাগ করে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্প প্রণেতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : গল্পের নায়ক তার স্কুলের ছাত্রদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য গল্পের নায়ক গৃহত্যাগ করে কলকাতায় যায়। সেখানে সে লেখাপড়ার ফাঁকে স্বদেশী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু পিতার মৃত্যুতে তার সব উচ্চাশা তিরোহিত হয়, সংসারে সে এখন একা নয়; দুটি বোন এবং মায়ের দায়িত্ব এসে বর্তায় তার ওপর। সংসারে সে-ই একমাত্র পুরুষ সদস্য হওয়ায় ব্যয়-নির্বাহের সমস্ত দায়িত্ব এখন তার একার ওপর। বাধ্য হয়ে সে নোয়াখালী অঞ্চলের এক এন্ট্র্যান্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি গ্রহণ করে। স্কুলের চাকরি তার বেশ ভালোই লাগে। সে ভাবে, তার উপযুক্ত কাজ

সে পেয়েছে। উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়ে এক-একটি ছাত্রকে সে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সেনাপতি করে গড়ে তুলবে। ছাত্রদের মাধ্যমে নিজে দেশসেবা করতে পারছে ভেবে সে এক ধরনের আত্মতৃপ্তি লাভ করে, কিন্তু কিছুদিন যেতেই তার সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে, ছাত্রদের মধ্যে দেশ নিয়ে তেমন কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই। দেশের চিন্তা অপেক্ষা তাদের ভেতর পরীক্ষার চিন্তাই বেশি কাজ করে। তাছাড়া গ্রামার অ্যালজেব্রা বহির্ভূত কোনো বিষয় নিয়ে ছাত্রদের মাঝে আলোচনা করলে হেডমাস্টারও অসন্তুষ্ট হন। ছাত্র-শিক্ষক সবার মাঝে দেশপ্রেমের অভাব দেখে নায়ক আলোচ্য উক্তিটি করে।

মন্তব্য : দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ছাত্র-শিক্ষকদের মাঝে উৎসাহের অভাব দেখে নায়ক মর্মাহত হয়। মাস-দুয়েকের মধ্যে এ ব্যাপারে সে নিজেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৯ ॥ বেশ বুঝিতে পারিলাম, জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহলপূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

অথবা, এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্ এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম।

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : গল্পের নায়ক উকিল রামলোচনের বাড়িতে গিয়ে তার সাথে গল্প করার সময় পাশের ঘরে সুরবালার অস্তিত্ব অনুভব করে আলোচ্য উক্তিটি করেছে।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়ক জজ-আদালতের হেডক্লার্ক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ও দেশোদ্ধারের মহান সাধনা পরিত্যাগ করে নোয়াখালীর এক এন্ট্রান্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি গ্রহণ করে। সেখানে স্কুলের একটা নির্জন কক্ষে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। নায়কের জানা ছিল, স্কুলগৃহের অনতিদূরে সুরবালা তার স্বামী রামলোচন রায়ের সাথে ঘর-সংসার করে। ইতোমধ্যে রামলোচন রায়ের সাথে নায়কের আলাপ হয়। এ আলাপ-পরিচয়ের সূত্র ধরে এক ছুটির দিনে নায়ক গল্প করার উদ্দেশ্যে সরকারি উকিল রামলোচন রায়ের বাসায় যায়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল। এমন সময় নায়ক পাশের ঘরে চুড়ির টুংটাং শব্দ, কাপড়ের একটুখানি খসখসানি এবং পায়েরও একটুখানি আওয়াজ শুনতে পেল। সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল, এ শব্দ আর কারোরই নয়, তার বাল্যকালের খেলার সাথি সুরবালার। যার সাথে তার বিয়ে স্থির হয়েছিল এবং সে তা তাচ্ছিল্যের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিল। নায়ক আরো বুঝতে পারল, জানালার ফাঁক দিয়ে সুরবালার কৌতূহলপূর্ণ চোখ তাকে নিরীক্ষণ করছে। বাল্যের বহুচেনা সুরবালার এ অনুমাননির্ভর অস্তিত্ব নায়ককে ভাববিহ্বল করে তোলে।

মন্তব্য : সুরবালার অস্তিত্বের অনুভব নায়কের হৃদয়ে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগ্রত করে। তার অবচেতন হৃদয় সুরবালার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১০ ॥ তৎক্ষণাৎ দুখানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল– বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব-প্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি।

অথবা, সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

অথবা, মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মতো হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রূপকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : রামলোচন বাবুর বাড়িতে সুরবালার উপস্থিতি নায়কের হৃদয়ে যে ঝড় তুলেছিল, আলোচ্য উক্তিতে সে অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়িকা সুরবালা ছিল নায়কের বাল্যসাথি। তারা একসাথে পাঠশালায় যেত এবং অবসরে বউ-বউ খেলত। এভাবেই শৈশবে উভয়ের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনায় নায়ক একদিন গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় পাড়ি জমায়। লেখাপড়ার পাশাপাশি সে দেশের সেবায় জড়িয়ে পড়ে। দেশোদ্ধারে ব্যস্ত থাকায় সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাবও সে প্রত্যাখ্যান করে। এদিকে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায় একজন উকিলের সাথে। সময়ের বিবর্তনে নায়ককে একদিন কলকাতা ছেড়ে নোয়াখালীর একটি স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি নিতে হলো। সেই স্কুলের পাশেই সুরবালা তার স্বামী-সংসার নিয়ে থাকে। একদিন সুরবালার স্বামী রামলোচনের সাথে তার বাড়িতে গল্প করার সময় সে সুরবালার কৌতূহলী অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। তখনই সুরবালার সাথে তার শৈশব স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে। সুরবালার চপল চঞ্চলতা, বিশ্বাস, সরলতা, শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড় বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি এসবই তার স্মৃতির পাতায় ভেসে ওঠে। সুরবালাকে হারানোর বেদনায় তার হৃদয় টনটন করে ওঠে। সে হৃৎপিণ্ডে প্রচণ্ড চাপ অনুভব করে।

মন্তব্য : নায়কের ভাবনায় নতুন করে সুরবালার উপস্থিতি শৈশব স্মৃতিকে আন্দোলিত করেছে। সুরবালার ওপর অধিকার হারিয়ে তার হৃদয় তাই ভারাক্রান্ত। তার খাঁ খাঁ হৃদয়ে বেদনার মৃদঙ্গধ্বনি অনুরণিত হয়েছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১১ ॥ আমি তো তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্য বসিয়া থাকিবে।

উৎস : উল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্বকীয় ধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে নায়ক সুরবালাকে হারিয়ে নিজের পরাহত মনকে সান্ত্বনার পরশ দিয়েছিল।

বিশ্লেষণ : সুরবালাকে পাওয়া একসময় নায়কের কেবল ইচ্ছার ব্যাপার ছিল। কিন্তু তখন সে লেখাপড়া ও দেশোদ্ধারের কাজে এত ব্যস্ত ছিল যে, সুরবালাকে নিয়ে ভাবার সময় তার একদম ছিল না। ইতোমধ্যে নোয়াখালীর সরকারি উকিল রামলোচন বাবুর সাথে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায়। তখন নায়ক পরাধীন ভারতবর্ষকে নিয়ে এত মগ্ন ছিল যে, এ বিয়ের খবরটিও তার কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলে বিবেচিত হয়েছিল। হঠাৎ পিতার মৃত্যু হলে নায়ক সবকিছু ত্যাগ করে এন্ট্রান্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি নিয়ে নোয়াখালী চলে যায়। সেখানে রামলোচন বাবুর সাথে তার আলাপ পরিচয় হয় এক ছুটির দিনে নায়ক রামলোচনের বাসায় বেড়াতে গেলে পাশের ঘরে সুরবালার অস্তিত্ব অনুভব করে। হঠাৎ নায়কের সমগ্র অন্তরাত্মা সুরবালার জন্য একযোগে হাহাকার করে ওঠে। হৃদয়ের ভেতরটা যেন টনটন করতে থাকে। কে যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকে কঠিন মুষ্টিতলে চেপে ধরল। বাসায় ফিরে আসার পরও সে ব্যথা কমল না। নায়ক কোনো কাজেই মন বসাতে পারছিল না। সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হয়ে নিজেকে নিজে সান্ত্বনাবাণী শোনাতে লাগল, আমার আক্ষেপ করার কিছু নেই। কেননা আমি তো তাকে ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিয়েছি। সে তো আর চিরকাল আমার জন্য বসে থাকবে না। তাছাড়া সুরবালাকে সে তার অপেক্ষায় থাকার জন্য কোনো আশ্বাসও দেয়নি। তাই তার জন্য অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকার কোনো সুযোগ সুরবালার ছিল না।

মন্তব্য : সুরবালা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে নায়কের অপরিণামদর্শিতাই দায়ী। তাই মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তখন তার আর কিছুই করার ছিল না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১২ ॥ তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না।

অথবা, সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কবি ও সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে সুরবালার সাথে নায়কের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ার ক্ষেত্রে সামাজিক অনুশাসনের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : সুরবালা গল্পের নায়কের প্রতিবেশী এবং ছেলেবেলার খেলার সাথি। সুরবালা ও নায়ক পরস্পরকে ভালোবাসত। তবে সেই অপরিণত ভালোবাসায় কিছুটা ঔদাসীন্য ছিল। নায়ক তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণেই সুরবালাকে অবজ্ঞা করে কলকাতায় গিয়ে একপর্যায়ে দেশোদ্ধারের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় তার পরিবারের পক্ষ থেকে সুরবালাকে বিয়ে করার প্রস্তাব যায়, কিন্তু দেশের জন্য আত্মত্যাগের আবেগ ও নেশায় সে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দেয়। সুরবালার বিয়ে হয় রামলোচন উকিলের সাথে। নায়কের বাবার মৃত্যু হলে, সংসারের ভার তার ঘাড়ে চাপে। সব রঙিন স্বপ্ন ভেঙে যায়। ইতোমধ্যে পেশা হিসেবে সে স্কুলের মাস্টারি বেছে নেয়। কাকতালীয়ভাবে তার স্কুলের পাশেই সুরবালার স্বামীগৃহ। কোনো একদিন নায়ক রামলোচনের বাড়িতে বেড়াতে যায়। নানা কথার মধ্যেও নায়কের মন পড়ে থাকে সুরবালার কাছে। কেননা পাশের কক্ষ থেকে সে সুরাবালার চুড়ির মৃদু-মধুর আওয়াজ, শাড়ির খস্‌খস্ শব্দ, পদধ্বনি সবই শুনতে পায়। সুরবালার অস্তিত্ব নায়কের মনে প্রেমের ঢেউ জাগিয়ে তোলে– ব্যাকুল হয়ে ওঠে সে। যে সুরবালা একদিন ছিল তারই হাতের ধন, আজ সে পরস্ত্রী। একসময়ের অতি কাছের সুরবালা আজ তার কাছে দুর্লভ। সুরবালা তার যত নিকটেই থাক না কেন, সুরবালার নিঃশ্বাস তার গায়ে এসে লাগলেও তাদের দু'জনের মিলনের উপায় নেই। হাতের কাছে থাকলেও সুরবালার ওপর তার কোনো অধিকার নেই। মন্ত্রের মধ্য দিয়ে সুরবালা আজ পরস্ত্রী হয়েছে। সামাজিক বিধি-রীতির প্রাচীর তাদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।

মন্তব্য : যে সুরবালাকে একদিন নায়ক হাত বাড়ালেই পেতে পারত, সমাজের প্রচলিত রীতিনীতি ও বৈবাহিক পবিত্র বন্ধন নামক দেয়ালই নায়কের জন্য তাকে দুর্লক্ষ্য ও অধরা করে রেখেছে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১৩ ॥ সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখভাগিনী হইতে পারিত।

অথবা, সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, সার্থক ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সুরবালার বিয়ে হওয়ার পর নায়কের সমস্ত হৃদয় জুড়ে সুরবালার অবস্থান, কিন্তু সুরবালা তখন তার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। আলোচ্যাংশে নায়কের এ আত্মোপলব্ধিই ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : 'একরাত্রি' গল্পে সুরবালা ছিল নায়কের খেলার সাথি। তারা একসাথে পাঠশালায় যেত এবং বউ-বউ খেলত। সুরবালাদের বাড়িতে নায়কের বিশেষ সমাদর ছিল। নায়ক এবং সুরবালাকে একত্র করে সুরবালার মা আপনা-আপনি বলাবলি করতেন, "আহা, দুটিতে বেশ মানায়।" নায়ক ছোট হলেও তার এ কথাটির মানে বুঝত। তাই সে সুরবালার ওপর বিশেষ অধিকার খাটাত। সুরবালাও নীরবে নায়কের সকল অত্যাচার-উপদ্রব মেনে নিত। সুরবালার সাথে নায়কের শৈশবের দিনগুলো এমনই মধুময় ছিল। কিন্তু ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নায়ক চলে আসে কলকাতায়। শহরে এসে লেখাপড়ার পাশাপাশি সে জড়িয়ে পড়ে দেশোদ্ধারের কাজে। এ সময় সুরবালার সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব করা হলেও সে তা প্রত্যাখ্যান করে। সুরবালার বিয়ে হয়ে যায় নোয়াখালীর সরকারি উকিল রামলোচন বাবুর সাথে। কাকতালীয়ভাবে নায়কেরও চাকরি হয় ওই একই অঞ্চলে। একদিন রামলোচন বাবুর সাথে গল্প করতে তার বাসায় গেলে নায়ক নতুন করে অনুভব করে সুরবালাকে, কিন্তু সে সুরবালা আজ তার কেউ নয়। সুরবালাকে অবহেলা করে নিজেই পর করে দিয়েছে। এ অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে সে। সুরবালা তার সবই হতে পারত; শুধু নিজের খামখেয়ালির জন্য সে আজ তার কেউ নয়। অতি কাছে থেকেও সে আজ যোজন যোজন দূরে। সামাজিক দৃষ্টিতে তার সাথে নায়কের দেখা করা ও কথা বলা দোষ, এমনকি তার বিষয়ে চিন্তা, জল্পনা-কল্পনা করাও পাপ। অথচ একসময় শুধু ইচ্ছে করলেই সুরবালা তার সবচেয়ে আপন হতে পারত।

মন্তব্য : নায়ক একসময় যাকে চরম ঔদাসীন্যে পরিত্যাগ করেছে, পরবর্তীতে তাকে পাওয়ার চেষ্টা করা নীতি নৈতিকতার বিচারে পাপ, সমাজের দৃষ্টিতে দূষণীয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১৪ ॥ আর, একটা রামলোচন, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত, কেবল গোটা দুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের স্বকীয় ধারার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বিয়ের মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে অপরিচিত একটি নারীর ওপর তার স্বামীর সব অধিকার বর্তায়– এখানে বাঙালি হিন্দু সমাজের এ চিরায়ত রীতি উদ্ধৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়কের সাথে সুরবালা একত্রে পাঠশালায় যেত এবং অবসরে বউ-বউ খেলত। এ সুবাদে তাদের দু'জনের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেজন্য সুরবালার ওপর তার অধিকার, উপদ্রব, আবদার ছিল অন্যদের তুলনায় বেশি। নিজের ভবিষ্যৎ গড়ার জন্য কলকাতায় পড়তে গিয়ে দেশের কল্যাণার্থে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে সুরবালাকে বিয়ে করেনি। সুরবালার বিয়ে হয় রামলোচন বাবুর সাথে। এদিকে গল্পের নায়ক পিতার মৃত্যুতে লেখাপড়া বন্ধ করে একটি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করে। কাকতালীয়ভাবে সুরবালার স্বামীগৃহের কাছেই নায়কের স্কুল-শিক্ষকতার চাকরি জুটে যায়। সে সুরবালার প্রতিবেশী হিসেবে একদিন তাদের বাড়িতে সুরবালার স্বামীর সাথে নানা বিষয়ে আলাপে মত্ত হয়। পাশের কক্ষেই সুরবালার চুড়ির শব্দ, শাড়ির খস্‌খস্ আওয়াজ

তাকে শৈশব-স্মৃতিতে নিয়ে যায়; যেখানে সুরবালা তাকে বিশ্বাসে, ভালোবাসার আবেশে জড়িয়ে রেখেছিল। সুরবালা তার জীবনের সবকিছু হতে পারত, কিন্তু আজ সুরবালা যত নিকটেই থাকুক, দু'জনের মাঝখানে একটি দেয়াল সৃষ্টি হয়েছে। যে সুরবালা একদিন তারই জন্য সৃষ্ট বলে বিবেচিত হতো, সেই সুরবালাকে দু'চরণ মন্ত্রের জালে জড়িয়ে তার স্বামী অন্য সবার অধিকার ছিন্ন করে কেবল তারই করে নিয়েছে। যে সুরবালা নায়কের জীবনের সুখ-দুঃখের অংশীদার, জীবনের জীবন হতে পারত, আজ তাকে দেখা নিষেধ, তার সাথে কথা বলা নিষেধ, তাকে নিয়ে তেমন করে ভাবাও পাপ। নায়কের সাথে তার এতদিনকার পরিচয়, এত আন্তরিকতা, ভালোবাসা সবই মন্ত্র নামক বৈবাহিক বন্ধনের কাছে বাঁধা পড়ে গেছে। এ অনুভূতিই নায়ককে দিশাহারা করে তোলে।

মন্তব্য : রামলোচনের দু'চরণ মন্ত্রের উচ্চারণই সুরবালার ওপর থেকে তার সকল অধিকার তুলে নিয়েছে। সমাজপ্রথার কাছে ব্যক্তির ইচ্ছে ও আবেগ পরাভূত ও বিপর্যস্ত হয়েছে। যে কারণে সুরবালা এখন শুধুই রামলোচন বাবুর, আর কারো নয়।

➤➤ ব্যাখ্যা : ১৫ ॥ আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না।

অথবা, আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসংগত।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি ও সাহিত্যিক, বাংলা ছোটগল্পের সার্থক রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, পরহস্তগত সুরবালা নায়কের হৃদয়ে যে নতুন অনুভূতির জন্ম দিয়েছে, তা থেকে নায়ক আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় রত।.

বিশ্লেষণ : প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে নায়ক এবং সুরবালার মাঝে শৈশবেই মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা একসাথে স্কুলে যেত এবং অবসরে বউ-বউ খেলত। কিন্তু কিছুদিন পর নায়ক ভবিষ্যৎ আত্মপ্রতিষ্ঠায় পড়াশোনার উদ্দেশ্যে কলকাতায় চলে যায়। সেখানে নায়ক দেশোদ্ধারের কাজে একসময় এমনভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। এদিকে সুরবালার বিয়ে হয়ে যায় রামলোচন বাবু নামে নোয়াখালীর এক উকিলের সাথে। পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে নায়ককে পরিবারের হাল ধরতে শেষপর্যন্ত একটা এন্ট্রান্স স্কুলে সেকেন্ড মাস্টারের চাকরি গ্রহণ করতে হয়। কাকতালীয়ভাবে সেই স্কুলের পাশেই সুরবালা তার স্বামী রামলোচন বাবুকে নিয়ে বসবাস করে। একদিন রামলোচন বাবুর বাড়িতে গল্প করতে গিয়ে নায়ক নতুনভাবে অনুভব করে বাল্যসাথি সুরবালাকে। তার সুপ্ত প্রেম উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সুরবালাকে সে শৈশবের মতো করে পেতে চায়, কিন্তু সে পথ আজ বন্ধ। কারণ, সে আজ রামলোচনের বিবাহিতা স্ত্রী। নায়ক জানে, আজ তাকে দেখা, তার সাথে কথা বলা সবই নিষেধ। তার বিষয়ে চিন্তা করাও পাপ। তবুও নায়কের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সামান্য কটা মন্ত্র পড়ে রামলোচন সুরবালাকে লাভ করেছে; অথচ সে যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে সুরবালাকে অনুভব করে, তার কি কোনো মূল্য নেই? কিন্তু নায়ক এও জানে, রামলোচন সুরবালার যতই অচেনা অজানা হোক, বিয়ের মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে সামাজিক যে বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে, তার কাছে নায়কের চির চেনা-জানা আন্তরিক সম্পর্কের কোনো মূল্য নেই। তাই সে বিয়ের পবিত্র বন্ধন না ছিঁড়ে, সমাজে নতুন নীতি প্রবর্তন না করে বরং আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।

মন্তব্য : আবেগ-উচ্ছ্বাস মানুষের মনে অনেক সময় নানা অসংগত চিন্তা-ভাবনার জন্ম দিলেও প্রচলিত সমাজ ও আইনকে অস্বীকার করতে পারে না। তখন আপন মনকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

ব্যাখ্যা : ১৬ ॥ এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসংগত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি, কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

অথবা, রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশি করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের সার্থক রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে নায়ক তার হৃদয়ে সুরবালার উপস্থিতির বৈধতার প্রশ্নে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছে।

বিশ্লেষণ : প্রতিবেশী হওয়ার সুবাদে বাল্যকালেই সুরবালার সাথে নায়কের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারা একসাথে স্কুলে যেত, বউ-বউ খেলত, কিন্তু নায়ক একসময় লেখাপড়া করতে কলকাতায় পাড়ি জমায়। অতঃপর দেশোদ্ধারের কাজে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং একই কারণে বাল্যসাথি সুরবালার সাথে বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। সুরবালার বিয়ে হয়ে যায় নোয়াখালীর সরকারি উকিল রামলোচন বাবুর সাথে। পিতার মৃত্যুতে নায়ককে একসময় মাস্টারের চাকরি নিয়ে নোয়াখালীর একটি এন্ট্রান্স স্কুলে যেতে হয়। ঘটনাক্রমে সেই স্কুলের কাছেই ছিল সুরবালার স্বামী রামলোচনের বাসগৃহ। সেখানে সরকারি উকিল রামলোচনের সাথে তার আলাপ-পরিচয় হয়। এক ছুটির দিনে তার বাসায় গিয়ে গল্প করার সময় দেয়ালের অন্তরালে নায়ক সুরবালার নীরব অস্তিত্বের সন্ধান পায়। সুরবালার এ অস্তিত্বের অবগতি নায়কের বুকে তুমুল ঝড় তোলে। কিন্তু সুরবালা আজ পরস্ত্রী। তাকে এক নজর দেখার অধিকার তার নেই। নায়ক বিধ্বস্ত মনে নিজ বাসগৃহে ফিরে আসে। সে তার বিবেকের সাথে যুদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু সুরবালার ওপর রামলোচনের চেয়ে তার অধিকার যে অনেক বেশি ছিল তা উপলব্ধি করে তার হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সুরবালার নানা শৈশবস্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠায় তার মন-প্রাণ ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে ওঠে, কিন্তু নিজের বিবেক তার পক্ষে সায় দেয় না। অগত্যা নিজের কাছে নতিস্বীকার করে সে আলোচ্য উক্তিটি করে। নায়ক বুঝতে পেরেছে, সময়ের প্রবাহে স্বাভাবিকভাবেই তার দাবি অন্যায়-অসংগত; কিন্তু এ অসংগত চিন্তা মনে আসা অস্বাভাবিকও নয়, এজন্য কিছুতেই সে মন থেকে সুরবালার স্মৃতি দূর করতে পারছিল না।

মন্তব্য : মানুষের মনে অনেক সময় নানা চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়। এর সবই যে বিবেচনাসঙ্গত তাও নয়, কিন্তু এটা সত্য যে, এ ধরনের চিন্তা মাথায় আসাটা খুবই স্বাভাবিক।

ব্যাখ্যা : ১৭ ॥ মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারও মনে পড়ে না, তাহার পরে বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' নামক অসাধারণ ছোটগল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মানুষের সহজাত ভুল-ভ্রান্তির ফলে অনেকসময় আফসোস করতে হয়, সে সম্পর্কে গল্পকার ব্যাখ্যেয় উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : গল্পের নায়ক একদিন তার শৈশবের খেলার সাথি সুরবালার স্বামী রামলোচন বাবুর বাড়িতে বেড়াতে যায়। সেখানে পাশের ঘরে সুরবালার নীরব অস্তিত্ব অনুভব করে তার মনোরাজ্যে ঝড় বয়ে যেতে থাকে। বাসায় ফিরে আসার পরও সে সুরবালার কথা মন থেকে সরাতে পারে না, কোনো কাজে মন বসাতে পারে না। সারাক্ষণ কেবল সুরবালার মুখ তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। যে সুরবালা তার সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল, আজ সে তার থেকে বহুদূরে। আজ তাকে দেখা, তার সাথে কথা বলা নিষেধ, এমনকি তার বিষয়ে চিন্তা করাও পাপ। অথচ সে একদিন তার সবকিছু হতে পারত। তারই অবহেলায় সে আজ অন্যের ঘরনি। মুখস্থ দুটি মন্ত্র পড়ে একজন অপরিচিত রামলোচন সুরবালাকে অধিকার করেছে। সুরবালা তার সমগ্র হৃদয় জুড়ে অবস্থান করলেও সে আজ তার কেউ নয়, কিন্তু সুরবালাকে ঠিক সময়ে সে চাইলেই পেত। ঠিক সময়ে তাকে গ্রহণ না করে বেঠিক সময়ে এসে সুরবালার জন্য সে হা-হুতাশ করছে।

মন্তব্য : সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারার কারণে মানুষ অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। গল্পের নায়কের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

➡ ব্যাখ্যা : ১৮ ॥ কেবল দুইজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

অথবা, তখন প্রলয়কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিবিয়া গেছে।

অথবা, কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোটগল্পের রূপকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : নায়ক প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে সুরবালার পাশে দাঁড়িয়ে তখনকার ভয়াবহ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে এ মন্তব্যটি করেছে।

বিশ্লেষণ : সুরবালা ছিল গল্পের নায়কের বাল্যসাথি। নায়কের অবহেলার কারণেই সুরবালা আজ পরহস্তগত। ঘটনাক্রমে নায়ক কর্মস্থলজনিত কারণে সুরবালার প্রতিবেশী হয়। তখন শৈশবের অতি পরিচিত সুরবালার প্রতি তার মনে দুর্বলতা দেখা দেয়, কিন্তু সুরবালা তখন তার নাগালের বাইরে। সে এখন পরস্ত্রী, তাকে দেখা নিষেধ, তার সাথে কথা বলা দোষ, তার কথা চিন্তা করাও পাপ; কিন্তু নায়কের মন বাধা মানে না। সে বারবার সুরবালার কথা চিন্তা করে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় এক রাতে বন্যা শুরু হয়। বন্যার জল নায়কের স্কুলগৃহ ও সুরবালার বাসগৃহ প্লাবিত করে। ঘটনাক্রমে সুরবালার স্বামী রামলোচন বাবু সেই রাতে বাড়িতে ছিলেন না। নায়ক সুরবালার প্রাণ রক্ষার্থে রামলোচনের বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে পুকুরের উঁচু কিনারের উপর গিয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর সুরবালাও প্রাণ রক্ষার্থে সেখানে আসে। দু'জন পাশাপাশি অবস্থান করে। কেউ কাউকে কিছু বলতে পারে না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে উভয়ে একে অপরকে শুধু অনুভব করে। বন্যার জল নেমে যায়। তারা কেবল অন্ধকারের মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত জলরাশির দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকে।

মন্তব্য : প্রিয়জনের বিরহে যখন কারো মনে অজস্র কথার পুঞ্জ গুমরে মরে, তখন আকস্মিক মিলনে তা বোবা কান্নায় পরিণত হয়। তখন নির্বাক তাকিয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১৯ ॥ আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি। [ফা. প. ২০০৮, '১৯]

অথবা, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল। [ফা. প. ২০১১]

অথবা, আমার আয়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সার্থক ছোট গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'গল্পগুচ্ছ' শীর্ষক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একরাত্রি' নামক অসাধারণ ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে এক দুর্যোগপূর্ণ রাতে আকস্মিকভাবে সুরবালাকে কাছাকাছি পাওয়ার পর নায়কের মনে যে অনুভূতি জেগেছিল তা ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'একরাত্রি' গল্পের নায়কের বাল্যসাথি ছিল প্রতিবেশী সুরবালা। বাল্যকালে তাদের মধ্যে আন্তরিকতাপূর্ণ এক মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের উভয়ের বিয়ে হওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নায়কের অদূরদর্শিতার কারণে তা হয়নি, ফলে সুরবালার অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে নায়ক চাকরিসূত্রে সুরবালার স্বামীর প্রতিবেশী হয়। সুরবালাকে দেখার জন্য তার মন উতলা হয়ে ওঠে, কিন্তু সুরবালা এখন পরস্ত্রী, অন্যের অধিকারে। তার সাথে দেখা করার, কথা বলার, তার সম্পর্কে চিন্তা করার অধিকার নায়কের নেই। কোনোক্রমেই সুরবালার কাছে পৌঁছানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশেষে এক ঝড়-বন্যার রাতে নায়ক সুরবালার দেখা পেল। প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে তারা আত্মরক্ষার্থ একটা পুকুরের উঁচু পাড়ে পরস্পরের মুখোমুখি হলো। কিন্তু এ আকস্মিক সাক্ষাতে উভয়েই নির্বাক হয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল, কেউ কারো কুশল পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল না। কোনো কথা না বলা হলেও এক রাতের মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়িয়ে নিস্তব্ধ গভীর নীরবতার মধ্যে নায়ক অনন্ত সুখ অনুভব করল। সুরবালা যে কোনোদিন তার হবে না, একথা নায়ক বুঝতে পেরে জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সান্ত্বনা ও আত্মতৃপ্তির অন্বেষণ করেছে।

মন্তব্য : সুরবালাকে পাওয়ার সব আশা ছেড়ে দিয়ে নায়ক একরাতের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার মাধ্যমে অনন্ত আনন্দ লাভ করেছে। একরাতের এই নীরব অন্ধকারের স্মৃতি তার কাছে তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

পুঁই মাচা

▸▸ ব্যাখ্যা : ২০ ॥ ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরিয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে সহায়হরি চাটুয্যের স্ত্রী অন্নপূর্ণার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রাত্যহিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : গল্পের প্রধান চরিত্র সহায়হরি চাটুয্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সে সংসার সম্পর্কে খুবই উদাসীন। অপরের কাছে হাত পাতা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাড়ক-খুড়ো খেজুর গাছ কেটেছে দেখে সহায়হরি তার বাড়িতে এলেন একটা পাত্র নিতে। স্ত্রী অন্নপূর্ণার

কাছে তিনি ঘটি জাতীয় কিছু একটা চাইলেন। অন্নপূর্ণা তখন রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চুলে তেল মাখছিলেন। স্বামীকে দেখে গায়ের কাপড় একটুখানি টেনে দিলেন, কিন্তু ঘটি দেওয়ার বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। সহায়হরি স্ত্রীর এরূপ উদাসীনতা দেখে বিস্মিত হয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। অন্নপূর্ণা তেলের বোতল সরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ স্বামী সহায়হরির দিকে তাকিয়ে থেকে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?" স্ত্রীর এ অতিরিক্ত শান্ত স্বরে সহায়হরি কিছুটা বিচলিত হয়। এটা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তা উপলব্ধি করেই তিনি মরিয়া হয়ে ঝড়ের প্রতীক্ষায় রইলেন। কেননা স্ত্রীকে তিনি ভালো করে চিনতেন। অন্যের কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনা সে মোটেও পছন্দ করতো না। অন্নপূর্ণা যখন মনে মনে ক্ষুব্ধ হতেন তখন প্রথমত কিছু বলতে গেলে শান্ত স্বরে বলতেন। ঝড় আসার পূর্বে যেমন আকাশ কিছুক্ষণ স্থির থাকে, অন্নপূর্ণার স্বভাবও সে রকম। তাই তার এ শান্তস্বর সহায়হরিকে বিচলিত করে তোলে।

মন্তব্য : সহায়হরি চাটুয্যে তার স্ত্রী অন্নপূর্ণার মন-মেজাজ সম্পর্কে ভালো করেই জানতেন। তিনি স্ত্রীকে ভালোভাবে বুঝতেন বলে তার প্রতি সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেন এবং তাকে খুব ভালোবাসতেন।

» ব্যাখ্যা : ২১ ॥ একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে।

অথবা, আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে আশীর্বাদ হওয়ার পর বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিয়ে ভেঙে গেলে তৎকালীন ব্রাহ্মণ সমাজে পিতামাতাকে কতটা হেয় হতে হয়, তা সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণার কথায় ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : ব্রাহ্মণ সহায়হরি চাটুয্যে গ্রামবাংলার একজন সমাজ অসচেতন উদাসীন প্রকৃতির লোক এবং অন্নপূর্ণা তারই মমতাময়ী সংসার-সচেতন স্ত্রী। সংসারে তাদের কোনো ছেলে-সন্তান নেই, আছে চার চারটি মেয়ে। বড় মেয়েটির নাম ক্ষেন্তি, বয়স পনেরো বছর। তৎকালীন হিন্দুপ্রধান সমাজে বাল্যবিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হতো। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিতে পারলে তখনকার পিতামাতাগণ গৌরববোধ করতেন। আর যথাশীঘ্র কম বয়সে বিয়ে দিতে অপারগ হলে পিতামাতা সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতেন। ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে লালন-পালনের অপরাধে তারা সমাজপতিদের দ্বারা লাঞ্ছিত, অপমানিত হতেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পের অসহায় পিতামাতা সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা এর বাস্তব প্রমাণ। সৎপাত্রের অভাবে বড় মেয়ে ক্ষেন্তিকে তারা বিয়ে দিতে পারছিলেন না, কিন্তু হৃদয়বান পিতামাতার এ কালক্ষেপণ সমাজপতি চৌধুরীরা মেনে নিতে পারেনি। তারা সহায়হরির বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ এনে তাকে একঘরে করে রাখার হুমকি দেয়। তাই সমাজ-সচেতন স্ত্রী অন্নপূর্ণা স্বামী সহায়হরিকে তাড়াতাড়ি মেয়ে বিয়ে দেওয়ার জন্য তাগিদ দেন।

মন্তব্য : সমাজপতিরা যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে পারে। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে কোনো পরিবারকে একঘরে করা কোনো কঠিন কাজ ছিল না। এ বিষয়টি চিন্তা করে স্বীয় পরিবারের ওপর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অন্নপূর্ণা স্বামীকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২২ ॥ আশীর্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হল না– ও নাকি উচ্ছুগৃগু করা মেয়ে– গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না– যাও, ভালোই হয়েছে তোমার।
অথবা, এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী, বাগ্দী-বাড়ী উঠে বসে দিন কাটাও।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতি ও সমাজজীবন নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : সহায়হরির দায়িত্বহীনতা ও উদাসীনতা সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে সমাজ সচেতন আদর্শ গৃহিণী অন্নপূর্ণা আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : 'পুঁই মাচা' গল্পের প্রধান চরিত্র সহায়হরি চাটুয্যের বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স পনেরোতে পড়েছে, কিন্তু পিতা তাকে পাত্রস্থ করতে পারেননি সৎ পাত্র ও অর্থের অভাবে। একবার ক্ষেন্তির বিয়ে ঠিক হয়ে আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের নির্ধারিত তারিখের কয়েক মাস পূর্বে সহায়হরি জানতে পারেন, পাত্রটি নিজের গ্রামে কী একটা অপরাধে বেদম মার খেয়েছিল। তাই সহায়হরি এ ধরনের পাত্রের হাতে স্বীয় কন্যাকে সোপর্দ করতে চাননি। এর ফলে ক্ষেন্তির বিয়ে হয়নি এবং সমাজে এ নিয়ে নানান কথাও উঠেছে। আশীর্বাদ হয়ে গেলে মেয়েকে উচ্ছুগগু অর্থাৎ উৎসর্গ করা হয়ে যায়। সুতরাং সেই মেয়েকে বিয়ে না দিয়ে ঘরে রাখার অপরাধে সমাজপতিরা সহায়হরিকে একঘরে করার হুমকি দেয়। কেউ তাকে আর কোনো সামাজিক কাজে যেতে বলবে না। সহায়হরি এসব সিদ্ধান্তের খবর রাখেন না। তিনি উদাসীন-অসচেতন স্বভাবের মানুষ। তিনি দুলে-বাড়ি ও বাগ্দী-বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকেন। আজ যখন তারক-খুড়োর গাছের রস আনার জন্য সহায়হরি স্ত্রীর কাছে ঘটি চেয়েছেন, তখনই শান্ত অথচ কঠিন স্বরে অন্নপূর্ণা তাকে তার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেন।

মন্তব্য : অন্নপূর্ণা ছিলেন সচেতন, সজাগ, বুদ্ধিমতী ও সাংসারিক স্ত্রী। তিনি আত্মসচেতন ছিলেন বলে সমাজের সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাই তিনি তাদের পরিবারের ব্যাপারে সমাজপতিদের নেওয়া সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্বামী সহায়হরিকে সতর্ক করে দেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৩ ॥ চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কী? [ফা. প. ২০১০]
অথবা, তোমাকে একঘরে করতে বেশি কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু সমাজজীবন ও প্রকৃতির গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে আশীর্বাদ হওয়া মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেওয়ায় তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ সহায়হরিকে এবং তার পরিবারকে যে হুমকি দিয়েছিল সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : একদিন অন্নপূর্ণা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চুলে তেল মাখছিলেন। এমন সময় তার স্বামী সহায়হরি চাটুয্যে বাড়ি প্রবেশ করে তারক-খুড়োর কাছ থেকে খেজুরের রস চেয়ে আনার জন্য অন্নপূর্ণার কাছে ঘটি চাইলেন। কিন্তু অন্নপূর্ণা এসব পছন্দ করতো না। তাই সে শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে স্বামীকে তার এ বাউণ্ডুলেপনার জন্য ভর্ৎসনা করে। তাদের মেয়ে ক্ষেন্তির আশীর্বাদ হওয়ার পর বিয়ে হয়নি। এ নিয়ে পাড়ায় নানান কথা হচ্ছে এবং সমাজ থেকে তাদের একঘরে করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সহায়হরি এসব কিছুর খোঁজ রাখেন

না। তিনি উদাসীন স্বভাবের মানুষ। সবসময় পাড়াময় ঘুরে বেড়ান। অর্থ উপার্জনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো কাজ করেন না। তাই স্ত্রীর মুখে একঘরে করে রাখার খবর শুনেও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করে বললেন, "এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার! একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন, এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর! ও!" স্বামীর এ অর্থহীন আস্ফালন দেখে অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে এ আবার এমন কঠিন কি?" কারণ অন্নপূর্ণা জানতেন, হিন্দু সমাজে যার অর্থের জোর নেই, যে সমাজে মাতব্বর শ্রেণির কেউ নয়, তাকে একঘরে করা কোনো কঠিন কাজ নয়। তাই অন্নপূর্ণা প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটি করেছে।

মন্তব্য : দুর্বলরা সর্বদা সবল কর্তৃক নির্যাতিত-নিপীড়িত হয়ে থাকে, যেমনটি হয়েছে সহায়হরির ক্ষেত্রে। তাই সমাজে মর্যাদার সাথে বসবাস করতে হলে সব ব্যাপারে সজাগ-সচেতন থাকা আবশ্যক।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৪ ॥ পিনটির বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সহায়হরি চাটুয্যে ছিলেন খুব গরিব। আলোচ্যাংশে তার বড় কন্যা ক্ষেন্তির একটি সেফটিপিনের প্রসঙ্গ তুলে ব্রাহ্মণ সহায়হরির দারিদ্র্যাবস্থার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : সহায়হরি চাটুয্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার চার চারটে কন্যা। বড়টির বয়স চৌদ্দ-পনেরো বছরের মতো, তার নাম ক্ষেন্তি। সহায়হরি যখন স্ত্রীর সাথে কথা কাটাকাটি শেষ করে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ক্ষেন্তি তার দু'টা ছোট বোনকে সাথে করে বাড়িতে ঢুকছিল। ক্ষেন্তির গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ অগোছালো। মুখখানা খুব বড়, চোখ দুটো ডাগর ও শান্ত। তার হাতে সরু সরু কাচের চুড়ি একটি সেফটিপিন দিয়ে আটকানো। পিনটির বয়স খুঁজতে গেলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়ে পড়তে হয়। ক্ষেন্তির বাবা সহায়হরির কোনো সহায়-সম্বল ছিল না। মেয়েদের তিনি অলঙ্কার কিনে দিতে পারেননি। ক্ষেন্তির হাতে আছে সরু কাচের চুড়ি। চুড়িগুলো যে সেফটিপিন দিয়ে আটকানো আছে তার ডজন পাওয়া যায় দু'পয়সায়। ক্ষেন্তির হাতের পিনটি অস্বাভাবিক পুরনো। সেটা যে কবে কেনা হয়েছে তার কোনো হদিস নেই। নতুন সেফটিপিন কিনে দেওয়ার সামর্থ্য হতদরিদ্র সহায়হরির নেই। তার দারিদ্র্যের প্রাবল্য এত বেশি যে, তিনি মেয়েদের তিন বেলা খাবারই দিতে পারেন না। তাই তার মেয়েদের হাতেও শোভা পাচ্ছে পুরাতন সেফটিপিন।

মন্তব্য : সহায়হরি চাটুয্যে ছিলেন তৎকালীন হিন্দু সমাজের অতিশয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির হাতের পুরনো সেফটিপিনই তার দারিদ্র্য প্রমাণ করে।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৫ ॥ দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে– আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায়-কাকা বললে, নিয়ে যা ...... কেমন মোটা মোটা ....।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশটুকু ভোজনপটু ক্ষেন্তির পুঁইশাকপ্রীতি ও তার নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ বহন করে।

বিশ্লেষণ : সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তির চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সে পুঁইশাকের প্রতি অতিমাত্রায় দুর্বল। "আর এই পুঁইশাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা বললে, নিয়ে যা .... কেমন মোটা মোটা ...." অথচ এ পুঁইশাকগুলো দেখলে মনে হয়, "কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে।" এ পুঁই রান্না করার জন্য ক্ষেন্তি তার গয়া পিসীর কাছ থেকে অনেক মিনতি করে চিংড়ি মাছ এনেছে। "দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে" –এ ছিল তার নিবেদন। এ থেকে বোঝা যায়, ক্ষেন্তির লোভের কারণেই সে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে। সে বুঝতে পারেনি, এ শাক দু'দিন পরেই উপড়ে ফেলে দিত তার রায় কাকা। তাই তাকে দিয়েই তার রায় কাকা সবজি ক্ষেত আগাছামুক্ত করেছে।

মন্তব্য : দরিদ্র সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তি। সে ছিল অধিকমাত্রায় ভোজনপটু। তার লোভের কাছে বুদ্ধি-বিবেচনা হয়েছিল পরাজিত, যা ব্যাখ্যেয় অংশটি দ্বারা প্রমাণিত।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৬ ॥ মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মার দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আলগা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পাকা পুঁইডাঁটা দেখে অন্নপূর্ণা উপর্যুপরি বকুনি দিলে অসহায় ক্ষেন্তির যে করুণ দশা প্রকাশ পেয়েছিল; আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে তা-ই ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : 'পুঁই মাচা' গল্পের ক্ষেন্তি সহায়হরির বড় মেয়ে। সে পনেরো বছর বয়সেই গ্রামীণ হিন্দু সমাজে সকলের কাছে দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। বিয়ে দেওয়ার বয়স রীতিমতো চলে যাচ্ছে বলেই সকলের ধারণা। হিন্দু সমাজে বাল্যবিয়ে প্রচলিত থাকায় সবার মধ্যে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। এ নিয়ে সহায়হরির অবশ্য তেমন কোনো চিন্তা নেই। কারণ তিনি ছিলেন সমাজের অন্যান্য লোক থেকে আলাদা প্রকৃতির। ক্ষেন্তির মা অন্নপূর্ণা যখন মেয়ের ব্যাপারে বাবার উদাসীনতার অভিযোগ এনে স্বামী সহায়হরিকে রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করছিলেন, তখনই ক্ষেন্তি হাতে এক বোঝা পাকা পুঁইডাঁটা নিয়ে বাড়িতে ঢুকে। এতে সহায়হরির কিছুটা আহ্লাদিত ভাব হলেও অন্নপূর্ণার রাগ বেড়ে যায় দ্বিগুণ। তার ধারণা, কারো পরিত্যক্ত পাকা পুঁই-শাকের ডাঁটা সে কুড়িয়ে এনেছে। তাই সে কঠোর ভাষায় মেয়েকে ভর্ৎসনা করে পাড়া বেড়াতে নিষেধ করে দেয়। ক্ষেন্তি মায়ের এ রুক্ষ মেজাজে হতভম্ব হয়ে যায়। মায়ের প্রচণ্ড তিরস্কারে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। যে আহ্লাদে সে শাক কুড়িয়ে এনেছিল তা মুহূর্তে মিলিয়ে গেল, মুখে ভেসে উঠল ভীতির ছাপ। আর তখন তার হাতের বাঁধন আলগা হয়ে পুঁইশাকের আধপাকা ডাঁটার বোঝাটি মাটিতে পড়ে গেল।

মন্তব্য : ক্ষেন্তি তার স্বভাবসুলভ চাপল্যের বিড়ম্বনা সম্পর্কে অসচেতন ছিল। বুদ্ধির কিংবা বয়সের স্বল্পতার কারণে তার মাঝে তখনো সামাজিক সচেতনতার উন্মেষ ঘটেনি। সেজন্যই মায়ের ভর্ৎসনা তার অবুঝ মনে একটু ধাক্কা লাগল বৈ কি।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৭ ॥ নিয়ে যা, খেতে হবে না– মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কীসের?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বড় মেয়ে ভোজনপটু ক্ষেন্তিকে শাসনের ছলে অন্নপূর্ণা ছোট মেয়ে লক্ষ্মীকে আদর মেশানো ধিক্কার দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : 'পুঁই মাচা' গল্পের ক্ষেন্তির বয়স পনেরো বছর। সে খুব ভোজনপটু। এ বয়সী মেয়েদের যতটুকু আত্মসচেতনতা ও পারিপার্শ্বিক কাণ্ডজ্ঞান থাকা প্রয়োজন ক্ষেন্তির তা মোটেও নেই; বরং সে চঞ্চলা চপলা এবং লজ্জাবোধহীনভাবে এপাড়া থেকে ওপাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। আসলে মেয়েটি তার বাবা সহায়হরির মতোই একটুখানি উদাসীন স্বভাবের। সহায়হরিও নানাজনের কাছ থেকে এটা ওটা নির্দ্বিধায় চেয়ে নেয়। হয়তো এ স্বভাবটাই ক্ষেন্তি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এজন্য মা অন্নপূর্ণা সর্বদা চিন্তিত থাকেন। তিনি মনে করেন, মেয়ে একদিন পরের ঘরে যাবে। এরূপ স্বভাব, চাল-চলন থাকলে শ্বশুর বাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করবে না; বরং মা-বাবাকে উদ্দেশ্য করে খারাপ কথা বলবে। তাই তিনি মেয়েকে পরের বাড়ির উপযোগী করে গড়ে তুলতে চান। একদিন ক্ষেন্তি পাকা পুঁইশাকের ডাঁটা নিয়ে বাড়ি ঢোকার পর অন্নপূর্ণা রেগে যান। কারণ কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে আনা অন্নপূর্ণা পছন্দ করেন না। এটা তার কাছে অত্যন্ত বেহায়াপনা বলে মনে হয়। তাই মেয়ের এরূপ আচরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি ছোট মেয়ে লক্ষ্মীকে ক্ষেন্তির আনা পুঁইশাকগুলো দূরে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলেন। এতে ছোট মেয়ে লক্ষ্মী কিছুটা অনিচ্ছা প্রকাশ করলে অন্নপূর্ণা বললেন, "নিয়ে যা, খেতে হবে না– মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কীসের"?

মন্তব্য : সব মা-ই চান, তার সন্তানেরা অশোভনীয় আচরণগুলো পরিবর্তন করে প্রশংসনীয় চরিত্রে গড়ে উঠুক। অন্নপূর্ণাও তার সন্তান ক্ষেন্তির ক্ষেত্রে তাই চেয়েছেন।

⏩ ব্যাখ্যা : ২৮ ॥ পুঁই শাকের উপর তাহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন– কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই?

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে পুঁইশাকের ওপর ক্ষেন্তির লোভ এবং ক্ষেন্তির প্রতি তার মায়ের অকৃত্রিম ভালোবাসার রূপ ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : সহায়হরি ও অন্নপূর্ণা দম্পতির বড় মেয়ে ক্ষেন্তি পুঁইশাক অত্যন্ত ভালোবাসে। চিংড়ি মাছ দিয়ে পুঁইশাকের চচ্চড়ি তার কাছে খুবই প্রিয়। তাই ক্ষেন্তি একদিন গয়া পিসীর কাছ থেকে কিছু চিংড়ি এবং তার রায় কাকার কাছ থেকে কতকগুলো পাকা পুঁইশাক চেয়ে এনে মায়ের কাছে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে হাজির হলো। এতে অন্নপূর্ণা মেয়ের প্রতি খুব চটে গিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি ছোট মেয়েকে দিয়ে পুঁইশাকের আপদগুলো পুকুরের ধারে ফেলে দিলেন, কিন্তু মায়ের কোমল হৃদয় একটু পরেই সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে বিগলিত হয়ে গেল। তার স্মরণ হলো, একদিন পুঁইশাক রান্নার সময় ক্ষেন্তি বলেছিল, মা অর্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার আর অর্ধেক সব মিলে তোমাদের। তাই যখন বাড়িতে কেউ ছিল না, তখন অন্নপূর্ণা নিজে উঠে গিয়ে খিড়কির কাছে পড়ে থাকা কতকগুলো পুঁইশাক কুড়িয়ে এনে কুঁচো চিংড়ি দিয়ে একরূপ চুপি চুপিই রান্না করলেন। দুপুর বেলা ক্ষেন্তি তার পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখে বিস্মিত ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালে মা খানিকটা দূরে সরে গেলেন। দু'একবার এদিক ওদিক ঘুরে এসে দেখলেন, পুঁইশাকের এক টুকরোও ক্ষেন্তির পাতে নেই। পুঁইশাকের প্রতি ক্ষেন্তির লোভের কথা অন্নপূর্ণা পূর্বেই জানতেন। তাই তিনি মেয়েকে মমতামিশ্রিত সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আর একটু চচ্চড়ি নেবে কিনা।

মন্তব্য : মায়ের ভালোবাসা অকৃত্রিম। সন্তানের জন্য মায়ের দরদ স্বাভাবিক। প্রত্যেক মা-ই তার সন্তানকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

➧ ব্যাখ্যা : ২৯ ॥ কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সহায়হরি চাটুয্যের স্ত্রী অন্নপূর্ণার সন্তানবাৎসল্যের চিত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে আলোচ্য উক্তিতে।

বিশ্লেষণ : ক্ষেন্তি ছিল স্বভাবসুলভ ভোজনপটু মেয়ে। পুঁইশাক ছিল তার প্রিয় তরকারি। একদিন ক্ষেন্তি তার ছোট বোনকে সাথে করে ওপাড়ায় রায়দের বাগানের ফেলে দেওয়া পাকা পুঁইশাকের ডাঁটা কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে এলে মা অন্নপূর্ণা তাকে খুব তিরস্কার করেন। মায়ের আদেশে ছোট মেয়ে পুঁইশাকের বোঝাটি ছাইয়ের গাদার পাশে ফেলে দেয়। দুপুর বেলা রান্না করতে গিয়ে অন্নপূর্ণার মাতৃহৃদয় মোমের মতো গলে গেল। তিনি জানতেন, তার এ ভোজনপটু মেয়েটি পুঁইশাক কতখানি পছন্দ করে। আজ কত আশা নিয়ে প্রখর রোদের মাঝে ক্ষেন্তি ওগুলো কুড়িয়ে এনেছে, অথচ রাগ করে তিনি তা ফেলে দিয়েছেন। বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। অন্নপূর্ণা উঠে গিয়ে ফেলে দেওয়া পুঁইশাকের যতটা সম্ভব সংগ্রহ করে এনে রান্না করেন। খাওয়ার সময় পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখে ক্ষেন্তি বিস্মিত হয়। সে সাগ্রহে পুঁইশাক খেয়ে শেষ করে ফেলে। অন্নপূর্ণা চেয়ে দেখলেন, ক্ষেন্তির পাতে এক টুকরো পুঁইশাকও অবশিষ্ট নেই। আর একটু পুঁইশাক নেবে কিনা, এ প্রশ্নের জবাবে ক্ষেন্তি সোৎসাহে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে অন্নপূর্ণার চোখে জল আসে। সন্তান-বাৎসল্যের প্রাবল্যে তার কোমল হৃদয় কেঁদে ওঠে। চোখের জল গোপন করতে তিনি চোখ উঁচু করে চালের বাতায় গোঁজা শুকনা লঙ্কা পাড়তে শুরু করেন।

মন্তব্য : সন্তানের প্রতি অন্নপূর্ণার এ আচরণের মধ্য দিয়ে তার মাতৃহৃদয়ের কোমল রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

➧ ব্যাখ্যা : ৩০ ॥ সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।

অথবা, সমাজে ব'সে এ সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব– এ তুমি মনে ভেব না।

অথবা, ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে? আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাকের যা বাকী, এই তো?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পরিবারের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে সমাজপতি কালীময় ঠাকুর সহায়হরি চাটুয্যেকে তার সমাজবিরোধী কাজের জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : আবহমানকাল থেকে সমাজে দুর্বলের ওপর সবলের শাসন-শোষণ চলে আসছে। সহায়হরি চাটুয্যে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বয়স পনেরো বছর। এখনো তিনি মেয়ের বিয়ে দিতে সক্ষম হননি। একবার কালীময় ঠাকুর মণিগাঁয়ের

শ্রীমন্ত মজুমদারের ঘর থেকে একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন। আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পূর্বে পাত্রের অসৎ চরিত্র সম্পর্কে জানতে পেরে সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মেয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্র ঠিক করতে পারেননি। সমাজে এ নিয়ে নানান কথা ওঠে। বয়সোত্তীর্ণ উচ্ছুগগু করা মেয়ের বিয়ে দেওয়া হচ্ছে না বলে সমাজপতিরা ক্ষুব্ধ হলেন। সহায়হরিকে একঘরে করার জন্য সমাজপতি কালীময় ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপে তার ডাক পড়ল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দেওয়ার পর কালীময় ঠাকুর উত্তেজিত স্বরে তাকে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি ক্ষেন্তির আশীর্বাদ হয়েও বিয়ে না হওয়া সম্পর্কে বললেন, "ও তো একরকম উচ্ছুগগু করা মেয়ে? আশীর্বাদ হওয়াও যা, বিয়ে হওয়াও তা, সাত পাঁকের যা বাকি, এই তো? সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব, এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, তবে মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল।" এভাবে কালীময় ঠাকুর দরিদ্র নিরুপায় সহায়হরিকে সামাজিক অনুশাসনের কশাঘাতে জর্জরিত করেন। কিন্তু হতভাগ্য সহায়হরি বলির পাঁঠার ন্যায় মুখ বুজে মাথা নত করে সকল অপমান লাঞ্ছনা হজম করলেন।

মন্তব্য : ব্রাহ্মণ সমাজের অনুশাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছেন দরিদ্র সহায়হরি। সমাজের কর্তা ব্যক্তিদের এসব হুমকি-ধমকি ও শোষণের প্রতিবাদ করার মতো শক্তি ও সাহস তার ছিল না।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩১ ॥ লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ-মেজেস্টর না হলে কি মানুষ হয় না?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু জীবন ও প্রকৃতির শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে সহায়হরি চাটুয্যের মেয়েকে বিয়ে দিতে দেরি হওয়ায় তার প্রতি কালীময় ঠাকুরের তিরস্কার উদ্ধৃত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ক্ষেন্তি সহায়হরি চাটুয্যের বড় মেয়ে। তার বয়স নিতান্ত কম হলেও তৎকালীন সমাজের চোখে তা ছিল কিছুটা বেশি। তাছাড়া ক্ষেন্তি ভোজনপটু ও অসচেতন প্রকৃতির হওয়ায় পিতামাতা সৎপাত্রের অভাবে তার বিয়ে দিতে দ্বিধা করেন। অনেকদিন থেকেই সম্বন্ধের আভাস আসে, কিন্তু সবদিক বিবেচনায় উপযোগী না হওয়ায় সহায়হরি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। একদিন সমাজপতি কালীময় সহায়হরির শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে ক্ষেন্তির বিয়ের সম্বন্ধ আনেন। সহায়হরি গরিব মানুষ, বেশি পণ দিতে পারবেন না। তাই কালীময় শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলের সাথে ক্ষেন্তির বিয়ে ঠিক করেন, কিন্তু স্নেহপ্রবণ পিতা পাত্রের দোষের কথা শুনে এ বিয়ে ভেঙে দেন। ফলে আশীর্বাদ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষেন্তির বিয়ে হয়নি। এতে কালীময়ের ইচ্ছা পূরণ না হওয়ায় তিনি সহায়হরির প্রতি রুষ্ট হন এবং সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে সহায়হরিকে শায়েস্তা করতে মনস্থ করেন। কিছুদিন পর কালীময় ঠাকুর সহায়হরিকে চণ্ডীমণ্ডপে ডেকে নিয়ে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, কিন্তু কিছুই হয়নি জানতে পেরে নানা কটুকথার মাধ্যমে মনের ঝাল মেটাতে লাগলেন। কটু ভাষায় বললেন, দরিদ্র মানুষের এত বাছাবাছি কেন? ছেলে লেখাপড়া না-ই বা জানল, না-ই বা হলো জজ-ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু বাড়ি, বাগান, পুকুর তো আছে, এমন ছেলের সাথে তুমি মেয়ের বিয়ে দিলে না।

মন্তব্য : সমাজের স্বার্থান্বেষী মানুষগুলো অন্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। আর এক্ষেত্রে ব্যর্থ হলে প্রতিশোধ নিতে উদ্যোগী হয়। কালীময় ঠাকুর তাদেরই একজন।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩২ ॥ ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারও ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অথবা, তৎপর পিতা-পুত্রীতে সন্তপণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে মেটে আলু চুরি করার উদ্দেশ্যে পিতা-কন্যা শাবল হাতে অতি সন্তর্পণে যাচ্ছিলেন, তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : একদিন শীতের সকালে উঠানে বাতাবীলেবু গাছের ফাঁক দিয়ে যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র এসেছিল, সহায়হরি চাটুয্যে তারই তাপে বসে আপন মনে তামাক টানছিলেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি চুপি চুপি বাবা সহায়হরিকে বলল, চল আমরা বরোজপোতার বন থেকে মেটে আলু নিয়ে আসি। ক্ষেন্তি তার মা অন্নপূর্ণাকে যেমনি ভয় পায় ঠিক সহায়হরিও স্ত্রী অন্নপূর্ণাকে ভয় পায়। পিতা-কন্যার এ পরিকল্পনার সময় অন্নপূর্ণা স্নান করার জন্য ঘাটে গিয়েছিলেন। তাই মেয়ের প্রস্তাবে সহায়হরি বাড়ির পাশে ঘাটের পথের দিকে একবার চেয়ে বললেন, ক্ষেন্তি! ঘর থেকে তাড়াতাড়ি শাবলটা নিয়ে আয়, কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি ঘাটের পথের দিকে আবদ্ধ থাকে। ইতোমধ্যে মেয়ে ক্ষেন্তি শাবল নিয়ে আসলে পিতা-কন্যা উভয়েই দ্রুতগতিতে অতি সন্তর্পণে বনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। তাদের গতিভঙ্গি এমনই ছিল, মনে হয় যেন তারা কারো বাড়িতে সিঁধ কাটতে যাচ্ছে।

মন্তব্য : অভাব মানুষকে অনেকসময় বিবেকহীন করে তোলে; ফলে মানুষ সমাজগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সহায়হরির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩৩ ॥ তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। [ফা. প. ২০১৪, '১৭]

অথবা, মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলু চুরি করার পর মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষেন্তির যে করুণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা-ই গল্পকার আলোচ্যাংশে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : সহায়হরি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত এ ব্রাহ্মণ অন্যের কোনোকিছু না বলে নিয়ে আসা তেমন অপরাধ মনে করেন না। তিনি মাঝে-মধ্যেই এখান-ওখান থেকে অনেককিছু চেয়ে কিংবা না বলে নিয়ে আসতেন। এজন্য স্ত্রী অন্নপূর্ণা তাকে উপর্যুপরি ভর্ৎসনা করতেন। তাদের বড় মেয়ে ক্ষেন্তিও বাবার স্বভাবে প্রভাবিত হয়ে তাকে সহযোগিতা করতো। একদিন বাবার সাথে ক্ষেন্তি বরোজপোতার জঙ্গল থেকে একটা বিরাট মেটে আলু নিয়ে আসে। এ সময় অন্নপূর্ণা বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ি ফিরে আলু দেখে তার সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে সহায়হরিকে জিজ্ঞেস করেও তেমন সদুত্তর পায়নি। তিনি জানান, ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার তাকে আলুটা তুলে আনতে বলেছে। কিন্তু স্বামীর কথা তার বিশ্বাস হয় না। এবার তিনি ক্ষেন্তিকে ডেকে আলু প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন। মায়ের সম্মুখে এসে ক্ষেন্তির গলা শুকিয়ে গেল। সে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আবার মাটি ত রাখা মেটে আলুটা দেখে মায়ের দিকে পুনরায় তাকাল। ভয় আর সংকোচে তার কপালে বিন্দু বিন্দু

ঘাম দেখা দিল। মায়ের কাছে সে মিথ্যা বলতে সাহস পাচ্ছে না। আবার সত্যি বলতেও ভয় লাগছিল। তাই তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছিল না।

মন্তব্য : ক্ষেন্তি ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল প্রকৃতির মেয়ে। সে তার মাকে যেমন সমীহ করতো তেমনি ভয়ও পেত। এজন্য সে মায়ের সামনে মিথ্যা কথা বলতে সাহস পায়নি।

» ব্যাখ্যা : ৩৪ ॥ আমার জোটে খাব, না জোটে না খাব– তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? অথবা, এ-মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও পরিবারের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে অন্নপূর্ণার ব্যক্তিত্ব ও সততার পরিচয় ফুটে উঠেছে। তিনি চৌর্যবৃত্তির নিন্দা করে স্বামী ও মেয়েকে তিরস্কার করে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : অন্নপূর্ণা ছিলেন দরিদ্র ব্রাহ্মণের স্ত্রী। অভাবের সংসারে তার সবসময় টানাটানি লেগেই থাকত। তাই বলে তিনি কারো কাছ থেকে কিছু চেয়ে না-চেয়ে আনা পছন্দ করতেন না। স্বামী সহায়হরি ছিলেন ঠিক এর উল্টো। তিনি এর-ওর কাছ থেকে প্রায়ই এটা-সেটা চেয়ে না-চেয়ে নিয়ে আসতেন। একদিন সহায়হরি মেয়ে ক্ষেন্তিকে সাথে করে বরোজপোতার জঙ্গল থেকে একটা বিরাট মেটে আলু তুলে নিয়ে এলেন। অন্নপূর্ণা বাড়িতে এসে আলুটা দেখে সন্দিহান হয়ে পড়লেন। স্ত্রী জিজ্ঞেস করায় সহায়হরি মিথ্যা বললেন। তিনি জানালেন, ও-পাড়ার ময়শা চৌকিদার আলুটা তাকে তুলে আনতে বলেছে। স্বামীর কথায় অন্নপূর্ণার বিশ্বাস হলো না। তিনি ক্ষেন্তিকে জেরা শুরু করলেন। মায়ের কাছে মিথ্যা বলার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই ক্ষেন্তির ছিল না। অন্নপূর্ণা বরোজপোতার জঙ্গলে গিয়ে মেটে আলু চুরি করার অপরাধে মেয়ে ক্ষেন্তিকে তীব্র কণ্ঠে ভর্ৎসনা করেন। মুখে যা এল তা-ই শুনিয়ে দিলেন। অন্নপূর্ণার নীতি হলো, নিজের জুটলে খাবেন, না জুটলে না খাবেন। তাই বলে পরের জিনিসে হাত দেওয়া তিনি কখনো সমর্থন করেননি। চৌর্যবৃত্তিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন।

মন্তব্য : দরিদ্র গৃহবধূ সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণা ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ। তিনি চৌর্যবৃত্তি ও কোনো অন্যায় কাজকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। এজন্য ক্ষেন্তিকে নিয়ে তিনি সর্বদাই উৎকণ্ঠায় থাকতেন।

» ব্যাখ্যা : ৩৫ ॥ মুখ যদি মনের দর্পণ-স্বরূপ হয় তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প হতে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ক্ষেন্তি তার মা অন্নপূর্ণার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে এক থাবা নারকেল নিয়ে একটু দূরে গিয়ে যেভাবে খাচ্ছিল, সে দৃশ্যের বর্ণনা এখানে ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : ক্ষেন্তিকে পৌষ-সংক্রান্তির পিঠে তৈরিতে প্রথমে নিতে চায়নি তার মা। কারণ ক্ষেন্তি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, তার কাপড় শাস্ত্রসম্মত শুদ্ধ নয়। ক্ষেন্তির অসীম আগ্রহ ও আকুতির ফলে হাত-পা ধুয়ে শুদ্ধ কাপড় পরিয়ে অবশেষে পিঠা তৈরিতে নিয়েছে। ময়দার গোলা মাখা শেষ করে খোলা উনুনে চাপাতে যাবেন, এমন সময় ছোট মেয়ে লক্ষ্মী হঠাৎ ডান হাত পেতে ময়দার গোলা খেতে চায়। অন্নপূর্ণা প্রথমে লক্ষ্মীকে, তারপর পুঁটিকে

ময়দার গোলা দিয়ে তারপর তার লোভী মেয়ে ক্ষেন্তির জন্য একটু বেশি করে রেখে দেয়। এরপর জেঠাইমার পিঠা তৈরি নিয়ে দু'বোনের মধ্যে কথা শেষ হলে ক্ষেন্তি মায়ের কাছে একটু নারকেলকোরা চেয়ে নিয়ে তা অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে খেতে থাকে। এ নারকেলকোরা ক্ষেন্তি এমনভাবে খাচ্ছিল, যা দেখে মানবমনের আত্মতৃপ্তির স্বরূপ বিচার করা সম্ভব। Face is the mirror of mind. একথা সত্য বলেই ক্ষেন্তির মুখ দেখে তার মনের তৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

মন্তব্য : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন নিপুণ চরিত্র বিশ্লেষক ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী সুদক্ষ গল্পকার। তাই তিনি ক্ষেন্তির মানসিক তৃপ্তি বিধৃত করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৬ ॥ তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন— চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সমাজ ও পারিবারিক জীবনের শাশ্বত চিত্র অঙ্কনকারী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিতে ক্ষেন্তিকে বিয়ের পরে স্বামীর হাতে তুলে দেওয়ার সময় মা অন্নপূর্ণার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : অন্নপূর্ণার বড় মেয়ে ক্ষেন্তি। বয়স পনেরো, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তার বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। একবার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়েছিল এবং আশীর্বাদও হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পাত্রের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ খবর পাওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলেন। এরপর ক্ষেন্তি উচ্ছুগগু করা মেয়ে বলে সমাজে নানা গুজব রটেছিল। অরক্ষণীয়া মেয়েকে ঘরে রাখার অপরাধে সমাজপতিরা সহায়হরিকে একঘরে করার হুমকি পর্যন্ত দেয়। বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিয়ে হয়ে গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশি হবে না। প্রথমত অন্নপূর্ণা এখানে মেয়ের বিয়ে দিতে আদৌ রাজি ছিলেন না। কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, শহর অঞ্চলে বাড়ি এবং চুন ও ইটের ব্যবসা আছে। এসব চিন্তা করেই শেষপর্যন্ত সম্মতি দিয়েছিলেন। জামাতার বয়স একটু বেশি, এ কারণে অন্নপূর্ণা জামাতার সামনে বের হতে সংকোচবোধ করছিলেন। কিন্তু পরে চিন্তা করে দেখলেন, তিনি এরকম করলে ক্ষেন্তি মনে কষ্ট পেতে পারে। তাই বরণের সময় তিনি মেয়ের সুপুষ্ট হাতখানি ধরে তুলে দিলেন জামাতার হাতে। এ সময় চোখের জলে তার গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। ফলে কোনো কথাই তিনি বলতে পারলেন না।

মন্তব্য : সমাজপতিদের বিরূপ সমালোচনার কারণে বয়স্ক জামাতার হাতে অবুঝ, অসচেতন, ভোজনপটু নিরীহ কন্যা সম্প্রদান করতে গিয়ে অন্নপূর্ণার বুক ভেঙে কান্না আসছিল এবং চোখের জলে তার গলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৩৭ ॥ প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্ক সুরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত 'পুঁই মাচা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য অংশে গল্পকার দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহায়হরির অতীত বংশমর্যাদা প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : সহায়হরি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। চার মেয়েকে নিয়ে তার ছয় সদস্যের পরিবার। কিছুদিন আগে তার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির বিয়ে হয়ে যায় দূরসম্পর্কীয় এক আত্মীয়ের ঘটকালিতে। আষাঢ়ের এক বর্ষণমুখর দিনে দাওয়ায় বসে সহায়হরির প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকার কথা প্রসঙ্গে ক্ষেন্তির সম্পর্কে জানতে চায়। সহায়হরি তাকে জানায়, মেয়ের বিয়ের পণবাবদ আড়াইশ টাকা শোধ করা বাকি ছিল। এজন্য মেয়ের শাশুড়ি তাকে নানা কথা শুনিয়ে দেয়, তার সাথে মেয়েকে কিছুতেই পাঠায়নি বরং ছোটলোক হিসেবে উপহাস করে। তাই ক্ষোভের সাথে সহায়হরি তার অতীত টেনে বলতে থাকে, তার পূর্বপুরুষেরা এ এলাকায় বেশ প্রভাবশালী ছিল। তার পূর্বপুরুষ পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীল কুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে। তাদের আভিজাত্যের এ গৌরব স্মরণ করে তিনি একটু শুষ্ক হাসি হাসেন।

মন্তব্য : চিরদিন মানুষের সমান যায় না। তাই একদিনকার উচ্চমর্যাদার অধিকারী সহায়হরি একসময় সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। সাথে সাথে তার বংশগৌরবও ম্লান হয়ে পড়ে। তারই স্মৃতিচারণ করেন সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সাথে আলাপে।

হুযুর কেবলা

⏩ ব্যাখ্যা : ৩৮ ॥ সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

[ফা. প. ২০১৩, '১৭, '১৯]

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে এমদাদ আস্তিকতায় ফিরে এসে নতুন জীবনে জনগণের নিকট থেকে যে সম্মান পেয়েছে, সে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্লেষণ : এমদাদ একজন শিক্ষিত যুবক। সে কলকাতায় দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পড়ত। আল্লাহর অস্তিত্বে তার ছিল ঘোর সংশয়। সে ধর্ম, আল্লাহ, রাসুল কিছুই বিশ্বাস করতো না। সে আল্লাহর আরশ, ফেরেশতা, অহি, মহানবির মিরাজ নিয়ে সর্বদা হাসিঠাট্টা করতো। কলেজ ম্যাগাজিনে সে আল্লাহর অস্তিত্বের অসারতা প্রমাণ করার জন্য মিল, হিউম, স্পেন্সার, কোঁত প্রমুখ লেখকের ভাব চুরি করে প্রবন্ধ লিখত। সেই এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে হঠাৎ বদলে গিয়ে ধর্মকর্মে মনোযোগ দেয়। এ সময় সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে শুরু করে। আধুনিক জীবনযাপনের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। আধুনিক জীবনযাপনের উপকরণগুলো সে একে একে নষ্ট করে ফেলে। সবগুলো বিলাতি ফিনফিনে ধুতি, সিল্কের জামা পুড়িয়ে দেয়। ফ্লেক্সের ব্রাউন রঙের পাম্পশুগুলো বাবুর্চিখানার বঁটি দিয়ে কুপিয়ে ইলশা-কাটা করে। এক পর্যায়ে সে কলেজও পরিত্যাগ করে। তারপর সে কোরা খদ্দরের কল্লিদার কোর্তা ও সাদা লুঙ্গি পরে মুখে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ ঝাঁকড়া দাড়ি নিয়ে সামনে-পেছনে সমান করে চুল কেটে, মাথায় কান পর্যন্ত গোল টুপি পরে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। সেদিন রাস্তায় বহুলোক তাকে সালাম দেয়। এমদাদ ধর্মের প্রতি জনগণের ভক্তি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে। ধর্ম এবং ধর্মীয় লেবাসের প্রতি এ ভক্তি দেখে তার মনে হলো, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

মন্তব্য : আলোচ্যাংশে আমাদের সমাজের অতি পরিচিত চিত্র ফুটে উঠেছে। ধর্মীয় লেবাস ও ধর্মকর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা এখনো আমাদের সমাজে বিদ্যমান।

⏩ ব্যাখ্যা : ৩৯ ॥ হে দেহ, তুমি আমার আত্মাকে ছোট করিয়া নিজেই বড় হইতে চাহিয়াছিলে। কিন্তু আর নয়।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এমদাদ ধর্মের পথে ফিরে আসার পর ইবাদতে মনোনিবেশ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে। এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য উক্তির অবতারণা।

বিশ্লেষণ : এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর তার জীবনে বড় রকমের পরিবর্তন আসে। বলা যায়, তা একেবারেই মৌলিক পরিবর্তন। সে অতি যত্নের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়তে লাগল। বিশেষ করে নফল নামাজে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়ল যেন বিগত জীবনের অনাদায়কৃত নামাজগুলো পরিশোধ করতে চায় সে। বিদেশি কোনো দ্রব্য সে এখন আর ব্যবহার করে না। তাই গোল গোল করে বাঁশের কঞ্চি কেটে নিজ হাতে এক ছড়া তসবিহ তৈরি করে এমদাদ। সে তসবির উপর দিয়ে সর্বদা আঙ্গুল চালিয়ে যিকির করতে থাকে। মুসলমান সব কাজে আল্লাহকে স্মরণ রাখে। কোনো মুহূর্তেই সে তার প্রভুকে ভুলতে পারে না। এ বিশ্বাস থেকে সে তসবিহ জপতে থাকে সারাক্ষণ। এতে করে তার দুটো আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়ে গেল তসবির ঘর্ষণে। জীবনাচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্ম পালনে এতদিনকার আরাম-আয়েশি শরীর ভেঙে পড়ে। মনে মনে সে ভাবল, শরীর এতদিন আত্মাকে ছাড়িয়ে বড় হচ্ছিল, কিন্তু তাকে আর বড় হতে দেওয়া যায় না। এ ব্যাপারে এমদাদের মানসিকতা ছিল অটল।

মন্তব্য : এমদাদ ধর্মের প্রতি মনোযোগী হয়েছিল, কিন্তু তার শরীর-মন তাকে সহযোগিতা করে না বলে সে শরীরকে উদ্দেশ্য করে উপর্যুক্ত উক্তি করেছিল।

⏩ ব্যাখ্যা : ৪০ ॥ কিন্তু পোড়া চোখের পানি কোনো মতেই আসিল না।
অথবা, অগত্যা সে নামাজে বসিয়া খোদার নিকট হাত তুলিয়া কাঁদিবার বহু চেষ্টা করিল।
অথবা, চোখের পানির অপেক্ষায় আগে হইতে কান্নার মত মুখ বিকৃত করিয়া রাখিল।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : জোর-জবরদস্তি করে ধর্মকর্মে মন বসাতে চেয়েছিল এমদাদ, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে এমদাদ প্রশ্নোল্লিখিত আচরণ করেছিল।

বিশ্লেষণ : অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কলেজ ছাড়ার পর এমদাদ এখন একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। ধর্মকর্মে এতটাই মনোযোগী হয়েছে যে, আধুনিক জীবনযাপন ত্যাগ করে সে সাধারণ জীবনযাপনে আনন্দবোধ করতে লাগল। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনোটাই যেন কাযা না যায়, সেদিকে সে সর্বক্ষণ খেয়াল রাখে। বেশি বেশি করে নফল নামাজ পড়তে শুরু করে। গোল গোল করে বাঁশের কঞ্চি কেটে সে নিজ হাতে এক ছড়া তসবিহ তৈরি করল। সে তসবির উপর দিয়ে দিনরাত আঙ্গুল চালিয়ে দুটি আঙ্গুলের মাথা ছিঁড়ে ফেলল। তবু ধর্মে অটল থাকল। সে দেহের কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করল। দেহ যেন আত্মাকে ছোট করতে না পারে, সেজন্য সে দেহের প্রতি যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেয়। এতকিছুর পরেও একটা অস্বস্তি এমদাদকে ঘিরে ধরে। বহু চেষ্টা করেও সে ইবাদতে নিষ্ঠা আনতে পারছিল না। বহু প্রক্রিয়া সে অবলম্বন করেছে, কিন্তু পোড়া ঘুম তাকে তাহাজ্জুদের

নামাজ তরক করতে বাধ্য করতে লাগল। এ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য সে নামাজে বসে খোদার নিকট হাত তুলে কাঁদার বহু চেষ্টা করল। চোখের পানির অপেক্ষায় আগে থেকে কান্নার মতো মুখ বিকৃত করে রাখল, কিন্তু পোড়া চোখের পানি কিছুতেই আসল না। একটু কেঁদে সে যে হালকা হবে তাও হলো না।

মন্তব্য : কখনো জোর-জবরদস্তি করে ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করা যায় না। এজন্য প্রয়োজন অন্তর থেকে ভক্তি বিশ্বাস।

➧ ব্যাখ্যা : ৪১ ॥ পীর না ধরিয়া কি কেহ রুহানিয়ৎ হাসেল করিতে পারে?

অথবা, জযবা ও সলুক খতম করিয়া ফানা ও বাকা লাভে সমর্থ হইয়াছেন এইরূপ কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মজযুব পীরের দামন না ধরিয়া কেহ যমিরের রওশ্‌নী ও রূহের তরক্কী হাসেল করিতে পারে না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে ধর্মেকর্মে এমদাদের নিষ্ঠা না আসায় এক সুফী সাহেবকে তার বেদনার কথা জানালে তার প্রতি সুফী সাহেবের মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : একসময়ের নাস্তিক এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাতারাতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। সে তার আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে ধর্মীয় লেবাস গায়ে জড়িয়ে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে থাকে। তসবিহ টিপতে টিপতে দুটি আঙ্গুলের মাথা ক্ষয় করে ফেলে, কিন্তু এতেও সে টলে যায়নি। সে তার দেহকে শাসন করতে লাগল, কিন্তু একটা অস্বস্তি তাকে ঘিরে রাখল। বহু চেষ্টায়ও সে ইবাদতে মনস্থির করতে পারল না। স্থানীয় কংগ্রেস এবং খেলাফত কমিটির সেক্রেটারি এমদাদ। সেখানে প্রত্যহ যারা একত্র হতেন, তাদের একজন সুফী সাদুল্লাহ। তিনি পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা। এ পীরের অনেক কেরামতির কথা লোকমুখে শোনা যায়। এমদাদ তার অস্থির চিত্তের কথা সুফী সাদুল্লাহকে জানায়। সুফী সাহেব দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চাইলেন, এমদাদ কার মুরিদ? সে জানালো, সে কারো মুরিদ নয়। রোগ নির্ণয় করে ফেলেছেন, এমন ভাব দেখিয়ে সুফী সাহেব বললেন, গোড়াতেই গলদ। পীর না ধরে কি কেউ রুহানিয়ৎ হাসিল করতে পারে। পীরের সাহায্য নিলেই আত্মার শান্তি ফিরে আসে। তাই এমদাদ একজন কামেল পীরের সান্নিধ্যে এসে পীরের মুরিদ হয়।

মন্তব্য : আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য খাঁটি কামেল অলীর সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে ধর্মের দোহাই দিয়ে একশ্রেণির ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং মুরিদ বৃদ্ধি করে তাদের ব্যবসায় জমজমাট করার জন্য এ ধরনের উক্তি করে থাকে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

➧ ব্যাখ্যা : ৪২ ॥ জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটাইয়াছে, তারা ব্যতীত আর কে জওহরের খবর দিতে পারে?

অথবা, হাযার শোকর খোদার দরগায়, বহু তালাশের পর তিনি জওহর মিলাইয়াছেন।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এমদাদ নিজে পীরের মুরিদ হওয়ার জন্য সুফী সাহেবের কাছে কামেল পীরের সন্ধান জানতে চাইলে সুফী সাহেব নিজের মাহাত্ম্য প্রচারে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : এমদাদ ধর্মকর্মে একনিষ্ঠ হতে ব্যর্থ হয়ে সে এক পীর সাহেবের স্থানীয় এক খলিফার শরণাপন্ন হলো। এমদাদ স্থানীয় কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির সেক্রেটারি ছিল। সেখানে প্রত্যহ সকালে বিকালে অনেক মাওলানা-মৌলবির সমাবেশ ঘটত। এদের একজনের সুফী বলে খ্যাতি ছিল। সে পীর সাহেবের স্থানীয় খলিফা ছিল এবং অনেক রাত পর্যন্ত 'এলহু' 'এলহু' যিকির করতো। এছাড়া সে মেয়েলোকের ওপর জিনের আসর হলে জিন ছাড়াতে পারত। এ সুফী সাহেবের কাছেই এমদাদ তার প্রাণের বেদনা জানাল। সুফী সাহেব এমদাদের দুর্বলতা বুঝতে পেরে তাকে অনুসরণ করার জন্য বলল। এমনি এক পরিস্থিতিতে সে এমদাদকে জিজ্ঞেস করল, সে এখনো কারো মুরিদ হয়েছে কিনা। জবাবে এমদাদ 'না' বললে সে এমন ভাব ধরল, যেন সে রোগ নির্ণয় করে ফেলেছে। সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, গোড়াতেই গলদ। পীর না ধরে কেউ রুহানিয়ৎ হাসিল করতে পারে না। তার যুক্তির পক্ষে সে হাদিস শরিফের উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করে, কামেল ও মোকাম্মেল, সালেক ও মযজুব পীরের আঁচল না ধরে কেউ যমিরের রৌশনী ও রূহের তরক্কী হাসিল করতে পারে না। সুফী সাহেবের মুখে হাদিসের এ সুস্পষ্ট নির্দেশের কথা শুনে এমদাদ নিতান্ত ঘাবড়ে গেল। সে সুফী সাহেবকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে তার সন্ধানে কোনো কামেল পীর আছে কিনা জানতে চাইল। চতুর সুফী সাহেব নিজের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তখন গর্বের সাথে একটি ফারসি বয়েত আবৃত্তি করল। যার অর্থ– জওহরের তালাশে যারা জীবন কাটিয়েছে তারা ছাড়া কে জওহরের খবর দিতে পারে।

মন্তব্য : ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের মুরিদরা নিজেদের মাহাত্ম্য প্রচার ও স্বার্থোদ্ধার করার জন্য নানা ফন্দি ফিকির করে, যা সবই তাদের ভণ্ডামি ও প্রতারণা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪৩ ॥ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে এমদাদ পীরের মুরিদ হতে সুফী সাহেবের সহায়তা প্রসঙ্গে এ উক্তিটির অবতারণা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কলেজের ছাত্র ছিল এমদাদ। সে তথাকথিত আধুনিক যুগে বাস করতো। আল্লাহ, রাসূল, খোদার আরশ, ফেরেশতা, অহী, মিরাজ ইত্যাদি কিছুই সে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু একসময় খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে সে পুরোপুরি বদলে যায়। তখন সে রীতিমতো নামাজ পড়ে, অতিরিক্ত নামাজও পড়ে, তসবিহ টিপতে টিপতে আঙ্গুলের মাথা ক্ষয় করে ফেলে। কম খেয়ে খেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে সে শরীরটাকে শুকিয়ে ফেলে, কিন্তু তারপরও তার মধ্যে একটা অস্বস্তি দেখা দেয়। অনেক চেষ্টা করেও সে ইবাদতে একনিষ্ঠ হতে পারে না। তাই সে পরিচিত এক সুফী সাহেবের শরণাপন্ন হয়ে তার বেদনার কথা জানায়। সুফী সাহেব তাকে পীরের মুরিদ হওয়ার আহ্বান জানায় এবং বলে, পীর ধরলেই ইবাদতে মনোযোগ আসবে এবং রুহানিয়ৎ হাসিল হবে। এমদাদ সুফী সাহেবের কাছে কামেল পীরের সন্ধান চাইল এবং তার কাছে নিয়ে যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলে সুফী সাহেব এমদাদকে উদ্দেশ্য করে বলে, "কেন লইয়া যাইব না? হাদিস শরিফে আসিয়াছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আসিতে চায়, তার সাহায্য কর।"

মন্তব্য : সমাজে একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী আছে যারা সহজ-সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করে ঠকায়। এমনি একজন মানুষ সুফী সাহেব, যে হাদিসের কথা বলে এমদাদকে প্রতারিত করে। তবে সমাজে খাঁটি আল্লাহর অলীও আছেন, তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা ঠিক নয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪৪ ॥ বস্ বেটা, তোর ভাল হইবে। আহা, বড় গরিব।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এমদাদ পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে পীর সাহেব করুণা করে তার প্রতি যে উক্তিটি করেছিলেন, আলোচ্যাংশে তা উক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : নাস্তিক এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রীতিমতো আস্তিক হয়ে যায়। সে নিয়মিত নামাজ পড়ে খোদার প্রতি অটল ভক্তি প্রকাশের চেষ্টা করতে লাগল। এমনকি সে অতিরিক্ত নামাজও পড়ত। বাঁশের কঞ্চির তৈরি তসবিহ টিপতে টিপতে হাতের দুটি আঙুলের মাথা ক্ষয় করে ফেলল, কিন্তু সে কিছুতেই ইবাদতে মনোযোগী হতে পারছিল না। এমদাদ সুফী সাদুল্লাহ নামে এক খেলাফতীর কাছে তার মনের বেদনার কথা জানায়। সুফী সাহেব তাকে কোনো কামেল পীরের মুরিদ হওয়ার পরামর্শ দেন। এমদাদ সুফী সাহেবকেই পীরের সন্ধান দিতে অনুরোধ জানালে তিনি নিজে যে অঞ্চলের পীরের খলিফা সে পীরের কাছে এমদাদকে নিয়ে যান। পীরের বাড়িতে পৌঁছানোর পর সুফী সাহেব এমদাদকে পেছনে রেখে হুযুরের দরবারে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করেন। সুফী সাহেবের সেখানে যাওয়ার উসিলা যে এমদাদ, পীর সাহেব চোখ বুজে সে কথা বলে দিলে সকলে বিস্মিত হলো। সুফী সাহেব এমদাদকে এগিয়ে আসার ইশারা করলে এমদাদ ধীরে ধীরে হুযুরের সামনে গিয়ে অনভ্যস্ত হাতে হুযুরকে কদমবুসি করে। তখন হুযুর নিজের কেরামতি জাহির করার জন্য ব্যাখ্যেয় উক্তিটি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আন্দাজে এমদাদকে গরিব মনে করে নিয়েছিলেন, কিন্তু এমদাদ গরিব ঘরের ছেলে ছিল না। পীর সাহেব হিসাবে ভুল করেছিলেন। পরে যদিও কৌশলে তিনি তা এড়িয়ে যান।

মন্তব্য : ভণ্ড পীরেরা এভাবে আন্দাজে ঢিল ছোঁড়েন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে কাজও হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে পীর সাহেবের অনুমান ঠিক হয়নি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪৫ ॥ বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দৌলত দিয়া ধনী-গরিব বিচার করিস্। এটা তোদের বুঝিবার ভুল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাশিল্পী ও প্রখ্যাত রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সুফী সাহেবের একটি কথার প্রতিবাদ করে ধনী-গরিবের পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে দুনিয়ার ধনদৌলতকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা না করার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে পীর সাহেব উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : দর্শনশাস্ত্রের নাস্তিক ছাত্র এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর হঠাৎ করে রীতিমতো আস্তিক হয়ে পড়ে। কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা-সাধনা করেও সে ধর্মকর্মে মনোযোগী হতে পারছিল না। অবশেষে সে সুফী সাদুল্লাহর কাছে তার মনের বেদনার কথা খুলে বলল। সুফী সাহেব তাকে কামেল পীরের মুরিদ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজের পীরের

কাছে নিয়ে গেলেন। এমদাদ সেখানে গিয়ে পীর সাহেবের শান শওকত দেখে বিস্ময়ে তাজ্জব হয়ে যান। সুফী সাহেবের ইশারায় এমদাদ পীর সাহেবের সামনে গিয়ে অনভ্যস্ত হাতে তার কদমবুসি করলে হুযুর নিজের কেরামতি জাহির করার জন্য তাকে গরিব বলে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু এমদাদ যে গরিব ছিল না, সে কথা সুফী সাহেবের জানা ছিল। তাই তিনি আমতা আমতা করে হুযুরকে জানালেন, এমদাদের আর্থিক অবস্থা গরিব নয়। তার বেশ তালুক-সম্পত্তি আছে। পীর সাহেব ছিলেন খুব ধূর্ত। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আত্মরক্ষার জন্য প্রসঙ্গটাকে ধর্মের দিকে ঠেলে দেন। তিনি নিজের ভুল স্বীকার না করে জাগতিক ধনদৌলত যে ধনী-গরিব নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়, সে কথা বোঝাতে গিয়ে আলোচ্য মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, যারা দুনিয়ার ধনসম্পত্তি দিয়ে ধনী-গরিব বিচার করে তারা কিছুই বোঝে না, তারা অন্ধ। মূলত ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে এসব কথা বলে চালাকি করে পীর সাহেব নিজেকে রক্ষা করেন।

মন্তব্য : পীর সাহেব আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে ব্যর্থ হওয়ার পর নিজের বক্তব্যকে সঠিক প্রমাণের যুক্তি খুঁজেছেন। তার চালাকি সহজ-সরল মুরিদরা ধরতে পারেনি।

⏩ ব্যাখ্যা : ৪৬ ॥ মুসলমানের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত হারাম।

অথবা, বেশক দুনিয়ার ধন-দৌলত শয়তানের ওয়াস্-ওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ছোটগল্প 'হুযুর কেবলা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে পীর সাহেব নিজের বলা একটা ভুল কথাকে সত্যে প্রতিপন্ন করতে গিয়ে এ মন্তব্য করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়েছেন।

বিশ্লেষণ : এমদাদ খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের মধ্য দিয়ে ধর্মকর্মে গভীরভাবে মনোযোগী হয়ে পড়ে। সে খুব বেশি বেশি নামাজ পড়তে শুরু করে। নফল নামাজে সে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। নিজের হাতে তসবিহ তৈরি করে তা গুনে হাতের আঙ্গুল ক্ষয় করে ফেলে। তার দেহের অবস্থাও খারাপ হয়। এতকিছুর পরেও এমদাদ ইবাদতে মনোযোগী হতে পারছিল না। তখন সে সুফী সাহেব নামে খ্যাত স্থানীয় এক পীর সাহেবের খলিফার কাছে তার মনের বেদনা প্রকাশ করে। সুফী সাহেব তাকে কামেল পীরের মুরিদ হওয়ার পরামর্শ দেয় এবং এমদাদকে নিয়ে নিজের পীরের কাছে হাজির হয়। ঘটনাক্রমে পীর সাহেব এমদাদকে 'আহা, বড় গরিব' বলে করুণা প্রদর্শন করেন। তখন সুফী সাহেব আমতা আমতা করে বলে, এর অবস্থা ততো গরিব নয়। বেশ ভালো তালুক সম্পত্তি রয়েছে তার। পীর সাহেব নিজের ভুল হচ্ছে দেখে সাথে সাথে গরিব শব্দটির আলাদা ব্যাখ্যা করে মুরিদদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে সক্ষম হন। তিনি বলেন, "বেটা, তোরা আজিও দুনিয়ার ধন-দৌলত দিয়া ধনী-গরিব বিচার করিস। এটা তোদের বুঝিবার ভুল। আমি গরিব কথায় দুনিয়াবী গোরবৎ বুঝাই নাই। মুসলমানের জন্য দুনিয়ার ধন-দৌলত হারাম।" কেননা এ ধন-দৌলত মানুষের রুহানিয়ৎ হাসিলের পথে বাধা জন্মায়। তার মধ্যে নফসানিয়ত পয়দা করে। আরবি ও উর্দু মিশিয়ে তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন : বেশক দুনিয়ার ধন-দৌলত শয়তানের ওয়াসওয়াসা, ইহা হইতে দূরে পলায়ন কর।

মন্তব্য : দুনিয়ার ধনদৌলত মুসলমানদের জন্য ভালো না হলেও তথাকথিত পীর সাহেব অসৎ উদ্দেশ্যে এ কথাগুলো বলেছিল।

» ব্যাখ্যা : ৪৭ ॥ আহা, বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।
অথবা, অত সহজে কি আর সব কথা বুঝা যায়রে বেটা? চেষ্টা কর্, চেষ্টা কর্।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত ছোটগল্প 'হুযুর কেবলা' থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব তার মুরিদদের বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে সফলকাম হতে না পেরে পীর সাহেব কুরআনের আয়াতের সাহায্যে স্বীয় বক্তব্যকে সত্য প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। এরপর নিজের কেরামতি জাহির করার উদ্দেশ্যে তিনি নতুন ফন্দি আঁটলেন। হঠাৎ তিনি চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "কুদরতে-ইয্দানী, কুদরতে-ইয্দানী।" মুরিদরা সে চিৎকার শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না। এরপর হুযুর ঈষৎ হেসে চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "তারা কত বছর হলো এখানে বসে আছে?" একজন মুরিদ উত্তরে বলল, "হয্রত, বৎসর কোথায়? এই না কয়েক ঘণ্টা হইল।" পীর সাহেব হেসে বললেন, "আহা, বেচারারা চোখের বাহিরে আর কিছুই দেখিতে পায় না।" অপর এক মুরিদ বলে, সে পীরের কথা বুঝতে পারেনি। এর উত্তরে হুযুর মৃদু হেসে বললেন, "অত সহজে কি আর সব কথা বোঝা যায় রে বেটা? চেষ্টা কর, চেষ্টা কর।" পীর সাহেব এ কথার মাধ্যমে মুরিদদের বোকা বানিয়ে নিজের কেরামতি জাহির করতে চেয়েছেন। তিনি এক নিমিষে সাত হাজার বছর ঘুরে এসে আবার তাদের সাথে মিলিত হয়েছেন বলে ব্যক্ত করেন। এটা ছিল তার একটা ধাপ্পাবাজি।

মন্তব্য : পীর সাহেব নিজের স্বার্থে মিথ্যা কেরামতি জাহির করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মুরিদদের চোখে ধুলো দিয়েছেন। তাদের এ ভণ্ডামির ফলে সাধারণ জনতা প্রতারণার শিকার হয়।

» ব্যাখ্যা : ৪৮ ॥ ইহার বেশি শুনিলে তোদের কলব ফাটিয়া যাইবে।
অথবা, কলব ফাটিয়া যাইবার ভয়ে কেহ কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত ছোটগল্প 'হুযুর কেবলা' থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মুরিদদের ধর্মের আজগুবি সব কাহিনি শুনিয়ে তাদের মধ্যে ভয় সৃষ্টি এবং নিজের কেরামতি জাহির করার কৌশল হিসেবে পীর সাহেব আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : পীর সাহেব ছিলেন একজন ধর্মব্যবসায়ী। তার নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও ব্যবসায় টিকিয়ে রাখার জন্য মুরিদদের তিনি নানাভাবে বোকা বানিয়েছেন। হাদিস কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মুরিদদের ভীত-সন্ত্রস্ত করেছেন। নিজেকে একজন কামেল এবং শক্তিমান পীর হিসেবে জাহির করতে গিয়ে তিনি তার অনেক অলৌকিক ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। ভণ্ডামির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে আমরা লক্ষ করি; একবার তিনি কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে হঠাৎ চিৎকার করে বলে ওঠেন– 'কুদরতে ইয্দানী, কুদরতে-ইযদানী।' মুরিদদের পীড়াপীড়িতে তার একথা বলার কারণ হিসেবে তিনি জানান, এরই মধ্যে তারা বহু বছর পার করে এসেছে। তিনি এ কথার ব্যাখ্যা দেন না, তবে গোপনীয়তা রক্ষা করে মুরিদদের নিজের একটা অলৌকিক কাহিনি শোনান। তার সারমর্ম হলো– একবার তিনি

এলমে লাদুন্নি হাসিল করার আগে লওহে মাহফুযে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি নূরে ইয্দানী দেখে বেহুশ হয়ে পড়েন। তার রূহ তাকে ছেড়ে গিয়েছিল। তারপর তার মুর্শেদ লওহে মাহফুয থেকে আবার তার রূহ এনে তাকে জিন্দা করেন। তিনি এ গল্প বলে, মুরিদগণ কত বছর যাবৎ এখানে বসে আছে তার একটা বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সাদুল্লাহ এখানে আসার পর তিনি তার রূহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সে তামাম দুনিয়া ঘুরে সাত হাজার বছর কাটিয়ে তারপর তার জেসমে পুনরায় প্রবেশ করেছে। এ সাত হাজার বছর পৃথিবীর যেসব পরিবর্তন হয়েছে, সব তার মনে আছে বলে তিনি দাবি করেন। এটুকু বলেই তিনি নাটকীয়ভাবে মুরিদদের উদ্দেশে বলেন, এ সম্পর্কে যেটুকু বলার তিনি বলে ফেলেছেন। এর বেশি শুনলে মুরিদদের কলব ফেটে যাবে। কারণ মুরিদদের কলব হুযুরের কলবের মতো শক্ত নয়।

মন্তব্য : মূলত হুযুর কেবলা পীর সাহেব তার মুরিদদের আজগুবি সব কাহিনি শুনিয়ে তার ভক্ত করতে চেষ্টা করেছিল। ভণ্ডামি আর প্রতারণার মধ্য দিয়ে সে নিজের বুজুর্গি জাহির করে টিকে থাকতে চায়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪৯ ॥ কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থিরতা বোধ করিতে লাগিল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে হুযুর কেবলার কেরামতি ও বুজুর্গি দেখে এমদাদের যে অবস্থা হয়েছিল তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : এমদাদ ছিল নাস্তিক। সে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাতারাতি ধার্মিক বনে যায়। সে নিয়মিত ধর্মীয় আচার-আচরণ ও বিধিবিধান পালন করতে থাকে, কিন্তু তবুও তার চিত্তের অস্থিরতা দূর হচ্ছিল না। তাই সে এক সুফী সাহেবের কাছে তার মনের বেদনা খুলে বলে। সুফী সাদুল্লাহ তাকে একজন পীরের কাছে নিয়ে যায়। পীর সাহেব এমন ভাব দেখাল যে, তার আসার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। এছাড়া তিনি তাদের উদ্দেশে আরো কিছু বুজরুকি দেখান। হঠাৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি বলেন, সাত হাজার বছর ঘুরে এসেছেন তাদের সামনে। এ সময় সারা দুনিয়ায় কত ঘটনা ঘটে গেছে। এ কথার ব্যাখ্যা শুনতে চাইলে তিনি বললেন, সবার তো সব কিছু সহ্য করার ক্ষমতা থাকে না। সব কথা খুলে বললে মুরিদদের কলিজা ফেটে যাবে। এমদাদ আগ্রহ নিয়ে এসব কথা শুনছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। কারণ এর আগে এরকম বুজরুকি সে কখনো দেখেনি।

মন্তব্য : প্রথম দর্শনেই এমদাদ পীর সাহেবের কেরামতির কথা জেনে বিস্মিত হয়েছিল। এতে পীরের ব্যাপারে সে ভীষণ কৌতূহলী হয়ে পড়ে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫০ ॥ তার শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল।

অথবা, এইভাবে আরো কিছুদিন গেলে তার রূহ বস্তুতঃই জেস্ম হইতে আযাদ হইয়া আলমে-আমরে চলিয়া যাইবে।

অথবা, অনাহার ও অনিদ্রায় এম্দাদের চোখ দু'টি মস্তকের মধ্যে প্রবেশ করিল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পীরের মুরিদ হওয়ার পর ধ্যান-জপ ও কৃচ্ছ্রসাধন করতে গিয়ে এমদাদের শারীরিক-মানসিক যে দুরবস্থা হয়েছিল, আলোচ্যাংশে তা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : মনের অস্থিরতা দূর করার মানসে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করার লক্ষ্য নিয়ে এমদাদ সুফী সাদুল্লাহর শরণাপন্ন হলে তিনি তাকে এক কামেল পীরের কাছে নিয়ে যান। পীর সাহেবের কথাবার্তা, আদব-কায়দা, শান-শওকত প্রভৃতি দেখার পর এমদাদ বিস্মিত ও অভিভূত হয়। যথার্থ লোকের সন্ধান পাওয়া গেছে ভেবে সে পীর সাহেবের মুরিদ হয়ে গেল। নতুন মুরিদ পেয়ে হুযুর নিজের লতিফার যিকর জারি করে সে যিকির এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করে দিলেন। এমদাদ সাগ্রহে প্রথম লতিফা যিকিরে জলী শুরু করে দিল। দিনরাত সে চোখ বুজে 'এলহু' 'এলহু' করতে লাগল। পীর সাহেব এমদাদকে বলেছিলেন, এ সাধনায় সফল হলে তার রূহ ঘড়ির কাঁটার ন্যায় কাঁপতে থাকবে। কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা করেও এমদাদ তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করতে সমর্থ হলো না। তার রূহ ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁপার পরিবর্তে বাড়িতে ফুফু আম্মার কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। এ অস্থিরতার মধ্য দিয়ে বেশ কিছুদিন কাটে। কঠোর সাধনা করতে গিয়ে তার শরীর ও মনের বারোটা বেজে গেল। অনাহার-অনিদ্রায় তার চোখজোড়া কোটরে প্রবেশ করে। এমদাদের শরীর নিতান্ত দুর্বল ও মন সাংঘাতিকভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। সে একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল, এমন করে আর কিছুদিন অতিবাহিত হলে তার রূহ জেসম থেকে মুক্ত হয়ে আলমে আমরে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ এমনভাবে আর কিছুদিন কাটলে তাকে মরতে হবে।

মন্তব্য : ভণ্ড পীরের খপ্পরে পড়ে এমদাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার এমন অবনতি হয়েছিল যা তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫১ ॥ কিন্তু বলি বলি করিয়াও কথাটা বলিতে পারিল না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক ব্যঙ্গাত্মক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এমদাদের ধর্মকর্মে মন টিকে না বলে সে মুরিদগিরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাওয়ার মনস্থির করে। কিন্তু কোনোভাবেই সে একথা মুখ ফুটে পীর সাহেবকে বা সুফী সাহেবকে বলতে পারেনি।

বিশ্লেষণ : নাস্তিক এমদাদ নিজেকে ধর্মের পথে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে সুফী সাদুল্লাহর শরণাপন্ন হলে সুফী সাহেব তাকে নিজের পীরের কাছে নিয়ে গেলেন। পীর সাহেবকে দেখে এমদাদের পছন্দ হয় এবং সে নির্দ্বিধায় তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। পীর সাহেবের নির্দেশমতো এমদাদ প্রথম লতিফা যিকিরে জলী শুরু করে। পীর সাহেব নিজের লতিফায় যিকির জারি করে এমদাদের লতিফায় নিক্ষেপ করলেন। এমদাদ পীর সাহেবের নির্দেশমতো রাত-দিন 'এলহু' 'এলহু' করতে লাগল, কিন্তু আন্তরিকভাবে অনেক চেষ্টা করেও সে তার কলবকে লতিফায় মুতাওয়াজ্জাহ করতে পারল না। তার রূহ ঘড়ির কাঁটার মতো কাঁপার পরিবর্তে বাড়িতে ফুফু আম্মার কাছে যাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। এভাবে আরো কিছুদিন অতিবাহিত হলো। অনাহার আর অনিদ্রায় তার চোখ কোটরে প্রবেশ করল। তার শরীর নিতান্ত দুর্বল এবং মন অস্থির হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল, আর কিছুদিন থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। সে স্থির করল, পীর সাহেবের কাছে নিজের অক্ষমতার কথা নিবেদন করে এখান থেকে বিদায় নেবে; কিন্তু কথাটা এমদাদ কীভাবে পীর সাহেবের কাছে উত্থাপন করবে, তার কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না বলে বলি বলি করেও কথাটা বলা হয়ে ওঠেনি।

মন্তব্য : এমদাদ পীর সাহেবের দরবার থেকে চলে যাওয়ার জন্য মনস্থির করেছিল, কিন্তু নতুন একটা ঘটনায় বিদায়ের কথাটা সে আপাতত চেপে রাখে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫২ ॥ পীর সাহেবের রুহানী শক্তি যত বেশিই থাকুক না কেন, তার হজম শক্তি নিশ্চয়ই তার চেয়ে বেশি।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কথাশিল্পী ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পীর সাহেবের পানাহারের অত্যধিক শক্তি দেখে বিদ্রূপ করে এমদাদের মুখে গল্পকার আলোচ্য উক্তিটির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : পীরপ্রথা আমাদের সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ পীরেরা পরজীবী। তারা অন্যের টাকায় নিজেদের যাবতীয় বিলাসিতা চরিতার্থ করে থাকে। পরের টাকায় খেতে খেতে এরা প্রত্যেকেই ভোজনরসিকে পরিণত হন। 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেবও ভোজনপটু। ভোজন বিলাসের ব্যাপারে এরা যেমন আগ্রহী, কাজের বেলায় তেমনটি নয়। 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেবের ক্ষেত্রে এ মন্তব্য যথার্থ। তিনি যখন দূরবর্তী স্থানে মুরিদান নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন, তখন মাত্র তেরো জন শাগরেদ তার সফরসঙ্গী হয়েছিল। পথের খাবার হিসেবে তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন এক মন ঘি, আড়াই মন তেল, দশ মন সরু চাল, তিনশ মুরগি এবং সাত সের অম্বুরি তামাকসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এমদাদও পীর সাহেবের সাথে গিয়েছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর বিভিন্ন দিন বিভিন্ন মুরিদের বাড়িতে বিরাট বিরাট ভোজ চলতে লাগল। পীর সাহেব যেখানে বসে আহার করেন, এমদাদ তার থেকে একটু দূরে বসে ভূরিভোজের মাধ্যমে এতদিনের কৃচ্ছ্রসাধনের প্রতিশোধ নিতে লাগল। এতে প্রথমে তার একটু পেটের পীড়া দেখা দিলেও শীঘ্রই তা সেরে গেল। প্রচুর ভালো খাবার খেয়ে তার শরীর পুষ্ট হলো। এর পূর্বে পীর সাহেবের ভোজন ক্ষমতা দেখার সৌভাগ্য এমদাদের হয়নি। এবারই সে এ সৌভাগ্য লাভ করে। পীর সাহেবের খাওয়া-দাওয়া দেখে সে বুঝতে পারল, পীর সাহেবের রূহানী শক্তির চেয়ে হজম শক্তি নিশ্চয় অনেকগুণ বেশি।

মন্তব্য : ভোজনবিলাসী মানুষ সাধারণত একটু অধিক আহারী হয়ে থাকেন। কিন্তু নামধারী ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের ভোজনবিলাসই সারকথা। তাই তারা নিত্য ভোজনশক্তি বাড়ানোর চেষ্টায় লিপ্ত থাকেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৩ ॥ মেয়েলোকের বুদ্ধি-শুদ্ধি বড় কম, তারা নাকেস আকেল।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' নামক ব্যঙ্গাত্মক গল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : হুযুর কেবলা ছিল নারীলোভী ভণ্ড পীর। অধিক নারী সান্নিধ্যলাভের নিমিত্ত তিনি তাদের কর্মজ্ঞান ও বুদ্ধির অভাবের মিথ্যা অজুহাতে যে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন, এখানে তারই একটি দিক সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব একজন দুশ্চরিত্র লম্পট। ধর্মপ্রাণ মানুষের সরল বিশ্বাসকে পুঁজি করে তিনি নিজের কামলালসা চরিতার্থ করতেন। তিনি দূরবর্তী স্থানে মুরিদান নিয়ে নিয়মিত মজলিস বসাতেন। সন্ধ্যায় পুরুষদের মজলিস বসত এবং রাতে

এশার নামাযের পর অন্দরমহলে মেয়েদের জন্য ওয়াজ হতো। মেয়েদের ওয়াজ মাহফিলে পুরুষদের প্রবেশাধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকদের ধর্মকথা বোঝাতে একটু বেশি সময় লাগত। পীর সাহেবের ধারণা, মেয়েদের বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম– তারা নাকেস আকেল। মেয়েদের এ আক্কেল কম থাকার সুযোগ নিতেন পীর সাহেব। তিনি ধর্মকথা বোঝানোর অজুহাতে তাদের সাথে বেশি সময় কাটাতেন। বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কলিমন সম্পর্কে পীর সাহেবের ধারণা অন্য রকম ছিল। মেয়ে-মজলিসে ওয়াজ করার সময় তিনি ঘন ঘন কলিমনের দিকে তাকাতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তাসাওউফের বাতেনী কথা বোঝার ক্ষমতা এ মেয়েটার মধ্যেই কিছু আছে। ভালো করে তাওয়াজ্জুহ দিলে তাকে আবেদা রাবেয়ার দরজায় পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে। এশার নামাযের পর দাড়িতে চিরুনি ও কাপড়ে আতর লাগানো সুন্নাত বিধায় তিনি ওই সুন্নাতের একজন বড় অনুসারী ছিলেন। ওয়ায করার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জযবা আসত। সে জযবাকে মুরিদেরা ফানাফিল্লাহ বলত। মেয়েদের মহলে ওয়াযের সময় এ জযবার বাড়াবাড়ি দেখা যেত। জয্‌বার সময় পীর সাহেবের হাত-পা টিপে দেওয়ার নিয়ম ছিল। এসবই ছিল পীর সাহেবের বুজরুকি। মেয়েদের আক্কেল-জ্ঞান কম, এ অজুহাতে তিনি তাদের সাথে বেশি সময় কাটাতেন। নিজের কু-প্রবৃত্তি পূরণার্থেই পীর সাহেব তাদের নাকেস আকেল বিশেষণে ভূষিত করেছেন।

মন্তব্য : পীর সাহেব ছিলেন নারীলোলুপ, ভণ্ড। তিনি নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই মেয়েদের নাকেস আকেল বলেছেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৪ ॥ কিন্তু সে জোর করিয়া মনকে ভক্তিমান রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।
অথবা, তার মনে পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পীর সাহেবের বুজরুকি কাণ্ড-কারখানা দেখে এমদাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়, তার মানসিক বিভ্রান্তি এ উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : মুরিদ হওয়ার পর এমদাদ দীর্ঘদিন পীরের সাথে অবস্থান করে। এ সময় একদিন পীর সাহেব সদলবলে মুরিদানে যাত্রা করেন। সেও তার সঙ্গী হয়। মুরিদানে গিয়ে পীরের কর্মকাণ্ড দেখে এমদাদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। গ্রামের মোড়লের বাড়িতে প্রতিদিন পুরুষদের মজলিস আর এশার নামাযের পর অন্দরমহলে মেয়েদের ওয়াযের মজলিস বসত। পীরের মেয়েমহলে ওয়ায করার আগ্রহ বেশি ছিল। মোড়লের বড় ছেলে রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনের প্রশংসা করতেন তিনি। ঘন ঘন তিনি তার দিকে তাকাতেন। ওয়াজ করার সময় পীর সাহেবের প্রায়ই জযবা আসত। মুরিদরা একে বলত ফানাফিল্লাহ। এ ফানাফিল্লাহর সময় হুজুর জ্বলে গেলাম, পুড়ে গেলাম বলে চিৎকার করে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়তেন। এসময় মুরিদরা কালো মখমল কাপড় দিয়ে চোখ-মুখ ঢেকে দিতেন আর মেয়েরা তার হাত-পা টিপে দিত। মেয়েমহলে ওয়াজ করার সময় এভাবে তার জযবা বেশি উঠত। এসব দেখে এমদাদের মনে খটকা লাগে। হুযুরের চরিত্রের প্রতি তার সন্দেহ দেখা দেয়। পীরের প্রধান খলিফার সাথে পীর সাহেবকে কানাকানি করতে দেখে সে বিভ্রান্তিতে পড়ে এবং পীর সাহেবের প্রতি একটা দুর্নিবার সন্দেহের ছায়াপাত হয়। কিন্তু এতকিছুর পরও এমদাদ জোর করে নিজের মনকে ভক্তিমান করার চেষ্টা করতে লাগল।

মন্তব্য : মূলত পীর সাহেব ছিল একজন ভণ্ড দুশ্চরিত্র। এমদাদ পীর সাহেবকে ঠিকই সন্দেহ করেছিল তার কর্মকাণ্ড দেখে। পরে অবশ্য সে তার সন্দেহের বাস্তব প্রমাণ পায়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫৫ ॥ সে ইহাকে কিছুতেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিল না।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে পীর সাহেবের আয়োজিত 'মোরাকাবা' অনুষ্ঠানের নাটকীয় ঘটনার প্রতি এমদাদের এক চরম অবিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

বিশ্লেষণ : একদিন মুরিদানে পীর সাহেব 'মোরাকাবা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সিদ্ধান্ত হলো, হুযুরের প্রধান খলিফা সুফী বদরুদ্দিন মোরাকাবায় বসবে এবং হুযুর তার দেহে রাসূলের আত্মা প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন। কৌতূহল আর অবিশ্বাসের কারণে এমদাদ নিজেই মোরাকাবায় বসার জন্য আবেদন জানাল। তার কথা হুযুর হেসেই উড়িয়ে দিলেন। এমদাদের সন্দেহ আরো ঘনীভূত হলো। এরপর সুফী বদরুদ্দিন মোরাকাবায় বসলেন। পীর সাহেব দোয়া কালাম পড়ে তাকে ফুঁক দিতে লাগলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তার দেহে কাঁপুনি দেখা দেয়। সে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগল। সুফী সাহেব পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। পীর সাহেবের নির্দেশে সবাই দাঁড়িয়ে মিলাদ পড়তে লাগল। মিলাদ কেয়াম শেষ হলে পীর সাহেব মজলিসে জানালেন, হুযুর পাকের রূহ পাক মজলিসে হাজির আছেন। তিনি সুফীর দেহে অবস্থান করছেন। কারো কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পার। এমদাদ ধাঁধায় পড়ে গেল। মহানবীর আত্মা উপস্থিত আছেন এমন আজগুবি কথা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারল না। সে মোরাকাবার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। উপস্থিত সকলে এটাকে সত্য বলে মেনে নিলেও এমদাদ ছিল এর ব্যতিক্রম। তার মনের সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হলো।

মন্তব্য : পীর সাহেবের আয়োজিত মোরাকাবা অনুষ্ঠানটিকে এমদাদ অসৎ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত এবং পূর্বপরিকল্পিত বলে সন্দেহ করে। পরে তার সন্দেহ বাস্তবে পরিণত হয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫৬ ॥ বাবা সকলের কথাই যদি রুহে পাকের কাছে পঁহুছিত, তবে দুনিয়ার সব মানুষই ওলি-আল্লাহ হইয়া যাইত।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' নামক গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : এমদাদ মোরাকাবায় উপবিষ্ট খলিফার দেহে আনীত রাসুলের আত্মাকে প্রশ্ন করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে পীর সাহেব তাকে নিরস্ত করার জন্য আলোচ্য উক্তিটি করে।

বিশ্লেষণ : মুরিদানে গিয়ে পীর সাহেবের বিভিন্ন অসঙ্গতিপূর্ণ কর্মকাণ্ড দেখার পর এমদাদের মনে তীব্র সন্দেহ সৃষ্টি হয়। বিশেষত মোরাকাবা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সে বিষম ধাঁধায় পড়ে যায়। প্রধান খলিফার দেহে হুযুর যখন রাসুলের রূহ প্রবেশ করালেন, তখন এমদাদ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারল না। যখন রাসুলের রুহকে সওয়াল করার পালা এল, তখন এমদাদ নিজেই জিজ্ঞেস করার আবদার করে বসেন। এর পূর্বে নিজের মোরাকাবায় বসার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে রীতিমতো অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। এবার সে মরিয়া হয়ে মোরাকাবায় উপবিষ্ট খলিফাকে সওয়াল করার ইচ্ছে ব্যক্ত করলে হুযুর উল্লিখিত

উক্তিটি করেন। মূলত পীর সাহেবের আয়োজিত এ মোরাকাবা অনুষ্ঠানটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত ভণ্ডামি। হুযুরের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের আয়োজন ছিল এটা। সুতরাং এ পাতানো খেলায় এমদাদকে খেলতে দেওয়া হলে সব জারিজুরি ফাঁস হয়ে পড়বে বলে হুযুর তাকে নিরস্ত করার ব্যবস্থাস্বরূপ উক্তিটি করেছেন। পীরের মতে, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। সবার কথাই যদি রূহ পাকের কাছে পৌছত, তাহলে সকলেই অলী-আল্লাহ হয়ে যেত। অতএব রাসূলের আত্মাকে প্রশ্ন করার যোগ্যতা এমদাদের নেই। একথা বলে কৌশলে তাকে নিবৃত্ত করা হয়।

মন্তব্য : পীর সাহেব মূলত তার ভণ্ডামি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আলোচ্য উক্তিটি করেছিল। সচেতন সমাজের প্রতিবাদ কখনো কখনো এভাবেই ধর্মের দোহাই দিয়ে ধামাচাপা দেওয়া হয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৭ ॥ যারা রুহানী ফয়েয হাসিল করিতে চায়, তাদের চার বিবি ছাড়া উপায় নাই। [ফা. প. ২০১০]

অথবা, এই চারের পরদা ঠেলিয়া আলমে আমরে নূরে ইয়্দানীতে ফানা হইতে হইলে দুনিয়াতে চার বিবির ভজনা করিতে হইবে।

অথবা, চার দিয়াই এ-দুনিয়া, চার দিয়াই আখেরাত। চারদিকে যা দেখ সবই খোদা চার চিজ দিয়া পয়দা করিয়াছেন।

অথবা, সেই হেদায়েত পাইতে হইলে মানুষকে চার এমামের চার মাযহাব অনুসারে চার তরিকা মানিয়া চলিতে হয়।

অথবা, এইভাবে মানুষকে চারের ফাঁদে ফেলিয়া খোদাতালা চার কুরসির অন্তরালে লুকাইয়া আছেন।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক গল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পীর সাহেবের জন্য চারজন বিবি হালাল করার উদ্দেশ্যে প্রধান খলিফা ভণ্ড দাগাবাজ বদরুদ্দিন অন্ধ মুরিদদের প্রতারণা করে মোরাকাবায় বসে আলোচ্য উক্তি করেন।

বিশ্লেষণ : বাড়িওয়ালার ছেলে রজবের সদ্য বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে দেখার পর পীর সাহেব তাকে বিয়ে করার ফন্দি আঁটেন। এ ফন্দি-ফিকিরের অংশ হিসেবে তিনি একটা পাতানো মোরাকাবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে পীর সাহেব তার সব দুষ্কর্মের সহযোগী একান্ত অনুগত খলিফা সুফী বদরুদ্দীনকে মোরাকাবায় বসান। মোরাকাবায় তিনি সবাইকে ধোঁকা দিয়ে সুফী সাহেবের দেহে রাসুলের আত্মা নিয়ে আসার তামাশা করেন। এরপর অন্যতম খলিফা মাওলানা বেলায়াতপুরী সাহেব হুযুরের নির্দেশমতো সওয়াল শুরু করেন। মাওলানা সাহেব জানতে চান, তাদের কামেল পীর নূরে ইয়দানীর জলওয়া সহ্য করতে পারেন না কেন। সুফী সাহেব তখন পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘোষণা দেন, পীর সাহেব শরিয়ত অবহেলা করেছেন। তিনি শরিয়ত বাদ দিয়ে মারেফত খুঁজছেন। কীভাবে শরিয়ত অবহেলা করা হয়েছে তা জানতে চাইলে সুফী সাহেব ব্যাখ্যা করেন, আমি শরিয়তে চার বিবি হালাল করেছি, কিন্তু পীর সাহেবের মাত্র তিন বিবি। যারা সাধারণ মানুষ তাদের এক বিবি হলেও চলে, কিন্তু যারা রূহানী ফয়েয হাসিল করতে চায়, তাদের চার বিবি থাকতে হবে। চার বিবি রাখার কারণ সম্পর্কে সুফী সাহেব 'চার'-এর নানা হাকীকাত বর্ণনা করতে গিয়ে ব্যাখ্যেয় উক্তি করেছেন। এর মাধ্যমে মূলত পরস্ত্রী কলিমনকে বিয়ে করে পীর সাহেবের নফসের খায়েশ চরিতার্থ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

মন্তব্য : হুযুর কেবলা মূলত পাতানো মোরাকাবার আয়োজন করে কলিমনকে বিয়ে করার ফন্দি করে। এ উক্তির মাধ্যমে সহজ-সরল মানুষকে সে বোকা বানিয়েছিল।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫৮ ॥ রে ভণ্ড শয়তান নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : পীর সাহেবের লাম্পট্য ও ভণ্ডামি ধরতে পেরে এমদাদ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রহার করতে করতে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : পীর সাহেব ছিলেন এক দুশ্চরিত্র লম্পট। নারীলোলুপ এ ভণ্ড পীর নিজের কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তার দুই খলিফার সহযোগিতায় এক মোরাকাবা অনুষ্ঠানের পাতানো খেলা খেলেন। এ মোরাকাবা আসরে রাসুলের আত্মা নিয়ে তামাশা দেখিয়ে হুযুরের জন্য রজবের সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে হালাল করা হয়। উপস্থিত ধর্মপ্রাণ সকল মুরিদ আখেরাতের ভয়ে তাদের রায় সোৎসাহে মেনে নেয়। বাপ-চাচা ও পাড়া-পড়শীর অনুরোধে, আদেশে ও তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে রজব তার একবছর আগে বিয়ে করা আদরের স্ত্রী কলিমনকে তালাক দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে চলে যায়। কলিমনের ঘন ঘন মূর্ছার মধ্যে পীর সাহেবের সাথে তার বিয়ে সম্পন্ন হয়। এমদাদ এতক্ষণ অচেতনের মতো এসব অবৈধ কাণ্ড কারখানা প্রত্যক্ষ করছিল। এবার চেতনা ফিরে পেলে সে একলাফে বরবেশে উপবিষ্ট ভণ্ড পীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পীরের মেহেদি রঞ্জিত দাড়ি ধরে হেঁচকা টান মেরে সে বলে ওঠে, "রে ভণ্ড শয়তান! নিজের পাপ-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটা তরুণ প্রাণ এমন দুঃখময় করিয়া দিতে তোর বুকে বাজিল না?" কথা শেষ না হতেই পীরের শাগরেদ মুরিদরা সকলে 'মার মার' করে এসে এমদাদকে ধরে ফেলে চড়-থাপ্পড় মারতে লাগল। এতদসত্ত্বেও এমদাদ এ শয়তানির প্রতিবাদ জানাতে থাকে, কিন্তু কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আচ্ছন্ন শাগরেদ মুরিদরা তার সে প্রতিবাদে সায় দেয়নি। উপরন্তু তাকে বিভিন্নভাবে লাঞ্ছিত করে।

মন্তব্য : শিক্ষিত এমদাদ ধর্মকর্মে নিষ্ঠা পাওয়ার জন্য পীরের শরণাপন্ন হলেও সে পরে পীর সাহেবের ভণ্ডামির বিপক্ষে জোরালো প্রতিবাদ করে পীররূপী এ ভণ্ড প্রতারকের মুখোশ খুলে দিয়েছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫৯ ॥ তোমরা নিতান্ত মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝিতে পারিতেছ না?
অথবা, নিজের শখ মিটাইবার জন্য সে হযরত পয়গম্বর সাহেবকে লইয়া তামাশা করিয়া তাঁর অপমান করিতেছে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কথাশিল্পী আবুল মনসুর আহমদ বিরচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসীর নির্বুদ্ধিতাকে এমদাদ মূর্খতা বলে আখ্যায়িত করে ভণ্ড পীরের মুখোশ জনগণের সামনে খুলে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : এমদাদ কলেজপড়ুয়া ছাত্র। ধর্মকর্মে তার কোনো বিশ্বাস ছিল না। হঠাৎ একদিন ধর্মে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আনার জন্য পীরের শরণাপন্ন হয়েছিল। এমদাদ তসবিহ পাঠ ও নফল ইবাদতের প্রতি বেশি জোর দিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিন পীরের সাথে থেকে তার মনে পীরের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সন্দেহ জেগে ওঠে। তবে এমদাদ একার প্রচেষ্টায় কিছুতেই ভণ্ড পীরের সাথে পেরে উঠছিল না। কারণ পীর সাহেবের সাথে ছিল ধর্মান্ধ মুরিদ-

শাগরেদরূপী বহু গ্রামবাসী। অবশেষে একদিন 'মোরাকাবা' নামক পাতানো খেলায় পীর সাহেব যখন নিজের জন্য রজবের সুন্দরী স্ত্রীকে হালাল করে নিল, তখন এমদাদ আর স্থির থাকতে পারল না। রজবকে কাঁদিয়ে পীর সাহেব যে পরিতৃপ্তির হাসি হাসছিলেন, তা দেখে এমদাদের চেতনা ফিরে এল। সে (এমদাদ) পীরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মেহেদি রঞ্জিত দাড়ি ধরে হেঁচকা টান মারে। সঙ্গে সঙ্গে পীর সাহেবের অসংখ্য শাগরেদ মুরিদ ছুটে এসে এমদাদকে বেদম মারতে লাগল, কিন্তু এমদাদ ক্ষান্ত হলো না। মার খেতে খেতে সে গ্রামের মাতব্বর সাহেবের দিকে চেয়ে বলল, তোমরা নিতান্তই মূর্খ। এই ভণ্ডের চালাকি বুঝতে পারছ না? নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সে রাসুলের আত্মা নিয়ে তামাশা করেছে, তাকে অপমান করেছে। এভাবে এমদাদ অশিক্ষিত ধর্মান্ধ গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে দিল যে, পীরের সবকিছুই ভণ্ডামি।

মন্তব্য : সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ গ্রামবাসী সরল বিশ্বাসে পীর সাহেবকে মানত। তারা পীরের ভণ্ডামি ধরতে পারত না। এমদাদ তাদের সামনে ভণ্ড পীরের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়।

➧ ব্যাখ্যা : ৬০ ॥ খোদা যাকে শাফা না দেন, তাকে কে ভালো করিতে পারে?
অথবা, দেখিস্ বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস্ না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বিশিষ্ট কথাশিল্পী সমাজ সচেতন ও অনুসন্ধানী লেখক আবুল মনসুর আহমদ রচিত 'আয়না' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'হুযুর কেবলা' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : 'হুযুর কেবলা' গল্পের পীর সাহেব কপট সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক কতকগুলো ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এ মন্তব্যের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : ভণ্ড প্রতারক পীর সাহেব নিজের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শরীয়ত, খোদা, রাসুল প্রভৃতি ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। তিনি 'মোরাকাবা' নামক এক পূর্ব পরিকল্পিত পাতানো খেলার আয়োজনের মাধ্যমে মুরিদের ছেলে রজবের সদ্যবিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী কলিমনকে নিজের জন্য হালাল করিয়ে নেন। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও মুরিদদের অসহনীয় চাপ সহ্য করতে না পেরে রজব কলিমনকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। এরপর তড়িঘড়ি করে পীর সাহেবের সাথে কলিমনের শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেলে এমদাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে অতর্কিতে বরাসনে বসে থাকা পীর সাহেবের দাড়ি ধরে হেঁচকা টান মেরে মাটিতে ফেলে দেয়। শাগরেদরা 'মার' 'মার' শব্দে এমদাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কিল ঘুষি মারতে থাকে। এমদাদ চিৎকার করে পীর সাহেবের ভণ্ডামির কথা সবাইকে জানানোর চেষ্টা চালায়। কিন্তু কেউ তার কথা কানে না তুলে তাকে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার উদ্যোগ নিলে পীর সাহেব কপট সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্বক বলেন– "দেখিস্ বাবারা, ওকে বেশি মারপিট করিস্ না। ও পাগল। ওর মাথা খারাপ। ওর বাপ ওকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল। অনেক তাবিয দিলাম। কিন্তু কোন ফল হইল না। খোদা যাকে শাফা না দেয়, তাকে কে ভালো করিতে পারে?" হুযুরের এ কথাগুলো ছিল ডাহা মিথ্যা। যে-কোনোভাবে করিমনকে পাওয়ার জন্য এমদাদকে পাগল আখ্যা দিয়ে তার প্রতিবাদকে নিছক পাগলের প্রলাপ হিসেবে প্রতিপন্ন করাই ছিল পীরের উদ্দেশ্য।

মন্তব্য : নামধারী পীর ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ী 'হুযুর কেবলা' যে চূড়ান্ত মিথ্যুক, ভণ্ড, প্রতারক, নারীলোভী ও শঠ ছিল, তার এসব কথা থেকে সেটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। শেষ সময়ও সে নানা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে এমদাদকে গ্রামছাড়া করেছে।

পাদটীকা

» ব্যাখ্যা : ৬১ ॥ পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল।

অথবা, সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্য-তীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের রম্যরচনার দিকপাল সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের টোলগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনামলে ব্যাপকভাবে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করে। এর ফলে এদেশীয় প্রাচীন ভাষা-সংস্কৃত শিক্ষালয় টোলসমূহ বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। পাঠান বা মোগল আমলে এরূপ ঘটেনি। এদেশে যখন মুসলিম শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, তখন রাজভাষারূপে ফারসি প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু ফারসির ব্যাপক চর্চার সাথে সংস্কৃতেরও চর্চা হতো। অথচ এখন ইংরেজ শাসনামলের শেষার্ধে ইংরেজি শিক্ষার দাপটে টোলসমূহ বন্ধ হয়ে যায় পুরোপুরি। আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অর্থনৈতিক বিবেচনায় তাদের সন্তানদের টোলে ভর্তি না করে ইংরেজি বিদ্যালয়ে পাঠানো শুরু করেন। কেননা সংস্কৃত অর্থকরী বিদ্যা নয়। এ বিদ্যা আয়ত্ত করলে অর্থ উপার্জন অসম্ভব। অর্থ উপার্জন বা চাকরি পাওয়ার জন্য ইংরেজি শিক্ষা প্রয়োজন। ইংরেজি শিক্ষার এ জয়জয়কারে বাংলার প্রাচীন শিক্ষাপীঠ টোলসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এসবের শিক্ষকগণ নিদারুণ আর্থিক সংকটে নিপতিত হন।

মন্তব্য : যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থাই মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারে। আর সে জন্যই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সাথে সাথে সংস্কৃত শিক্ষালয় টোলসমূহ দ্রুত উজাড় হয়ে যায়।

» ব্যাখ্যা : ৬২ ॥ এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি, কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য রম্যগল্পকার, সুসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে ইংরেজ শাসনামলে এদেশীয় সংস্কৃত পণ্ডিতগণ যে দুরবস্থায় ছিল, সে ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার লাভের সাথে সাথে সংস্কৃত শিক্ষার দুয়ার বন্ধ হয়ে যায়। অনেক ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয় এবং সাথে সাথে প্রাচীন ভারতীয় ভাষাশিক্ষার বিদ্যাপীঠ টোলসমূহ প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়; যে রকম গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেত মড়ক লেগে। চারিদিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়জয়কারে বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা যেতে লাগল। যে সকল পণ্ডিত কোনোরকমে সংস্কৃত বা বাংলার শিক্ষক হিসেবে হাই স্কুলগুলোতে স্থান লাভ করলেন, তাদের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

নিঃসংশয়ে তাদের পাণ্ডিত্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত, কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তারা সম্মান ও পারিশ্রমিকের সিংহভাগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত ছিলেন। নিজ নিজ বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রে তারা অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। অথচ তারা সকল শিক্ষকের চেয়ে সম্মান ও পারিশ্রমিক পেতেন কম। শোনা যায়, কোনো কোনো স্কুলের পণ্ডিতদের বেতন চাপরাশীর চেয়েও কম ছিল। মূলত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই সংস্কৃত পণ্ডিতদের এই পরিণতি হয়েছিল।

মন্তব্য : ইংরেজি শিক্ষার চাহিদাহেতু সংস্কৃত পণ্ডিতগণ অধিক জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সমাজে নিম্নবেতনভুক ও অবহেলিত ছিলেন। অথচ অন্যান্য শিক্ষকদের মান-সম্মান ও পারিশ্রমিক ছিল বেশি।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬৩ ॥ 'অনার্য', 'শাখামৃগ', 'দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না।

অথবা, পণ্ডিত মশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা রম্যগল্পকার সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' নামক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে গল্পকার তার এবং স্কুলের পণ্ডিত মশাইয়ের সুসম্পর্কের কথা উদ্ধৃত করেছেন।

বিশ্লেষণ : লেখক যে স্কুলে পড়তেন সে স্কুলের পণ্ডিত মশাই বাংলা ভাষা অপছন্দ করতেন এবং সংস্কৃতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। পণ্ডিত মশাই বাংলা ব্যাকরণের খাঁটি সংস্কৃত অংশটুকুই মাত্র পড়াতেন। তবে তিনি যতটুকু পড়াতেন তার চেয়ে বেশি বকতেন এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে ঘুমাতেন। হেডমাস্টার তার ছাত্র ছিলেন বলে তাকে তিনি পরোয়া করতেন না। এমনকি ছাত্রদের সামনে তার সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। লেখককে তিনি বেশি স্নেহ করতেন। কেননা বিদ্যাসাগরী বাংলা লেখায় তিনি দক্ষ ছিলেন। পণ্ডিত মশাই তাকে যে বেশি স্নেহ করতেন, এর প্রমাণ দিতেন তার প্রতি নানা কটুবাক্য বর্ষণ করে। তিনি লেখককে অনার্য, শাখামৃগ, দ্রাবিড়সম্ভূত ইত্যাদি ব্যতীত সম্বোধন করতেন না। এজন্য লেখকও কষ্ট পেতেন না; বরং আনন্দ উপভোগ করতেন।

মন্তব্য : আলোচ্যাংশে কটুবাক্যের অন্তরালে পণ্ডিত মশাইয়ের স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পরিচয় ফুটে উঠেছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬৪ ॥ তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিত মশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন।

অথবা, এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান –এ কথা অস্বীকার করার জো নেই।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের রম্যগল্প রচয়িতাদের অন্যতম স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে লেখক শ্রেণিকক্ষে পণ্ডিত মশাইয়ের অহরহ ঘুমের রসাত্মক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রতিদিন ক্লাসে এসে পণ্ডিত মশাই রোষকষায়িত দৃষ্টিতে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে কোনো একটা অজুহাত ধরে শুধু বকাবকি করতেন। তারপর বকা বন্ধ করে টেবিলে পা

রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। কোনো কোনো দিন বন্ধ হওয়া টোলের কথা স্মরণ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিয়ে টানাপাখার দিকে তাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। এ প্রসঙ্গে লেখক ঋগ্বেদের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যমের মৃত্যুতে যমপত্নী শোকাতুরা হলে দেবতারা তাকে কোনোপ্রকারে সান্ত্বনা দিতে না পেরে শেষপর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। লেখক বিশ্বাস করতেন, পণ্ডিত মশাইয়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য অহরহ যে-কোনো স্থানে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। অন্যথা টোল বন্ধ হয়ে যাওয়ার শোক ভুলে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এছাড়া যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থানে ঘুমিয়ে পড়া সবার পক্ষে সম্ভবও নয়। পণ্ডিত মশাই এটা পারতেন। কাজেই এটা দেবতার আশীর্বাদ বৈ অন্য কিছু নয়।

মন্তব্য : এখানে পণ্ডিত মশাইয়ের ঘুম-কাতুরে স্বভাবের পরিচয় প্রদানকল্পে লেখক ঋগ্বেদের কাহিনি সংযোজন করছেন। হতাশাগ্রস্ত মানুষের জন্য ঘুম দেবতার দানস্বরূপ, যা পণ্ডিত মশাইয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬৫ ॥ একে তো জীবনভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

অথবা, বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায়, শেষটায় পণ্ডিত মশায়ের, সেই অবস্থা হল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত রম্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে গেঞ্জি গায়ে দেওয়ার পর পণ্ডিত মশাই যে বিড়ম্বনাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত মশাই ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক-বাহক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাশিক্ষার পীঠস্থান টোলসমূহ উজাড় হয়ে যাওয়ায় তিনি স্কুলে চাকরি নিয়েছেন বাঁচার তাগিদে, কিন্তু তিনি আধুনিক সভ্যতা গ্রহণ করেননি। সেলাই করা কাপড় পরা হিন্দু শাস্ত্রমতে পাপ। সে পাপ এড়িয়ে চলতেন তিনি সযত্নে। ধুতি-চাদরই ছিল তার নিত্যদিনের দেহাবরণ। কিন্তু লাট সাহেবের আগমনবার্তা শুনে তিনি খালি গায়ে স্কুলে আসা সমীচীন মনে করেননি। তাই অনেক ভেবে তিনি একটি কোরা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে স্কুলে আসেন, এতে তার গা চুলকাতে থাকে। সে চুলকানি ছিল অসহ্য। নতুন জিন পরালে বাচ্চা ঘোড়া যেমন আকাশের দিকে পা তুলে লাফায়, পণ্ডিত মশায়ের অবস্থাও নতুন গেঞ্জি পরে সেরূপ হলো। তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েন।

মন্তব্য : অনভ্যাস মানুষকে ভালো কাজও ভুলিয়ে দেয়। যার যে কাজে অভ্যাস নেই সে কাজ করতে গেলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬৬ ॥ তারপর লুপ্তদেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। [ফা. প. ২০০৫]

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক, বিখ্যাত রসগল্পকার সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচাকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটির মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে গেঞ্জি খুলে পণ্ডিত মশাই কতটা আনন্দ অনুভব করেছেন সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : পণ্ডিত মশাই আজীবন ধুতি পরে চাদর গায়ে স্কুলে আসতেন। শাস্ত্রে নিষেধ থাকায় সেলাই করা কাপড় তিনি পরতেন না। লাট সাহেব স্কুলে আসবেন বলে সেদিন পণ্ডিত মশাই একটি নতুন গেঞ্জি পরে আসেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই করা নয়। গায়ে কাপড় পরার অভ্যাস না থাকায় পণ্ডিত মশাই আধ মিনিট যেতে না যেতেই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে এখানে ক্ষণে ওখানে, পিঠের অসম্ভব স্থানে কখনো ডান হাতে কখনো বাম হাতে চুলকাতে লাগলেন। তার মতলব ছিল গেঞ্জিটা খোলার। কেবল ছাত্রদের সাপোর্টের অপেক্ষায় ছিলেন। লেখক, ইহলোক-পরলোক-সর্বলোক তুলে দিব্যি কসম খেয়ে বললেন, লাট সাহেব আসার আগে জানালা দিয়ে দেখে তাকে জানাবেন, যাতে পণ্ডিতমশাই আবার গেঞ্জিটা পরতে পারেন। এবার নিশ্চিত হয়ে তিনি গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের ওপর রেখে যে দৃষ্টি হানলেন, তার টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণাভরে তাকাতে পারতেন না। এরপর পণ্ডিত মশাই তার অনাবৃত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে উল্লসিত হয়ে সারা দেহ ইচ্ছামতো খামচালেন। কারণ গেঞ্জি পরার অভ্যাস ছিল না বলে পণ্ডিত মশাইয়ের বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভরে গিয়েছিল।

মন্তব্য : মানবজীবনে অভ্যাসের ব্যতিক্রম হলে অনেকের ক্ষেত্রেই বিড়ম্বনা দেখা দেয়। পণ্ডিত মশাই আজীবন খালি গায়ে কাটিয়েছেন। তাই হঠাৎ গায়ে গেঞ্জি পরে তিনি অস্বস্তিতে পড়েন, যা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৭ ॥ এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণি সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেলেও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

অথবা, রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিত মশাইয়ের সর্ব যন্ত্রণা লাঘব হলো। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য রম্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত চাচাকাহিনী' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পাদটীকা' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে লাট সাহেবের অভিবাদন লাভে পণ্ডিত মশাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : পণ্ডিত মশাইরা আপন আপন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মর্যাদা এবং বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা অপরাপর শিক্ষকদের চেয়ে কম লাভ করতেন। এরা খুবই অনাদৃত ছিলেন। তাই সামান্য গতানুগতিক সম্মান পেলেই এরা আনন্দে আত্মহারা হতেন। গল্পকার যে স্কুলে পড়তেন, এ প্রসঙ্গে সেখানকার পণ্ডিত মশাইয়ের কথা উল্লেখ করেন। লাট সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এসে পণ্ডিত মশাইয়ের সাথে করমর্দন করেন। এ সম্মানলাভকে পণ্ডিত মশাই রাজসম্মান মনে করে ধন্য ও কৃতার্থ হলেন। তার চেহারায় আনন্দের প্রকাশ দেখা দিল, যদিও লাট সাহেব তার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন তা একান্তভাবেই লৌকিকতা ভিন্ন আর কিছু নয়। তবু পণ্ডিত মশাই এতে কৃতার্থ হন। তিনি বারবার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সালাম করেন। এতে তার শারীরিক ও মানসিক অস্থিরতা কিছুটা লাঘব হয়। তারা সাধারণ সম্মান থেকেও বঞ্চিত ছিলেন বলে গতানুগতিক সম্মান পেয়েও বিগলিত হন।

মন্তব্য : মানুষ একটু প্রীতি, সম্মান চায়। যখন কোনো মানুষ জীবনভর অনাদর-অসম্মান পেয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন একটু সম্মানের ছোঁয়া পেলে সে কৃতার্থ হয়। পণ্ডিত মশাই তার অনাদৃত উপেক্ষিত জীবনে একটু সম্মানের পরশ পেয়ে বিগলিত হয়ে পড়েছিলেন।

➽ ব্যাখ্যা : ৬৮ ॥ দেখি, সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।
[ফা. প. ১৯৯৩, '৯৯, '০১, '০৩, '০৯, '১৫, '১৮]

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য রম্যগল্পকার সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'চাচা কাহিনী' নামক গল্পগ্রন্থের 'পাদটীকা' নামক চমৎকার রসাত্মক ও বাস্তবধর্মী গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে পণ্ডিত মশাইয়ের আত্ম-অবমাননার করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : সংস্কৃতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন পণ্ডিত মশাই। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এ দেশের মানুষ সংস্কৃতের প্রতি বিমুখ হয়ে যখন ইংরেজির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তখন সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান টোলগুলো বন্ধ হয়ে যায়। পণ্ডিত মশাই যে হাইস্কুলে চাকরি করতেন, সে স্কুল পরিদর্শনে লাট সাহেবের আগমন ঘটেছিল। লাট সাহেবের সাথে তিন ঠ্যাংবিশিষ্ট একটি কুকুরও এসেছিল। পণ্ডিত মশাই খবর নিয়ে জানতে পারেন, ওই কুকুরটির জন্য লাট সাহেব ব্যয় করেন মাসে পঁচাত্তর টাকা। ক্লাসে এসে ছাত্রদের অঙ্ক কষতে দিলেন, লাট সাহেবের তিন ঠ্যাংবিশিষ্ট কুকুরের জন্য মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হলে, আর পণ্ডিত মশাইয়ের বেতন পঁচিশ টাকা হলে, তার আট সদস্যবিশিষ্ট পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টি ঠ্যাংয়ের সমান? এ প্রশ্ন শুনে নিস্তব্ধতা নেমে আসে ক্লাসে। সবাই তাকিয়ে দেখল, আত্ম-অবমাননার গ্লানি কীভাবে সর্বাঙ্গে মাখছেন পণ্ডিত মশাই। তার মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

মন্তব্য : সমকালীন শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষকজীবনের গ্লানি পরিস্ফুটিত হয়েছে 'পাদটীকা' গল্পের এ অংশে।

➽ ব্যাখ্যা : ৬৯ ॥ এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।
[ফা. প. ১৯৯৫, '০৭, '১২, '১৬]

অথবা, পণ্ডিত মশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

অথবা, 'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' Silence is golden যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই। [ফা. প. ১৯৯১]

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত রম্যলেখক সৈয়দ মুজতবা আলী বিরচিত 'পাদটীকা' শীর্ষক চমৎকার গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিতে লেখক আত্ম-অবমাননায় ক্ষতবিক্ষত পণ্ডিত মশাইয়ের লজ্জাবনত তিক্ত মুখের নীরব মূর্তি স্মরণ করে এ মন্তব্য করেছেন।

বিশ্লেষণ : পণ্ডিত মশাই জানতে পারলেন, লাট সাহেবের তিন ঠ্যাংবিশিষ্ট কুকুরটির জন্য মাসে পচাঁত্তর টাকা ব্যয় হয়। লাট সাহেবের কুকুরটির এক ঠ্যাংয়ের পেছনে মাসিক খরচ পঁচিশ টাকা। আর পণ্ডিত মশাই মাসিক বেতন পান পঁচিশ টাকা। এ টাকা দিয়ে আট জনের সংসার চালাতে হয় তাকে। ক্লাসের ছাত্রদের তিনি প্রশ্ন করলেন, এ ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কয়টা ঠ্যাংয়ের সমান? কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে? সমগ্র ক্লাস নিস্তব্ধ। ছাত্ররা মাথা নিচু করে বসে আছে। পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ লজ্জা, তিক্ততা ও ঘৃণায় বিকৃত হয়েছে। ছেলেরা বুঝতে পেরেছে, পণ্ডিত মশাই তাদেরকে সাক্ষী রেখে আত্ম-অবমাননার কী নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন। পণ্ডিত মশাই উত্তরের প্রতীক্ষায় বসে

আছেন, কিন্তু কে উত্তর দেবে? কী উত্তর দেবে? সমগ্র ক্লাসে নীরবতা বিরাজমান। প্রবাদ আছে, নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়, কিন্তু সবক্ষেত্রে এটা ঠিক নয়। ক্লাসের এ নীরবতা যে-কোনো সরবতার চেয়ে ভয়ানক। এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি মন থেকে মোছা যায় না, এটি ভুলবার মতো নয়। এ নিস্তব্ধতা বেদনাময়। যে কারণে লেখক Silence is golden-এ কথার ঘোর বিরোধী।

মন্তব্য : নীরব মুহূর্ত প্রাণে আনন্দ দেয়, কিন্তু অবমাননাজনিত কারণে যদি মুখের ভাষা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং পরিবেশ থমথমে হয়, তবে সে নীরব মুহূর্ত অনেক কষ্টের, অনেক বেদনাদায়ক।

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

⏩ ব্যাখ্যা : ৭০ ॥ বাড়িটা তারা দখল করেছে। অবশ্য লড়াই না করেই।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তিটিতে দেশবিভাগের পর কতিপয় উদ্বাস্তু কর্তৃক হিন্দুদের একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখলের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ১৯৪৭ সনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর ভারত থেকে মুসলমানরা পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা ভারতে গমন করে। এতে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে অসংখ্য মানুষ। এসব উদ্বাস্তু মানুষেরই প্রতিনিধি মোদাব্বের, মতিন, ইউনুস, মকসুদ, বদরুদ্দীন প্রমুখ। এরা কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে পায়নি। একসময় তাদের চোখে পড়ে রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত দোতলা প্রকাণ্ড বাড়িটা। হৈ হৈ করে তারা সবাই মিলে গেইটের তালা ভেঙে বাড়িটা দখল করে নেয়। দখলের জন্য তাদের কোনোপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করতে হয়নি। কারণ দেশবিভাগের ফলে বাড়িটির মালিকও বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন।

মন্তব্য : দেশবিভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষ একটু আশ্রয়ের জন্য অন্যের বাড়ি দখল করতেও দ্বিধা করেনি। দখলের উদ্দেশ্যে দখল নয়; মানুষের মৌলিক চাহিদা বাসস্থানের প্রয়োজনেই তারা বাধ্য হয়ে এ কাজ করেছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭১ ॥ খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে এ বাড়ি তাদের মধ্যে একটা নতুন জীবন সঞ্চার করেছে যেন।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন মুসলিম উদ্বাস্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে যে বাড়িটি দখল করেছে, তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করে বাড়িটি তাদের মনে কী পরিবর্তন এনেছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কলকাতা থেকে ঢাকায় আগত কয়েকজন মুসলিম উদ্বাস্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসেবে হিন্দুদের পরিত্যক্ত একটি বাড়ি দখল করে নেয়। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়িটা দখল করে তারা আনন্দচিত্তে বসবাস করতে লাগল। এর পেছনে তাদের মনে একটা বিশ্বাস কাজ

করে তা হলো, এ বাড়ি আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এ ছাড়াও এ রকম খোলামেলা ঝরঝরে তকতকে বাড়ি পাওয়াও কম ভাগ্যের ব্যাপার নয়। এর আগে কলকাতায় তারা কেউ খালাসি পট্টিতে, কেউ দফতরিদের পাড়ায়, কেউ বা সৈয়দ সালেহ লেনের তামাক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে দুর্গন্ধ, নোংরা গলির মধ্যে দিন কাটিয়েছে। সে তুলনায় এ বাড়ির বড় বড় কামরা, মস্ত মস্ত জানালা, খোলামেলা উঠান তাদের মনকে মুগ্ধ করে। তাদের কারো কারো মন হয়ে ওঠে কল্পনাপ্রবণ। কারো বা শরীরের রোগব্যাধি দূর হয়ে শরীর-মন হয়ে ওঠে সতেজ।

মন্তব্য : উদ্বাস্তু জীবনে আশ্রয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আশ্রয়স্থলটা যদি মনোমুগ্ধকর ও স্বাস্থ্যকর হয়, তাহলে ব্যাপারটা যারপরনাই আনন্দের এবং নতুন জীবনসঞ্চারী।

➤ ব্যাখ্যা : ৭২ ॥ আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে শুষ্কপ্রায় মৃতপ্রায় নগণ্য তুলসী গাছটি হঠাৎ সে বাড়ির অন্দরের কথা প্রকাশ করেছে যেন।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উদ্বাস্তুদের দ্বারা দখলকৃত বাড়িটির প্রকৃত পরিচয় ফুটে ওঠে তুলসী গাছটি আবিষ্কারের পর। এ সম্পর্কেই আলোচ্যাংশে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কলকাতা থেকে আগত কতিপয় মুসলিম উদ্বাস্তু ঢাকায় এসে একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজছিল। এমতাবস্থায় তারা একটি পরিত্যক্ত বাড়ি পেয়ে হৈ হৈ করে তাতে উঠে পড়ে। যে যার মতো জীবন গুছিয়ে নেয়– মোদাব্বের, মতিন, মকসুদ, ইউনুসসহ বাকিরা। একদিন সকালে দাঁত মেসওয়াক করতে করতে মোদাব্বের একটি তুলসী গাছ দেখতে পায়। মৃতপ্রায় তুলসী গাছটি অযত্ন আর অবহেলায় রান্নাঘরের পাশেই ছিল। মুহূর্তে তুলসী গাছটি কল্পনাপ্রবণ মতিনের কাছে এ বাড়ির পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে দেয়। বাড়িটি ছিল মূলত কোনো এক হিন্দু পরিবারের। তুলসীতলায় হিন্দুরা সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালায় এবং প্রণাম করে। একটি হিন্দু পরিবারের প্রতীক হয়ে তুলসী গাছটি সবার দৃষ্টি কাড়ে। আজ দেশ বিভাগের কারণে এই হিন্দু পরিবারটিও উদ্বাস্তু হয়ে কলকাতায় চলে গেছে বাড়িঘর সবকিছু ছেড়ে।

মন্তব্য : তুলসী গাছ হিন্দু পরিবারের ঐতিহ্য বহন করে। গাছটি আবিষ্কারের পরই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া গেছে, এটি একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে গৃহকর্ত্রীর অনেক স্মৃতি।

➤ ব্যাখ্যা : ৭৩ ॥ আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন। [ফা. প. ২০০৯, '১৫]

উৎস : ব্যাখ্যেয় গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গল্পকার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : পরিত্যক্ত বাড়ির তুলসী তলে যে একসময় নিত্য সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলত দখলকৃতদের কল্পনায় সে দৃশ্য ভেসে ওঠা সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ বিভাগের পর কলকাতা থেকে আগত কতিপয় মুসলিম উদ্বাস্তু ঢাকায় এসে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে ঠাঁই নেয়। মোদাব্বের, মতিন, মকসুদ, ইউনুসসহ অন্যান্যরা প্রশস্ত এ বাড়িতে বসবাস শুরু করে। একদিন সকালে মেসওয়াক করার সময় তাদের দৃষ্টি পড়ে বাড়ির আঙিনায় মৃতপ্রায় একটি তুলসী গাছের প্রতি। তখন তারা বুঝতে পারে যে এটা হিন্দু বাড়ি ছিল। মোদাব্বের তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তার এ নির্দেশ পালনে কারো হাতই এগিয়ে আসে না। গাছটির প্রতি মমতার দৃষ্টি পড়ে তাদের। তাদের মানসপটে ভেসে ওঠে এ বাড়ির সাবেক বাসিন্দাদের কথা; যারা নিয়মিত পরিচর্যা করে গাছটির অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, যাদের যত্নে সবুজ-সতেজ হয়ে থাকত এর পত্র-পল্লব। তারা জানে, হিন্দু রমণীরা দিনশেষে তুলসী তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। তাই তাদের কল্পনায় ভেসে ওঠে অতীতের ছায়াছবি– দিনশেষে সন্ধ্যা তারা যখন আকাশে উঁকি দিত, তখন সিঁদুর পরা কোনো এক রমণী প্রতিদিন এই গাছের নিচে প্রদীপ জ্বালাত। আজ সে গৃহকর্ত্রী এখানে নেই, কিন্তু তুলসী গাছটি নিজের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

মন্তব্য : কালপরিক্রমায় তুলসী গাছটি একটি পরিবারের আবহমানকালের জাতিগত ঐতিহ্য এবং ধর্মানুষ্ঠানের নিদর্শন বহন করে চলেছে।

» ব্যাখ্যা : ৭৪ ॥ যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসী গাছের তলে প্রদীপ দিয়েছে সে আজ কোথায়?

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থ থেকে সংকলিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে উদ্বাস্তুদের দখল করা বাড়িতে রান্নাঘরের পাশে একটি তুলসী গাছের সন্ধান পেয়ে এর পরিচর্যাকারী গৃহকর্ত্রী সম্পর্কে মতিনের কল্পনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ভারত থেকে ঢাকায় আসা কয়েকজন মুসলিম উদ্বাস্তু একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে বসবাস শুরু করে। এরা হলো মোদাব্বের, মতিন, ইউনুস, মকসুদ, বদরুদ্দীন প্রমুখ। থাকার এরকম একটা সুবন্দোবস্ত তাদের স্বস্তি ও আনন্দ দেয়। একদিন সকালে মোদাব্বের দাঁত মেসওয়াক করতে করতে রান্নাঘরের পাশে একটি তুলসী গাছ আবিষ্কার করে। সে হিন্দুয়ানী চিহ্ন বলে হৈ-হুল্লোড় করে তুলসী গাছটি উপড়ে ফেলতে চায়। অন্য সবাই বুঝতে পারে বাড়িটি হিন্দু বাড়ি। হুজুগে মানুষ মোদাব্বের যতই হৈ চৈ করুক, গাছটি কেউ উপড়ে ফেলল না; বরং কল্পনাপ্রবণ মতিনের চোখে ভেসে ওঠে একটি হিন্দু পরিবারের স্মৃতি। যারা একসময় এ বাড়িতে বসবাস করতো। তুলসী গাছের তলে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা করা হিন্দুদের নিয়ম। যে গৃহকর্ত্রী প্রতিদিন তুলসী তলায় সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালাত, সে গৃহকর্ত্রী আজ কোথায়? সেও হয়তো তাদের মতোই কোনো আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। ছেড়ে যাওয়া এ বাড়ির তুলসীতলার কথা মনে হলে তার চোখ হয়তো এখনও ছলছল করে ওঠে।

মন্তব্য : ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পর অসংখ্য মানুষ অসহায় নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে। তাদের বেদনার জলছবি অঙ্কিত হয়েছে আলোচ্য উক্তিটিতে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৫ ॥ হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে।

উৎস : উদ্ধৃত গল্পাংশটুকু প্রথিতযশা সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলা হয়েছে, হাতে ক্ষমতা থাকলে নিরীহকেও নির্যাতন-নিপীড়ন করার দিকে দৃষ্টি যায়।

বিশ্লেষণ : ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর কলকাতা থেকে ঢাকায় আগত কয়েকজন মুসলিম উদ্বাস্তু একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে বসবাস করতে থাকে। আপাতত একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই তাদের ক্ষণিক স্বস্তি দিলেও স্থায়ী শান্তি দিতে পারেনি। কারো মাধ্যমে খবর পেয়ে একসময় পুলিশ এসে হাজির হয় বাড়িটি রিকুইজিশন করার জন্য। রিকুইজিশন করতে আসা পুলিশদের দেখতে নিরীহ মনে হচ্ছিল, কিন্তু তাদের চোখ ছিল ছাদের একজোড়া কবুতরের দিকে। গল্পকার তাদের এ আচরণের ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন, হাতে বন্দুক থাকলে নিরীহ মানুষেরও দৃষ্টি পড়ে পশু-পক্ষীর দিকে। তখন একান্ত নিরীহজনেরও পশু-পাখি শিকারের ইচ্ছা জাগে। গল্পকার বোঝাতে চেয়েছেন, হাতে বন্দুক থাকার কারণেই ক্ষমতা পেলে মানুষ মমতা ভুলে শাসন-শোষণ করতে চায়, এটাই মানুষের প্রকৃতি।

মন্তব্য : হাতে ক্ষমতা থাকলে নিরীহ মানুষও তখন আর নিরীহ থাকে না। তার স্বভাব ও আচরণে পরিবর্তন আসে। সাধারণত পুলিশের আচরণ কিছুটা রুক্ষ হয়ে থাকে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৬ ॥ অন্যের অপমান দেখার নেশা বড় নেশা। [ফা. প. ২০১২]

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য সাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে উদ্বাস্তুদের দখল করা বাড়ি থেকে পুলিশ কর্তৃক বিতাড়নের সময় রাস্তায় কৌতূহলী মানুষের ভিড় সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর হিন্দুরা পাকিস্তান থেকে ভারতে এবং মুসলমানরা ভারত থেকে পাকিস্তানে গমন করে। যার ফলে অনেকেই হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু। এরকম কয়েকজন মুসলমান উদ্বাস্তু কলকাতা থেকে ঢাকায় আসে। তাদেরই প্রতিনিধি মতিন, মোদাব্বের, ইউনুস, মকসুদ, বদরুদ্দীন প্রমুখ। ঢাকায় এসে তারা কোথাও কোনো আশ্রয়ের সন্ধান না পেয়ে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি দখল করে বসবাস শুরু করে। বাড়িটি প্রকাণ্ড, দোতলা, বড় বড় দরজা-জানালা, খোলামেলা, ঝকঝকে তকতকে। বাড়িটিতে আশ্রয় পেয়ে তারা সবাই খুবই আনন্দিত। আবার যারা এ বাড়ির দখল নিতে পারেনি, তারা ব্যথিত চিত্তে ফিরে যায়। তাদের কেউ হয়তো পুলিশকে জানায় বাড়িটি দখলের খবর। একসময় পুলিশ এসে বাড়িটি রিকুইজিশন করে। পুলিশের আগমন টের পেয়ে রাস্তায় মানুষ জড়ো হয়। তারা যেন উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা ও অপমান দেখার আনন্দ উপভোগ করার জন্যই জড়ো হয়েছে।

মন্তব্য : মানুষ স্বভাবজাতভাবেই একটু ঈর্ষাকাতর হওয়ার কারণে অন্যের অপমান দেখে এক ধরনের আনন্দ অনুভব করে। স্বভাবগত সে কারণেই তারা উদ্বাস্তুদের অপমান দেখতে কৌতূহলী চোখে রাস্তায় জড়ো হয়।

» ব্যাখ্যা : ৭৭ ॥ সেদিন থেকে গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও আর কারো মনে পড়েনি।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রতিথযশা ব্যক্তিত্ব সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিরচিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' শীর্ষক অসাধারণ গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে অবৈধভাবে দখলকারী উদ্বাস্তুরা বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার পর তুলসী গাছটির পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর হিন্দুরা ভারতে এবং মুসলমানরা পাকিস্তানে বসবাসের উদ্দেশ্যে গমন করে। যার ফলে তারা হয়ে পড়ে উদ্বাস্তু। এরকম একদল মুসলিম উদ্বাস্তু কলকাতা থেকে ঢাকায় আসে। কোথাও মাথা গোঁজার ঠাঁই না পেয়ে তারা একটি পরিত্যক্ত বাড়ি দখল করে বসবাস শুরু করে। একদিন মোদাব্বের নামে তাদের একজন আবিষ্কার করে, বাড়িটিতে একটি তুলসী গাছ আছে। এতে তারা সবাই বুঝতে পারে, এটি একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। কল্পনাবিলাসী মতিনের চোখে ভেসে ওঠে একটি হিন্দু পরিবারের স্মৃতি। একজন গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখ। যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় এ তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে পূজা অর্চনা করতো। আজ কোথায় তারা? একসময় পুলিশ এ বাড়িটি রিকুইজিশন করে দখল নিয়ে নেয়। বের করে দেওয়া হয় উদ্বাস্তুদের। উদ্বাস্তুরা যতদিন ছিল, ততদিন তাদের কেউ একজন তুলসী গাছটির যত্ন নিয়েছিল। তাই গাছটি হয়ে উঠেছিল সজীব সতেজ। উদ্বাস্তুরা বিতাড়িত হওয়ার পর আর কেউ গাছটির যত্ন নেয়নি। গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কারো মনে পড়েনি।

মন্তব্য : দেশবিভাগের পর হাজার হাজার উদ্বাস্তুর মতো তুলসী গাছটিও অভিভাবকহীন ও যত্নহীন হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনের যেমন নিরাপত্তা নেই, তেমনি নেই গাছটিরও।

পথ জানা নাই

» ব্যাখ্যা : ৭৮ ॥ মানুষ হইতে হইলে, ভালোভাবে জীবনধারণ করিতে হইলে ঐসব শহর বন্দরের সহিত যোগাযোগ একান্ত দরকার।
অথবা, এই যোগাযোগের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে একটা সড়ক নির্মাণ করিতে হইবে।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক অনন্য সাধারণ গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : উন্নত জীবনযাপন করতে হলে যে শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা দরকার, সে ব্যাপারে এখানে গল্পকার জোনাবালি হাওলাদারের যুক্তি তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : মাউলতলা গ্রামের অধিবাসীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ধারায় জীবনযাপন করছিল। আধুনিক পৃথিবীর নব্য সভ্যতার সাথে তাদের কোনো যোগাযোগ ছিল না। গ্রামের তরুণ জোনাবালি প্রায় চল্লিশ বছর শহরে বসবাস করার পর গ্রামে আসে এবং গ্রামবাসীকে শহরের আধুনিক জীবনের প্রতি কৌতূহলী করে তোলে। এতদিনে সে যে নাগরিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে, তা তার পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব নয়। সে গ্রামবাসীর উন্নতির জন্য তাদের উদ্দেশে বলে, তারা যেখানে গিয়ে রাজার খাজনা দেয়, তার ওপারেও আর একটা দেশ আছে, যার নাম শহর। বর্তমান যুগে শহরের সাথে পরিচিত হতে না পারলে জীবন অর্থহীন। শহরের সাথে পরিচিত হতে হলে যোগাযোগ একান্ত

প্রয়োজন। আর যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হলো রাস্তা বা সড়ক। তাই সে গ্রামবাসীকে সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দেয়।

মন্তব্য : বর্তমান যুগে সভ্যতার ধারক-বাহক হলো শহর। শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেই মানুষ আধুনিকতার সংস্পর্শে আসতে পারে। আর এ যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম সড়ক।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৯ ॥ মোডে পাঁচকুড়া আমার ভুঁই, হের দুই কুড়াই সড়কে খাইলে আমি খামু কী? [ফা. প. ১৯৯৬]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে গল্পকার গহুরালির দুই-পঞ্চমাংশ জমি সড়কের জন্য ছেড়ে দেওয়ার পর তার ভবিষ্যৎ জীবনে চলার উৎকণ্ঠার চিত্র তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : জোনাবালি দীর্ঘ চল্লিশ বছর শহরে কাটিয়ে গ্রামে এসে শহরের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দেয়। সে গ্রামবাসীদের মনে শান্তিতে বসবাসের নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে, কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণ রাস্তা নির্মাণের জন্য তাদের জমি ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছিল না। গহুরালিও তাদের একজন। সে মোট ভূ-সম্পত্তির দুই-পঞ্চমাংশ সড়ক তৈরিতে দিলে অবশিষ্ট জমি দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনধারণ সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। জোনাবালি বুঝিয়েছেন, শুধু জমি থেকে তারা এতদিন আয়ের পথ দেখেছে; এবার এ নতুন রাস্তাটি হলে তাদের রোজগারের উৎস অনেক বেড়ে যাবে। গ্রাম্য মানুষ উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় সরল বিশ্বাসে তাদের শেষ সম্বল পর্যন্ত রাস্তার জন্য সঁপে দেয়।

মন্তব্য : নতুন স্বপ্নের সন্ধানে সড়ক নির্মাণে গ্রাম্য সরল মানুষ তাদের সামান্য সম্বলটুকু উৎসর্গ করতে দ্বিধান্বিত ছিল। পরে তাদের এ দ্বিধা কেটে যায়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮০ ॥ এ সড়ককে সড়ক বলইয়াই ভাইব্যো না, এ তারো চাইয়া বড়ো জিনিস। অথবা, সবকথা তো বোঝবা না, তউ কই হোনো এ রাস্তা নোতুন জীবনেরো।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে জোনাবালি রাস্তা তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা গ্রামের সাধারণ লোকদের বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : একদিন অভাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য জোনাবালি গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়, সেখানে তার জীবনের মোড় বদলে যায়। সে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর অঢেল ধনসম্পদ নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে এসে সে গ্রামবাসীদের শহর সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। সে তাদের শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ কতটা প্রয়োজনীয় তা বোঝায় এবং সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দেয়, কিন্তু গ্রামের গরিব কৃষকেরা কোনোমতেই তাদের ধানি জমি সড়কের জন্য উৎসর্গ করতে সম্মত হলো না। তখন সে তাদের বোঝায়, শুধু কৃষিকাজই উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম নয়। শহরের সাথে গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হলে আরো অনেক রকম উপার্জনের পথ তৈরি হবে। গ্রাম অনেক উন্নত হবে। এভাবে জোনাবালি গ্রামবাসীকে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়।

মন্তব্য : সভ্যতা রক্ষায় সড়ক নির্মাণের গুরুত্ব অপরিসীম। আর জীবনের মান উন্নয়ন এবং উপার্জনের পথ সৃষ্টির জন্য সড়কের গুরুত্ব উদ্ধৃত করতে গিয়ে জোনাবালি গ্রামবাসীর উদ্দেশে আলোচ্য উক্তি করেছেন।

» ব্যাখ্যা : ৮১ ॥ মাইয়া মানুষের বুদ্ধি তো। যে জিনিস যার নাই, হের লাইগ্যা তারই তো বেশি আইহট।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : গহুরালি তার স্ত্রী হাজেরাকে উদ্দেশ্য করে আলোচ্য কথাটি বলেছে। কারণ হাজেরা রাস্তা তৈরিতে জমি দিতে নিষেধ করেছিল।

বিশ্লেষণ : তরুণ বয়সে জোনাবালি গ্রাম ছেড়ে শহরে যায়। চল্লিশ বছর পর সে অনেক ধনসম্পদ নিয়ে মাউলতলা গ্রামে ফিরে আসে। নিয়ে আসে শহরে সভ্যতার ছোঁয়া। গ্রামে এসে সে গ্রামবাসীকে শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বোঝাতে থাকে। বলে, গ্রামের এ অর্থহীন জীবনকে অর্থময় করে তোলার জন্য শহর-বন্দরের সাথে যোগাযোগ একান্ত দরকার। শহরের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হলে সড়ক নির্মাণ করতে হবে। সড়ক নির্মাণে প্রথম বাধা আসে গহুরালির কাছ থেকে। জোনাবালি গহুরালিকে বলল, "আরে মেয়া কেবল ক্ষেতের ধান বেইচাই পয়সা হয় শেখছো এতোকাল। সড়কটা হইতে দেও না, দেখবা উপায়ের আরো কতো রাস্তা খুলে যায়।" তার কথায় গহুরালির প্রতিবাদের তীব্রতা কিছুটা কমে। বাড়িতে এসে গহুরালি স্ত্রীকে রাস্তার জন্য জমি দেওয়ার ইচ্ছার কথা জানায়। বউ এতে খুঁত খুঁত করলে সে জোনাবালির কথাগুলো ভারিক্কীচালে বউকে শুনিয়ে দেয়, "অতোশতো ভাবতে গেলে কী আর দ্যাশের দশের কাম হয়?" স্ত্রী বলে, "যাগো খাইয়া পইরাও বাড়তি আছে হেরা করুক গিয়া।" এর প্রতিউত্তরে গহুরালি ব্যাখ্যেয় উক্তিটি করে।

মন্তব্য : সরল মানুষের মনে কোনো কথা একবার প্রবেশ করলে সে কথাই তার কাছে চূড়ান্ত, অন্যসব মূল্যহীন। তেমনি গহুরালিও নয়া জীবনের হাতছানিতে প্রলুব্ধ হয়ে স্ত্রীর যুক্তি খণ্ডন করে ধানি জমি উৎসর্গ করতে সম্মত হয়। কারণ, সবার মঙ্গলে তাদেরও মঙ্গল।

» ব্যাখ্যা : ৮২ ॥ মনে মনে গভীরভাবে সে উপলব্ধি করিল এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসের যাচাই।

অথবা, এখানে পয়সার মূল্যে সব জিনিসের যাচাই। পয়সাই এখানকার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রাণের কোনো মূল্য ইহারা দেয় না। [ফা. প. ১৯৯২, '০০]

অথবা, তবু সারাপথ ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই পয়সার ভিত্তিতেই ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিল।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গহুরালির স্বপ্নভঙ্গের প্রাথমিক রূপ তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : জোনাবালির প্রচেষ্টায় সড়ক নির্মাণের মাধ্যমে শহরের সাথে মাউলতলা গ্রামের যোগাযোগ স্থাপিত হলো। এ যোগাযোগ নতুন জীবনের সূত্রপাত ঘটাবে বলে গহুরালি ধারণা করেছিল, কিন্তু শহরে এসে শহরের বিচিত্র রূপ দেখে সে প্রাথমিকভাবে হতাশায়

নিমজ্জিত হয়। গ্রামের মতো সহজ-সরল নিবিড় জীবন শহরে নেই। এখানে সবাই স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাপন প্রীতিহীন। পতিতালয়ের অভিজ্ঞতায় গহুরালি উপলব্ধি করে, নগরকেন্দ্রিক সমাজজীবন পুরোপুরি প্রেমহীন। সেখানে অর্থই সবকিছুর নিয়ন্তা, অর্থের মাপকাঠিতেই সবকিছুর বিচার হয়। এমনকি প্রেম-ভালোবাসা পর্যন্ত পাওয়া যায়। এ পাষাণপুরীতে প্রাণের স্পন্দন আশা করা বৃথা। এ সত্য উপলব্ধি গহুরালিকে মর্মে মর্মে পীড়িত করে, কিন্তু সে দমে যায় না। অর্থ-নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তিত এ জটিল সমাজজীবন মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে। এতে গহুরালির চরিত্রের আন্তরিকতা যেমন ধরা পড়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার মনোবল।

মন্তব্য : অর্থই নগর জীবনের একমাত্র প্রাণ। অর্থের মাপকাঠিতেই এখানে সবকিছুর মূল্যায়ন হয়। এ সত্যটি গহুরালি উপলব্ধি করেছে মর্মে মর্মে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৩ ॥ কিন্তু অতীতের শত শত বৎসরে যাহা ঘটে নাই, দুই শত বৎসরের ইংরেজ শাসনের ফলে এবার এখানে তাহাই আত্মপ্রকাশ করিল।

অথবা, তাহার ঢেউ এ পথ বাহিয়া এবার আসিল এখানেও।

অথবা, এদেশের ইতিহাসে তাহা এই প্রথম, রাজ্যস্বার্থ লইয়া ভাঙাগড়ায় এই সব গ্রামের কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই কোনোদিন।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক গল্প থেকে চয়নকৃত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে ইংরেজ শাসনের ফল ও দ্রুত যুগ পরিবর্তনের বিষয়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : এ অঞ্চলে ইংরেজদের আগমনের পর এখানকার কৃষ্টি সভ্যতায় পরিবর্তনের ছাপ পড়ে। সে পরিবর্তন দীর্ঘ এক শতাব্দীরও অধিককাল পর্যন্ত শিক্ষিত শহরবাসীর জীবনেই সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভয়াবহ সর্বনাশা অভাব-অনটন শহরের সংযোগ সড়কের পথ ধরে মাউলতলার মতো নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবনেও পরিবর্তন এনে দেয়। গ্রামীণ মানুষের সহজ-সরল জীবনে কুটিল আবহের সৃষ্টি হয়। ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মকদ্দমা গ্রামের মানুষের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। অতীতে বহু ভাঙাগড়া হয়েছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষের জীবনে কোনো প্রভাব বা পরিবর্তন সূচিত হয়নি। ব্রিটিশ শাসনামলে শহরের সাথে গ্রামীণ জীবনের যোগাযোগের ফলে মানুষের জীবনে দ্রুত পরিবর্তন আসে। শত শত বছরের বহমান জীবনস্রোতে হঠাৎ পঙ্কিল আবর্ত সৃষ্টি হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। মানুষের মন থেকে মায়া-মমতা, আন্তরিকতা মুছে যায়।

মন্তব্য : এ দেশে ইংরেজ শাসনের ফলে এখানকার সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অতীত ঐতিহ্য সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। নেমে আসে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৮৪ ॥ দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের।

[ফা. প. ১৯৯০, '০২, '০৮, '১১, '১৩, '১৬, '১৮]

অথবা, ধীরে ধীরে এই সড়ক বহিয়াই আসিল মন্বন্তর।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু স্বনামধন্য সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক গল্প থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে গল্পকার ইংরেজদের এ অঞ্চলে আবির্ভাবের পর যে পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছিল তা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : মাউলতলা গ্রামের মানুষ উন্নত, সচ্ছল জীবনের প্রত্যাশায় সড়ক নির্মাণ করে শহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল। গহুরালির মতো গ্রামবাসীরা প্রথম দিকে যদিও সচ্ছলতা পেয়েছিল, কিন্তু তা উবে যেতে বেশি দেরি হয়নি। শহুরে সমাজজীবনের বিষস্পর্শে মাউলতলায় খুন, জখম, মামলা-মকদ্দমা ইত্যাদি শুরু হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত যখন এসে পড়ল তখন সেই বিষাক্ততা তীব্র আকার ধারণ করে। যুদ্ধের সঙ্গে এল মন্বন্তর, এল রোগ-ব্যাধি, চোরাবাজারী ও দুর্নীতি। অবসান ঘটল মানবিকতা, নৈতিকতার। জিনিসপত্রের দাম চড়তে চড়তে চলে গেল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এমন অবস্থায় বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ বিবেক বিসর্জন দিয়ে অনৈতিকতার শিকার হতে বাধ্য হলো। লেখক এ শোচনীয় পরিস্থিতিরই বর্ণনা দিয়েছেন উদ্ধৃত বাক্যটিতে। জীবনের দাম কমে যাওয়ার ঘটনায় শোষিত, বঞ্চিত সাধারণ মানুষের করুণ অসহায়ত্বই প্রকাশ পেয়েছে। পাশাপাশি উন্নত জীবনপ্রত্যাশী মাউলতলা গ্রাম তথা গহুরালির প্রতি পরিস্থিতির নিষ্ঠুর পরিহাস তীব্র হয়ে ওঠে।

মন্তব্য : মাউলতলা গ্রামের মানুষের জীবনে নতুন সড়কের বদৌলতে শুভ কিছু হয়েছে সত্য, কিন্তু অশুভের কালো ছায়াও নেমেছে। মন্বন্তরের কারণে সব জিনিসের দাম বেড়েছে এবং এর বিরূপ প্রভাবে মানুষের জীবনের দাম কমেছে।

» ব্যাখ্যা : ৮৫ ॥ মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হইয়াছিল বাহিরে, এবারে হইল অন্তরে।

[ফা. প. ২০০৪, '০৭]

অথবা, ভুল, ভুল অইছিলো এ রাস্তা বানাইন্যা। আমরা যে রাস্তা চাইছেলাম হেয়া এ না, ঠিক অয় নাই।

উৎস : সংকলিত গল্পাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম বিরচিত 'পথ জানা নাই' শীর্ষক গল্প থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে গল্পকার আধুনিক নগর সভ্যতার কুফল তুলে ধরেছেন। মূলত লেখক এখানে নগর সভ্যতার প্রতি গহুরালির তিরস্কার উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : অনুন্নত মাউলতলা গ্রামের অধিবাসীরা শহরের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সড়ক নির্মাণ করে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে, কিন্তু শহুরে হাওয়া গ্রামের গায়ে লাগায় জীবনযাত্রা জটিল হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সে সড়ক বেয়েই গ্রামে এসে ঢুকল মন্বন্তর। আর সেই সাথে চোরাচালান, কালোবাজারি ইত্যাদি প্রবঞ্চনায় গ্রামের আবহাওয়া দূষিত হয়ে পড়ল। সামরিক বাহিনীর জন্য রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঠিকাদার গ্রামে আসতে থাকে। গহুরালি এ দুর্ভিক্ষের বাজারে আয়ের উদ্দেশ্যে এমনি এক ঠিকাদারের দালালের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে, কিন্তু হিতে বিপরীত হয়। একদিন সকালে গহুরালির স্ত্রী হাজেরা দালালের হাত ধরে ওই সড়ক দিয়েই শহরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। মন্বন্তরে গহুরালি নিঃস্ব হয়েছিল বাইরে, এবার হলো অন্তরে। গহুরালি শোকে পাথর হয়ে দু'দিন বাড়িতে পড়ে থেকে অবশেষে উন্মাদের মতো শহর থেকে গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে কোদাল দিয়ে রাস্তা কাটতে থাকে। ভুল স্বীকারের মাধ্যমে সে আত্মসমর্পণ করে উদ্ভূত পরিস্থিতির কাছে।

মন্তব্য : সড়ক নির্মাণে গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এর পাশাপাশি নৈতিক অবক্ষয়ও শুরু হয়। তাদের জীবন এক দুর্বিষহ যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। সঠিক পথের সন্ধান তারা পায় না।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

▶২টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে − ১৫ × ১ = ১৫

যে সবে বঙ্গেত জন্মি

আবদুল হাকিম [আনু. ১৬২০−১৬৯০ খ্রি.]

⏩ প্রশ্ন : ১ ॥ কবি আবদুল হাকিম রচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতার মূল ভাব নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

অথবা, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি কবির যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১০]

অথবা, আবদুল হাকিম রচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতার সারমর্ম লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সপ্তদশ শতকের অন্যতম প্রগতিশীল কবি আবদুল হাকিম ছিলেন স্বদেশ ও স্বভাষার প্রেমিক কবি। কবি কাব্যনির্ভর মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নিজ ভাষার প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ করেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতার মাধ্যমে। এ কবিতায় কবি তাঁর মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর অনুভূতি ও আন্তরিক বিশ্বাসের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কালের বিচারে আবদুল হাকিম মধ্যযুগীয় হলেও মেধা ও মননে তিনি আধুনিকতার ছোঁয়ায় সিক্ত করেছেন তাঁর 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থটি। এ কাব্যগ্রন্থেরই শ্রেষ্ঠ কবিতা 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি'।

মূল ভাব/সারমর্ম : আবদুল হাকিমের আলোচ্য কবিতাটিকে বিষয়বস্তু ও সারমর্মের বিচারে নিম্নোক্তভাবে আলোচনা করা হলো :

বাংলা ভাষার প্রতি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন : বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম যখন বাংলা কাব্যচর্চা শুরু করেন, তখন এ উপমহাদেশে আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার প্রচলনই বেশি ছিল। একশ্রেণির লোক বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাষা বলে অবহেলা করতো; কিন্তু কবির মতে, ধর্মীয় ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এই ভাষা মহান স্রষ্টারই দান। কবির ভাষায়−

যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।

এভাবে কবি তাঁর উদার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার প্রতি ভ্রান্তধারণা ও অযৌক্তিক হিংসা-বিদ্বেষের অপনোদন ঘটিয়েছেন।

সব ভাষার প্রতি কবির শ্রদ্ধাবোধ : ভাব প্রকাশের প্রধান বাহন ভাষা আল্লাহর দান। দেশভেদে ও কালভেদে ভাষার পার্থক্য সূচিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের বোধগম্যের জন্য কবি বাংলা ভাষার চর্চা করলেও আরবি, ফারসি, হিন্দি বা অন্যান্য ভাষার প্রতি তিনি কোনোরকম অবজ্ঞা প্রকাশ করেননি; বরং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন এভাবে−

আরবি ফারছি শাস্ত্রে নাই কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ।।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা ও মহানবি (স)-এর গুণকীর্তন করা হয়েছে আরবি, ফারসি ভাষায়। তাই কবি এসব ভাষার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল।

স্বদেশি ভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ : স্বভাষা ও স্বভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ এবং মমত্ববোধের কবি আবদুল হাকিম মাতৃভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন অনেক বেশি। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে ও সাহিত্যচর্চা করতে যারা লজ্জাবোধ করে, তাদের প্রতি কবি তীব্র ক্ষোভ ও কটাক্ষ প্রকাশ করেছেন। কবির ভাষায়–

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে, তাদের জাতি, বংশ ও জন্ম সম্পর্কে কবি সন্দিহান। দেশি ভাষায় বিদ্যার্জন ও সাহিত্যচর্চা করাটা যারা পছন্দ করে না, কবি বলেছেন, এসব লোকের দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়া উচিত। এ দেশের অন্ন, বস্ত্র, ফল-ফলাদি ও পানীয়তে তাদের কোনো অধিকার নেই।

দেশি ভাষাচর্চার প্রভূত কল্যাণ ও উপকারিতা : দেশি ভাষাচর্চার কল্যাণ ও উপকারিতা সম্পর্কে কবি বলেছেন–

মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

মাতা-পিতামহ থেকে যারা বংশানুক্রমে বাংলাদেশে বসবাস করছে, তাদের জন্য দেশি ভাষাচর্চাই হিতকর ও প্রভূত কল্যাণকর। নিজ ভাষায় মনের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে এবং সাহিত্যচর্চা করে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিবেদিত হতে পারে।

উপসংহার : কবি আবদুল হাকিমের 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি সপ্তদশ শতকের বাংলা কাব্যজগতে একটি প্রতিনিধিত্বশীল কবিতা। এ কবিতায় কবি বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার সপক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এতে কবির স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ এবং অকৃত্রিম শ্রদ্ধা অনুরণিত হয়েছে। মোটকথা, মাতৃভাষাই হওয়া উচিত প্রতিটি জাতির সাহিত্যচর্চার মাধ্যম।

» প্রশ্ন : ২ ॥ বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার প্রতি কবি আবদুল হাকিমের যে প্রগাঢ় মমতা প্রকাশ পেয়েছে তা 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, "কবি আবদুল হাকিম রচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব প্রকাশ পেয়েছে" – আলোচনা কর।

অথবা, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় কবির দেশ ও ভাষার প্রতি যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে তার পরিচয় দাও।

অথবা, 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে– আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মধ্যযুগের অন্যতম প্রগতিশীল মুসলিম কবি আবদুল হাকিম বিরচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' একটি অসাধারণ দেশপ্রেমমূলক কবিতা। দেশি ভাষা অনুধাবন ও চর্চাই যে পরম সৌভাগ্যের চাবিকাঠি, এমন আন্তরিক আস্থা ও বিশ্বাসের কবি আবদুল হাকিম। সপ্তদশ শতকের কবি হয়েও তাঁর চিন্তা-চেতনায় আধুনিক বস্তুনিষ্ঠতার পাশাপাশি গভীর দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশে জন্ম নিয়েও যারা মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করে, কবি তাদের প্রতি চরম ঘৃণা উচ্চারণ করেছেন। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ভালোবাসা :

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা?

কবিয়াল রামনিধি গুপ্তের মতো কবি আবদুল হাকিমও নিজের আত্মতৃপ্তি এবং সাধারণ বাঙালি পাঠকদের মাতৃভাষা চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বাংলা কাব্য রচনায় নিবেদিত হওয়ার অভিলাষ ব্যক্ত করেন এভাবে–

তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন।।

কবি গোঁড়া মাতৃভাষা প্রেমিক নন : মাতৃভাষার প্রতি কবি তাঁর গভীর উপলব্ধি ও মমত্ববোধের কথা ব্যক্ত করলেও আরবি, ফারসি, হিন্দি ভাষাসহ অন্যান্য ভাষার প্রতি তাঁর কোনো রাগ-বিরাগ নেই। কবির ভাষায়–

আরবি ফারছি হিন্দে নাই দুইমত।
যদি বা লিখয়ে আল্লা নবীর ছিফত।।

আরবি, ফারসি ভাষায় আল্লাহ ও মহানবি (স)-এর প্রশস্তি বর্ণিত হলেও আল্লাহ তায়ালা অন্য ভাষা বোঝেন না এমন নয়; বরং সব ভাষাই মহান আল্লাহর দান। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমিপ্রেম ঈমানেরই একটি অঙ্গ। কবি আবদুল হাকিম সেই মাতৃভাষা প্রেমই এখানে প্রকাশ করেছেন তাঁর কবিতায়।

মাতৃভূমির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও মমত্ববোধ : মাতৃভূমি মায়ের মতোই স্নেহময়ী ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কবি তাই স্বদেশের প্রতি তার সর্বাত্মক আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও মমত্ব প্রকাশ করেছেন মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার মাধ্যমে। আলোচ্য কবিতায় কবি দৃঢ় দেশপ্রেম ব্যক্ত করেছেন, মাতৃভূমিতে বসবাস করেও যারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশের মাধ্যমে। মানুষ যে ভূমিতে বা যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়, সে ভূমি বা সে মাটিই হচ্ছে তার মাতৃভূমি। মায়ের কোলে শিশুটি যেমন হেসে-খেলে বড় হয়, তেমনি মাতৃভূমির আলো-বাতাস, ধূলিকণা গায়ে মেখেই একটি মানবশিশু পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে ওঠে। মাতৃভূমির এ অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মধ্যযুগের এ স্বনামধন্য কবিও স্বদেশ ভূমি এবং স্বদেশ মাতৃকাকে গভীরভাবে ভালোবাসেন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মাতৃভূমির ঋণ পরিশোধ করার জন্যই কবি মাতৃভাষা চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। যারা বঙ্গদেশে জন্মলাভ করেও বঙ্গবাণীর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে, কবি তাদের জন্ম-পরিচয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাদের নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দেন এভাবে–

দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

এ সাহসী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবি আবদুল হাকিম তাঁর গভীর দেশপ্রেমের অনুভূতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

উপসংহার : কাব্যানুভূতির শেষলগ্নে কবি মাতা-পিতামহসহ বংশানুক্রমে লালিত দেশি ভাষার আধারেই সর্বস্তরের গ্রন্থ রচনা করে সর্বাধিক কল্যাণ ও উপকার লাভ করা যায় বলে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধার বাস্তব দলিল 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি। এটি মধ্যযুগে আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ চেতনার বহিঃপ্রকাশের একটি প্রতিনিধিত্বশীল কবিতা।

▸▸ প্রশ্ন : ৩ ॥ বাংলা ভাষার প্রতি যাদের অশ্রদ্ধা তাদের প্রতি কবি কী উপদেশ দিয়েছেন? 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতা অনুসরণে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : প্রখ্যাত কবি আবদুল হাকিম কাব্যনির্ভর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের এক অনন্য প্রতিভা। সাহিত্যে দেবদেবী আর রাজস্তুতির সংস্কারমুক্ত উদার চিন্তাচেতনার কবি তাঁর 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও ভাষাপ্রেম উচ্চারণ করে কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক ধারার সংযোজন করেছেন। 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম এ কবিতায় কবি মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তীব্র ভালোবাসার অনুরাগ নিয়েই বাংলাদেশে বসবাসকারীর বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধাকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের কবি এক যুগান্তকারী উপদেশ ও পরামর্শ দান করেছেন আলোচ্য কবিতায়।

সব ভাষার প্রতি কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গি : ভাষা মহান আল্লাহর অপার দান। পৃথিবীর দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে পরিচয়ের এক স্বতন্ত্র মাধ্যম ভাষা। সব ভাষাই আল্লাহ তায়ালা বোঝেন, তাই কোনো ভাষাকে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিত নয়। আরবি, ফারসি ভাষায় যেমন আল্লাহ নবির স্তুতি জ্ঞাপন করা হয়েছে, তেমনি বাংলা ভাষায়ও আল্লাহ-নবির প্রশংসা করা যায়। মনের যে-কোনো প্রার্থনা, আবেগ-আকুতি, হৃদয়ের একান্ত কামনা-বাসনা, আল্লাহর কাছে এ ভাষায় করলেও আল্লাহ তায়ালা শোনেন। কবির ভাষায়–

যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন।।

কবি এভাবেই ভাষার প্রতি অবজ্ঞাকারীদের বিবেককে নাড়া দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে।

বাংলা ভাষা-বিদ্বেষীদের প্রতি কবির ক্ষোভ : যেসব লোক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলাদেশের আলো, বাতাস, ফলমূল খেয়েও মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা ও হিংসা-বিদ্বেষের চোখে দেখে, কবি তাদের প্রতি তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কবি এই শ্রেণির লোকদের জাত, বংশ ও জন্ম সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন–

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।

দেশি ভাষা বাংলায় বিদ্যার্জন ও সাহিত্যচর্চায় যাদের মন বসে না, কবি তাদের নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কারণ এ দেশের জলবায়ু, অন্ন, বস্ত্রে তাদের কোনো অধিকার নেই।

কবির উপদেশ : মায়ের মতোই স্নেহময়ী মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি। মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা প্রেম ঈমানেরই অঙ্গবিশেষ। কবি আবদুল হাকিম তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি নিচের পঙ্ক্তিদ্বয়ে উচ্চারণ করেছেন–

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

কবির মতে, মাতা, পিতামহ থেকে শুরু করে বংশানুক্রমে যারা বাংলাদেশে বসবাস করে আসছে, তাদের বাংলা ভাষাকে অশ্রদ্ধা না করে মনেপ্রাণেই তা গ্রহণ করা উচিত। তাঁর মতে, দেশি ভাষা বাংলাই তাদের জন্য হিতকর ও কল্যাণকর। কবির একান্ত উপদেশ তারা যেন নিজ ভাষাতেই তাদের মনের আবেগ প্রকাশ করে এবং সাহিত্যচর্চা করে দেশ ও জাতির প্রভূত কল্যাণে নিবেদিত হয়।

উপসংহার : সপ্তদশ শতকের প্রতিভাবান কবি আবদুল হাকিম আলোচ্য কবিতায় বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এ ভাষায় কাব্যচর্চার পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজ ভাষা-বিদ্বেষীদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তাদের জন্ম-পরিচয় সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছেন।

»» প্রশ্ন : ৪ ॥ 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতায় 'হিন্দুর অক্ষর' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? হিন্দুর অক্ষর মনে করে যারা বাংলা ভাষা বিদ্বেষী হয়েছে তাদের ব্যাপারে কবি কী বলেছেন?

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কবি আবদুল হাকিম সপ্তদশ শতকের একজন প্রতিভাবান কবি। তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকমনস্ক এক উদার কবি হিসেবে স্থান লাভ করে আছেন। তাঁর কবিতায় স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি অনুরাগের কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অনন্য হয়ে আছেন। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

'হিন্দুর অক্ষর'-এর তাৎপর্য : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, কিন্তু এ ভাষা সরাসরি উৎপত্তি হয়নি। মূল প্রাকৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের বাংলা ভাষায় রূপলাভ করেছে। এ বাংলা ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে যা সংস্কৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বাংলায় রূপলাভ করেছে। এ কারণেই তৎকালে বাঙালি হয়েও একশ্রেণির গোঁড়া মানুষ মনে করতো, সংস্কৃত ভাষাজাত বাংলা হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা। তাদের মতে, আরবি-ফারসি হচ্ছে কুরআন-কিতাবের ভাষা। কাজেই বাংলা বাদ দিয়ে সেসব ভাষায় জ্ঞান ও সাহিত্য সাধনা করতে হবে। কিন্তু কবির মতে, 'হিন্দুর অক্ষর' বলে যারা বাংলাকে অশ্রদ্ধা করে, তারা মারাত্মক ভুল করছে। কেননা কোনো ভাষাই কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা হচ্ছে মহান আল্লাহর এক শাশ্বত দান। বাংলা ভাষা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল বাঙালির ভাষা। কাজেই 'হিন্দুর অক্ষর' বলে বাংলাকে বাদ দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। যাদের আধ্যাত্মিক বা মারফত জ্ঞান নেই, তারাই কেবল এ ধরনের ভুলে নিমজ্জিত হয়। যেমন কবি বলেন–

মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ।।

বাংলা ভাষা-বিদ্বেষীদের ব্যাপারে কবির বক্তব্য : বাংলা ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে, কবি তাদের সংশোধনের উদ্দেশে বলেন, দেশের যেসব লোক আরবি, ফারসি ভাষা বোঝে না, তাদের জন্য মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করা উচিত। নইলে তারা চিরদিনই ধর্মীয় ব্যাপারে অজ্ঞ থেকে যাবে। আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও নিজেদের মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি সব বোঝেন। যে কোনো ভাষায় প্রার্থনা করলে তিনি তা শোনেন। সবার মাতৃভাষাই আল্লাহর কাছে সমান। ভাষার প্রশ্নে কাউকে হিংসা করা অনুচিত। কবি উপদেশ দিচ্ছেন, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে, পিতৃ-পুরুষের ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখে, তারা যেন তাদের জন্ম উৎসকেই অস্বীকার করে। এ দেশের আলো-বাতাস, ফল-ফসল ভোগের কোনো অধিকার তাদের নেই। তাই তাদের দেশত্যাগী হওয়া উচিত।

উপসংহার : ধর্মের দোহাই দিয়ে, বাংলাকে হিন্দুর অক্ষর আখ্যা দিয়ে হিংসা ও অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। স্রষ্টা সব ভাষাই বোঝেন। তিনি মানুষকে ভাষা দিয়েছেন নিজেদের মনের ভাব প্রকাশের জন্য। তাই স্বভাষাপ্রেম নিঃসন্দেহে মানবিকতা ও ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুর অক্ষর আখ্যা দিয়ে নিজ ভাষাকে ঘৃণা করা সমীচীন নয়।

⏩ প্রশ্ন : ৫ ॥ মধ্যযুগের কবি আবদুল হাকিম কাদের লক্ষ্য করে 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি রচনা করেছেন? এ কবিতায় কবি কী উপদেশ দিয়েছেন? আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কবি আবদুল হাকিম ছিলেন সপ্তদশ শতকের অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'নূরনামা' থেকে 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে। মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে আলোচ্য কবিতায়। যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে, কবি তাদের প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং তাদের নিজ দেশ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন। নিচে প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো :

কবিতাটি যাদের উদ্দেশে রচিত : 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' একটি উদ্দেশ্যমূলক কবিতা। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত হয়। কবিতাটি যাদেরকে উদ্দেশ্য করে রচিত হয় তারা হলেন–

শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণি : মধ্যযুগে (সপ্তদশ শতক) রাজভাষা ছিল ফারসি। সংখ্যাগুরু মুসলমান রাজপুরুষদের ধর্মীয় ভাষা ছিল আরবি। স্বাভাবিকভাবেই সে যুগের কবি-সাহিত্যিকরা ছিলেন আরবি ও ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। তারা বাংলা ভাষায় যা রচনা করেন তার ওপর আরবি ও ফারসি ভাষার প্রভাব ছিল বিস্তর। মুসলমান কবিদের অনেকেই তখন বাংলা কাব্য লিখেছিলেন আরবি অক্ষরে। বাংলা বর্ণমালাকে তারা হিন্দুদের বর্ণমালা মনে করে অবহেলা করতেন। কবি সপ্তদশ শতকের সেই শিক্ষিত পণ্ডিত মুসলমানদের লক্ষ্য করে 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি রচনা করেন।

সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণি : দেশের সাধারণ শিক্ষিতজন, যারা আরবি-ফারসি কিতাব পড়তে জানে না, অথচ তাদের জানার আগ্রহ আছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে তারা সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চা করতে আগ্রহী, তাদের লক্ষ্য করে কবি বাংলা কাব্যগ্রন্থ, বিশেষ করে 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি রচনা করেন। কবির ভাষায়–

কিতাব পড়িতে যার নাহিক অভ্যাস।
সে সবে কহিল মোতে মনে হাবিলাষ।।
তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন।।

যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে : বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে নিজ মাতৃভাষা বাংলায় কথা বলতে ও সাহিত্যচর্চা করতে যারা লজ্জাবোধ করে, কবি তাদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ও কটাক্ষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়–

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে, তাদের জাত, বংশ ও জন্ম সম্পর্কে কবি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের কবি দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

কবির উপদেশ : বাংলা ভাষাকে যারা অবজ্ঞা করে, কবি তাদের সংশোধনের উদ্দেশে বলেন, দেশের যেসব লোক আরবি-ফারসিতে রচিত কিতাবের ভাষা বোঝে না, তাদের জন্য মাতৃভাষা বাংলায় ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করা উচিত। নইলে তারা চিরদিনই ধর্মীয় ব্যাপারে

অজ্ঞ থেকে যাবে। আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও নিজেদের মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি সব বোঝেন। যে-কোনো ভাষায় প্রার্থনা করলে তিনি তা শোনেন। সবার মাতৃভাষাই আল্লাহর কাছে সমান। ভাষার প্রশ্নে কাউকে হিংসা করা অনুচিত। কবি উপদেশ দিচ্ছেন, বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও যারা বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে, পিতৃ-পুরুষের ভাষাকে ঘৃণার চোখে দেখে, তারা যেন তাদের জন্ম উৎসকেই অস্বীকার করে। এ দেশের আলো-বাতাস, ফল-ফসল ভোগের কোনো অধিকার তাদের নেই। তাই তাদের দেশত্যাগী হওয়া উচিত। কবি বলেছেন–

মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি।।

অর্থাৎ পুরুষানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে যে বাংলা ভাষা আমরা মাতৃভাষা হিসেবে পেয়েছি, সে ভাষায় সর্বস্তরের গ্রন্থ রচনা করাই সর্বাধিক কল্যাণকর।

উপসংহার : মাতৃভূমি ও মাতৃভাষা প্রেম ঈমানের অঙ্গ। নিজ ভাষায় সব ধরনের গ্রন্থ রচনা করা উচিত। বিশেষ করে ধর্মীয় গ্রন্থাদি যা আরবি, ফারসি; উর্দু ভাষায় রচিত, সেগুলো যদি আমাদের মাতৃভাষায় চর্চা করি, তাহলে মানুষ সহজেই ধর্মীয় বিধান বুঝতে ও মেনে চলতে পারবে। তাই আমাদের অবশ্যই মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে হবে।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী

লালন শাহ [আনু. ১৭৭৪–১৮৯০ খ্রি.]

»» প্রশ্ন : ৬ ॥ বাউল সম্রাট লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক কবিতার মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি' কবিতাটির ভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১২]

অথবা, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' বাউল সম্রাট লালন শাহের একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতার মূলভাব/বিষয়বস্তু তোমার নিজের ভাষায় আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : লালন শাহ মধ্যযুগের শেষের দিকের একজন বিখ্যাত বাউল কবি। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' তাঁর একটি অনবদ্য কবিতা। এ বিখ্যাত গীতিকবিতায় তিনি জাতি-ধর্মহীন আড়ম্বরপূর্ণ দেহকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক ধর্ম সাধনার অপূর্ব সুধাময় ব্যঞ্জনা চির পরিচিত সহজ-সরল উপমায় অলঙ্কৃত করে উপস্থাপন করেছেন। পুরান-কুরআন, বেদবেদান্ত এবং পোশাক-পরিচ্ছদসম্পন্ন আচারসর্বস্ব ধর্ম পালনের রীতিতে অবিশ্বাসী লালন শাহ দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক গীতিকবিতায়।

মূল বক্তব্য/মূলভাব : নিচে বিভিন্ন শিরোনামে আলোচনার মাধ্যমে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতার মূল বক্তব্য/মূলভাব উপস্থাপন করা হলো :

লালন শাহের জীবনদর্শন : লালন শাহ ধর্মের প্রচলিত সংকীর্ণতা গ্রহণ করেননি। ধর্মের বেশভূষা, আচার-আচরণ কোনোটাতেই লালন শাহের বিশ্বাস ছিল না। তাঁর ভাষায়–

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন কয়, জাতের কিরূপ, দেখলাম না এক নজরে।

বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিকতা, হিন্দু ধর্মের শক্তি ও ফকিরী মতবাদ বাউল মতকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু লালন শাহ হিন্দুদের শক্তি ও মুসলমানদের তাসাউফ কিংবা সুফী মত দ্বারা প্রভাবিত হয়েও এর মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। সাংসারিক জীবনের বাইরে থেকে লালন শাহ

সংগীতমুখর দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা পরমাত্মাকে পেতে চেয়েছেন। কবির মতে, স্রষ্টাকে পেতে ঢাকা কিংবা দিল্লিতে খুঁজে বেড়ানোর দরকার নেই। অন্য কথায় আনুষ্ঠানিকভাবে তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে পরমাত্মার সন্ধান করতে যাওয়ার দরকার হয় না। তিনি আত্মারূপে মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন–

আত্মারূপে কর্তাহরি
মনের নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।

লালন শাহ পরম আরাধ্য কাঙ্ক্ষিত স্রষ্টাকে কখনো কখনো মনের মানুষ, অচিন পাখী কিংবা অলক সাঁই অভিধায় অভিহিত করেছেন। 'হারামনি' নামক লোকসংগীত গ্রন্থের সংগ্রাহক মনসুরউদ্দিন বাউলদের মনের মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, "বাউলরা মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরিতেছে। মনকে ইহাতে পারিভাষিক শব্দে মগজ বলিয়া ধারণা করা যায়। মগজই আমাদের জীবনের নিয়ামক। মগজ যাহা ভালোবাসে তাহাই আমাদের প্রিয় ও ভালোবাসার ধন। বাউলদের ব্যবহারিক জীবনদর্শন আশ্চর্য। বাউলরা অধ্যাত্মবাদী, কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ দেহাত্মবাদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। জড়মানবদেহ তাহাদের প্রধান সাধন লক্ষণ ও অবলম্বন।" লালন শাহ দেহাত্মবাদের সাহায্যে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক গীতিকবিতায় অচিন পাখী ও খাঁচার প্রতীকে নিজস্ব ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

অচিন পাখি ও খাঁচার রূপক অর্থ : আধ্যাত্মিক রহস্যময় পুরুষ লালন শাহ রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারের সাহায্যে বাউল মতের সাধনাকে সুদূরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ গীতিকবিতায় তিনি মানুষের দেহকে খাঁচার সঙ্গে তুলনা করে দেহের নশ্বরতা বোঝাতে বলেছেন–

খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে।

অর্থাৎ কচি বাঁশের তৈরি বস্তু অপেক্ষাকৃত কম দিন টিকে। মানবাত্মারূপী কাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বিমূর্ত স্রষ্টাকে পাখিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমরা কোনোদিন আত্মাকে দেখতে পাইনি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে অচিন পাখি খাঁচার ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। সেখানে তিনি স্থায়ীরূপে অনন্তকাল বসতি স্থাপন করেন না। খাঁচা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অচিন পাখি আমাদের অগোচরে পালিয়ে যাবে। যেমন লালনের ভাষায়–

লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।

কবিতার ভাব : কবিতাটির বাহ্যিক অর্থ সহজ-সরল হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। এ গীতিকবিতায় বাউল সম্রাট লালন শাহ সমাজ-সংসার বিবর্জিত বাউলদের অধ্যাত্মবাদ সাধনার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করেছেন। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য বাউলরাও চর্যাকারদের মতো রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে তাদের দেহকেন্দ্রিক সাধনার সুরবার্তা শিষ্যদের জন্য রেখে যেতেন। অনেক গবেষক হয়তো এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত পণ্ডশ্রম হয়েছে কিনা তা বাউল সম্প্রদায়ই বলতে পারে।

সৃষ্টিজগতের মধ্যমণি স্রষ্টা বিমূর্ত নিরাকার। তাঁকে অনুভব করা যায় তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। সুফীবাদ কিংবা বৈষ্ণববাদের মতো বাউলরা বিশ্বাস করে, সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ। সৃষ্টিতে স্রষ্টা বিরাজমান। বাউল সম্রাট লালনের মতে, মানুষের দেহে আত্মারূপে স্রষ্টা বসবাস করে। অতএব নিজের দেহকে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা যায়।

যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন–

একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।

এ অচেনাকে এ গীতিকবিতায় কবি লালন শাহ অচিন পাখিরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ পাখির দেহরূপ খাঁচায় প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া অনুভব করেন, কিন্তু ধরতে পারেন না। তা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।

তবে লালন শাহ দেহের অভ্যন্তরে পাখির প্রবেশ, প্রস্থানের পথ এবং অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তাঁর মতে, দেহের আট কুঠুরি, নয় দরজা এবং অন্যান্য ঝলকা কাটার অবস্থান ও কার্যপ্রণালি এবং আমাদের কর্তব্য জানতে পারলে অচিন পাখিকে চেনা যাবে। শিশমহল সদর-কোঠায় উপবিষ্ট হয়ে আকাঙ্ক্ষিত আলোর ঝলকানি আমরা দেখতে পাব। কবির আক্ষেপ সাধারণ মানুষ খাঁচারূপী দেহের পরিচর্যা করে। তার সৌন্দর্য ও কল্যাণ নিয়ে চিন্তিত থাকে। আর মানুষের পরিচর্যাকৃত পরম প্রাণপ্রিয় দেহ একদিন কাঁচা বাঁশের ভঙ্গুর খাঁচার ন্যায় খসে পড়ে। অচিন পাখি সে মুহূর্তে পালিয়ে যায়। এ কারণে আলোকিত আরশিনগর পড়শির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে না।

উপসংহার : সাধক পুরুষ লালন শাহ তাঁর ছোট পরিসরের কবিতায় সহজ-সরল, প্রচলিত-পরিচিত উপমার আড়ালে বাউল সাধকদের জন্য সুর সাধনার সুধা ছড়িয়ে দিয়েছেন। দেহকেন্দ্রিক দুর্বোধ্য সাধনায় যারা সার্থক হবে তারা লালন শাহের অচিন পাখির সাক্ষাতের সুধা পান করতে পারবে। রূপক, প্রতীক, উপমা ও সহজ-সরল শব্দ ব্যবহারে কারুকার্য কবিতাটি হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

▸▸ প্রশ্ন : ৭ ॥ "লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতাটি একই সঙ্গে মরমি রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ"– উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০০৯, '১৫]
অথবা, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতার অন্তর্নিহিত মরমী ভাব ও কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যধারায় বাউল সঙ্গীত এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এক্ষেত্রে বাউল সম্রাট লালন শাহের অবদান অগ্রগণ্য। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' তাঁর একটি বিখ্যাত গীতিকবিতা। কবিতাটি অধ্যাত্মভাব, মরমি রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। অনাড়ম্বরপূর্ণ দেহকেন্দ্রিক ধর্মসাধনার অপূর্ব সুধাময় ব্যঞ্জনা লালিত্যপূর্ণ শব্দালঙ্কারে কবি তাঁর এ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা

বাউল সম্রাট লালন শাহ রচিত 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতাটি একই সাথে মরমি রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। নিচে এ উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হলো :

কবিতার মরমি রসব্যঞ্জনা

অচিন পাখি ও খাঁচার রূপক অর্থ : আধ্যাত্মিক রহস্যময় পুরুষ লালন শাহ রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারের সাহায্যে বাউল মতের সাধনাকে সুদূরে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এ গীতিকবিতায় তিনি মানুষের দেহকে খাঁচার সঙ্গে তুলনা করে দেহের নশ্বরতা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন–

খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে।

অর্থাৎ কাঁচা বাঁশের তৈরি বস্তু অপেক্ষাকৃত কমদিন টিকে। মানবাত্মারূপী কাঙ্ক্ষিত আরাধ্য বিমূর্ত স্রষ্টাকে কবি পাখিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমরা কোনোদিন আত্মাকে দেখতে পাইনি। শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে অচিন পাখি খাঁচার ভেতরে-বাইরে আসা-যাওয়া করে। সেখানে তিনি স্থায়ীরূপে অনন্তকাল বসতি স্থাপন করেন না। খাঁচা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অচিন পাখি আমাদের অগোচরে পালিয়ে যাবে। যেমন, লালনের ভাষায়–

লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।

কবিতার মরমি ভাব : ছোট কবিতাটির বাহ্যিক অর্থ সহজ-সরল হলেও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য আমাদের নিকট দুর্বোধ্য। এ গীতিকবিতায় বাউল সম্রাট লালন শাহ সমাজ-সংসারবিবর্জিত বাউলদের অধ্যাত্ম-সাধনার সুনির্দিষ্ট পরামর্শ প্রদান করেছেন। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে সেজন্য বাউলরাও চর্যাকারদের মতো রূপক ও প্রতীকের সাহায্যে তাদের দেহকেন্দ্রিক সাধনার সুরবার্তা শিষ্যদের জন্য রেখে যেতেন। অনেক গবেষক হয়তো এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত পণ্ডশ্রম হয়েছে কিনা তা বাউল সম্প্রদায়ই বলতে পারে।

সৃষ্টিজগতের মধ্যমণি স্রষ্টা বিমূর্ত নিরাকার। তাঁকে অনুভব করা যায় তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে, কিন্তু তাঁকে দেখা যায় না। সুফীবাদ কিংবা বৈষ্ণববাদের মতো বাউলরা বিশ্বাস করে সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ। সৃষ্টিতে স্রষ্টা বিরাজমান। বাউল সম্রাট লালনের মতে, মানুষের দেহে আত্মারূপে স্রষ্টা বসবাস করে। অতএব নিজের দেহকে চিনতে পারলে স্রষ্টাকে চেনা যায়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন–

একবার আপনারে চিনতে পারলে রে, যাবে অচেনারে চেনা।

এ অচেনাকে আলোচ্য গীতিকবিতায় কবি লালন শাহ অচিন পাখিরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ পাখির দেহরূপ খাঁচায় প্রতিনিয়ত আসা-যাওয়া অনুভব করেন, কিন্তু ধরতে পারেন না, তা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।

লালন শাহ দেহের অভ্যন্তরে পাখির প্রবেশ, প্রস্থানের পথ এবং অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছেন। তাঁর মতে, দেহের আট কুঠরি, নয় দরজা এবং অন্যান্য ঝলকা কাটার অবস্থান ও কার্যপ্রণালি এবং আমাদের কর্তব্য জানতে পারলে অচিন পাখিকে চেনা যাবে। শিশমহল সদর-কোঠায় উপবিষ্ট হয়ে আকাঙ্ক্ষিত আলোর ঝলকানি আমরা দেখতে পাব। কবির আক্ষেপ, সাধারণ মানুষ খাঁচারূপী দেহের পরিচর্যা করে। তার সৌন্দর্য ও কল্যাণ নিয়ে চিন্তিত থাকে। আর মানুষের পরিচর্যাকৃত পরম প্রাণপ্রিয় দেহ একদিন কাঁচা বাঁশের ভঙ্গুর খাঁচার ন্যায় খসে পড়ে। অচিন পাখি সে মুহূর্তে পালিয়ে যায়। এ কারণে আলোকিত আরশিনগর পড়শির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে না।

কবিতার শিল্পগুণ

লালনের মানসচেতনার প্রকাশ : লালন শাহ ধর্মের প্রচলিত সীমানায় নিজেকে আটকে রাখেননি। ধর্মের বেশভূষা, আচার-আচরণ কোনোটাতেই তাঁর বিশ্বাস ছিল না। বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিকতা, হিন্দুধর্মের শক্তি এবং লোকজ লেংটা ফকিরী মতবাদে প্রভাবিত হয়ে তিনি বাউল সাধনায় ব্রত হয়েছেন। কিন্তু লালন শাহের মতে, আনুষ্ঠানিকভাবে তীর্থস্থানে ভ্রমণের মাধ্যমে পরমাত্মা তথা স্রষ্টার সন্ধান করতে যাওয়ার দরকার নেই। পরমাত্মা আত্মারূপে

মানুষের হৃদয়েই অবস্থান করেন। তাই তিনি এই পরম আরাধ্য স্রষ্টাকে কখনো মনের মানুষ, অচিন পাখি, অলক সাঁইসহ নানা অভিধায় অভিহিত করেছেন। 'খাচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতায় তাঁর ধর্ম ও মানসচেতনা শিল্পগুণে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী/ কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন বেড়ী/ দিতাম তাহার পায়।।

ছন্দব্যঞ্জনা : আমরা জানি, 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' একটি গীতিকবিতা। পয়ার ছন্দের বন্ধনে কবি এ কবিতাটি রচনা করেছেন। সুসমন্বিত অন্ত্যমিল কবিতাটিকে নিঃসন্দেহে শিল্পমণ্ডিত করেছে। যেমন, কবিতার দ্বিতীয় কলিতে– দরজা আঁটা, ঝলকা কাটা ও সদর কোঠা এবং তৃতীয় কলিতে খাঁচার আশে, কাঁচা বাঁশে ও পড়বে খসে পঙ্ক্তির মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ চমৎকার অন্ত্যমিল পরিলক্ষিত হয়।

সঙ্গীতধর্মিতা : গীতিকবিতায় কবির আবেগ-অনুভূতি এক ধরনের সুর-মূর্ছনায় উদ্বেলিত ও অনুরণিত হয়। ভাবাবেগ, শব্দ ও ছন্দ এবং সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করে। 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতার ছন্দের মধ্যেও তেমনি সুরধ্বনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। কবিমনের আবেগ-অনুভূতি, বাউলপ্রাণের ভাবসুর এবং পরমাত্মার সান্নিধ্যপিয়াসী হৃদয়ের আকুলতা হৃদয়লোকে এক অনির্বচনীয় সঙ্গীত সুধার নির্ঝরিণী শত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে লালন শাহের এ গীতিকবিতায়।

শব্দালঙ্কার : অলঙ্কারপূর্ণ শব্দ চয়নের মাধ্যমে 'খাচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতার শিল্পগুণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অচিন পাখী, মন-বেড়ী, আট কুঠরী নয় দরজা আঁটা, সদর কোঠা, আয়না মহল, খাঁচার আশে, কাঁচা বাঁশে প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগে এটি একটি সার্থক গীতিকবিতার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

উপসংহার : সাধক পুরুষ লালন শাহ তাঁর ছোট পরিসরের কবিতায় সহজ-সরল প্রচলিত পরিচিত উপমার আড়ালে বাউল সাধকদের জন্য সুর সাধনার সুধা ছড়িয়ে দিয়েছেন। দেহকেন্দ্রিক দুর্বোধ্য সাধনায় যারা সার্থক হবে তারা লালন শাহের অচিন পাখির সাক্ষাতের সুধা পান করতে পারবে। রূপক, প্রতীক, উপমা ও সহজ-সরল শব্দ ব্যবহারে কারুকার্য কবিতাটি শিল্পরসসমৃদ্ধ ও হৃদয়স্পর্শী হয়েছে।

▸▸ প্রশ্ন : ৮ ॥ লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতা অবলম্বনে বাউলদের ধর্মবোধের পরিচয় দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতায় বাউল সম্রাট লালন শাহ অনানুষ্ঠানিক ও অনাড়ম্বরপূর্ণ দেহকেন্দ্রিক ধর্ম সাধনার অপূর্ব সুধাময় ব্যঞ্জনা চিরপরিচিত সহজ-সরল উপমার সাহায্যে উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম পালনের রীতির বিরুদ্ধে গিয়ে লালন শাহ নিজের দেহকেন্দ্রিক সাধনার মাধ্যমে স্রষ্টার সন্ধানে নিমগ্ন হয়েছেন।

বাউল ধর্মমত এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রভাব : 'বাউল' শব্দটির উৎপত্তি ও শাব্দিক অর্থ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কারো মতে, বাউল শব্দটি 'বাউর' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ বাউণ্ডুলে অথবা পাগল। এর অন্য অর্থ হচ্ছে সহজ-সরল ব্যক্তি। বাউল শব্দটির আরেকটি দ্যোতনা বায়ু শব্দ সংলগ্ন, যোগসাধনার ইঙ্গিতবহ। বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব বাউল মতবাদের ওপর রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের তান্ত্রিক, হিন্দু ধর্মের শক্তি ও ফকিরী মতবাদ বাউল মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। হিন্দুদের শক্তি ও মুসলমানদের তাসাউফ কিংবা সুফী মত দ্বারা প্রভাবিত হলেও বাউলরা এর মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি। সাংসারিক জীবন সম্পর্কে

উদাসীন বাউলরা জাতি-ধর্মের বাইরে এসে সংগীতমুখর দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা অমর স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে মুক্তি পেতে চায়।

লালনের অচিন পাখী : বৈষ্ণবদের মতো বাউলরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাতত্ত্বে বিশ্বাসী। তবে বাউল সম্রাট লালনের বিশ্বাস, পরমাত্মা তার সৃষ্ট জীবাত্মায় বসবাস করেন। দেহকেন্দ্রিক নির্দিষ্ট সাধনায় তার সন্ধান পাওয়া সহজ। কেউ কেউ বলেছেন, লালন শাহ পরমাত্মার অংশে মানবাত্মাকে অচিন পাখির সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।

লালন শাহ 'অচিন পাখী' নামক মনের মানুষের সন্ধানে সারাজীবন সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। কবি লালন একে 'মনের মানুষ', 'অলক সাঁই', 'অচিন পাখী' ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত করেছেন। লালন শাহ সাধন পদ্ধতিকে গানের মাধ্যমে শিষ্য পরম্পরায় পৌঁছে দিতে প্রেরণা পেয়েছেন।

লালন শাহের ধর্মবোধ : বাংলাদেশের বাউল সম্রাট লালন শাহ অচিন পাখির ফাঁকিঝুঁকি বোঝার চেষ্টা করেছেন। এই অচিন পাখিকে কোথাও কোথাও তিনি মনের মানুষ বলেও অভিহিত করেছেন। যেমন তাঁর অন্য একটি গানে আছে–

আত্মারূপে কর্তা হরি
মনের নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি ঠিকানা।
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা।

পুরাণ, কুরআন, বেদবেদান্ত অনুসরণ করে নয়, নিজস্ব সাধনপদ্ধতি অনুসরণে মনের মানুষের ঠিকানা মিলবে। মুহাম্মদ মনসুরউদ্দিন তার 'হারামনি' নামক লোক সংগীত সংগ্রহ গ্রন্থের ভূমিকায় বাউলদের মনের মানুষ সম্পর্কে বলেছেন, বাউলরা মনের মানুষের সন্ধানে ঘুরিতেছে, ইহাতে মনকে পারিভাষিক শব্দে মগজ বলিয়া ধারণা করা যায়। মগজই আমাদের জীবনের নিয়ামক। মগজ যাহা ভালোবাসে তাহাই আমাদের প্রিয় ও ভালোবাসার ধন। বাউলদের ব্যবহারিক জীবনদর্শন আর্শ্চয। বাউলরা অধ্যাত্মবাদী, কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদ দেহাত্মবাদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। জড় মানবদেহ তাহাদের প্রধান সাধন লক্ষণ ও অবলম্বন। তাই লালন শাহ দেহকে খাঁচার সাথে তুলনা করে তার ভেতরে লুক্কায়িত 'অচিন পাখী'রূপ অধরাকে ধরতে চেয়েছেন। আদরমিশ্রিত আক্ষেপে অধরাকে বন্দি করার আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এভাবে–

ধরতে পারলে মন বেড়ী
দিতাম তাহার পায়।।

কবি আধ্যাত্মিক দেহসাধনার চক্রে সাধন সামগ্রী দেহকে জটিল ধাঁধার আবর্তনে বিভক্ত করেছেন। কবির মতে, দেহের আট কুঠরী এবং নয়টি দরজা ও অন্যান্য ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করতে পারলে অচিন পাখির দেখা পাওয়া সম্ভব। এই দেহকেন্দ্রিক সাধনার মর্মকথা বুঝতে পারি না বলে আমরা নশ্বর দেহের সৌন্দর্য চর্চায় ব্যস্ত থাকি, কিন্তু বাঁশের খাঁচার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী দেহ একদিন ভেঙে পড়বে। কবি বলেন–

মন, তুই রইলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে।

কবি লালনের মতে, নিজেকে এবং নিজের দেহকে চিনতে পারলে পরম শক্তিমান, দুর্জ্ঞেয়, অচেনা স্রষ্টাকে চেনা যায়। সংগীত সাধক, আধ্যাত্মিক কবি-পুরুষ অন্য একটি গানে এ

বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে–

একবার আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।

কলবের স্বচ্ছ সুন্দর স্পষ্ট প্রতীয়মান আরশি নগরের পড়শিরূপে অচিন পাখি বাস করে। তা প্রকাশ করেছেন এভাবে–

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
(সেথা) এক পড়শী বসত করে।।

এই পড়শি হচ্ছে লালন শাহের পরম কাঙ্ক্ষিত অচিন পাখি।

উপসংহার : কবি লালন শাহ তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক কবিতায় বাউল সাধনার দেহকেন্দ্রিক মোক্ষলাভের উপায়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন অপূর্ব লৌকিক ও পরিচিত ব্যঞ্জনাময় উপমার সাহায্যে। আধ্যাত্মিক রহস্যময় বাউল লালন শাহ তাঁর এই কবিতায় সাধককে সুপরামর্শ দিয়েছেন, যা হয়তো আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের নিকট বোধগম্য নয়। অল্প কথায়, সহজ উপমায় এর চেয়ে গূঢ়ার্থ অধ্যাত্মবাদের কথা রূপকের সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

➤ প্রশ্ন : ৯ ॥ লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক গীতিকবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

অথবা, "খাঁচার ভিতর অচিন পাখি/কেমনে আসে যায়" –এই উদ্ধৃতির আলোকে কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

অথবা, রূপক কবিতা হিসেবে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক কবিতায় জাত-ধর্ম বিভেদ ও হিংসায় বীতশ্রদ্ধ অসাম্প্রদায়িক রসময় পুরুষ, আধ্যাত্মিক সাধক বাউল লালন শাহ, ভক্তিরসে তৃপ্ত অনাড়ম্বরপূর্ণ দেহকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক সাধনার একটি সহজ-সরল ও স্বতন্ত্র রূপ অপূর্ব সুধাময় ব্যঞ্জনায়, পরিচিত রূপক ও প্রতীকে অলঙ্কৃত করে বর্ণনা করেছেন। নিচে আলোচ্য গীতিকবিতার নামকরণের সার্থকতা উপস্থাপন করা হলো :

সাহিত্যে নামকরণের রীতিনীতি : বলা হয়– 'Literature is the mirror of life.' অর্থাৎ, সাহিত্য জীবনের দর্পণ। আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই সাহিত্যকর্মের মূল ভাববস্তু ফুটে ওঠে। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক Cavendis বলেন, 'A beautiful name is better than a lot of wealth.' অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম।

সাহিত্যিকগণ সাধারণত কল্পনাবিলাসী হয়ে থাকেন। তাঁরা কল্পনার সমুদ্রে অবাধ সন্তরণ করেন। তাই বলে তাঁরা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির উর্ধ্বে নন। রচনার সাথে ন্যূনতম সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সাহিত্যের নামকরণ সার্থক হয় না। সুতরাং একটি শিল্পকর্ম সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি যথাযথ অনুকরণ ও অনুসরণ একান্ত অপরিহার্য।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে লেখককে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। সেগুলো হলো–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- স্থান বা কাল
- নায়ক-নায়িকার নাম
- রচনার মূলভাব।

তবে কবিতার নামকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল ভাব বা বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই হয়। নিচে 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করা হলো :

রূপকের সাহায্যে আলোচ্য গীতিকবিতার নামকরণ : স্রষ্টার সান্নিধ্যের সুধা পেতে ব্যাকুল বাউলরা জীবনবিমুখ, সংসারবিরাগী হয়ে দলবদ্ধভাবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় দেহকেন্দ্রিক সাধনা করতো। বাউলরা মনে করে সৃষ্টিমাত্র স্রষ্টার অংশ। স্রষ্টা সৃষ্টিকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে না। আবার স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির জীবনের কোনো মূল্য নেই। তারা মনে করে, সকল সৃষ্টিতেই স্রষ্টা বিদ্যমান। মানুষের দেহেও শক্তিমান, নিরাকার স্রষ্টা বসবাস করে। এজন্য লালন শাহ অন্যত্র বলেছেন–

আপনারে চিনতে পারলে রে যাবে অচেনারে চেনা।

অর্থাৎ আমাদের দেহে যেহেতু স্রষ্টার বসবাস, তাই দেহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পাওয়া যায়।

এ কবিতায় কবি স্রষ্টাকে অচিন পাখি বলেছেন এভাবে–

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি
কেমনে আসে যায়।

আমাদের দেহরূপ খাঁচায় অচিন পাখিরূপ স্রষ্টা প্রতিনিয়ত যাতায়াত করছে। তাঁকে আমরা কোনোদিন দেখতে পাই না, চিনতে পারি না কিংবা বুঝতেও পারি না তার উপস্থিতি। এজন্য তিনি আমাদের নিকট অচেনা পাখি। কবি অচিন পাখি বলেছেন, সেহেতু পাখির বাসস্থান দেহের খাঁচার সাথে তুলনা করা বাঞ্ছনীয়। এই পাখি আকাশের মুক্ত বিহঙ্গ নয়, তার সৃষ্টির মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ। অতএব এ পাখিকে খাঁচার পাখির সাথে তুলনা করাই সঠিক। দেহের নশ্বরতা বোঝানোর জন্য খাঁচাকে ভঙ্গুর কাঁচা বাঁশের সাথে তুলনা করেছেন। দেহের মধ্যে স্রষ্টার অবস্থান চিহ্নিত করতে সাধনার জটিল ধাঁধায় ভাবুকদের অধ্যাত্মচেতনায় মোহাবিষ্ট করেছেন এভাবে–

আট কুঠরী নয়-দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা
তার উপর আছে সদর-কোঠা
আয়না-মহল তায়।

দেহের আট কুঠরি, নয় দরজাসহ অন্যান্য প্রবেশ, প্রস্থান ও অবস্থান যেখানে অচিন পাখি যাতায়াত করে, অথবা কলবের অলৌকিক আলোর মধ্যমণির সদর কোঠার শিশমহল সর্ম্পকে জানতে পারলে অচিন পাখিকে চেনা যেতে পারে। নির্দিষ্ট, নির্ধারিত, স্বতন্ত্র ও আধ্যাত্মিক দেহকেন্দ্রিক সাধনা বোঝানোর এমন উপমাকে রূপকের রঙে রঞ্জিত করা সমীচীন হয়েছে।

নামকরণের সার্থকতা : কবি 'অচিন পাখী' নামক অধরা স্রষ্টাকে দেহের অভ্যন্তরে চিহ্নিত করতে দেহকে খাঁচার সাথে তুলনা করেছেন। অচিন স্রষ্টা যে মানুষের দেহে বাস করে একথা বোঝাতে এ গীতিকবিতার নাম 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' সার্থক হয়েছে। বাউল সম্রাট তাঁর সুর সাধনাকে কেন্দ্র করে শিষ্যদের সুপরামর্শ দান করেছেন, দেহরূপ ভঙ্গুর খাঁচায় যাতায়াতরত অচিন পাখিকে ধরতে হলে দেহকেন্দ্রিক সাধনার বিকল্প নেই। সুতরাং সুনির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্য সামনে রেখে কবি লালন শাহ এমন রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন। সহজ-সরল ভাষা, প্রচলিত উপমার রূপকের ব্যঞ্জনায় এ গীতিকবিতাটির নামকরণ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। রূপকের আড়ালে নিহিত দেহকেন্দ্রিক সাধনার গূঢ়ার্থ বোঝানোর অন্য নামকরণের সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

উপসংহার : দেহাত্মবাদের সাধনার তত্ত্ব তথ্য প্রকাশের জন্য কবিতার 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামকরণ যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ, সুন্দর ও পরিপাটি হয়েছে।

বঙ্গভাষা

মাইকেল মধুসূধন দত্ত [১৮২৪–১৮৭৩ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ১০ ॥ 'বঙ্গভাষা' কবিতার ভাববস্তু নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, 'বঙ্গভাষা' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

অথবা, 'বঙ্গভাষা' কবিতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চতুর্দশপদী কবিতা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রধান স্থপতি। বিশেষত কাব্য ও নাটক রচনায় তিনি অবিসংবাদিত। উভয়ক্ষেত্রেই নতুন নতুন ধারা সৃষ্টি করে তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'বঙ্গভাষা' তাঁর একটি বিখ্যাত সনেট কবিতা। এ কবিতায় তিনি আত্মোপলব্ধি ও ব্যর্থতার সুনিপুণ ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন নির্মোহ ভাষায়।

কবিতার ভাববস্তু/ মূল বক্তব্য

কবিজীবনের প্রাথমিক ভাবনা : ব্যক্তিজীবনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত খুবই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্য ও আধুনিক ইউরোপের প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই জীবনের প্রথম প্রভাতেই চেয়েছিলেন ঔপনিবেশিক ভারতের রাজশক্তিতে আসীন ইংরেজদের ভাষা ইংরেজিতে সাহিত্য সাধনা করে খ্যাতি অর্জন করবেন। এমনকি তিনি ইংরেজিতে সাহিত্য সাধনার নিমিত্ত ধর্মান্তরিতও হয়েছিলেন। এ বাসনা পূরণের জন্য তিনি নিরলস সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং এ সাধনার প্রথম ফসল 'ক্যাপটিভ লেডি' নামক ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য সমালোচকদের নিকট এটি সার্থক রচনা বলে গৃহীত হয়নি। কবি যতটা আশা নিয়ে ইংরেজি সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন ঠিক ততটাই আশাহত হন। ফলে তার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়।

মাতৃভাষার প্রতি মমত্ববোধ : মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মা, মাতৃভূমি আর মাতৃভাষা– এসবই পরম প্রশান্তির আশ্রয়। কিন্তু কবি মধুসূদন দত্ত যখন ইংরেজি ভাষা সাধনা করছিলেন তখন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিল তাঁর সীমাহীন উদাসীনতা ও অবজ্ঞা। পরবর্তীতে ইংরেজিতে যশ-খ্যাতি অর্জন করতে না পারায় তিনি আবার বাংলা ভাষার প্রতি নিবেদিত হন এবং বাংলা সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে ধিক্কার দেন এভাবে–

তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

মাতৃভাষা সম্পর্কে মহান ধারণা : কবি বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য সাধনার একপর্যায়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হন তখন থেকে তিনি মাতৃভাষার প্রতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতে থাকেন। আলোচ্য কবিতাটি সে ধারণারই সফল কাব্যরূপ। এতে তিনি বলেছেন, মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ভান্ডার বহুবিধ মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ, যা অন্য কোনো ভাষায় নেই। মহামূল্যবান হীরার সাথে তুলনীয় মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে বিদেশি ভাষার কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করেছেন বলে তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।

কবির কর্ম সম্পর্কে ধারণা : বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য সাধনা করে কবি যশ-খ্যাতি লাভের মোহে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে যে শ্রম দিয়েছেন, তা সবই বৃথা হয়ে গেছে। একপর্যায়ে তিনি তাঁর নিজের ভুল বুঝতে পারেন। অন্ধমোহে পড়ে তাঁকে কত দিবস রজনী মানসিক কষ্টে অস্বস্তিতে কাটাতে হয়েছে তার অন্ত নেই। তিনি জীবনের মোহগ্রস্ত সময়কে পণ্ডশ্রম বলে অভিহিত করে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যকে শ্যাওলার সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়–

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

মধুসূদন দত্তের দেশাত্মবোধ : 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশাত্মবোধের গভীর প্রকাশ ঘটেছে। কবি বিদেশ বিভূঁইয়ে গেলেও এক মুহূর্তের জন্য নিজের দেশকে ভুলতে পারেননি। আর তাই স্বপ্নে তিনি বিবেকরূপী কুললক্ষ্মী দ্বারা ঘরে ফেরার আদেশপ্রাপ্ত হন। কবির ভাষায়–

স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,–
"ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"

আত্মবিশ্লেষণ : ইংরেজি ভাষায় কাব্যচর্চা করে খ্যাতিলাভ করা আর ইংরেজ হওয়ার স্বপ্নে ইউরোপ গমন করেন কবি মধুসূদন দত্ত। একপর্যায়ে তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন, পোশাক পরিবর্তন করা গেলেও আপন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করা যায় না। তিনি বুঝলেন, মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের জন্য সুখকর ও পরম তৃপ্তির বস্তু। তাই কবি কুললক্ষ্মীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্বীকার করেন, তাঁর মাতৃভাষার ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ, হীরক খনি তুল্য। খনিতে যেমন বিচিত্র রতন আর মণিমাণিক্য থাকে, বাংলা ভাষার ভাণ্ডারেও তা রয়েছে। তাই তিনি সকল মোহ ত্যাগ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অবিচল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, মানুষের অস্থিমজ্জায় যে মাতৃভাষার ছোঁয়া, তা উপেক্ষা করে কখনো সফলকাম হওয়া যায় না।

উপসংহার : 'বঙ্গভাষা' কবির ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার নান্দনিক প্রকাশ। পরদেশ, পরভাষার মালিন্য ও মাতৃভাষার ঐশ্বর্যকে তিনি ভাব, ভাষা ও ছন্দের দোলায় উচ্ছ্বসিতরূপে প্রকাশ করেছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ১১ ॥ সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির সার্থকতা বিচার কর।

অথবা, সনেট কাকে বলে? সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা আলোচনা কর।

অথবা, চতুর্দশপদী কবিতা কাকে বলে? চতুর্দশপদী কবিতার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে দেখাও, 'বঙ্গভাষা' একটি সার্থক চতুর্দশপদী কবিতা।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। বিশেষত কাব্য ও নাটক রচনায় তিনি ছিলেন অবিসংবাদিত। তাঁর প্রতিভা আজও আমাদের বিস্মিত করে। চতুর্দশপদী কবিতা চর্চা করে তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে নতুন দিগন্তের সূচনা করেছেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। 'বঙ্গভাষা' তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা।

সনেটের অর্থ : ইতালীয় 'সনেটো' (Sonnetto) শব্দ থেকে 'সনেট' শব্দের উৎপত্তি। 'সনেটো' শব্দের অর্থ গতিস্পন্দিত মৃদু ধ্বনি। সনেটের বাংলা অর্থ– চতুর্দশপদী বা চৌদ্দ চরণবিশিষ্ট এক বিশেষ ধরনের কবিতা।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : কবিহৃদয়ের একটি অখণ্ড ভাব বা অনুভূতি যখন চৌদ্দ অক্ষর সমন্বিত চৌদ্দ চরণ দ্বারা বাণীমূর্তি লাভ করে, তখন তাকে সনেট বলে। বাংলায় একে বলা হয় চতুর্দশপদী কবিতা।

সনেটের প্রবর্তন : ইতালির কবি পেত্রার্ক (Petrarch-1304–74) সর্বপ্রথম সনেটের সূচনা করেন। ষোড়শ শতকে Wyatt এবং Surry সর্বপ্রথম ইংরেজিতে সনেট রচনা করেন। পরবর্তীতে তার অনুসরণে দান্তে, ট্যাসো, আরো পরে সিডনি, শেকসপিয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, ব্রাউনিং প্রমুখ ইংরেজ কবি সফলতার সাথে সনেট রচনা করেন।

সনেটের গঠনকৌশল : একটিমাত্র অখণ্ড ভাব-কল্পনা বা অনুভূতি-কণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত ১৪ পঙ্‌ক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার রূপ পরিগ্রহ করে। সনেট হলো সেই কাব্যরীতি যার পঙ্‌ক্তি বা চরণসংখ্যা ১৪ এবং প্রতি পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যাও ১৪। কবিতাটির দুটি পর্ব বা ভাগ থাকবে। প্রথম পর্ব ৮ পঙ্‌ক্তির এবং দ্বিতীয় পর্ব ৬ পঙ্‌ক্তির। প্রথম ৮ পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় অষ্টক (Octave), আর দ্বিতীয় পর্বের ৬ পঙ্‌ক্তিকে বলা হয় ষটক (Sestet)। অষ্টকে কবিতার মূল বক্তব্যের উপস্থাপন এবং ষটক পর্বে অষ্টকেরই চূড়ান্ত বিশ্লেষণ বা পরিণতি নির্ধারিত হয়। চরণশেষের অন্ত্যমিল পেত্রার্কীয় ও শেকসপিয়রীয় রীতিতে ভিন্নতর।
আলোচ্য 'বঙ্গভাষা' কবিতার মিল-বিন্যাস নিম্নরূপ–

অষ্টক (Octave)	ষটক (Sestet)
কখ	গঘ
কখ	ঘগ
খক	ঙঙ
খক	ঙঙ

সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতার বৈশিষ্ট্য : 'বঙ্গভাষা' মধুসূদন দত্তের একটি বিখ্যাত সনেট কবিতা। সনেট হিসেবে এ কবিতার কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–

ক. সনেটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ কবিতায় একটি অখণ্ড ভাবের অবতারণা করা হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধ।

খ. সনেটের রীতি অনুযায়ী এ কবিতায় চৌদ্দটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে এবং প্রতি পঙ্‌ক্তির মাত্রাসংখ্যা চৌদ্দ। কবিতার প্রথম আট চরণে ভাবের প্রবর্তন এবং শেষ ছয় চরণে রয়েছে ভাবের পরিণতি।

গ. ছন্দের দিক থেকে 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অনিয়মিত ধরনের। তবে সমগ্র কবিতায় এর অখণ্ড ভাব নান্দনিক সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে।

'বঙ্গভাষা' কবিতায় ছন্দের ব্যাপারে অষ্টক ও ষটকের রীতি এক নয়। এদের আলাদা মিল-বিন্যাস চোখে পড়ে। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে কবিতাটির অষ্টক ও ষটকের পার্থক্য ধরা পড়ে।

সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতার সার্থকতা : 'বঙ্গভাষা' শুধু বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেটই নয়; বরং এটি বাংলা সাহিত্যের সেরা সনেটগুলোরও একটি। এর ভাব যেমন মার্জিত, পরিশীলিত ও সুসংহত, তেমনি এর শিল্পরূপও উঁচুমানের। এ কবিতায় কবির

ব্যক্তিজীবনের গভীর ভাব প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত বিদেশি ভাষা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কবি যখন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি নিবেদিত হন, সে অনুভূতি এতে বাণীরূপ লাভ করেছে।

সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় রয়েছে চৌদ্দটি পঙ্ক্তি। প্রতি পঙ্ক্তিতে রয়েছে চৌদ্দ মাত্রা। প্রতি চরণে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৮ এবং দ্বিতীয় পর্বে ৬। কবিতায় অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে অনিয়মিত রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি চরণ শেকসপিয়রীয় রীতিতে রচিত। পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ অনিয়মিত শেকসপিয়রীয় ঢঙের, নবম থেকে দ্বাদশ চরণে পেত্রার্কীয় ঢং লক্ষ করা যায়।

'বঙ্গভাষা' কবিতায় পরিমিত পরিসরে কবি একটি ভাবের অখণ্ড ব্যঞ্জনা দান করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই বলা যায়, বৈশিষ্ট্য বিচারে 'বঙ্গভাষা' একটি সার্থক সনেট কবিতা।

উপসংহার : 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের অসাধারণ কাব্য প্রতিভারই জ্বলন্ত প্রমাণ। ছন্দ, ভাষাশৈলী ও গঠনের বিচারে সত্যিই 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি একটি অসাধারণ কবিতা। এ কবিতার আবেদন চিরদিন অম্লান থাকবে।

▸▸ প্রশ্ন : ১২ ॥ 'বঙ্গভাষা' কবিতা অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দাও। [ফা. প. ২০১৬, '১৮]

অথবা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতা অবলম্বনে কবির স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দাও। [ফা. প. ২০০৯]

অথবা, মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতা অবলম্বনে কবির মাতৃভাষা ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দাও। [ফা. প. ২০১৪]

অথবা, 'বঙ্গভাষা' কী জাতীয় কবিতা? এ কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্য জগতের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভার নাম। গভীর স্বদেশপ্রেমে আপ্লুত হয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উনিশ শতকে বাঙালির সমাজজীবনে চিন্তার ক্ষেত্রে যেমন বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তেমনি বাংলা কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও ঘটিয়েছিলেন অভূতপূর্ব পরিবর্তন। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি মাইকেলের চিরন্তন স্বদেশপ্রীতির সার্থক শিল্পরূপ।

'বঙ্গভাষা' কবিতার ধরন : 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটধর্মী দেশপ্রেমমূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি অভিনব ছন্দ, ভাষা ও আবেগের উচ্ছ্বাসে মাতৃভাষার জয়গান গেয়েছেন। সনেট হিসেবে 'বঙ্গভাষা' কবিতায় রয়েছে ১৪টি পঙ্ক্তি, প্রতি পঙ্ক্তিতে রয়েছে ১৪টি মাত্রা, প্রতি চরণে রয়েছে দুটি পর্ব। প্রথম পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৮ এবং দ্বিতীয় পর্বে মাত্রাসংখ্যা ৬। কবিতার অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে অনিয়মিত রীতি লক্ষ করা যায়। কবিতার প্রথম চারটি ও শেষ দুটি চরণ শেকসপিয়রীয় রীতিতে রচিত। পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ অনিয়মিত শেকসপিয়রীয় ঢঙের, নবম থেকে দ্বাদশ চরণে পেত্রার্কীয় ঢং লক্ষ করা যায়। তাই বলা যায়, 'বঙ্গভাষা' একটি সার্থক সনেট।

কবির স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ

মধুসূদনের প্রথম জীবনের বাসনা : কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত যৌবনের উন্মেষকালে উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতের রাজশক্তি ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করে খ্যাতিলাভ করবেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একপর্যায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু অবশেষে তাঁর আশার গুড়ে বালি পড়ে।

'বঙ্গভাষা' কবিতার প্রেক্ষিত : খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কবি পাশ্চাত্য সাহিত্য সংস্কৃতির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা ছেড়ে মদ্রাজে গমন করেন। সেখানে নিজেকে ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তিনি ইংরেজি কবিতা লিখতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশিত হলে তা সমালোচকদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এরপর কবি মাদ্রাজ ছেড়ে সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে পাড়ি জমান, কিন্তু সেখানেও চরম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। ক্রমেই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রয়োজন অনুভব করেন। তারপর বাংলা ভাষায় কবিতা রচনা শুরু করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ : কবি আপন ভুল বুঝতে পেরে আবার মাতৃভাষা বাংলার কাছে ফিরে আসেন। ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি সংস্কৃতির প্রতি মোহগ্রস্ত মনোবৃত্তিকে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি তাঁর মোহগ্রস্ত জীবনের প্রচেষ্টাকে পণ্ডশ্রম হিসেবে আখ্যায়িত করে মাতৃভাষাকে পদ্মকাননের সাথে আর বিদেশি ভাষাকে শ্যাওলার সাথে তুলনা করেন। যেমন কবির ভাষায়–

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

কবির দুর্দশামোচন : মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মা আর মাতৃভাষা। সুদূর প্রবাসে বসে কবি দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত দুঃসময়ে মাতৃভূমি আর হারানো মাতৃভাষার মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশেষে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে এ দৈন্যদশা থেকে মুক্তিলাভ করেন। কবির ভাষায়–

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!

কবির স্বদেশপ্রেম : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশাত্মবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিদেশ ও বিদেশি ভাষার প্রতি প্রচণ্ড মোহ ভেঙে গেলে তিনি দেশের প্রতি আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। তিনি প্রবাস জীবনকে ভিক্ষাবৃত্তির জীবনের সাথে তুলনা করেছেন। জীবনের এ পর্যায়ের চিত্র অঙ্কন করে কবি বলেন–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর–ধন–লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

উপসংহার : বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির মোহ কবির দেশাত্মবোধ চাপা দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু সত্যিকারের আন্তরিকতা, ভালোবাসা কখনো চাপা থাকে না। একসময় কবির বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মোহভঙ্গ ঘটে এবং তিনি স্বদেশ, স্বদেশি ভাষা ও সাহিত্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। কবির স্বদেশপ্রীতির বাণীময় রূপ 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি বিশ্ব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

▸▸ প্রশ্ন : ১৩ ॥ 'বঙ্গভাষা' কবিতায় মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষার প্রতি যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। কাব্য ও নাটক রচনায় কৃতিত্বের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন

লাভ করেছেন। বহুভাষাবিদ এ খ্যাতিমান কবি যৌবনের উন্মেষকাল থেকেই উচ্চাভিলাষী ছিলেন। এ উচ্চাভিলাষই তাঁকে বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রবল মোহগ্রস্ত করে তোলে। বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির এ মোহ যে চরম বিভ্রান্তিকর ছিল, পরবর্তীতে তা তিনি হাড়ে হাড়ে অনুভব করতে থাকেন। বাংলা ভাষার কোলে ফিরে এসে বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার জনক। 'বঙ্গভাষা' তাঁর রচিত বিখ্যাত সনেট। এতে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি কবির প্রগাঢ় মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে।

কবির উচ্চাকাঙ্ক্ষা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত যৌবনে উচ্চাভিলাষী ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া পরাধীন ভারতবর্ষে ঐশ্বর্যশালী ইংরেজ শাসকের রাজভাষা, সংস্কৃতি আর জীবনধারা মধুসূদন দত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ইংরেজি সাহিত্যে প্রতিষ্ঠালাভ ও ইউরোপ গমনের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল, ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে ইংরেজ কবিদের আসরে জায়গা করে নেবেন। তাই তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, কিন্তু তাঁর সে আশা সফল হয়নি। তাই কবি খেদোক্তি করেছেন–

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন।

'বঙ্গভাষা' কবিতা রচনার প্রেক্ষিত : স্বধর্মের প্রতি বিদ্বেষবশত কবি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। একসময় তিনি কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ গমন করেন এবং সেখানে ইউরোপীয় সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে খ্যাতিলাভের আশায় ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং 'ক্যাপটিভ লেডি' নামে ইংরেজি ভাষায় তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্য সমালোচকদের কাছে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। মাদ্রাজে তিনি ইংরেজি ভাষার কবি সাহিত্যিকদের আসরে আসন করে নেওয়ার যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, পূর্ণতার পথে প্রভূত অন্তরায় দেখে তিনি তা থেকে বিরত হন এবং মাদ্রাজ ছেড়ে সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে গমন করেন। কিন্তু সেখানে গিয়েও জীবন–জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। একপর্যায়ে তিনি স্বদেশ ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ অনুভব করে বাংলা ভাষায় কাব্য সাধনা শুরু করেন। তাঁর এ সাধনার প্রথম ফসল 'বঙ্গভাষা' কবিতা।

স্বদেশের প্রতি কবির অনুরাগ : বিদেশ বিভুঁইয়ে অবস্থান করেও এক মুহূর্তের জন্য কবি তাঁর স্বদেশকে ভুলতে পারেননি। দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহের সৃষ্টি। তিনি 'বঙ্গভাষা' কবিতায় প্রবাস জীবনকে ভিক্ষাবৃত্তির জীবনের সাথে তুল া করেছেন। জীবনের এ পর্যায়ে কবি বলেন–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন-লোভে-মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কবির বোধোদয় : প্রবাসে কবি অনুধাবন করতে পারলেন, মাতৃভাষায় মানুষের হৃদয়াবেগ যত সহজে প্রকাশ পায়, অন্য কোনো ভাষায় তত সহজে সেটা সম্ভব নয়। এই বোধোদয় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কবি অনুভব করলেন, বঙ্গজননী তাঁকে স্বপ্নে আহ্বান জানাচ্ছে– তিনি যেন ভিনদেশি ভাষার কাছে খ্যাতি ভিক্ষা না করে আপন ঐতিহ্য ভান্ডারের কাছে ফিরে যান।

তাই তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তাঁর কণ্ঠে ফুটে ওঠে–

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ : জীবনের একপর্যায়ে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি সৃষ্ট সকল মোহ কেটে গেলে কবি আবার মাতৃভাষা বাংলার কাছে কায়মনে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তিনি সুদূর বিদেশে বসে অনুভব করেছেন– বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ, যাকে তিনি মণি-মাণিক্যের সাথে তুলনা করেছেন। এবার তিনি সর্বপ্রকার যশ-খ্যাতির মোহ কাটিয়ে মাতৃভাষা বাংলায় কাব্যচর্চা শুরু করেন। তিনি মাতৃভাষা বাংলাকে শ্রদ্ধাভরে পদ্মকাননের এবং বিদেশি ভাষাকে শ্যাওলার সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়–

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;–
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন!

উপসংহার : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মন ছিল দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ। তিনি একসময় বিদেশ এবং বিদেশি ভাষার জন্য মোহগ্রস্ত হলেও পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং নিজের সমালোচনা করেন কঠোরভাবে। আলোচ্য কবিতায় কবি দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

⏩ প্রশ্ন : ১৪ ॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি-মানসের যে প্রকাশ ঘটেছে তার পরিচয় দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্য জগতে এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক। বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে তিনি কাব্যক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেন। সার্থক মহাকাব্য রচনা করেও তিনি অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। 'বঙ্গভাষা' তার একটি বিখ্যাত সনেট কবিতা। নিচে প্রশ্নানুসারে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবি-মানস

কবির যৌবনের আকাঙ্ক্ষা : মাইকেল মধুসূদন দত্ত যৌবনে ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এ ভাষাতেই কবিতা রচনা করে খ্যাতি অর্জনের সাধনা শুরু করেন। এ উদ্দেশ্যে সাফল্য পেতে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি সাধনার জন্য মাদ্রাজ গমন করে সেখানে ইউরোপীয় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। মাদ্রাজ থাকাকালে তাঁর ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশিত হয়।

'বঙ্গভাষা' রচনার প্রেক্ষিত : কবি ইংরেজি কবিতা লিখে সফলতা না পেয়ে মাদ্রাজ ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে গমন করেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি; বরং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতার শিকার হন। পরে তাঁর সকল মোহ কেটে যায় এবং তিনি মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। যৌবনের উন্মেষকালে বিদেশি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি কবির প্রবল মোহ সৃষ্টি হলেও একপর্যায়ে তিনি মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার সূচনা করেন। এ পর্যায়েরই প্রথম ফসল 'বঙ্গভাষা'।

কবির স্বদেশপ্রেম : 'বঙ্গভাষা' কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির গভীর প্রেম ও মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে। এতে তিনি তাঁর মোহগ্রস্ত জীবনের সমালোচনা করে এর প্রতি চরম ঘৃণা প্রকাশ করেন। বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকার সময়কে তিনি ভিক্ষাবৃত্তির সাথে

তুলনা করেছেন। এ কারণেই সুদূর ফ্রান্সে বসে তিনি প্রতিটি মুহূর্তে দেশকে স্মরণ করেছেন। কবির ভাষায়–

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি।
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

কবির বোধোদয় : প্রবাসে কবি অনুধাবন করতে পারলেন, মাতৃভাষায় মানুষের হৃদয়াবেগ যতটা সহজে প্রকাশ পায়, অন্য কোনো ভাষায় তত সহজে প্রকাশ সম্ভব নয়। এ বোধোদয় ঘটার সাথে সাথে কবি অনুভব করলেন, বঙ্গজননী তাঁকে ভিনদেশি ভাষার কাছে খ্যাতি ভিক্ষা না করে আপন ঐশ্বর্য-ভান্ডারের কাছে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে, তাই তিনি মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কবির ভাষায়–

পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।।

কবি মধুসূদনের দুরবস্থা মোচন : মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মা আর মাতৃভাষা। সুদূর প্রবাসে বসে দুঃখ-দারিদ্র্যে জর্জরিত কবি মধুসূদন দত্ত দুঃসময়ে মাতৃভূমি আর হারানো মাতৃভাষার মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। অবশেষে স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তিনি এ দৈন্যদশা থেকে মুক্তি লাভ করেন। কবির ভাষায়–

এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে।

মাতৃভাষা সম্পর্কে কবির ধারণা : জীবনের সকল মোহের অবসান ঘটলে একপর্যায়ে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষার ক্রোড়ে ফিরে আসতে চান। তিনি মাতৃভাষা বাংলার ভান্ডারকে মণি-মাণিক্যের ভান্ডারের সাথে তুলনা করেন। তিনি আবার বাংলা ভাষার কাছে ফিরে এসে বাংলায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। সনেট রীতিতে রচিত 'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম বিখ্যাত কবিতা। এ কবিতায় মাতৃভাষাহীন জীবনকে ভিক্ষুকের জীবনের, মাতৃভাষাকে পদ্মকাননের এবং বিদেশি ভাষাকে শ্যাওলার সাথে তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়–

মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি;
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমল-কানন।

কবির আত্মসমালোচনা : কবি কুললক্ষ্মীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক স্বীকার করেন, তাঁর মাতৃভাষার ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। খনিতে যেমন বিচিত্র রত্ন থাকে, মাতৃভাষা বাংলার ভান্ডারেও তেমনি অমূল্য সম্পদ রয়েছে। তাই তিনি সকল মোহ ত্যাগ করে বাংলাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি অবিচল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, মানুষের অস্থিমজ্জায় যে মাতৃভাষার ছোঁয়া, তা উপেক্ষা করে কখনো সফল হওয়া সম্ভব নয়।

উপসংহার : বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য থেকে মোহগ্রস্ততা অবসানের পর বঙ্গভাষার প্রতি ভালোবাসা কবির একান্ত ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির ফসল। এতে একইসঙ্গে তাঁর দেশপ্রেম এবং মাতৃভাষাপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে কাব্যিক কিন্তু নির্মোহ ও সরল ভাষায়, যা তার কবি-মানসের পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করেছে সুন্দরভাবে।

▸▸ প্রশ্ন : ১৫ ॥ 'বঙ্গভাষা' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতা, নাটক, মহাকাব্যে বিশেষ ধারা প্রবর্তন করে অমর হয়ে আছেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দরীতির প্রবর্তক তিনিই। 'বঙ্গভাষা' কবির সর্বপ্রথম সনেট কবিতা। এ কবিতায় তাঁর দেশপ্রেম ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটির নামকরণের মধ্য দিয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যচেতনার অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও শিল্পসফল রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্যে নামকরণের রীতিনীতি : সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ, আর সাহিত্যের দর্পণ হলো নামকরণ। কারণ নামকরণের মধ্য দিয়েই যে-কোনো আলোচিত বিষয়ের সঠিক ভাববস্তু ফুটে ওঠে। নামকরণ সম্পর্কে প্রখ্যাত ইংরেজ মনীষী Cavendis বলেছেন– 'A beautiful name is better than a lot of wealth.' অর্থাৎ একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। কবিরা কল্পনাবিলাসী, মুক্ত বিহঙ্গের মতো। তাই বলে তারা সাহিত্যের স্বীকৃত রীতিনীতির ঊর্ধ্বে নন। সুতরাং একটি শিল্পকর্ম সার্থক করে তুলতে নামকরণের রীতিনীতি মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য।

নামকরণের ভিত্তি : সাহিত্যে নামকরণের কোনো সুনির্দিষ্ট ভিত্তি নেই। অন্যদিকে নামকরণ যথাযথ না হলে সাহিত্যকর্মের সঠিক মর্মার্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই সাহিত্যিকগণ যথাযথ নামকরণের ওপর যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা সাধারণত নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে নামকরণ করে থাকেন–

- রচনার মূলভাব অনুসারে
- নায়ক-নায়িকার নামানুসারে
- রূপক বা প্রতীকী অর্থানুসারে
- কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে
- কোনো সুনির্দিষ্ট স্থান বা কালের নামানুসারে
- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু অনুসারে।

'বঙ্গভাষা' কবিতার নামকরণ : কবিতার মূলভাবের মধ্যে যে বক্তব্য লুকিয়ে আছে, নামকরণের মধ্য দিয়ে তা ফুটে উঠেছে। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির ব্যক্তি জীবনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মাতৃভাষা ও স্বদেশের প্রতি কবির যে মমত্ববোধ তা-ই এ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য।

'বঙ্গভাষা' নামকরণের সার্থকতা : 'বঙ্গভাষা' নামকরণের মধ্য দিয়ে একটি ভাষার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, তা হচ্ছে বাংলা ভাষা। কবি প্রথম জীবনে বাংলা ভাষার প্রতি বিমুখ ছিলেন, কিন্তু ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে সফলতা না পাওয়ায় তিনি আবার বাংলার কাছে আত্মসমর্পণ করেন, যা আলোচ্য কবিতার বিষয়বস্তু। এ কবিতায় কবির একটি অখণ্ড ভাব-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছে, যা চমৎকারভাবে বিকশিত হয়ে ক্রমে পরিণতির দিকে এগিয়ে মাতৃভাষার প্রতি উপেক্ষাজনিত মনোবেদনার কাছে শেষ হয়েছে। ফলে এতে কবির সুগভীর হৃদয়াবেগই শুধু প্রকাশিত হয়নি– সাথে সাথে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় মমত্ববোধও প্রকাশ পেয়েছে। এ সকল দিক পর্যালোচনা করে বলা যায়, 'বঙ্গভাষা' নামকরণ সার্থক ও সুন্দর হয়েছে।

উপসংহার : 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্পকলা ও নন্দনতত্ত্বে সঠিক, আকর্ষণীয় ও শিল্পবোধসম্পন্ন নামকরণ অত্যাবশ্যক। যথার্থ নামকরণ রচনার সৌন্দর্য বাড়ায়। আলোচ্য 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির দেশপ্রেম ও মাতৃভাষাপ্রীতির হিরন্ময় প্রকাশ কবিতাটিকে সুখপাঠ্য ও হৃদয়স্পর্শী করে তুলেছে। তাই 'বঙ্গভাষা' নামকরণ কবিতাটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত, আকর্ষণীয় ও অর্থবহ করেছে।

ঐকতান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৬১–১৯৪১ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ১৬ ॥ 'ঐকতান' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১৭]
অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ঐকতান' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০০৭]
অথবা, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'ঐকতান' কবিতার সারমর্ম/ ভাবার্থ/মূলভাব তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, 'ঐকতান' কবিতার মূলসুর/মূলকথা/মর্মার্থ তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : নোবেল বিজয়ী ও বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিচরণকারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঐকতান' কবিতাটি একটি আত্মবিশ্লেষণমূলক অসাধারণ কবিতা। এ কবিতায় রবীন্দ্র-মানসের বহু বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে। কবি স্বীয় কাজকর্ম সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী বক্তব্য এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীকে তাঁর কাব্যে স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁর বিশ্বায়ত জীবনদৃষ্টি এবং কবি-মানসেরও প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সর্বোপরি 'ঐকতান' কবিতায় কবির অতৃপ্তির বেদনা প্রস্ফুটিত হয়ে কবিসত্তার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে। নিচে 'ঐকতান' কবিতার মূলভাব উপস্থাপন করা হলো :

'ঐকতান' কবিতার পটভূমি : ১৯৪১ সালে 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থে 'ঐকতান' কবিতাটি প্রকাশিত ও গ্রন্থিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি কবির জীবন-সায়াহ্নে স্বহস্তে লিখিত সর্বশেষ রচনা। কবি যখন তাঁর কাব্যকর্মের মূল্যায়নে ব্রতী হলেন তখন তাঁর শিল্পকর্মের দুর্বল ক্ষেত্রগুলো উন্মোচিত হলো। স্বীয় কাব্যকর্মে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রের অনুপস্থিতি উপলব্ধি করে শেষজীবনে তিনি অতৃপ্তির বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়েছেন।

কবির ভাবনা : কবি স্বীয় কাব্যকল্পনার ডানায় ভর করে উড়ে চলছেন দিগদিগন্তে। তিনি বিচিত্র বিশ্বের প্রতিটি কোণ থেকে উদার প্রাণের আহ্বান শুনতে পান। বিস্তৃত এ পৃথিবীর বিচিত্র ভৌগোলিক কাঠামো চর্মচোখে দর্শন করে কবি ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে বিশ্বমাত্রা প্রদানে উদগ্রীব ছিলেন, কিন্তু বাস্তবতার কারণে তা অনেকাংশে অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। একই সাথে বিশ্বসাহিত্যের সাথেও আত্মসংযোগের সুবিধা সম্পূর্ণতা পায়নি। এজন্য কবির উদাস মানসিক চেতনা অতৃপ্তির হাহাকারে গুমরে উঠেছে।

কবির কল্পনা : কবির চেতনায় স্থান, পাত্র ও কালে কোনো ভেদাভেদ নেই; বরং তিনি সমগ্র বিশ্বসংসারকে এক সুরমূর্ছনায় স্নাত করেছেন। হৃদয়লোকের কোনো ভৌগোলিক চৌহদ্দি না থাকায় তিনি সমগ্র বিশ্বলোকে কল্পনার সাগরে সন্তরণ করেছেন, আর কল্পনার চোখে বিশ্বসৌন্দর্য অবলোকন করেছেন। এমনকি তিনি সুদূর মরু প্রদেশের তুষার, ধূম্র কিংবা গিরিনিঃস্রাব জলপ্রপাতের সুরমূর্ছনা বাংলার এক কোণে বসেই অনুভব করেন।

সাধারণজনের প্রতি কবির অনুভূতি : কবি সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এজন্য সাধারণ নিম্নশ্রেণি ও প্রাকৃতজনদের নিয়ে সাহিত্য সাধনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে প্রাকৃতজনদের প্রতি মমত্ব অনুভব করেন এবং স্বীয় কাব্যকর্মের দুর্বলতা দর্শনে অনুশোচনায় দগ্ধ হন। এ কারণে তিনি এমন নবীন কবির উত্থান কামনা করেন যারা কৃষক, কামার, কুমোর, তাঁতি, জেলেসহ সমাজের সভ্যতা সৃষ্টির নায়কদের স্বীয় কাব্যে শামিল করবেন, তাদের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সাহিত্যে রূপায়ণ করবেন। এ ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ কবিদের প্রতি কবি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

কবির অক্ষমতার স্বীকারোক্তি : বিংশ শতকে আর্টনির্ভর সাহিত্য রচিত হতে থাকে। কারণ তখন সাহিত্যে যথারীতি যান্ত্রিকতার হাওয়া লেগে গেছে। ফলে সাহিত্য তথা কাব্যের ধারা জীবনসত্যের বদলে শিল্পসত্যকে অতিমাত্রায় অগ্রাধিকার প্রদান করে, যাতে মধ্যবিত্তের জীবনচিত্র প্রাধান্য পায়। অথচ এ ধরনের সাহিত্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শামিল না করায় তা আর সাধারণ মানুষের উপভোগ্য রইল না। আর কবিও এ আর্টনির্ভর সাহিত্যধারা থেকে নিম্নশ্রেণির কাতারে শামিল হতে পারলেন না। ফলে জীবনসায়াহ্নে এসে তিনি এসব উপলব্ধি করে অনুশোচনায় দগ্ধ হন এবং স্বীয় অক্ষমতার স্বীকারোক্তি প্রদান করলেন যে, তাঁর কাব্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান রয়েছে। কবির এ উপলব্ধি তাঁর সুন্দর মনের পরিচয় বহন করছে।

কবির ব্যর্থতা : আলোচ্য কবিতায় কবি তাঁর কাব্যকর্মের দুর্বলতা ও অপূর্ণতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন, যাদের শ্রমে ও ঘামে সভ্যতার সৃষ্টি, যারা পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে প্রতিক্ষণে, ঘাস আর মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা যেসব শ্রমজীবী চাষি, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি, ঘুম ভাঙলেই যাদের সাথে প্রথম দেখা হয়, তারাই রইল তাঁর অন্তর থেকে দূরে। তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়নি তাদের জীবনালেখ্য। ফলে প্রাকৃতজনের নিকট তাঁর কাব্যশিল্প আস্বাদ্য হয়ে ওঠেনি।

স্বীয় কাব্যকর্মের মূল্যায়ন : নিজের শিল্পকর্ম তথা কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বকবির কোনো সংশয় ছিল না। তবে তাঁর এ প্রতিভার বিচ্ছুরণ সমাজ ও মানবজীবনের সর্বত্র পৌঁছেছে এ বিশ্বাস তিনি সর্বদা করতেন। অথচ জীবনসায়াহ্নে এসে তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন যে, তাঁর কাব্য সাহিত্য বাংলার অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বিশাল সাধারণ জনগোষ্ঠী ধারণ করেনি। তিনি তা স্বীকার করে উচ্চারণ করেন–

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।।

অসমাপ্ত কর্ম-সম্পাদনের ভার : কবিগুরু স্বীয় কাব্যের অসম্পূর্ণতা পূর্ণকরণের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন নবীন কবির কাছে। যে কবি মাটির কাছাকাছি থেকে সোঁদা গন্ধে ভরা শ্রমজীবী মানুষের মর্মের দিশারি, আত্মার আত্মীয়তে পরিণত হয়, সে কবিই অবহেলিত প্রায় নির্জীব মানুষের মর্মবেদনা স্বীয় কাব্যে তুলে এনে নিজে যেমন খ্যাতিমান হন, তেমনি কবির খ্যাতিতে খ্যাত হয়ে ওঠে দেশের চিরবঞ্চিত ও অপরিচিত মানুষজন। নতুন কবির আগমনে সাহিত্য পূর্ণতা পাবে, জীবন হবে রসময়। একতারা হাতের মানুষগুলো সাহিত্যে জায়গা করে নেবে। কবি বসে আছেন এসব ভবিষ্যৎ কবির জন্য। এ কামনায় তিনি উচ্চারণ করেন–

এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের;
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার।

ঐকতানের উপায় : বহু বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সুরের সম্পূর্ণতা আসে, একক বাদ্যযন্ত্রে যা সম্ভব নয়। অনেকের কাজ একজন করতে পারে না। তেমনি কবির কাব্যের সাথে লৌকিক কবিদের কাব্যযোগে কাব্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সুরের মতো সাহিত্য ক্ষেত্রেও বিচিত্র রাগিনী সৃষ্টিতে একক কবি নন, বহু কবির শ্রম সাধনার সমন্বয় বা ঐকতান প্রয়োজন।

উপসংহার : 'ঐকতান' কবিতাটি কবির জীবনসায়াহ্নের ভাব-কল্পনা এবং জীবনঘনিষ্ঠ সত্য উপলব্ধিমূলক কবিতা। এতে কবির বহুমাত্রিক কাব্য ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। কবি

একদিকে সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন, অপরদিকে নিম্নশ্রেণির মানুষের সাথে নবীন কবিদের মাধ্যমে নিবিড় সংযোগ স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন, 'ঐকতান' ব্যতীত কাব্য বা সাহিত্যচর্চা কখনো পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

⏩ প্রশ্ন : ১৭ ॥ 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তরুণ কবিদের প্রতি যে দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

অথবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ঐকতান' কবিতায় কবি কেন 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' কবির আগমন প্রত্যাশা করেছেন?

অথবা, যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
–এই কবির উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ কেন এবং কী কী বলেছেন তা 'ঐকতান' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ কাব্য প্রতিভা, নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'ঐকতান' কবিতাটি মূলত আত্মবিশ্লেষণ ও স্বীয় শিল্পকর্মের মূল্যায়নধর্মী রচনা। জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বীয় মানসলোকে তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন এবং সমাজজীবনে নিজের শিল্পকর্মের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করেন। তিনি প্রজ্ঞার আলোকে আপন সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করে এর সীমাবদ্ধতা এবং দোষত্রুটি নির্দেশ করেছেন। আর এ সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের প্রত্যাশায় এ দেশের নরম মাটি থেকে আবির্ভূত কবিদের প্রতি তিনি নিজের অপূর্ণতার গ্লানি দূরীকরণের দায়িত্বভার অর্পণ করেন।

সমসাময়িক কাব্যরীতি : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কাব্য সাহিত্যে নিরঙ্কুশ শিল্পানুসরণ তথা আধুনিকতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় কাব্যাদর্শ ও রীতি বাংলা কাব্যধারাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে। গড়ে ওঠে বিশুদ্ধ শিল্পবাদী কাব্য আন্দোলন। Arts for arts sake বা শিল্পের জন্য শিল্পচর্চার যে ধারা শুরু হয়েছিল, এ ভাবধারায় কবিতার প্রাবল্যে সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ লৌকিক সাহিত্যের অবলুপ্তি ঘটে। সাহিত্যের বিষয়, উপকরণ হয়ে দাঁড়ায় মধ্যবিত্তের ভাবানুভূতি। ফলে সাহিত্যের সঙ্গে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পর্কসূত্র শিথিল হয়ে পড়ে। নাগরিক সাহিত্যের সৌকর্য শিল্প সফল হলেও জীবনসত্যের মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়।

কবির অবমূল্যায়ন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ফলে পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত আভিজাত্যের দেয়াল ডিঙিয়ে সাধারণ্যে প্রবেশের পথে প্রবল বাধা থাকায় রবীন্দ্রনাথের কবি-মানস গড়ে উঠেছিল নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করে। বাংলার প্রাকৃতজন তথা কৃষক, শ্রমিক, তাঁতি ও নিম্ন পেশার লোকদের প্রতি অনুভূতি থাকা সত্ত্বেও শ্রেণি-বৈষম্যের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি কখনো বাংলার কুঁড়ে ঘরে প্রবেশ করতে পারেননি। কবির উচ্চ ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনা বাংলার সাধারণ মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও রোমান্টিকতা থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।

কবির জীবনসায়াহ্নের ভাবনা : 'ঐকতান' কবিতার কবি জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে ভাব-কল্পনার শূন্যাকাশ থেকে ধুলার ধরণীতে নেমে আসার আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেন। তিনি শেষ জীবনে কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতি মানুষদের প্রতি সীমাহীন মমতা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন। বিশেষভাবে তাদের জীবনের দুঃসহ কষ্ট ও শ্রম কিঞ্চিৎ প্রশমিত করে আনন্দদায়ক ও আশা-সঞ্চারক সাহিত্য রচনার নিতান্ত অভাব লক্ষ করেন। কেননা

দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম এ অসহায় মানুষগুলোর চিরসাথি হলেও অধুনা পূর্বকালে তারা কাব্যানন্দ থেকে বঞ্চিত ছিল না।

কবিজীবনের ব্যর্থতার স্বরূপ : জীবনসায়াহ্নে এসে কবি উপলব্ধি করেছেন, তিনি প্রচুর লিখেছেন, কিন্তু বাকিও রয়ে গেছে প্রচুর। জীবনের শেষপাদে উপনীত হয়ে কবি বুঝতে পেরেছেন, কাব্য মানুষেরই জন্য। তাই যাদের রক্তে-ঘামে সৃষ্ট সভ্য পৃথিবী, তাদের বাদ দিয়ে নন্দিত কাব্য হতে পারে, কিন্তু জীবনের ভাষ্য হতে পারে না। যারা তাদের শ্রমে-ঘামে পৃথিবীর রূপ বদলাচ্ছে প্রতিক্ষণ, ঘাম আর মাটির সোঁদা গন্ধে ভরা যেসব শ্রমজীবী চাষি, জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতি, মাঝি; ঘুম ভাঙলেই যাদের সাথে প্রথম দেখা হয়, হাতের খুব নিকটে যারা, তারাই থাকল তাঁর সাহিত্য থেকে দূরে, অন্তরের বাইরে।

কবির সীমাবদ্ধতা : কবি জমিদার নন্দন। তিনি বিত্তস্খলিত হতে পারেননি, পৌঁছাতে পারেননি শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ের দ্বারে। এখানেই কবির অক্ষমতা এবং তাঁর কাব্যে অপূর্ণতার মৌল কারণ নিহিত। সাধারণ মানুষের অন্তরের খোঁজ জানতে গেলে অন্তরে অন্তর মেশাতে হয়। আর সেজন্য প্রয়োজন জীবনে জীবন যোগ করা। যদিও কবি নিম্নবিত্ত মানুষের প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। তাই কবি তাদের সত্যরূপ আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়েছেন। সে ব্যর্থতার কথা অকপটে তিনি স্বীকার করে বলেন–

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।।

লৌকিক কবিদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ : এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে একান্তভাবে ঘনিষ্ঠ, এ দেশের নরম মাটি থেকে উদ্‌গত কবিদের প্রতি বিশ্বকবি নিজের অপূর্ণতার গ্লানি দূরীকরণের দায়িত্বভার অর্পণ করেছেন। লৌকিক ও নবীন কবিরা অবাস্তব রোমান্সের জগৎ ছেড়ে ধূলিধূসর পৃথিবীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও বঞ্চিত মানুষের কথা সাহিত্যে রূপায়ণ করবে। তাদের সাহিত্য হয়ে উঠবে বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন। শহরের আলোকোজ্জ্বল ড্রয়িং রুমে কল্পনায় অবগাহন না করে মাটির সোঁদা গন্ধ গায়ে মেখে সাধারণ মানুষের জীবনসত্যকে তারা উঠিয়ে আনবে কাব্যলোকে। মাটির কাছাকাছি থাকা এসব কবির জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা–

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির আহ্বান : কবিগুরু তরুণ কবিদের প্রতি সাহিত্যে জীবনসত্যের রূপায়ণ করার সর্বাধিক বড় দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। কবি রোমান্টিকভাবে ভাব-কল্পনার মোহমুগ্ধতা ত্যাগ করতে না পারায় বাস্তবজীবনের পরম সত্যরূপ তাঁর কাছে অধরাই রয়ে গেছে। তাই তিনি নবীন কবিদের ভাব ও শিল্পের দুর্লঙ্ঘ্য অনুশাসন ত্যাগ করে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য রচনার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাকৃতজনকে আনন্দদান : বাংলার নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, শ্রমজীবী অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত মানুষের জীবনে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, হতাশা এবং বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। নগর সভ্যতার আগ্রাসন ও নাগরিক সংস্কৃতির উল্লাসে অখ্যাতজনদের বিনোদন উপকরণ বলতে কিছুই থাকেনি। অধুনা সাহিত্যের উচ্চমার্গীয় রীতিসর্বস্বতার কারণে কাব্যধারার সাথে প্রাকৃতজনদের বিচ্ছিন্নতা ছিল স্পষ্ট। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ অতি সাধারণ মানুষের আনন্দহীন জীবনে নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে আনন্দসুধা বিতরণের জন্য নবীন কবিদের প্রতি অনুরোধ জানান, যা ছিল কবির নিজেরই কর্তব্য। যেমন তিনি উচ্চারণ করেন–

প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

নবীন কবিদের সম্মান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রত্যাশিত নবীন কবিদের ওপর গুরুভার দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকুও দিতে কার্পণ্য করেননি। মানুষের কবি, জীবনের কবি, জগতের কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা নমস্কার জানিয়ে তিনি বলেন–

তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি–
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।

উপসংহার : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে যখন তাঁর শিল্পকর্মের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন, তখন তিনি নিরাশ না হয়ে অনুভব করলেন, জীবন তো খণ্ডিত। তাই এককভাবে সম্পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব প্রয়োজন ঐকতানের। এজন্য কবি অন্তরে ঐকতানের নিমন্ত্রণ পেয়ে নবীন ও উদীয়মান কবিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

➤ প্রশ্ন : ১৮ ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'ঐকতান' কবিতা অবলম্বনে কবির সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোকপাত কর।

অথবা, 'ঐকতান' কবিতায় কবি সমকালীন সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মূলত সত্য ও সুন্দরের সাধক। এই সত্য ও সুন্দরের সাধনায় তিনি নিবেদন করেছেন তাঁর সমগ্র কবিজীবন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের কাব্য ফসলের বিপুল সম্ভার নিয়ে সাহিত্য দরবারে অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করে অসীম কাব্যাকাশের উড়ন্ত বলাকায় পরিণত হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর কাব্যশিল্পে ছিল অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, যা তিনি জীবনসায়াহ্নে 'ঐকতান' কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রশ্নালোকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা তথা তৎসমকালীন সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

সমকালীন সাহিত্যরীতি : বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় কাব্যাদর্শ, রীতি ও বিধি বাংলা কাব্যধারাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে গড়ে ওঠে বিশুদ্ধ শিল্পবাদী সাহিত্য আন্দোলন। Arts for arts sake বা শিল্পের জন্য শিল্পচর্চা– এ ভাবধারার কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার অবলুপ্তি ঘটে। তখন সাহিত্যের বিষয় ও উপকরণ হয়ে দাঁড়ায় মধ্য ও উচ্চবিত্তের ভাবানুভূতি। এছাড়াও কাব্যশিল্পে তখন উচ্চমার্গীয় ভাবদর্শন, প্রকৃতিপ্রেম ও অধ্যাত্মবাদই শতধারায় ব্যঞ্জনাময় হয়ে ওঠে। ত্রিশোত্তর কবিরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যানুসারী হলেও রচনারীতিতে তারা ছিলেন পাশ্চাত্যানুসারী। সর্বোপরি নাগরিক রুচিকে প্রাধান্য দিয়েই তৎকালীন সাহিত্য রচিত হতো।

কবির সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে ভাবনা : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমকালীন সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এর পাশাপাশি তিনি স্বীয় সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও আত্মমূল্যায়নে ব্রতী ছিলেন। তার সাহিত্যের উচ্চ ভাবাদর্শ ও আধ্যাত্মিক চেতনা জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্য রচনায় অপূর্ণতা সৃষ্টি করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তার সৃষ্ট কাব্যশিল্প এবং জীবনঘনিষ্ঠ কবিদের রচিত কাব্যসাহিত্যের যৌথ মূল্যায়নে স্বীয় সাহিত্যের অপূর্ণতা খুঁজে

পেয়েছেন। তাই তিনি ঐকতানের মাধ্যমে উভয় সাহিত্যের সমন্বয়ে স্বীয় সাহিত্যের পরিপূর্ণতার আহ্বান জানিয়েছেন।

কবির বিশ্বসন্দর্শন : কবি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করতে হলে বিশ্বসন্দর্শন অত্যাবশ্যক। বিশ্বায়ত চিন্তাধারার বিকাশ লাভ করতে হলে বিশ্বসভ্যতা, প্রকৃতি, মানুষ, মনুষ্যকীর্তি ও ভৌগোলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করা দরকার। বিশ্বভাবনার মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়ন সম্ভব। পরিভ্রমণের মাধ্যমে বিশ্বায়ত জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব নয়। গ্রন্থপাঠের মাধ্যমেই বিশ্বায়ত জ্ঞানলাভ সম্ভব। সাহিত্যে বিশ্বমানবতার সুর বেজে না উঠলে সে সাহিত্য জড়সাহিত্য হতে বাধ্য। সাহিত্যে কল্পলোকের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই, নেই কোনো পরিসীমা। যেমন কবি উচ্চারণ করেন–

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

মন দিয়ে হৃদয়ের অনুসন্ধান : বিশ্বায়ত অন্তরানুভূতি একমাত্র হৃদয়ানুভূতির মাধ্যমে সম্ভব। কেননা এ হৃদয়লোকের সন্ধান কেবল হৃদয় স্পর্শ দিয়ে লাভ করা যায়। যেমন কবি যথার্থই বলেছেন–

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার।

প্রাকৃতজনের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবন-সায়াহ্নে উপলব্ধি করেন যে, তিনি নিজের সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বায়ত চেতনাকে স্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। শ্রেণিবৈষম্যের কারণে তাঁর সাহিত্য সর্বজনীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তাই কবি জীবনসায়াহ্নে কামার, কুমোর, তাঁতি, কৃষক ও দিনমজুর তথা প্রাকৃত মানুষের জীবনচিত্রকে সাহিত্যানুষঙ্গ করার প্রেরণায় উন্মুখ ছিলেন।

লৌকিক কবির প্রতি আহ্বান : গ্রামবাংলার বিশাল জীবনপ্রবাহের সাথে একাত্ম কবির পক্ষেই কেবল জীবনঘনিষ্ঠ লৌকিক সাহিত্য রচনা করা সম্ভব। আর এসব কবিরাই পারেন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যেতে। শ্রেণিচরিত্র, শ্রেণিচেতনা ও জীবন-বাস্তবতা সম্পর্কে অনুমাননির্ভর সাহিত্য জীবনসত্যকে ধারণ করে না। যে কারণে কবি বলেছেন–

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।

শুধু শিল্পকুশলতা কাম্য নয় : সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণ। শিল্পগুণসমৃদ্ধ সাহিত্য সকলের পাঠযোগ্য ও উপভোগ্য, কিন্তু এ ধরনের সাহিত্যের সাথে নিম্নশ্রেণির কোনো সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্যক্লিষ্ট খেটে খাওয়া মানুষের জীবনচিত্রও সাহিত্যে নেই। শুধু শিল্পকুশলতায় পরিপূর্ণ সাহিত্যের বিপক্ষে অবস্থান করে 'ঐকতান' কবিতার কবি বলেছেন–

সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।

আনন্দের সারথী সাহিত্য : নিরানন্দ, বিপর্যস্ত, হতাশাগ্রস্ত জীবনকে আনন্দে ভরপুর করে দিতে পারে একমাত্র সাহিত্য। সাহিত্য আনন্দের উল্লেখযোগ্য উপাদান। একমাত্র সাহিত্যই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হৃদয়কে পুলকিত ও আন্দোলিত করতে পারে। শুধু শিক্ষিত শ্রেণির হৃদয়কে আন্দোলিত করতে পারলেই সাহিত্য তার উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হয় না। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সবাইকে বিনোদন দেওয়া।

লৌকিক কবিদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য : নাগরিক সভ্যতার ভিড়ে গ্রামবাংলার বাউল ও জীবনঘনিষ্ঠ কবিরা স্বীকৃতি পান না। অবহেলা আর অনাদরের মধ্যে তারা সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হন। এসব নিভৃতচারী কবি সভ্য সমাজে পরিচিত নন, কিন্তু সম্মানটুকু তাদের প্রাপ্য। নিভৃতচারী এসব কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

উপসংহার : রবীন্দ্র সাহিত্যকর্মে বা সমকালীন সাহিত্যে ইউরোপীয় কাব্যাদর্শ দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছিল। ফলে জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মের প্রায় বিলুপ্তি ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে এ ব্যাপারটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি এবং এসব সাহিত্যিকদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করেছেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, তাদের ঐকতানের মাধ্যমেই তাঁর কাব্যশিল্প পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

⏩ প্রশ্ন : ১৯ ॥ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ঐকতান' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিচরণকারী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি আত্মবিশ্লেষণমূলক কবিতা হলো 'ঐকতান'। রবীন্দ্র-মানসের বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে এ কবিতায়। এর নামকরণ রবীন্দ্র প্রতিভার অনবদ্য সৃষ্টি ও স্বাক্ষর। এ কবিতায় ঐক্যের বীণার ঝঙ্কারে প্রকৃতি আর মানুষকে কাছে টানার এক অপূর্ব প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে। কবিতাটি কবির জীবনসায়াহ্নে রচিত। এ রচনার মধ্যে গভীর ভাবনা ও দার্শনিক মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে, যা রবীন্দ্র প্রতিভার অমর সার্থকতা বহন করে। নিচে কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করা হলো :

নামকরণের রীতি : নামকরণ সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব অনেকাংশই ফুটে ওঠে। এজন্য কবি সাহিত্যিকগণ নামকরণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। মনীষী Cavendis-এর মতে, 'A beautiful name is better than a lot of wealth.' অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। নামকরণে কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আলোচ্য কবিতার নামকরণ করা হয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- নায়ক-নায়িকার নাম
- স্থান বা কাল
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- রচনার মূলভাব।

'ঐকতান' কবিতায় অনুসৃত নীতি : বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেই কবিতাটির শিরোনাম 'ঐকতান' রাখা হয়েছে। কবিতাটিতে মূলত প্রকৃতি, মানসপ্রকৃতি সীমা-অসীমা ইত্যাদি বিষয়সমূহকে কবি ঐক্যের বন্ধনে গেঁথেছেন।

বিষয়বস্তুর বিচারে 'ঐকতান' : পৃথিবীতে নানা জাতি ও নানা শ্রেণির মানুষ রয়েছে। তাদের সামান্য ও অসামান্য মিলেই পূর্ণতার পরিমাপ। কবি তাঁর জীবনসায়াহ্নে এসে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছেন যে, তিনি অসংখ্য কবিতা প্রবন্ধ, গান ইত্যাদি রচনা

করেছেন সত্য, কিন্তু কবি সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; তাই সাধারণ নিম্নশ্রেণি তথা সর্বস্তরের মানুষ নিয়ে সাহিত্য সাধনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর কাব্যেও অপূর্ণতা রয়েছে। তিনি যে সুরের সাধনা করেছেন তা বিচিত্র পথে হয়নি। সর্বত্রগামী ও সামাজিক বাধার কারণে কবি উঁচু সমাজ হতে তাঁর জীবন নৌকাকে কদাচিৎ নিচুতলার মানুষের ঘাটে নোঙর করেছেন। তিনি এসব শ্রমজীবী মানুষের সাথে আত্মীয়তা গড়ে তুলতে পারেননি। সাধারণ মানুষের সাথে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে আত্মিক পরিচয় গড়া যায় না। কবির ভাষায়–

"কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।"

কেবল কল্পনা আর অনুমানে আত্মার খবর পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সমাজের একশ্রেণির মানুষের বিলাসী জীবনের স্বব্যঞ্জনা কোনোমতেই তাদের পূর্ণতা আনতে পারে না। তাই কবি 'কৃষাণের জীবনের শরীক যে জন' সেই কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছেন। অখ্যাতজনেরা সেই কবির আগমন প্রতীক্ষায় আছেন যিনি সাহিত্যের ঐকতান সভায় সবাইকে এক সুতায় গাঁথতে পারেন। সুতরাং বিষয়বস্তুর বিচারে 'ঐকতান' নামকরণ সুন্দর, সার্থক ও সফল হয়েছে।

বক্তব্যের বিচারে 'ঐকতান' : 'ঐকতান' কবিতার বক্তব্য ও ভাষা খুবই প্রাঞ্জল। এর ভাষা আবেগনির্ভর নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বায়ত কবি প্রতিভা হিসেবে বিশ্বের বিশালতার সাথে স্বীয় একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। কবি জীবনসায়াহ্নে এসে আত্মমূল্যায়ন দ্বারা তাঁর অসামান্য কাব্যশিল্পকে অপূর্ণ ও ঔদ্ধত্য বক্তব্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং 'ঐকতান'-এর নামকরণ বক্তব্যের শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ হয়েছে।

বিষয়ের আবেদনে 'ঐকতান' : রবীন্দ্র প্রতিভার শিল্প-সাফল্য প্রশ্নাতীত। কবি তাঁর অসম্পূর্ণ শিল্প-সাহিত্যের পূর্ণতা নতুন প্রজন্মের মাটি ও মানুষের দ্বারা আশা করেছেন এবং নব প্রজন্মের শিল্প-শৈলিতার সাথে স্বীয় একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। এজন্য বিষয়ের আবেদন ও নামকরণ যথেষ্ট মানানসই।

চূড়ান্ত বিবেচনায় 'ঐকতান' : বিষয়বস্তু আর বক্তব্যের মাধুর্যতায় 'ঐকতান' কবিতার নামকরণ 'ঐকতান' না হলেও ক্ষতি ছিল না। তবে 'ঐকতান'কে নামকরণের শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করায় এর মাধুর্য যত বৃদ্ধি পেয়েছে তা অন্য নামে কখনো হতো না। 'ঐকতান' নামকরণের মাধ্যমে কবির শিল্পচাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আর সার্বিক বিচারে এর নামকরণ হয়েছে যুক্তিযুক্ত ও সার্থক।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের আলোকে কবিতার 'ঐকতান' নামকরণ শুধু সার্থকই নয়; বরং অর্থবহ ও শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। বিশ্বকবি তাঁর এ কবিতায় অন্তর্নিহিত ভাববিন্যাসে যে শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল।

» প্রশ্ন : ২০ ॥ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্য সাধনায় যে অসম্পূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন, 'ঐকতান' কবিতার আলোকে তা আলোচনা কর।

অথবা, 'ঐকতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্য সাধনায় যে অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল অবাধ বিচরণ। তিনি নোবেল বিজয়ী কবি এবং তাঁর কবিগুরু খ্যাতি রয়েছে। তাঁর হাতের

শৈল্পিক তুলিতে বাংলা সাহিত্যের সকল শাখা বিচিত্র রং ধারণ করেছে, হয়েছে যুগশ্রেষ্ঠ। নোবেল প্রাইজের মাধ্যমে পেয়েছেন তিনি বিশ্ব সাহিত্যিকের স্বীকৃতি। এতদসত্ত্বেও জীবনসায়াহ্নে তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়নধর্মী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন তাঁর কাব্যের ত্রুটি, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা এবং সর্বজনহীনতা। তাই তিনি নবীন ও জীবনঘনিষ্ঠ কবিদের ঐকতানের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যের পূর্ণতা আনয়নের আহ্বান করেছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার চরম বিকাশ ঘটে। ইউরোপীয় কাব্যাদর্শ ও রীতি বাংলা কাব্যধারাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। গড়ে ওঠে বিশুদ্ধ শিল্পবাদী সাহিত্য আন্দোলন। Art for art's sake বা শিল্পের জন্য শিল্প– এ ভাবধারার কবিতায় সাধারণ মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ লৌকিক সাহিত্যের অবলুপ্তি ঘটে। তখন সাহিত্যের বিষয়, উপকরণ হয়ে দাঁড়ায় মধ্যবিত্তের ভাবানুভূতি। আর কবি রবীন্দ্রনাথসহ প্রায় সকল সাহিত্যিকের সাহিত্যই তখন উচ্চমার্গীয় ভাবদর্শন, প্রকৃতিপ্রেম ও অধ্যাত্মবাদের বৈশিষ্ট্যে রচিত হতো। এমনকি ত্রিশোত্তর কবিরাও রচনারীতিতে পাশ্চাত্যানুসারী ছিলেন। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য ছিল শহুরে সভ্যতা, নাগরিক রুচি ও রোমান্টিকতা।

কবির অসম্পূর্ণতাবোধ : জীবনসায়াহ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন আত্মমূল্যায়ন ও স্বীয় কাব্যশিল্পের পর্যালোচনায় ব্রতী হন, তখন তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর সাহিত্যের দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতা ও সর্বজনগ্রাহ্যহীনতা। 'নবজাতক', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে তাঁর এই আত্মমূল্যায়নের আভাস ও মৃত্যুভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জীবনের অন্তিমক্ষণের অনুভব থেকে বুঝতে পারলেন, তাঁর কবিতার বিষয় ও বক্তব্যে ভাবকল্পনা, আধ্যাত্মবাদ এবং শিল্পানুশাসনে বিচিত্র মাত্রা প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সর্বত্রগামী হয়নি, যা তার কাব্যশিল্পে অসম্পূর্ণতার সৃষ্টি করেছে। যেমন কবি নিজেই বলেন–

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা–
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।।

বাস্তবজ্ঞান অর্জনে কবির সীমাবদ্ধতা : কবি জমিদার নন্দন। বিত্ত ও শ্রেণিবৈষম্যের দরুন কবি প্রাকৃতজনের সাথে অন্তরে অন্তর মেলাতে পারেননি, হতে পারেননি তাদের আবেগ, অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগীদার। ফলে বিশ্বায়ত প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে কবি ব্যর্থ হয়েছেন। বাংলার নিভৃতকোণে কাটানো এবং স্বীয় কাব্য বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি বিশ্বপ্রকৃতি, নৈসর্গিক জীবনবোধ, সমাজ সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রাণিকুল এবং প্রাকৃতজনের সান্নিধ্য গ্রহণে অসমর্থ হয়েছেন। তাই কবি অকপটে স্বীকার করেন–

মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু।

বিশ্বমাত্রিকতার অসম্পূর্ণতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে তাঁর সাহিত্যের যে দিকটিতে অসম্পূর্ণতা লক্ষ করেছেন তা হলো তাঁর সাহিত্য বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও সর্বত্রগামী নয়, তাঁর সুরেরও অপূর্ণতা রয়েছে। বস্তুত কবির সামাজিক অবস্থান, সীমাবদ্ধ গণ্ডি ও বৃহত্তর সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণেই বিশ্বমাত্রিকতার অসম্পূর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই

কবি অকপটে স্বীকার করেন–

এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।

আসল ব্যক্তিদের সাথে সংযোগহীনতা : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্ভ্রান্ত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে সর্বসাধারণের সাথে তাঁর সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ সমাজে শ্রেণিগত বৈষম্য ছিল প্রবল। ফলে তিনি নিম্নবিত্তদের সাথে মিশতে পারেননি। এ সংযোগহীনতার কারণে তাঁর সাহিত্যে সর্বজনীনতার আদর্শ খুবই দুর্বল। কবি বলেছেন–

পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।–

মেকি জীবনবোধ : কবির পক্ষে সাধারণ মানুষের সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এতদসত্ত্বেও অনেক সময় তিনি যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন, যা কৃত্রিম বলে প্রতিভাত হয়েছে এবং কবিকে দারুণভাবে কষ্ট দিয়েছে। অনেকে কবির সমালোচনা করেছেন। কবি সেই সমালোচনা মাথা পেতে নিয়ে বলেন–

তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা–
আমার সুরের অপূর্ণতা।

কবির রচনা সর্বজনগ্রাহ্য নয় : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ করলেও তাঁর কবিতা সর্বত্রগামী হতে পারেনি। রোমান্টিকতার আবহে অনেক কিছু লেখা হলেও তাতে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়নি। কবির স্বীকারোক্তি হলো–

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।।

ব্যক্তিগত অভিমত : জীবনসায়াহ্নে কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যশিল্পের পর্যালোচনা করে তার দুর্বলতা, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি যে বিশ্বায়ত প্রতিভা এবং বাংলা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি, এর প্রমাণ বিশ্বস্বীকৃতি–নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি। তাঁর কাব্য প্রতিভার অপূর্ণতা ও ত্রুটি নির্ণয় করে আত্মমূল্যায়ন করা মানবপ্রেম, সৎসাহস ও সততার পরিচায়ক। তবে রবীন্দ্রসাহিত্য অতি উচ্চমাত্রায় রোমান্টিকপ্রবণ। ফলে তাঁর সাহিত্যে বাস্তবজীবন ও প্রাকৃতজনের জীবন-কথা প্রাধান্য পায়নি। তাঁর সাহিত্য, কাব্য ও সংগীত মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পরিপুষ্টতা দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে রচিত কাব্যগ্রন্থে স্থান পাওয়া কবিতাসমূহের মাধ্যমে বোঝা যায়, জীবনসায়াহ্নে তিনি জীবনঘনিষ্ঠ কাব্য রচনা করে প্রাকৃতজনের সংস্পর্শে থাকতে চেয়েছেন।

উপসংহার : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঐকতান' কবিতায় অনুতাপদগ্ধ হয়েছেন ভীষণভাবে। এ কবিতায় তাঁর জীবনবোধের স্বরূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে। তিনি সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করে ব্যর্থতার দায়িত্বভার কাঁধে তুলে নেন। কবি তাঁর জীবনসায়াহ্নে যখন বুঝতে পারেন, তাঁর সাহিত্যকর্ম সর্বত্রগামী নয়, তখন তিনি ঐকতানের মাধ্যমে নবীন ও বাস্তববাদী কবিদের জীবনঘনিষ্ঠ কাব্যের মাধ্যমে তাঁর রচনার পূর্ণতা সাধনের আহ্বান জানিয়েছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ২১ ॥ 'ঐকতান' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শনের ফসল'– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? কেন? [ফা. প. ২০১১]

অথবা, 'ঐকতান' কবিতায় বিধৃত রবীন্দ্রনাথের জগৎ ও জীবনবোধের স্বরূপ উদঘাটন কর।

অথবা, 'ঐকতান' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎ ও জীবনবোধের স্বরূপ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৯]

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মূলত সত্য ও সুন্দরের সাধক। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের কাব্য ফসলের বিপুল সম্ভার নিয়ে সাহিত্য দরবারে অতি উচ্চস্থানে আরোহণ করেছেন। এতদসত্ত্বেও তাঁর কাব্যশিল্পে ছিল অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা, যা তিনি জীবনসায়াহ্নে 'ঐকতান' কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। 'ঐকতান' কবিতাটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মদর্শনের ফসল। এ কবিতায় তিনি বিশ্বজগৎ থেকে শুরু করে স্বজাতি ও প্রাকৃতজনের সাথে তাঁর প্রাণ সংযোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করার পাশাপাশি এক্ষেত্রে নিজের অপূর্ণতার বিষয়টিও নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন, যা তাঁর কাব্যশিল্পের আত্মমূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণও বটে। প্রশ্নালোকে নিচে রবীন্দ্রনাথের আত্মদর্শন তথা জগৎ ও জীবনবোধের স্বরূপ আলোচনা করা হলো :

জগৎ ও জীবনবোধের সঙ্গে সংযোগহীনতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আজীবন যে কাব্য সাধনা করেছেন তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি তাঁর কাব্যের সুধা সর্বত্র পৌঁছে দিতে না পারায় জীবনসায়াহ্নে আক্ষেপ করেছেন। তিনি সারাজীবন প্রেম, রোমান্টিকতা, প্রকৃতি ও অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কিত যা কিছু রচনা করেছেন, তার সঙ্গে সাধারণ লৌকিক জীবনের কোনো সংযোগ নেই। তাই স্বীয় কাব্য সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন–

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।

কবির বিশ্বায়ত জীবনবোধ : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বপ্রকৃতির ভাবাবেগকে হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে ভাষারূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের সমাজ-সভ্যতার বাস্তবতা ও প্রকৃতি ভাবনা তাঁর হৃদয়ে চিরভাস্বর ছিল। কবি বিচরণ করেন দিক থেকে দিগন্তে। কবিকল্পনায় বিশ্বায়ত জীবনবোধ জাগ্রত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বজগতের ঐকতানে কবিহৃদয় আন্দোলিত হয়ে উঠেছে। তাই তিনি বলেন–

**কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।**

প্রকৃতির মহা-ঐক্যের প্রেরণা : জীবনসায়াহ্নে কবি উপলব্ধি করেছেন, সমগ্র বিশ্বলোকে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ প্রাণের আবেগ ঐক্যসূত্রে গাঁথা। কবির পক্ষে সমগ্র বিশ্ব পরিভ্রমণ করা সম্ভব হয়নি, কিন্তু যতটুকু দেখেছেন তন্মধ্যে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজি ও অসীম তুষার শুভ্রতার মধ্যে ঐক্য অনুভব করেছেন। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির মতো সাহিত্যেও কবি আবিষ্কার করেন এক মহা-ঐক্যের প্রেরণা। এ ঐক্যের আহ্বানে কবি বলেছেন–

প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে–

মনোজগতের ঐক্য : প্রতিটি মানুষের শরীরী সত্তার অন্তরালে যে সত্তা রয়েছে তাকে বলে মন। দৈহিক বিচরণ সর্বক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কল্পনা ও ভাবাবেগের অবাধ বিচরণ সর্বত্র। তাই মানুষের মনোজগৎ বড়ই রহস্যঘেরা। দেহান্তরালে যে মনের অবস্থিতি, তার প্রকৃত সন্ধান লাভ করা প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। তবে কেবল মন দিয়েই প্রকৃত মনের স্পর্শ

পাওয়া সম্ভব। মানবমনের এ ঐক্য সম্পর্কে কবি বলেন–

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

ঐক্য স্থাপনে সীমাবদ্ধতা : সর্বত্র মনুষ্য মনের অবাধ বিচরণ থাকলেও সামাজিক বর্ণ বা শ্রেণিবিভেদের কারণে সকলের মনোজগতে ঐক্য স্থাপিত হয় না। উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে যে শ্রেণিগত বৈষম্য রয়েছে তা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণি সচেতনভাবেই দূর করতে দেয় না। সমাজের যারা শ্রমজীবী, যাদের শ্রমে মানুষের প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ উৎপন্ন হচ্ছে, যারা জীবন-সংসারকে সচল করে রেখেছে, তাদের মনের খবর কে রাখে? কবি নিজেও কি তাদের সাথে আত্মিক মিলনে সক্ষম হয়েছেন? কবির ভাষায়–

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;

কবির ভাবনায় মানবপ্রেম : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ঐকতান' কবিতায় বাংলার অতি সাধারণ অখ্যাত লোকদের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোবাসার টান অনুভব করেছেন। জীবনসায়াহ্নে তিনি নিজের অর্থ-ঐশ্বর্যের অহমিকা ভুলে দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের পর্ণ কুটিরে প্রবেশের জন্য উন্মুখ হয়েছেন। নিজে প্রাকৃতজনের জন্য যা করতে পারেননি তা আগামীদিনের জীবন ও মাটিঘনিষ্ঠ কবির দায়িত্বে ছেড়ে দিয়েছেন। যেমন কবির ভাষায়–

যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

প্রাকৃতজনের প্রতি কবির সম্মান : প্রাকৃতজন তথা সমাজ-সংসারে অতিসাধারণ মানুষের জীবনচিত্র অনুল্লেখ্য। তাদের জীবন নিস্তরঙ্গ, সমাজে তাদের অবদান অনস্বীকার্য হলেও তা স্বীকৃতিহীন। সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে এবং তাদেরই উপভোগ্য যে লৌকিক কবি বা গীতিসাধক তার খবর নগর জীবনে কেউ রাখে না। নিভৃতচারী এ সাধারণ মানুষ ও সাধারণ মানুষের কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাবনত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন–

সাহিত্যের ঐকতান সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়–

লৌকিক কবির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য : জীবনসায়াহ্নে কবি তাঁর কাব্যের অপূর্ণতা উপলব্ধি করে নবীন ও লৌকিক কবিদের প্রতি জীবনঘনিষ্ঠ রচনার মাধ্যমে তাঁর কবিতার পূর্ণতা আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন, যা তাঁর কোমল মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। প্রাকৃতজন তথা সমাজের অতিসাধারণ মানুষ ও তাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দদানকারী লৌকিক, নবীন ও আউল-বাউল কবিদের প্রতি তাঁর সহস্র শ্রদ্ধা নিম্নোক্ত পঙ্ক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন–

আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।।

উপসংহার : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নের রচনায় বাস্তবজীবন ও সাধারণ মানুষদের প্রতি যে মমত্ববোধ প্রকাশ করেছেন, 'ঐকতান' কবিতাটি তাঁর সেই আত্মদর্শনেরই ফসল। জীবনের শেষপ্রান্তে তিনি তাঁর রচনায় জগৎ ও জীবনবোধের অনুপস্থিতি দারুণভাবে উপলব্ধি করে লৌকিক কবিদের প্রতি তাঁর কাব্যের পূর্ণতা আনয়নের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি সহস্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন সে সকল মাটিঘেঁষা নবীন কবিদের প্রতি যারা জীবনঘনিষ্ঠ, বাস্তব এবং সাধারণদের নিয়ে কাব্য রচনা করেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ ও সার্থক।

▸▸ প্রশ্ন : ২২ ॥ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ঐকতান' কবিতার শিল্পমূল্য বিচার কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঐকতান' কবিতাটি মূলত আত্মবিশ্লেষণ ও স্বীয় শিল্পকর্মের মূল্যায়নধর্মী অনবদ্য রচনা। এ কবিতায় রবীন্দ্র-মানসের বিচিত্র দিক উন্মোচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনসায়াহ্নে উপনীত হয়ে স্বীয় মানসলোকে তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন এবং সমাজজীবনে নিজের শিল্পকর্মের বিশ্লেষণ করেন। তিনি কবিতাটিতে আত্মমূল্যায়নের বাণী যেভাবে উপমা প্রয়োগে ফুটিয়ে তুলেছেন তা বিস্ময়কর। এক অপূর্ব সুরের মালায় বীণার ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হয়েছে। আর অন্তর্নিহিত ভাব বিন্যাসে যে শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত। নিচে প্রশ্নালোকে এর বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

'ঐকতান' কবিতার শিল্পমূল্য

রবীন্দ্র প্রতিভার শৈল্পিক দক্ষতা : কবি নিসর্গজাত সৌন্দর্যের কল্পমূর্তির আকর্ষণে অধীর হয়ে মানব মন ও আত্মার টানে এক ঐকতানের জয়গান করেছেন। কবি অতৃপ্তির ছোবলে জীবনসায়াহ্নে বাস্তবতার কাছে ফিরে গেছেন। বিষয়বৈচিত্র্য, সমাজমুখিতায়, নিজ মানসের নিপুণ বিশ্লেষণে কবির শৈল্পিক প্রতিভার অপূর্ব প্রকাশ ঘটে।

ঐকতানের শিল্পশৈলী : একটি কবিতার ছন্দ, শব্দচয়ন ও ভাবগাম্ভীর্য পরস্পর একত্রিত হয়ে অবিচ্ছেদ্য শিল্পকর্মে উত্তীর্ণ হলে কবিতা সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়। সুর ও ভাষা একদেহে লীন হয়ে সৃষ্টি করে এক স্বপ্নিল পরিবেশ ও মনোমুগ্ধকর মানসচিত্র। তাই কবি Shelley বলেছেন–

"Music when soft voices die
Vibrates in the memory".

কবিতার ছান্দিক ঝঙ্কার ও কাঁকনের রিনিঝিনি হয়ে পাঠক–হৃদয়ে চির জাগরূক হয়ে থাকে। অপূর্ব কল্পনা আর অপরূপ উপমা বিন্যাসে তাঁর কাব্য পাঠকচিত্তে প্রচণ্ড ঝঙ্কার তোলে। যেমন কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে–

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি–"

জীবনবোধ ও বিষয়ের শৈল্পিকতা : 'ঐকতান' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের গভীর জীবনবোধ শৈল্পিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে। একটি দার্শনিক প্রত্যয় সর্বদাই কবিসত্তার শিল্পচৈতন্যকে জাগ্রত রেখেছিল। রূপক, প্রতীক আর উপমার ব্যবহার কবির সেই জীবনবোধ ও জীবনদৃষ্টির পরিচায়ক। আর সর্বোপরি কবিতাটি ভাষার বিন্যাসে শৈল্পিক সুষমামণ্ডিত হয়েছে। নিচের চরণদ্বয়ই তার প্রমাণ বহন করে–

"জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে, কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

শব্দচয়ন ও অলঙ্কারের প্রয়োগ : শব্দ চয়ন ও গাঁথুনি কবিতার শিল্প সার্থকতার জন্য একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। 'ঐকতান' কবিতায় কবি চিত্রময়ী বর্ণনা, অক্ষয় উৎসাহ, নিঃশব্দ নীলিমা, অবজ্ঞার তাপ, শৌখিন মজুরদারি ইত্যাদি শব্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ করে তাঁর শিল্প দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে।

বিষয়ের আবেদন : যারা অক্লান্ত শ্রমে সভ্যতা গড়েছেন কবি সামাজিক বাধার কারণে তাদের কথা তাঁর সাহিত্যে স্থান দিতে পারেননি। অহমিকায় মেহনতি মানুষের সাথে

আত্মীয়তার বাঁধন গড়ে তুলতে কবি ব্যর্থ হয়েছিলেন। অপূর্ব সুরের ভঙ্গিমায় কবি তা নিপুণ শিল্পীর তুলিতে ফুটিয়ে তুলেছেন–

"বিশাল বিশ্বের আয়োজন!
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।"

কবি তাঁর অক্ষমতাকে নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

"এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।"

চূড়ান্ত বিচার : 'ঐকতান' কবিতাটি কবির বিরল অলঙ্কার আর এক স্বল্পতম ভাষণের গভীর আলেখ্য। এ কবিতায় আত্মদর্শন, আত্মমূল্যায়ন, দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীরতম দর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বক্তব্যের গাম্ভীর্য প্রাধান্য পেয়েছে এই কবিতায়। অস্পষ্টতার ছাপ নেই বললেই চলে। প্রখর দৃষ্টি ও সংযত আবেগ দ্বারা কবিতাটির বক্তব্যের বাণী রূপায়িত হয়েছে। যেমন কবির ভাষায়–

"মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"

উপসংহার : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর Art for art's sake অর্থাৎ 'শিল্পের জন্য শিল্প' –একথা গভীর মানবিকবোধ ও বাস্তব জীবনচিত্র থেকে উপলব্ধি করেছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের 'ঐকতান' কবিতাটির শিল্পমূল্য অনেক উঁচুমানের।

মোহররম

কাজী নজরুল ইসলাম [১৮৯৯–১৯৭৬ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ২৩ ॥ 'মোহররম' কবিতায় যে হৃদয় বিদারক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১৬]

অথবা, 'মোহররম' কবিতায় যে হৃদয়বিদারক কাহিনির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ১৯৯১, '৯৭]

অথবা, "নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া–"

যে করুণ ও শোকাবহ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলাম পঙ্‌ক্তি দুটির অবতারণা করেছেন তা 'মোহররম' কবিতা অবলম্বনে বিবৃত কর।

অথবা, 'মোহররম' কবিতা অবলম্বনে কারবালার বিষাদময় ঘটনার ইতিবৃত্ত রচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি, বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিদ্রোহী কবি ও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'মোহররম' কবিতায় কারবালার মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক ঘটনা এবং মোহররমের তাৎপর্য ও শিক্ষা চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

কারবালার করুণ উপাখ্যান : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর মোতাবেক ৬০ হিজরীর ১০ মোহররম। এদিন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (স)-এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা) পাষণ্ড সীমারের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনা : মহানবি (স)-এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে খলিফা নির্বাচিত হন হযরত আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং আলী (রা)। ওসমান হত্যার পর আলী ও

মুয়াবিয়ার (রা)-এর মধ্যে খেলাফত নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। হযরত আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া (রা) মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র খলিফা হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র ইয়াজিদকে খেলাফতের উত্তরসূরি নির্বাচিত করে যান। এর ফলে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থার বিলোপ ঘটে। সূচনা হয় রাজতন্ত্রের। দুশ্চরিত্রবান হওয়ার কারণে সাধারণ জনগণ ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে মক্কা মদিনার মুসলমানগণ হযরত আলীর পুত্র ইমাম হোসাইনকে খলিফা নিযুক্ত করে তাঁর নিকট খেলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত হোসাইন (রা) খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন শুনে ইয়াজিদ ক্ষেপে গিয়ে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়।

কুফাবাসীর আমন্ত্রণ : এদিকে কুফার শাসনকর্তা এবং অধিবাসীরাও ইমাম হোসাইনের আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁকে কুফায় আমন্ত্রণ জানায়। তিনি মদিনা থেকে কুফার পথে যাত্রা শুরু করেন, কিন্তু কুফার বিশ্বাসঘাতক শাসনকর্তা তখন ইয়াজিদের পক্ষ নেয়।

কারবালার প্রান্তরে : ভুল পথনির্দেশনায় ইমাম হোসাইন (রা) কুফার পরিবর্তে কারবালা প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হন। কারবালার একপাশে গভীর অরণ্য, অন্য পাশে ধু-ধু মরুভূমি এবং জনমানবহীন পরিবেশ। কবির ভাষায়–

'হায় হায় হোসেনা,' ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়,
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদেরো পঞ্জায়।

ইয়াজিদবাহিনীর মুখোমুখি : ইয়াজিদ বাহিনী আগে থেকেই কারবালায় অবস্থান করছিল। তারা হোসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের নতিস্বীকারে বাধ্য করার জন্য ফোরাত নদীর কূল দখল করে রাখে।

কাসেমের রণে যাত্রা : মা ফাতেমা তাঁর ছেলে ও আত্মীয়স্বজনদের শোকাবহ ঘটনা দেখে আলুলায়িত কেশে আসমান পানে মুখ তুলে বিলাপ করতে থাকেন।

সদ্য বিবাহিত কাসেম আর স্থির থাকতে পারেন না। তিনিও ছুটে যান রণে। কবির ভাষায়–

রণে যায় কাসিম ঐ দু'ঘড়ির নওশা,
মেহেদীর রঙটুকু মুছে গেল সহসা।

সকিনার বৈধব্য : কাসেম যুদ্ধে গিয়ে বীরের মতো শহীদ হন। দু'ঘড়ি আগে কাসেম বিয়ে করেছিল সকিনাকে। সে সকিনা এখন বিধবা। কবির ভাষায়–

কাঁদে কে রে কোলে ক'রে কাসিমের কাটা-শির।
খান খান খুন হ'য়ে ক্ষরে বুক-ফাটা নীর।

কারবালায় শিশুদের অবস্থা : কারবালায় তীব্র পানির সংকটে শিশুদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে কাজী নজরুল বলেন–

গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা
"আম্মা গো, পানি দাও, ফেটে গেল ছাতি, মা।"

সম্মুখযুদ্ধ : নতিস্বীকার করলেন না ইমাম হোসাইন (রা) এবং তাঁর সঙ্গী সাথিগণ। তাঁদের দৃঢ়চিত্তের পরিচয় তুলে ধরে কবি বলেন–

দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!"

এভাবেই ইমাম হোসাইন (রা) তাঁর যৎসামান্য শক্তি নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থায় ইমাম হোসাইনের অনুচরগণ একে একে শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন। এরপর ইমাম হোসাইন নিজেই শত্রুসেনার মুখোমুখি হন এবং

বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে ফোরাতকূল মুক্ত করেন। আঁজলা ভরে পানি পান করতে গিয়ে তাঁর মনে পড়ে শিশুপুত্র আসগরের কথা। অঞ্জলি হতে পানি পড়ে গেল তাঁর। কবির ভাষায়–

অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল, ঝর্‌ঝর্‌,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!

হোসাইনের শাহাদাতবরণ : পানি পানের সুযোগ গ্রহণ করে সীমার তীর বিদ্ধ করল হযরত ইমাম হোসাইন (রা)-কে। ইমাম হোসাইন পড়ে গেলে তাঁর বুকে চেপে বসে শিরচ্ছেদ করে নেয় পাষণ্ড সীমার।

শোকাচ্ছন্ন প্রকৃতি : ইমাম হোসাইন শাহাদাতবরণ করলেন। প্রকৃতিও এ নিদারুণ ঘটনায় শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। পৃথিবী নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত। কবি এর বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে–

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?–
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।
আসমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপুরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে!

এভাবে ইমাম হোসাইনের মৃত্যুতে সমগ্র প্রকৃতি কেঁপে উঠল, মুহ্যমান হলো অবর্ণনীয় শোকে। বিশ্বের সর্বত্র ধ্বনিত হতে লাগল হায় হোসাইন হায় হোসাইন! স্বরে করুণ আর্তি। কবির ভাষায়–

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,–
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"

উপসংহার : গণতন্ত্রের পক্ষে, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেন ইমাম হোসাইন (রা)। বেদনাঘন পরিবেশ সৃষ্টি ও ভাষার অপূর্ব কারুকাজে 'মোহররম' কবিতায় কারবালার সেই বিষাদময় ঘটনার ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন কবি।

▸▸ প্রশ্ন : ২৪ ॥ "ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না"– এ উক্তির তাৎপর্য আলোচনা কর।

[ফা. প. ১৯৯৫, '৯৯, '০৪]

অথবা, 'মোহররম' কবিতায় কবি 'ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না' কেন বলেছেন? এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

অথবা, মোহররমের শোক-স্মৃতির প্রেরণায় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কী কর্তব্য স্থির করেছেন? তা 'মোহররম' কবিতার আলোকে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের অমর প্রতিভা, বিদ্রোহী কবি এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের একটি প্রেরণাদায়ক কবিতা 'মোহররম'। এ কবিতায় কবি মোহররমে সংঘটিত কারবালা প্রান্তরের শোকাবহ ঘটনার করুণ আলেখ্য বিনির্মাণের পাশাপাশি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে জীবনবাজির প্রেরণা দিয়েছেন। একই সাথে মোহররমের শোকস্মৃতিকে প্রেরণা হিসেবে তুলে ধরে মুসলিম জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছেন।

কারবালার শোকস্মৃতি : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর মোতাবেক ৬০ হিজরীর ১০ মোহররম। এদিন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদরের দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা) ও তার অনেক সঙ্গী-সাথিসহ ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর এক পাষণ্ড সীমারের হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন ইমাম হোসাইনের সঙ্গী- সাথিগণ। ইয়াজিদ বাহিনীর অত্যাচারের মুখেও নতিস্বীকার করলেন না হোসাইন বাহিনী, বরং তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন সম্মুখযুদ্ধে লড়বার। কবির ভাষায়–

দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা!"

এভাবে স্বল্পশক্তি নিয়ে বীরত্বের সাথে লড়েন ইমাম হোসাইন। অবশেষে কারবালার প্রান্তরে ফোরাতের তীরে ইয়াজিদের এক নরাধম সৈন্য সীমারের হাতে শাহাদাতবরণ করেন তিনি। কবি সে ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্তরূপে–

নীল সিয়া আসমান, লালে লাল দুনিয়া,–
"আম্মা! লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"

নীল আকাশ যেন হোসাইনের রক্তে রঞ্জিত। কারবালার ফোরাত প্রান্তরে যেন কোনো ক্রন্দসী আকুলভাবে কাঁদছে। সে কাঁদনে সীমারের ছোরাতেও অশ্রু ঝরে। কবির ভাষায়–

কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।

মুসলমানদের ক্রন্দন : কারবালা প্রান্তরে একমাত্র শিশু জয়নাল ছাড়া নবি পরিবারের সব পুরুষই শহীদ হন। মুসলমানরা আজ সেই শোকাবহ ঘটনা এবং অভিভাবকহীন, অসহায় জয়নাল আবেদীনের স্মৃতি স্মরণ করে কেবল অশ্রু ঝরায়।

কবির আহ্বান : এ পরিস্থিতিতে কবি আহ্বান জানিয়েছেন–

ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

আমাদের কর্তব্য/মোহররমের শিক্ষা : মোহররমের শোকস্মৃতি প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়েই চির জাগরূক। ১০ মোহররম এলে কোনো কোনো মুসলিম সম্প্রদায় রুদ্র মাতমের মাধ্যমে এক ধরনের করুণ মর্সিয়া (শোকগীতি) গেয়ে শোক পালন করেন। কবি এটাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কারণ ইসলামে কখনো আবেগের স্থান যুক্তির উর্ধ্বে নয়। তাই তিনি বলেন, মোহররমের শোক থেকে শক্তি অর্জন করতে হবে। মোহররমের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আত্মত্যাগের মাধ্যমে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হবে। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা থেকে আমাদের আরো শিক্ষা নিতে হবে– বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার। ইমাম হোসাইন যেমন প্রতিবাদী হয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে–

উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।

কবি আরো আহ্বান করেছেন–

জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক,
শহীদের দিনে সব লালে-লাল হয়ে যাক।

মোহররমের পবিত্র শিক্ষা নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের জীবনবাজি রাখতে হবে, প্রয়োজনে নিজের বংশধরদেরও কুরবানি দিতে হবে আসগরের মতো, মাতা-কন্যাকে প্রয়োজনে বিধবার বেশ পরাতে হবে, তবু যেন সত্যেরই জয় হয়। আঁধার শেষে যেন মুক্তির সোনালি সকালের আগমন ঘটে।

উপসংহার : মোহররম আমাদের শোক ও আত্মদহনের স্মৃতি। তথাপি মোহররমের ত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবন-সংগ্রামে জয়ী হতে হবে। এ শোকে মাতম না করে; বরং প্রয়োজনে জীবন দিয়ে হলেও বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

প্রশ্ন : ২৫ ॥ কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'মোহররম' কবিতার নামকরণের সার্থকতা লেখ।

অথবা, 'মোহররম' কবিতার নামকরণ কতটা যুক্তিসংগত তা বিচার কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : নামকরণ সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব অনেকাংশই ফুটে ওঠে। এজন্য কবি সাহিত্যিকগণ নামকরণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। মনীষী Cavendis-এর মতে, A beautiful name is better than a lot of wealth. অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। নামকরণে কবি সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আলোচ্য কবিতার নামকরণ করা হয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে। নিচে 'মোহররম' কবিতার নামকরণের সার্থকতা উপস্থাপন করা হলো :

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- নায়ক-নায়িকার নাম
- স্থান বা কাল
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- রচনার মূলভাব।

নামকরণের তাৎপর্য : কারবালার মর্মবিদারক কাহিনিই 'মোহররম' কবিতার মূল উপজীব্য। এ কবিতায় পাষণ্ড ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী কর্তৃক কারবালার মরুপ্রান্তর অবরুদ্ধ হওয়া, পার্শ্ব-প্রবাহিত ফোরাত নদীর পানিবঞ্চিত হযরত ইমাম হোসেনের পরিবার-পরিজন ও সাথিদের নিদারুণ মৃত্যুবরণ, নববিবাহিত তরুণ কাসিমের প্রাণদান এবং স্বয়ং ইমাম হোসেনের মর্মান্তিক শাহাদাতবরণের করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।

'মোহররম' কবিতায় কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মৃতির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে এভাবে–

নীল সিয়া আস্‌মান, লালে লাল দুনিয়া,–
"আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।

অথবা,

দাউ দাউ জ্বলে শিরে কারবালা–ভাস্কর,
কাঁদে বানু–"পানি দাও, মরে জাদু আসগর"
পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা, –"পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্।"

কবি এভাবে 'মোহররম' কবিতায় বিয়োগান্ত ঘটনার বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন, যা কারুণ্যের নির্ঝর হয়ে উঠেছে। যখন ইমাম হোসেনের–

অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল ঝর্‌ঝর্
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর!

হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে ব'সে ছাতিতে?
আফ্‌তাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে।

তবে কবি মোহররমের স্মৃতিরোমন্থন ও অশ্রু বিসর্জনের মধ্যেই কবিতাটিকে শেষ করেননি; বরং কবি মোহররমের শিক্ষাকে জাতির সামনে তুলে ধরে তাদেরকে এর আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। স্বাধীনতা ও সত্য ন্যায়ের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার মধ্যেই মোহররমের বৈপ্লবিক তাৎপর্য নিহিত। যেমন কবি বলেন–

ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।
....
আস্‌গর সম দিব বাচ্চারে কোরবান,
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান্‌
সকীনার শ্বেত বাস দেবো মাতা-কন্যায়
কাসিমের মত দেবো জান্‌-রুধি' অন্যায়।

নামকরণের সার্থকতা : মোহররমে যে রক্ত ঝরেছে তা যেন কোনো মরু সূর্য চুষে নিতে না পারে, কবি সেই কামনাই ব্যক্ত করেছেন। 'মোহররম' কবিতায় কারবালার সেই ঐতিহাসিক হৃদয় বিদারক ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মোহররমের তাৎপর্য অর্থাৎ সত্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের আদর্শের কথাও বলা হয়েছে, যা একালেও মানবজাতির জন্য অনুপ্রেরণাদাত্রী। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'মোহররম' কবিতার নামকরণ যথার্থ সার্থক ও সফল হয়েছে।

উপসংহার : উপর্যুক্ত আলোচনার শেষে বলা যায়, কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের প্রতি লক্ষ রেখে আলোচ্য কবিতার 'মোহররম' নামকরণ শুধু সার্থকই নয়; বরং অর্থবহ ও শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে। তিনি তাঁর এ কবিতায় অন্তর্নিহিত ভাববিন্যাসে যে শিল্পচাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য।

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ [১৮৯৯–১৯৫৪ খ্রি.]

» প্রশ্ন : ২৬ ॥ কবি জীবনানন্দ দাশ রচিত 'বনলতা সেন' কবিতার মূলভাব/ মূল সুর/ মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।
অথবা, জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' কবিতার ভাবার্থ/ সারাংশ/ সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যের ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিদের পথিকৃৎ এবং রূপসী বাংলার কবি। তাঁর রচিত 'বনলতা সেন' একটি অনিন্দ্যসুন্দর রোমান্টিক প্রেমের কবিতা। কবির মানসপ্রতিমা বনলতা সেনের সৌন্দর্য অনবদ্য। শব্দ চয়ন, ছন্দ কৌশল, উপমা প্রয়োগ এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের দুর্লভ সমন্বয়ে তাঁর এ কবিতা এক অনন্য রূপ লাবণ্যে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। এ কবিতার মাধ্যমে তিনি মানবহৃদয়ের প্রেমানুভূতি আর নারীর চিরায়ত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের এক অনুপম বর্ণনা তুলে ধরেছেন।

'বনলতা সেন' কবিতার মূল সুর : কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায় যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তা সমগ্র পুরুষজাতির অনুভূতিকে একত্রিত করেছে।

শ্রমক্লান্ত মানুষ (পুরুষ) প্রতিনিয়ত শান্তির অন্বেষণ করে। কাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ফেরে, কিন্তু শান্তির সন্ধান সে পায় না। অনন্তকালের পথপরিক্রমায় কবির জীবনে যেসব অশান্তি সমুদ্রের সফেন হয়ে জমেছিল, তা আজ তাঁর মানস-প্রতিমা রূপসী-প্রেয়সী নারী বনলতা সেনের ভালোবাসার পরম স্পর্শে নির্মল হয়ে ওঠে।

প্রকৃতি ও মানবীয় মেলবন্ধন : 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেন এখানে নারীসত্তারূপে, কবির মানস প্রিয়তমারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর হাজারো পথ অতিক্রম করে কবি যখন ক্লান্ত, ইতিহাসের কোনো সভ্যতাই যখন কবিকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি, তখন প্রকৃতি-সংলগ্নতাই কবিকে এনে দিয়েছে শান্তি-সুখের সন্ধান। ফলে সেই প্রকৃতিকে মানবীরূপ দিয়ে তার জন্য রচনা করেন স্তুতি গান, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার প্রয়াসে খুঁজে ফেরেন নির্জনতা, কাটান অপেক্ষার দীর্ঘপ্রহর। যেমন তিনি উচ্চারণ করেন–

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,

ইতিহাস চেতনা : 'বনলতা সেন' কবিতায় কবির ইতিহাস চেতনা দৃঢ় প্রত্যয়ীপূর্ণ। বনলতা সেনের বর্ণনায় তিনি 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' উপনীত হয়েছেন। শ্রাবস্তীর কারুকাজে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন। দারুচিনি দ্বীপ, সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে। তরীর হাল ভেঙে যে নাবিক দিগভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ দ্বীপের সন্ধান পেয়ে উজ্জ্বল আলোক চোখে ধারণ করে বলে ওঠেন–

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর

কবির মানসপ্রতিমা : 'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেন কবির মানস-প্রতিমা এবং কবি যেন সমগ্র মানব জাতির অংশ। বনলতা সেন চিরকালের প্রেমময়ী নারীর এক আশ্চর্য মনোহর প্রতিমা। প্রাণের অকৃপণ ঐশ্বর্যে সে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। তাই বনলতা সেন এক মুহূর্তের মধ্যেই সঞ্জীবিত করে তোলে হাজার বছরের ক্লান্তিতে জর্জর পুরুষসত্তাকে। কবির ভাষায়–

অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে।

মানসপ্রতিমার আশ্রয় : কবি দারুচিনি দ্বীপ, সিংহল সমুদ্র ও রাতের অন্ধকার পেরিয়ে মালয় পর্যন্ত ঘুরেছেন। হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতা যখন ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে সংসার সমুদ্রের অস্থিরতায় তোলপাড় করছিল, তখনই কবি দেখা পান আরাধ্য সেই প্রশান্তির আশ্রয় বনলতা সেনের। তার আশ্রয় লাভ করে তিনি পরিতৃপ্তি প্রকাশ করেন। যেমন কবির ভাষায়–

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

মানসপ্রতিমার সৌন্দর্য : কবির মানসপ্রতিমা বনলতা সেন অনবদ্য সৌন্দর্যের অধিকারী। তার চুল প্রাচীনকালের মালয় দেশের বিদিশা নগরীর অন্ধকারের মতো কালো। তার মুখে শ্রাবস্তীর কারুকার্য শোভা পায়। সমুদ্রে হালভাঙা পথহারা হতাশ নাবিক যেমন হঠাৎ সবুজাভ ঘাসের দেশে দারুচিনি দ্বীপের সন্ধান পেয়ে আশান্বিত হয়, তেমনি কবিও তাঁর মানস-প্রতিমা বনলতা সেনের সান্নিধ্য পেয়ে এক নতুন পথের দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। পরম মমতায় চোখ তুলে সে কবিকে বলেছে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

প্রেম ও সৌন্দর্য : 'বনলতা সেন' প্রেম ও সৌন্দর্যের মেলবন্ধন। এখানে যুগ-যুগান্তরের পথচারী পুরুষসত্তা খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত এক নারী সত্তাকে। সেই শাশ্বত নারী প্রেম ও সৌন্দর্যের অনিঃশেষ দীপ্তিতে মহীয়সী। তার সান্নিধ্য পাওয়া যে-কোনো পুরুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় বটে। কবি সেই সৌভাগ্যবান পুরুষদেরই একজন।

মানসপ্রতিমার পরম শান্তির সন্ধান লাভ : দিনের শেষে নিঃশব্দ চরণে সন্ধ্যা নামে। দিনের সকল কোলাহল থেমে যায়। শিশিরের পতন বৃষ্টির মতো মৃদু শব্দ করে, চিলের ডানায় রোদের গন্ধ মুছে যায়, মুছে যায় পৃথিবীর সব রং, চারদিকে নেমে আসে ধূসরতা। পৃথিবীর সব আলো তখন দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। জোনাকিরা আলো ঝিলমিল করে নতুন গল্পকাহিনি রচনার জন্য পাণ্ডুলিপির আয়োজন করে। আরম্ভ হয় সময়ের নতুন পর্যায়। পাখিরা তাদের খুঁজে বেড়ায়। স্তব্ধ হয়ে যায় নদীতীরের গুঞ্জন। তাই কবি বলেন–

সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী– ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

উপসংহার : 'বনলতা সেন' কবি জীবনানন্দ দাশের অসাধারণ রোমান্টিক মানসের এক অনন্য সৃষ্টি, যা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। এ কবিতার মধ্য দিয়ে নাটোর নামক নির্দিষ্ট এলাকা ও 'বনলতা সেন' নামক এক অপরূপ নারীর বর্ণনার মিলন ঘটানো হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ এ কবিতায় ক্লান্ত পরিশ্রান্ত এক প্রেমিক আর বনলতা সেন তার মানসপ্রতিমা। বাংলার সবুজ শ্যামল নৈসর্গিক আর সুগভীর ইতিহাস চেতনার সংমিশ্রণে 'বনলতা সেন' যেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের উজ্জ্বল সম্পদ।

▸▸ প্রশ্ন : ২৭ ॥ "কবি জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতায় নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় দিয়েছেন।"– বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১৯]

অথবা, "কবি জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতায় নারীকে সৌন্দর্যের প্রতীক বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর স্বদেশের রূপ বর্ণনা করেছেন।"–বিশ্লেষণ কর।

অথবা, "কবি জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতায় নারী ও প্রকৃতি প্রেমের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন"– যুক্তির আলোকে প্রমাণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'বনলতা সেন' কবিতাটি স্বদেশ ও প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশের অনবদ্য সৃষ্টি। এ কবিতায় নারীর চিরাচরিত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মহিমাকীর্তন করা হলেও নারীর সৌন্দর্য ও প্রকৃতির মধ্য দিয়ে রূপকভাবে লাল-সবুজ বাংলার রূপ-প্রকৃতির বর্ণনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমেরও পরিচয় দিয়েছেন রূপসী বাংলার এই কবি। কবি তার স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

বাংলার প্রকৃতিতে ইতিহাস : 'বনলতা সেন' কবিতায় কবির ইতিহাস-চেতনা দৃঢ় প্রত্যয়ীপূর্ণ। বনলতা সেনের বর্ণনায় তিনি 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে' উপনীত হয়েছেন। শ্রাবস্তীর কারুকাজে আত্মতৃপ্তি পেয়েছেন। দারুচিনি দ্বীপ, সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর তাঁর চোখে ভেসে উঠেছে। তরীর হাল ভেঙে যে নাবিক দিগভ্রান্ত হয়ে হঠাৎ দ্বীপের সন্ধান পেয়ে উজ্জ্বল আলোক চোখে ধারণ করে বলে ওঠেন–

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর।

প্রেমানুভূতিতে রূপসী বাংলা : প্রেমের শাশ্বত অনুভূতির স্পন্দনে কবিতাটি সমৃদ্ধ। আর প্রেমানুভূতির সাথে চমৎকারভাবে মিশে আছে কবির প্রকৃতিগত চেতনা। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য ব্যতীত প্রেম কখনো পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। কবি প্রেমকে পরিপূর্ণতা দানের লক্ষ্যে ইতিহাস ও ভূগোলাশ্রয়ী প্রকৃতি এবং নিসর্গকে টেনে এনেছেন তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায়, যা কবির উক্তিতে প্রকাশ পায়–

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

বাঙালি নারীহৃদয়ের অব্যক্ত ভালোলাগা : প্রকৃতিগতভাবে পৃথিবীতে প্রেম-ভালোবাসা নারী ও পুরুষকে ঘিরে আবর্তিত হয়। পুরুষ যেমন নারীকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত, তেমনি নারীও তার স্বপ্নপুরুষকে কামনা করে হৃদয় আলোড়িত করে। একদিন হঠাৎ করে তার স্বপ্নপুরুষটি সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তার বিস্ময়ের বাঁধ ভেঙে যায়। প্রেমপিয়াসী নারীর হৃদয় তখন অব্যক্ত ভালোবাসায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কবিকে দেখে বনলতা সেনের বিস্ময়মাখা আবেগাপ্লুত প্রশ্ন– 'এতদিন কোথায় ছিলেন' বাঙালি নারীর যথার্থতার পরিচয় দেয় এবং এভাবেই বনলতা সেন চরিত্রের মাধ্যমে কবি নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন–

বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

নারীসৌন্দর্যে বাংলার রূপ : প্রেম-ভালোবাসার ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান এবং তার দেহ-মনের সৌন্দর্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। কবির মানস-প্রতিমা বনলতা সেনের সৌন্দর্যে নিসর্গের স্নিগ্ধতা ও প্রকৃতির নিষ্কলুষতার ছোঁয়া সুস্পষ্ট। কবি নারীর সৌন্দর্যকে ইতিহাস-ঐতিহ্যঘনিষ্ঠ বলেই বিবেচনা করেছেন। হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন নগরী বিদিশার অন্ধকারকে কবি প্রেয়সীর ঘন কালো চুলের সৌন্দর্যের সাথে তুলনা করেছেন। অপরূপ প্রাচীন মূর্তি শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সাথে নিখুঁত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন বাংলার বনলতা সেনের মুখাবয়বের। এ নিখুঁত সৌন্দর্যের আড়ালে নারীর আসল সৌন্দর্য তাঁর হৃদয় ও মনে ধরা দিয়েছে পাখির নীড়ের মতো শান্তির নীড় হিসেবে। যে সৌন্দর্যের গভীরেও রয়েছে বাংলার বৈচিত্র্যময় প্রকৃতি। কবির ভাষায়–

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

প্রকৃতি ও নারীসৌন্দর্যে স্বদেশ : সৌন্দর্যবোধ থেকেই প্রেমের সৃষ্টি। জীবনানন্দ দাশ নারীর সৌন্দর্যের যে বোধ জাগ্রত করেছেন তা তাঁর একান্ত মানসকামনা। 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি তার স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতি চেতনা নারী চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। কবিতায় সবুজ ঘাস, সমুদ্র সফেন, ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ, রৌদ্রের গন্ধ, ধূসর জগৎ, পাখির নীড়, বিদিশার রাত, শিশিরের শব্দ, বাংলার চির চেনা চিল ইত্যাদির মাধ্যমে কবি নিজ জন্মভূমির প্রকৃতি ও সৌন্দর্যকে নারীর সৌন্দর্যে রূপ দিয়ে তার প্রকৃত স্বদেশপ্রেম তুলে ধরেছেন। তাই কবি কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত করেন–

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল।

রূপসী বাংলায় প্রেমের অমরত্ব : বিশ্বজগতের গতিশীল ও পরিবর্তনশীল জীবনধারায় টিকে আছে মানুষের প্রেম ও ভালোবাসা। প্রেমের অমরত্বের কারণেই নারী-পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্য দিয়ে জীবনের গতিধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সবকিছু নিঃশেষ হওয়ার পরও প্রেম ও ভালোবাসা বেঁচে থাকে অনন্তকাল। সৌন্দর্যবোধের মধ্য দিয়ে এ প্রেমের জাগরণ। আর নারী এ সৌন্দর্যেরই অন্যতম প্রতীক। যে সৌন্দর্যের আভায় প্রকৃতি সিক্ত হয়। সিক্ততায় ফুটে ওঠে দেশ-কালের ইতিহাস। প্রেমার্তি নিয়ে মুখোমুখি বসে থাকে নারী আর

পুরুষ। কবিও বনলতা সেনকে নিয়ে প্রেমের এ চিরন্তন বাণী প্রচার করেছেন–

সব পাখি ঘরে আসে– সব নদী–ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

বনলতা সেনের মধ্যে কবি বাংলার প্রকৃতির যে সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন, সে সৌন্দর্যকে সমালোচকগণ মূলত তার স্বদেশপ্রেমের চেতনায় ব্যক্ত করেছেন। এখানে নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা তার স্বদেশপ্রেমেরই পরিচায়ক।

উপসংহার : 'বনলতা সেন' কবিতাটি কবির প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বিত রূপ। এটি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। পুরুষ সত্তা এখানে খুঁজে পেয়েছে শাশ্বত নারী সত্তাকে। প্রেম ও সৌন্দর্যের অনিঃশেষ দীপ্তিতে মহীয়ান হয়ে উঠেছে সেই শাশ্বত নারী, যাকে পাওয়া যে-কোনো পুরুষের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। কবি সেই সৌভাগ্যবানদের একজন হয়ে নারী চরিত্র, ইতিহাস এবং প্রকৃতির সৌন্দর্যের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বদেশপ্রেমের অকৃত্রিম পরিচয় দিয়েছেন।

⏩ প্রশ্ন : ২৮ ॥ 'বনলতা সেন' কবিতার মূলভাব ও কাব্যসৌন্দর্য বিচার কর। [ফা. প. ২০০৮]
অথবা, 'বনলতা সেন' একটি অসামান্য আধুনিক বাংলা কবিতা – উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।
অথবা, কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ কর।
অথবা, কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার বিশিষ্টতা নিরূপণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য আধুনিক কবি জীবনানন্দ দাশের এক অনন্য সৃষ্টি। ত্রিশোত্তর কবি হিসেবে আধুনিক কাব্যরীতি আর স্বদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রেরণা জীবনানন্দ দাশকে বাংলা কাব্যে একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্ধারণ করে দেয়। তাঁর সেই স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ হলো বনলতা সেন। গভীর প্রেমানুভূতি, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, ইতিহাস চেতনা, উপমার প্রয়োগ, ছন্দের কারুকার্য প্রভৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এ কবিতায়।

কবিতার মূল ভাব

প্রেমানুভূতির প্রকাশ : 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ যে প্রেমানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন তা সমগ্র পুরুষ জাতির অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত মানুষ প্রতিনিয়ত শান্তির অন্বেষণ করে চলে। কাঙ্ক্ষিত শান্তির জন্য সে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ফেরে, কিন্তু শান্তির ঠিকানা সে পায় না। অনন্তকালের পথপরিক্রমায় কবিজীবনে যেসব অশান্তি সমুদ্রের সফেন হয়ে জমেছিল, তা আজ তাঁর মানসপ্রতিমা বনলতা সেনরূপী প্রেয়সী নারীর ভালোবাসার পরশ স্পর্শে নির্মল হয়ে ওঠে।

ভৌগোলিক ধারণা : 'বনলতা সেন' কবিতাটি ভৌগোলিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ, কবির বিশ্বমনস্ক বিদগ্ধজারিত ঐতিহ্যমণ্ডিত এক অনন্যধর্মী কবিতা। তিনি পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে হেঁটেছেন । তাই এ কবিতায় স্থান পেয়েছে সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর (ভারতের মধ্য-প্রদেশের বিদর রাজ্যের পূর্ব নাম), নাটোর, বিদিশা (বৌদ্ধ যুগের প্রাচীন এক সমৃদ্ধ নগরী), শ্রাবস্তী, সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ ইত্যাদি স্থানের নাম উল্লেখে কবিতাটি বৈশ্বিক রূপধারণ করেছে।

ইতিহাস চেতনা : ইতিহাস চেতনা 'বনলতা সেন' কবিতাটিকে এক স্বতন্ত্র মহিমায় মহীয়ান করে তুলেছে। কবি নিজেই বলেছেন, কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার। কবির

অস্থিমজ্জায় মিশে থাকবে ইতিহাস চেতনা, চিত্তে থাকবে পরিচ্ছন্ন কাণ্ডজ্ঞান। 'বনলতা সেন' কবিতায় তাঁর সার্থক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় এভাবে–

সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

মানসপ্রতিমার পরম শান্তির সন্ধান লাভ : দিনের শেষে নিঃশব্দ চরণে সন্ধ্যা নামে। দিনের সব কোলাহল থেমে যায়। শিশিরের পতন বৃষ্টির মতো মৃদু শব্দ করে, চিলের ডানায় রোদের গন্ধ মুছে যায়, মুছে যায় পৃথিবীর সব রং, চারদিকে নেমে আসে ধূসরতা। পৃথিবীর সব আলো তখন দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। জোনাকিরা আলো ঝিলমিল করে নতুন গল্পকাহিনি রচনার জন্য পাণ্ডুলিপির আয়োজন করে। আরম্ভ হয় সময়ের নতুন পর্যায়। পাখিরা তাদের নীড় খুঁজে বেড়ায়। স্তব্ধ হয়ে যায় নদীতীরের গুঞ্জন।

কবিতার কাব্যসৌন্দর্য

শাব্দিক সুষমা : কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতায় এমনসব শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যার জন্য একে শাব্দিক সুষমায় ভূষিত কবিতা বলে অভিহিত করা যায়। এ কবিতায় বিম্বিসা, অশোক, বিদিশা, শ্রাবস্তী ও বিদর্ভ ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার আমাদের কয়েক হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাসের সাথে পরিচিত করে তোলে। 'পাখির নীড়', 'শিশিরের শব্দ', 'ক্লান্ত প্রাণ', 'দারুচিনি দ্বীপ', 'রৌদ্রের গন্ধ', 'সবুজ ঘাস' ইত্যাদি শব্দের সমন্বিত রূপ কবিতাটিকে কাব্যিক সুধায় সমৃদ্ধ করেছে।

উপমার শৈল্পিক প্রয়োগ : আঠারো পঙ্ক্তিতে রচিত এ ছোট্ট কবিতায় কবি শব্দের যথার্থ প্রয়োগে যেমন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি উপমার শৈল্পিক বিন্যাসে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এতে তিনি অসাধারণ দক্ষতায় পাঁচটি উপমার প্রয়োগ করেছেন। বনলতা সেনকে তিনি তুলনা করেছেন অন্ধকার বিদিশা নগরীর রাতের সাথে, তার মুখকে তুলনা করেছেন শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সাথে এবং চোখকে তুলনা করেছেন পাখির নীড়ের সাথে। কবির ভাষায়–

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

আলোচ্য কবিতায় সন্ধ্যা নেমেছে শিশিরের মতো নিঃশব্দে, হাল ভাঙা দিশেহারা নাবিক স্বস্তি পেয়েছে যেমন সবুজ ঘাসে ঘেরা দারুচিনি দ্বীপ দেখে, কবির অশান্ত মনও তেমনি স্বস্তি পেয়েছে বনলতা সেনকে দেখে।

ভাব-সম্পদ : 'বনলতা সেন' কবিতাটি ভাব-সম্পদের দিক থেকে ঋদ্ধ আকর্ষণীয়। প্রেম মানবসত্তার এক শাশ্বত অনুভূতি। শাশ্বত কালের এ মধুর অনুভূতি নিয়েই গড়ে উঠেছে এ কবিতাটি। নীড়সন্ধানী পথিক হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে প্রেমের যে ব্যাকুলতা, কবি অসাধারণ শিল্প চাতুর্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি তাকে দাঁড় করিয়েছেন এক শাশ্বত কল্যাণী নারীর নীড়ের মুখোমুখি। প্রেম-প্রীতিদাত্রী এ দুই সত্তা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে প্রেমের মিষ্টি-মধুর অনুভূতি নিয়ে। এ অমূল্য ভাব-সম্পদে পরিপুষ্ট জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতাটি।

চিত্রকল্প : শৈল্পিক শব্দচয়নে সংযত 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি যে চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছেন, তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। কবি বহু ভাষণে কবিতাটিকে দীর্ঘায়িত না করে খুব অল্প কথায়, নির্বাচিত শব্দ ও উপমার ঝঙ্কারে তার ভাব প্রকাশ করেছেন। রূপক ও অলঙ্কার

প্রয়োগের স্থলে কবি নিপুণভাবে প্রতীক ও চিত্রকল্প সমৃদ্ধ করেছেন, যা বক্তব্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অধিকতর ক্রিয়াশীল। যেমন–

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর।

এ চিত্রকল্প যেন পাঠককে উপনীত করে এক মোহনীয় ব্যঞ্জনার সেই স্বপ্নময় দারুচিনি দ্বীপে। ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের এবং স্পর্শেরও বটে।

প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবহার : প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ে কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর কাব্যের ডালি পূর্ণ করেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতা প্রাকৃতিক উপাদানের অনুপম ব্যবহার ও নান্দনিক বিন্যাসে অপরূপ হয়ে উঠেছে। কবিতাটিতে পাখীর নীড়, বিদিশার রাত, শিশিরের শব্দ, দারুচিনি দ্বীপ, ঘাসের দেশ, রৌদ্রের গন্ধ, সমুদ্র সফেন, ধূসর জগৎ ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়াবলির চমৎকার সম্মিলন ঘটেছে। এছাড়া কবিতাটিতে এসেছে চিল, জোনাকি এবং নদীর প্রসঙ্গ। যার সবকটি বাংলা বা কবির স্বদেশের প্রকৃতির অংশ। সবশেষে কবিতার নামটিও প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত বনলতা অর্থাৎ বনের লতা। তাই হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত কবি যে প্রকৃতির সমগ্রতায় লীনতা প্রত্যাশী, তা সুস্পষ্ট। ফলে ভাবের সঙ্গে ভাষা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের সামঞ্জস্য এবং প্রাকৃতিক উপাদানের নিপুণ ব্যবহারে কবিতাটি হয়ে উঠেছে অনন্য।

কবিতার অনন্য ভঙ্গি : 'বনলতা সেন' জীবনানন্দ দাশের এক অসামান্য কবিতা, যা বাংলা সাহিত্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। যুগ যুগ ধরে সাহিত্য অনুরাগীদের চিত্তে এক অনাবিল ভাব-কল্পনার উদ্রেক করে চলেছে। তাঁর কবিতার অনন্যতা তাঁকে বাংলা কাব্যজগতে স্বতন্ত্র আসনে আসীন করে।

আধুনিক কবিতা হিসেবে মূল্যায়ন : প্রকৃতিপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক কবিতা। এ কবিতার ভাব, ভাষা, শব্দচয়ন, অলঙ্কার, ছন্দ সবই আধুনিক। কিন্তু আধুনিক কবিতার যে অন্যতম উপাদান দুর্বোধ্যতা ও অশ্লীলতা; তা এ কবিতায় নেই। সমিল অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় অন্ত্যানুপ্রাস বিদ্যমান। একজন শান্তিপ্রত্যাশী মানুষ সভ্যতার সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আধুনিক সভ্যজগতে পৌঁছে শান্তির অন্বেষণে বিভোর। পথ চলতে চলতে সে প্রত্যাশিত মানবীর সন্ধান পেয়েছে নাটোরে এসে। কল্পিত সে মানবীর নাম বনলতা সেন। এ বনলতা সেন সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক। কবিহৃদয়ের সুখ ও স্বস্তির জন্য প্রয়োজন বনলতা সেন-এর সান্নিধ্য। কবির অন্বেষী মনের এ ভাব ও চিন্তা আধুনিক। এ কবিতায় কবি অনন্য উপমা ব্যবহার করেছেন। অপলক চোখ বোঝাতে তিনি 'পাখির নীড়' এবং নিঃশব্দতা বোঝাতে 'শিশিরের শব্দ' ব্যবহার করেছেন। এমন সুন্দর উপমা আধুনিক কাব্য সাহিত্যে একান্তই বিরল। তাই ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার, উপমা, শব্দচয়ন, প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার– যে-কোনো দিক থেকেই 'বনলতা সেন' একটি রসোত্তীর্ণ আধুনিক কবিতা। প্রেম, সৌন্দর্য, আনন্দ, রোমান্টিক ব্যঞ্জনা আর আত্মোপলব্ধিতে কবিতাটি আধুনিক কবিতার এক অনুপম নমুনা।

উপসংহার : প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক ব্যবহারে, চিত্রকল্প নির্মাণে, ভাষা ও ছন্দের বিচিত্র প্রয়োগে, ইতিহাস চেতনার প্রবাহ সৃষ্টিতে 'বনলতা সেন' বাংলা সাহিত্যে একটি বহুমাত্রিক অসাধারণ আধুনিক কবিতা। এ কবিতার মাধ্যমে কবির ব্যক্তিমানসের রোমান্টিক অনুভূতির সার্থক প্রকাশ আর মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেমের অনিন্দ্য সৌন্দর্যের দিকটি শৈল্পিকভাবে কাব্যিক ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে।

▸▸ প্রশ্ন : ২৯ ॥ 'বনলতা সেন' কবিতায় কবি জীবনানন্দ দাশ প্রকৃতিপ্রেমের যে মানসচিত্র অঙ্কন করেছেন, তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০১২]

অথবা, "কবি জীবনানন্দ দাশ অত্যন্ত প্রকৃতি-সংলগ্ন কবি"– 'বনলতা সেন' কবিতা অবলম্বনে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী প্রতিভা। প্রকৃতিপ্রেমে বিভোর হয়ে প্রকৃতিকে উপজীব্য করে তিনি তাঁর কাব্যের ডালি পরিপূর্ণ করেছেন। প্রকৃতির সোঁদামাটি, ঘাসফুল, সমুদ্র, নদী আর সবুজ চত্বর প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের দিকে তিনি বারবার ছুটে গেছেন। তাঁর অমর সৃষ্টি 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি প্রকৃতি প্রেমের এক অনন্য মানসচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং প্রকৃতিবিনাশী সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবনের আকাঙ্ক্ষাই উচ্চকিত করেছেন।

প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপ : কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন প্রকৃতিপ্রেমিক কবি। প্রকৃতিকে খুব আপন মনে করে তিনি জীবনতরীকে সফলতার বন্দরে নিয়ে যান। প্রকৃতির মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে জীবন ও জগতের সকল অশান্তি, ক্লান্তি আর অবসাদ ভুলতে শিখেছেন তিনি। প্রাকৃতিক উপাদানকে উপজীব্য করে তিনি তাঁর কাব্যদেহকে সুষমামণ্ডিত করেছেন। 'বনলতা সেন' কবিতায় তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের অনুপম ব্যবহার ও নান্দনিক বিন্যাস করে তার প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে তিনি খুব দরদমাখা হৃদয়ে, কলমের শৈল্পিক ছোঁয়ায় নিশীথের অন্ধকার, ধূসর জগৎ, সমুদ্র সফেন, বিদিশার রাত, শ্রাবস্তীর কারুকার্য, সবুজ ঘাসের দেশ, দারুচিনি দ্বীপ, পাখির নীড়, শিশিরের শব্দ, রৌদ্রের গন্ধ, সন্ধ্যার আগমন প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানের অপূর্ব সম্মিলন ঘটিয়েছেন। এছাড়াও কবিতাটিতে এসেছে চিল, জোনাকি এবং নদীর প্রসঙ্গ, যার প্রতিটি প্রকৃতির অংশ। সবশেষে কবিতার নামটিও প্রকৃতির উপাদানে কল্পিত বনলতা, অর্থাৎ বনের লতা। তাই ভাবের সঙ্গে ভাষা, শব্দ ও উপমা প্রয়োগের সামঞ্জস্যে এবং প্রাকৃতিক উপাদানের নিপুণ ব্যবহারে কবিতাটিতে কবির প্রকৃতিপ্রেমের অনন্য স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

প্রকৃতির সমগ্রতায় লীন : 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রকৃতির সমগ্রতায় লীনতা প্রত্যাশী কবি হাজার বছর ধরে প্রকৃতির বুকের ওপর দিয়ে পথপরিক্রমায় ক্লান্ত। সিংহল সমুদ্র, মালয় সাগর, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগৎ, বিদর্ভ নগর সবখানে ঘুরেছেন তিনি, কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। অতীতের দিকে চোখ মেলেও দেখেছেন, সেখানেও কোনো শান্তি ছিল না। ইতিহাসের বিভিন্ন সভ্যতার কাছেও আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও কোনো শান্তি পাননি। অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত কবিকে প্রকৃতিই এনে দিয়েছে শান্তি-সুখ। তাই কবি প্রকৃতিকে মানবীয় রূপ দিয়ে তার জন্য রচনা করেছেন প্রশস্তি গান। কবির ভাষায়–

আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

হাজার বছরের পথপরিক্রমায় কবির 'ক্লান্তপ্রাণ' দেখছে চারদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন, এ জীবন প্রকৃতি-সংলগ্ন জীবন।

প্রকৃতির আশ্রয় : গভীর সমুদ্রে প্রকৃতির সর্বনাশা ঝড়ে হাল ভেঙে নাবিক দিশেহারা হয়ে পড়ে। অনিশ্চিত পথের যাত্রী হয়ে সে প্রকৃতির অকূল সাগরে ভাসতে থাকে। এ অবস্থায় নাবিক যখন সবুজ ঘাসের দেশ দারুচিনি দ্বীপ আবিষ্কার করে, তখন সে নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঁচার জন্য। সব হতাশা দূর করে সেই দ্বীপ তখন তার মনে শান্তি ও স্বস্তি বিলায়। প্রকৃতিরূপ নারী বনলতা সেন কবির সেই দ্বীপ, যাকে দেখে কবি শান্তি ও সুখনীড়ের আশ্রয় অনুভব করেছেন।

প্রাকৃতিক উপাদানে উপমার প্রয়োগ : প্রকৃতিপ্রেমী কবি আঠারো পঙ্ক্তিতে রচিত 'বনলতা সেন' কবিতায় পাঁচটি উপমার প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটিতে তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের শৈল্পিক ব্যবহার করেছেন। কবিতায় বনলতা সেনের চোখ উপমিত হয়েছে পাখির নীড়ের সঙ্গে, চুল বিদিশার রাতের সঙ্গে, মুখ শ্রাবস্তীর কারুকার্যের সঙ্গে, সন্ধ্যা নেমেছে শিশিরের শব্দের মতো। বনলতা সেন দেখা দিয়েছে সমুদ্রে দিশাহারা নাবিকের চোখে চারুচিনি দ্বীপের ভেতর সবুজ ঘাসের দেশের অপার শান্তি নিয়ে। এভাবে কবি উপমাতে তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের হৃদয় নিংড়ানো প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

নারী প্রকৃতিরই অপর নাম : যুগে যুগে পুরুষ তার সংকট, সমস্যা, বিক্ষুব্ধতা ও বিপর্যস্ততায় প্রকৃতির কোলে শান্তি খোঁজে। নারীই পুরুষের প্রেরণা, যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনিই পুরুষের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। কর্মক্লান্ত পুরুষ নারীপ্রেমের আঁচলে শান্তির পরশ পায়। নারীর প্রেরণা পেয়েই পুরুষ সাগর পাড়ি দেয়, পাহাড় ডিঙ্গায়। জীবনে শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা আসে নারী থেকেই। ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জটিল অশান্ত জীবনে বনলতা সেন গভীর আশ্বাসে কবির খোঁজ নিয়েছেন; বিশ্বাসে, আশ্রয়ভরা মমতায় নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছেন। এভাবে নারীর কোমল নীড়ে কবি আশ্রয় নেন। নিকষ কালো অন্ধকার বিদিশার রাতের মতো ঘন দীঘল কালো চুল, শ্রাবস্তী নগরীর ভাস্কর্যের মতো অপরূপ মুখাবয়ব নিয়ে বনলতা সেন কবিকে দিয়েছে পরম প্রশান্তি।

জীবনের সব আলো নিভে গেলে, জীবনসংগ্রামে নেতিয়ে পড়া পুরুষের জীবনে ক্লান্তি নেমে এলে নারীকে নিয়ে শান্তির নীড় রচনার নিরন্তর প্রত্যাশা রয়েই যায়। যুদ্ধোত্তর সংকটময় জীবনে কবি বনলতাকে চিত্রিত করেছেন তৃপ্তির উপাদান হিসেবে, অনাবিল ও অবর্ণনীয় শান্তির প্রতীক এবং চিরন্তন মানসপ্রতিমারূপে।

বনলতা সেন কেবল পুরুষের বিশেষ নারীরূপে মূর্ত নয়; বরং যুগ যুগান্তরের ক্লান্ত পুরুষের স্বস্তির যমীন। তার পাখির নীড়ের মতো সৌম্য শান্ত চোখে মায়ার প্রীতির অঞ্জন জীবনচলা শেষে রাতের অন্ধকারে বনলতা সেনরূপ নারীর মুখোমুখি ঠাঁই নিয়েছে। কবির সর্বৈব চপলতা শান্ত-শীতল হয়ে এসেছে। শাশ্বত পুরুষ শাশ্বত নারীর হৃদয়-যমীনে বেঁধেছে শান্তির নীড়। প্রকৃতির কোলে মুখ লুকানো আর নারীর চোখে শান্তির পরশ খোঁজা উভয়ই প্রকৃতিতে আত্মসুখ খোঁজা। এক অপরূপ মমতা আর অনন্যধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিতে কবি প্রকৃতির রূপমাধুর্য চিত্রিত করেছেন।

প্রকৃতির বিবর্ণতা : একসময় দিনের আলো নিভে যায়। ধীর পায়ে সন্ধ্যা নেমে আসে শিশিরের মতো নিঃশব্দে। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। পৃথিবীর সব রং মুছে যায়। সব পাখি ঘরে ফেরে, চারদিকে নেমে আসে ধূসরতা। এভাবে পৃথিবীর সবরকম দৃষ্টিগোচর দৃশ্য আঁধারে ঢেকে যায়। তখন জোনাকির আলো ঝিলমিল করে নতুন গল্প শুরু করে। আরম্ভ হয় সময়ের নতুন পর্যায়। রজনীর গভীরতায় পিনপতন নীরবতায় প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় এক অপূর্ব দ্যোতনা, এক অনন্য রোমান্টিক পরিবেশ।

উপসংহার : প্রকৃতির উদার আকাশের নিচে, সবুজ বিস্তীর্ণ চত্বরে, সবুজের কোলে লালিত-পালিত হন কবি জীবনানন্দ দাশ। তাই প্রকৃতিকে উপজীব্য করে তিনি নিজের কাব্যের ডালিকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রশস্তি গেয়েছেন দৃষ্টিনন্দন রূপময় প্রকৃতির লাবণ্যের। প্রেয়সীর সাথে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার জন্য খুঁজেছেন প্রকৃতির নির্জনতা। 'বনলতা সেন' কবিতার মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতি-সংলগ্নতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আলোচ্য কবিতায় অপূর্ব শব্দচয়ন, অনন্য ভাষাশৈলী, অকল্পনীয় চিত্রকল্প নির্মাণ, অনুপম উপমা প্রয়োগ ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভাবনায় কবির প্রকৃতি-প্রেমের মানসচিত্র ফুটে উঠেছে।

▸▸ প্রশ্ন : ৩০ ॥ নামকরণের সার্থকতাসহ 'বনলতা সেন' কবিতার মূল্যায়ন কর।
অথবা, 'বনলতা সেন' কবিতার নামকরণের যথার্থতা বিচার কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের অনন্য সৃষ্টি 'বনলতা সেন' কবিতাটি। গভীর প্রেমানুভূতি, ভৌগোলিক বিস্তৃতি, ইতিহাস চেতনা, উপমার প্রয়োগ, ছন্দের কারুকার্য প্রভৃতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এ কবিতায়। এ কবিতায় নারীর চিরাচরিত সৌন্দর্য ও মাধুর্যের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে। নিচে 'বনলতা সেন' কবিতার নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করা হলো :

নামকরণের রীতি : নামকরণ সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব অনেকাংশই ফুটে ওঠে। এজন্য কবি সাহিত্যিকগণ নামকরণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। মনীষী Cavendis-এর মতে, 'A beautiful name is better than a lot of wealth.' অর্থাৎ, একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। নামকরণে কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আলোচ্য কবিতার নামকরণ করা হয়েছে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে।

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন–

- রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু
- স্থান বা কাল
- রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা
- নায়ক-নায়িকার নাম
- কেন্দ্রীয় চরিত্র
- রচনার মূলভাব।

নামকরণের উপজীব্য বিষয় : ক্লান্ত-শ্রান্ত কবি হাজার বছর পথ হেঁটে কোথাও সুখ-শান্তি ও আশ্রয় পাননি। হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত কবির কাছে বনলতা সেন ছিল শেষ আশ্রয়স্থল। ফলে বনলতা সেন এখানে হয়ে উঠেছে কবির মানস-প্রিয়া। তাই বনলতা সেনের রূপ বর্ণনায় কবি হয়ে উঠেছেন উদ্বেল ও আবেগপ্রবণ। প্রাচীন ভারতের সকল ধ্রুপদী সৌন্দর্যের সমারোহে কবি তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তাঁর মানসপ্রতিমাকে। বনলতা সেনের রূপ-সৌন্দর্যের উপমায় তিনি আহরণ করেছেন প্রাচীন ভারতের বস্তুনিচয় থেকে। বনলতা সেন সুন্দরী, তার চুল ঘনকৃষ্ণ। কবি প্রাচীন বিদিশা নগরীর আঁধার রাতের সঙ্গে বনলতা সেনের চুলের তুলনা করেছেন। বনলতা সেনের চুল বিদিশার মোহ ছড়ানো অন্ধকার রাতের মতোই কালো। শ্রাবস্তী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী। শ্রাবস্তীর কারুকাজ নিটোল রমণীমূর্তিকে পাথরে অক্ষয় করে রেখেছে। সে মূর্তি সৌন্দর্যের প্রতীক। কবির চোখে বনলতা সেনের মুখ যেন শ্রাবস্তীর সেই কারুকার্যময় নি টাল রমণীমূর্তির মুখ। এ মুখে কোনো খুঁত নেই। সৌন্দর্যের অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল সে মুখ।

নামকরণের সার্থকতা : কবির কবিতায় যে হতাশার সুর, ব্যর্থ জীবনের ক্লান্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে তা দূর হয়েছে বনলতা সেনের প্রীতিস্নিগ্ধ প্রেমময় সংলাপে। সুস্থির কুশল সংলাপের মধ্য দিয়ে বনলতা সেন তাঁর প্রাণের অমল ভালোবাসাকে, কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধতাকে সঞ্চারিত করেছে জীবন-সমুদ্রের পথহারা কবির হৃদয়ে। অশান্ত কবি শান্তিলাভ করেন বনলতা সেনের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে। তাঁর দেহের সৌন্দর্যের রূপমুগ্ধতায়ই কবি পরম শান্তি পাননি, তার চোখের মাঝে মমতার উষ্ণ আতিথ্যই তাঁকে নিবিড় শান্তি এনে দিয়েছিল। কবিতাটির প্রধান আকর্ষণ হতাশা-পীড়িত কবিহৃদয় নয়, মমতাময়ী বনলতা সেন। বঞ্চনা, সংশয়, ক্লান্তি সব আমরা ভুলে যাই, যখন আমাদের চেতনায় বনলতা সেন এক অবিনাশী

নারীমূর্তি হয়ে বিরাজ করে। তার চুল, মুখ, আন্তরিক সম্ভাষণ এবং মমতাপূর্ণ চোখ আমাদের চেতনায় প্রেমের প্রত্যাশাকে জাগ্রত করে।

'বনলতা সেন' কবিতায় বনলতা সেন এখানে নারীসত্তারূপে, কবির মানস প্রিয়তমারূপে উপস্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে কবি যখন ক্লান্ত, ইতিহাসের কোনো সভ্যতাই যখন কবিকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি, তখন প্রকৃতি-সংলগ্নতাই কবিকে এনে দিয়েছে শান্তি-সুখের সন্ধান। ফলে সেই প্রকৃতিকে মানবীরূপ দিয়ে তার জন্য রচনা করেন স্তুতি গান, তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিলিত হওয়ার প্রয়াসে খুঁজে ফিরেন নির্জনতা, কাটান অপেক্ষার দীর্ঘপ্রহর। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, 'বনলতা সেন' কবিতার নামকরণ কবিতার ভাববস্তু বিচারে সঙ্গত, শিল্পসম্মত ও সার্থক হয়েছে।

উপসংহার : সংযত চিন্তাচেতনা জীবনানন্দের কবিতায় যে চিত্রকল্পের সৃষ্টি করেছে তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। 'বনলতা সেন' কবিতাটি অনন্য হয়ে উঠেছে কবির অনুচ্ছ্বসিত সংযত প্রকাশে। জীবনানন্দের কাব্যের এ অনন্য বৈশিষ্ট্য তাঁকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে স্বতন্ত্র মহিমা এনে দিয়েছে। 'বনলতা সেন' কবিতায় তাঁর সার্থক প্রতিফলন সবিশেষ লক্ষণীয়।

» প্রশ্ন : ৩১ ॥ কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' একটি অসামান্য গীতিকবিতা– আলোচনা কর।

অথবা, একটি অসাধারণ গীতিকবিতা হিসেবে কবি জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার মূল্যায়ন কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। 'বনলতা সেন' তাঁর একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এ কবিতায় কবি শব্দচয়ন, ছন্দকৌশল, উপমা প্রয়োগ, চিত্রকল্প এবং ইতিহাস চেতনার শৈল্পিক রূপায়ণে রোমাঞ্চকর অনুভূতির সুরমূর্ছনার নিপুণ অনুরণন ঘটিয়েছেন। কবি স্বীয় আবেগ আর প্রেমানুভূতির কাব্যিক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এক অসাধারণ গতিময়তা সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি কবিতাটিকে একটি অসামান্য কবিতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।

গীতিকবিতা : গীতিকবিতা হলো কবির আত্মভাবনামূলক কবিতা এবং তা মানব মনের একান্ত অনুভূতির বাহক। ইংরেজিতে একে Lyric বলা হয়। গীতিকবিতা বলতে গান ও কবিতার সংমিশ্রণ বোঝায়। সংগীতমূলক এ কবিতাগুলো বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আবৃত্তি করা হতো বলেই এদের নাম হয়েছে গীতিকবিতা। আধুনিক গীতিকবিতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বদলেছে সঙ্গত কারণেই। আধুনিক দৃষ্টিতে গীতিকবিতা মনোময় কবিতা পদবাচ্য। কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো বিশেষ ভাব অনুভূতি যখন সংগীতমুখর ছন্দে ও সুললিত শব্দে বাণীবদ্ধ হয়, তখন তা হয় গীতিকবিতা। গীতিকবিতা বিশেষ কোনো তত্ত্ব দ্বারা আক্রান্ত নয়; বরং কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির আনন্দ-বেদনার দলিল।

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক শ্রীশচন্দ্র দাস গীতিকবিতা সম্পর্কে বলেন, "যে কবিতায় কবির আত্মানুভূতি বা একান্ত ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা অন্তরের অন্তস্তল থেকে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে প্রকাশ পায়, তা-ই গীতিকবিতা।"

Oxford Dictionary-তে গীতিকবিতা বা Lyric-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– Expressing a person's personal feelings and thoughts.

গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য : গীতিকবিতার মাধ্যমে কবির অন্তরের গভীরতম রূপ স্বচ্ছ পানিতে মাটি দেখার মতো স্পষ্ট দেখা যায়। এতে কাহিনি থাকে না এবং কবির বিশেষ উপলব্ধির দ্যোতক হওয়ায় এর কলেবর দীর্ঘ নয়। সাবলীল গতি, সঙ্গীতমুখরতা, নিটোল স্বল্পাকৃতি

অবয়ব– এই হলো গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য। গীতিকবিতার প্রাণ হচ্ছে কবির অন্তর নিংড়ানো অনুভূতি। বস্তু নয়, বস্তুনির্যাসই গীতিকবিতার প্রধান বিষয়। অর্থাৎ বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ জাগিয়ে তোলাই হচ্ছে গীতিকবিতার কর্ম। সৌন্দর্য, আনন্দ, প্রেম ও রোমান্টিক ব্যঞ্জনাই গীতিকবিতা। সবকিছু মিলিয়ে গীতিকবিতায় থাকবে আন্তরিক অনুভূতি, সংগীত মূর্ছনা, গীতি চপলতা এবং কবির আত্মচেতনা।

গীতিকবিতা হিসেবে 'বনলতা সেন' : কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নানা বর্ণালোকে, প্রকৃতির আশ্রয়ে, গ্রামবাংলার চিরায়ত রূপ নিয়ে তাঁর কাব্যের ডালি পূর্ণ করেছেন। শিল্পবোধ ও শিল্পসূত্রের প্রশ্নে তিনি ছিলেন পূর্বাপর সপ্রতিভ, সতর্ক। তাই শিল্প প্রকরণে ও জীবন অনুধাবনে তিনি ছিলেন ক্রমাগত সূক্ষ্মতর সৃষ্টি সাফল্যের অভিযাত্রী। তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটি বিষয় ও আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণে একটি স্ফটিক-স্বচ্ছ গীতিকবিতা। আশ্চর্য শীতল কবিতাটির মর্মে রয়েছে প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী অনুভব। তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছেন, বিচ্ছেদ পূর্ণতা দেয় না; বরং দেহ, মন ও আত্মাকে বিধ্বস্ত করে। হাহাকারে পরিপূর্ণ করে মনোজগৎ। হাজার বছর ধরে পথে পথে শান্তির অন্বেষায় ঘুরে বেড়িয়েছেন কবি, কিন্তু কোথাও শান্তির পরশ পাননি; বরং পথপরিক্রমায় চারপাশে তিনি দেখেছেন মৃত্যুর সফেন সমুদ্র। আর সেই সফেন সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে তিনি অনুভব করলেন, হৃদয়ে তাঁর প্রেমের অভিজ্ঞতাই শুধু অনির্বাণ হয়ে জেগে রয়েছে। যুগের সব হতাশা-নিরাশার মাঝে ধ্রুপদী সৌন্দর্যে স্বর্গীয় শান্তির অপূর্ব হাতছানি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বনলতা সেন।

অপূর্ব অনুভূতি : প্রেম মানবসত্তার এক অপূর্ব অনুভূতি। শাশ্বত কালের এ মধুর অনুভূতি নিয়েই গড়ে উঠেছে কবিতাটি। নীড়সন্ধানী পথিক হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুরে প্রেমের জন্য যে ব্যাকুলতা, কবি অসাধারণ শিল্পচাতুর্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাকে দাঁড় করিয়েছেন এক শাশ্বত কল্যাণী নারীর নীড়ের মুখোমুখী। হাজার বছর ধরে পথিক যাকে খুঁজছিল, তাকেই পাইয়ে দিয়েছেন তিনি। প্রেমপ্রার্থী ও প্রেমদাত্রী দুই সত্তা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে নির্জন অন্ধকারে। সৃষ্টি হয়েছে প্রেমের মিষ্টি মধুর অনুভূতি ও রোমাঞ্চ, যা গীতিকবিতারই প্রতিচ্ছবি।

কবির মানসপ্রতিমা : কবি তাঁর মানস-প্রতিমার রূপ-সৌন্দর্য অত্যন্ত নিখুঁতভাবে 'বনলতা সেন' কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সৌন্দর্যরূপিণী এ মানস-প্রতিমা কবির স্বপ্ন প্রেয়সী বনলতা সেন অনবদ্য সৌন্দর্যের মূর্তপ্রতীক। এ কারণে অলৌকিক হয়েও রক্তমাংসের এক সৌন্দর্যময়ী নারীর প্রতিমারূপে জীবন্ত হয়েছে বনলতা সেন। এ কবিতাটি প্রেম ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সর্বোপরি রূঢ় বাস্তবের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারে এমন এক স্বপ্নের মতো আশ্রয়ের প্রতীক। জীবন বাস্তবতার উত্তাল তরঙ্গে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্ত কবি আশ্রয় পেয়েছেন তাঁর মানসপ্রতিমা বনলতা সেনের কাছে। প্রকৃতপক্ষে এ আশ্রয় কবির কল্পিত, কবির মনোজগতে সৃষ্ট সৌন্দর্যের কাছে আশ্রয়। চোখগুলো তার পাখির নীড়ের মতো, চুলগুলো ঘন কালো অন্ধকার বিদিশার নিশিরাতের ঘন কালো অন্ধকারের মতো, মুখে তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য আঁকা। প্রেয়সীর সে শান্ত চোখেই কবি সান্ত্বনার বাণী খুঁজেছেন। তাই দিনের কোলাহল শেষে মুখোমুখি বসে বনলতা সেন কবিকে প্রশ্ন করে, এতদিন কোথায় ছিলেন? মূলত বনলতা সেন জীবনানন্দ দাশের তীব্র রোমান্টিক মানসের এক অসাধারণ সৃষ্টি।

কবিতায় গতিময়তা : আঠারো লাইনে রচিত কবিতাটির মধ্যে উচ্ছ্বসিত বাংলা ছন্দের সবচেয়ে অধিক ব্যবহৃত প্রধানতম ছন্দকে তিনি নিজস্ব ধরনে ব্যবহার করে কবিতাটিকে গতিময় করে তুলেছেন।

কবিতায় চিত্রকল্প : শৈল্পিক শব্দচয়নে ফুটে ওঠা সংযত চিত্ত-চেতনা এ কবিতায় যে চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অনন্য। কবি বহু ভাষণে কবিতাকে দীর্ঘায়িত না করে খুব অল্প কথায় নির্বাচিত শব্দ ও উপমার ঝঙ্কারে ভাব প্রকাশ করেছেন। রূপক ও অলঙ্কার প্রয়োগের স্থলে তিনি নিপুণভাবে প্রতীক ও চিত্রকল্পে কবিতাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন, যা বক্তব্য অপেক্ষা ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অধিকতর ক্রিয়াশীল। যেমন তিনি বলেন–

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর।

এ চিত্রকল্প যেন পাঠককে উপনীত করে ব্যঞ্জনার সেই স্বপ্নময় দারুচিনি দ্বীপে। এ ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের এবং স্পর্শেরও বটে। এভাবে কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি তুলে ধরেন। তিনি হতাশা, নিরাশা আর ক্লান্তির অবসাদ থেকে মুক্তি পান বনলতা সেনের রোমান্টিকতার মধ্য দিয়ে। পরিশেষে খুঁজে পান আনন্দ আর প্রেয়সীর মধুর সম্বোধন।

উপসংহার : কবি জীবনানন্দ দাশ বাস্তব জীবনের অধীত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে স্বীয় হতাশা, নিরাশা, ক্লান্তি, অবসাদ, আশা, আনন্দ আর প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মানুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটিয়েছেন 'বনলতা সেন' কবিতাটিতে। তাই বলা যায়, গীতিকবিতার গীতময়তা, চপলতা, আত্মচেতনা, সংগীত ও সুরের মূর্ছনা, সব মিলিয়ে 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের এক অসাধারণ আধুনিক গীতিকবিতা।

এ-গাঁও ও-গাঁও

জসীমউদ্‌দীন [১৯০৩–১৯৭৬ খ্রি.]

» প্রশ্ন : ৩২ ॥ পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' শীর্ষক কবিতায় পল্লি জীবনের যে অনবদ্য ছবি ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, "পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতায় পল্লিজীবনের এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে" – আলোচনা কর।

অথবা, 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতায় চিরন্তন গ্রামীণ জীবনের এক অনবদ্য রূপ ফুটে উঠেছে– আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০১, '০৫, '১০]

অথবা, জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতা অবলম্বনে কবির পল্লিপ্রীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ১৯৯০]

অথবা, 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতার আলোকে কবি জসীমউদ্‌দীনের কবি প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ কর। [ফা. প. ১৯৯৩]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীনের 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতাটি তাঁর অনন্য কাব্যগ্রন্থ 'নকশী কাঁথার মাঠ' হতে নেওয়া হয়েছে। New School of literature তথা বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠশালাখ্যাত কবি জসীমউদ্‌দীন এ কবিতায় পল্লিজীবনের অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করে তাঁর পল্লিপ্রেমী কবি মানসের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো :

দু'গ্রামের প্রকৃতি : কবি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পটভূমিকায় দুটি গ্রামের মনোরম নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন। একটি ধান-কাউনের বিশাল মাঠের দু'পাশে দুটি গ্রাম। এ গ্রাম কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা। এখানে-ওখানে দু'একটি গাছ। ওই গ্রামের গাছগুলো জমাট বেঁধে শ্যামল,

মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। কবির ভাষায়–

এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।

দু'গাঁয়ের মাঝখানে জলীর বিল : দু'গ্রামের মাঝখানে আছে জলীর বিল। তার কালো পানিতে শাপলা আর পদ্মফুল ফুটে আছে। দু'গাঁয়ের দুটি পথ এসে মিলেছে জলীর বিলের দু'ধারে। তারাই যেন এ পদ্মফুল ফুটিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে।

গ্রাম্যজীবনে কিংবদন্তী : গ্রামীণ জীবনে আছে নানাবিধ জনশ্রুতি। কেউ কেউ বলে, অনেক আগে এ গ্রামের এক চাষী ওই গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে গলায় ফাঁসি পরেছে। তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল গ্রামের পথে। আনমনে পথ চলতে গিয়ে প্রেম হয় উভয়ের মাঝে। সামাজিক কোনো বাধা কিংবা সংস্কারের কারণে সফল হয়নি তাদের প্রেম। এ জলীর বিলে এসে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে তারা দু'জনে। তাদের মালা থেকে খসে পড়া ফুলই হয়তো এখন শাপলা হয়ে পরাগ মেলেছে জলীর বিলের পানিতে। কবির ভাষায়–

এইখানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।
কেইবা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।

গ্রামীণ জীবনের প্রেম-বিরহ : এ গ্রাম ওই গ্রাম, দু'গ্রামের লোকজন জলীর বিলে নাইতে আসে। নাইতে এসে তারা জলকেলীও করে। দু'গ্রামের মাঝখানে জলীর বিল প্রকৃতপক্ষে কোনো দূরত্ব নয়। ওই গাঁয়ের মেয়েরা কলসি ভরে পানি নিতে আসলে পানিতে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তার দোলা এ গাঁয়ে এসে লাগে। নিঝুম, নিস্তব্ধ, গহীন রাতে এ গাঁয়ের বংশীবাদক চাষি যখন তার বাঁশিতে মোহনীয় বিরহের সুর তোলে সে সুরে হৃদয়ে ব্যথা ও বিরহের হাহাকার জাগে ওই গাঁয়ের কোনো এক কিষাণী যুবতির। দুটি গ্রাম যেন সুরের বাঁধনে বাঁধা। কবি বলেন–

এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

গ্রামীণ জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত : গ্রামীণ জীবনে শুধু প্রেম, মিলন আর বিরহ নয়, মাঝে মাঝে স্বার্থবাদী মানুষ সুরের মাঝে অসুরেরও সাধনা করে। পারস্পরিক স্বার্থের কারণে দু'গাঁয়ের মানুষের মাঝে শুরু হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তাদের রক্তে অনেকবারই লাল হয়েছে জলীর বিল। কবি বলেন–

এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।

ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।' জসীমউদ্দীনও একই কথা বলেছেন–

তবু ভাল, এ-গাঁও ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধূলায় দোলে দুখান দীঘল বাট।

গ্রামে দ্বন্দ্ব আছে, সংঘাত আছে, আছে না পাওয়ার বেদনা; অভাব, অভিযোগ, বিরহের জ্বালা। তথাপি গ্রামীণ জীবন শান্তিপূর্ণ। প্রকৃতির উদার মমতা আর ভালোবাসায় গ্রামীণ জীবন স্নিগ্ধ এবং সতত সুন্দর।

উপসংহার : গ্রামবাংলার সহজ-সরল প্রাকৃতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে পল্লিপ্রেমী কবি জসীমউদ্‌দীন নতুন মহিমায় কাব্যমূল্য দান করেছেন। পল্লিজীবনের সহজ-সতেজ শব্দ, উপমা এবং চিত্র সর্বদা তাঁর কাব্যের রূপকল্প নির্মাণ করেছে। এ জন্যই তিনি পল্লিকবি নামে পরিচিত।

⏩ প্রশ্ন : ৩৩ ॥ 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতার মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, কবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতার সারমর্ম তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' শীর্ষক কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এ কবিতায় কবি সহজ-সরল শব্দচয়ন ও সাবলীল বর্ণনাভঙ্গিতে গ্রামবাংলার অতি পরিচিত কিছু দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। গ্রামবাংলার প্রেম-বিরহ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, রূপ-প্রকৃতি ও নিত্যদিনের কর্মকাণ্ড তাঁর ভাষানৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে।

গ্রামবাংলার রূপ : গ্রামবাংলার এপাশে এক গ্রাম অন্যপাশে আরেকটি গ্রাম। দু'গ্রামের মাঝে মাঠ, মাঠে নানা প্রকার ফসলের সমারোহ। কবির ভাষায়–

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও– মধ্যে ধু-ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।

কবিতার গ্রাম : কবিতায় কবি যে দুটি গ্রামের চিত্র এঁকেছেন, সে গ্রাম দুটি বাংলাদেশের সব গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করছে। গ্রাম দুটির মাঝখানে একটি ফসলের মাঠ। এক গ্রাম একটু ফাঁকা, অন্য গ্রাম ঘন সবুজে ঘেরা। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে একটি ঘর আরেকটি ঘরকে জড়িয়ে ধরে আছে। এ-গাঁও ও-গাঁয়ের দিকে তাকিয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। কবি বলেন–

এ-গাঁও চেয়ে ও-গাঁর দিকে, ও-গাঁও এ-গাঁর পানে,
কতদিন যে কাটবে এমন, কেই বা তাহা জানে।

গ্রাম্যজীবন : গ্রামবাংলার মানুষের জীবনে আছে প্রেম, আছে বিরহ, হাসি-কান্না ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এখানে এক গ্রামের চাষি অন্য গ্রামের মেয়ের সাথে প্রেম করে। নিশিরাতে বাঁশের বাঁশী বাজায়। গ্রামে গ্রামে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে এ-গাঁয়ের চাষির সাথে ও-গাঁয়ের মেয়ের প্রেম মেনে নিতে পারে না গ্রামবাসী। পরিণামে প্রেমিক-প্রেমিকা জলীর বিলে আত্মাহুতি দেয়। প্রতিটি গ্রামেই একটা না একটা কিংবদন্তী চালু থাকে। এ গ্রাম দুটিতেও তেমনি কিংবদন্তী চালু আছে। গ্রাম্য মানুষ বিলে-পুকুরে গোসল করে, এ দু'গাঁয়ের মানুষ তার ব্যতিক্রম নয়। কবির ভাষায়–

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও– মধ্যে ধু-ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।

গ্রামের পাখ-পাখালি : কবি গ্রামের পাখ-পাখালির চমৎকার চিত্র এঁকেছেন। গ্রামের অনন্য উপকরণ এ পাখ-পাখালি। পাখ-পাখালি গ্রামগুলো মুখরিত করে রাখে কলকাকলিতে। এ গাঁয়ের পাখি ও গাঁয়ের পানে ছুটে যায় সন্ধ্যার সাথে সাথে।

যুবক-যুবতির প্রেম : গ্রামের সুখ-দুঃখের মাঝেও গেঁয়ো যুবক-যুবতিরা একে অপরের সাথে মন দেওয়া-নেওয়া করে। এ দু'গাঁও তার ব্যতিক্রম নয়। এ গাঁয়ের চাষি ও গাঁয়ের যুবতি মেয়ের মন আকর্ষণ করার জন্য নিশিরাতে বাঁশের বাঁশি বাজায়। কবির ভাষায়–

এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।

জলীর বিলের বর্ণনা : দু'গাঁয়ের মাঝখানে যে বিলটি আছে, তার নাম জলীর বিল। শুকনো মৌসুমে এ বিলে থাকে ধান, কাউন, আর বর্ষা মৌসুমে থাকে জল কুমুদী। কবির ভাষায়–

মাঝখানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল কুমুদী মেলছে শতদল।

বিরহ : 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতায় গ্রামবাংলার প্রেমবিরহ সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এ-গাঁয়ের চাষি ও-গাঁয়ের মেয়ের সাথে প্রেম করে। প্রেমের মিলনে যখন বাধা দেখে, তখন তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। কবির ভাষায়–

এইখানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়,
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।

গ্রাম্যজীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত : গ্রাম্য মানুষের জীবনে যেমন আছে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, তেমনি আছে নানান দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঝগড়া-ফ্যাসাদ। এ ঝগড়া-ফ্যাসাদে অনেক সময় রক্তারক্তিও হয়ে যায়। ঝগড়া-ফ্যাসাদ করে গ্রামবাংলার মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয় অনেক। তারা মারামারি করে গ্রামবাংলার নিবিড় শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে কলুষিত করে।

শান্তির নীড় : গ্রাম্য মানুষের জীবনে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও বিরহ থাকলেও আসলে গ্রাম একটি শান্তির নীড়। কবির ভাষায়–

তবু ভালো, এ-গাঁও ও-গাঁও, আর যে সবুজ মাঠ,
মাঝখানে তার ধুলায় দোলে দু-খান দীঘল বাট।

উপসংহার : গ্রামবাংলার দক্ষ শিল্পী কবি জসীমউদ্‌দীন রচিত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতায় গ্রামবাংলার বাস্তবচিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামবাংলার মনোরম আলেখ্য আর পল্লির জীবনযাত্রার বাস্তবরূপ মূর্ত হয়ে ধরা দিয়েছে পল্লিকবির দক্ষ তুলির আঁচড়ে।

সাত সাগরের মাঝি

ফররুখ আহমদ [১৯১৮–১৯৭৪ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ৩৪ ॥ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ফররুখ আহমদের ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৮]

অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ফররুখ আহমদ ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ তথা রেনেসাঁর যে স্বপ্ন দেখেছেন তা উপস্থাপন কর।

[ফা. প. ১৯৯১, '৯৫, '৯৭, '০০, '০৩, '০৭, '১৪]

অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় কবি ফররুখ আহমদ সুপ্ত মুসলিম জাতির জাগরণের প্রয়াস পেয়েছেন– আলোচনা কর।

অথবা, কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা অনুসরণে কবির পুনর্জাগরণ মনোভাব ও ইসলামী ঐতিহ্যবোধের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা অবলম্বনে কবি ফররুখ আহমদের কবি মানসের পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ইসলামী রেনেসাঁর কবি এবং ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত সাগরের মাঝি' শীর্ষক কালজয়ী কবিতাটি তার 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে। এটি তাঁর বিখ্যাত একটি রূপক কবিতা। এ কবিতায় কবি সুপ্ত মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণের প্রয়াস পেয়েছেন।

সাত সাগরের মাঝি : যিনি নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পরিচালনা করেন তাকেই মাঝি বলা হয়। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় 'মাঝি' বলতে কবি মুসলিম জাতিকে ও তাদের নেতাকে বুঝিয়েছেন।

মুসলমানদের অতীত গৌরব : অন্ধকারে নিমজ্জিত মরু আরবে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)। আইয়ামে জাহেলিয়ার অবসানে বিশ্ব যেন আলোর জোয়ারে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মহানবি (স)-এর মহাপ্রয়াণের পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও ইসলাম তার আপন জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছিল দুনিয়ার অন্ধকার কোণে কোণে। মরু আরবের সে আলো আফ্রিকা, ইউরোপ এমনকি ভারতবর্ষকেও আলোকিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের খোদাভক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে গৌরবমণ্ডিত সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল।

মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশা : মুসলমানরা বর্তমানে দুর্দশার অতল অন্ধকারে নিমজ্জমান। তাদের উত্থান ও উজ্জীবনের সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আগের মতো তাদের শৌর্যবীর্য আর জগৎকে চমকিত করে না। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রসায়নশাস্ত্রে, গণিতে, পদার্থবিদ্যায়– মোটকথা, জ্ঞানের সকল শাখায় নেতৃত্ব দিত মুসলমানরা। সে অতীত গৌরব এখন কেবলই সুখ-স্মৃতি। মুসলমানরা এখন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে মুসলিম জাতি : মুসলমান ছিল স্বাধীনচেতা জাতি, কিন্তু এখন তারা পরাধীন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসন ক্ষমতাসহ কোথাও তাদের উচ্চাসন নেই। সারা বিশ্বে যখন নবজাগরণের জোয়ার এসেছে, তখনো মুসলিম জাতির অবচেতন ঘুম ভাঙেনি। শৃঙ্খলিত ঘুমঘোরে নিমজ্জিত এ জাতির প্রতি কবির বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা–

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা,
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণ কামনা : মুসলিম জাগরণের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি ফররুখ আহমদ নিদ্রামগ্ন, বিলাসব্যসনে মত্ত মুসলিম জাতিকে নতুন করে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সাত সাগরের মাঝিকে কবি বলেন–

তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তি আবার ভেসেছে সাগর জলে,

দুয়ারে অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষের ভিড়, সাপের গর্জন, জাতি আজ ভুল পথে এগিয়ে চলছে, যার কারণে তারা ক্রমাগত পতনের দিকে অগ্রসরমান। এ সময় মুসলিম জাতির কর্ণধারকে জেগে উঠতে হবে। তাদের ভুলে গেলে চলবে না অতীত গৌরব। কবির ভাষায়–

ভুলেছ কি সেই প্রথম সফল জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে।

অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে সাহসের সঞ্চার করতে চান কবি। কোনো দ্বিধা নয়, সংশয় নয়, কবির সুস্পষ্ট আহ্বান–

আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

কবির পুনর্জাগরণী মনোভাব/কবি মানস : ফররুখ আহমদের কাব্যপ্রতিভা প্রাণ পেয়েছে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী আদর্শ অবলম্বন করে। কবি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে

তার সমস্ত চেতনা রাঙিয়ে তুলেছেন এবং দ্বীন ইসলামকে বর্তমান যুগের পটভূমিতে নতুন বিপ্লবের দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্যকেই তিনি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কবিতায় রূপায়িত করেছেন।

রোমান্টিক কবি-মানসের অধিকারী কবি ফররুখ আহমদ হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করেছেন, মুসলিম জাতি যেন পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় তাঁর সে কবি-মানসেরই পরিচয় মেলে।

কবির স্বপ্ন ও বিশ্বাস : কবির বিশ্বাস, প্রত্যয় আর সাহস থাকলে মুসলিম জাতি একদিন তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। হেরার আলোর প্রোজ্জ্বল শিখায় দূর হবে তাদের জীবনের সকল অন্ধকার। তাই কবির আহ্বান–

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো;
এবার অনেক পথ শেষে সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।

উপসংহার : মুসলিম জাতির নব রেনেসাঁর নেতাকে হতে হবে সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান, আদর্শবান ও আপসহীন। তার চোখে থাকবে হেরার জ্যোতির্ময় স্বপ্ন সম্ভাবনা। তাহলেই মুসলিম জাতি বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে নতুন আকাঙ্ক্ষা, নতুন স্বপ্নে উদ্দীপিত হতে পারবে। অতীত গৌরবের পথ ধরে তৈরি করতে পারবে ভবিষ্যতের সোনালি সোপান। কবি ফররুখ আহমদ আন্তরিকভাবেই মুসলমানদের গৌরবময় জাগরণে প্রত্যাশী।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৫ ॥ কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লেখ।
অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার সারাংশ লেখ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : 'সাত সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতাটি ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি, ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের আলোচিত কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' থেকে সংকলিত। কবিতাটি বাংলা সাহিত্যে একটি গৌরবোজ্জ্বল সংযোজন। এ কবিতায় কবি সুপ্ত মুসলিম জাতিকে জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন।

সাত সাগরের মাঝির পরিচয় : যিনি নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পরিচালনা করেন তাকেই মাঝি বলা হয়। আলোচ্য কবিতায় 'সাত সাগরের মাঝি' বলতে কবি মুসলিম জাতি ও তাদের নেতাকে বুঝিয়েছেন।

মুসলমানদের হৃত গৌরব : অন্ধকারে নিমজ্জিত মরু আরবে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)। আইয়ামে জাহেলিয়ার অবসানে বিশ্ব যেন আলোর জোয়ারে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মহানবি (স)-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও ইসলাম তার আপন জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছিল দুনিয়ার অন্ধকার কোণে কোণে। মরু আরবের সেই আলো আফ্রিকা, ইউরোপ এমনকি ভারতবর্ষকেও আলোকিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের খোদাভক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে গৌরবমণ্ডিত সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল।

মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশা : মুসলমানরা বর্তমানে দুর্দশার অতল অন্ধকারে নিমজ্জমান। তাদের উত্থান ও উজ্জীবনের সকল দুয়ার বন্ধ হয়ে গেছে। আগের মতো তাদের শৌর্যবীর্য আর জগৎকে চমকিত করে না। বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, রসায়নশাস্ত্রে, গণিতে, পদার্থবিদ্যায়– মোটকথা জ্ঞানের সকল শাখায় নেতৃত্ব দিত মুসলমানরা। সে অতীত গৌরব এখন কেবলই সুখস্মৃতি। মুসলমানরা এখন ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে মুসলিম জাতি : মুসলমান ছিল স্বাধীনচেতা জাতি, কিন্তু এখন তারা পরাধীন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শাসন ক্ষমতাসহ কোথাও তাদের উচ্চাসন নেই। সারা বিশ্বে যখন নব জাগরণের জোয়ার এসেছে, তখনো মুসলিম জাতির অবচেতন ঘুম ভাঙেনি। শৃঙ্খলিত, ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন এ জাতির প্রতি কবির বিস্ময়ভরা জিজ্ঞাসা–

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা,
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

মুসলিম জাতির পুনর্জাগরণ কামনা : ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ নিদ্রামগ্ন, বিলাসব্যসনে মত্ত মুসলিম জাতিকে নতুন করে জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সাত সাগরের মাঝিকে কবি বলেছেন–

তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে।

দুয়ারে অসংখ্য ক্ষুধিত মানুষের ভিড়, সাপের গর্জন। জাতি আজ ভুল পথে এগিয়ে চলেছে, যার কারণে তারা ক্রমাগত পতনের দিকে অগ্রসরমান। এ সময় মুসলিম জাতির কর্ণধারকে জেগে উঠতে হবে। তাদের ভুলে গেলে চলবে না অতীত গৌরব। কবির ভাষায়–

ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর জাহাজ চলেছে ভেসে
অজানা ফুলের দেশে।

কবি অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে সাহসের সঞ্চার করতে চান। কোনো দ্বিধা নয়, সংশয় নয়, কবির সুস্পষ্ট আহ্বান–

আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

কবির পুনর্জাগরণী মনোভাব/কবি-মানস : কবি ফররুখের কাব্যপ্রতিভা প্রাণ পেয়েছে মুসলিম ঐতিহ্য ও ইসলামী আদর্শ অবলম্বন করে। কবি একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত চেতনা রাঙিয়ে তুলেছেন এবং দ্বীন ইসলামকে বর্তমান যুগের পটভূমিতে নতুন বিপ্লবের দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব সৌন্দর্যকেই তিনি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কবিতায় রূপায়িত করেছেন।

রোমান্টিক কবি-মানসের অধিকারী কবি ফররুখ আহমদ হৃদয়ের সমস্ত আকুতি দিয়ে কামনা করেছেন, মুসলিম জাতি যেন পুনরায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে বিশ্বের দরবারে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় তার সে কবি-মানসেরই পরিচয় মেলে।

কবির দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস : কবি ফররুখ আহমদের বিশ্বাস, প্রত্যয় আর সাহস থাকলে মুসলিম জাতি একদিন তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। হেরার আলোর প্রোজ্জ্বল শিখায় দূর হবে তাদের জীবনের সকল অন্ধকার। তাই কবির আহ্বান–

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো;
এবার অনেক পথ শেষে সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।

উপসংহার : মুসলিম জাতির নব রেনেসাঁর নেতাকে হতে হবে সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রবান আদর্শবান ও আপসহীন। তার চোখে থাকবে জ্যোতির্ময় স্বপ্ন সম্ভাবনা। তাহলেই মুসলিম

জাতি বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে নতুন আকাঙ্ক্ষায় নতুন স্বপ্নে উদ্দীপিত হতে পারবে। অতীত গৌরবের পথ ধরে তৈরি করতে পারবে ভবিষ্যতের সোনালি সোপান। কবি ফররুখ আহমদ আন্তরিকভাবেই মুসলমানদের গৌরবময় জাগরণের প্রত্যাশী।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৬ ॥ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় নতুন স্বপ্ন সম্ভাবনার যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় যে আশাবাদ ব্যক্ত হয়েছে তার পরিচয় দাও।

অথবা, 'সাত সাগরের মাঝি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে? কবি মাঝির আত্মসম্বিত ফিরিয়ে আনার জন্য যে উদ্দীপনাসঞ্চারী উৎসাহ বাণী ব্যবহার করেছেন, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত চেতনায় বলীয়ান কবি ফররুখ আহমদ তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় মুসলিম যুবশক্তির উদ্দেশে জাগরণের বীণায় গান গেয়েছেন। ইসলামের নিমজ্জমান সূর্যের পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায় তিনি বিপ্লবী দামামা বাজিয়েছেন শিল্পময় ভাষায়। পরাজয় গ্লানির সাগর পেরিয়ে পৃথিবীর বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হোক– এ স্বপ্ন দেখেছেন কবি ফররুখ আহমদ।

সাত সাগরের মাঝি : সাধারণত যিনি নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি পরিচালনা করেন তাকেই মাঝি বলা হয়। আলোচ্য কবিতায় 'সাত সাগরের মাঝি' বলতে কবি মুসলিম জাতি ও তাদের নেতাকে বুঝিয়েছেন। অপরাজেয় শক্তিময় মুসলিম উম্মাহর সিংহ সন্তানেরা কবির কল্পনায় 'সাত সাগরের মাঝি'। কিন্তু এ মাঝি-মাল্লারা আজ পরাজয় পরাধীনতার আঁধারে পথহারা। কবি তাদের উদ্দেশে জাগরণ গান গেয়েছেন। সিন্দাবাদের ন্যায় আবার ক্লান্তিহীন সমুদ্র অভিযান শুরু করার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেন–

তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তি আবার ভেসেছে সাগর জলে।

মাঝির প্রতি কবির আহ্বান : মাঝি বা নেতার প্রতি কবির আহ্বান, তিনি যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। কবি তার কাছে মিনতি করে বলছেন, হে মাঝি! তুমি উঠে এসে জাহাজের হাল ধর। তোমার দিকে চেয়ে আছে অগণন মুসলমান। তোমার পাল ফেটে গেছে। শত্রুরা তোমার রাজ্যকে বিষাক্ত করে ফেলেছে। কবির ভাষায়–

তবে নোঙর তোলো
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো।

বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানরা চরমভাবে হতাশা ও দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের সাফল্যের সূর্য আজ মেঘে ঢাকা পড়ে গেছে। তাদের বিজয়াভিযানের জাহাজ আজ অচল, তার হাল ভাঙা। গোটা মুসলিম উম্মাহর অগ্রাভিযান আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শৌর্য-বীর্যে একসময় যে মুসলিম উম্মাহ সাফল্যের শীর্ষ মার্গে অবস্থান করতো, তারা আজ নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত জাতি। অতীত গৌরব আজ তাদের অলস স্মৃতিচারণের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তারা যেন ঘুমাচ্ছে অঘোরে। কবি প্রত্যক্ষ করেছেন, রাতের আঁধারের অবসান ঘটেছে। প্রভাতের সোনালি আলোয় সবকিছু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাত সাগরের জোয়ার দুয়ারে এসে উছলে পড়ছে। এমন যুগসন্ধিক্ষণে মুসলিম নেতাকে সব অবসাদ অলসতা কাটিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হবে। অথচ মাঝিরূপী মুসলিম জাতির নেতৃবৃন্দের এখনো ঘুম ভাঙেনি। অগণিত ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির ব্যাপারে মুসলিম নেতৃবৃন্দ আজ বড়ই

উদাসীন। ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলমান প্রায় অর্ধ দুনিয়ায় সত্যের শাসন কায়েম করেছিল। সেই মুসলিম জাতিই আজ লাঞ্ছিত, অপমানিত, বিপন্ন, নিগৃহীত ও উপেক্ষিত। মুসলমানদের এ দুর্দিনে কবি একজন সত্য ও কল্যাণের পতাকাবাহী সৈনিক খুঁজছেন। তাই কবি মুসলিম নেতাকে তৌহিদী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে মুসলিম জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কবি বলেন–

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো;
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে,
দেখবে তোমার কিশ্‌তি আবার ভেসেছে সাগর জলে।

মুসলমানদের অতীত গৌরব : অন্ধকারে নিমজ্জিত মরু আরবে ইসলামের আলো জ্বালিয়েছিলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)। আইয়ামে জাহেলিয়ার অবসানে বিশ্ব যেন আলোর জোয়ারে উদ্ভাসিত হয়েছিল। মহানবি (স) এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও ইসলাম তার আপন জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছিল দুনিয়ার অন্ধকার কোণে কোণে। মরু আরবের সেই আলো আফ্রিকা, ইউরোপ এমনকি ভারতবর্ষকেও আলোকিত করেছিল। মুসলমানরা তাদের খোদাভক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে গৌরবমণ্ডিত সভ্যতা সৃষ্টি করেছিল।

মুসলমানদের পুনর্জাগরণ : কবি ফররুখ আহমদ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় সুপ্ত ও বিলাসী মুসলিম জাতিকে তাদের ঘোর নিদ্রা, অবসাদ, অলসতা কাটিয়ে উঠে সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অগণিত ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য তিনি মুসলিম নেতৃত্বকে হেরার রোশনী নিয়ে সাত সাগর পাড়ি দিতে বলেছেন। কবি মুসলিম নেতার প্রতি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান রেখেছেন, জড়তা পরিহার করে আশাদৃপ্ত চোখ মেলে ভোরের দীপ্ত সূর্যের সাথি হওয়ার জন্য। একদিন আরবের অন্ধকার ঊষর মরুতে হেরার যে অনির্বাণ দীপ্ত শিখা জ্বলেছিল, সেই শিখা এখনো দীপ্তিমান। সেই আলো ও আদর্শের প্রতি কবি পূর্ণ আশাবাদী। তাই কবির দৃপ্ত আহ্বান–

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো;
এবার অনেক পথ শেষ সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।

কবির আশা : কবি মাঝিকে হাল ধরার জন্য আহ্বান জানিয়ে তাকে আশার বাণী শোনাচ্ছেন। বলছেন, হে মাঝি! তুমি তোমার নৌকা ভাসাও সাগর জলে, দেখবে তোমার কিশ্‌তি দরিয়ায় ভাসবে পূর্ণ চাঁদের মতো। তোমার পথের আলো এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তোমার লালা, রায়হান এখনো দিগন্তে আছে; তুমি ভয় পেয়ো না। তুমি তোমার ছেঁড়া পালে তালি দাও, মাস্তুল জোড়া দাও। তবুও তোমাকে জাহাজ ছোটাতে হবে। এখনো হেরার তোরণ তোমার জন্য আলো ছড়াচ্ছে। কবির ভাষায়–

হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন।
ভিড় করে– যেথা জাগছে হেরার রাজ-তোরণ।

কবির বিশ্বাস : কবি বিশ্বাস করেন, প্রত্যয় আর সাহস থাকলে মুসলিম জাতি একদিন তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারবে। হেরার আলোর প্রোজ্জ্বল শিখায় দূর হবে তাদের জীবনের অন্ধকার।

উপসংহার : কবির দৃঢ় বিশ্বাস, সকল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দরিয়ার নোনাজল পাড়ি দিয়ে সাত সাগরের মাঝি তীরে ভিড়বেই। অস্পষ্ট হলেও এই যে হেরার রাজতোরণ দেখা যাচ্ছে, মুসলিম কাফেলার জাহাজ তথায় পৌঁছবেই। সুতরাং আর দেরি নয়, এখনি মুসলমানদের যাত্রা করতে হবে। আর এ যাত্রাই জাতিকে সফলতার মনজিলে পৌঁছে দেবে। বস্তুত জাতির সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ইসলামী আদর্শের বাস্তবতায় রূপায়িত হবে। এ কামনাই কবি মুসলিম জাতির নিকট করেছেন।

প্রশ্ন : ৩৭ ॥ রূপক কবিতা বলতে কী বোঝ? রূপক কবিতা হিসেবে 'সাত সাগরের মাঝি'র সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মুসলিম জাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রদূত কবি ফররুখ আহমদের অনন্য রচনা 'সাত সাগরের মাঝি'। কবি এ কবিতায় রূপকের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের দুর্দশার বাস্তবচিত্র বিভিন্ন উপমা এবং মুসলিম জাতিকে সে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তকরণের লক্ষ্যে একজন বীর পুরুষের প্রয়োজনীয়তা নৌকার মাঝি বা জাহাজের নাবিকের রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নৌকা বা জাহাজ যেমন মাঝি বা নাবিক ব্যতীত পরিচালনা করা যায় না, তেমনি একজন সত্যের বীর সেনানী নাবিকের বলিষ্ঠ ভূমিকা ছাড়া মুসলমানদের অতীত ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। তাই মুসলিম জাতি থেকে একজন আদর্শ নেতার আবির্ভাবের আহ্বান কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুরণিত হয়েছে।

রূপক কবিতার পরিচয় : 'রূপক' শব্দের আভিধানিক অর্থ উপমা ও উপমেয়র অভেদ কল্পনামূলক অর্থালঙ্কার, কাব্যে বা বর্ণনায় একজনের ওপর অন্য কারো যে দৃশ্যরূপ আরোপ করা হয়। সুতরাং রূপক কবিতা এমন গুণবিশিষ্ট, যার মাধ্যমে উপমার সাহায্যে একটি বিষয় স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়। এরূপ রূপকের আড়ালে থাকে প্রকৃত তত্ত্ব উদঘাটনের উপকরণ, দিকনির্দেশনা ও নির্দিষ্ট বিষয়ে ইতিহাস-ঐতিহ্য। রূপকের মাধ্যমে মূল বক্তব্য পাঠকের সামনে তুলে ধরাই কবি বা লেখকের উদ্দেশ্য।

'সাত সাগরের মাঝি'র পরিচয় : 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় মাঝি বলতে এমন একজন নেতার কথা বলা হয়েছে, যিনি ইসলামের আদর্শে দেদীপ্যমান; যার নেতৃত্বে ইসলাম তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পাবে। মুসলমানগণ হতাশা ও নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে আলোর পথে, জীবনের পথে ফিরে আসবে। এ মাঝি মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত নন, শত্রুর মোকাবেলায় দুর্বল নন, ঐক্যবদ্ধ জনতাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে কখনো বিভ্রান্ত নন। তিনি হবেন সত্য ও ন্যায়ের পথে জাগ্রত জনতার কাফেলার কর্ণধার। তার যাত্রাপথে ঝড় আসবে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে; হয়তো জাহাজের মাস্তুল ভেঙে যাবে, পাল ছিঁড়ে যাবে; তবুও তাকে হতাশ হলে চলবে না। সাহসী ও প্রত্যয়ী মনোবল নিয়ে তাকে এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যের দিকে। কবিতাটিতে দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী ও ইসলামী আদর্শের মন্ত্রে দীক্ষিত এ মহান নেতাকে মাঝি হিসেবে অভিহিত করেছেন কবি।

কবি প্রতিভার স্বরূপ : ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ মূলত রোমান্টিক কবি-মানসের অধিকারী। ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্যকেই তিনি তার অনিন্দ্যসুন্দর কবিতায় রূপায়িত করেছেন। ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে কবি ইসলামের অতীত ঐতিহ্য উপলব্ধি করে রচনা করেন 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা। এতে মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, গৌরব ও কৃতিত্বপূর্ণ বীরত্ব, অনুপম শব্দচয়ন ও অপরূপ ছন্দ ও বাক্যে ফুটে উঠেছে। কবি বলেন–

হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভেনি একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বর্ণ দেখছে এ মরুভূমি,
দেখ জমা হ'লো লালা, রায়হান তোমার দিগন্তরে,
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে!

এছাড়া কবি এ কবিতায় ইসলামের অতীত গৌরব এক অসাধারণ রূপক ব্যঞ্জনার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতির বিপদসংকুল অবস্থায় জাতিকে সুপথে পরিচালনার জন্য কবি একজন যোগ্য ও আদর্শ নেতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন, যে নেতা মুসলিম উম্মাহকে কল্যাণের দিকনির্দেশনা দেবে। এতে মুসলিম জাতি বিশ্বে আবার পূর্ণ শক্তি নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ আদর্শ নেতাকে কবি 'সাত সাগরের মাঝি' রূপে অভিহিত করেছেন। কবি বলেন–

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো!
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তি আবার ভেসেছে সাগর জলে।

'সাত সাগরের মাঝি'র রূপক : কবি 'সাত সাগরের মাঝি' প্রতীক ও রূপকের অন্তরালে সারা পৃথিবীতে মুসলিম আধিপত্যের কথা বলেছেন, ভবিষ্যতে তাদের কর্মপন্থা কী হবে সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। সাগরবক্ষে চলমান জাহাজের নাবিকের সাথে মুসলিম জাতির নেতার উপমা যে ভাষাব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন, তা বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উদাহরণ। তিনি শত্রুপক্ষের নিন্দা ঘৃণাকে তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। কবির ভাষায়–

আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

রূপক কবিতা হিসেবে সার্থকতা : 'সাত সাগরের মাঝি' বলতে নৌকা বা জাহাজ চালককেই বোঝানো হয়। মাঝি বা নাবিক তার ইচ্ছেমতো জাহাজ বা নৌকা পরিচালনা করে থাকেন। এ কবিতায় কবি সাত সাগরের মাঝিকে রূপক অর্থে উল্লেখ করেছেন। পুরো কবিতা জুড়ে এ মাঝির দায়িত্ব ও কর্তব্য জাহাজের নাবিকের রূপকে অনুরণিত হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের তরি উত্তাল সাগরে ভাসমান জাহাজের ন্যায় ডুবুডুবু অবস্থা। অথচ তাদের নেতা, জাতির কাণ্ডারি গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন। এখনো তার ঘুম ভাঙেনি। জাহাজ দ্রুত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে হবে, তাই তাকে জাগ্রত হতেই হবে। এমনিভাবে মুসলিম জাতির কাণ্ডারিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে জাতিকে কল্যাণ ও সুপথে নিয়ে আসতে হবে। নতুবা মুসলিম জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। কবিতার প্রতিটি ছন্দে রূপকভাবে জাতির কাণ্ডারির প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। তাই বলা যায়, রূপক কবিতা হিসেবে 'সাত সাগরের মাঝি' একটি সার্থক কবিতা।

উপসংহার : মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য বর্ণনার পাশাপাশি কাব্যাকারে জাতির নেতার করণীয় সম্পর্কে কবি ফররুখ আহমদ 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় যথাযথ উপদেশবাণী প্রদান করেছেন। ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার মানসে কবি রূপকের অন্তরালে কবিতাটি রচনা করেছেন। তাই বাংলা কাব্য সাহিত্যে এটি এক বিরল কবিতা।

স্বাধীনতা তুমি

শামসুর রাহমান [১৯২৯–২০০৬ খ্রি.]

▸▸ প্রশ্ন : ৩৮ ॥ আধুনিক কবি শামসুর রাহমান রচিত 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটির ভাবার্থ/ সারমর্ম/ মূল বক্তব্য তোমার নিজের ভাষায় লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের বিশিষ্ট আধুনিক কবি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতার ধারায় অসাধারণ চিত্রকল্পের এক শিল্পসার্থক কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি'। কবিতাটি কবির 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ কবিতায় কবি বাঙালির স্বাধীনতা অর্জনে মুক্তিযুদ্ধের আনন্দ-বেদনা, অসম ত্যাগ, অম্লান স্মৃতিগাথা এবং গৌরবময় বিজয় উপাখ্যান অনুপম উপমা ও রূপকের আশ্রয়ে চিত্রায়িত করেছেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামগ্রিক বাংলার জনসাধারণের অকৃত্রিম আত্মত্যাগের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস উন্মোচনই এ কবিতার মূল প্রতিপাদ্য।

কবিতার ভাবার্থ ও মর্মবাণী

স্বাধীনতার রূপ : মুক্ত প্রাণের বাধাহীন প্রকাশই স্বাধীনতা। আমাদের পার্থিব জীবনের সর্বোত্তম পাওয়া এ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা তাই আমাদের চলার পথের সঞ্জীবনী শক্তি, অর্জিত আনন্দের সীমাহীন সম্ভার। স্বাধীনতা একটি জাতির মুক্ত সত্তা। আলোচ্য কবিতায় কবি শামসুর রাহমান বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। বহু রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতা কবির অনুভূতিকে তীব্রভাবে নাড়া দিয়েছে। এ স্বাধীনতাকে কবি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক উপাদান ও জীবনের বিচিত্র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন।

রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : বাংলার স্বাধীনতা যেন অধিকার আদায়ের দাবিতে পতাকাশোভিত শ্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল। এ স্বাধীনতাকে কবি শহীদ মিনারের অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভায় দেখেছেন এবং একে অনুভব করেছেন সৃষ্টির আনন্দে প্রমত্ত ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো মহান কবি নজরুলের বিদ্রোহী সত্তায়। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।

সামাজিক প্রেক্ষাপট : কবি শামসুর রাহমান তাঁর 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাধীনতার প্রতি গভীর আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। বিচিত্র উপমার মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন; স্বাধীনতা মানুষের জীবনের জন্য, মানুষের অস্তিত্বের জন্য, মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য, সুখী-সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য এক অপরিহার্য বিষয়। পিতার কোমল জায়নামাজ, উদার জমিনের চা-খানায়, মাঠে-ময়দানের ঝড়ো সংলাপে এবং মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে কবি বাংলার স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন আমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালির ফাঁকে ফাঁকে খানিক আনন্দময় অবসরে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট : রবি ঠাকুরের অজর কবিতা ও অবিনাশী গানে কবি স্বাধীনতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতা মানে– বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী সাংস্কৃতিক কর্মীর সতেজ ভাষণ; 'বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার' এবং 'বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রং।' কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–

নৈসর্গিক প্রেক্ষাপট : কবির দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হলো শ্রাবণের ভরা মেঘনা, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার কাটা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক যেন এ স্বাধীনতা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

এ স্বাধীনতা বন্ধুর হাতে জ্বলে ওঠা রাঙা পোস্টার, হাওয়ায় ওড়ানো গৃহিণীর ঘন কালো উদ্দাম চুল, খোকার গায়ের রঙিন জামা, খুকীর তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।

কবির অনুভূতি : কবির দৃষ্টিতে স্বাধীনতা কোনো খণ্ডিত স্বপ্ন বা কল্পনা নয়; ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, মিলন-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অনুভূতি-সংবলিত অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় চেতনা। স্বাধীনতা জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করে, মুক্তি দেয় সামগ্রিক সত্তাকে। এ স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য জাতীয় জীবনের জন্য। স্বাধীনতাকে কবি দেখেছেন বাগানের ধারের স্নিগ্ধতা ও সৌরভের মতো। এ স্বাধীনতাকে মনে হয়েছে কোকিলের গান। এ স্বাধীনতাকে কবি অবলোকন করেছেন বয়সী বটের পাতার ঝিলিমিলি মন-মাতানো রূপে। শুধু তাই নয়, এ স্বাধীনতা কবির গভীরতম আবেগের, তীব্রতম ভালোবাসার কবিতার খাতা। সমস্ত বাধা-নিষেধ, প্রতিবন্ধকতা, শাসন ও পরমুখাপেক্ষিতা এবং রক্তচক্ষুর দুঃশাসন থেকে মুক্তির মহান বাণী। এ স্বাধীনতাকে কবি তাই তার যেমন ইচ্ছে লেখার কবিতার খাতা বলে বর্ণনা করে তার আবেগের গভীরতাকে পাঠকের কাছে এক অন্তহীন মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

উপসংহার : আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস সুদীর্ঘ ও রক্তাক্ত সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত। কবি 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় সামাজিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন এবং জাতীয় সত্তায় স্বাধীনতাকে কখনো কোমল, কখনো কঠোর উপমা উৎপ্রেক্ষায় চিত্রিত করেছেন। এতে কবির অনন্য ও প্রখর কাব্যমেধার স্বাক্ষর মেলে।

প্রশ্ন : ৩৯ ॥ 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা অবলম্বনে কবির দৃষ্টিতে স্বাধীনতার যে স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে তা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১১]

অথবা, কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা অনুসরণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

অথবা, 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা অবলম্বনে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শামসুর রাহমান পঞ্চাশের দশকের অতি আধুনিক কবি। তাঁর কবিতায় আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাথে সাথে প্রকৃতিপ্রেম ও স্বদেশ প্রেমের অভিপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। কবির 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে সর্বস্তরের জনতার যে বিপুল উদ্বোধন সূচিত হয়েছে তার বাস্তবরূপ চিত্রিত হয়েছে। 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এ কবিতায় কবি স্বাধীনতার স্বরূপ যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা নিচে উপস্থাপন করা হলো :

স্বাধীনতার স্বরূপ : একটি জাতির সামগ্রিক জীবনের মুক্তিচেতনার নাম স্বাধীনতা। মুক্ত জীবনচেতনার এক ভাষাচিত্র শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি। এ কবিতায় কবি স্বাধীনতাকে খণ্ডিত কোনো স্বপ্নময় স্বরূপ হিসেবে তুলে না ধরে একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাফল্য চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি তার পরাধীনতার শৃঙ্খলকে ছিন্ন করার জন্য, স্বাধীনতার সূর্য পুনরুদ্ধার করার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন রক্তাক্ত সংগ্রামের পর তারা স্বাধীনতা লাভ করে। এ মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও তার সর্বপ্রসারী বিকাশ অবলোকন করেছেন। কবি বিচিত্র উপমা ও প্রতীকের তুলিকাস্পর্শে দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা জীবনের জন্য। তাই তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনাকে মূল দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে স্বাধীনতার অর্থকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন।

সাংস্কৃতিক জীবন : বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আমাদের স্বাধীনতার সাংস্কৃতিক রূপ এ উভয় কবির সৃষ্টিকর্মের মাঝে ফুটে উঠেছে। কবির কণ্ঠে–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি, কবির কাছে তা রবীন্দ্রনাথের জরাহীন কবিতার মতো, আনন্দময়ী অবিনাশী গানের মতো চিত্তাকর্ষক ও মনোমুগ্ধকর। এ স্বাধীনতা বাংলার বিদ্রোহী জাতিসত্তার কবি নজরুলের বাবরি দোলানো চুলের মতো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা চির ঐশ্বর্যময়ী।

রাজনৈতিক জীবন : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে আমাদের স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর সাধারণ নির্বাচন, ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের মনে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছে। স্বাধীনতার জন্য শহিদ মিনারে ঝাঁঝালো সভা হয়েছে, পতাকা সহকারে স্লোগান-মুখর বিপ্লবী মিছিল হয়েছে। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি বলেন–

স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা,
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।

এ স্বাধীনতা যেন শহীদ মিনারের উজ্জ্বল সভা, পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।

প্রাকৃতিক জীবন : বাংলার প্রাকৃতিক জীবনের এক অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়। বিস্তৃত ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার কাটা– এসবই গ্রামবাংলার সাধারণ দৃশ্য। মজুর যুবার ঝলসিত দক্ষ বাহুর শক্তিমান পেশি, কালবৈশাখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা, শ্রাবণে অকূল মেঘনা বুক, বাগানের ঘর, কোকিলের গান, বয়েসী বটের ঝিলমিলি পাতায় বাংলার প্রকৃতিকে খুঁজে পাওয়া যায়। কবির দৃষ্টিতে তাই স্বাধীনতা কোনো খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন নয়, ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা; মিলন-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অনুভূতি সংবলিত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় চেতনা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।............
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।

সামাজিক জীবন : আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রামবাংলার সাধারণ কৃষক, শহরের কলকারখানার শ্রমিক-মজুর, দক্ষ-অদক্ষ মুক্তিসেনা, মেধাবী ও সাধারণ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। এরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার স্বাধীনতা। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় তাই এসব শ্রমজীবী ও পেশাজীবীদের নাম উচ্চারিত হয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। কবি স্বাধীনতাকে পেয়েছেন পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমীনে, চা-খানায় আর মাঠে ময়দানের ঝড়ো সংলাপে, উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির ব্যাকুল কাঁপনে এবং নিত্যদিনের কাজকর্মের ফাঁকে অবসর যাপনের বিচিত্র সুখে।

এ স্বাধীনতা বাগানে নির্মিত ঘরের মতো স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক, কোকিলের কুহুতানের মতো মধুবর্ষী, প্রাচীন বটবৃক্ষের ঝিলমিল পাতার মতো মনোরম। তাই কবি বলেছেন, যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা। কবির কবিতার সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপ একই সুরে বাজে।

উপসংহার : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অন্যতম আধুনিক কবি শামসুর রাহমানের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার নানারূপ উন্মোচিত হয়েছে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, তা আমাদের জাতিসত্তার সম্মিলিত আনন্দ-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল। স্বাধীনতা লাভের এই শাশ্বত রূপ কবি নানা চিত্রকল্পে, উপমা রূপকের আশ্রয়ে চমৎকার কবিত্ব শক্তিতে উপস্থাপন করেছেন।

▸▸ প্রশ্ন : ৪০ ॥ 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি স্বদেশের যে বন্দনা করেছেন তা ব্যাখ্যা কর। [ফা. প. ২০১৭]

অথবা, 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান স্বদেশের স্বাধীনতার যে বন্দনা করেছেন তা নিজের ভাষায় লেখ। [ফা. প. ২০০৮, '১৫]

অথবা, "কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা কবির স্বদেশের স্বাধীনতার বন্দনায় এক অনন্যধর্মী কাব্যগাথা।" – আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : কবি শামসুর রাহমান পঞ্চাশোত্তর আধুনিক বাংলা কাব্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। কবির সমৃদ্ধ মেধা-মনন ও জাগ্রত কাব্যগ্রন্থের প্রতীক 'বন্দী শিবির থেকে'

কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় স্বাদেশিক এ রাজনৈতিক ভাবাদর্শের এক গভীর অনুভূতির কথা ব্যক্ত হয়েছে। নিচে প্রশ্নালোকে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

স্বাধীনতার বন্দনায় কবি : কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি দেশ ও জাতির স্বাধীনতায় বিমুগ্ধ, দেশপ্রেমজাত আবেগের বহুমাত্রিক প্রকাশের এক পরিপূর্ণ দলিল। অজস্র বাঙালির রক্তঝরা স্বাধীনতাকে কবি দেশীয় ঐতিহ্যে নানা উপকরণে সজ্জিত করেছেন, জাতির আত্মত্যাগের গৌরবময় অহংকার ও প্রকৃতি-নিচয়ের অনির্বচনীয় অভিব্যক্তিকে কবি উচ্চারিত করে তুলেছেন এভাবে–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা ....
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল। .....
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি......
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।

এমনিভাবে মনের অভিব্যক্তিকে বাঙময় করতে গিয়ে কবি কবিতাটির স্তবকে স্তবকে স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন। কবির চেতনায় স্বাধীনতা রবি ঠাকুরের কবিতা আর গানের মতোই অবিনাশী, বিদ্রোহী কবি নজরুলের মাথার চুলের বাবরি দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা ঐশ্বর্যময়ী। কবি নির্বাচিত বিচিত্র উপমার অলঙ্করণে স্বাধীনতার অমিয় মাধুরী প্রত্যক্ষ করেছেন শহীদ মিনারের উজ্জ্বল সভায়, খুকির তুলতুলে গালে রোদের খেলায়, কৃষকের হাসিতে আর মজুরের গ্রন্থিল পেশিতে, মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিকে, কালবৈশাখীর ঝড়ো হাওয়ায় ও বৃদ্ধ পিতার জায়নামাজের উদার জমিনে, মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে, বোনের হাতের মেহেদির রঙে, গৃহিণীর কালো চুল ও কোকিলের কুহুতানে। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন, ...
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।

কবি স্বকীয় ব্যক্তিত্বের অভিনবত্বে, একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন কবিতার প্রতিটি চরণে চরণে। ইংরেজ কবি Richard Lovelace-এর কবিতায়ও এমনি ধরনের স্বাধীনতার বন্দনা শোনা যায়–

If I have freedom in my love
and in my soul and free,
Angels alone that soar above
Enjoy such liberty.

কবি স্বাধীনতাকে লক্ষ করেন বন্ধুর হাতে তারার মতো উজ্জ্বল রঙিন পোস্টারে, খোকার গায়ের রঙিন জামা, খুকির নরম গালে রৌদ্রের খেলা, বাগানের ঘর, বয়েসী বটের ঝিলমিলি পাতা ও কবির ইচ্ছেমতো কাব্য লেখার খাতার সাথে স্বাধীনতা মিশে আছে। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

এ স্বাধীনতার স্পর্শে সুপ্ত শক্তি হয়ে ওঠে দুর্বার ও অপ্রতিহত। এভাবেই কবি স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে।

উপসংহার : কবি শামসুর রাহমান বাংলাদেশের সন্তান। '৭১-এর মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এ সংগ্রাম, স্বাধীনতা কবিকে দারুণভাবে আন্দোলিত-আলোড়িত করেছে। তাই কবি এমন আকুলভাবে আমাদের রক্তঝরা স্বাধীনতার অকৃত্রিম বন্দনা করেছেন।

⏩ প্রশ্ন : ৪১ ॥ আধুনিক কবি শামসুর রাহমান জীবনের বিচিত্র চিত্রে স্বাধীনতাকে যে বিপুল সৌন্দর্য ও শক্তিতে অবলোকন করেছেন, 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার আলোকে তার পরিচয় দাও।

অথবা, 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান স্বাধীনতাকে জীবনের বিস্তৃত সামগ্রিকতায় উপলব্ধি করেছেন– উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পঞ্চাশের দশকের আধুনিক তারকা কবি শামসুর রাহমান। '৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অনন্য কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি'। কবি স্বাধীনতা সংগ্রামে জনতার আত্মত্যাগ, বিপুল সৌন্দর্য ও শক্তিকে অবলোকন করেছেন এবং এ অসাধারণ মুক্তি চেতনাকে সর্বস্তরের জনজীবনের বিস্তৃত সামগ্রিকতায় উপলব্ধি করেছেন। কবিতার প্রতিটি চরণে তাঁর স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। কবিতায় ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও উপমাগুলোতে আমাদের আবহমান বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। নিচে স্বাধীনতা নিয়ে কবির বিচিত্র অভিধার কথা উপস্থাপিত হলো :

স্বাধীনতার বিপুল সৌন্দর্য ও শক্তি : ব্যক্তি ও ব্যষ্টির বিকাশ এবং অস্তিত্বের পূর্বশর্ত স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য, স্বাধীনতার সূর্য পুনরুদ্ধার করার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন রক্তাক্ত সংগ্রামের পর এ জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। এ স্বাধীনতার সঙ্গে অনেক সংগ্রামী চেতনা জড়িত। এ সংগ্রামের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা ও তার সর্বপ্রসারী বিকাশ অবলোকন করেছেন। কবি বিচিত্র উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীকের তুলিকা স্পর্শে দেখিয়েছেন, স্বাধীনতা জীবনের জন্য, জাতির অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য। কবি বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনাকে মূল দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে স্বাধীনতার অর্থকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলেছেন। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমাদের যে স্বাধীনতা, কবির চোখে তা রবি ঠাকুরের অজর কবিতার মতো আনন্দময় এবং অবিনাশী গানের মতো চিত্তহারী মনোমুগ্ধকর। এ স্বাধীনতা বাংলার বিদ্রোহী কবি নজরুলের মাথার চুলের বাবরি দোলানো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা ঐশ্বর্যময়ী। এ স্বাধীনতা যেন শহিদ মিনারের উজ্জ্বল সভা, পতাকাশোভিত স্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল, ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি, রোদেলা দুপুরে গ্রাম্যমেয়ের অবাধ সাঁতার কাটা, মজুর যুবার ঝলসিত দক্ষ বাহুর শক্তিমান পেশি। এ স্বাধীনতা অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক, বন্ধুর হাতে জ্বলজ্বলে রাঙা পোস্টার। কবির চোখে স্বাধীনতা যেন গৃহিণীর হাওয়ায় ওড়ানো ঘন কালো উদ্দাম চুল, খোকার গায়ের রঙিন জামা, খুকীর তুলতুলে নরম

গালে রৌদ্রের খেলা। কবির ভাষায়–

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুলের ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা–............
স্বাধীনতা তুমি ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।.........
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙিন কোর্তা
খুকির অমল তুলতুলে গালে রৌদ্রের খেলা।

জীবনের বিস্তৃত সামগ্রিকতায় স্বাধীনতা

সামাজিক জীবন : কবি স্বাধীনতাকে সামগ্রিক চিত্রের মাঝে অবলোকন করেছেন। কৃষক, গ্রাম্যমেয়ে, মজুর, যুবা, মেধাবী তরুণ আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য চরিত্র। ফসলের মাঠে কৃষকের অকৃত্রিম হাসি, গ্রাম্য মেয়ের দুপুরের রোদে সাঁতার কাটা, মজুর যুবার পরিশ্রম আর বটের ছায়ায় মেধাবী তরুণের ভাষণে আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে।

সাংস্কৃতিক জীবন : বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবির মতে, আমাদের স্বাধীনতার রূপ এ দু'জন সংস্কৃতিসেবীর সৃষ্টির মাঝে ফুটে উঠেছে। রবি ঠাকুরের অবিনাশী গান আর নজরুলের বিদ্রোহী সুর আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। স্বাধীনতার অস্তিত্বের সাথে এরা যেন মিশে আছেন।

প্রাকৃতিক জীবন : বাংলার প্রাকৃতিক জীবন এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়। বিস্তৃত ফসলের মাঠ, রোদেলা দুপুর, প্রসারিত বটের ছায়া, শ্রাবণের ভরা নদী, উদ্দাম বুনো হাওয়া, বাগানের ঘর, কোকিলের গান, বয়েসী বটের বিচিত্র রঙের পাতা প্রভৃতির মাঝে বাংলার প্রকৃতি ধরা দিয়েছে। স্বাধীনতার স্বরূপ অন্বেষণে ব্যবহৃত উপমানগুলোতে কবি বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্যই ফুটিয়ে তুলেছেন।

রাজনৈতিক জীবন : আন্দোলন সংগ্রামই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের মূল উপজীব্য। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবহ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি; রাজপথের স্লোগানমুখর সংগ্রামী মিছিল, বটতলায় বাংলার রাজনৈতিক সূতিকাগারের চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায়।

উপসংহার : কবির দৃষ্টিতে স্বাধীনতা কোনো খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন কল্পনার বাস্তবরূপ নয়; ঐক্যবদ্ধ জীবনের প্রচেষ্টা, মিলন-বিরহ, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব অনুভূতি সংবলিত এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী অপরাজেয় চেতনা। স্বাধীনতা জীবনের সমগ্রতাকে ধারণ করে, মুক্তি দেয় সামগ্রিক সত্তাকে। স্বাধীনতা ব্যক্তিজীবনের জন্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য জাতীয় জীবনের জন্যও। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায়, লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত যে স্বাধীনতা, তা আমাদেরই জাতিসত্তার সম্মিলিত আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার ফসল। চির-কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতালাভে বিমোহিত কবি বিচিত্র ভঙ্গিমায় দেখেছেন স্বদেশের স্বাধীনতাকে অতৃপ্ত রূপ-কল্পনায়। সামগ্রিক ভাব-দ্যোতনায় 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক চেতনার এক ঐক্যবদ্ধ অমর ভাষাচিত্র। এ অনন্য প্রতিভার জন্য কবি বাংলা কাব্যজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

» প্রশ্ন : ৪২ ॥ কবি শামসুর রাহমান বিরচিত 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : শামসুর রাহমান আধুনিক কালে বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর অনন্য প্রতিভা পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। নাগরিক জীবনের প্রত্যাশা, হতাশা, অনুরাগ, বিচ্ছিন্নতা ও সংগ্রাম তাঁর কবিতায় বস্তুনিষ্ঠভাবে বিধৃত হয়েছে। অতি আধুনিক কালের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর কবিতায় পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবচিত্র তাঁর কবিতায় একটি বড় স্থান দখল করে আছে। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত একটি অনন্য কবিতা।

নামকরণের রীতি : নামকরণ সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর মধ্য দিয়ে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাব অনেকাংশই ফুটে ওঠে। এজন্য কবি-সাহিত্যিকগণ নামকরণে বিশেষ সতর্ক থাকেন। মনীষী Cavendis-এর মতে, 'A beautiful name is better than a lot of wealth.' অর্থাৎ একটি সুন্দর নাম অঢেল সম্পদের চেয়ে উত্তম। নামকরণে কবি-সাহিত্যিকগণ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু, চরিত্র এবং অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর গুরুত্বারোপ করে থাকেন। আলোচ্য কবিতার নামকরণ করা হয়েছে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ওপর ভিত্তি করে। নিচে 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার নামকরণের সার্থকতা উপস্থাপিত হলো :

নামকরণের ভিত্তি : প্রবন্ধ, কবিতা বা গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের অভীষ্ট লক্ষ্য, ভাব ও বক্তব্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তাই সাহিত্যে নামকরণের ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হয়। যেমন :

- **রচনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বা বিষয়বস্তু**
- **নায়ক-নায়িকার নাম**
- **স্থান বা কাল**
- **কেন্দ্রীয় চরিত্র**
- **রূপক বা প্রতীকী ব্যঞ্জনা**
- **রচনার মূলভাব।**

নামকরণের সার্থকতা বিচার : আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ একসময় পরাধীন ছিল। অত্যাচার-নির্যাতন আর শোষণে জর্জরিত হয়ে ১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়। এ স্বাধীনতার সাথে অনেক সংগ্রামী চেতনা বিজড়িত। সেই মুক্তি সংগ্রামের পটভূমিতে কবি আলোচ্য কবিতায় নানা উপমা ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনা প্রকাশ করেছেন। বাঙালির প্রাণের অবারিত আবেগের সঙ্গে স্বাধীনতাকে একাকার করে কবি স্বাধীনতার স্বরূপ প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন। রক্তাক্ত সংগ্রামের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তার স্বরূপ চিত্রিত করেছেন কবি তাঁর নিজস্ব অনুভূতির নিরিখে। তিনি কয়েকটি অপরূপ রূপকথার মাধ্যমে তাঁর মনের অফুরন্ত আবেগ রূপায়িত করেছেন এ কবিতায়। মনের আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা ঝরনাধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনো বিধিবদ্ধ প্রকাশরীতির তোয়াক্কা করেননি তিনি। বাংলাদেশের সংস্কৃতির পটভূমি, জনগণের প্রাত্যহিক জীবন আর বাংলার নৈসর্গিক জীবন-বৈশিষ্ট্য কবি আবেগায়িত চিত্তে রূপায়িত করেছেন। এ কবিতায় অপূর্ব সুন্দর আবেগ-উচ্ছলতায় কবি স্বাধীনতার আবহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। সে আবহে সমগ্র মহিমার আলোকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা যুদ্ধের আত্মত্যাগ। কবিতার একমাত্র উপজীব্য যেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সে দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটির নামকরণ 'স্বাধীনতা তুমি' সার্থক ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

উপসংহার : স্বাধীনতা অর্জন যেমন সীমাহীন আত্মত্যাগের ফসল, স্বাধীনতা রক্ষায়ও তেমনি সর্বসাধারণ জনতাকে অতন্দ্র প্রহরীর মতো নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। সমগ্র কবিতায় কবি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার সমাজ জীবন, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির রূপ তুলে ধরেছেন– যা এক অর্থে স্বাধীনতারই ফসল। এ প্রেক্ষিতে কবিতাটির নামকরণ যথার্থ ও সার্থক হয়েছে।

নির্বাচিত কবিতা
ব্যাখ্যাবলি

▶২টি উদ্ধৃতি দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির ব্যাখ্যা করতে হবে – ৫ × ১ = ৫

যে সবে বঙ্গেত জন্মি

▸▸ ব্যাখ্যা : ১ ॥ তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন।
নিজ পরিশ্রম তোষি আমি সর্বজন॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু সপ্তদশ শতকের বিশিষ্ট কবি আবদুল হাকিম বিরচিত কাব্যগ্রন্থ 'নূরনামা'র অন্তর্গত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য কবিতাংশে কবির বাংলা ভাষাচর্চায় আত্মনিয়োগ করার কথা সুন্দরভাবে ছন্দাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : বাংলায় এমন অনেক সাধারণ শিক্ষিত লোক আছে, যারা আরবি ও ফারসি কিতাব পড়তে জানে না। আর এ না জানার কারণে তারা ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। তাদের কল্যাণার্থে কবি বাংলা ভাষাচর্চা তথা বাংলা কাব্য ও সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, যেন সর্বস্তরের শিক্ষিত জনগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তিনি সব ভাষার স্রষ্টা। সব ভাষাই তিনি বোঝেন। যে ভাষাতেই তাঁর কাছে প্রার্থনা করা হোক তিনি তা শোনেন। এজন্য কবির অনুরোধ, কেউ যেন তার মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা না করে। আমরা বাংলাদেশি। আমাদের মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমেই আমরা জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্যচর্চা করব। তাতেই আমাদের সার্বিক কল্যাণ হবে। কবি এ কামনা ব্যক্ত করেছেন আলোচ্য কবিতাংশে।

মন্তব্য : দেশের সব মানুষের কল্যাণের জন্য আমাদের মাতৃভাষাতেই জ্ঞানসাধনা ও সাহিত্যচর্চা করতে হবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২ ॥ যেই দেশে যেই বাক্যে কহে নরগণ।
সেই বাক্য বুঝে প্রভু আপে নিরঞ্জন ॥
অথবা, সর্ববাক্য বুঝে প্রভু কিবা হিন্দুয়ানী।
বঙ্গদেশী বাক্য কিবা যত ইতি বাণী॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি আবদুল হাকিম বিরচিত 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' নামক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর কাছে কোনো ভাষাই অবোধগম্য নয়; বরং সব ভাষাই তিনি বোঝেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা ভাষাচর্চার প্রতি কবি আবদুল হাকিম গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বলেন, যে-কোনো দেশের মানুষ যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, মহান প্রভু আল্লাহ তায়ালা তা বুঝতে পারেন। কারণ তিনি সর্বজ্ঞ। তিনিই সব জাতি ও ভাষার সৃষ্টিকর্তা। একশ্রেণির গোড়া মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ মনে করেন, কেবল আরবি ও ফারসি ভাষাতেই আল্লাহ

রাসুলের কথা বলা যায়, অন্য কোনো ভাষায় নয়। কবি তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করার মানসে বলেন, আল্লাহ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সব ধর্মের সব ভাষাই বোঝেন। যে-কোনো দেশের লোক যে-কোনো ভাষাতে আল্লাহকে ডাকুক না কেন, আল্লাহ তা বুঝতে পারেন।

মন্তব্য : ধর্মের দোহাই দিয়ে কোনো ভাষাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। কেননা মহান আল্লাহ সব দেশের সব ভাষাই বোঝেন। এজন্য প্রতিটি ভাষাই স্ব-স্ব ভাষাভাষীর কাছে শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

» ব্যাখ্যা : ৩ ॥ মারফত ভেদে যার নাহিক গমন।
হিন্দুর অক্ষর হিংসে সে সবের গণ ॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু সপ্তদশ শতকের জনপ্রিয় কবি আবদুল হাকিম বিরচিত 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : সপ্তদশ শতকে একশ্রেণির গোঁড়া মানসিকতাসম্পন্ন লোকের কূপমণ্ডূকতার প্রতি ইঙ্গিত করে কবি আবদুল হাকিম আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা ভাষায় এমন বহু শব্দ আছে, যা সংস্কৃত ভাষা থেকে বিভিন্ন অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে বাংলা রূপ লাভ করেছে। এ কারণেই তৎকালে বাঙালি হয়েও একশ্রেণির গোঁড়া মানুষ মনে করতো, সংস্কৃত হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা। সে ভাষা থেকে যেহেতু বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, সেহেতু বাংলা হিন্দুয়ানী ভাষা। তাদের মতে, আরবি ও ফারসি হচ্ছে কুরআন কিতাবের ভাষা। কাজেই বাংলা বাদ দিয়ে সেসব ভাষায় জ্ঞান সাধনা ও সাহিত্য সাধনা করতে হবে। কিন্তু কবির মতে, 'হিন্দুর অক্ষর' বা সংস্কৃত ভাষা বলে যারা বাংলাকে অশ্রদ্ধা করে, তারা মারাত্মক ভুল করছে। কেননা কোনো ভাষাই কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম বা মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ভাষা হচ্ছে মহান স্রষ্টার এক শাশ্বত দান। বাংলা ভাষা এদেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব বাঙালির মাতৃভাষা। কাজেই 'হিন্দুর অক্ষর' বলে বাংলাকে অবহেলার কোনো যুক্তি নেই। যাদের আধ্যাত্মিক বা মারফত জ্ঞান নেই, তারাই কেবল এ ধরনের ভুলে নিমজ্জিত হয়।

মন্তব্য : মারফত ভেদ তথা জ্ঞানসমুদ্রে যাদের বিচরণ কম, যারা স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন, কেবল তারাই ধর্মের দোহাই দিয়ে ভাষাকে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চায়।

» ব্যাখ্যা : ৪ ॥ আরবী ফারছি শাস্ত্রে নাহি কোন রাগ।
দেশী ভাষে বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত পঙক্তিদ্বয় সপ্তদশ শতকের প্রধান কবি আবদুল হাকিম বিরচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' নামক কবিতা থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃতাংশে কবি মাতৃভাষা বাংলার আপেক্ষিক সুবিধা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : আরবি ও ফারসি ভাষার প্রতি কবি শ্রদ্ধাশীল। কেননা ইসলামী শাস্ত্র কথা আরবি ভাষায় রচিত। তার একটা বিরাট অংশ ফারসিতেও স্থান করে নিয়েছে। প্রধানত এ দুটি ভাষায় আল্লাহ ও আমাদের মহানবী (স)-এর গুণগান করা হয়েছে। কবি যে আরবি বা ফারসি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছেন তার অর্থ এই নয় যে, তিনি আরবি-ফারসি ভাষার প্রতি অবহেলা বা অশ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেছেন। অন্যসব মুসলমান যেরূপ এ ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল কবিও তাই। তবে বাংলাদেশের জন্মগত অধিবাসী হিসেবে তিনি অনুভব করেন যে, মাতৃভাষায় যে-কোনো শাস্ত্রের সারবস্তু হৃদয়ঙ্গম

করা অনেক বেশি সহজ এবং মাতৃভাষাতে শাস্ত্রের মর্ম পুরাপুরি বোঝা যায়। সংগত কারণেই তিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলায় 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

মন্তব্য : মাতৃভাষার প্রতি কবির আজন্ম প্রেম-ভালোবাসা থাকলেও আরবি-ফারসি ভাষার প্রতিও কবি ছিলেন আন্তরিক ও শ্রদ্ধাশীল।

ব্যাখ্যা : ৫ ॥ যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥ [ফা. প. ২০০৮]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি আবদুল হাকিম রচিত কাব্যগ্রন্থ 'নূরনামা'র অন্তর্গত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : বঙ্গভাষার প্রতি হিংসা পোষণকারীদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ প্রসঙ্গে কবি আলোচ্যাংশের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, প্রাণের ভাষা। বাংলা ভাষায় বাঙালিরা যেভাবে তাদের প্রাণের আকুতি প্রকাশ করতে পারে, অন্য ভাষায় তা অসম্ভব। যেসব বাঙালি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করে, কবির দৃষ্টিতে তারা আত্মপ্রবঞ্চক। কবি তাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। এমনকি তাদের বংশ ও জন্ম পরিচয় সম্পর্কে কবির মনে সন্দেহ জাগে। কবির দৃষ্টিতে মায়ের ভাষার প্রতি যাদের আগ্রহ ও ভালোবাসা নেই, মায়ের ভাষার বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, তারা সুসন্তান নয়, তারা দেশের শত্রু। কবি তাদের এ ধরনের মনোভাব ত্যাগ করতে বলেছেন, অন্যথায় এ দেশ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

মন্তব্য : মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও মর্যাদা প্রদর্শন ঈমানের অন্যতম অঙ্গ। এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে।

ব্যাখ্যা : ৬ ॥ দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি আবদুল হাকিমের 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে কবি মাতৃভাষা বাংলাবিদ্বেষীদের প্রতি তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভে যারা আগ্রহী নয়, কিংবা এ ভাষায় বিদ্যাভ্যাসে অনীহা প্রকাশ করে, কবি তাদের বাংলাদেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। দেশ ও ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে কবি এ সাহসী অভিমত ব্যক্ত করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের গৌরব অপরিসীম। মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করা যত সহজ, অন্য ভাষায় তত সহজ নয়। মাতৃভাষার জন্য কবির গভীর মমত্ববোধ রয়েছে। মা, মাটি ও মাতৃভাষা মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। কবির দৃষ্টিতে যারা এদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাদের দেশ ত্যাগ করা উচিত। মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকায় তিনি বিদেশি ভাষার অনুরাগীদের ধিক্কার দিয়ে দেশ ত্যাগের প্রস্তাব দিয়েছেন।

মন্তব্য : যারা মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করে না, তারা বিবেকহীন আত্মপ্রবঞ্চক। তাদের মধ্যে দেশপ্রেম নেই।

**ব্যাখ্যা : ৭ ॥ মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত কবি আবদুল হাকিম বিরচিত 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি বংশানুক্রমে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারীদের প্রতি একটি উপদেশ উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : আমরা যারা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এবং যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাদের বাংলা ভাষাতেই কথা বলা উচিত। আমাদের পূর্বপুরুষগণ পিতৃধারা এবং মাতৃধারা উভয়দিক থেকেই এদেশের অধিবাসী। এদেশের আলো-বাতাসে তারা বড় হয়েছেন। এদেশের ভাষা বাংলাতেই তারা কথা বলেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে আমরা তাদের কাছেই পারিবারিক পরিবেশ এবং মুখের ভাষা লাভ করেছি। আমাদের জীবনধারাও এদেশের আবহাওয়া এবং ভাষায় পুষ্ট। সুতরাং তাদের জীবনধারা উপলব্ধি করতে হলে তাদের মুখের ভাষার বিকল্প নেই। বাংলা ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। বাংলা ভাষায় দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়েই আমাদের কল্যাণ অর্জিত হতে পারে– একথা আমাদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

মন্তব্য : আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজ মাতৃভাষা বাংলাতেই সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করা।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী

**ব্যাখ্যা : ৮ ॥ খাঁচার ভিতর অচিন পাখী
কেমনে আসে যায়।** [ফা. প. ২০১৩]

উৎস : সংকলিত গীতিকবিতাংশটুকু বাউল সম্রাট লালন শাহের অনবদ্য সৃষ্টি 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে আধ্যাত্মিক সাধক লালন শাহ দেহের অভ্যন্তরে স্রষ্টার আসা-যাওয়া সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : কর্তারূপে স্রষ্টা অন্তরে বসবাস করেন। তার মতে, পরমাত্মারূপে স্রষ্টা জীবাত্মার দেহে যাতায়াত করেন। কিন্তু পরমাত্মার আকারহীন প্রেমলীলা কেউ বুঝতে পারে না, যদিও সৃষ্টিকুল তা অনুভব করতে পারে। শক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টার আসা-যাওয়া আমরা দেখতে পাই না। স্রষ্টা আমাদের দেহে বসবাস করেন, অবস্থান করেন, তারপরও তাঁকে আমরা চিনতে পারি না, দেখতে পাই না। এজন্য লালন তাঁকে অচিন পাখি নামে অভিহিত করেছেন। অবলীলাক্রমে তার দেহের অভ্যন্তরে স্রষ্টার নীরব-নিশ্চুপ পদচারণায় হতচকিত হয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, খাঁচারূপ দেহের মধ্যে অচিন পাখি নির্বিঘ্নে আমাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে কেমনে আসে-যায়, যাঁর দর্শন পাওয়ার জন্য লালন অন্তরে বাসনা পোষণ করে আছেন। কবির হৃদয়ের আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা, কিন্তু বিচক্ষণ স্রষ্টা লালনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেহের ভেতর-বাইরে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। কবি স্রষ্টার এই মহিমা দেখে আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁকে পাওয়ার জন্য কবির হৃদয়ের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

মন্তব্য : দেহদরিয়ার মাঝি আত্মারূপী স্রষ্টার কীর্তি-মহিমায় মুগ্ধ কবি উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন।

ব্যাখ্যা : ৯ ॥ খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়। [ফা. প. ২০১৬]
অথবা, ধরতে পারলে মন-বেড়ী
দিতাম তাহার পায়॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলার বাউল সম্রাট লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক অসাধারণ গীতিকবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে স্রষ্টার সান্নিধ্যলাভে লালন শাহের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

বিশ্লেষণ : প্রিয়জনকে অনুভব করলেও তার দর্শন না পেলে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কায়মনোবাক্যে কারো জন্য অপেক্ষা তাকে আরো প্রিয় করে তোলে। বাউলরা প্রেমাস্পদকে পরমাত্মা স্পর্শ করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। তাদের অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়ে যায়, তবুও পরমাত্মার দেখা পাওয়া যায় না। তাই পরমাত্মাকে পূজিতে তাদের এত ব্যাকুলতা। পরমাত্মা দেহের অভ্যন্তরে নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে নীরবে অদৃশ্য হয়ে আসা-যাওয়া করছে। তাঁকে অনুভব করা যায়, কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। বিধাতার বিরহে ব্যাকুল লালন শাহ তাঁকে ভক্তির বাঁধনে বাঁধতে চান। তাই অচিন পাখির পায়ে মন বেড়ি পরিয়ে তাঁকে বন্দি করার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। স্রষ্টার প্রেমে মোহাবিষ্ট বাউল সম্রাট স্রষ্টার দর্শনে যেন পাগল হয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছেন। লালনের ধারণা, দেহকেন্দ্রিক অসাধ্য গূঢ় সাধনা স্রষ্টার দর্শন পাওয়া সম্ভব। এজন্য আট কুঠরি নয় দরজা এবং তার উপরে অবস্থিত সদর কোঠার সতর্ক খবর রাখতে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে চান।

মন্তব্য : এখানে স্রষ্টার দর্শন কামনায় ব্যাকুল লালন শাহের আবদারমিশ্রিত আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। প্রিয়জনের প্রতি অবাধ অধিকারের কথা যেন ব্যক্ত হয়েছে উক্ত উক্তিতে।

ব্যাখ্যা : ১০ ॥ আট কুঠরী নয়-দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা।
তার উপর আছে সদর-কোঠা
আয়না-মহল তায়॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি বাউল লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' নামক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে লালন শাহ দেহকেন্দ্রিক স্রষ্টাসাধনার সূত্র ব্যাখ্যার ইঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাউল মতে, সকল সৃষ্টি মহান স্রষ্টার অংশ। সৃষ্টিদরদি স্রষ্টা সৃষ্টির মাঝেই সদা বিরাজমান। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে স্রষ্টার প্রবেশ, প্রস্থান ও অবস্থান নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেহ সাধনার সাধক পুরুষরা নিজেদের কঠোর সাধনার মাধ্যমে দেহের মাঝে স্রষ্টার অবস্থান বুঝতে পেরে তাঁর সান্নিধ্য পেতে পারেন। লালন শাহ দেহকে অধ্যাত্মবাদের জটিল ধাঁধায় বিভক্ত করে সেখানে স্রষ্টার অবস্থানের সুধাময় সুগন্ধ পেয়েছেন। তার মতে, আট কুঠরি, নয় দরজা এবং ঝলকা কাটা সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে পারলে স্রষ্টার সহজ দর্শন পাওয়া যেতে পারে। কলবের শিশমহলের সদর কোঠায় সম্ভবত স্রষ্টা সমাসীন থাকেন। দেহের নাড়ি-নক্ষত্র বুঝে সে অনুযায়ী সাধনা করলে স্রষ্টা অর্থাৎ অচিন পাখির দেখা পাওয়া যেতে পারে। বাউল সাধনার আধ্যাত্মিক মানুষ ছাড়া এ উপমার সঠিক তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া ভার।

মন্তব্য : নিজেকে চিনলে অর্থাৎ নিজের দেহের নাড়ি-নক্ষত্র বুঝতে পারলে স্রষ্টাকেও অনুভব করা যাবে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১১ ॥ মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে, [ফা. প. ২০০৭]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাউল সম্রাট লালন শাহের বিখ্যাত কবিতা 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' থেকে গৃহীত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে বাউল সম্রাট লালন শাহ খাঁচারূপী দেহের নশ্বরতা তুলে ধরেছেন ছন্দাকারে।

বিশ্লেষণ : সাধারণ মানুষ নশ্বর দেহের পরিচর্যার মাধ্যমে একে সুস্থ রেখে দীর্ঘজীবী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তারা দৃশ্যমান দেহ ছাড়া অদৃশ্য আত্মার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। দেহের রোগ হলে আমরা তা আরোগ্য করার জন্য অনবরত চেষ্টা করি, কিন্তু এই নশ্বর শরীর স্বাভাবিক নিয়মে একদিন চিরনিদ্রায় শায়িত হবে। শত সৌন্দর্যের পসরা নিয়ে যখন দেহ চিরতরে ভেঙে পড়বে, তখন শত চেষ্টায়ও সেটিকে সজীব করা যাবে না। কাঁচা বাঁশের খাঁচা এই দেহ সামান্য আঘাতেই ভেঙে পড়বে। এজন্য আমাদের উচিত, খাঁচাসদৃশ দেহ-অভ্যন্তরে অচিন, অমর, শাশ্বত পাখির পরিচর্যা করা। এই অচিন পাখির সংস্পর্শে নশ্বর শরীর নিয়ে আমরা অমর হওয়ার অমৃত সুধা পান করতে পারি। লালন শাহ আক্ষেপ করেন, তার অবুঝ মন খাঁচারূপী দেহের আশায় সময় ক্ষেপণ করছে, কিন্তু এ দেহ তো কাঁচা বাঁশের তৈরি নশ্বরতায় পরিপূর্ণ। তাইতো লালন শাহ অন্তর্মুখী হওয়ার মাধ্যমে অচিন পাখিকে চিনতে চেয়েছেন।

মন্তব্য : লালন শাহ দেহবাদ দিয়ে আত্মারূপী অচিন পাখির সন্ধানে অনুসন্ধিৎসু হতে প্রেরণা দান করেছেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ১২ ॥ কোন্ দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলার বাউল সম্রাট লালন শাহের বিখ্যাত কবিতা 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে গীতিকবি লালন শাহ আত্মার অবিনশ্বরতা এবং দেহের নশ্বরতা প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বিশ্লেষণ : সুন্দর পৃথিবীতে কেউ মরতে চায় না, কিন্তু মরণ একদিন মানুষকে ঠেলে দেয় মহাকালের গহ্বরে। নশ্বর বিশ্বে নশ্বর মানবদেহের অবিনশ্বর স্রষ্টা পরমাত্মারূপে বসবাস করেন। সৃষ্টির ভালোবাসায় সাড়া দিয়ে স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে বিরাজ করেন। বাউলরা বিশ্বাস করে, দেহকেন্দ্রিক সাধনা দ্বারা পরমাত্মারূপে নিরাকার অচিন পাখিরূপ স্রষ্টাকে সহজে চেনা যায়। তখন দেহের নশ্বরতা পাশ কাটিয়ে মানুষ স্রষ্টার ন্যায় অবিনশ্বরতার অমৃত সুধা গ্রহণ করতে পারে। পলাতক পাখি পরমাত্মা সারাজীবন আমাদের সাথে লুকোচুরি খেলছেন। তিনি আমাদের নিকট কোনোদিন ধরা দেননি। তাঁকে কেবল অনুভব করা যায়। দৈনন্দিন কাজকর্মে, সক্রিয়তায় তাঁর উপস্থিতি আমাদের হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যায়, কিন্তু এই দরদি প্রাণ, নিত্যসঙ্গী নিষ্ঠুরের মতো একদিন নশ্বর দেহ ছেড়ে অজানায় পাড়ি জমান। কাঁচা বাঁশের ভঙ্গুর খাঁচা যেমন সময়ের আবর্তনে বিলীন হয়ে যায়, তদ্রূপ দেহরূপী খাঁচা একদিন ভেঙে পড়ে, আর প্রাণ পাখি অজানা ঠিকানায় নিজে নিজেই চলে যায়।

মন্তব্য : কাঁচা বাঁশের খাঁচাসদৃশ মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর। এ দেহের কোনো নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু আত্মারূপ অচিন পাখি অবিনশ্বর। তবে দেহের মৃত্যুতে এ অবিনশ্বর অচিন পাখিও অনন্তে বিলীন হয়ে যায়।

বঙ্গভাষা

**ব্যাখ্যা : ১৩ ॥ পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি।** [ফা. প. ২০১০]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, অসাধারণ কাব্য প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : মাতৃভাষা পরিহার করে বিদেশি ভাষার প্রতি মোহ ভিক্ষাবৃত্তির শামিল এবং কবি নিজেও মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আলোচ্যাংশে কবি সে দিকটিই তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : যৌবনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি পৃথিবীর একজন বিখ্যাত কবি হওয়ার স্বপ্ন লালন করতেন। এ উচ্চাভিলাষ থেকেই তিনি ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে কলকাতা থেকে মাদ্রাজে গিয়ে ইংরেজি ভাষায় ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যেই কবির ইংরেজি কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা সমালোচকদের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। ফলে কবির সকল আশা-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কবি চলে যান সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে। সেখানে কবি জীবন-জীবিকার ব্যাপারে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কবি প্রত্যক্ষ করলেন, মাতৃভাষার ভাণ্ডার বিবিধ রত্নে পরিপূর্ণ। এ সময়ে কবির শিল্প-প্রতিভা প্রকাশ পায়। এভাবে মাতৃভাষা বাদ দিয়ে বিদেশি ভাষার মোহকে কবি পরধনের প্রতি মোহ বলে ভিক্ষাবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন।

মন্তব্য : কবি প্রথম জীবনে মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বিদেশি ভাষার প্রতি মোহগ্রস্ত হলেও পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

**ব্যাখ্যা : ১৪ ॥ মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।** [ফা. প. ২০১২]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি বলেছেন, বিদেশি ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে কেউ বরণীয় হতে পারে না। কারণ বিদেশি ভাষা শৈবাল আর মাতৃভাষা কমল-কাননের মতো।

বিশ্লেষণ : মধুসূদন দত্ত যৌবনে মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। যৌবনে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে ইংরেজ কবিদের আসরে তিনি নিজের নাম স্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। এ বাসনা পূরণের জন্য তিনি একান্তভাবে ইংরেজি সাহিত্য সাধনায় মনোনিবেশ করেন। শুধু তাই নয়, এ লক্ষ্যে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি। তাঁর সর্বপ্রথম ইংরেজি কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' পাঠক সমাজে

সমাদৃত হয়নি। মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা মধুসূদনের জীবনে পূর্ণতার পরিবর্তে এনে দেয় শূন্যতা ও ব্যর্থতা। তিনি বুঝতে পারলেন, মাতৃভাষা ছাড়া সাহিত্যজগতে খ্যাতি অর্জন সম্ভব নয়। তাই তিনি বাংলায় সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। মাতৃভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চাকে পানিতে ভেসে থাকা শ্যাওলার সাথে খেলা করে বৃথা সময় নষ্ট করার সাথে এবং বাংলাকে মূল্যবান পদ্মফুলের সাথে তুলনা করেন। এ বোধই তাঁকে বাংলা সাহিত্য সাধনায় ব্রতী করে।

মন্তব্য : মানুষ মাত্রই ভুল করে। কবিও প্রথম জীবনে ভুল করেছিলেন। পরে ভুল বুঝতে পেরে তিনি মাতৃভাষাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর নিজ ভুলের সমালোচনা করেছেন কঠোরভাবে।

⏩ ব্যাখ্যা : ১৫ ॥ "ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? [ফা. প. ২০০৭, '১৫, '১৮]

অথবা, স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,
"ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু স্বনামধন্য কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি মাতৃভাষা পরিহার করে যে দৈন্যদশায় পতিত হয়েছিলেন এবং বিদেশি ভাষার প্রতি কবির কীভাবে মোহভঙ্গ ঘটেছিল, আলোচ্যাংশে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যৌবনে উচ্চাভিলাষী হয়ে বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। শুধু তাই নয়, এ উচ্চাভিলাষ পূরণার্থে তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে ভাষায় কবিতা রচনা করে তিনি ইংরেজ কবিদের মতো খ্যাতি অর্জন করতে চেয়েছিলেন। এ বাসনা পূরণের জন্য কবি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা ছেড়ে মাদ্রাজ গমন করেন এবং সেখানে থাকাকালে তার 'The Captive Ladie' নামে একটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায়। কিন্তু তাতে তিনি খ্যাতিলাভ করতে পারেননি। ফলে তাঁর বিদেশি ভাষার প্রতি মোহ ভেঙে যায়। কবি তখন সুদূর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে গমন করে বিদেশ বিভূঁইয়ে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন এবং নিজের ভুল বুঝতে পারেন। ফলে তিনি আত্মতাড়িত হয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনা শুরু করেন। তিনি অন্তর থেকে বুঝতে পারেন, মাতৃভাষা বাংলা অনেক সমৃদ্ধ, যার অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে বহু মণিমাণিক্য। আর সে সমৃদ্ধ ভাষায় সাহিত্যচর্চা ত্যাগ করে আজ কবির ভিখারিদশা হয়েছে।

মন্তব্য : মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করে সে ভাষা ও সংস্কৃতির আন্তরিক চর্চা একজন কবি-সাহিত্যিককে খ্যাতি এনে দিতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে সে খ্যাতি অর্জন সম্ভব নয়।

⏩ ব্যাখ্যা : ১৬ ॥ হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত পঙক্তিদ্বয় বাংলা সনেটের প্রবর্তক মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত 'বঙ্গভাষা' নামক কবিতা হতে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষার বিশাল ভান্ডারকে অজ্ঞতাবশত কবি অবহেলা করেছেন– আলোচ্যাংশে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কবি যৌবনের উন্মেষকালে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে খ্যাতি পেতে চেয়েছিলেন। এজন্য স্বদেশ, ধর্ম ও ভাষা ত্যাগ করে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন এবং The Captive Ladie নামে ইংরেজিতে কাব্য রচনাও করেন। কিন্তু তা পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়নি, বিধায় তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। বিদেশের মাটিতে এ সময় তিনি নিদারুণ অর্থ-সংকটে পড়েন এবং দুঃখ-কষ্টে দিন যাপন করেন। কবির এরূপ দুর্দশা দেখে স্বপ্নে কুললক্ষ্মী এর কারণ জানতে চান। তিনি কবিকে আদেশ দিয়ে বলেন, কবির মাতৃভাষা ও সাহিত্য ভান্ডার অজস্র মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ণ, তবে কবির এ ভিখারি দশা কেন। কুললক্ষ্মীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবির আত্মোপলব্ধি ঘটে এবং স্বদেশি ভাষায় সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিলাভ করেন। বাংলা ভাষার বিশাল ভান্ডারকে দূরে রেখে ইংরেজি সাহিত্যচর্চা কবির জীবনের বড় ভুল ছিল এবং তিনি অজ্ঞতাবশত মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করেছেন।

মন্তব্য : মাইকেল মধুসূদন দত্ত অজ্ঞতাবশত বাংলা ভাষার বিশাল ভান্ডারকে অবহেলা করেছেন। আর এজন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন। অবশেষে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন এবং খ্যাতিলাভ করেন।

» ব্যাখ্যা : ১৭ ॥ পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সনেটের রূপকার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে বলা হয়েছে, কবির মাতৃভাষা বাংলার শব্দভান্ডার অন্য অনেক ভাষা থেকে সমৃদ্ধ এবং এ ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে পরম আত্মতৃপ্তি লাভ হয়।

বিশ্লেষণ : মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে বিদেশি ভাষার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইউরোপের প্রতি ছিল কবির দুর্বার আকর্ষণ। তিনি ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য রচনা করে খ্যাতিমান ইংরেজ সাহিত্যিকদের আসরে তাঁর নাম যুক্ত করার উচ্চাশা পোষণ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন এবং ইংরেজি ভাষায় 'Captive Ladie' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর কাব্য ইংরেজি সাহিত্যে সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়তে পারেনি। তিনি বুঝতে পারেন, বিদেশি ভাষায় সাহিত্য সাধনা করে কখনো খ্যাতিলাভ করা যাবে না। এই বোধোদয় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে কবি অনুভব করলেন, বঙ্গজননী তাকে যেন নতুন স্বপ্নে আহবান জানাচ্ছে, ভিনদেশি ভাষার কাছে সাহিত্যখ্যাতি ভিক্ষা না করে তিনিও যেন ফিরে যান আপন ঐতিহ্য ভান্ডারের কাছে। ফলে তিনি আবার বাংলা ভাষায় সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে খ্যাতিলাভ করেন। জীবনের এ পর্যায়ে তিনি বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ববোধ দেখিয়ে এ ভাষাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেন উদ্ধৃত পঙক্তিদ্বয়ে।

মন্তব্য : প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা তার কাছে বেশি প্রিয়, বেশি সমৃদ্ধ। কবি যদিও প্রথমে সুসমৃদ্ধ মাতৃভাষা বাংলাকে অবজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মোহভঙ্গ হলে তিনি নিজ ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু করেন।

ঐকতান

**▸▸ ব্যাখ্যা : ১৮ ॥ বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী–**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : মানবজীবনে পূর্ণতা সাধনের অসম্ভাব্যতা ও সীমাবদ্ধতা অকপটে স্বীকার করে কবি এ চিরন্তন সত্য তুলে ধরেছেন আলোচ্যাংশে।

বিশ্লেষণ : কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত হয়ে নিজের জানা-অজানা সকল বিষয়ের পরিমাপ করেছেন। আহরিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে তিনি বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডারকে অনুভব করে এ সত্যে উপনীত হয়েছেন যে, তিনি বিস্তৃত এ পৃথিবীর যৎসামান্যই জানতে পেরেছেন। দেশে দেশে বহু নগর, বন্দর, রাজধানী রয়েছে; যা আমাদের অদেখাই রয়ে গেছে। তাছাড়া মানুষের কত কীর্তি, কত নদী-গিরি-সিন্ধু-মরু, কত অজানা জীব, অপরিচিত তরু আমাদের অগোচরে রয়ে গেছে। বিশাল বিশ্বের আয়োজনে আমাদের মন কতই বা আর ধারণ করার সুযোগ পায়। কবিগুরুও স্বীকার করেছেন, বিশ্বের বিশাল আয়োজনের মধ্যে তাঁর মন অতি ক্ষুদ্র একটি কোণে পড়ে আছে। অর্থাৎ বিশ্বজ্ঞান-ভাণ্ডারের এক নগণ্য পরমাণু মাত্র তিনি জানতে পেরেছেন।

মন্তব্য : এ বিশ্বের বিশাল জ্ঞান-ভাণ্ডার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর নয়। কবিগুরুও স্বীকার করেছেন, তিনি এর অতি নগণ্য পরমাণুমাত্র জানতে পেরেছেন।

**▸▸ ব্যাখ্যা : ১৯ ॥ জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।।**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি, নোবেল বিজয়ী, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবিগুরু আলোচ্যাংশে বিস্তৃত পৃথিবীর বিবিধ জ্ঞান সংগ্রহের উপায় হিসেবে গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিশাল বিস্তৃত এ পৃথিবীর সবকিছু মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব। দেশে দেশে অবস্থিত বহু নগর, নদ-নদী, মরু-পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর ও গ্রহ-নক্ষত্র জানার অগোচরে থেকে যায়। সাহিত্যের সকল শাখা-প্রশাখায় বিচরণ করার পরেও কবি জীবনসায়াহ্নে নিজের অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। নিজ জ্ঞানের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কবি সদা সচেতন। তাই তিনি গ্রন্থগত বিদ্যা অর্জন করেন। এছাড়া তিনি পাঠ করেন দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। অক্ষয় উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে গ্রন্থগত জ্ঞানের আলোয় উজ্জীবিত হয়েছেন কবি। আপন জ্ঞানের দীনতা তিনি এভাবে ভিক্ষালব্ধ ধন দ্বারা পূরণ করে থাকেন। কারণ আমাদের এ ক্ষুদ্র জীবনে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। কাজেই জ্ঞানের এ শূন্যতা একমাত্র গ্রন্থগত বিদ্যার মাধ্যমে কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব।

মন্তব্য : ভাবাবেগে কিংবা কল্পনায় সমগ্র বিশ্বে অবাধ বিচরণ সম্ভব হলেও বাস্তবে তা অকল্পনীয়। অথচ বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অপরিহার্য। তাই কবি গ্রন্থ পাঠেই জ্ঞানানুশীলনের

পন্থা অবলম্বন করেছেন, যদিও তিনি এতে তৃপ্ত নন। এজন্য পুঁথিগত বিদ্যাকে তিনি 'ভিক্ষালব্ধ ধন' বলেছেন।

**ব্যাখ্যা : ২০ ॥ আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি–
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক,
রয়ে গেছে ফাঁক।**

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবিগুরু জীবনসায়াহ্নে নিজ শিল্পকর্মের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে উল্লিখিত পঙ্ক্তিগুলো উচ্চারণ করেছেন। যার মর্মকথা হচ্ছে, পৃথিবীর কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাঁশির সুর সর্বত্র পৌছতে পারেনি; বরং সুরসাধনার উচ্চশিখরে পৌছতে অনেক দূরত্ব রয়ে গেছে।

বিশ্লেষণ : কবি তাঁর বিশ্বমাত্রিকতায় পৌছাতে চেয়েছেন, কিন্তু পারেননি। তাঁর কাব্য সাধনায় অপূর্ণতা রয়ে গেছে। জীবনসায়াহ্নে এসে কবি 'ঐকতান' কবিতার মাধ্যমে তাঁর কাব্যকীর্তির অসংকোচ ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন এবং জানিয়েছেন, তাঁর সৃষ্টি অসামান্য হলেও অপূর্ণতার গ্লানি থেকে মুক্ত নয়। কবি সমাজের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষগুলোর দিকে সীমাহীন মমতা নিয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের সম্পদভারে আত্ম-অবগাহনের মাধ্যমে নিজের কাব্য প্রতিভার পরিধি ব্যাপ্ত করতে চেয়েছেন কবি। কিন্তু কবির এ বিশ্বভাবনার আকাঙ্ক্ষা সমাজ সংসারের শত বাধার কারণে পূর্ণ হতে পারেনি। বিশ্বপ্রকৃতির অপরিসীম জ্ঞান কবির জানার অন্তরালেই রয়ে গেছে। তাঁর কাব্য সর্বশ্রেণির মানুষের মাঝে একাকার হতে পারেনি। কবির এ অতৃপ্তি তাঁর প্রতিভার সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি যে অপার কাব্যশক্তিধারী ও প্রখর মেধার অধিকারী ছিলেন, তা আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে।

মন্তব্য : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্য প্রতিভার দরুন বিশ্বস্বীকৃতি লাভ করেছেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির মাধ্যমে। যদিও প্রাকৃতজনের জন্য তা ছিল অসম্পূর্ণ ও ক্রটিপূর্ণ।

**ব্যাখ্যা : ২১ ॥ কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধ ক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিত থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবিগুরু বিশ্বচেতনায় অবগাহনের স্বকীয় ভাবনা প্রকাশ করতে আলোচ্য পঙ্ক্তিগুলোর অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : জীবনসায়াহ্নে কবি তাঁর জ্ঞানের মূল্যায়ন করে যখন বুঝলেন, তিনি বিশ্বায়ত জ্ঞানলাভ করতে পারেননি, তখন তিনি আহত হন। তাই তিনি জগতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিচিত্র প্রকৃতি, মনুষ্যকীর্তি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানার জন্য গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ বাস্তবে ক্ষুদ্র মানবজীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে সামান্য শক্তি নিয়ে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ অসম্ভব। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের মানচিত্রগত ভিন্নতা, অবাধ চলাচলের সীমিত সুযোগ, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষাগত পার্থক্য বিশ্বচেতনার পরিপুষ্টির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে কল্পনাবিলাসী কবির পক্ষে এমন পার্থিব বাধা যথেষ্ট নয়। কারণ কবির

কল্পনা ও ভাবরাজ্যের পরিসীমা নেই, নেই কোনো জাতিগত বৈষম্য ও ভৌগোলিক বাধা। কবি আত্মানুভূতির মাধ্যমে সবার সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। কল্পলোকের ডানায় ভর করে তিনি পৃথিবী পরিভ্রমণ করেছেন। নিজের চেতনালোকের মাধ্যমে অনুভব করেছেন, পৃথিবীর সব মানুষের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না একই। মানচিত্রের সীমানা অনুভূতির জগতে অচল। সেজন্য কবি বিশ্বের সাথে একাকার হতে চেয়েছেন।

মন্তব্য : আলোচ্য কবিতাংশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভাবনার আকুতি মূর্ত হয়ে উঠেছে। কল্পনার জগতে অবগাহন করে কবি বুঝতে চেয়েছেন জগতের অপার সম্ভার।

» ব্যাখ্যা : ২২ ॥ সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন-অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিরসত্য কথাটি উচ্চারণ করেছেন তা হলো মানবহৃদয় দেশ, কাল ও ভূখণ্ডের ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

বিশ্লেষণ : এ পৃথিবীর সৃষ্টিনিচয় বড়ই বিচিত্র। কোথাও দুর্গম পর্বত, কোথাও তুষাররাজ্য, কোথাও প্রবলধারায় বহমান ঝরনা, কোথাও অসীম সবুজ সমতলের বিস্তার। জীবজন্তু, গাছপালা, নিসর্গ এসবও দেশ থেকে দেশে ভিন্নতর। আছে মনুষ্যকীর্তি ও সভ্যতার নানা বিচিত্র সমারোহ। এ সবকিছুই দেখার এবং শেখার। স্রষ্টা পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড মানচিত্রে বিভক্ত না করলেও আজ বিশ্বগোলক রাজনৈতিকভাবে খণ্ডবিখণ্ড। ভূমির গঠনগত কারণে আছে দুর্গমতার বাধা। বিশ্ব ভ্রমণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন এবং বিশ্ববৈচিত্র্যের সন্ধানে উল্লিখিত বাধা ছাড়াও রয়েছে সময়, অর্থ ও জীবনীশক্তির সীমাবদ্ধতা। সেজন্য বিশ্বলোক আমাদের নিকট রয়ে যায় অদেখা, অনুন্মোচিত। বস্তুজগতের রূপ ও প্রকৃতি দেশ থেকে দেশে, জাতি থেকে জাতিতে ভিন্নতর হলেও মানব-মনের জগৎ অভিন্ন। দেশ কালভেদে মনোজাগতিক স্বরূপ একই। এ সত্ত্বেও মানব-মনের বৈচিত্র্য ও দুর্গমতা কম নয়। অসীম এক রহস্যঘন জগৎ মানুষের মন। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শরীরী অস্তিত্বে যাওয়া-আসা করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনোরাজ্যের রহস্যঘেরা জগতে সহজে প্রবেশাধিকার মিলে। যদিও কবির কাজ মানব-মনের এ বিচিত্র রহস্যময়তার উদঘাটন প্রচেষ্টা। তথাপি এ জগজ্জীবনের চেয়ে মনোজীবনের দুর্গমতা সম্পর্কে তিনি সচেতন।

মন্তব্য : জগৎ সংসারের বিবিধ আইন-বিধি, দেশ ও সমাজের প্রচলিত বিবিধ সংস্কার মানুষের অবাধ বিচরণে বাধা দেয়। যদিও ভাবজগতে এর কোনো বাধা নেই।

» ব্যাখ্যা : ২৩ ॥ চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।

উৎস : ব্যাখ্যেয় কবিতাংশটুকু নোবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবিগুরু আলোচ্যাংশে জীবন সংসারে বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি মাটিঘনিষ্ঠ মেহনতি মানুষের সাথে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : ভৌগোলিক কাঠামোপূর্ণ বহির্জগতের বাইরে আরেকটি জগৎ আছে, তা হলো মানুষের মনোজগৎ। আর এ মনোজগৎ বড়ই বিচিত্র ও বিশাল। দেশ-কালভেদে এ জগতের কোনো রূপান্তর নেই। কবির চেতনায় মানুষের মনোজগৎ পার্থিব জগতের চেয়েও দুর্গম। পৃথিবীতে বিচিত্র পেশার, নানা জাতের, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের উপস্থিতি রয়েছে। আছে অতি সাধারণ কৃষি ও পেশাজীবী মানুষ। এসব মানুষের রয়েছে নিজস্ব হৃদয়ানুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবকল্পনা। একজন জীবনঘনিষ্ঠ কবিকে তাঁতি, জেলে, কৃষকসহ নিম্নপেশার মানুষের খবর রাখতে হয়। তাদের জীবনকে নিজের কাব্যকল্পনার অনুষঙ্গ করতে পারলে একজন মহৎ কবির সামাজিক দায় অনেকাংশে লাঘব হয়। নানা পেশার মানুষের যে কর্মপ্রবাহ, তারই অবদানে জীবন সংসারের চাকা ঘোরে। কাজেই এসব সাধারণ মানুষের স্বীকৃতিও সাহিত্যে সংস্থাপিত হওয়ার দাবি রাখে। কিন্তু তাদের সাথে গভীরভাবে না মিশলে, একাত্ম হতে না পারলে, তাদের সুখ-দুঃখ-জীবনযন্ত্রণা উপলব্ধি করা সহজ নয়। সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবন সম্পর্কে উপলব্ধিশূন্য সাহিত্য অন্তঃসারশূন্য হতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাকৃতজনের সাথে তাঁর দূরত্ব ঘোচাতে চান। তবে তিনি সমাজের বিত্তশালীদের অন্তর্ভুক্ত বলে এ দূরত্বের ফাঁকটুকু রয়েই গেছে। তিনি ভাবেন, এটা তাঁর কবিকীর্তির বড় ধরনের দুর্বলতা।

মন্তব্য : কবি নিজেকে সাধারণ মানুষের কাতারে শামিল করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তা আর হয়ে ওঠেনি সামাজিক দূরত্বের কারণে।

» ব্যাখ্যা : ২৪ ॥ মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবিগুরু জীবনসায়াহ্নে তাঁর রচনার দুর্বলতা আবিষ্কার করে প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রবেশের অক্ষমতা প্রকাশ করতে উক্ত চরণদ্বয় উচ্চারণ করেছেন।

বিশ্লেষণ : সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন জ্ঞান, দর্শন, তত্ত্ব ও জীবনবোধের প্রকাশ ঘটে, তেমনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ এবং জীবনচিত্রও পরিস্ফুটিত হয়। আমাদের নাগরিক সাহিত্যের অধিকাংশই উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত জীবনকেন্দ্রিক। সমাজের কৃষক, কামার, জেলে, তাঁতিসহ বিপুল শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র্য ও জীবনপদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রসাহিত্যে উচ্চ ভাবাদর্শ ও অধ্যাত্মবাদের ফলে নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র উপেক্ষিত হয়েছে। তিনি আত্মমূল্যায়নপূর্বক এ দুর্বলতা আবিষ্কার করে বলেছেন, তিনি উচ্চবংশে জন্মেছিলেন, তার ছিল পারিবারিক সীমাবদ্ধতা। ফলে তিনি শ্রেণিবৈষম্যের গণ্ডি অতিক্রম করতে সক্ষম হননি এবং অতি সাধারণ মানুষের জীবন বাস্তবতা ও শ্রেণি-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানলাভ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অভিজ্ঞতাবিহীন সাহিত্যের অন্তঃসারশূন্যতা সম্পর্কেও কবি সচেতন। তাই কবি সজ্ঞানেই নিম্নবিত্তের জীবনকথা তার সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য করেননি। এটা কবির দৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্য ও সংগীতকলার বড় ধরনের ত্রুটি এবং সীমাবদ্ধতা। এটা তাঁর দুর্বলতাও বটে। কবি এ সীমাবদ্ধতাটুকু অতিক্রম করার জন্য জীবনঘনিষ্ঠ কবিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্তব্য : কবি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন। তাঁর বংশ গৌরব তাঁকে প্রান্তিক মানুষের কাছে আসতে দেয়নি। তাঁর এ সচেতন স্বীকারোক্তি তাঁর কবিসত্তার সততারও প্রমাণ।

» ব্যাখ্যা : ২৫ ॥ আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।। [ফা. প. ২০০৯, '১৪, '১৫]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্যাংশে তাঁর কাব্যসম্ভারের বিষয়গত সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলা সাহিত্যগগনে বিশ্বায়ত প্রতিভা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। জীবনসায়াহ্নে কবি আত্মমূল্যায়ন করে উপলব্ধি করলেন, তিনি উচ্চমার্গীয় দর্শন ও অধ্যাত্মবাদ নিয়ে সাহিত্য রচনার কারণে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সর্বদা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তিনি সর্বদা উচ্চবিত্তদের নিয়ে সাহিত্যজগৎ সৃষ্টি করেছেন। চাষি, তাঁতি, কামার-কুমারের শ্রমের ওপর নির্ভর করে এ জগৎ-সংসার চলছে। কারণ চাষি চাষাবাদ করে, তাঁতি কাপড় বোনে এবং কামার চাষের উপকরণ প্রস্তুত করে। তাদের কর্মভার বিচিত্র ও বহুদূর প্রসারিত, কিন্তু কবি সমাজের উচ্চবিত্তদের মঞ্চে বসে আছেন। কবি মাঝে মাঝে ওদের পাড়ায় প্রবেশের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শ্রেণিবৈষম্যের কারণে প্রবেশের সুযোগ হয়নি। নিজের হৃদয়ের সাথে দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের হৃদয়ের যোগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কবি নিজেই এ ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, তাঁর কবিতা বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী হতে পারেনি। নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে এমন মন্তব্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে বিরল।

মন্তব্য : বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কাব্যের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে জীবনঘনিষ্ঠ রচনার জন্য নবীন কবিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

» ব্যাখ্যা : ২৬ ॥ যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।
অথবা, সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনসায়াহ্নে তাঁর কাব্যশিল্পের অপূর্ণতা ও দুর্বলতা নিরূপণ করেন। তাঁর এ অসম্পূর্ণ কাজ করার জন্য তিনি মাটিঘেঁষা কবিদের কাঁধে দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : বিংশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলা সাহিত্যে ইউরোপিয়ান শিল্পচর্চার ধারা (Arts for arts sake) চালু হওয়ার ফলে বাংলা কাব্যসাহিত্যে নিরঙ্কুশ শিল্পানুসরণ তথা আধুনিকতার চরম বিকাশ সাধিত হয়। আর কবিতা হয়ে ওঠে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত শ্রেণির সংস্কৃতি, রুচি ও ফ্যাশনের অংশ। আর সঙ্গত কারণেই এসব কাব্যে গ্রামবাংলার নিরক্ষর, শ্রমজীবী ও নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনচিত্র এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন

ঘটেনি। স্পর্শ করেনি সাধারণ মানুষের রুচি ও সাংস্কৃতিক চেতনাবোধকে। ফলে এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিল্প-সাহিত্যের ছোঁয়া পেতে ব্যর্থ হয়। অথচ যে-কোনো ভাষার সাহিত্য সুষমায় অবগাহনের অধিকার সবার সমান। অসীম প্রতিভাধর কবি তার নিপুণ শৈল্পিক সৃষ্টি নিয়ে বাংলা সাহিত্য গগনে আবির্ভূত হন; যদিও তিনি তার কাব্যে প্রাকৃতজনদের জীবনচিত্র অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি, পারেননি আভিজাত্যের চৌকাঠ মাড়িয়ে নিম্নবিত্তের কুঁড়েঘরে উঁকি দিতে। তবে জীবনসায়াহ্নে তিনি এরূপ দুর্বলতার বিষয় উপলব্ধি করে তাঁর শিল্পকর্মের অপূর্ণতা খুঁজে পান। তাই তিনি জীবনঘনিষ্ঠ, মাটিঘেঁষা লৌকিক কবিদের আগমনের প্রত্যাশায় উদ্বেলিত। তিনি মনে করেন, একমাত্র মাটিঘেঁষা লৌকিক কবিরাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উপভোগ্য লৌকিক সাহিত্য রচনা করে তাঁর সাহিত্যের অপূর্ণতা নিরসনে সক্ষম হবেন।

মন্তব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি বটে; কিন্তু তিনি সমাজের নিরক্ষর, নিম্নবিত্ত ও বৃহত্তর সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

**» ব্যাখ্যা : ২৭ ॥ সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আর্টনির্ভর সাহিত্য তথা নিরঙ্কুশ শিল্পানুসরণ বা জীবনমূল্যবর্জিত বিশুদ্ধ শিল্পসৌকর্যময় সাহিত্যের অসারতা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কবি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : অধুনা বাংলা সাহিত্য ইউরোপীয় আর্টনির্ভর শিল্পসৌকর্যময় নাগরিক সাহিত্যেরই প্রতিভূ। বিশুদ্ধ শিল্পানুসারী সাহিত্যের প্রসারে কবিতা বিমূর্ত ও বিষয়নিষ্ঠ হয়ে পড়ে। ফলে সাহিত্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির রুচি, ফ্যাশন ও জীবনবোধের পরিচায়ক হয়ে ওঠে এবং সাহিত্যে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্র অবলম্বিত না হয়ে মধ্যবিত্তের জীবনধারাই প্রাধান্য পায়। ফলে মাটি ও মানুষের সাথে সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়। গ্রামীণ সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে লৌকিক সাহিত্য, পল্লিগীতি, কবিগান আনন্দধারা বইয়ে দিত। শহরায়ন ও নাগরিক সাহিত্যের বিস্তারে এসব পল্লিসংস্কৃতির উপকরণ দিন দিন হারিয়ে যায়। কবিকুল যে কাব্যধারায় অবগাহন করে তা বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র ও স্পর্শবঞ্চিত হয়ে পড়ল। উপরন্তু ইউরোপীয় শিল্পনির্ভর সাহিত্যচর্চাকে বিশুদ্ধ শিল্প মনে করে আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকগণ যেভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য নকল করা শুরু করেছে তাকে কবি চৌর্যবৃত্তি বলে অভিহিত করে বলেছেন, এটা আমাদের জন্য মোটেও শুভ নয়, ভালো নয়; বরং আর্টনির্ভর শিল্পের অনুসরণকে তিনি শৌখিন মজদুরি মনে করেন। তার মতে, এর ফলে সামগ্রিক জীবন ও সাহিত্যধারার মধ্যে সুস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়।

মন্তব্য : কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্টনির্ভর শিল্পসৌকর্যময় সাহিত্যের অসারতা উপলব্ধি করতে পারলেও তাঁর পক্ষেও উচ্চ ও মধ্যবিত্তের গণ্ডি অতিক্রমের মাধ্যমে শৌখিন মজদুরি পরিহার করা সম্ভব হয়নি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৮ ॥ প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু নোবেল বিজয়ী কবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : দেশের অতি সাধারণ, নিরক্ষর, শ্রমজীবী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপযোগী জীবনঘনিষ্ঠ সাহিত্যের প্রসারে নবীন ও লৌকিক কবিদের প্রতি কবি আহ্বান জানিয়েছেন আলোচ্যাংশে।

বিশ্লেষণ : বিংশ শতাব্দীর প্রথম লগ্নে বাংলা কাব্যসাহিত্যে নিরঙ্কুশ ইউরোপীয়ান শিল্পানুসরণ প্রথা চালু হয়। বিশুদ্ধ শিল্পানুসারী কবিতা বিমূর্ত ও বিষয়নিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সাহিত্য তখন উচ্চবিত্ত শ্রেণির রুচি, ফ্যাশন ও জীবনবোধের পরিচয় ধারণ করে। ফলে সাহিত্য দেশের বৃহত্তর সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র আলোচিত না হয়ে মধ্যবিত্তের জীবনধারাই প্রাধান্য পায়। এর অনিবার্য পরিণতিতে মাটি ও মানুষের সাথে সাহিত্যের একটি সুস্পষ্ট দূরত্ব তৈরি হয়। এতে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনে আর সাহিত্যের উপযোগিতা অবশিষ্ট থাকেনি। একদা লৌকিক সাহিত্য, পল্লিগীতি, কবিগান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে আনন্দধারা বইয়ে দিত। শহরায়ন ও নাগরিক সাহিত্যের বিস্তারে পল্লিসংস্কৃতির এসব উপকরণ দিন দিন হারিয়ে যায়। পল্লির বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে নিরানন্দ বাস্তবতা ছাড়া আর কিছুই রইল না। কবিকুল যে কাব্যধারায় অবগাহন করে তা বাংলার সাধারণ মানুষের নিকট অপ্রিয় ও স্পর্শবঞ্চিত হয়ে পড়ল। ফলে সামগ্রিক জীবন ও সাহিত্যধারার মধ্যে সুস্পষ্ট ফাঁক তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথ এ সত্যটুকু উপলব্ধি করলেও তাঁর পক্ষে মধ্যবিত্তের গণ্ডি অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। তাই তিনি এমন নবীন ও লৌকিক কবির প্রত্যাশায় উন্মুখ হলেন; যারা মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের জীবনকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করবেন। তাদের রচিত লৌকিক সাহিত্য বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনে আবারো আনন্দের ধারা বইয়ে দেবে।

মন্তব্য : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্যকে লৌকিক করতে পারেননি সত্য, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি তিনি তাঁর মমত্ববোধ ভুলে যাননি।

▸▸ ব্যাখ্যা : ২৯ ॥ তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারই খ্যাতি–
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ঐকতান' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : ইউরোপীয় কাব্যসংস্কৃতির চৌকাঠ পেরিয়ে গ্রামবাংলার শ্রমজীবী মানুষদের জীবনবোধ নিয়ে যেসব কবি কাব্য রচনা করেন, তাদের প্রতি কবি নমস্কার প্রদান করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিংশ শতাব্দীর নাগরিক সাহিত্যের উচ্চমার্গের শিল্পানুসারী ধারা বাংলার বৃহত্তর নিরক্ষর, শ্রমজীবী সাধারণ জনেগোষ্ঠীর জীবনচিত্র ধারণ করতে ব্যর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকর্মেও এসব মানুষের জীবন ও আবেগ প্রস্ফুটিত হয়নি। উচ্চবিত্তকেন্দ্রিক

আধুনিক সাহিত্যও সাধারণ মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। কেননা অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষের রুচি ও জীবনবোধ উচ্চশ্রেণির শিল্পকলার মাত্রা স্পর্শ করা সম্ভব ছিল না। ফলে বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের কবিতার ধারা সর্বসাধারণ জনগোষ্ঠীর আনন্দ-উপচার হতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শিল্পানুসারী সাহিত্যেরই ধারক ছিলেন। দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমজীবী বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সাথে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ তেমন একটা গড়ে ওঠেনি। কবি এ বাস্তবতাটুকু উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নিস্তরঙ্গ জীবনের নিরানন্দ ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাকৃতজনের উপভোগ্য সাহিত্য রচনায় সিদ্ধহস্ত নতুন কবিদের উত্থান কামনায় উন্মুখ ছিলেন তিনি। তিনি নিজে যা পারেননি তা যেন তাঁর উত্তরসূরিরা সম্পাদন করেন, সে প্রত্যাশা তিনি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন। মাটি ও মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের জন্য যারা সাহিত্য রচনা করেন, তাদের অবদান কবি অসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছেন, তাদের খ্যাতি ও শ্রমে সাধারণ মানুষের উচ্চাসন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাই কবি আগামী দিনের প্রাকৃতজনের কবিদের নমস্কারের মাধ্যমে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে ভুল করেননি।

মন্তব্য : আন্তরিক উচ্চারণে কবিগুরু অনাগত কালের কবির মহিমাকে সুউচ্চ আসন দিয়েছেন এবং গণমানুষের জীবনচিত্র বিষয়ক কাব্য রচনার আহ্বান জানিয়ে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন।

মোহররম

» ব্যাখ্যা : ৩০ ॥ দ্রিম্ দ্রিম্ বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা,
হাঁকে বীর, "শির দেগা, নেহি দেগা আমামা।"

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলাদেশের জাতীয় কবি, বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের 'মোহররম' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেনের ক্ষুদ্র বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হলে তারা দৃঢ় মনোবলে যুদ্ধ শুরু করে। উল্লিখিত পঙক্তিতে তাদের সে মনোবলের দৃপ্ত উচ্চারণ করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কারবালা প্রান্তরে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়। একপক্ষে পাপিষ্ঠ ইয়াযিদের বিশাল বাহিনী। তারা ফোরাতের পানি অবরুদ্ধ করে রয়েছে। অপরপক্ষে কুফার পথে যাত্রারত ইমাম হোসেন (রা)-এর ক্ষুদ্র এক কাফেলা। ইয়াযিদ বাহিনীর অবরোধের মুখে ইমাম হোসেন শিবির স্থাপন করেন কারবালা প্রান্তরে। এদিকে ইয়াযিদ বাহিনী ফোরাতের পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলে ইমাম হোসেনের শিবিরে পানির তৃষ্ণায় হাহাকার ওঠে। তৃষ্ণার্ত নারী-পুরুষ-শিশুরা মৃত্যুসীমায় পৌঁছে যায়। অবশেষে শুরু হয় ভয়াবহ যুদ্ধ। ইমাম হোসেনের কাফেলা সত্যের পক্ষে জীবন বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। তারা রণ দামামা বাজিয়ে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করার ঘোষণা দেয়। বেজে ওঠে রণতূর্য দ্রিম দ্রিম শব্দে। বীর মুজাহিদরা ঘোষণা দেয়, প্রয়োজনে জীবনকে উৎসর্গ করব, তবু সত্য ও শাশ্বত ইসলামের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হতে দেব না।

মন্তব্য : রণাঙ্গনে ইমাম হোসেনের বাহিনীর অনন্য সাহসিকতার প্রকাশ ঘটেছে এখানে। মিথ্যার কাছে মাথানত না করার শিক্ষা পাওয়া যায় কবির এ পঙক্তি থেকে।

» ব্যাখ্যা : ৩১ ॥ পেলো না তো পানি শিশু পিয়ে গেল কাঁচা খুন,
ডাকে মাতা,–"পানি দেবো ফিরে আয় বাছা শুন্।"

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি, বিদ্রোহী কবি, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের 'মোহররম' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কারবালার প্রান্তরে পানির অভাবে শিশু আসগরের মৃত্যুর করুণ পরিণতির কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কুফাবাসীর আমন্ত্রণে ইমাম হোসেন (রা) পরিবার পরিজন এবং সঙ্গীসাথিদের নিয়ে কুফার উদ্দেশে রওয়ানা হন। ভুল পথনির্দেশনায় তাঁরা কারবালা প্রান্তরে এসে উপনীত হন। এদিকে ইয়াযিদের সৈন্যরা তাঁদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলে। ফোরাত নদীও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ইয়াযিদ বাহিনী কর্তৃক। পানির জন্য ইমাম হোসেনের শিবিরে হায় হায় মাতম ওঠে। পানির পিপাসায় ছোট মেয়ে ফাতিমার ছাতি ফেটে যায়। সে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে পানি পানি করে। মরুভূমির তৃষ্ণা যেন তাদের দেহে। পুত্র আসগরকে পানি পান করাতে হোসেন ফোরাতের দিকে যান। পানির পরিবর্তে আসগরের দেহে ইয়াযিদ বাহিনীর নিক্ষিপ্ত তীর বিদ্ধ হয়। তাঁর দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। পানির পরিবর্তে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করে আসগর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পুত্রের করুণ মৃত্যু দেখে মা চিৎকার দিয়ে কাঁদছে আর বলছে, পানি দেব ফিরে আয় বাছা শোন।

মন্তব্য : কারবালা ময়দানে ইয়াযিদ বাহিনীর পাষণ্ডতা দেখে শত্রুর চোখেও পানি এসে যায়। শিশুরাও এ নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা পায়নি।

» ব্যাখ্যা : ৩২ ॥ কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে। [ফা. প. ২০১৬]
অথবা, পুত্রহীনার আর বিধবার কাঁদনে
ছিঁড়ে আনে মর্মের বত্রিশ বাঁধনে। [ফা. প. ২০০৮]

উৎস : আলোচ্য কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, মুসলিম জাগরণের কবি, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মোহররম' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : ইমাম হোসেন (রা)-এর পরিবারবর্গ কারবালার ময়দানে স্বজনদের হারিয়ে কী পরিমাণ শোকের মুখোমুখি হয়েছেন, আলোচ্যাংশে তারই বর্ণনা উপস্থাপিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কুফাবাসীর আমন্ত্রণে কুফায় যাওয়ার পথে ইমাম হোসেন (রা) ভুল পথনির্দেশনায় স্বজনদের নিয়ে উপনীত হলেন কারবালা প্রান্তরে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিল ইয়াযিদের সৈন্যবাহিনী। তারা হোসেনের বাহিনী পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে ফোরাত নদীর কূল ঘিরে রাখে। এদিকে হোসেনের সঙ্গীসাথি ও পরিবারবর্গ অনেক পথ পাড়ি দেওয়ায় তৃষ্ণার্ত ও ক্লান্ত ছিল। ইয়াযিদ বাহিনীর বাড়াবাড়িতে এক পর্যায়ে ইমাম হোসেন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ইমাম হোসেনের সঙ্গীসাথিদের যুদ্ধ-প্রস্তুতি ছিল না। তাই তারা একে একে শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন। শিশুরা মারা যেতে লাগল তৃষ্ণায়। এভাবে একে একে কাসেম, আসগর সবাই শাহাদাতবরণ করে। এক পর্যায়ে ইমাম হোসেন (রা)-ও শাহাদাতবরণ করেন। নীল আকাশ যেন হোসাইনের রক্তে রঞ্জিত হয়। এরূপ অবর্ণনীয় দৃশ্য দেখে কারবালার ফোরাত প্রান্তরে কোনো এক ক্রন্দসী অঝোরধারায় কাঁদছে। সে

কাঁদন আকাশ বাতাস ছেয়ে সীমারের ছোড়াতেও যেন অশ্রু হয়ে ঝড়ে পড়ে। হোসাইনের কাফেলার মধ্যে একমাত্র পুরুষ শিশু জয়নাল জীবিত ছিল। স্বামী এবং পুত্রদের হারিয়ে নবি পরিবারের নারীরা হৃদয়বিদারক শোকের মাতমে অবতীর্ণ হন। সত্যিই কারবালার এরূপ হৃদয়বিদারক মর্মান্তিক ঘটনা এক করুণ ইতিহাস।

মন্তব্য : কারবালার হৃদয়বিদারক মর্মস্পর্শী করুণ পরিণতি সকল মুসলিম হৃদয়কে ব্যথিত করে।

» ব্যাখ্যা : ৩৩ ॥ অঞ্জলি হ'তে পানি প'ড়ে গেল ঝর্‌ঝর্‌,
লুটে ভূমে মহাবাহু খঞ্জর-জর্জর। [ফা. প. ২০১০]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত অসাধারণ ও হৃদয়বিদারক কবিতা 'মোহররম' থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : ইমাম হোসেন (রা) ফোরাত নদী দখলে আনার পর তাঁর মনে যে অতীত স্মৃতি ভেসে উঠেছিল, আলোচ্যাংশে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ইমাম হোসেনের শিবির ইয়াযিদ বাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শিবিরের পানি ও রসদ ফুরিয়ে যায়। পানির তীব্র সংকটে শিবিরবাসীর মাঝে হাহাকার ওঠে। উত্তপ্ত মরুভূমির প্রখর রৌদ্রে সবাই পানির তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। বিশেষ করে শিশুরা মৃতপ্রায় হয়ে ওঠে। ইয়াযিদ শিবিরে সামান্য পানির জন্য আবেদন জানালে তারা তীর নিক্ষেপ করে পানি চাওয়ার জবাব দেয়। ইমাম হোসেন (রা) শত্রুপক্ষের সাথে মহাবিক্রমে যুদ্ধ করে অবশেষে ফোরাত কূলে এসে পৌছান। তীব্র পিপাসা মেটানোর অভিপ্রায়ে যখনই তিনি অঞ্জলি ভরে পানি তুলে নিয়েছেন, তখনই পরিবারের লোকদের নিদারুণ পানিকষ্টের কাহিনিগুলো তাঁর মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে, পানির তৃষ্ণায় ছোট শিশুরা কীভাবে মৃত্যুবরণ করেছে। এ উপলব্ধি আসার সাথে সাথে ইমাম হোসেন (রা) পানি পান না করে ফেলে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

মন্তব্য : কবিতার এ অংশে ইমাম হোসেন (রা)-এর সর্বোত্তম মানবতাবোধের প্রতিফলন ঘটেছে অত্যন্ত সার্থক ও সুন্দরভাবে।

» ব্যাখ্যা : ৩৪ ॥ উষ্ণীষ কোরানের, হাতে তেগ্‌ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির,
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা,
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিখ্যাত কবিতা 'মোহররম' থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মুসলিম জাতি আত্মবলে বলীয়ান হয়ে শির উঁচু করে সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে শপথ-দীপ্ত হবে, আলোচ্যাংশে এ আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : ইসলাম সত্য, ন্যায় ও সাম্যের ধর্ম। ইসলাম ধর্মকে পৃথিবীর মাঝে শ্রেষ্ঠধর্ম হিসেবে বিজয়ী করার লক্ষ্যে রাসূল (স) আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সমাজে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অনেক যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। তথাপি বাতিলের নিকট মাথা নত করেননি। কেননা ইসলামে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট মাথা নত করার বিধান নেই। তাই মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে সত্য ও ন্যায়ের পথে এক অমর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার গড়ে তুলেছিল। তাঁদের মাথায় ছিল কুরআনের নির্দেশ। ফলে তারা সংগ্রামে রত হয়েছেন। এমনকি প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। পরাধীনতার গ্লানি

থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সবাইকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। স্বাধীনতার দামামা বেজে উঠেছে। তাই এখনই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

মন্তব্য : কাজী নজরুল ইসলাম মোহররম মাসে শোক না করে স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন ত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করেছেন।

» ব্যাখ্যা : ৩৫ ॥ **ফিরে এলো আজ সেই মোহর্‌রম মাহিনা,**
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না। [ফা. প. ২০১১, '১৩, '১৭]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিরচিত 'অগ্নি-বীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'মোহররম' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মোহররমের শোকময় স্মৃতি থেকে কবি আমাদের জন্য যে কর্তব্য স্থির করেছেন, তারই প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

বিশ্লেষণ : কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হয় ৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর মোতাবেক ৬০ হিজরী সনের ১০ মোহররম। এদিন মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদরের দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা) ইয়াযিদের সৈন্য পাষণ্ড সীমারের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। শাহাদাতবরণ করেন তাঁর অনেক সঙ্গীসাথি। এ মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। প্রতিবছর ১০ মোহররম ফিরে আসে কারবালার করুণ শোকের স্মৃতি নিয়ে। মুসলমানরা এদিন শোক প্রকাশে কেঁদে বুক ভাসায়। শিয়া সম্প্রদায় ১০ দিন ধরে মর্সিয়া গেয়ে মাতম করে। কবি এভাবে শোক প্রকাশ না করে কারবালার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্তব্য : আমাদের কর্তব্য কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

বনলতা সেন

» ব্যাখ্যা : ৩৬ ॥ **হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,**
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি,

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু রূপসী বাংলার কবি, বাংলা সাহিত্যে অনন্য ব্যতিক্রমী প্রতিভা জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর দীর্ঘপথে বিচিত্র পরিবেশে মানবজাতির অবিরত পরিভ্রমণের কথা ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে মানুষ বাস করে আসছে। মানুষের এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় ধীরে ধীরে সভ্যতা বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে; দীর্ঘ পথপরিক্রমায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রচিত হয়েছে বিভিন্ন সভ্যতা। কালের ধারায় এসব সভ্যতার আবার বিলুপ্তিও ঘটেছে। পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে মানুষ বুঝতে পেরেছে, তার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং কণ্টকাকীর্ণ। তাদের জীবন সুখের ছায়াতলে স্নিগ্ধ-সুন্দর অমলিন নয়। পৃথিবীর পথে মানুষের চলাফেরার কোনো শেষ নেই, এ এক অন্তহীন যাত্রা। নতুন নতুন প্রজন্মের ভেতর দিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে। সিংহল সমুদ্র ও মালয় সাগরে মানুষের অস্তিত্বের ইতিহাস দীর্ঘদিনের। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতেও একদা

মানুষের বসবাস ছিল। এমনকি বিদর্ভ নগরেও সে বাস করেছে। উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে, কিন্তু তা সবই আজ শুধু ইতিহাসের পাতায় বন্দি হয়ে আছে। এ দীর্ঘ ভ্রমণের মাধ্যমে শান্তির অন্বেষায় ছুটে ছুটে মানুষ আজ ক্লান্ত-শ্রান্ত। পাওয়ার বেদনায় মানুষের মিছিল হাহাকারের স্লোগান তুলে সুদূর অতীত থেকেই এগিয়ে চলেছে এবং নব নব সভ্যতার উন্মেষ ঘটাচ্ছে।

মন্তব্য : সব প্রতিকূলতা আর বন্ধুর পথ মাড়িয়ে মানুষ এগিয়ে চলেছে। সভ্যতার সংস্পর্শে নতুন করে জীবন গড়ে তুলছে। সব ক্লান্তি, অবসাদ ডিঙিয়ে উন্নত সভ্যতার বন্দরে তরণি ভেড়াচ্ছে।

►► ব্যাখ্যা : ৩৭ ॥ বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি,
আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে,

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি জীবনানন্দ দাশ শান্তির অন্বেষায় অতীতের বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসের অতলতলে পরিভ্রমণের বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : কবি চিরশান্তি প্রত্যাশী। আধুনিকতার যন্ত্রণাদগ্ধ কবিচিত্ত একটু শান্তির প্রত্যাশায় পথ চলেছে হাজার বছর ধরে, কিন্তু কোথাও শান্তি নেই। কী বর্তমান, কী অতীত– কোথাও কবি বুক ভরে স্বস্তিতে নিশ্বাস গ্রহণ করতে পারেননি। বর্তমানের বিক্ষুব্ধ সময়, যুদ্ধোত্তর পোড়োজমিন কবিকে অস্থির করে তুলেছে। পৃথিবীর আকাশ ভরে গেছে শকুনের ডানায়। এখানে প্রেম-প্রীতি, মানবতা মনুষ্যত্ব তিরোহিত। তাই বর্তমানকে ছাড়িয়ে শান্তির অন্বেষায় কবি পরিভ্রমণ করেছেন অতীতের উন্নত ও সমৃদ্ধ সভ্যতায়। সেখানে খুঁজে ফিরেছেন শান্তির উৎস ও উপকরণ। শান্তির জন্য তিনি যেমন সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তেমনি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে ঘুরে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেন শান্তির পায়রাকে, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ক্লান্ত, শ্রান্ত দেহে আবার তিনি যাত্রা করেছেন ভারতবর্ষের সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান বিদর্ভ নগরের দিকে, যা আজ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। কবি সেই অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে শান্তির অন্বেষণ করেছেন। সভ্যতার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তবুও একটু শান্তির পরশে স্নিগ্ধ হতে পারেননি। নিদারুণ হতাশা, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ ও সংশয় নিয়ে ক্লান্ত প্রাণে দাঁড়িয়েছেন সমুদ্র সফেনে।

মন্তব্য : যুগযন্ত্রণাদগ্ধ কবির শান্তিপিপাসু মন শান্তির প্রত্যাশায় ইতিহাসের পাতায়, অতীত সভ্যতার বাঁকে বাঁকে ঘুরে ফিরেছে। বারবার ব্যর্থ হওয়ার পরও তিনি কল্পনার রথে চড়ে শান্তির অন্বেষণে ছুটেই চলেছেন।

►► ব্যাখ্যা : ৩৮ ॥ আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল, নাটোরের বনলতা সেন।

[ফা. প. ২০১১, '১৭]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতার অন্তর্গত।

প্রসঙ্গ : কবি জীবনানন্দ দাশ শান্তির প্রত্যাশায় পরিভ্রমণরত মানব সত্তার ক্লান্তি, ক্লেশ এবং পরিতৃপ্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে আলোচ্য উক্তির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : প্রকৃতিগতভাবে মানুষ শান্তির প্রত্যাশী। শান্তি প্রত্যাশায় হাজার বছর ধরে চলে তার পথচলা, কিন্তু কোথাও শান্তি মিলে না। সে বুক ভরে নিতে পারে না শান্তির সুবাতাস। কবিও শান্তির অন্বেষায় উন্মুখ। শান্তির খোঁজে তিনি ভ্রমণ করেছেন সিংহল সাগর থেকে মালয় সাগর তীরে। ঘুরে বেড়িয়েছেন অতীতের বিখ্যাত সভ্যতার দ্বারে দ্বারে। সভ্যতার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা অতীত ইতিহাসের পাতাগুলো নিবিষ্ট মনে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তন্ন তন্ন করে শান্তির পায়রাকে খুঁজেছেন, কিন্তু তিনি বারবারই ব্যর্থ হয়েছেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কবি এখন ক্লান্ত-শ্রান্ত, নিদারুণ হতাশা ও সংশয়ে ভারাক্রান্ত, বিভ্রান্ত দিশেহারা। পৃথিবী তার কাছে হয়ে উঠেছে সফেন সমুদ্র। এমনি অবস্থায় কোনো একদিন নাটোরের বনলতা সেন শান্তির অমিয়ধারা প্রদান করে কবির তৃষিত হৃদয়কে ক্ষণকালের জন্য শান্ত করেছিল। কবির কাছে আজ তা স্মরণীয় স্মৃতি। বনলতা সেন কবির শান্তিদেবী। ক্লান্ত-শ্রান্ত কবি দু'দণ্ডের জন্য শান্তি খুঁজে পেয়েছেন নির্জনতা আর শান্তির প্রতীক প্রেমিকা মানবী বনলতা সেনের সান্নিধ্যে এসে। ক্লান্ত কবিপ্রাণ স্বল্প সময়ের জন্য বনলতা সেনের চক্ষু নীড়ে যে আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন তাতে তার ক্ষুব্ধ জীবন সার্থকতা পেয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, নারীর স্নেহপূর্ণ প্রেমই হচ্ছে শান্তির আলয়। তাই বনলতা সেন কবির কল্পিত মানস প্রতিমার প্রতীকী আশ্রয় মাত্র।

মন্তব্য : শান্তির অন্বেষায় ভ্রমণরত মানুষের ক্লান্ত মন কখনো শান্তি পায় আপন মানস প্রতিমার সান্নিধ্যে, তবে তা স্থায়ী নয়, স্বল্প সময়ের জন্য মাত্র।

» ব্যাখ্যা : ৩৯ ॥ চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য

উৎস : উদ্ধৃত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ভাবধারার প্রবর্তক, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি জীবনানন্দ দাশ বনলতা সেনের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে উক্ত শৈল্পিক পঙক্তি দুটির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত কবির কাছে 'বনলতা সেন' ছিল শেষ আশ্রয়স্থল। ফলে 'বনলতা সেন' এখানে হয়ে উঠেছে কবির মানস-প্রিয়া। তাই বনলতা সেনের রূপ বর্ণনায় কবি হয়ে উঠেছেন উদ্বেল ও আবেগপ্রবণ। প্রাচীন ভারতের সকল ধ্রুপদী সৌন্দর্যের সমারোহে কবি তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন তার মানস প্রতিমাকে। বনলতা সেনের রূপ সৌন্দর্যর উপমা তিনি আহরণ করেছেন প্রাচীন ভারতের বস্তুনিচয় থেকে। বনলতা সেন সুন্দরি, তার চুল ঘনকৃষ্ণ। কবি প্রাচীন বিদিশা নগরীর আঁধার রাতের সঙ্গে বনলতা সেনের চুলের তুলনা করেছেন। বনলতা সেনের চুল বিদিশার মোহ ছড়ানো অন্ধকার রাতের মতোই কালো। শ্রাবস্তী প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী। শ্রাবস্তীর কারুকাজ নিটোল রমণীমূর্তিকে পাথরে অক্ষয় করে রেখেছে। সে মূর্তি সৌন্দর্যের প্রতীক। কবির চোখে বনলতা সেনের মুখ যেন শ্রাবস্তীর সেই কারুকার্যময় নিটোল রমণীমূর্তির মুখ। এ মুখে কোনো খুঁত নেই। সৌন্দর্যের অপরূপ মহিমায় উজ্জ্বল সে মুখ।

মন্তব্য : কবির চেতনায় বনলতা সেন এক অপূর্ব মমতাময়ী নারী। তাই তিনি তার সৌন্দর্যকে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সার্থক উপমায় শৈল্পিক চয়নে তুলে ধরেছেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪০ ॥ অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে,

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু রূপসী বাংলার রূপে মুগ্ধ বাংলা সাহিত্যের ব্যতিক্রমী ভাবধারার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি জীবনানন্দ দাশ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানস-প্রতিমাকে কীভাবে, কেমন করে দেখতে পেয়েছেন, সে অনুভূতিই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : একটি শান্তির নীড়ের প্রত্যাশায় কল্পনাবিলাসী কবি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন জনপদ ভ্রমণ করেছেন। এ প্রত্যাশায় তিনি সিংহল সমুদ্র থেকে শুরু করে মালয় সাগর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। এমনকি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতেও তিনি শান্তির নীড়ের অনুসন্ধান চালিয়েছেন, কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজে পাননি। শান্তির অন্বেষণে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত কবি শেষপর্যন্ত প্রেয়সীর সাহচর্য লাভের জন্য নাটোরে গিয়ে মানস-প্রিয়া সন্দর্শনে শান্তির সন্ধান পান। কবি প্রেয়সীর সাহচর্যে ভুলে যান জীবনের ক্লান্তি। বনলতা সেন কবির সংসার-মরুতে বৃষ্টির ফোঁটা, নির্জন জীবনে অনির্বাণ দীপশিখা। অজানা কোনো দূর সমুদ্রের পথে জাহাজের হাল ভেঙে নাবিক যেমন দিশেহারা ও ভীত-সন্ত্রস্ত এবং দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তার জীবনের সব আশা ও সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়, জাহাজ তখন বাতাস ও স্রোতে ইচ্ছেমতো ভাসতে থাকে; হঠাৎ অদূরে সবুজ ঘাসে ভরা দারুচিনি দ্বীপ দেখতে পেলে নাবিক যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে, তরীর অনিশ্চিত জীবনের হতাশার গ্লানি দূর হয়ে মুখ প্রশান্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি কবিও সমুদ্রে হাল ভাঙা তরীর নাবিকের মতো হতাশাগ্রস্ত হয়ে ভ্রমণ করার পর আলো-অন্ধকারে বনলতা সেনের সাক্ষাৎ পান। সবুজ ঘাসে ভরা দারুচিনি দ্বীপের দেখা পেয়ে যেমন গভীর সমুদ্রে হালভাঙা নাবিকের মনোজগতে আশার আলো জ্বলে ওঠে, তেমনি কবিহৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তার ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ-মনে স্বস্তি ফিরে আসে। কারণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন ভালোবাসার মানস প্রতিমাকে। যার কাছে খুঁজে পান জীবনের সার্থকতা ও স্বর্গীয় প্রশান্তির ফল্গুধারা।

মন্তব্য : নিদারুণ হতাশা আর দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর মানুষ যখন কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে, তেমনি শান্তিপিয়াসী কবি চির প্রতীক্ষার মানস-সুন্দরীর সাক্ষাৎলাভে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৪১ ॥ বলেছে সে, এতদিন কোথায় ছিলেন?
পাখীর নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে রূপসী বাংলার কবি হিসেবে খ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক অসাধারণ রোমান্টিক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবির প্রতি তার মানস-প্রিয়া বনলতা সেনের গভীর অনুরাগমিশ্রিত জিজ্ঞাসা এবং তার সৌন্দর্যের বর্ণনা আলোচ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে উচ্চারিত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : কবি শান্তির অন্বেষায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে পথে হাঁটছেন। সিংহল সমুদ্র থেকে রাতের অন্ধকারে তিনি মালয় সাগরে পাড়ি জমিয়েছেন। ইতিহাসের বিভিন্ন

সভ্যতার দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন, কিন্তু কোথাও শান্তি খুঁজে পাননি। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কবি যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, যখন রূঢ় বাস্তবতার তরঙ্গ জীবনের চারিদিকে বিপর্যস্ত করে চলেছে, ঠিক তখনই কবি শান্তির প্রতিমা 'বনলতা সেন'-এর সন্ধান পেলেন। কবির ঊষর জীবনে বনলতা সেন বিলিয়েছে দু'দণ্ড শান্তি। কবি অনুভব করেছেন তার ক্লান্ত-শ্রান্ত, হতাশ জীবনে নাটোরের বনলতা সেন গভীর মমতায়, মধুর আলাপে একান্ত আন্তরিকতার উষ্ণ পরশ দান করেছে। তিনি খুঁজে পেয়েছেন প্রশান্তির স্বর্গীয় নীড়। কবি তার তৃষিত হৃদয়ের পাশে যখন দয়িতার অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন, তখন বনলতা সেনের নারীহৃদয় একইভাবে তার জন্য প্রতীক্ষমাণ। তার সাথে দেখা হলে সে গভীর আগ্রহভরে মমতা দিয়ে হৃদয় মেলে প্রশ্ন করেছে, এতদিন কোথায় ছিলেন? তার এ জিজ্ঞাসা নিছক সৌজন্যবোধ নয়; বরং সহানুভূতিশীল অন্তরঙ্গ উচ্চারণ। কবি বনলতা সেনের চোখে দেখেছেন পাখির নীড়ের অপলকতা। পাখির বাসা সবসময় খোলা থাকে, তা বন্ধ করার কোনো কপাট নেই। তেমনি বনলতা সেনের চোখও খোলা, তাতে পলক নেই, বন্ধ করার কোনো কপাট নেই। বিস্ময় ও কৌতূহলপূর্ণ এ অপলক চোখের দৃষ্টিতে কবি মুগ্ধ হয়েছেন। এতে এ কথাই সমুদ্ভাসিত হয়, পুরুষ যেমন নারীর সঙ্গ কামনায় উন্মুখ, ঠিক তেমনি নারীও পুরুষের পথ চেয়েই হৃদয়-মন খুলে বসে থাকে। প্রেমের এ পথচলা কারো একার নয়। জীবনের এই যে ক্ষণকালীন পরিতৃপ্তি, তার মধ্যে ব্যক্তির সীমানা পেরিয়ে কবি মানবাত্মার পরিতৃপ্তি প্রকাশ করেছেন।

মন্তব্য : নারীর কোমল মন, মধুর সম্ভাষণ এবং মমতাময়ী চোখ ব্যথিত চিত্ত ব্যক্তিকে শান্তির নিশ্চয়তা দেয়। তাই কবির ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসাদগ্রস্ত জীবনের সমুদ্র সফেন বনলতা সেনের নীড়রূপী চোখে আশ্রয়ের সন্ধান পায়। খুঁজে পায়, ফিরে পায় স্বর্গীয় নীড়, আনন্দের উদ্বেলতা আর জীবনের গতি।

ব্যাখ্যা : ৪২ ॥ সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল,

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ব্যতিক্রমী ধারার আধুনিক কবি, রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : প্রকৃতিপ্রেমিক কবি আলোচ্যাংশে নিপুণ শব্দ চয়ন আর অপূর্ব কাব্যিক ব্যঞ্জনায় দিনের পরিসমাপ্তি ও সন্ধ্যার আগমনের দৃশ্য চিত্রিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানুষ স্বভাবতই শান্তি প্রত্যাশী। সে জীবনভর শান্তি খুঁজে বেড়ায়। এ খোঁজার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত অবিরাম চলেছে মানুষের এ শান্তির অন্বেষণ। কবি হাজার বছর ধরে শান্তি অন্বেষণকারী এক ক্লান্ত পথিক। শান্তির স্নিগ্ধ শীতল আলয় খুঁজে খুঁজে আজ তিনি ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। শান্তির অন্বেষায় অন্তহীন পথযাত্রার একপর্যায়ে তিনি খুঁজে পান তার মানস-প্রতিমা বনলতা সেনকে। সে কবিকে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল। তার মুহূর্তের সান্নিধ্য কবির ক্লান্তি আর অবসাদ মুছে দিয়েছে। নিশ্চল জীবনে গতির সঞ্চার করেছে। আশা আর আনন্দে তার অন্তর ভরে ওঠেছে, কিন্তু তখন জীবনের উজ্জ্বল আলো নিষ্প্রভ, সূর্য তখন ডুবোডুবো। অবশেষে শিশিরের শব্দের মতো আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসে। দিনান্তে ক্লান্ত চিল ফিরে আসে নীড়ে। দিনের রৌদ্রে তার উত্তপ্ত ডানা হয়ে ওঠে শীতল। তখন প্রকৃতিতে নেমে আসে এক স্বর্গীয় প্রশান্তির দ্যোতনা। এমনি আলো আঁধারের মধ্যে নিস্তব্ধ পরিবেশে কবি তাঁর দয়িতা বনলতা সেনের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এ সময় তাঁর সামনে থেকে সবকিছু লুপ্ত হয়ে কেবল বনলতা সেনই মুখোমুখি অবস্থান করছিলেন। তার কোমল পরশে কবি জীবনের ক্রান্তিলগ্নে আশায় উজ্জীবিত হয়ে

ওঠেন। অতৃপ্তি, ক্লান্তি আর অবসাদ ভুলে কবি লাভ করেন অসীম শান্তি। জীবনের শেষ অধ্যায়ে মানুষ এরকমই কামনা করে থাকে।

মন্তব্য : জীবনসায়াহ্নে নিঃশব্দ নিভৃত অন্ধকারে মানুষ কাঙ্ক্ষিতজনের সঙ্গ কামনা করে। এছাড়া মানুষের আত্মা তৃপ্ত হতে পারে না।

▸ ব্যাখ্যা : ৪৩ ॥ পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল,

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' শীর্ষক অসাধারণ রোমান্টিক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে জীবনসায়াহ্নে দাঁড়িয়ে কবি জীবনানন্দ দাশের মনে যে স্বস্তি ও সুখের অনুভূতি ধরা দেয়, সে সম্পর্কিত বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : পৃথিবীর বুকে মানুষের পদচারণা শুরু হয়েছে বহুদিন ধরে। কবি মানব-সভ্যতার প্রাচীন পর্ব থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে তন্ন তন্ন করে নিজের স্বস্তি ও সুখের সন্ধান করেছেন। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরেছেন দ্বারে দ্বারে। হালভাঙা তরীর নাবিকের মতো দিশেহারা হয়ে খুঁজেছেন অনিশ্চিত সম্ভাবনাকে, কিন্তু কোনো হদিস পাননি কোথাও। অবশেষে তিনি উত্তরবঙ্গের নাটোরে গিয়ে সন্ধান পেয়েছেন তাঁর কল্পিত মানসপ্রতিমা বনলতা সেনের, সে-ই কবির কাঙ্ক্ষিত সুখের নীড়। তাঁর কাছেই তিনি পেয়েছেন দুদণ্ড শান্তি। কবির জীবনসায়াহ্নে জীবনের উজ্জ্বল আলো যখন নিষ্প্রভ, জীবনসূর্য যখন ডুবোডুবো, পৃথিবী যখন তার হিসাবের খাতা গোছানোর আয়োজন করে, ঠিক তখনই কবি খুঁজে পান তাঁর মানসীকে কয়েক মুহূর্তের জন্য। কবির বর্ণনায়, ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল, শিশিরের শব্দের মতো নেমে আসে নির্জন সন্ধ্যা; পৃথিবীর সব রঙ যায় নিভে, মৃদু আলোর অপরূপ আলোকমালা রচনা করে জোনাকিরা, পাখিরা ফিরে যায় নীড়ে, থেমে যায় নদীর কল-কোলাহল। এখন আর দিনের চাঞ্চল্যের কিছুই বাকি নেই; এ সময়ের আলো-আঁধারীর নির্জনতায় কবির মুখোমুখি যে বসে আছে, তার নাম নাটোরের বনলতা সেন। ক্লান্ত, অবসন্ন কবির প্রত্যাশিত শান্তির আশ্রয়।

মন্তব্য : পৃথিবীর সব রং-রূপ মুছে গেলেও কবি মৃত্যুর স্তব্ধতার মাঝে বনলতা সেনকে আশ্রয় করে নতুন জীবনের স্বপ্নের জাল বুনে চলেন।

▸ ব্যাখ্যা : ৪৪ ॥ সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের পথিকৃৎ, শান্তি ও সৌন্দর্যপিয়াসী কবি জীবনানন্দ দাশ বিরচিত 'বনলতা সেন' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসেও বনলতা সেন কবির জন্য কীভাবে উজ্জীবনের আশ্চর্য উৎস হয়ে ওঠে, আলোচ্যাংশে তারই বর্ণনা ফুটে উঠেছে।

বিশ্লেষণ : শান্তির সমগ্রতায় লীন হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশী কবি হাজার বছরের পথপরিক্রমায় ক্লান্ত। কিন্তু অতিদূর সমুদ্রে তরির হালভেঙে যে নাবিক দিশাহারা, দারুচিনি দ্বীপের সবুজ ঘাস দেখলে অকস্মাৎ যেমন জীবনসম্ভাবনায় সে জেগে ওঠে, তেমনিভাবে সেই চোখে বনলতা সেনকে দেখেছেন জীবনের সফেন সমুদ্রে ভাসমান ক্লান্ত কবি। বনলতা সেন তার

দিকে তাকিয়েছে পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে। কবি বনলতা সেনের চোখে খুঁজে পেয়েছেন শান্তির শেষ আশ্রয়। এ আশ্রয় আসলে কবির কল্পিত, মনোজগতে সৃষ্ট সৌন্দর্যের আশ্রয়। তখন সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসছে– জীবনের শেষে মৃত্যুর নিস্তব্ধতার মতো সন্ধ্যা, তখন ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল এবং জীবনের সমাপ্তিতে, মৃত্যুর নিস্তব্ধতার মধ্যে, পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে জোনাকির আলোতে চলে গল্পের আয়োজন, থেমে যায় জীবনের সব কোলাহল। সব পাখি নীড়ে ফিরে যায়, জীবনের সব লেনদেনও সমাপ্ত হয়। তখন বনলতা সেন অন্ধকারে অপার শান্তির উৎস হয়ে অপেক্ষারত। জীবনসায়াহ্নে কবি তারই মুখোমুখি হয়েছেন।

মন্তব্য : মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও কবি তার কল্পিত আশ্রয় বনলতা সেনকে গ্রহণ করেছেন উজ্জীবনের এক আশ্চর্য উৎস হিসেবে। তাই তার বুকের ভেতর অনুক্ষণ গুঞ্জরিত হতে থাকে শান্তি আর আনন্দের লহরি।

এ-গাঁও ও-গাঁও

» ব্যাখ্যা : ৪৫ ॥ এ-গাঁর ও-গাঁর দুধার হ'তে পথ দুখানি এসে,
জলীর বিলের জলে তারা পদ্ম ভাসায় হেসে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, পল্লিকবি খ্যাত কবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতা থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে জলীর বিলকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রামের সেতুবন্ধ রচনার যে কিংবদন্তি প্রচলিত আছে তা কাব্যিক ছন্দে ব্যক্ত হয়েছে।

বিশ্লেষণ : আবহমানকাল ধরে দুটি গ্রামের মাঝখানে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে বিরাজ করছে জলীর বিল। এ জলীর বিলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে দুটি গ্রাম। জলীর বিলের সৌন্দর্য পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিলের কাজল-কালো জলে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে অসংখ্য পদ্ম। অজস্র জল-কুমুদী ফুটে প্রকৃতির শোভা বর্ধন করে। জলীর বিলের কূল ঘেঁষেই এসে মিলিত হয়েছে দুটি গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা দুটি মেঠো পথ। এই পথ ধরেই দুই গ্রামের মানুষ বিলে এনে পদ্ম ভাসায়, স্নান করে, জলকেলিতে মত্ত হয়। এভাবেই গ্রামের অধিবাসীদের মানুষ জলীর বিলকে কেন্দ্র করে একাত্মতা প্রকাশ করে। এ বিলটি যেন দুটি গ্রামের অধিবাসীদের মাঝে সেতুবন্ধ রচনা করেছে। দুই গ্রামবাসীকে এক অটুট সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে এ জলীর বিল।

মন্তব্য : জলীর বিলের দুধারের দুটি পথ এর অববাহিকার অধিবাসীদের মধ্যে যেমন সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছে, তেমনি তাদের প্রেম-বিরহ ও নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে এ জলীর বিল।

» ব্যাখ্যা : ৪৬ ॥ এইখানেতে এসে তারা পথ হারায়ে হায়
জলীর বিলে ঘুমিয়ে আছে জল-কুমুদীর গায়।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন গ্রামীণ জীবনে প্রেম বিরহের জনশ্রুতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

বিশ্লেষণ : গ্রামীণ জীবনে নানারকম গল্প-কাহিনি প্রচলিত আছে, যার কোনো কোনোটি কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছে। কেউ কেউ বলেন, আদিকালে এ গ্রামের এক চাষি ওই গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে গলায় ফাঁসি পরেছিল। তাদের দেখা হয়েছিল গ্রামের পথে। আনমনে পথ চলতে গিয়ে প্রেম হয় উভয়ের মাঝে। সামাজিক কোনো বাধা কিংবা সংস্কারের কারণে মিলন হয়নি তাদের। বিরহের জ্বালা সইতে না পেরে জলীর বিলে এসে উভয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এখানে এসে পথ হারিয়ে যেন তারা জল-কুমুদীর কাছে ঘুমিয়ে গেছে।

মন্তব্য : গ্রামীণ-জীবনে প্রেম আছে, বিরহ আছে, আছে ভালোবাসার জন্য আত্মত্যাগ। গ্রামের প্রকৃতি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের নীরব সাক্ষী।

ব্যাখ্যা : ৪৭ ॥ কেইবা জানে হয়ত তাদের মাল্য হতেই খসি,
শাপলা-লতা মেলছে পরাগ জলের উপর বসি।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, পল্লিকবি খ্যাত কবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' কবিতা থেকে সংকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি গ্রামীণ জীবনের অনবদ্য প্রেমের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে একটি প্রচলিত জনশ্রুতির বর্ণনা দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : গ্রামীণ জীবনে আছে নানাবিধ কিংবদন্তি তথা জনশ্রুতি। কেউ কেউ বলে, অনেক আগে এ গ্রামের এক চাষি ওই গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে পড়ে গলায় ফাঁসি পরেছিল। তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল গ্রামের পথে। আনমনে পথ চলতে গিয়ে প্রেমের সূচনা হয় উভয়ের মধ্যে। সামাজিক বাধা কিংবা সংস্কারের কারণে সফলতা লাভ করতে পারেনি তাদের প্রেম। তাই জলীর বিলে এসে আত্মহননের পথ বেছে নেয় দু'জনে। তাদের গলার মালা থেকে খসেপড়া ফুলই হয়তো শাপলা হয়ে পরাগ মেলেছে জলীর বিলের পানিতে। আর কিংবদন্তির প্রেমিক যুগলের শাশ্বত প্রেমের সাক্ষী হয়ে এ জল-কুমুদী প্রতিনিয়তই পানির উপর পরাগ মেলে তাদের স্মৃতি তুলে ধরছে।

মন্তব্য : পঙ্‌ক্তি দুটিতে গ্রামবাংলার সহজ-সরল প্রাকৃতিক জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে পল্লিপ্রেমিক কবি জসীমউদ্‌দীন অপরূপ মহিমায় চিত্রিত করেছেন।

ব্যাখ্যা : ৪৮ ॥ ও গাঁর বধূ ঘট ভরিতে যে ঢেউ জলে জাগে,
কখন্ কখন্ দোলা তাহার এ-গাঁয় এসে লাগে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা কবি, পল্লিকবি-খ্যাত কবি জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : জলীর বিলের ঢেউ জাগানোর মাধ্যমে 'এ-গাঁও ও-গাঁও'-এর মাঝে একটি নির্মল প্রাকৃতিক সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করেছেন কবি আলোচ্যাংশে।

বিশ্লেষণ : এ-গাঁও এবং ও-গাঁও জলীর বিলের দ্বারা বিভক্ত থাকলেও এ দু'গাঁয়ের মানুষের মনের দরজায় কোনো ফাঁক নেই। এ গাঁয়ে কোনো এক যুবকের করুণ বাঁশির সুরে ও

গাঁয়ের কোমলমতি যুবতি বিরহ ব্যথায় দীর্ণ হয়। এ-গাঁও ও-গাঁও দু'গাঁর লোকই জলীর বিলে গোসল করতে আসে। হাসি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে জলকেলি করে। জলীর বিল যেন দু'গাঁয়ের এক মনোমিলন কেন্দ্র। জলীর বিল যদিও দু'গ্রামকে আলাদা করে রেখেছে, বাস্তবে দু'গাঁয়ের মানুষ এক মন এক প্রাণ হয়ে বসবাস করছে। এখানে কবি দুটি গাঁয়ের মিলনের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রাম্য বধূর সঞ্চালিত হাতের পানির ঢেউকে উপমা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রেমের এমন সার্থক উপমা সত্যিই তাৎপর্যময় এবং এ উপমার ভেতর দিয়ে দুটি গ্রামের ভালোবাসা যে কত স্নিগ্ধ, তা বোঝানো হয়েছে। সেই ভালোবাসা যেন বধূর হাতের পরশে বাধা। আর এ পরশ বহন করে নিয়ে যায় প্রকৃতি।

মন্তব্য : কাছাকাছি দুটি গ্রামের মানুষের জীবনও যে পরস্পর সম্পর্কিত, একের মনের বেদনা যে অন্যের মনোবেদনার উদ্রেক ঘটায়, কবি এখানে সেই কথাই অনুপম ভাষাচিত্রে তুলে ধরেছেন।

»» ব্যাখ্যা : ৪৯ ॥ **এ-গাঁর চাষী নিঝুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,**
ওই না গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।
অথবা, এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান। [ফা. প. ২০১৯]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য কবি, পল্লিকবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত **'নকশী কাঁথার মাঠ'** শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত **'এ-গাঁও ও-গাঁও'** শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি জসীমউদ্‌দীন গ্রামের মানুষের জীবনের রোমান্টিকতা ও গভীর বিরহ-বেদনার সুর মূর্ত করে তুলেছেন।

বিশ্লেষণ : বিলের দু'পাশে মাঠের পরে দুটি গ্রাম। এ দুটি গ্রামের মানুষের মাঝে রয়েছে গভীর প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা। দুটি গ্রামের লোকই বিলে গোসল করতে আসে। মেয়েরা কলসি কাঁখে করে পানি ভরে ঘরে ফিরে যায়। গভীর রাতে এ-গাঁয়ের চাষি বাঁশি বাজালে কিংবা ভাটিয়ালি সুরে গান ধরলে তাতে বিরহের সুর বেজে ওঠে। সে বিরহ বেদনা ও-গাঁয়ের মেয়েদের মনে দোলা দেয়। ব্যাকুল চঞ্চল হয়ে বেড়ার ফাঁকে কান পেতে সে তা উপভোগ করে। উভয়ের ভালোবাসা গুমরে মরে, গভীর আর্তিতে ঝরে পড়ে।

মন্তব্য : কবি অতি চমৎকারভাবে রাতের বাঁশির সুরে ব্যথার কাঁপন এবং তার সাথে দুটি বিরহী মনের ভাব-তন্ময়তা ও বুকের কান্না অপূর্ব ভাষাশৈলীতে প্রকাশ করেছেন।

»» ব্যাখ্যা : ৫০ ॥ **এ-গাঁর লোক দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,**
কাইজা ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।
অথবা, এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান কবি, পল্লিপ্রেমিক কবি জসীমউদ্‌দীন বিরচিত 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'এ-গাঁও ও-গাঁও' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি গ্রামীণ জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে ছন্দাকারে তুলে ধরেছেন।

বিশ্লেষণ : আবহমান বাংলার দুটি গ্রাম, মাঝখানে তাদের ধান-কাউনের মাঠ। প্রকৃতি অপার মমতায় শ্যামল স্নিগ্ধ করে রেখেছে দুটি গ্রামকে। দু'গ্রামের মাঝখানে আছে জলীর বিল। এ বিল দুই গ্রামেরই অনেক প্রেম, বিরহ, মিলন ও বেদনাঘন ঘটনার নীরব সাক্ষী। দুটি গ্রাম যেন একই সুরের গ্রন্থিতে বাধা, কিন্তু মাঝে মাঝে স্বার্থবাদী মানুষ সুরের মাঝে অসুরের সাধনা করে। দুগাঁয়ের পশু-পাখির মেলবন্ধন আছে কিন্তু সৃষ্টির সেরাজীব দু'গাঁর মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে। সুযোগ পেলেই তারা শক্তি পরীক্ষা করতে একে অপরের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয়। এভাবে দুগাঁয়ের মানুষের মাঝে শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এতে প্রাণহানি হয় অসংখ্য মানুষের। জলীর বিল তাদের রক্তে অনেক বারই লাল হয়েছে।

মন্তব্য : এ-গাঁও এবং ও-গাঁয়ের লোকদের মাঝে যেরূপ ভালোবাসা সম্প্রীতি ও সুসম্পর্ক রয়েছে, তদ্রূপ রয়েছে শক্তি প্রদর্শনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও। এ দ্বারা কবি পল্লিগ্রামের চিরায়ত বাস্তবতার দিকটিও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সাত-সাগরের মাঝি

**» ব্যাখ্যা : ৫১ ॥ দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ 'সাত-সাগরের মাঝি'র অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতিকে পুনর্জাগরণের প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মরু আরবে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের আলো। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণযুগে ইসলাম তার আপন জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়েছিল। সেই আলো আফ্রিকা, ইউরোপ এমনকি ভারতবর্ষকেও আলোকিত করেছিল। মুসলমানদের স্বর্ণোজ্জ্বল সেই অতীত এখন কেবলই স্মৃতি। তাদের শৌর্যবীর্য, আত্মবিশ্বাস যেন এখন আটকে গেছে শতাব্দীর চোরাবালিতে। বিলাস-ব্যসনে মত্ত বর্তমান মুসলিম জাতি ঘুমে অচেতন। দুয়ারে সামুদ্রিক জোয়ারের ফেনা এসেছে, তবু জাগছে না মুসলিম জাতি।

মন্তব্য : সমগ্র বিশ্ব যখন নবচেতনায় জাগরিত হচ্ছে, তখনো মুসলমানরা অলস নিদ্রায় বিভোর হয়ে সময় কাটাচ্ছে। তাদের উচিত এখনি পুনর্জাগরিত হয়ে অতীত গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করা।

**» ব্যাখ্যা : ৫২ ॥ তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশ্‌তী আবার ভেসেছে সাগর জলে,**

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি নতুন উদ্যমে সাগরে জাহাজ ভাসানোর অনুরোধ জানিয়ে সাত সাগরের মাঝির উদ্দেশে আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

বিশ্লেষণ : অনেক আঁধার পার হয়ে ভোর হয়েছে। নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা কাঁপছে। সাত-সাগরের জোয়ারে মাঝির দুয়ারে ফেনা এসেছে। তবু মাঝির ঘুম ভাঙেনি। তার দুয়ারে

জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে স্থির ছবির মতো; কিন্তু তার হালে পানি নেই, পাল উড়ছে না। তাই কবি সাত সাগরের মাঝিকে আহ্বান জানিয়ে বলছেন, সে যেন তার মিনতি রাখে। তাকে উঠে আসার জন্য তিনি অনুরোধ করেছেন। তাকে মাঝিমাল্লার দলে উঠে এসে আবার সাগরের নোনা পানিতে কিশতি ভাসাতে হবে। দুঃসময় শেষ হয়েছে, এখন সুসময়ের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। তাই এখনই মাঝিকে সাগরে জাহাজ ভাসাতে হবে।

মন্তব্য : অতীতে মুসলমানরা ছিল নেতৃত্বের আসনে সমাসীন। তাই কবি আবার সেই সঠিক নেতৃত্ব নিয়ে অতীত ঐতিহ্যের স্রোতধারায় তরি ভাসাতে আহ্বান জানিয়েছেন।

➧ ব্যাখ্যা : ৫৩ ॥ হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো,
নইলে যে সব ভেঙে হবে চৌচির।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গ : মুসলিম জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনে দুর্যোগময় মুহূর্তে নেতৃত্বের করণীয় বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি ফররুখ আহমদ আলোচ্য উক্তির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : জাতীয় জীবনের ঘোর অমানিশার অবসান ঘটেছে। জাতি এখন কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম। জাতির কর্ণধারের সম্মুখে সবকিছু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষমাণ। সুযোগ্য কর্ণধার তার দক্ষ পরিচালনায় জাতিকে মুক্তি ও গৌরবের পথে নিয়ে যাবে। দেশের সকল মানুষ কর্ণধারকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে, দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে পরিচালনা করতে। স্থবির জাতিকে সচল করতে তার ভূমিকা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সব আয়োজনও সম্পন্ন, কিন্তু তারি মাঝে কিছু অশুভ শক্তির উদয় ঘটে, যারা জাতির অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায়। ক্ষুধার্ত মানুষ মুক্তির চেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয়। এমনি অবস্থায় জাতিকে অগ্রগতির পথে পরিচালনা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কর্ণধার এরূপ ক্ষেত্রে তার সকল শক্তি ও সম্পদ প্রয়োগ করে জাতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। যে জাতির কর্ণধার এ প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ, সে জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হয় না। তাদের উন্নয়নের সব আয়োজনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মন্তব্য : জাতীয় অগ্রগতির জন্য দক্ষ কর্ণধার আবশ্যক। একজন সুযোগ্য কর্ণধার তার সুযোগ্য পরিচালনায় যেমন জাতিকে সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারেন, তেমনি সুযোগ্য পরিচালনার জন্য জাতির সহায়-সম্পদ এবং অধিনায়কের দৃঢ় মনোবল ও উন্নত মানসিকতা থাকতে হবে।

➧ ব্যাখ্যা : ৫৪ ॥ জানি না, তবুও ডাকছি তোমাকে সাত দরিয়ার মাঝি,
প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠেছে বাজি।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি, ইসলামী রেনেসাঁর কবিখ্যাত ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝির অভিযানের সফলতার প্রতি ইঙ্গিত দিতে গিয়ে আলোচ্য উক্তির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : সাত সাগরের মাঝি তার জাহাজ চালিয়ে যাচ্ছে অভীষ্ট লক্ষ্যে। ওই দূর বন্দরে পৌছার লক্ষ্যে সব দুর্যোগ পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যেতে চায়। আকাশের তারাকে

পথনির্দেশক ধরে নিয়ে অকূল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মাঝি পৌঁছতে চায় কাঙ্ক্ষিত বন্দরে। কখনো কখনো মাঝিকে দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীত মনে হয়। পথনির্দেশক আকাশের তারা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার কারণেই হয়তো মাঝির এ অবস্থা। তার জাহাজ স্তব্ধ হয়ে পড়ে, পাল চুপসে যায়, কিন্তু কবি এসবের ঊর্ধ্বে উঠে মাঝিকে আহ্বান জানান জাহাজ চালাতে। কারণ প্রবাল দ্বীপের নারিকেল গাছের শাখা বাতাসে কেঁপে উঠছে। নারিকেল শাখার এ বাজনা নৌযাত্রার সাফল্যের ইঙ্গিত প্রদান করছে। বস্তুত জাতির কর্ণধার তার সুযোগ্য মেধা ও প্রজ্ঞা দ্বারা জাতিকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যান। বিভিন্ন কারণে অনেক সময় জাতির নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, ভয় পায়; কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ মহৎ লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশে কর্ণধারের যে-কোনো প্রচেষ্টা সফল হতে বাধ্য। স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে ওঠে জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য জাতির কর্ণধারকে সাফল্য নিশ্চিত জেনে এগিয়ে আসতেই হবে। কারণ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা তাকে ঘিরেই রচিত হয়। তাই তার প্রতি উন্নয়নের আহ্বান জানানো ছাড়া জাতির আর কিছুই করণীয় থাকে না।

মন্তব্য : নেতার সঠিক সিদ্ধান্ত ও দৃঢ় মনোবলই জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৫ ॥ সকাল হ'য়েছে। তবু জাগলে না?
তবু তুমি জাগলে না?

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি ফররুখ আহমদ মুসলিম জাতির কর্ণধারের দায়িত্বহীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বিশ্লেষণ : বিশ্বের ব্যাপক অঞ্চলে যোগ্য নেতৃত্বের বলে একসময় ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে নেতৃত্বের অভাবে এবং মুসলমানদের স্বেচ্ছাচারে ইসলাম তমসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তাই কবির আক্ষেপ, দুর্যোগপূর্ণ সময় তো অনেক দিন ধরে চলছে, স্বেচ্ছাচারের দায় তো মুসলমানদের অনেক বহন করতে হয়েছে। আর তো অচেতন থাকলে চলবে না। দুর্যোগের অমাবস্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। চারিদিকে জাগরণ-সংগীত বেজে ওঠেছে। মানুষ এসে ঐক্যবদ্ধভাবে নেতার দ্বারপ্রান্তে সমবেত হয়েছে, এখন নেতার জেগে ওঠা উচিত। অতীতের সমস্ত ব্যর্থতা, বর্তমানের সমস্ত ভয়ভীতি, দুর্যোগের সমস্ত ঘনঘটা অতিক্রম করে তাকে অবশ্যই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। প্রবল শক্তি, দুর্বার গতি, দৃঢ় বিশ্বাস ও অফুরন্ত প্রাণৈশ্বর্য নিয়ে তাকে আজ জেগে উঠতে হবে। আলোচ্য অংশে তার জেগে ওঠার বিলম্বে কবি মর্মাহত।

মন্তব্য : মুসলমানদের জাতীয় জীবনে নতুন জাগরণ অনুভূত হচ্ছে। এবার সুযোগ্য কর্ণধার জাতিকে নতুন বন্দরে পৌঁছে দেবে। অথচ এ কর্ণধার দৃঢ় প্রত্যয়ে নেতৃত্ব দিতে বিলম্ব করছেন বিধায় কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৫৬ ॥ হে মাঝি! তোমার সেতারা নেভে নি একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনি রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত পঙক্তিদ্বয় মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদের 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : সাত সাগরের মাঝিকে কবি বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দিতে আলোচ্য পঙক্তিদ্বয়ের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : রাতের আঁধার পার হয়ে ভোর হয়েছে। পূর্ণ চাঁদের মতো নীল দরিয়ায় জাহাজ ভাসছে। হাসনাহেনা ঝরেছে সেই কোন সকালে; কিন্তু ঘুম ভাঙেনি সাত সাগরের মাঝির। অসংখ্য সাপের গর্জন শোনা যাচ্ছে দুয়ারে। অসংখ্য ক্ষুধিতের দল সেখানে এসে ভিড় জমিয়েছে। তাই সাত সাগরের মাঝিকে কবি অনুরোধ করেছেন, সে যেন ঘুম থেকে জেগে ওঠে তার বেসাতি ছড়ায়; অন্যথা সব ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে। এরা কোন আলেয়ার পিছে যাচ্ছে তা দেখার জন্য তিনি মাঝিকে অনুরোধ করেছেন। তারা চলতে চলতে ক্রমে পথ ছেড়ে আরো নিচে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু এতটা দুঃসহ এখন নয়। কারণ সাত সাগরের মাঝির ধ্রুবতারা এখনো নেমে যায়নি; একথা তিনি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার চাঁদনি রাতের স্বপ্নও দেখেছে মরুভূমি। অথচ কবি বুঝতে পারছেন না, কোন এক অজ্ঞাত ভয়ে সাত সাগরের মাঝি কাঁপছে।

মন্তব্য : সব দুঃখ-কষ্ট আর হতাশা জাতির জীবন থেকে দূর করে তাদেরকে আত্মবলে বলীয়ান হতে হবে। কেননা এর মাধ্যমেই মুক্তিলাভ এবং কাঙ্ক্ষিত অনাবিল সুখময় সুন্দর জীবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

» ব্যাখ্যা : ৫৭ ॥ কোন অজ্ঞাত বন্দরে এসে লাগল সেই জাহাজ
মনে পড়ে নাকো আজ,
তবুও সেখানে ভ'রেছে জাহাজ মারজান মর্মরে
এইটুকু মনে পড়ে।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে কবি ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝির প্রথম সফরের স্মৃতিময় বর্ণনা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : নিদ্রামগ্ন রাতের অবসান হলে কবি সমুদ্রে জাহাজ ভাসানোর জন্য সাত সাগরের মাঝিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি তাকে প্রথম সফরের কথা মনে করার জন্য বলেছেন। প্রথম সফরকালে সাত সাগরের মাঝি অজানা ফুলের দেশে জাহাজ ভাসিয়েছেন। সেদিন জামরুদ তোলার স্বপ্ন ছিল সকলের চোখে। চন্দ্রালোকে দেখা গিয়েছিল, পাল তুলে জাহাজ অশ্রান্ত সন্ধানীর ন্যায় দিগন্তের নীল পর্দা ছিঁড়ে ফেলে নোনা পানি চিরে চিরে অগ্রসর হচ্ছিল। তারপর কোনো এক অজ্ঞাত বন্দরে গিয়ে ভিড়ে, সে কথা আজ আর মনে পড়ে না। তবে এটুকু মনে পড়ে, মারজান মর্মরে সেদিন গোটা জাহাজ ভর্তি হয়েছিল। সেই পুরানো স্মৃতি আজও কবির মনে অম্লান হয়ে রয়েছে।

মন্তব্য : স্মৃতি রোমন্থনে কবির মনে পড়ে যশ প্রতিপত্তি ও খ্যাতিতে ভাস্বর ছিল মুসলিম জাতি। সুতরাং সাময়িক বাধা-বিপত্তিকে ভয় পেলে চলবে না। আবার জাতিকে নব উদ্যমে, নবচেতনায় তরি ভাসাতে হবে; এটাই কবির প্রত্যাশা।

» ব্যাখ্যা : ৫৮ ॥ এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার। [ফা. প. ২০০৯, '১২, '১৯]

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি ফররুখ আহমদ দুর্দশাকবলিত মুসলিম জাতির আর্তনাদ ফুটিয়ে তুলে জাতির কর্ণধারকে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে দুর্দশা ও হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। তাদের উত্থান ও জাতীয় উজ্জীবনের সব দুয়ার বন্ধ। আগের মতো তাদের শৌর্যবীর্য আর বিশ্বকে চমকিত করে না। মুসলমানদের গন্তব্যগামী জাহাজের পাল ছিঁড়ে গেছে প্রবল ঝড়ে। তাদের প্রতিটি রাত যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটে। ভয়াল সে রাতে হিংস্র অজগরেরা ফণা তুলে তেড়ে নিয়ে যায় মৃত্যুর বন্দরে। মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী সাত সাগরের মাঝির দুয়ারে আজ সহস্র মানুষের তীব্র হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে। ক্ষুধার্ত লক্ষ শিশুর ক্রন্দন যেন সেতারের ঝংকারের ন্যায় আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করছে। এমনি ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সংকটময় লগ্নে মুসলিম উম্মাহকে ঘুমের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠতে হবে। কঠিন শপথে বলীয়ান হয়ে দুর্দম গতিতে এগিয়ে যেতে হবে সামনে বিজয় আর সাফল্যের সোনালি বন্দরের দিকে। কবি এরই আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্তব্য : কবির প্রত্যাশা, মুসলিম উম্মাহ্ যেন তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। এজন্য তাদের সবাইকে অলস ঘুমের ঘোর থেকে জেগে ওঠতে হবে কঠিন শপথে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৫৯ ॥ কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত,
আজকে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে করে কশাঘাত,

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি বর্তমানে দুর্দশাপীড়িত মুসলিম জাতির বেদনাভারে নুয়েপড়া জীবনবৃত্ত অঙ্কন করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : মুসলমানরা একসময় যুগান্তকারী ইতিহাস রচনা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের সেদিনের সাফল্য ছিল চমকপ্রদ। পৃথিবীর বুক থেকে অন্যায়-অনাচার দূর করে এক শান্তিময় ভুবনের জন্ম দিতে তারা সক্ষম হয়েছিল; কিন্তু সেদিন আজ আর নেই। আজ তারা পরাজিত, পরাধীন। তাদের শৌর্য নেই, পৌরুষ নেই, সুখরাজ্য থেকে তারা নির্বাসিত, তাদের চোখে নতুন স্বপ্ন নেই। মৃত্যুর বিভীষিকায় আজ মুসলিম জাতির সামনে এক কঠিন রাত ঘনিয়ে এসেছে। সব সম্ভাবনা যেন এক কঠিন রূঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ। সাহসী সারথি আজ নেই। বন্দরে নৌকা পড়ে আছে। মাঝি ঘুমে অচেতন। নতুন কোনো দ্বীপের আকর্ষণ তাকে আর প্রেরণা দিচ্ছে না।

মন্তব্য : মুসলমানরা আজ নির্যাতিত, লাঞ্ছিত ও ক্ষমতাহারা। তারা যে কখন ক্ষমতা হারিয়েছে সে খবরও তাদের নেই, কিন্তু কঠিন বজ্রাঘাতে তারা আজ জর্জরিত, তাই তাদের পরাধীনতা দূর করে আবার তাদের অবশ্যই জেগে উঠতে হবে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৬০ ॥ কাঁকর বিছানো পথ,
কত বাধা, কত সমুদ্র পর্বত,
মধ্যদিনের পিশাচের হামাগুড়ি,
শকুনি ফেলেছে ছায়া আমাদের মাথার উপরে উড়ি'

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি ফররুখ আহমদ সাত সাগরের মাঝির অগ্রযাত্রার পথে বাধা-বিপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : কোনো শুভযাত্রাই কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবনচলার পথ চিরকাল সমতল থাকে না। পথ চলতে গেলে, গন্তব্যে পৌছতে হলে অনেক বিপদ বন্ধুরতা অতিক্রম করতে হয়। মুসলমানরা হতভাগ্য জাতি, অতীত গৌরব হারিয়ে তারা হতাশায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে । এ সময় আর ঘুমিয়ে থাকলে চলবে না। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এ শতাব্দীতে এগিয়ে চলতে হবে দ্রুতগতিতে। পথে অনেক বাঁধা থাকবে, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র পেরিয়ে ষড়যন্ত্রের সব জাল ছিন্ন করে পৌছাতে হবে মনযিলে মকসুদে।

মন্তব্য : জীবনের যাত্রাপথে বাধাবিপত্তি থাকবেই। তাই বলে ভয় পেয়ে ঘরে বসে থাকলে চলবে না। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। তাহলেই জীবন সফলতার হিরন্ময় সৌন্দর্যে ভরে উঠবে।

➽ ব্যাখ্যা : ৬১ ॥ বেসাতী তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে? ঘুমঘোরে তুমি শুনছো কেবল দুঃস্বপ্নের গাথা।

উৎস : আলোচ্য অংশটুকু কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি মুসলিম নেতাকে স্বপ্নের ঘোর কেটে জেগে ওঠার আহ্বান জানাতে গিয়ে আলোচ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : নিদ্রামগ্ন রাতের অবসান হলে কবি সমুদ্রে জাহাজ ভাসানোর জন্য সাত সাগরের মাঝিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। কবি বলেন, হে নাবিক! তোমার জাহাজ এখনো বিপর্যস্ত হয়নি; মেঘখণ্ড তোমার সেতারা এখনো আড়াল করেনি। জাহাজের হালও সুদৃঢ়। ক্ষুধাতুরেরা তোমার দিকে চেয়ে আছে। প্রবাল দ্বীপের নারকেল শাখা বাতাসে ঝনঝনিয়ে উঠছে। মাঝি-মাল্লারা তাদের ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে, সাত-সমুদ্র নীল আক্রোশে উত্তাল তরঙ্গ তুলছে, এদিকে অচেনা যাত্রীরা উদ্দেশ্যহীনভাবে পথ চলছে। এমনি এক সময়-সন্ধিক্ষণে মাঝি ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। সাত সাগরের মাঝি তথা মুসলিম নেতা তার প্রথম সফরের কথা ভুলে গেছে। অথচ জাহাজ অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এ সময় মুসলিম জাতির মুক্তির লক্ষ্যে একজন অকুতোভয় বীর সেনানীর দরকার। প্রচ্ছন্ন সে মুসলিম নেতাকেই কবি অসীম সাহস নিয়ে সম্মুখপানে অগ্রসর হওয়ার আকুল আবেদন জানান।

মন্তব্য : মুসলিম উম্মাহ বর্তমানে দুর্দশা ও হতাশার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত। তাদের এ করুণ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন একজন পূর্ণ ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মুসলিম নেতার। নেতার সঠিক সিদ্ধান্ত ও দৃঢ় মনোবলই জাতিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দিতে পারে।

➽ ব্যাখ্যা : ৬২ ॥ শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা, অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি, ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : হেরার জ্যোতিতে মুসলিম জগৎ ও জীবন যে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, এখানে কবি ফররুখ আহমদ এ আত্মবিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন।

বিশ্লেষণ : মানুষের জীবনচলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, তাতে আছে অনেক বাধা, অজস্র বিপদ। এ সবকিছু অতিক্রম করেই মানুষকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে হয়। বর্তমানে যে হিংসা-বিদ্বেষ, অনৈক্য মানবজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ ইসলামী আদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ। বর্তমানে মুসলমানদের জীবনে নেমে এসেছে পতন, তারা আজ পরাধীন, তাদের অতীত গৌরব আজ অস্তমিত, তবু কবি আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস করেন, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে সত্যের প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে সামনে অগ্রসর হলে জাতিকে জয়ের মালা পরানো কঠিন হবে না। শাহী দরজার কপাট খোলা আছে, সেখানে পূর্ণ চাঁদের আলো সব আঁধার বিনাশ করে দোল খাচ্ছে। হেরার গুহায় একদিন যে সত্য জ্যোতিষ্মান ছিল, সে সত্যের আলো জোছনা হয়ে ঝরে পড়ছে, সেই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজত্বের অম্লান আদর্শ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই কবি মাঝিকে বলছেন, পাল তুলে নোঙ্গর খুলে নিতে।

মন্তব্য : মানবজীবন জটিলতামুক্ত নয়, তার জীবনচলার পথ বন্ধুর। তবু মানুষের জীবনে আশা থাকে, স্বপ্ন থাকে। কবি এখানে মুসলিম জাতিকে সেই আশার বাণী শুনিয়েছেন।

➤ ব্যাখ্যা : ৬৩ ॥ এবার তাহ'লে বাজাও তোমার যাত্রার জয়ভেরী,
আসুক যাত্রী পথিক, হে মাঝি এবার কোরোনা দেরী।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : সাত সাগরের মাঝির ভূমিকায় মুসলিম উম্মাহর সিপাহসালারকে দুঃসাহসী যাত্রাভিযান শুরু করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন কবি ফররুখ আহমদ।

বিশ্লেষণ : পরাজয় ও পরাধীনতার গ্লানিতে পিছিয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহ আজ দিশেহারা। শোষণের যাঁতাকল এবং অত্যাচার-নিপীড়নে আজ তারা রিক্ত নিঃস্ব। তাদের দুর্ভাগ্যের রজনী যেন ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বঞ্চিত মানবতার দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত হয়ে উঠছে আকাশ-বাতাস। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য দরকার সাহসী নেতৃত্ব এবং নেতৃত্বের দুঃসাহসী অগ্রাভিযান। যাত্রাপথের অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে বিজয়ের কাঙ্ক্ষিত মনযিলে পৌঁছে যাওয়া সময়ের প্রত্যাশিত দাবি। মুসলিম উম্মাহর এ কাঙ্ক্ষিত মনযিলে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে একজন দক্ষ নাবিকের অভিযাত্রায় শামিল হওয়া একান্তই কাম্য। এমনি প্রেক্ষাপটে কবি সাত সাগরের দক্ষ নাবিককে তার যাত্রার ঘোষণা-ধ্বনি উচ্চারণের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি যাত্রীদের আগমন অব্যাহত থাকা এবং যাত্রা বিলম্বিত না করারও আহ্বান জানান।

মন্তব্য : মুসলিম উম্মাহর পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে বিজয়ের ধারায় প্রত্যাবর্তনের জন্য বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অগ্রাভিযান একান্ত জরুরি। 'সাত-সাগরের মাঝি' কবিতায় কবি মুসলিম উম্মাহর এক আপসহীন ক্লান্তিহীন নেতৃত্ব সৃষ্টির উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

➤ ব্যাখ্যা : ৬৪ ॥ দুয়ারে সাপের গর্জন শোন নাকি?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি! তোমার বেসাতি ছড়াও, শোনো,
নইলে যে-সব ভেঙে হবে চৌচির।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু মুসলিম পুনর্জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংগৃহীত।

প্রসঙ্গ : উদ্ধৃতাংশে কবি বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম জাতির পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : অনেক ঘোর অমানিশা কেটে ভোরের দীপ্তিমান আলো প্রকাশিত হয়েছে। নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা কাঁপছে। সাগরের নোনা পানি জোয়ারে এসে হাল রেখেছে। মুসলিম জাতি দীর্ঘদিন তমসাচ্ছন্ন থাকার পর তাদের সামনে আজ হেরার রশ্মি প্রোজ্জ্বল। অথচ তাদের সঠিক নেতৃত্বের অভাবে তারা আজ পৃথিবীর মাঝে লাঞ্ছিত, অবহেলিত ও নির্যাতিত। কবি বলেন, জাগ্রত জনতা মুক্তির নেশায় আজ দিশেহারা। এ সময় যদি সঠিক নেতৃত্বের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্তির দিশা প্রদান না করা হয় তাহলে তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কবি মুসলিম নেতার প্রতি আকুল আবেদন জানান, এ সময় তিনি যেন জনতার ভিড়ে এসে তাদের হারানো পথের সন্ধান দেন।

মন্তব্য : যোগ্য ও আদর্শবান নেতা ছাড়া জাতীয় নেতৃত্ব সম্ভব নয়। তাই ইসলামী পুনর্জাগরণের জন্য আজ দরকার যোগ্য নেতৃত্বের। নতুবা মুসলিম জাতি তাদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

ব্যাখ্যা : ৬৫ ॥ **হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়োনা ভয়,**
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক–তারকার বিস্ময়,
অথবা, ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে–যেথা জাগছে হেরার রাজ-তোরণ।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদ বিরচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি ফররুখ আহমদ সাত-সাগরের মাঝির উদ্দেশে আলোচ্য উক্তি করেছেন। আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে কবি মাঝিকে অভয় বাণী শুনিয়েছেন।

বিশ্লেষণ : নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা কাঁপছে। অজানা মাটির গভীর টান সবুজ স্বপ্নে ধূসরতা বয়ে এনেছে। যদিও বাতাসে ধূসর পাতা ঝরছে, ঝরছে মৃত্যু হিম-শীতল বরফ, তবুও অফুরান আশা জ্বলছে। এখনো তার অপরিসীম স্বপ্ন। তাই আজ সাত-সাগরের মাঝিকে সমুদ্রে জাহাজ ভাসাতে হবে। কবি তার মনে সাহস সঞ্চার করে বলেছেন, তাকে ভয় পেলে চলবে না। সে হেরার পথিক– তারকার বিস্ময় তাকে কুড়াতে হবে। এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা ঝরছে, তবু অগণন পাতা ভিড় করে। দূরে জাগছে হেরার রাজতোরণ। সে পথে যদিও মরু পার হতে হবে, যদিও সে পথে দরিয়ার নোনা পানি, তবুও সে পথে আছে মনযিল, আছে ছায়াতরু আর পথে আছে মিঠা পানি। তাই সব ভয় দূরে রেখে সাত-সাগরের মাঝিকে যাত্রা শুরু করতে হবে।

মন্তব্য : মুসলমানরা একত্ববাদের বলে বলীয়ান। কোনো বাধাবিপত্তি তাদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারবে না, হেরার রাজ-তোরণের সংস্পর্শ তারা লাভ করবেই। তারা তাদের অতীত ঐতিহ্য আবার পুনরুদ্ধার করবে; এটা কবির বিশ্বাস।

ব্যাখ্যা : ৬৬ ॥ **সর্প-চিকন জিহ্বায় তার মৃত্যুর ইঙ্গিত,**
প্রবল পুচ্ছ আঘাতে তোমার রঙীন মিনার ভাঙে।

উৎস : ব্যাখ্যেয় অংশটুকু কবি ফররুখ আহমদ রচিত 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : এখানে কবি মুসলিম জাতির বর্তমান করুণ অবস্থা বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন।

বিশ্লেষণ : ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে তাদের নিদ্রা-অলসতা কাটিয়ে সত্যের মশাল নিয়ে এগিয়ে যেতে কবি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা তাদেরকে অগণিত ক্ষুধার্ত-

নিপীড়িত মানবতার মুক্তির জন্য ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাত সাগরে পাড়ি জমাতে হবে। কিন্তু মাঝি-মাল্লারা এক অজানা আলেয়ার পেছনে ঘুরছে। কবির মতে, মুসলিম জাতির নেতা অলস, নিষ্ক্রিয় এবং হতাশার সাগরে নিমজ্জিত। মুসলিম নেতা সুখস্বপ্নের ঘনঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেননি বলে তিনি লাভবান হচ্ছেন না। জাহাজের পাল আজ অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাচ্ছে। এক অজ্ঞাত বন্দরে এসে জাহাজ ভিড় জমিয়েছে। তাদের চোখে নতুন কোনো স্বপ্ন নেই। জীবনের চারদিকে শুধু অশুভ সংকেত। আজ তাদের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলছে। মৃত্যুদূত তাদের সামনে উপস্থিত। বারে বারে তা অশুভ আঘাত হেনে ইসলামের মহান ঐতিহ্যকে কষাঘাত করছে। অথচ মুসলিম নেতা ঘুমের ঘোরে দিকভ্রান্ত।

মন্তব্য : বর্তমানে মুসলমানরা অশুভ শক্তির যাঁতাকলে পিষ্ট। তাদেরকে এ অবস্থা থেকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে আজ দরকার একজন সাহসী মুসলিম বীর সেনার। যার নেতৃত্বে মুসলিম জাতি ফিরে পাবে হারানো ঐতিহ্য।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৭ ॥ **তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো,**
এবার অনেক পথ শেষে সন্ধানী।
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যে ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের 'সাত-সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'সাত-সাগরের মাঝি' শীর্ষক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি ফররুখ আহমদ সব বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সাত-সাগরের মাঝিকে পাল তোলার জন্য অনুরোধ করেছেন।

বিশ্লেষণ : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি মুসলমানরা ইসলামের আদর্শচ্যুত হয়ে অন্তহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করছে। পরাধীনতার গ্লানি, শোষণের যাঁতাকল এবং অত্যাচার-নিপীড়নে তারা দিশেহারা। তাদের দুর্ভাগ্যের রজনী যেন ক্রমে আরো আঁধার হয়ে আসছে। ফলে মেহনতি মানুষের মধ্যে মুক্তির আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। তারা মিথ্যার নাগপাশ থেকে, অত্যাচার-শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু এমনিভাবে অনন্ত যুগ চলতে পারে না। তাহলে মুসলিম জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। তাই নৈরাশ্যের ঘুম থেকে জেগে ওঠে তাদের অতীত সমৃদ্ধির পথ ধরে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। এ যাত্রাপথে রয়েছে নানাবিধ বাধাবিপত্তি। তবু ভেঙে পড়লে চলবে না। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে যেতে পারলেই সম্মুখে কাঙ্ক্ষিত হেরার রাজতোরণ দেখা যাবে। বহু পথ অতিক্রমশেষে মিলবে বাঞ্ছিত মনযিল। তাই কবি মুসলিম জাতিকে এখনই যাত্রা শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্তব্য : সত্যের পথে চলতে গেলে বাধাবিপত্তি থাকবে, কিন্তু তা অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত সাফল্যে পৌছাতে হবে।

স্বাধীনতা তুমি

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৮ ॥ **স্বাধীনতাম তুমি**
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা কাব্যের অনন্য কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি আলোচ্যাংশে আমাদের স্বোপার্জিত প্রিয় স্বাধীনতাকে একুশের সংগ্রামী সভা এবং স্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিলের ধারাবাহিকতার সাথে একাত্ম করেছেন।

বিশ্লেষণ : আমাদের স্বাধীনতা কোনো বিশেষ মুহূর্তের আবেগ বা উচ্ছ্বাস নয়। এ স্বাধীনতা দীর্ঘ সংগ্রামের অর্জিত ফসল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ সংগ্রাম শুরু। ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি মায়ের ভাষাকে বাঁচাতে গিয়ে অকালে প্রাণ দেন সালাম, রফিক, জব্বার, বরকত। তাদের বুকের তাজা রক্ত ঝরে পড়ে ঢাকার রাজপথে, রাজপথ হয় কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙিন। তারপর প্রতিবছর একুশ আসে, আসে সংগ্রামমুখর দিন। দীর্ঘ মিছিলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী তরুণেরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় নতুন প্রত্যয়ে। শুরু হয় পতাকাশোভিত স্লোগানমুখর ঝাঁঝালো মিছিল। এ মিছিল রাজধানীবাসীকে সচকিত করে, সচকিত করে সমগ্র দেশকে।

মন্তব্য : আমাদের স্বাধীনতা একুশের উজ্জ্বল সভার মতো প্রাণময়। পতাকাশোভিত স্লোগানমুখর মিছিলের মতো যৌবনদৃপ্ত আমাদের চেতনা।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৬৯ ॥ স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু আধুনিক কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে উৎকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি শামসুর রাহমান স্বাধীনতাকে তাঁর কাব্যিক চেতনায় ফসলের মাঠে কৃষকের স্নিগ্ধ হাসির সাথে উপমিত করেছেন।

বিশ্লেষণ : বাংলার কৃষককুল খোলা আকাশের নিচে রোদ বৃষ্টিতে কঠোর পরিশ্রম করে সোনার ফসল ফলায়। তাদের অক্লান্ত শ্রম ও সাধনার ফলে একসময় ফসলে মাঠ ভরে যায়, মনের আনন্দে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে। তেমনি স্বাধীনতার বদৌলতে বাংলাদেশের জনগণের মুখে সফল কৃষকের ন্যায় আনন্দের হাসি ফুটেছে। বাংলার কৃষকের মাঠের ফসল এখন আর শোষকের গোলায় যাবে না। কৃষক নিজেই ভোগ করবে সে ফসল যা স্বাধীনতার বদৌলতেই সম্ভব হয়েছে। তাই স্বাধীনতার অপর নাম কৃষকের অমলিন হাসি, অবারিত ফসলের মাঠ।

মন্তব্য : স্বাধীনতা এক পরম পাওয়া, পরম তৃপ্তি। স্বাধীনতা পেলে মানুষ শান্তির হাসি হাসে প্রাণ ভরে। স্বাধীনতাহীনতায় মানুষের দুঃখের শেষ থাকে না।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭০ ॥ স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুল,
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।

উৎস : প্রশ্নোল্লিখিত পঙ্ক্তিত্রয় আধুনিক কবি শামসুর রাহমানের 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' নামক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : কবি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে স্বাধীনতাকে গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুলের সাথে উপমিত করতে গিয়ে আলোচ্য অংশের অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : স্বাধীনতা মানবজীবনের এক পরম সম্পদ। কবি বাংলাদেশের অনবদ্য প্রাকৃতিক জীবনের বিচিত্র চিত্রে এ দেশের স্বাধীনতার শক্তি ও সৌন্দর্য অবলোকন করেছেন। কবি সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে এবং জাতীয় সত্তায় স্বাধীনতাকে কখনো কোমল, কখনো কঠোর রূপের প্রতীকে ধারণ করতে চেয়েছেন। কবি স্বাধীনতার স্বরূপ অঙ্কনে এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে লালিত বুনো হাওয়ায় উদ্দাম গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুলের সাথে স্বাধীনতাকে তুলনা করেছেন। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতা মানুষের দেহ,

মনকে এক পরম বিশ্বাস, তৃপ্তি ও প্রত্যয়ের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে। স্বাধীনতার স্পর্শে মানুষ, মাটি ও প্রকৃতি হয় প্রাণবন্ত। এজন্যই কবি স্বাধীনতাকে হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম গৃহিণীর ঘন কালো খোলা চুলের সাথে উপমা দিয়েছেন।

মন্তব্য : এক পর পাওয়া ও পরম তৃপ্তি হলো স্বাধীনতা। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় আবহমান বাংলার সামাজিক জীবন ও প্রকৃতিতে স্বাধীনতার স্বরূপ বিধৃত হয়েছে।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭১ ॥ স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনা বুক।

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু আধুনিক কবি শামসুর রাহমান বিরচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে আবেগপ্রবণ কবি শামসুর রাহমান শ্রাবণে মেঘনার অকূল জলরাশির প্রমত্ত স্রোতধারার বিশাল চিত্রকল্পে স্বাধীনতাকে প্রতীকায়িত করেছেন।

বিশ্লেষণ : স্বাধীনতা মানুষের এক পরম বিশ্বাস। স্বাধীনতার যেমন একটি প্রমত্ত ও দুর্বার রূপ আছে, ঠিক তেমনি আছে তার শাশ্বত ও কোমল স্নিগ্ধরূপ। তাই স্বাধীনতার সঙ্গে শ্রাবণের অকূল মেঘনার বুকের রয়েছে চমৎকার মিল। শ্রাবণে প্রমত্তা মেঘনা শুধু সর্বনাশই করে না, দু'কূল প্লাবিত করে এ দেশের মাটিকে করে উর্বরা; দেশের জন্য বয়ে আনে বিপুল ফসল। ঠিক তেমনি স্বাধীনতার জন্য মুক্তিপাগল মানুষ রত হয় কঠিন সংগ্রামে। সংগ্রাম সুখের নয়; ধ্বংসের, দুঃখ-কষ্টের, কিন্তু ধ্বংসের মধ্যেই জন্ম নেয় সৃষ্টিসুখের উল্লাস। আমাদের স্বাধীনতা রক্তাক্ত পথপরিক্রমা শেষে মেঘনার মতো সমগ্র দেশকে দেয় প্রশান্তি ও আনন্দ। তাই কবি শ্রাবণের মেঘনার বুকের সাথে স্বাধীনতাকে উপমিত করেছেন।

মন্তব্য : নদীর প্রমত্ত বুকের যে উদারতা তা স্বাধীনতার বিশালত্বকে স্পষ্ট করে তোলে। মেঘনার উত্তাল বুকে যে উদ্দাম গতিময়তা তাকে স্বাধীনতার প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রাণাবেগের সাথেই কবি তুলনা করেছেন।

⏩ ব্যাখ্যা : ৭২ ॥ স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।

উৎস : প্রশ্নোদ্ধৃত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি শামসুর রাহমান রচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে সংকলিত।

প্রসঙ্গ : কবি স্বাধীনতাকে অবলোকন করেছেন শ্রমজীবী যুবকের মজবুত বাহুর গ্রন্থিল পেশীর সাথে, আলোচ্যাংশে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কোনো মানুষই কোনোদিন পরাধীনতার মাঝে জীবন কাটাতে চায় না। কবি রক্তাক্ত আখরে রচিত আমাদের স্বাধীনতাকে বন্দনা করেছেন অনুভবের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ বস্তু-নির্বস্তু সব অনুষঙ্গেই স্বাধীনতা দীপ্তমান। তাই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতাকে তিনি আবহমানকাল থেকে আমাদের প্রকৃতির কোলে লালিত শ্রমিক, মজুর আর যুবকের পেশীময় শক্তিশালী বাহুর প্রতীকে প্রত্যক্ষ করেছেন। মূলত আমাদের স্বাধীনতা শ্রমিক, মজুরসহ ত্রিশ লাখ প্রাণের বিনিময়ে রক্তের নদী দিয়েই সাঁতার কেটে এসেছে। স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন তার চেয়ে আরো কঠিন স্বাধীনতা রক্ষা করা। অর্জিত ভৌগোলিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে দক্ষ শ্রমিকের পেশীবহুল হাত।

মন্তব্য : অসংখ্য মানুষ তথা মুক্তিযোদ্ধার রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তাই কবি আমাদের অপরাজেয় স্বাধীনতার অস্তিত্বকে যে নান্দনিক সত্তায় উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৩ ॥ স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু আধুনিক কবি শামসুর রাহমান বিরচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : আলোচ্যাংশে কবি স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য ও গভীরতর ব্যঞ্জনাকে প্রতীকায়িত করার জন্য আলোচ্য চরণ দুটির অবতারণা করেছেন।

বিশ্লেষণ : কোনো সত্য প্রতিষ্ঠা বা কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রয়োজনে পোস্টার ও ফেস্টুনের ব্যবহার হয়। এতে একদিকে যেমন বক্তব্য ব্যক্ত হয়, অপরদিকে তেমনি অত্যাচার-অনাচার-অন্যায়ের প্রতিবাদও করা হয়। পোস্টারের এ বৈশিষ্ট্যের সাথে বাঙালির স্বাধীনতার সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। কবি এ সংগ্রামী জনতার স্বাধীনতার স্বরূপ পর্যালোচনা করে তাকে রাঙা পোস্টারের সাথে তুলনা করেছেন। এ দেশের সাধারণ জনতার কাছে স্বাধীনতার স্বপ্ন রাঙা পোস্টারের মতোই চকচকে। এভাবে কবি স্বাধীনতার ব্যঞ্জনাধর্মী চিত্র এঁকেছেন।

মন্তব্য : পাঞ্জেরি যেমন নাবিককে পথ প্রদর্শন করে, রাঙা পোস্টারও তেমনি আমাদের স্বাধীনতার উজ্জ্বল দিকনির্দেশনা ও অসীম অনুপ্রেরণা।

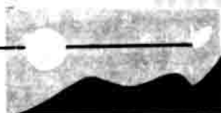
▸▸ ব্যাখ্যা : ৭৪ ॥ স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা। [ফা. প. ২০১৪, '১৮]

উৎস : সংকলিত কবিতাংশটুকু বাংলা সাহিত্যের স্বনামখ্যাত আধুনিক কবি শামসুর রাহমান বিরচিত 'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বাধীনতা তুমি' শীর্ষক কবিতা থেকে চয়ন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গ : স্বাধীনতা যে মানুষের জীবনের একান্তই আপন সত্তার অনুরণন, আলোচ্য চরণগুলোতে তার অবতারণা করা হয়েছে।

বিশ্লেষণ : স্বাধীনতা মানবজীবনের এক পরম সম্পদ। আমাদের এ দেশ একদিন পরাধীন ছিল। নির্যাতনে নিষ্পেষণে এ দেশের মানুষ মনোবিকল হয়ে পড়ে। সুদীর্ঘ আন্দোলনের পথ ধরে এক সাগর রক্তের বিনিময় ১৯৭১ সালে এ দেশ স্বাধীন হয়। মানুষ পায় মুক্তির অনাবিল আনন্দ। কবির অনুভূতিতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একাকার হয়ে মিশে আছে মূল্যবান এ স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বসন্ত দিনের কোকিল কণ্ঠের সুরেলা গানের মতো, আবার কখনো পথ-পাশে দাঁড়িয়ে যে ছায়াবীথি বয়েসী বটগাছ, যার ছায়াদান কৃতার্থ করে জনজীবনকে, স্বাধীনতা সে বয়েসী বটের রৌদ্রস্নাত পত্রের মায়াবী আচ্ছাদন।

মন্তব্য : স্বাধীনতার বদৌলতেই কবি মুক্তমনে ইচ্ছেমতো নিজ খাতায় কবিতা লিখতে গিয়ে মুক্ত বিহঙ্গের মতো কাব্যাকাশে মনের আবেগ-অনুভূতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। পাশাপাশি ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ আস্বাদন করতে পেরেছেন।




খ. বাংলা ভাষার প্রয়োগবিধি

ভাষাশিক্ষা

- বাংলা বানানরীতি
- ভাষারীতি : সাধু, চলিত ও কথ্য
- বাংলা ব্যাকরণ
- অনুবাদ : ইংরেজি হতে বাংলা

প্রবন্ধ রচনা

ব্যাকরণ



ভাষাশিক্ষা

▶৫টি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ৩টির উত্তর দিতে হবে – ৫ × ৩ = ১৫

ক. বাংলা বানানরীতি

⏩ প্রশ্ন : ১ ॥ বাংলা বানানের রীতি বলতে কী বোঝ?
অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে লেখ।

উত্তর ।। বাংলা বানানের রীতি : বাংলা ভাষা বিশ্বের সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর অন্যতম। বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই বাংলা বলতে পারে। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে কেবল শিক্ষিত লোকেরাই বাংলায় লিখতে পারে। তবে অনেক সময় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরাও বানানে অগণিত ভুল করে থাকেন। এ ভুল সংশোধনের জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজন সর্বাগ্রে।

সঠিক বাংলা লিখনের জন্য ব্যাকরণভিত্তিক যে রীতি বা পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকেই বাংলা বানানের রীতি বা পদ্ধতি বলে। বাংলা বানানের রীতি অনেকটা জটিল। তাই এ রীতিকে সহজবোধ্য করার জন্য উনিশ শতকের পর থেকে আধুনিক বাংলা বানানরীতি প্রবর্তন করা হয়। ভাষা প্রবহমান জলধারার মতো সচল। চলতে চলতে স্বাভাবিকভাবেই ভাষা মোড় নেয়, তার শব্দসমূহের মধ্যে অনেকগুলোর অর্থ ও উচ্চারণে পরিবর্তন ঘটে; আবার নিত্যনতুন দেশি ও বিদেশি শব্দের আমদানিও হয়। ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ অভিধানে অধিকৃত থাকলেও প্রচলিত উচ্চারণে ও বানানে বেশকিছু লক্ষণীয় পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বানানের ক্ষেত্রে এক ধরনের অস্বস্তিকর অস্থিরতা ও নৈরাজ্য থেকে ভাষাকে সুন্দর ও সর্বজনগ্রাহ্য উচ্চারণ ও বানানের রূপদানের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৎকালে দেশের সর্বাগ্রগণ্য ভাষাতাত্ত্বিকদের নিয়ে একটি বানান সংস্কার কমিটি গঠন করে। এ কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে বানানরীতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হাতে নেওয়া হয়, তাকেই সংক্ষেপে বলা হয় আধুনিক বাংলা বানানের রীতি বা পদ্ধতি।

⏩ প্রশ্ন : ২ ॥ বাংলা বানানরীতির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর।
অথবা, বাংলা বানানের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা : ভাষার পরিশুদ্ধতার জন্য প্রতিটি ভাষায় সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল বানানরীতি বা পদ্ধতি রয়েছে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর সমৃদ্ধ ভাষাগুলোর অন্যতম একটি ভাষা অথচ বাংলা ভাষার কতকগুলো শব্দের ক্ষেত্রে দেখা যায়, নানা জনে নানা রকম বানান লিখছেন। বাংলার মতো উন্নত ভাষার ক্ষেত্রে এটা মোটেই গৌরবের কথা নয়। তাছাড়া এখনো বাংলা বানানের সম্পূর্ণ সমতা যে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়; বরং কালে কালে বানানের বিশৃঙ্খলা যেন বেড়েই চলেছে। তাই বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে উচ্চারণ ও লেখার জন্য বাংলা বানানের নিয়ম জানা আবশ্যক।

বাংলা ভাষা তৎসম, অর্ধতৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃত বানানগুলো নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রেও বানানের নানারূপ

পরিবর্তন দেখা যায়। ভাষায় কোনোমতেই একটি শব্দের একাধিক বানান সমীচীন নয়। কেননা বানান একরকম না হলে ভাষার সৌন্দর্য যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনি ভাব ও অর্থ গ্রহণেও জটিলতা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা বানান পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে-কোনো ভাষার ব্যাকরণে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বানানের নিয়ম সূত্রবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়। তা না হলে স্বরবর্ণে ই, ঈ, উ, ঊ এবং ব্যঞ্জনবর্ণে ণ, ন, জ, য, শ, ষ, স, র, ড়-এর সঠিক ব্যবহার নিয়ে ভিন্নমত দেখা দিবে। কারণ নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই এ বর্ণগুলোর ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়া সকল ক্ষেত্রে দেশের আপামর জনসাধারণ যাতে একই বানানের নিয়মের মধ্যে তাদের পঠন-পাঠন ইত্যাদি চালাতে পারে সেজন্য অবশ্যই একটি সবর্জনস্বীকৃত বানানের নিয়ম থাকা চাই। এক্ষেত্রে বাংলা বানানের নিয়মের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

উপসংহার : বাংলা ভাষার বানান পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। বইয়ের ভাষা আর মুখের ভাষা এক নয়। মুখে যা উচ্চারণ করা হয় তা ভুল হলে তেমন ক্ষতি হয় না; কিন্তু লেখার ভাষার ভুল হলে তার কুফল বড় মারাত্মক হয়। এতে ভাষা বিকৃত হয় এবং অনেক সময় অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়।

▸▸ প্রশ্ন : ৩ ॥ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০১৭]

অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০৮, '১১, '১৩]

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের দশটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ। [ফা. প. ২০১৫, '১৯]

অথবা, আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ১৯৯০, '৯৩, '৯৬, '৯৮, '০২, '০৬]

অথবা, প্রমিত বাংলা বানানের যে-কোনো দশটি নিয়ম উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

উত্তর ।। বাংলা একাডেমি/আধুনিক বাংলা বানানরীতি : বাংলা বানানের জটিলতা দূর করার জন্য কতিপয় নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা একাডেমি/আধুনিক/প্রমিত বাংলা বানানের বিশেষ বিশেষ নিয়মগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম

তৎসম শব্দ

এই নিয়মে বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের নির্দিষ্ট বানান অপরিবর্তিত থাকবে।

যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন ি ু হবে। যেমন : কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, চুল্লি, তরণি, ঊর্ণা, ঊষা।

রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : অর্জ্জন, ঊর্দ্ধ, কর্ম্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, ঊর্ধ্ব, কর্ম হবে।

সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) হবে। যেমন : অহম্ + কার = অহংকার। এভাবে ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম।

সন্ধিবদ্ধ না হলে ঙ স্থানে ং হবে না। যেমন : অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, আতঙ্ক, কঙ্কাল।

সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঈ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলোতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন : গুণী → গুণিজন, প্রাণী→ প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রিপরিষদ।

তবে এগুলোর সমাসবদ্ধ রূপে ঈ-কারের ব্যবহারও চলতে পারে। যেমন : গুণী→ গুণীজন, প্রাণী→ প্রাণীবিদ্যা, মন্ত্রী→ মন্ত্রীপরিষদ।

ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে -ত্ব ও -তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন : কৃতী→ কৃতিত্ব, দায়ী→ দায়িত্ব, সহযোগী→ সহযোগিতা।

বিসর্গ (ঃ) : শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : ইতস্তত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন : দুস্থ, নিস্তব্ধ, নিস্পৃহ, নিশ্বাস।

অতৎসম শব্দ

ই, ঈ, উ, ঊ : সকল অতৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে। যেমন : আরবি, আসামি, ইংরেজি, ইমান, ইরানি, উনিশ, হেঁয়ালি।

পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন : এটা কী বই? কী আনন্দ! কী আর বলব? কী করছ? কী করে যাব? কী খেলে?

এ, অ্যা : বাংলায় এ বর্ণ বা ে-কার দিয়ে এ এবং অ্যা এই উভয় ধ্বনি নির্দেশিত হয়। যেমন : কেন, কেনো (ক্রয় করো); খেলা, খেলি; গেল, গেলে, গেছে; দেখা, দেখি; জেনো, যেন। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যেগুলোর ্যা-কার যুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, ল্যাঠা।

ং, ঙ : শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।

তবে অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।

বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।

ক্ষ, খ : অতৎসম শব্দ খিদে, খুদ, খুদে, খুর (গবাদি পশুর পায়ের শেষ প্রান্ত), খেত, খ্যাপা ইত্যাদি লেখা হবে।

জ, য : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিপদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন : কাগজ, জাদু, জাহাজ, জুলুম, জেব্রা, বাজার, হাজার।

মূর্ধন্য ণ, দন্ত্য ন : অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গভর্নর, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, রানি, সোনা, হর্ন।

তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ- এর পূর্বে যুক্ত নাসিক্যবর্ণ ণ হয়। যেমন : কণ্টক, প্রচণ্ড, লুণ্ঠন। কিন্তু অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর আগে কেবল ন হবে। যেমন : গুন্ডা, ঝান্ডা, ঠান্ডা।

শ, ষ, স : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। যেমন : কিশমিশ, নাশতা, পোশাক, বেহেশত, শখ, শয়তান, শরবত, শরম, শহর, শামিয়ানা, শার্ট, শৌখিন;

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি ং ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। যেমন : পাসপোর্ট, বাস; রেশন, স্টেশন।

যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে সেখানে ছ-এর ব্যবহার থাকবে। যেমন : তছনছ, পছন্দ, মিছরি, মিছিল।

বিদেশি শব্দ ও যুক্তবর্ণ

বাংলায় বিদেশি শব্দের আদিতে বর্ণবিশ্লেষ সম্ভব নয়। এগুলো যুক্তবর্ণ দিয়ে লিখতে হবে। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

তবে অন্য ক্ষেত্রে বিশ্লেষ করা যায়। যেমন : মার্কস, শেকসপিয়র, ইসরাফিল।

হস-চিহ্ন : হস-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কলকল, করলেন, কাত, চট, চেক, জজ, ঝরঝর। তবে যদি অর্থ বিভ্রান্তি বা ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, বাহ্, যাহ্।

উর্ধ্ব-কমা : উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চাল (চাউল), আল (আইল)।

▸▸ প্রশ্ন : ৪ ॥ বাংলা বানানে ই-কারের পাঁচটি ব্যবহার দেখাও।
অথবা, বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের ছয়টি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ।। ই-কারের ছয়টি ব্যবহার : বাংলা বানানে ই-কারের ছয়টি ব্যবহার উদাহরণসহ নিচে প্রদত্ত হলো–

১। **ঈ-কারের পরিবর্তে ই-কার :** তৎসম শব্দ যদি তদ্ভব শব্দে রূপান্তরিত হয়, তাহলে ঈ-কারের পরিবর্তে ই-কার হয়। যেমন– বাড়ী>বাড়ি, শাড়ী>শাড়ি ইত্যাদি।

২। **জাতি বা ভাষার নামের শেষে ই-কার :** আধুনিক বাংলা বানানের নিয়মে জাতি বা ভাষার নামের শেষে ই-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন– বাঙালি, ইহুদি, জাপানি, হিন্দি, আরবি, ইংরেজি ইত্যাদি।

৩। **অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার :** বস্তুবাচক, ভাববাচক, কর্মবাচক এবং প্রাণিবাচক ইত্যাদি অ-তৎসম শব্দের শেষে ই-কার হয়। যেমন– আলমারি, ওস্তাদি, চালাকি, মাস্টারি ইত্যাদি।

৪। **স্ত্রীবাচক অতৎসম শব্দে ই-কার :** বাংলা স্ত্রীবাচক অতৎসম শব্দে ই-কার হয়। যেমন– মাসি, পিসি, চাচি, গিন্নি, বিবি ইত্যাদি।

৫। **ক্রিয়াবাচক শব্দে :** বাংলা ক্রিয়াবাচক শব্দে ই-কার হয়। যেমন– করি, লিখি, ধরি, শিখি ইত্যাদি।

৬। **পদাশ্রিত নির্দেশক :** টি-তে ই-কার হবে। যেমন : ছেলেটি, বইটি, লোকটি।

▸▸ প্রশ্ন : ৫ ॥ বাংলা বানানে ই, ঈ, উ, ঊ-এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে ই, ঈ, উ, ঊ-এর ব্যবহার :

১। সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কার চিহ্ন (ি, ু) ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন– গাড়ি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, চুরি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচে, নিচু, ইমান, চুন, পুব, ভুখা, মুলা, উনিশ ইত্যাদি।

২। অনুরূপভাবে 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন– খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি। তবে নামবিশেষ্যের ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হতে পারে।

৩। সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ ও যোজক পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমন– কী করছ? কী পড়? কী খেলে? কী আর বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটা কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে? কী আনন্দ! কী দুরাশা! কী বাংলা কী ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী ইত্যাদি।

৪। যেসব প্রশ্নবাচক বাক্যের উত্তর হ্যাঁ বা না হবে সেইসব বাক্যে 'কি' হ্রস্ব-ই-কার হবে। যেমন : তুমি কি যাবে? সে কি এসেছিল?

⏩ প্রশ্ন : ৬ ॥ উদাহরণসহ বাংলা বানানে উ-কার ব্যবহারের সূত্রগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর ॥ বাংলা বানানে উ-কার ব্যবহারের নিয়ম/সূত্র : বাংলা বানানে উ-কার (ু) ব্যবহারের নিয়মগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। সকল অ-তৎসম শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব, অর্ধ-তৎসম, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দে উ-কার হবে। যেমন–পূর্ব > পুব, পূজা > পুজো, কুলা, হুকুম, বুলেট, পুলিশ ইত্যাদি।

২। অ-তৎসম বা বাংলা ক্রিয়াবাচক পদে উ-কার (ু) হয়। যেমন– আসুন, বসুন, বলুন, শুনুন ইত্যাদি।

৩। উ-যুক্ত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দে উ-কার (ু) ব্যবহৃত হয়। যেমন– ইচ্ছা + উক = ইচ্ছুক, নিন্দা + উক = নিন্দুক ইত্যাদি।

৪। উ-কারান্ত উপসর্গযোগে গঠিত শব্দে উ-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন– দুর্নাম, সুবোধ, অনুকরণ ইত্যাদি।

৫। দ্বিরাবৃত্ত শব্দে উ-ধ্বনিতে সর্বত্রই উ-কার হয়। যেমন– চুলাচুলি, হুড়োহুড়ি, খুনোখুনি ইত্যাদি।

৬। 'উপ' উপসর্গ বা 'উপ' অব্যয়যোগে গঠিত শব্দের বানানে উ-কার হয়। যেমন– উপগ্রহ, উপকার, উপনদী, উপজেলা ইত্যাদি।

৭। সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদের শেষে উ-কার থাকলে তা বহাল থাকে। যেমন– প্রভুভক্ত, গুরুগম্ভীর, অনুগমন ইত্যাদি।

⏩ প্রশ্ন : ৭ ॥ উদাহরণসহ বাংলা বানানে ঊ-কার (ূ) ব্যবহারের সূত্রগুলো উল্লেখ কর।
অথবা, বাংলা বানানে ঊ-কার (ূ) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ॥ বাংলা বানানে ঊ-কার (ূ) ব্যবহারের নিয়ম : বাংলা বানানে ঊ (ূ) কারের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা বানানে ঊ-কার (ূ) ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। তৎসম শব্দে ঊ-কার অবিকৃত থাকে। যেমন– বধূ, মূল, ধূলি ইত্যাদি।

২। উ-কারের উপর ঊ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন– ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব, বধূ + উরা = বধূরা ইত্যাদি।

৩। উ-কারের পর উ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঊ-কার হয়। যেমন– মরু + উদ্যান = মরূদ্যান, সু + উক্তি = সূক্তি ইত্যাদি।

৪। বিসর্গের পর 'র' থাকলে পূর্ব পদের উ স্থলে ঊ হয়। যুক্তপদে বিসর্গ (ঃ) লোপ পায়। যেমন– চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ ইত্যাদি।

৫। সমাসবদ্ধ পদের মধ্যাংশে ঊ-কার থাকলে ঊ-কার বহাল থাকে। যেমন– উপকূল, ভূতপূর্ব, অকূল ইত্যাদি।

⏩ প্রশ্ন : ৮ ॥ বাংলা বানানে এ, অ্যা, ও-এর ব্যবহার উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে এ, অ্যা-এর ব্যবহার : বাংলায় এ বা ে-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা, এ উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনিনিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা ে-কার হবে। যেমন– দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা ে-কার হবে। যেমন– এন্ড, নেট, বেড, শেড ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা ্যা ব্যবহৃত হবে। যেমন– অ্যান্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট ইত্যাদি। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল পরিচিত। যেমন– ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা এসব শব্দে–্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

ও-এর ব্যবহার : বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এ উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদে বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ে া-কার ব্যবহার করছেন। যেমন– ছিলো, করলো, বলতো, কোরছে, হোলে, যেনো, কেনো, (কী জন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে।

বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ে া-কার ব্যবহার করা যাবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ, যার শেষে ে া-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন– ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো প্রভৃতি।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় শব্দের আদিতেও ও-কার লেখা যেতে পারে। যেমন : কোরো, বোলো, বোসো।

⏩ প্রশ্ন : ৯ ॥ ণ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ১৯৯৫, '৯৭, '০১, '০৩, '০৫, '০৭, '০৯]

অথবা, ণ-ত্ব বিধান কী? ণ-ত্ব বিধানের নিয়ম বা সূত্রগুলো আলোচনা কর।

অথবা, বাংলা বানানে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ।। ণ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে। এর ব্যবহারের নিয়ম বা সূত্রগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরে ট-বর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কণ্টক, কুণ্ঠা, লুণ্ঠন, দণ্ড, ভণ্ড ইত্যাদি।

২। ঋ, র, ষ– এ কয়টি বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কৃপণ, কর্ণ, বর্ণ, তৃণ, ঋণ, ভাষণ ইত্যাদি।

৩। প্র, পরা, পরি, নির-এ চারটি উপসর্গের পর এবং অন্তর শব্দের পরবর্তী নব, নশ, নহ, নদ, নী, অন, হন্– এ ৭টি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– প্রণাম, পরিণতি, পরিবহণ, নির্ণয় ইত্যাদি।

৪। মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও সমাসবদ্ধ কয়েকটি শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– অগ্রণী, গ্রামীণ ইত্যাদি।

৫। অতৎসম শব্দে কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন– কান, কুরআন, ইরান, ঠান্ডা, ভান্ডার ইত্যাদি।
৬। প্র, পরা, পূর্ব ও অপর– এ চারটির পরবর্তী অহ্ন শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– প্রাহ্ণ, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ইত্যাদি।
৭। পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পর 'অয়ন' শব্দের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– পরায়ণ, উত্তরায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ ইত্যাদি।
৮। ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ এবং য, ব, হ বা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– দর্পণ, গ্রহণ, শ্রবণ, লক্ষণ, ভক্ষণ ইত্যাদি।
৯। ত, থ, দ, ধ-এর পূর্বে সংযুক্ত বর্ণ দন্ত্য-ন হয়; এক্ষেত্রে কখনো মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন– দৃষ্টান্ত, বৃন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি।
১০। যদি ঋ, র, ষ-এর পর ক-বর্গ, প-বর্গ, য, র, হ, ঙ ছাড়া অন্য কোনো বর্ণ থাকে এবং তারপর দন্ত্য-ন থাকে, তাহলে মূর্ধন্য-ণ হবে না। যেমন– দর্শন, নর্তন, প্রার্থনা, বর্ধন ইত্যাদি।
১১। কিছু কিছু শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কল্যাণ, গণ, অণু, কণা, গুণ, গণিত, গণিকা, আপণ, কোণ, বাণিজ্য, বিপণি, বীণা, বাণী, তৃণ, নিপুণ, পণ্য, পুণ্য, পণ, ফণি, মাণিক্য, লাবণ্য, শণ, শোণ, লবণ, শোণিত, শাণিত, শোষণ, কর্ষণ ইত্যাদি।

▸▸ প্রশ্ন : ১০ ॥ ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৪, '০৭, '০৯]

অথবা, বাংলা বানানে মূর্ধন্য-ষ ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, ষ-ত্ব বিধি বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ষ-ত্ব বিধির পাঁচটি নিয়ম লেখ। [ফা. প. ১৯৯৯, '০২, '০৬]

উত্তর ॥ ষ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ-তে পরিণত হয়, তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে। এর ব্যবহারের নিয়ম বা সূত্রগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। অ, আ, ভিন্ন অপরাপর স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– ইষ্ট, উষ্ণ, উষা, ওষ্ঠ, রাষ্ট্র, ওষধি ইত্যাদি।
২। ঋ বা ঋ-কারের পর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়ে যায়। যেমন– ঋষি, কৃষি, বৃষ্টি, সৃষ্টি, বৃষ ইত্যাদি।
৩। ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– প্রতি+স্থান = প্রতিষ্ঠান, অনু+স্থান = অনুষ্ঠান, অভি+সেক = অভিষেক, প্রতি+সেধক = প্রতিষেধক ইত্যাদি।
৪। ট এবং ঠ-এর পূর্বে সবসময় দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– কাষ্ঠ, তুষ্ট, নিষ্ঠা, স্পষ্ট, সুষ্ঠু ইত্যাদি।
৫। দুঃ, নিঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ ইত্যাদি বিসর্গযুক্ত উপসর্গের পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ (ঃ) স্থানে মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– দুঃ+কর = দুষ্কর, বহিঃ+কার = বহিষ্কার, নিঃ+ফল = নিষ্ফল, আবিঃ + কার = আবিষ্কার ইত্যাদি।
৬। খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে কখনো মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন– গ্রিস, মিসর, আসর, বাসর, পুলিশ ইত্যাদি।
৭। দুটি পদ সমাসযুক্ত হয়ে একপদে পরিণত হলে এবং প্রথম পদের শেষে ই, উ, ঋ, ও থাকলে পরবর্তী পদের আদ্য দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ তে পরিণত হয়। যেমন– যুধিষ্ঠির, সুষ্ঠু, গোষ্ঠী, সুষমা ইত্যাদি।
৮। কতকগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– শোষণ, শেষ, ভাষা, আষাঢ়, পাষাণ, ভীষণ, ভূষা, মেষ, প্রত্যুষে, ওষধি, পৌষ, উষা, কোষ, কর্ষণ, ঘর্ষণ, তুষার, পুরুষ, পুষ্প, ভূষণ, মহিষ, বিশেষ্য, বিশেষণ, বৃষ, ষোড়শ, বাষ্প, আভাষ, ষাণ্মাসিক, ষড়যন্ত্র, পাষণ্ড ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ১১ ॥ ণত্ব ও ষত্ববিধান বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ষত্ববিধানের তিনটি নিয়ম আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৭]

অথবা, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম লেখ। [ফা. প. ২০১৫]

অথবা, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম লেখ। [ফা. প. ২০১২]

উত্তর ॥ ণ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ-তে পরিণত হয়, তাকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

ষ-ত্ব বিধান : যে বিধান বা নিয়মে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ-তে পরিণত হয়, তাকে ষ-ত্ব বিধান বলে।

ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম : নিচে ণ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো–

১। সংস্কৃত শব্দের যুক্তাক্ষরে ট-বর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কণ্টক, কুণ্ঠা, লুণ্ঠন, দণ্ড, ভণ্ড ইত্যাদি।

২। ঋ, র, ষ– এ কয়টি বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– কৃপণ, কর্ণ, বর্ণ, তৃণ, ঋণ, ভাষণ ইত্যাদি।

৩। প্র, পরা, পরি, নির–এ চারটি উপসর্গের পর এবং অন্তর শব্দের পরবর্তী নব, নশ, নহ, নদ, নী, অন, হন্– এ ৭টি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন– প্রণাম, পরিণতি, নির্ণয় ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম : নিচে ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো–

১। অ, আ, ভিন্ন অপরাপর স্বরবর্ণ এবং ক ও র-এর পর প্রত্যয়ের দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– ইষ্ট, উষ্ণ, উষা, ওষ্ঠ, রাষ্ট্র, ওষধি ইত্যাদি।

২। ঋ বা ঋ-কারের পর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়ে যায়। যেমন– ঋষি, কৃষি, বৃষ্টি, সৃষ্টি, বৃষ ইত্যাদি।

৩। ই-কারান্ত এবং উ-কারান্ত উপসর্গের পর কতকগুলো ধাতুর দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়। যেমন– প্রতি+স্থান = প্রতিষ্ঠান, অনু+স্থান = অনুষ্ঠান, অভি+সেক = অভিষেক, প্রতি+সেধক = প্রতিষেধক ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ১২ ॥ র-ফলা ও রেফ-এর প্রয়োগ দেখিয়ে ৮টি শব্দ লেখ।

উত্তর ॥ র-ফলা ও রেফ-এর প্রয়োগ : বাংলা বানানে কোথায় এবং কীভাবে র-ফলা ও রেফ-এর ব্যবহার করা হয়, তা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। 'র' বর্ণটি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পরে বসে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গঠন করে। ফলে এর নাম হয়ে যায় র-ফলা (্র)। এই র-ফলা পূর্ববর্তী বর্ণের নিচে বসে। যেমন– ব+র = ব্র, প+র = প্র, গ+র = গ্র, ঘ+র = ঘ্র, দ+র = দ্র ইত্যাদি।

২। র-ফলা যোগে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন– বিক্রম (বিক্‌ক্রম) ভদ্র, (ভদ্‌দ্র) ইত্যাদি। এছাড়া অনেকভাবে র-ফলার ব্যবহার দেখা যায়।

রেফ-এর ব্যবহার : রেফ (র্) ব্যবহৃত আটটি শব্দ যথা– কর্তা, পর্দা, ধর্ম, উর্ধ্ব, বর্ধমান, জার্মানি, অর্চনা, মূর্চ্ছা ইত্যাদি। বাংলা বানানে রেফের ব্যবহার নিম্নরূপ–

১। রেফের পরে শ, ষ, স, হ ব্যতীত কতকগুলো বর্ণের বানানে দ্বিত্ব হয়; কিন্তু উচ্চারণে নয়। যথা– কার্য্য > কার্য, ধর্ম্ম>ধর্ম, সর্ব্ব>সর্ব ইত্যাদি।

২। দুটি মহাপ্রাণ বর্ণ দ্বিত্ব করলে সংযুক্ত বর্ণ হয় না; মহাপ্রাণ অর্ধ মহাপ্রাণরূপে উচ্চারণ ও লেখ্য উভয়েই আসে। যেমন– বর্ধমান শব্দে 'ধ'-কে দ্বিত্ব করা হয় র্ধ ধ লিখে নয়; বরং র্দ্ধ অর্থাৎ র্দধ লিখে।

৩। তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব হয় না। যেমন– অর্চনা, মূর্ছা, ধর্ম, কর্ম, অর্জুন ইত্যাদি।

৪। অসংস্কৃত বা তদ্ভব শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হয় না। যেমন– কর্তা, পর্দা, ফর্সা, সর্দার, জার্মানি ইত্যাদি।

⏩ প্রশ্ন : ১৩ ॥ বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ লেখার নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দ লেখার নিয়ম : বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে বিদেশি শব্দের সমাহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সাহিত্যিকগণ ভাষার সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা বৃদ্ধির স্বার্থে এসব বিদেশি শব্দ বাংলা সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। তবে পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষায় এসব বিদেশি শব্দ লেখার সুনির্দিষ্ট নিয়মও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

১। আরবি, ফারসি শব্দে 'সে' (ث) 'সিন' (س), 'সোয়াদ' (ص) বর্ণগুলো প্রতিবর্ণরূপে স এবং শিন (ش)-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহার হয়। যেমন– সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস), বেহেশত ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার প্রবণতাও দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স বর্ণটি ছ-এর রূপ লাভ করেছে, সেখানে ছ ব্যবহার করতে হবে। যেমন– পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ ইত্যাদি।

২। ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question ইত্যাদি শব্দের বানান অন্যরূপ। যেমন– কোএস্চন্ হতে পারে।

৩। বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন– কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল, পুলিশ, হুকুম, হাজার, বাজার, টেবিল, জেব্রা, জুলুম, ফিরিস্তি ইত্যাদি।

তবে ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে যা (ز), যা (ذ), দোয়াদ (ض) যোয়া (ظ) রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি শব্দগুলোর জন্য য ব্যবহার হওয়া সংগত। যেমন– আযান, অযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান। তবে কেউ ইচ্ছে করলে এক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

৪। ইংরেজি st-এর স্থলে সংযুক্ত বর্ণ 'স্ট' হবে। যথা– স্টোভ (stove), স্টিমার ইত্যাদি।

৫। বিদেশি শব্দে ঐ এবং ঔ-এর স্থলে যথাক্রমে 'অই' এবং 'অউ' বসবে। যেমন– পছন্দ সৈ> পছন্দসই, পৈছা > পইছা ইত্যাদি।

৬। বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে 'অ্যা', 'য্া' ব্যবহৃত হবে। যেমন– অ্যান্ড, ক্যাসেট ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ১৪ ॥ বাংলা বানানে ক্ষ, মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার আলোচনা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে ক্ষ-এর ব্যবহার : ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লিখতে হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ. খুদে, খুর, খেপা, খিধে ইত্যাদি লিখতে হবে।

মূর্ধন্য-ণ ও দন্ত্য-ন-এর ব্যবহার : ১। তৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ-এর নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণ-ত্ব বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার করা হবে না। যেমন– অঘ্রান, ইরান, কান, কুরআন, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন ইত্যাদি।

২। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-এর পূর্বে ণ হয়। যেমন– কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-এর আগে দন্ত-ন হবে।

৩। বাংলা ক্রিয়ায় মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয় না। সেখানে 'ন' ব্যবহার করতে হয়। যেমন– করেন, পড়েন, খান, আসুন, ধরেন ইত্যাদি।

৪। সমাসবদ্ধ পদের পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলে পরপদে মূর্ধন্য-ণ হয় না। যেমন– ত্রিনয়ন, মৃগনাভি, দুর্নীতি ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ১৫ ॥ বাংলা বানানে শ, ষ, স-এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে শ, ষ, স-এর ব্যবহার : তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-এর নিয়ম মেনে চলতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ববিধি প্রযোজ্য হবে না।

বিদেশি মূল শব্দে শ, স-এর প্রতিসঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে, বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন– সাল (বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট ইত্যাদি।

তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূপে শ দিয়ে লেখা হবে।

তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন– বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা প্রভৃতি। কিন্তু বিদেশি শব্দে এক্ষেত্রে স ব্যবহার হবে। যেমন– স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট ইত্যাদি।

কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশি s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং sh, -sion, -ssion, -tion ইত্যাদি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে। তবে question জাতীয় শব্দের বানানের পদ্ধতি ভিন্নরূপ। যেমন– কোএস্‌চন্‌ হতে পারে।

আরবি, ফারসি শব্দে সা (ث) সিন (س), সোয়াদ (ص) বর্ণগুলো প্রতিবর্ণরূপে স এবং শিন (ش)-এর প্রতিবর্ণরূপে শ ব্যবহার হবে। যেমন– সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান, শাওয়াল, বেহেশত ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে স-এর পরিবর্তে ছ লেখার প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশি শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে স ছ-এর রূপ লাভ করেছে, সেখানে ছ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। যেমন– পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ১৬ ॥ বাংলা বানানে হস্-চিহ্ন ও ঊর্ধ্ব-কমা ব্যবহারের নিয়ম লিপিবদ্ধ কর।

উত্তর ।। হস্-চিহ্নের ব্যবহার : হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন– কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক ইত্যাদি।

তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– উহ্, যাহ্ ইত্যাদি।

যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন– কর্, ধর্, মর্, বল্ ইত্যাদি।

ঊর্ধ্ব-কমার ব্যবহার : ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করতে হবে। যেমন– করল (করিল), ধরত, বলে (বলিয়া), হয়ে, দুজন, চারশ, চাল (চাউল), আল (আইল) ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ১৭ ॥ বাংলা বানানে জ, য-এর ব্যবহার আলোচনা কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে জ, য-এর ব্যবহার : বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন– কাগজ, জাহাজ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা ইত্যাদি। কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে যা (ز), যা (ذ) দোয়াদ (ض) যোয়া (ظ) রয়েছে যার ধ্বনি ইংরেজি z-এর মতো, সেক্ষেত্রে উক্ত আরবি শব্দগুলোর জন্য য লেখা বাঞ্ছনীয়। যেমন– আযান, অযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান ইত্যাদি। কিন্তু কেউ ইচ্ছে করলে এক্ষেত্রে য-এর পরিবর্তে জ ব্যবহার করতে পারে। তবে জাদু, জোয়াল, জো ইত্যাদি শব্দ জ দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন : ১৮ ॥ বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলা বানানে 'ঙ' ও 'ং' ব্যবহারের সূত্রগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর ।। বাংলা বানানে 'ঙ' এবং 'ং' ব্যবহারের নিয়ম : বাংলা বানানে 'ঙ' এবং 'ং' ব্যবহারের নিয়মগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। বাংলা ভাষায় বহু তৎসম শব্দ আছে। এসব শব্দ সাধু ভাষায় বেশি ব্যবহৃত হয়। সাধু ভাষায় ঙ-এর সাথে গ-সংযুক্ত হয়ে 'ঙ্গ' হয়, চলিত ভাষায় 'ঙ্গ'-এর স্থলে শুধু 'ঙ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
আঙ্গুর	আঙুর	আঙ্গুল	আঙুল
কাঙ্গাল	কাঙাল	রঙ্গিন	রঙিন
বাঙ্গালি	বাঙালি	বাঙ্গালা	বাঙালা
লাঙ্গল	লাঙল	আঙ্গিনা	আঙিনা

২। 'ঙ' নাসিক্য ব্যঞ্জন। এর সাথে ক, খ, গ, ঘ যুক্ত হলে তা অবিকৃত থাকে। ঙ-এর বদলে 'ং' লেখা যাবে না। যেমন– বঙ্গ, সঙ্গ, আতঙ্ক, আশঙ্কা, শৃঙ্খলা ইত্যাদি।

৩। 'ঙ্ক্ষ' যুক্ত ধাতু থেকে উৎপন্ন শব্দে 'ঙ'-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– আকাঙ্ক্ষা, অনাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি।

৪। সন্ধি হলে প্রথম শব্দের শেষ ব্যঞ্জন 'ম' এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ব্যঞ্জন অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) কিংবা উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ) থাকলে সন্ধির ফলে 'ম' স্থানে শুধু 'ং' হয়। যেমন– কিংবদন্তি, কিংবা, সংবাদ, সংবর্ধনা, সংলাপ, সংযত, সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৫। তদ্ভব ও দেশি শব্দে শুধু 'ং' ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন– গাংচিল, বাংলা, পালং, চিংড়ি, জংলী, আংটি ইত্যাদি।

৬। বিদেশি শব্দে বর্তমানে সর্বত্র অবিকৃত 'ং' ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন– কংগ্রেস, ইংলিশ, ব্যাংক, শিলিং, নার্সিং, ট্রেনিং ইত্যাদি।

৭। প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে 'ং'-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– রং, সং, ঢং ইত্যাদি।

৮। সংস্কৃত থেকে আগত কিছু শব্দে 'ং'-এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– বংশ, দংশন, হংস, কংস, নৃশংস ইত্যাদি।

৯। সন্ধি হলে যদি পূর্বপদের শেষে 'ম' এবং পরপদের প্রথমে ক, খ, গ, ঘ থাকে তাহলে 'ম' স্থানে 'ঙ' অথবা বিকল্পে 'ং'-এর হয়ে থাকে। যেমন– অহঙ্কার > অহংকার, অলঙ্কার > অলংকার, ভয়ঙ্কর > ভয়ংকর, শুভঙ্কর > শুভংকর ইত্যাদি।

⏩ প্রশ্ন : ১৯ ॥ বাংলা বানানে য-ফলা ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ॥ বাংলা বানানে য-ফলা ব্যবহারের নিয়ম : বাংলা বানানে য-ফলা (্য) ব্যবহারের নিয়মগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। ই বা ঈ-কারের পর ই, ঈ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ই বা ঈ-কার স্থানে য-ফলা হয়ে থাকে। যেমন– অতি + অন্ত = অত্যন্ত, অতি + অধিক = অত্যধিক, প্রতি + উষ = প্রত্যুষ ইত্যাদি।

২। বিশেষণ পদের শেষে র-ফলা বা রেফ থাকলে এবং পদটি বিশেষণ থেকে বিশেষ্য পদে পরিণত হলে য-ফলা ব্যবহৃত হয়। যেমন– দরিদ্র > দারিদ্র্য, দীর্ঘ > দৈর্ঘ্য, বিচিত্র > বৈচিত্র্য ইত্যাদি।

৩। কতক বিশেষ্য পদে স্বভাবতই য-ফলা ব্যবহৃত হয়। যেমন– আলোচ্য, অনিন্দ্য, কার্পণ্য ইত্যাদি।

৪। মূল শব্দের সাথে ষ্ণ্য প্রত্যয়যোগে গঠিত সাধিত শব্দের শেষে য-ফলা ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– দিতি + ষ্ণ্য = দৈত্য, সুহৃদ + ষ্ণ্য = সৌহার্দ্য ইত্যাদি।

৫। ঔচিত্য বোঝাতে পদের শেষে য-ফলা ব্যবহৃত হয়। যেমন– কর্তব্য, কাম্য, পাঠ্য, মান্য ইত্যাদি।

⏩ প্রশ্ন : ২০ ॥ বাংলা বানানে উপসর্গের নিয়মাবলি উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলা বানানে উপসর্গের পাঁচটি নিয়ম বা সূত্র লেখ।

উত্তর ॥ বাংলা বানানে উপসর্গের নিয়ম : বাংলা বানানে উপসর্গের প্রধান নিয়ম বা সূত্রগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। দুরূহ, অসাধ্য, মন্দ, কষ্ট ইত্যাদি অর্থে শব্দের প্রথমে উ-কারযুক্ত 'দুঃ' উপসর্গ বসে। যেমন– দুঃসহ, দুঃসাধ্য ইত্যাদি।

২। নিন্দা, বীভৎস্যতা, নিকৃষ্টতা ইত্যাদি অর্থে কু-উপসর্গ বসে। যেমন– কুদিন, কুকর্ম, কুৎসা ইত্যাদি।

৩। সম, পরিঃ, আবিঃ ইত্যাদি উপসর্গের পর কৃ-ধাতু বসলে 'স, ষ' -এর আগমন ঘটে। যেমন– সম + কার= সংস্কার, আবিঃ + কার = আবিষ্কার ইত্যাদি।

৪। অভাব অর্থে আ-কারান্ত 'হা' উপসর্গ প্রথমে বসাতে হয়। যেমন– হাভাত, হাঘর ইত্যাদি।

৫। উৎকর্ষতা, বিশুদ্ধতা, গভীরতা ইত্যাদি অর্থে শব্দের আদিতে 'সু' উপসর্গ বসে। যেমন– সুখবর, সুতীব্র, সুনিপুণ ইত্যাদি।

৬। বর্তমান বা সহ অর্থে পদের প্রথমে 'স' উপসর্গ বসে। যেমন– সজল, সতীর্থ, সস্ত্রীক ইত্যাদি।

৭। অ, অনা, অঘা, উনা ইত্যাদি আ-কারযুক্ত উপসর্গযোগে শব্দ গঠিত হলে উপসর্গের আ-কার বজায় থাকে। যেমন– অঘারাম, অনাচার, আকাল, উনাবর্ষা ইত্যাদি।

৮। নিন্দা, বিরামহীনতা, নিকৃষ্টতা ইত্যাদি অর্থে শব্দের প্রথমে অ-উপসর্গ বসে। যেমন– অকাজ, অবিরাম, অমানুষ ইত্যাদি।

৯। না অর্থে শব্দের প্রথমে ই-কারান্ত 'নি' উপসর্গ বসাতে হয়। যেমন– নিখরচা, নিলাজ, নিখুঁত ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ২১ ॥ নিম্নলিখিত বানানগুলো বাংলা বানানের কোন কোন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত লেখ : বিশ্লেষণ, ঘণ্টা, অধিবাসিগণ, মালিনী, অর্চনা। [ফা. প. ২০০০]

উত্তর ।। প্রশ্নোল্লিখিত শব্দগুলোর বানানপদ্ধতি নিচে আলোচনা করা হলো–

বিশ্লেষণ : ণ-ত্ব বিধানঘটিত নিয়ম। ণ-ত্ব বিধান অনুসারে মূর্ধন্য-ষ-এর পর মূর্ধন্য-ণ হয়ে থাকে।

ঘণ্টা : ণ-ত্ব বিধানঘটিত নিয়ম। ট-বর্গের সাথে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

অধিবাসিগণ : প্রত্যয়ঘটিত নিয়ম। গণ-প্রত্যয় যোগ হওয়াতে শব্দের শেষের ঈ-কার না হয়ে ই-কার হয়েছে। অধিবাসী+গণ = অধিবাসিগণ।

মালিনী : ঈ-কার ঘটিত নিয়ম। ব্যক্তি নির্দেশ করতে শব্দের শেষে ঈ-প্রত্যয় যোগ হয়।

অর্চনা : সাধারণ নিয়ম। শব্দটি মূলত এভাবেই গঠিত।

» প্রশ্ন : ২২ ॥ বাংলা বানানে দন্ত্য-ন ব্যবহারের নিয়মগুলো কী কী? আলোচনা কর।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলা বানানে 'ন' ব্যবহারের সূত্রগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর ।। 'ন' ব্যবহারের নিয়ম : বাংলা বানানে দন্ত্য-ন ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। সর্বদা বিদেশি শব্দে দন্ত্য-ন হয়। যেমন– কুরআন, ইরান, জাপান, জার্মান, জর্দান, মেহমান ইত্যাদি।

২। বাংলা ক্রিয়াপদে দন্ত্য-ন হয়। যেমন– করেন, পড়েন, খান, যান, আসুন, ধরেন, বসেন ইত্যাদি।

৩। ত-বর্গীয় বর্ণে (ত, থ, দ, ধ) দন্ত্য-ন হয়। যেমন– বৃন্ত, গ্রন্থ, দুরন্ত, বৃন্দ, সনাতন ইত্যাদি।

৪। খাঁটি বাংলা শব্দে সর্বদা দন্ত্য-ন হয়ে থাকে। যেমন– সোনা, নুন, চুন, কান, কানা ইত্যাদি।

৫। সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে ঋ, র, ষ থাকলে পরপদে দন্ত্য-ন হয়। যেমন– ত্রিনয়ন, হরিনাম, দুর্নীতি, বারিনিধি, মৃগনাভি ইত্যাদি।

৬। কতিপয় শব্দে স্বভাবতই দন্ত্য-ন ব্যবহৃত হয়। যেমন– রূপবান, সর্বনাম, শ্রীমান, দুর্নাম, পাওনা ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ২৩ ॥ বাংলা তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দের বানানের প্রধান পাঁচটি নিয়ম দৃষ্টান্তসহ আলোচনা কর।
অথবা, বাংলা তৎসম, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দের বানানের প্রধান পাঁচটি নিয়ম দৃষ্টান্তসহ নিচে উপস্থাপন কর।

উত্তর ।। তৎসম শব্দ : ক, খ, গ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে 'ং' এবং বিকল্পে 'ঙ' হবে। যেমন– সংগীত> সঙ্গীত, শুভংকর> শুভঙ্কর ইত্যাদি।

তদ্ভব শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তদ্ভব শব্দে সর্বদাই ই-কার হবে। যেমন– কুমির, পাখি, বাড়ি ইত্যাদি।

দেশি শব্দ : দেশি শব্দের ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান ব্যবহার হবে। যেমন– কুড়ি, ডিঙি ইত্যাদি।

বিদেশি শব্দ : বিদেশি 'St' স্থানে নতুন সংযুক্ত বর্ণ 'স্ট' হবে। যেমন–স্টেশন, স্টোভ ইত্যাদি।

মিশ্র শব্দ : মিশ্র শব্দে ই-কার হবে। যেমন– খ্রিস্টান, চৌহদ্দি ইত্যাদি।

▸▸ প্রশ্ন : ২৪ ॥ বাংলা বানানে দন্ত্য-স ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ আলোচনা কর।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলা বানানে 'স' ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম লেখ।
অথবা, বাংলা ভাষায় 'স'-এর ব্যবহারের পাঁচটি সূত্র উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ।। 'স' ব্যবহারের নিয়ম : বাংলা বানানে দন্ত্য-স ব্যবহারের নিয়মগুলো উদাহরণসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। 'সাৎ' প্রত্যয়ের দন্ত্য-স রক্ষিত হয়। যেমন– ধূলিসাৎ, ভূমিসাৎ, অকস্মাৎ, অগ্নিসাৎ ইত্যাদি।

২। খাঁটি বাংলা শব্দে সর্বদা দন্ত্য-স হয়। যেমন– ভাসা, সোনা ইত্যাদি।

৩। ক্রিয়াপদে সর্বদা দন্ত্য-স হয়ে থাকে। যেমন– করিস, খাস, যাস, হাসা ইত্যাদি।

৪। সন্ধিতে যদি অঃ/ আঃ থাকে তাহলে দন্ত্য-স হবে। যেমন– তিরঃ + কার = তিরস্কার; পুরঃ + কার = পুরস্কার; ভাঃ + কর = ভাস্কর; মনঃ + কামনা = মনস্কামনা ইত্যাদি।

৫। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহে দন্ত্য-স হয়ে থাকে। যেমন–
আরবি শব্দ : আসামি, ওস্তাদ, কসাই, মুসকিল, খাসি ইত্যাদি।
ফারসি শব্দ : আসমান, মুন্সেফ, খানসামা ইত্যাদি।
ইংরেজি শব্দ : অফিস, গ্লাস, মাস্টার, স্টেশন, পোস্ট ইত্যাদি।

▸▸ প্রশ্ন : ২৫ ॥ বাংলায় সন্ধিঘটিত বানানের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলায় সন্ধিঘটিত বানানের পাঁচটি নিয়ম বা সূত্র উল্লেখ কর।

উত্তর ।। সন্ধিঘটিত বাংলা বানানের নিয়ম : সন্ধিঘটিত বানানের পাঁচটি নিয়ম বা সূত্র উদাহরণসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয় এবং আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন– নব + অন্ন = নবান্ন, মহা + অর্ঘ = মহার্ঘ, বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ইত্যাদি।

২। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার বা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে ঈ-কার হয়। ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন– অতি + ইত = অতীত, পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা, শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র, সতী + ঈশ = সতীশ ইত্যাদি।

৩। অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়। এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। যেমন– দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র, নর + ঈশ = নরেশ, অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা ইত্যাদি।

৪। দ কিংবা ধ -এর পর বর্গীয় প্রথম বা দ্বিতীয় বর্ণ কিংবা স থাকলে দ ও ধ স্থানে ত (ৎ) হয়। যেমন– বিপদ + সংকুল = বিপৎসংকুল, উদ + ফুল্ল = উৎফুল্ল, ক্ষুধ + পিপাসা = ক্ষুৎপিপাসা ইত্যাদি।

৫। ও-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ও-কারের স্থানে অব হয়। যেমন– পো + অন = পবন, গো + এষণা = গবেষণা ইত্যাদি।

৬। ঔ-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-কারের স্থানে 'আব' হয়। যেমন– পৌ + অক = পাবক, নৌ + ইক = নাবিক ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ২৬ ॥ বাংলা প্রত্যয়ঘটিত বানানের কয়েকটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, উদাহরণসহ বাংলায় প্রত্যয়ঘটিত বানানের পাঁচটি নিয়ম বা সূত্র লেখ।

উত্তর ॥ বাংলায় প্রত্যয়ঘটিত বানানের নিয়ম : প্রত্যয়ঘটিত বানানের প্রধান সূত্র বা নিয়মগুলো উদাহরণসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। ক্রিয়ার শেষে 'অক' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর আদি স্বরের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন– কৃ + অক = কারক, লিখ্ + অক = লেখক ইত্যাদি।

২। 'য' প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদি স্বর বৃদ্ধি পায়। যেমন– পর্বত + য = পার্বত্য, অধিক + য = আধিক্য ইত্যাদি।

৩। 'ইক' প্রত্যয় যুক্ত হলে শব্দের আদি (স্বর) বৃদ্ধি পায়। যেমন– দর্শক + ইক = দার্শনিক, ইতিহাস + ইক = ঐতিহাসিক ইত্যাদি।

৪। শব্দের শেষে 'তা' প্রত্যয় যুক্ত হলে পদান্তের ঈ-কার ই-কার হয়। যেমন– প্রতিদ্বন্দ্বী + তা = প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগী + তা = প্রতিযোগিতা, অপকারী + তা = অপকারিতা ইত্যাদি।

৫। ধাতুর সাথে 'অনট্' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন– গম্ + অনট্ = গমন, কৃষ্ + অনট্ = কর্ষণ ইত্যাদি।

৬। যেসব শব্দের শেষে স্বরবর্ণ বা 'ৎ' থাকে সেসব শব্দের শেষে 'ত্ব' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন– নারী+ত্ব = নারীত্ব, মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব, মনুষ্য + ত্ব = মনুষ্যত্ব ইত্যাদি।

৭। ধাতুর সাথে 'অনীয়' প্রত্যয় যুক্ত হলে ধাতুর মূল স্বরের পরিবর্তন হয়। যেমন– দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয়, পূজ্ + অনীয় = পূজনীয় ইত্যাদি।

৮। শব্দের সাথে 'মতুপ্' প্রত্যয় যুক্ত হওয়ায় 'মতুপ্' পরিবর্তন হয়ে 'মান' হয় এবং 'মান' মূল শব্দের সাথে যুক্ত হয়। যেমন– বুদ্ধি + মতুপ্ = বুদ্ধিমান, শ্রী + মতুপ্ = শ্রীমান ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ২৭ ॥ সমাসঘটিত বানানের নিয়মগুলো উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, উদাহরণসহ সমাসঘটিত বানানের পাঁচটি সূত্র উল্লেখ কর।
অথবা, বাংলা বানানে সমাসঘটিত পাঁচটি নিয়ম বা সূত্র উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ॥ সমাসঘটিত বানানের নিয়ম : সমাসঘটিত বাংলা বানানের প্রধান নিয়ম বা সূত্রগুলো উদাহরণসহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। সমাসঘটিত পদ একসাথে লিখতে হয়। যেমন– জটিলতামুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। প্রয়োজনে শব্দের মাঝখানে হাইফেন (-) দেওয়া যেতে পারে। যেমন– লজ্জা-শরম, ফাঁকে-ফাঁকে ইত্যাদি।

২। দুটি পদ মিলে সমাস হলে প্রথম পদের আদ্যস্থিত উ-কার বহাল থাকে। যেমন– কূটনীতি (কূট যে নীতি), পূর্ণচন্দ্র (পূর্ণ যে চন্দ্র), ভূতপূর্ব (ভূত যে পূর্ব), পূর্বরাগ (পূর্ব যে রাগ) ইত্যাদি।

৩। দুটি পদ মিলে সমাস হলে পরপদের উ-কার বহাল থাকে। যেমন– মেঘমুক্ত (মেঘ থেকে মুক্ত), পঞ্চমুখ (পঞ্চমুখ যার) কারামুক্ত (কারা থেকে মুক্ত) ইত্যাদি।

৪। অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের পূর্বপদের এ বিভক্তি সমস্তপদে বহাল থাকে। যেমন– মাঠে-ময়দানে, ঘরে-বাইরে ইত্যাদি।

৫। অব্যয়ীভাব সমাসে পর্যন্ত অর্থে পদের আগে 'আ' উপসর্গ যুক্ত হয়। যেমন– আকণ্ঠ, আমরণ, আজীবন ইত্যাদি।

৬। কতিপয় নঞ্ বহুব্রীহি সমাসে পদের আদিতে 'অ' উপসর্গ বসে। যেমন– অকাজ, অজানা, অসীম ইত্যাদি।

বাংলা বানানের অশুদ্ধি সংশোধন

▸▸ প্রশ্ন : ২৮ ॥ বাংলা বানানের ক্ষেত্রে কী কী ধরনের অশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়? লেখ।

উত্তর ॥ বাক্যে বা শব্দে বিভিন্ন কারণে অশুদ্ধিজনিত ত্রুটি দেখা যায়। এর মধ্যে সন্ধি, সমাস, প্রত্যয়, ণ-ত্ব, ষ-ত্ব, লিঙ্গ, ই-কার ও ঈ-কার ঘটিত, উ-কার ও ঊ-কার ঘটিত, 'শ' 'ষ' 'স' ঘটিত, যুক্তাক্ষরঘটিত, বিশেষ্য ও বিশেষণঘটিত, অর্থের ও পদের প্রয়োগঘটিত এবং পুনরুক্তিঘটিত অশুদ্ধি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সংক্রান্ত বিষয়সমূহের কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হলো–

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানজনিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অপরাহ্ন	অপরাহ্ণ	পরিস্কার	পরিষ্কার
অভিলাস	অভিলাষ	বৃহস্পতি	বৃহস্পতি
আশীষ	আশিস	মিন্ময়	মৃন্ময়
অভিসেক	অভিষেক	পুরষ্কার	পুরস্কার
অগ্রনী	অগ্রণী	প্রণষ্ট	প্রনষ্ট
গনিত	গণিত	সুসমা	সুষমা
গণণা ['০৮, '১৫]	গণনা	আবিস্কার ['০৯]	আবিষ্কার
আহ্নিক	আহ্নিক	অনুসঙ্গ ['০৮, '১৫]	অনুষঙ্গ
কল্যান	কল্যাণ	বীনাপানি ['০৮, '১৫]	বীণাপাণি
অ্যানুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	সুসপ্ত	সুষুপ্ত
কণক	কনক	নমষ্কার	নমস্কার
গুন	গুণ	নিশেদ	নিষেধ
গৃহিনী	গৃহিণী	দর্শণ	দর্শন
তিরষ্কার	তিরস্কার	পাষান ['০৮, '১৫]	পাষাণ
নিস্পৃহ	নিস্পৃহ	নৃশংষ	নৃশংস
প্রাঙন	প্রাঙ্গণ	গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম
পূর্বাহ্ন ['০৯]	পূর্বাহ্ণ	চাক্ষুস	চাক্ষুষ
মধ্যাহ্ণ	মধ্যাহ্ন	তিরষ্কার	তিরস্কার
প্রনাম	প্রণাম	প্রনয়ন	প্রণয়ন
কঙ্কন	কঙ্কণ	গগণ	গগন
বিশেষন	বিশেষণ	প্রচলণ	প্রচলন

সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি

অদ্যপি	অদ্যাপি	নুপুর	নূপুর
যদ্যাপি	যদ্যপি	ন্যাস্ত ['০৮, '১৫]	ন্যস্ত
অত্যান্ত	অত্যন্ত	অধগতি	অধোগতি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
প্রতিদন্ধি	প্রতিদ্বন্দ্বী	ব্যাগ্র	ব্যগ্র
বক্ষোপরি	বক্ষউপরি	মনলোভা	মনোলোভা
ইতিপূর্বে	ইতঃপূর্বে	ঘণিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠ
ঋনগ্রস্ত	ঋণগ্রস্ত	চব্য	চর্ব্য
কিম্বা	কিংবা	জিবীকা	জীবিকা
গৃহীতা	গ্রহীতা	স্বম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
সম্বলিত	সংবলিত	স্বতোসিদ্ধ	স্বতঃসিদ্ধ
সদ্যজাত	সদ্যোজাত	তাজ্য	ত্যাজ্য
তাক্ত	ত্যক্ত	দোষণীয়	দূষণীয়
তড়িৎ	তদ্ধিত	মনহর	মনোহর
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট	শিরপীড়া ['১১]	শিরঃপীড়া
যশরাশি	যশোরাশি	ক্ষিতিশ	ক্ষিতীশ
সম্বাদ	সংবাদ	শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ

লিঙ্গঘটিত অশুদ্ধি

অনাথিনী	অনাথা	পিশাচিনী	পিশাচী
মাতঙ্গিনী	মাতঙ্গী	পাচকী	পাচিকা
অধিনী	অধীনা	অপ্সরী	অপ্সরা
সুকেশিনী	সুকেশা	সুবদনা	সুবদনী
বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী
অশ্বী	অশ্বা	উদাসিনী	উদাসীনা
সুলোচনী	সুলোচনা	সিংহিনী	সিংহী
ভয়ংকরী	ভয়ংকর	নিরপরাধিনী	নিরপরাধা
কুরঙ্গিনী	কুরঙ্গী	গোপিনী	গোপী
রজকিনী	রজকী	রূপসীনি	রূপসি
ননদিনী	ননদ, ননদী	ত্রিনয়নী	ত্রিনয়না
গায়কী	গায়িকা	চাতকিনী	চাতকী

সমাসঘটিত অশুদ্ধি

অল্পজ্ঞানী	অল্পজ্ঞান	আপ্রাণ	প্রাণপণ
অহরাত্রি ['১০]	অহোরাত্র	ভগবানদত্ত	ভগবদ্দত্ত
গুণীগণ	গুণিগণ	মহদুপকার	মহোপকার
কর্তাকারক	কর্তৃকারক	মহাত্মাগণ	মহাত্মগণ
কালীদাস	কালিদাস	মহারাজা	মহারাজ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ছাত্রিগণ	ছাত্রীগণ	বিজ্ঞানীগণ	বিজ্ঞানিগণ
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃগণ
নিঃস্বার্থপর	নিঃস্বার্থ	শিক্ষার্থীবৃন্দ	শিক্ষার্থিগণ
নির্ধনী	নির্ধন	লজ্জাস্কর	লজ্জাকর
নিরোগী	নীরোগ	শিরোনামা	শিরোনাম
নিরাশা	নিরাশ	সশঙ্কিত	শঙ্কিত, সশঙ্ক
নিরপরাধী	নিরপরাধ	রাজাগণ	রাজগণ
পথমধ্যে	পথিমধ্যে	সবিনয়পূর্বক	সবিনয়, বিনয়পূর্বক
ফণীভূষণ	ফণিভূষণ	সাষ্ঠাঙ্গ সহকারে	সাষ্টাঙ্গে
বীধর্মী	বিধর্মা, বিধর্মী	স্থায়ীভাব	স্থায়িভাব
সলজ্জিত	সলজ্জ	আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠ পর্যন্ত
সকাতর	কাতর	কমলাক্ষি	কমলাক্ষ
সুবুদ্ধিমান	সুবুদ্ধি	নিঃশঙ্কা	নিঃশঙ্ক
সুকেশিনী	সুকেশা	নেতাগণ	নেতৃগণ
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	মধ্যরাত্রি	মধ্যরাত্র
সাধ্যয়াত্ত	সাধ্য	শশীশেখর	শশিশেখর
সানন্দিত	সানন্দ	ত্রিনয়ন	ত্রিয়না
সহ্যাতীত	সহনাতীত	হস্তীমূর্খ	হস্তিমূর্খ

প্রত্যয়ঘটিত অশুদ্ধি

অজানিত	অজ্ঞাত	আরক্তিম	আরক্ত
অনুবাদিত	অনূদিত	আহরিত	আহৃত
অধীনস্থ ['১০]	অধীন	আধিক্যতা	আধিক্য
অসহনীয়	অসহ্য	আবশ্যকীয়	আবশ্যক
দোষনীয়	দূষণীয়	দারিদ্রতা	দারিদ্র্য
প্রসারতা	প্রসার	নৈপুণ্যতা	নৈপুণ্য
বিশুদ্ধতা	বিশুদ্ধ	সৌন্দর্যতা	সৌন্দর্য
মান্যনীয়	माननीয়	নিন্দুক	নিন্দক
বিদ্যান	বিদ্বান	নিঃশোষিত	নিঃশেষ
মনান্তর	মতান্তর	প্রবর্ত	প্রবৃত্ত
আলস্যতা	আলস্য/অলসতা	ভাগ্যমান	ভাগ্যবান
ঐক্যতা	ঐক্য/একতা	বালকবৃন্দেরা	বালকেরা/বালকবৃন্দ
চাঞ্চল্যতা	চাঞ্চল্য	থতাপি	তথাপি
সখীতা	সখ্য	আশ্চার্য্য	আশ্চর্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পৌরুষত্ব	পৌরুষ	পাকাকেশ	পক্বকেশ
সার্বজনিন	সার্বজনীন/সর্বজনীন	সৌজন্যতা	সৌজন্য
সম্ভ্রান্তশালী	সম্ভ্রমশালী	দৈন্যতা	দৈন্য, দীনতা
ঐক্যতান	ঐকতান		
ইতিমধ্যে ['০৭]	ইতোমধ্যে		
স্বাতন্ত্র্যতা	স্বাতন্ত্র্য		

ই-কার ও ঈ-কারঘটিত অশুদ্ধি

অতিত	অতীত	বিদুষি	বিদুষী
আশির্বাদ	আশীর্বাদ	বাল্মিকী	বাল্মীকি
ইঙ্গিত	ঈঙ্গিত	ভাগিরথী	ভাগীরথী
কুটীল	কুটিল	মিমাংসা	মীমাংসা
কালীদাস	কালিদাস	সমীচিন	সমীচীন
নিশিথ	নিশীথ	পৃথিবি	পৃথিবী
পিপিলিকা	পিপীলিকা	বিশ্রি	বিশ্রী
হৃষিকেশ	হৃষীকেশ		

উ-কার ও ঊ-কারঘটিত অশুদ্ধি

অনুকুল	অনুকূল	মুমুর্ষু ['০৭, '০৯]	মুমূর্ষু
কৌতুহল	কৌতূহল	মুহুর্ত ['১৭]	মুহূর্ত
চ্যুত	চ্যুত	ময়ুর	ময়ূর
দুষিত	দূষিত	মধূসূদন	মধুসূদন
দুর্বা	দূর্বা	মহীরূহ	মহীরুহ
দূর্গা	দুর্গা	শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
নুপুর	নূপুর	বধু	বধূ

যুক্তাক্ষরঘটিত অশুদ্ধি

আয়ত্ব	আয়ত্ত	লক্ষী	লক্ষ্মী
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস	সতন্ত্র	স্বতন্ত্র
উজ্জল	উজ্জ্বল	সাস্থ্য	স্বাস্থ্য
কজ্জ্বল	কজ্জল	স্বরসতী	সরস্বতী
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	সান্তনা	সান্ত্বনা
বিদ্যান	বিদ্বান	সত্বা	সত্তা
পার্শ	পার্শ্ব	সচ্ছ	স্বচ্ছ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

বিশেষ্য ও বিশেষণঘটিত অশুদ্ধি

অলস নিবন্ধন	আলস্য নিবন্ধন	সাক্ষী দেওয়া	সাক্ষ্য দেওয়া
অরাজক হয়েছে	অরাজকতা হয়েছে	স্বীকার হওয়া	স্বীকার করা
আরোগ্য হওয়া	আরোগ্য লাভ করা	বিদায়ী হওয়া	বিদায় হওয়া
গোপন কথা	গোপনীয় কথা	সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া
সাক্ষী দিবে	সাক্ষ্য দিবে	আশ্চর্য হওয়া	আশ্চর্যান্বিত হওয়া

পুনরুক্তিঘটিত অশুদ্ধি

বিবিধ প্রকার	বিবিধ	অদ্যাপিও	অদ্যাপি
যদ্যপিও	যদ্যপি, যদিও	অধীনস্থ	অধীন
সমতুল্য	সম বা তুল্য	আকণ্ঠ পর্যন্ত	আকণ্ঠ, কণ্ঠ পর্যন্ত
কেবলমাত্র	কেবল, মাত্র	অশ্রুজল	অশ্রু, চোখের জল
সবিনয়পূর্বক	সবিনয়/বিনয়পূর্বক	নিশীথ রাত্রি	নিশীথ
শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ	অন্যান্যদের	অন্যদের, অন্যান্যের
সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ	সশঙ্কিত	শঙ্কিত

বচনঘটিত অশুদ্ধি

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
নানাবিধ পক্ষীসব	নানাবিধ পক্ষী
সকল পরীক্ষকগণ	সকল পরীক্ষক
যাবতীয় লোকসমূহ	যাবতীয় লোক
সব মাছগুলি	সব মাছ
একশ' বালকগণ	একশ' বালক
যাবতীয় ছাত্রগণেরা	যাবতীয় ছাত্র
যাবতীয় ভদ্রমহোদয়গণ	ভদ্রমহোদয়গণ
সকল বালকেরা	সকল বালক

প্রকৃতিঘটিত অশুদ্ধি

একত্রিত	একত্র
সাধ্যায়াত্ত	সাধ্য
ব্যাকুলিত	ব্যাকুল
ইয়ত্ত্বা	ইয়ত্তা
প্রফুল্লিত	প্রফুল্ল
ভৌগলিক	ভৌগোলিক
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু
মর্মন্তদ	মর্মন্তুদ

কতিপয় বানানঘটিত অশুদ্ধি

প্রশ্ন : ২৯ ॥ অশুদ্ধ থাকলে শুদ্ধ কর :

উত্তর ॥

অ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্যাধিক	অত্যধিক	অত্যান্ত	অত্যন্ত
অহনিশি	অহর্নিশ	অধ্যায়ণ/অধ্যায়ন ['০১, '০২, '০৬, '১২, '১৬, '১৮]	অধ্যয়ন
অদ্যপি ['৯২, '৯৩]	অদ্যাপি	অদ্যাক্ষর	আদ্যাক্ষর
অজানিত	অজ্ঞাত	অধীনস্ত/অধীনস্থ ['১০, '১২]	অধীন
অনুকুল	অনুকূল	অনুবাদিত	অনূদিত
অন্ন কাপড় ['৯২]	ভাত কাপড়	অশ্রুজল	অশ্রু/চোখের জল
অপরাহ্ন ['৯৪, '৯৫]	অপরাহ্ণ	অন্তরেন্দ্রিয়	অন্তরিন্দ্রিয়
অপকর্ষতা	অপকর্ষ	অর্চ্যনা	অর্চনা
অধঃস্তন	অধস্তন	অনুদিত	অনূদিত
অত্তাচার	অত্যাচার	অনু	অণু
অমর্স	অমর্ষ	অভিসেক ['০৩, '০৭]	অভিষেক
অগ্রহায়ন	অগ্রহায়ণ	অনাথিনী	অনাথা
অতিতি ['৯৫]	অতিথি	অপ্সরি	অপ্সরা/অপ্সরী
অভিলাস	অভিলাষ	অরন্য	অরণ্য
অর্পন	অর্পণ	অগ্নিষাৎ	অগ্নিসাৎ
অধিসঠান	অধিষ্ঠান	অর্জুণ	অর্জুন
অভ্যান্তরিক	আভ্যন্তরিক	অন্ত্যাষ্টি	অন্ত্যেষ্টি
অন্তকরণ	অন্তঃকরণ	অঙ্গিকার	অঙ্গীকার

আ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আবশ্যকীয় ['১৪]	আবশ্যক	আহরিত	আহৃত
আলস্যতা	অলসতা	আধিক্যতা	আধিক্য
আরক্তিম	আরক্ত	আহ্নিক	আহ্নিক
আনুসঙ্গিক	আনুষঙ্গিক	আশীস ['৯৭]	আশিস
আবিস্কার	আবিষ্কার	আবরন	আবরণ
আবর্তণ	আবর্তন	আনুভুমিক	অনুভূমিক
আর্তণাদ	আর্তনাদ	আদ্যান্ত	আদ্যন্ত
আত্মষাৎ	আত্মসাৎ	আরবী	আরবি
আশ্চার্য	আশ্চর্য	আয়ত্ব	আয়ত্ত

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
আরোগ্য হওয়া	আরোগ্য লাভ করা	আগত কল্য	আগামী কল্য
আশ্চার্য হওয়া	আশ্চর্যান্বিত হওয়া	আকাঙ্খা/আকাংখা ['৯৭, '০৭, '১৭]	আকাঙ্ক্ষা
আমাবস্যা ['০৪]	অমাবস্যা	আড়ষ্ঠ	আড়ষ্ট

ই

ইতিমধ্যে ['১১, '১৪, '১৬]	ইতোমধ্যে	ইস্পিত	ঈপ্সিত
ইস্টার্ণ	ইস্টার্ন	ইংরেজী	ইংরেজি
ইতঃস্তত	ইতস্তত	ইত্যাদী	ইত্যাদি
ইহুদী	ইহুদি	ইরানী	ইরানি
ইয়াত্তা	ইয়ত্তা	ইদানিং	ইদানীং

উ

উদাসিনী	উদাসীনা	উল্যেখ	উল্লেখ
উপনিবেশিক	ঔপনিবেশিক	উর্ধ্বগামীতা	উর্ধ্বগামিতা
উত্তীর্ন	উত্তীর্ণ	উল্ল্যাস	উল্লাস
উত্তরসূরী	উত্তরসূরি	উচ্চারন	উচ্চারণ
উপরোক্ত ['১২]	উপরিউক্ত	উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উৎকর্ষতা ['১০]	উৎকর্ষ	উজ্জল	উজ্জ্বল

ঋ

ঋতুবর্তি	ঋতুমতী	ঋণষোধ	ঋণশোধ
ঋন	ঋণ	ঋসি	ঋষি
ঋনগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত	ঋদ্ধিবান	ঋদ্ধিমান
ঋনাত্মক	ঋণাত্মক	ঋদ্ধিবতী	ঋদ্ধিমতি

এ

এমতাবস্থা	এমত অবস্থা	এবম্বিধ	এবংবিধ
একত্রিত	একত্র	এদগলি	এঁদোগলি
একাডেমী	একাডেমি	একার্ত	একার্থ
এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা	এক্ষুণি	এক্ষুনি
একাধিক্রমে	একাদিক্রমে	একাকীত্ব	একাকিত্ব

ঐ

ঐক্যতা ['৯২, '৯৩, '০৯]	একতা/ঐক্য	ঐক্যতান	ঐকতান
ঐশর্য	ঐশ্বর্য	ঐক্যমত	ঐকমত্য
ঐশ্বর্যশালি	ঐশ্বর্যশালী	ঐন্দ্রীলা	ঐন্দ্রিলা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ

ও

ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য	ওরপে	ওরফে
ওৎপ্রোত ['০২]	ওতপ্রোত	ওৎপাতা	ওতপাতা
ওদার	ওধার	ওয়ারীস	ওয়ারিশ
ওস্টব্রন	ওষ্ঠব্রণ	ওশার	ওসার

ঔ

ঔষধি ['১০]	ওষধি	ঔপদেশীক	ঔপদেশিক
ঔদ্ভিজ	ঔদ্ভিজ্জ	ঔরশ	ঔরস
ঔষধী	ঔষধি	ঔৎসুক	ঔৎসুক্য
ঔৎকচিক	ঔৎকোচিক	ঔচিত্ত	ঔচিত্য

ক

কিম্বদন্তী	কিংবদন্তি	কৃশান	কৃষাণ
কুলীন্য	কৌলীন্য	কীর্তণ	কীর্তন
কান্ড	কাণ্ড	কালিপদ	কালীপদ
কালিমাতা	কালীমাতা	কালীদাস	কালিদাস
কৃশাঙ্গিনী	কৃশাঙ্গা	কুজন	কূজন
কেবল মাত্র	কেবল	কুলসিত	কলুষিত
কায়মনবাক্যে	কায়মনোবাক্য	কতকাংশ	কতক অংশ
কর্তা কারক	কর্তৃকারক	কৃপন ['৯৪, '০০]	কৃপণ
কুটীল	কুটিল	কৌতুহল	কৌতূহল
কল্যাণীয়েসু	কল্যাণীয়েষু	কটুক্তি	কটূক্তি

ক্ষ, খ

ক্ষুধ পিপাসা	ক্ষুৎপিপাসা	ক্ষুন্ন	ক্ষুণ্ন
ক্ষুণ্নি বৃত্তি	ক্ষুন্নিবৃত্তি	ক্ষেতমজুর	খেতমজুর
খোলাখোলি	খোলাখুলি	খেলোয়ার	খেলোয়াড়
খেলাধূলা	খেলাধুলা	খান্ত	ক্ষান্ত
খুটিনাটি	খুঁটিনাটি	খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ

গ

গৃহিতা	গ্রহীতা	গৃহিনী	গৃহিণী
গড্ডালিকা	গড্ডলিকা	গণিতিক	গাণিতিক
গুনীগন	গুণিগণ	গ্রাহ্যনীয়	গ্রাহ্য/গ্রহণীয়
গরুবধ	গোহত্যা	গাফিলতী	গাফিলতি/গাফলতি
গ্রন্থিত	গ্রথিত	গৃহস্থ্য	গার্হস্থ্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গৌরবত্ব	গৌরব	গুণবতি	গুণবতী
গগণ	গগন	গ্রীস্ম	গ্রীষ্ম
গোপিনী	গোপী	গায়ীকা	গায়িকা
গোপন কথা	গোপনীয় কথা	গোধুলি	গোধূলি
গীতাঞ্জলী ['১৭]	গীতাঞ্জলি	গননা ['১৮]	গণনা

ঘ

ঘৃনা	ঘৃণা	ঘূর্ণ্যমান	ঘূর্ণমান
ঘর্ষন	ঘর্ষণ	ঘোমানো	ঘুমানো
ঘর নির্মাণ	গৃহনির্মাণ	ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ

চ

চাকরীজিবী	চাকরিজীবী	চালাকী	চালাকি
চিম্ময়	চিন্ময়	চ্যুত	চ্যুত
চাতিকিনী	চাতকী	চারত্রিক	চারিত্রিক
চাকরী	চাকরি	চক্ষুষ	চাক্ষুষ
চাঁদ বদনি	চাঁদ বদনী	চুস্য	চূষ্য

জ, ঝ

জিবীকা	জীবিকা	জোতিন্দ্র	জ্যোতিরিন্দ্র
জাত্যাভিমান	জাত্যভিমান	জাগরুক	জাগরূক
জগবন্ধু	জগদ্বন্ধু	জোযন	যোজন
জামিনী	যামিনী	জৌতুক	যৌতুক
জগৎময়	জগন্ময়	জননি	জননী
জ্ঞানি	জ্ঞানী	জগত	জগৎ
জঘণ্য	জঘন্য	ঝুকিপূর্ণ	ঝুঁকিপূর্ণ

ত

তড়িৎ	তড়িত	ত্যাক্ত	ত্যক্ত
তাজ্য	ত্যাজ্য	তপবন	তপোবন
তন্নী	তন্বী	তুস্ট	তুষ্ট
ততসম	তৎসম	তৃষ্ণর্ত	তৃষ্ণার্ত
তারুন্য	তারুণ্য	ত্রিশয়ন	ত্রিনয়ন
তিরষ্কার	তিরস্কার	ততক্ষনাৎ	তৎক্ষণাৎ

দ

দোষনীয়	দূষণীয়	দুরাদৃষ্ট	দূরদৃষ্ট
দিবারাত্রি	দিবারাত্র	দর্শণ	দর্শন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
দুঃচিন্তা	দুশ্চিন্তা	দুঃনাম	দুর্নাম
দূরাবস্থা ['১০]	দুরবস্থা	দিগ্বিজয়	দিগ্বিজয়
দুস্কর্ম	দুষ্কর্ম	দুলোক	দ্যুলোক
দিবলোক	দ্যুলোক	দুস্কর	দুষ্কর
দুর্ণাম	দুর্নাম	দৈণ্য	দৈন্য
দুর্বিসহ	দুর্বিষহ	দোষিত ['৯৪]	দূষিত
দুর্বা	দূর্বা	দূর্গা	দুর্গা
দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	দারিদ্রতা ['৯২, '৯৭, '০১, '০২, '০৭]	দারিদ্র্য
দৈন্যতা ['০৪, '১৪]	দীনতা	দুষ্কৃতিকারী	দুষ্কৃতকারী

ধ

ধনবতি	ধনবতী	ধণী	ধনী
ধুলিষাৎ	ধূলিসাৎ	ধরণ	ধরন
ধিমান	ধীমান	ধুর্ত	ধূর্ত

ন

নিমিলিত	নিমীলিত	নীরিহ	নিরীহ
নিসঠা	নিষ্ঠা	নিস্পৃহ	নিঃস্পৃহ
নিরপরাধী	নিরপরাধ	নির্বাষন	নির্বাসন
নির্ধণ	নির্ধন	নিস্পাপ	নিষ্পাপ
নিচ্চয়	নিশ্চয়	নীতিক	নৈতিক
নিস্প্রয়োজন	নিষ্প্রয়োজন	নৈরাশ	নিরাশ
নিশ্চিন্তিত	নিশ্চিন্ত	নেতাগণ	নেতৃগণ
নির্দোষী	নির্দোষ	নিরহংকারী	নিরহংকার
নিরোগী	নীরোগ	নৈপুণ্যতা	নিপুণতা
নিমন্ত্রন	নিমন্ত্রণ	নারায়ন	নারায়ণ
নমষ্কার	নমস্কার	নিষেদ	নিষেধ
নৃশংষ	নৃশংস	নিস্প্রাণ	নিষ্প্রাণ
ননদিনী	ননদী/ননদ	নিশীথ রাত্রি	নিশীথ

প

প্রতিযোগীতা ['১৪, '১৬, '১৮]	প্রতিযোগিতা	পাষান ['১৮]	পাষাণ
পুনরাভিনয়	পুনরভিনয়	পুস্প	পুষ্প
পিতাহীন	পিতৃহীন	প্রার্থণা	প্রার্থনা
প্রাণীহত্যা	প্রাণিহত্যা	পক্ষীশাবক	পক্ষিশাবক
প্রত্যেহ	প্রত্যহ ['০০]	পৌরুষত্ব	পৌরুষ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রসারতা	প্রসার	প্রাঙন ['০৪]	প্রাঙ্গণ
পিপিলিকা	পিপীলিকা	প্রনাম	প্রণাম
প্রতিস্ঠিত	প্রতিষ্ঠিত	প্রেয়সি	প্রেয়সী
প্রবহমাণ	প্রবহমান	পিচাশ	পিশাচ
পরস্পর ['১৩]	পরস্পর	প্রানীবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা ['১১, '১৭]	প্রাণিবিদ্যা
প্রত্যহিক	প্রাত্যহিক	পসারীণি	পসারিণী
প্রসারি	প্রসারী	পরপকার	পরোপকার
প্রনয়ণ	প্রণয়ন	পূর্বাহ্ন ['১১]	পূর্বাহ্ণ
পরিস্কার ['১২]	পরিষ্কার	প্রত্তেক	প্রত্যেক
পুনউদ্ধার	পুনরুদ্ধার	পিপাসর্ত	পিপাসার্ত
প্রাতকাল	প্রাতঃকাল	প্রতিদ্বন্দীতা	প্রতিদ্বন্দ্বিতা
পন	পণ	প্রতিসেধক	প্রতিষেধক
পুরষ্কার	পুরস্কার	প্রতিয়মান	প্রতীয়মান
প্রষ্ফুটিত	প্রস্ফুটিত	পৈত্রিক ['১১]	পৈতৃক

ফ

ফনীভূষণ	ফণিভূষণ	ফাকীবাজ	ফাঁকিবাজ
ফাতরামী	ফাতরামি	ফোশকা	ফোসকা

ব

বিহঙ্গিনী	বিহঙ্গী	বক্ষোপরি	বক্ষ উপরি
বিভিষিকা ['৯৭]	বিভীষিকা	বয়াধিক	বয়োধিক
বধু	বধূ	বিধর্ম	বিধর্মা/বিধর্মী
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি	বিপদগ্রস্থ	বিপদগ্রস্ত
বৈচিত্র	বৈচিত্র্য	বিদেশিক	বৈদেশিক
বেদিক	বৈদিক	বায়ুবিয়	বায়বীয়
বিপথগামীতা	বিপথগামিতা	বিলাসীনী	বিলাসিনী
বিলাসি	বিলাসী	বিমানিক	বৈমানিক
বৈশিষ্ট্যতা ['০১, '০২]	বৈশিষ্ট্য	বিদূষী	বিদুষী
বিদ্যাণ ['৯১]	বিদ্বান	বিষিশ্‌ট ['৯৪]	বিশিষ্ট
বিবরিত	বিবৃত	বুদ্ধিমানতা	বুদ্ধিমত্তা
বিসম	বিষম	বর্ন	বর্ণ
বুড়ী	বুড়ি	বাটী	বাড়ী/বাড়ি
বিস্ময়	বিস্ময়	বিবী	বিবি
বাহ্যীক	বাহ্য/বাহ্যিক	বানিজ্য	বাণিজ্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
বিসন্ন/বিষন্ন	বিষণ্ণ	বয়জ্যেষ্ঠ	বয়োজ্যেষ্ঠ
বিপদজনক	বিপজ্জনক	বিষ্ফোরণ	বিস্ফোরণ
বিবর্তণ	বিবর্তন	বিজয়ীনী	বিজয়িনী
বিদেশীনী	বিদেশিনী	বুদ্ধিবান	বুদ্ধিমান
বাস্প	বাষ্প	বিপৎসঙ্কুল	বিপদসংকুল

ভ

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভ্রাতাগণ ['০৪]	ভ্রাতৃগণ	ভগবানদত্ত	ভগবৎ দত্ত
ভষ্ম	ভস্ম	ভিখারীনী	ভিখারিনী
ভবিস্যৎ	ভবিষ্যৎ	ভাগিরথী	ভাগীরথী
ভূমিষাৎ	ভূমিসাৎ	ভুতপূর্ব	ভূতপূর্ব
ভূসণ	ভূষণ	ভূবন ['৯৪, '০১]	ভুবন
ভয়ঙ্করি	ভয়ঙ্করী/ভয়ঙ্কর	ভৌগলিক	ভৌগোলিক
ভন্ড	ভণ্ড	ভক্ষন	ভক্ষণ
ভীষন	ভীষণ	ভয়র্ত	ভয়ার্ত
ভ্রান্তী	ভ্রান্তি	ভাস্য	ভাষ্য
ভাসণ	ভাষণ	ভগিনেয়	ভাগিনেয়
ভাবৃক	ভাবুক	ভুরি ভুরি	ভূরি ভূরি

ম

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
মনমোহন	মনোমোহন	মহাত্মাগন	মহাত্মাগণ
মহদুপকার	মহোপকার	মিন্ময়	মৃন্ময়
মানষিক ['৯০, '০০, '০৬]	মানসিক	মুমূর্ষ্য/ মূমূর্ষ্য/ মুমুষু/ মুমর্ষ ['০২, '০৬, '০৭, '০৯, '১২, '১৭]	মুমূর্ষু
মুহুর্ত ['১৭]	মুহূর্ত	মেধাবি	মেধাবী
মালিনি	মালিনী	মানিক্য	মাণিক্য
মহীয়সি	মহিয়সী	মন্ত্রীসভা	মন্ত্রিসভা
ময়ুর	ময়ূর	মধুষূদন ['০৬]	মধুসূদন
মহীরূহ	মহীরুহ	মুখস্ত	মুখস্থ
মনান্তর	মতান্তর	মন মুগ্ধকর	মনোমুগ্ধকর
মহারাজা ['৯২]	মহারাজ	মনযোগ ['৯৮, '০১, '০৫, '১৩]	মনোযোগ
মিমাংশা	মীমাংসা	ম্রিয়মান ['০৯]	ম্রিয়মাণ

য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যশরাশি	যশোরাশি	যথপযুক্ত	যথোপযুক্ত
যাত্রি	যাত্রী	যুধিস্ঠির	যুধিষ্ঠির

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
যথচ্ছা	যথেচ্ছা	যাবৎজীবন	যাবজ্জীবন
যথাচিত	যথোচিত	যোগিক	যৌগিক
যন্ত্রনা	যন্ত্রণা	যোদ্ধাগণ	যোদ্ধৃবর্গ
যদ্যপিও	যদ্যপি/যদিও	যৌগপত্য	যৌগপদ্য

র

রাজাগণ	রাজগণ	রাজনৈতিক	রাজনীতিক
রাজকীনী	রজকী	রাক্ষশ	রাক্ষস
রসায়ণ	রসায়ন	রূপায়ন	রূপায়ণ
রাণি	রানি	রোস	রোষ
রবিন্দ্রনাথ	রবীন্দ্রনাথ	রেখিক	রৈখিক
রক্ষন	রক্ষণ	রজণী	রজনী
রূপসী	রূপসি	রেস্তঁরাঁ	রেস্তোরাঁ

ল

লজ্জাস্কর	লজ্জাকর	লক্ষী	লক্ষ্মী
লুন্ঠন	লুণ্ঠন	লেখিক	লৈখিক
লঘব	লাঘব	লিপ্‌ষা	লিপ্সা
লিখক	লেখক	লোকিক	লৌকিক

শ

শ্রদ্ধাঞ্জলী ['০৭]	শ্রদ্ধাঞ্জলি	শিকারী	শিকারি
শ্রবন	শ্রবণ	শারিরীক ['০৪, '০৬]	শারীরিক
শীতর্ত	শীতার্ত	শোনিত	শোণীত
শকুনিক	শাকুনিক	শিরোনামা	শিরোনাম
শিক্ষার্থীবৃন্দ	শিক্ষার্থিগণ	শ্রেষ্ঠতম	শ্রেষ্ঠ
শুভম্‌কর	শুভঙ্কর	শ্রদ্ধাস্পদেসু	শ্রদ্ধাস্পদেষু
শীততাপ ['০১, '১৩, '১৬, '১৮]	শীতাতপ	শুচনীয়	শোচনীয়
শিরচ্ছেদ	শিরশ্ছেদ	শান্তনা ['১৪]	শান্ত্বনা
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা	শিক্ষার্থীনী	শিক্ষার্থিনী
শিথিল্য	শৈথিল্য	শোষন	শোষণ
শশীশেখর	শশিশেখর	শষ্য	শস্য
শ্বাশুড়ী	শাশুড়ি	শিরপীড়া ['১১]	শিরঃপীড়া

স

সমীচিন ['০০, '০৫, '১৩]	সমীচীন	সশঙ্কিত	শঙ্কিত
সন্তোষ হওয়া	সন্তুষ্ট হওয়া	সবিনয় পূর্বক	সবিনয়/বিনয়পূর্বক

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সমস্ত ছাত্রগণ ['১৩, '১৬]	সমস্ত ছাত্র	সখ্যতা	সখ্য
সৌজন্যতা	সৌজন্য	সৈরাচার ['৯৫, '৯৮, '০০, '০৬]	স্বৈরাচার
সুবুদ্ধিবান	বুদ্ধিমান	সুসমা	সুষমা
স্বাতন্ত্রতা	স্বাতন্ত্র্য	সাস্থ্য	স্বাস্থ্য
সুরভিত	সুরভি	সান্তনা ['০০, '০৫]	সান্ত্বনা
সচ্ছ	স্বচ্ছ	সায়াহ্ন	সায়াহ্ন
সর্বাঙ্গীন	সর্বাঙ্গীণ	সিংহিনী	সিংহী
সুষ্ঠ ['৯৮, '০০, '০৬,]	সুষ্ঠু	সশঙ্কিত	শঙ্কিত/সশঙ্ক
সাহার্য্য	সাহায্য	সকৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞ
সুস্থ্য	সুস্থ	স্বেচ্ছাচারীতা	স্বেচ্ছাচারিতা
সাগতম	স্বাগতম	স্বচ্ছল	সচ্ছল
সঙঘর্ষ	সংঘর্ষ	সর্বণাম	সর্বনাম
সম্প্রদায়িক	সাম্প্রদায়িক	সংঘাতিক	সাংঘাতিক
সহোমর্মীতা	সহমর্মিতা	সরজ	সরোজ
সহধর্মীতা	সহধর্মিতা	সংবাদিক	সাংবাদিক
সন্তুস্ট	সন্তুষ্ট	সঙঘ	সংঘ
সৎচিন্তা	সচ্চিন্তা	ষ্টীমার	স্টিমার
ষ্টেশন	স্টেশন	সঙশোধন	সংশোধন
ষ্টোভ	স্টোভ	সোড়শ	ষোড়শ
সমুদ্রিক	সামুদ্রিক	সহোযোগীতা	সহযোগিতা
সতিন্দ্র	সতীন্দ্র	সুকেশিনী	সুকেশা
সতিশ	সতীশ	সত্বা	সত্তা
সল্প	স্বল্প	সদ্যজাত	সদ্যোজাত
স্টেডীয়াম	স্টেডিয়াম	সন্যাশী	সন্ন্যাসী

হ

হরিন	হরিণ	হিংষা	হিংসা
হাসী	হাসি	হেমন্তিক	হৈমন্তিক
হৃদয়ংগম	হৃদয়ঙ্গম	হৃষিকেশ	হৃষীকেশ
হটাৎ ['০৪]	হঠাৎ	হৃৎরোগ	হৃদরোগ
হৃদপিণ্ড	হৃৎপিণ্ড	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
হতবম্ব	হতভম্ব	হীনমন্যতা	হীনম্মন্যতা

বাক্যের অশুদ্ধি সংশোধন

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১।	অংকটি কষিতে ভুল করিও না।	অঙ্কটি ভুল করিও না।
২।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।
৩।	অন্যায়ের প্রতিফল দুর্নিবার্য।	অন্যায়ের প্রতিফল অনিবার্য।
৪।	অতি লোভে তাঁত নষ্ট।	অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।
৫।	আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনযোগী।	আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী।
৬।	আমার টাকার আবশ্যক নাই।	আমার টাকার আবশ্যকতা নাই।
৭।	আমি সাক্ষী দিয়াছি।	আমি সাক্ষ্য দিয়াছি।
৮।	আমি অপমান হইয়াছি।	আমি অপমানিত হইয়াছি।
৯।	আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রহিলাম।	আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।
১০।	আশা করি ভালো আছ তুমি!	আশা করি তুমি ভালো আছ।
১১।	ইতিমধ্যে তিনি আসিয়া পড়বেন।	ইতোমধ্যে তিনি আসিয়া পড়িবেন।
১২।	উন্নতির মূল চাবিকাঠি হইল সশ্রম।	উন্নতির মূল চাবিকাঠি হইল পরিশ্রম।
১৩।	এই দায়িত্ব আমাকে দিও না।	এ দায়িত্ব আমাকে দিয়ো না।
১৪।	এই বিদ্যা আয়ত্তাধীন করা সহজ নয়।	এ বিদ্যা আয়ত্ত করা সহজ নয়।
১৫।	একের লাঠি দশের বোঝা।	দশের লাঠি একের বোঝা।
১৬।	ক্ষমাই মহৎ লক্ষণ।	ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ।
১৭।	ঠান্ডা পড়িলে হাঁপানি বাড়ে।	ঠান্ডা পড়লে হাঁপানি বাড়ে।
১৮।	তিনি যেমন বিদ্যান তেমনি ব্যবহারে বিনয়ী।	তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি বিনয়ী।
১৯।	তার অন্তর অজ্ঞান সমুদ্রে আচ্ছন্ন।	তার অন্তর অজ্ঞানসমুদ্রে নিমজ্জিত।
২০।	তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।	তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।
২১।	দরিদ্রে দয়া কর।	দরিদ্রকে দয়া কর।
২২।	মানুষের সব প্রচেষ্টা সার্থক হয় না।	মানুষের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হয় না।
২৩।	সে অপমান হইয়াছে।	সে অপমানিত হয়েছে।
২৪।	সে এমন রূপসী যে অপ্সরী।	সে এমন রূপবতী যেন অপ্সরা।
২৫।	হস্তীটি অপরিসীম স্থুল।	হস্তীটি অত্যন্ত স্থুলকায়।
২৬।	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর পর্বত।	হিমালয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ পর্বত।
২৭।	হীন চরিত্রবান লোক পশুর চেয়েও অধম।	চরিত্রহীন লোক পশুর চেয়েও অধম।
২৮।	সেখানে সকল ছাত্ররাই উপস্থিত হইয়াছিল।	সেখানে সকল ছাত্রই উপস্থিত হয়েছিল।
২৯।	সর্ববিষয়ে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সর্ব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
৩০।	সংসার সুখের হয় রমণির গুনে।	সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।
৩১।	তুমি গীতাঞ্জলী পড়িয়াছ কি?	তুমি গীতাঞ্জলি পড়েছ কি?
৩২।	নিশ্চয়ই সংবাদ পাইয়াছ কি?	নিশ্চিত সংবাদ পেয়েছ কি?
৩৩।	আগত শনিবারে তাহারা যাইবে।	আগামী শনিবারে তাহারা যাইবে।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪।	বটতলায় বিরাট গরু ছাগলের হাট বসেছে।	বটতলায় গরু ছাগলের বিরাট হাট বসেছে।
৩৫।	তোমার উচিৎ খাঁটি সুন্দরবনের মধু খাওয়া।	তোমার উচিত সুন্দরবনের খাঁটি মধু খাওয়া।
৩৬।	গণতন্ত্রই সবার সকল অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারিবে।	গণতন্ত্র সবার সকল অধিকার ফিরিয়ে দিতে পারবে।
৩৭।	মেয়েটি পরম সুন্দরী বটে।	মেয়েটি পরমা সুন্দরী বটে।
৩৮।	মহিবুল আগতকল্য আসিবে বলে মনে হচ্ছে।	মহিবুল আগামীকাল আসবে বলে মনে হচ্ছে।
৩৯।	মুমুর্ষু ব্যক্তির নিকট বসে এত কথা বলো না।	মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকটে বসে এত কথা বলো না।
৪০।	আজিকার দিনটা বড়ই মধুর মনে হচ্ছে আমার।	আজকার দিনটা আমার বড়ই মধুর মনে হচ্ছে।
৪১।	শুধুমাত্র তানভীরই তার মায়ের একমাত্র ছেলে।	তানভীরই তার মায়ের একমাত্র ছেলে।
৪২।	তিনি তেলে বেগুনে রেগে উঠলেন।	তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।
৪৩।	অশিক্ষিতের সভায় কবিতা মানে বাঁশবনে মুক্তা ছড়ানো।	অশিক্ষিতের সভায় কবিতা আবৃত্তি মানে উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।
৪৪।	মুখের খাদ্য কেড়ে নিও না।	মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ো না।
৪৫।	বিবিধ প্রকার পুরস্কার পেলাম।	বিবিধ পুরস্কার পেলাম।
৪৬।	মেয়েটি অফুরন্ত সুন্দরী।	মেয়েটি অতি সুন্দরী।
৪৭।	সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়।	সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়।
৪৮।	এই ঘটনা আমি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।	এই ঘটনা আমি চাক্ষুষ দেখেছি।
৪৯।	বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে।	বৃক্ষটি সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
৫০।	বিদ্বান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
৫১।	আনোয়ারা পরমা সুন্দরী ছিলেন।	আনোয়ারা পরম সুন্দরী ছিলেন।
৫২।	বিলাসের কথা প্রমাণ হয়েছে।	বিলাসের কথা প্রমাণিত হয়েছে।
৫৩।	আমি সন্তোষ হলাম।	আমি সন্তুষ্ট হলাম।
৫৪।	স্বপ্না আরোগ্য হয়েছে।	স্বপ্না আরোগ্য লাভ করেছে। অথবা, স্বপ্না নীরোগ হয়েছে।
৫৫।	সেখানে গেলে তুমি অপমান হবে।	সেখানে গেলে তুমি অপমানিত হবে।
৫৬।	মণিকাকে একটা গোপন কথা বলি।	মণিকাকে একটা গোপনীয় কথা বলি।
৫৭।	আমি সাক্ষি দিব না।	আমি সাক্ষ্য দেব না।
৫৮।	প্রত্যেক শিক্ষকগণ উপস্থিত থাকবেন।	প্রত্যেক শিক্ষক উপস্থিত থাকবেন।
৫৯।	দৈন্যতা সব সময় ভালো নয়।	দীনতা সবসময় ভালো নয়।
৬০।	আগামীকাল ক্রিড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হইবে।	আগামীকাল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
৬১।	তারা মড়াদাহ করতে গেল।	তারা মড়া পোড়াতে গেল।
৬২।	সে সশংকিত কাল যাপন করে।	সে শঙ্কিত চিত্তে কাল যাপন করে।
৬৩।	ছাগীদুধ শরীরের পক্ষে উপকারী।	ছাগদুগ্ধ শরীরের পক্ষে উপকারী।
৬৪।	বাহ্যিক দৃশ্যে ভুলো নারে মন।	বাহ্য দৃশ্যে ভুলো নারে মন।
৬৫।	গ্রীষ্মকালে অত্যাধিক গরম পড়ে।	গ্রীষ্মকালে অত্যধিক গরম পড়ে।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৬।	আপনার জ্ঞাতার্থে লিখলাম।	আপনার জ্ঞাতার্থে লেখা হলো।
৬৭।	মনোযোগ দিয়ে পাঠজ্ঞান কর।	মনোযোগ দিয়ে পাঠাভ্যাস কর।
৬৮।	আমি মনোকষ্টে কাল কাটাচ্ছি।	আমি মনঃকষ্টে কাল কাটাচ্ছি।
৬৯।	তার গলা বাস্পরুদ্ধ হলো।	তার কণ্ঠ বাস্পরুদ্ধ হলো।
৭০।	সকল ছাত্ররা শিক্ষকের বাধ্য।	সকল ছাত্র শিক্ষকের বাধ্য।
৭১।	সে এ কথায় অত্যন্ত দুঃখ হলো।	সে এ কথায় অত্যন্ত দুঃখিত হলো।
৭২।	দুরাদৃষ্টবশত তিনি আজ বিপদগ্রস্থ হয়েছেন।	দূরদৃষ্টবশত তিনি আজ বিপদগ্রস্ত হয়েছেন।
৭৩।	পুত্রের অধগতি দেখে পিতা ব্যথিত হলেন।	পুত্রের অধোগতি দেখে পিতা ব্যথিত হলেন।
৭৪।	সকলের মধ্যে ঐক্যতা থাকা দরকার।	সকলের মধ্যে একতা থাকা দরকার।
৭৫।	দেশের মধ্যে ঐক্যতা থাকা দরকার।	দেশের অভ্যন্তরে ঐক্যবদ্ধতা দরকার।
৭৬।	দেশের দারিদ্র্যতা দূর করতে হবে।	দেশের দারিদ্র্য/দরিদ্রতা দূর করতে হবে।
৭৭।	তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষী নও।	তুমি নির্দোষ নও।
৭৮।	তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন।	তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন।
৭৯।	তার কবিতার মাধুর্যতা নেই।	তার কবিতায় মাধুর্য নেই।
৮০।	এখানে প্রবেশ নিষেধ।	এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।
৮১।	কৃতকার্যতার সহিত সে এই কাজ করিয়াছে।	কৃতিত্বের সহিত সে এই কাজ করিয়াছে।
৮২।	ছেলেটি ভয়ানক ভালো।	ছেলেটি অত্যন্ত ভালো।
৮৩।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়েছেন।	তিনি মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছেন।
৮৪।	তার জীবন সংশয়।	তার জীবন সংশয়াপন্ন।
৮৫।	এ কাজটি তার কর্তব্য।	এই কাজটি তার করা উচিত।
৮৬।	শাকিলের ভীষণ ঘুম পেয়েছে।	শাকিলের খুব বেশি ঘুম পেয়েছে।
৮৭।	সময় বড় সংক্ষেপ।	সময় বড় সংক্ষিপ্ত।
৮৮।	তার সাংসারিক বুদ্ধি অল্প।	তার সংসার জ্ঞান অল্প।
৮৯।	হোসনেয়ারা মৌন রহিলেন।	হোসনেয়ারা মৌনী রহিলেন।
৯০।	আমার মোটেই অবকাশ নাই।	আমার অবকাশ নাই।
৯১।	সে সানন্দিত চিত্ত মানুষ।	সে আনন্দিত চিত্ত মানুষ।
৯২।	আমি মহিবুলের কথায় স্বীকার হলাম।	আমি মহিবুলের কথায় স্বীকৃত হলাম।
৯৩।	এই জিনিসের উৎকর্ষতা নাই।	এই জিনিসের উৎকর্ষ নাই।
৯৪।	যদিও তিনি সামর্থ্য কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না।	যদিও তিনি সমর্থ তথাপি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলেন না।
৯৫।	বিদ্যাশিক্ষার ওপর তাহার আকর্ষণ নাই।	বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাহার আকর্ষণ নাই।
৯৬।	মূর্খের হাতে এ কাজ দেওয়া ঠিক হয় নাই।	মূর্খের ওপর এ কাজ দেওয়া ঠিক হয় নাই।
৯৭।	যদিও তিনি শোকাভূত তাহা সত্ত্বেও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই।	যদিও তিনি শোকাভিভূত তবু তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই।
৯৮।	শীঘ্র আমাকে টাকা পাঠাও।	শীঘ্র আমার নিকট টাকা পাঠাও।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯।	লতীফের বাড়ি ঘোড়াশাল।	লতীফের বাড়ি ঘোড়াশালে।
১০০।	ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম অনেক দূর।	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অনেক দূর।
১০১।	তিনি এই সমিতির অন্যতম একজন সহ-সভাপতি।	তিনি এ সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি।
১০২।	তিনি আসামীর স্বপক্ষে সাক্ষী দিলেন	তিনি আসামির পক্ষে সাক্ষ্য দিলেন।
১০৩।	পিতা তোমার প্রতি অত্যান্ত ক্রোধ হয়েছেন।	পিতা তোমার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন।
১০৪।	তিনি একজন কৃতি পুরুষ।	তিনি একজন কীর্তিমান পুরুষ।
১০৫।	আমার বড় দূরাবস্থা।	আমার বড় দুরবস্থা।
১০৬।	তিনি প্রভাতেই বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন।	তিনি প্রভাতেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন।
১০৭।	এ কাজটি আমার পক্ষে সম্ভব নহে।	এ কাজ আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
১০৮।	অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য হলেন।	অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আরোগ্য লাভ করলেন।
১০৯।	দুবাড়ির গিন্নির মধ্যে খুব সখ্যতা।	দু'বাড়ির গিন্নির মধ্যে খুব সখ্য।
১১০।	তিনি সহসা আসবেন, বলে গেছেন।	তিনি হঠাৎ আসবেন, বলে গেছেন।
১১১।	দারিদ্র্যতা লজ্জার বিষয় নয়।	দরিদ্রতা লজ্জার বিষয় নয়।
১১২।	অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে।	অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার পড়ে গেছে।
১১৩।	বাংলা বানান আয়ত্ব করা অফুরন্ত কঠিন।	বাংলা বানান আয়ত্ত করা অত্যন্ত কঠিন ।
১১৪।	সলজ্জিত হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।	সলজ্জ (লজ্জিত) হাসি হেসে মেয়েটি উত্তর দিল।
১১৫।	তার দু'চোখ অশ্রুজলে ভরা।	তার দু'চোখ জলে ভরা।
১১৬।	তিনি আমাদের পক্ষে সাক্ষী দিতে স্বীকার করেছেন।	তিনি আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার করেছেন।
১১৭।	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানিংকালে বিরল।	তার মতো কুশলী শিল্পী ইদানীং বিরল।
১১৮।	আমার অধীনস্থ এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্থ।	আমার অধীন এ কর্মচারী বেশ বিশ্বস্ত।
১১৯।	নতুন নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত করছে।	নতুন ছেলেগুলো স্কুলে এসে বড় উৎপাত শুরু করেছে।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩০।	বিবাদমান দুটি দলের সংঘর্ষ হয়।	বিবদমান দুটো দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।
১৩১।	তিনি এখন সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি।	তিনি এখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত বা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি।
১৩২।	সে ভিড়ে অন্যান্যদের মধ্যে হারিয়ে গেল।	সে ভিড়ে হারিয়ে গেল।
১৩৩।	তুমি সেখানে গেলে অপমান হবে।	তুমি সেখানে গেলে অপমানিত হবে।
১৩৪।	মুমূর্ষূ ব্যক্তির সেবা করবে।	মুমূর্ষু ব্যক্তির সেবা করবে।
১৩৫।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণ হয়।	মিথ্যা একদিন না একদিন প্রমাণিত হয়।
১৩৬।	সে কৌতুক করার কৌতুহল সম্ভবরণ করতে পারল না।	সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।
১৩৭।	মহারাজ সভাগৃহে প্রবেশ করলেন।	মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করলেন।
১৩৮।	বিষয়সমূহে বাহুল্যতা বর্জন করবে।	সব বিষয়ে বাহুল্য বর্জন করবে।
১৩৯।	শশীভূষণ গীতাঞ্জলী পাঠ করেছে।	শশিভূষণ গীতাঞ্জলি পাঠ করেছে।
১৪০।	তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন, আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই।	তিনিও তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, আমার আর বাঁচার সাধ নেই।
১৪১।	সে সঙ্কট অবস্থায় পড়েছে।	সে সংকটে পড়েছে।
১৪২।	আবাল্য হতেই সযত্নপূর্বক ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।	আবাল্য সযত্নে ব্যাকরণ পাঠ করা উচিত।
১৪৩।	সব ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের আতিথ্য সংকার করা উচিৎ।	সব ধনাঢ্য ব্যক্তির অতিথি সৎকার করা উচিত।
১৪৪।	তার কাজ করার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।	তার কাজের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব।
১৪৫।	মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে মগ্ন।	মাতৃবিয়োগে তিনি শোকানলে দগ্ধ।
১৪৬।	গতকাল নিলীমা লাল পেড়ে শাড়ি পড়েছিল।	গতকাল নীলিমা লালপেড়ে শাড়ি পরেছিল।
১৪৭।	তোমার গোপন কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।	তোমার গোপনীয় কথা শোনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।
১৪৮।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনোস্তাপে ভুগছে।	মনস্কামনা পূর্ণ না হওয়ায় সে মনস্তাপে ভুগছে।
১৪৯।	অত্যান্ত গরমে কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করিতেছ না কেন?	গরমে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছি, বাতাস করছ না কেন?
১৫০।	আমাদের দৈন্যতা. দৃষ্টে তোমার পুলকের কারণ কী?	আমাদের দীনতা দেখে তোমার পুলকের কারণ কী?
১৫১।	পিপিলিকা আর মরিচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।	পিপীলিকা আর মরীচিকার পিছু ধাওয়া করা একই কথা।
১৫২।	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামীনি	বাবু চলিলেন, যেন গজেন্দ্রগামিনী।
১৫৩।	ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মানবিকার দেখা দিয়েছে।	ইতোমধ্যে যা ঘটেছে তাতেই তার মনোবিকার দেখা দিয়েছে।
১৫৪।	কালক্রমানুসারে আমি সবই জানতে পারিব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।	কালক্রমে আমি সবই জানতে পারব, কিন্তু তখন আর উপায় থাকবে না।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৫।	বিস্ময়াভিভূত হতবাক চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখছিলাম।	বিস্ময়াভিভূত চিত্তে আমি তখন তোমাকে দেখছিলাম।
১৫৬।	মনোনীত কবিতা হইতে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি করিয়া পড়।	নির্বাচিত কবিতা থেকে একটি বেছে নাও এবং আবৃত্তি কর।
১৫৭।	মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষকগণকে লক্ষ করে তিনি কথাগুলি বললেন।	মাননীয় সভানেত্রী এবং উপস্থিত সকল শিক্ষককে লক্ষ করে তিনি কথাগুলো বললেন।
১৫৮।	অনাদি অনন্তকাল ধরে আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করবো।	আমি চিরদিন তোমাকে স্মরণ করব।
১৫৯।	রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐক্যমত্যে পৌছলেন, তবু আগামীতে কি ঘটবে বলা যায় না।	রাষ্ট্রপ্রধানগণ আপাতত ঐকমত্যে পৌছলেন, তবু ভবিষ্যতে কী ঘটবে বলা যায় না।
১৬০।	অনন্যোপায়ী হইয়া আমি তোমার সরনাপন্ন হইলাম।	অনন্যোপায় হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হলাম।
১৬১।	আমি, তুমি ও সে কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখিতে যাব।	সে, তুমি ও আমি কাল সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ দেখতে যাব।
১৬২।	যিনি যথার্থই বিদ্যান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করে না।	যিনি যথার্থই বিদ্বান, তিনি কখনো নিজের বিদ্যার গৌরব করেন না।
১৬৩।	তার জৈষ্ঠ পুত্র ও কণিষ্ঠ কন্যা বিদেশে গেছে।	তার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কনিষ্ঠা কন্যা বিদেশে গেছে।
১৬৪।	বিষয়টির বিষদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।	বিষয়টির বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।
১৬৫।	ইহা একটি মুক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।	ইহা একটি মূক ও বধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।
১৬৬।	পরিবেশ দোষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।	পরিবেশ দূষণ সমস্যা দিন দিন জটিল হচ্ছে।
১৬৭।	দারিদ্র্যতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।	দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা।
১৬৮।	এসব মানুষগুলির কোন ঠিকানা নেই।	এসব মানুষের কোনো ঠিকানা নেই।
১৬৯।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখগণ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।	শোকসভায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, দার্শনিক প্রমুখ শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন।
১৭০।	মণিষী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।	মনীষী মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি আদর্শ বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন।
১৭১।	অনেকে পরিস্কার, পুরষ্কার, শ্বশ্মান, শ্বাশুড়ী বানান লিখতে ভূল করেন।	অনেকে পরিষ্কার, পুরস্কার, শ্মশান, শাশুড়ি বানান লিখতে ভুল করেন।
১৭২।	তারা যাইতে যাইতে এ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হল।	তারা যেতে যেতে এ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হলো।
১৭৩।	তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দিবে।	তার প্রতি এতটা অন্যায় করলে সবাই দোষ দেবে।
১৭৪।	তোমরা সুখে দুঃখে পরস্পরের সাথী হও।	তোমরা সুখে-দুখে পরস্পরের সাথি হও।
১৭৫।	অনেকে মুমুর্ষু, মুহুর্ত, তিরষ্কার, শুকর বানান লিখতে ভুল করেন।	অনেকে মুমূর্ষু, মুহূর্ত, তিরস্কার, শূকর বানান লিখতে ভুল করেন।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭৬।	সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল।	সে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।
১৭৭।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ এশিয়াতে।	বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে।
১৭৮।	তাহার জন্য অপেক্ষা করা সমীচিন হবে না।	তার জন্য অপেক্ষা করা সমীচীন হবে না।
১৭৯।	শারিরিক অবস্থা বুঝিয়া চিকিৎসক ডাকবে।	শারীরিক অবস্থা বুঝে চিকিৎসক ডাকবে।
১৮০।	মুর্খ লোকের দূর্গতির সীমা থাকে না।	মূর্খ লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না।
১৮১।	মুহুর্তের ভূলে বিদূষীরাও বিপাকে পড়ে।	মুহূর্তের ভুলে বিদুষীরাও বিপদে পড়ে।
১৮২।	পুরাণ চাল ভাতে বাড়ে।	পুরান চালে ভাত বাড়ে।
১৮৩।	তিনি অযথা অশ্রুজলবিসর্জন করিয়া সময় নষ্ট করছেন।	তিনি অযথা অশ্রু বিসর্জন করে সময় নষ্ট করছেন।
১৮৪।	সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাব নিকাশের নাম হইতেছে বাজেট।	সরকারের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের নাম হচ্ছে বাজেট।
১৮৫।	স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় সৃতিশৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী দিবার ব্যবস্থা আছে।	স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
১৮৬।	নত্ববিধান ও সত্ববিধান জানা থাকিলে বানান ভূল হবে না।	ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান জানা থাকলে বানান ভুল হবে না।
১৮৭।	ইদানিং কালে অনেক মহিলাই ববকাট করেন।	ইদানীং অনেক মহিলাই চুলে ববকাট করেন।
১৮৮।	রবী ঠাকুরের গীতাঞ্জলী বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।	রবি ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলি' বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।
১৮৯।	বিদ্রোহী কবির 'অগ্নিবীণা' পড়েছ কী?	বিদ্রোহী কবির 'অগ্নিবীণা' কাব্য পড়েছ কি?
১৯০।	আল মাহমুদ বাংলাদেশের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।	আল মাহমুদ বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
১৯১।	ষ্টেশন মাষ্টার তখন ষ্টেশনে ছিলেন না।	স্টেশন মাস্টার তখন স্টেশনে ছিলেন না।
১৯২।	এটা অতি লজ্জাস্কর বিষয়।	এটা অতি লজ্জাকর বিষয়।
১৯৩।	বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।	বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ত্রিশ কোটি।
১৯৪।	বানান ভূল দোষণীয়।	বানান ভুল দূষণীয়।
১৯৫।	বিবিধ প্রকার দ্রব্য কিনলাম।	বিবিধ দ্রব্য কিনলাম।
১৯৬।	অনেকে সন্মান, সান্তনা, সন্থান, সমিচিন, বানান লিখতে ভুল করেন।	অনেকে সম্মান, সান্ত্বনা, সন্তান, সমীচীন বানান লিখতে ভুল করেন।
১৯৭।	তার উদ্ধতপূর্ণ আচরণে ব্যাথ্যা পেয়েছি।	তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে ব্যথা পেয়েছি।
১৯৮।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্যতা দেখতে পাই।	তাদের মধ্যে বেশ সখ্যভাব দেখতে পাই।
১৯৯।	সে আকন্ঠ পর্যন্ত পান করেছে।	সে আকণ্ঠ পান করেছে।
২০০।	সমৃদ্ধমান পরিবারে তার জন্ম।	সমৃদ্ধ (বা সমৃদ্ধিমান) পরিবারে তার জন্ম।
২০১।	বিধি লঙ্ঘন হয়েছে।	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে।
২০২।	ইহা অপক্ক হাতের লেখা।	ইহা কাঁচা/অপরিপক্ক হাতের লেখা।
২০৩।	চোরে চোরে খালাত ভাই।	চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

ক্রমিক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৪।	বাংলাদেশের ছাত্রগণ অধ্যায়ন ছেড়ে রাজনীতি করছে।	বাংলাদেশের ছাত্রগণ অধ্যয়ন ছেড়ে রাজনীতি করছে।
২০৫।	রাঙামাটি পার্বতীয় এলাকা	রাঙামাটি পার্বত্য এলাকা।
২০৬।	আগত রবিবারে তারা জাপান যাইবে।	আগামী রবিবারে তারা জাপান যাবে।
২০৭।	ব্যধিই সংক্রমক, স্বাস্থ্য নয়।	ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়।
২০৮।	পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে হলুদ ফুল দেখে।	পরীক্ষা এলেই কেউ কেউ চোখে সর্ষেফুল দেখে।
২০৯।	এ দোকানে খাঁটি সুন্দরবনের মধু পাওয়া যায়।	এ দোকানে সুন্দরবনের খাঁটি মধু পাওয়া যায়।
২১০।	ড. লুৎফর রহমান একজন নামজাদা লেখক ছিলেন।	ডা. লুৎফর রহমান একজন নামকরা লেখক ছিলেন।

খ. ভাষারীতি : সাধু, চলিত ও কথ্য ভাষা

প্রশ্ন : ৩০ ॥ ভাষা কাকে বলে? বাংলা ভাষার পরিচয় দাও। সাধু ও চলিত ভাষারীতির সংজ্ঞার্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

অথবা, বাংলা ভাষার রূপ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানুষ মাত্রই ভাব প্রকাশ করে থাকে। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে ভাষা বলে। নিচে ভাষার সংজ্ঞার্থ এবং বাংলা ভাষার সাধু ও চলিতরীতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো−

ভাষার সংজ্ঞার্থ

সাধারণ কথায়, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করে তাকে ভাষা বলে। এ বিষয়ে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ নিচে উপস্থাপন করা হলো−

১। **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত :** তিনি বলেন, "মনুষ্য জাতি যেসব ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা।"

২। **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত :** তার মতে, "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

৩। **ড. শাহজাহান মুনিরের মত :** তার মতে, "মানবজাতি মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে অপরের বোধগম্য যে ধ্বনি বা ধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহার নাম ভাষা।"

বাংলা ভাষার পরিচয়

ভৌগোলিক দিক থেকে এ পৃথিবী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত। দেশ, জাতি, গোষ্ঠী ও অঞ্চলভেদে ভাব প্রকাশের ধ্বনির তারতম্যের জন্য হাজার হাজার ভাষা সৃষ্টি হয়েছে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। বাঙালি জনগণ যে ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে, তাকে বাংলা ভাষা বলে। ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে

বাংলা ভাষা চতুর্থ স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের প্রায় ত্রিশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। নিত্য নতুন শব্দ গ্রহণের দ্বারা বাংলা প্রতিনিয়তই শ্রীমণ্ডিত, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। তাই আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের বিচারে বাংলা একটি উন্নতমানের ভাষা। গঠনগত দিক থেকেও বাংলা ভাষার উৎকর্ষ প্রশ্নাতীত। এছাড়া ব্যবহারিক চমৎকারিত্ব ও উপযোগিতার দিক থেকে পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার চেয়ে ঋদ্ধ এবং ব্যাপক সম্ভাবনায়ময় আমাদের এ বাংলা ভাষা।

বাংলা ভাষার রূপ

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষারও প্রধানত দুটি রূপ রয়েছে। যথা– ১। লেখ্য রূপ, অর্থাৎ অক্ষর বা বর্ণের সাহায্যে লিখে মনের ভাব প্রকাশ এবং ২। কথ্য রূপ, অর্থাৎ মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশিত ভাষারূপ।

বাংলা ভাষার লেখ্য রূপ আবার দু'প্রকার। যথা– ক. সাধু ভাষা ও খ. চলিত ভাষা।

ক. সাধু ভাষা : পূর্ণ ক্রিয়াপদ সংবলিত গুরুগম্ভীর ভাষারীতিকে সাধারণত সাধু ভাষা (Standard Literary) বলা হয়। সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বেশি।

উদাহরণ : নদীর জল ছল-ছল করিতেছে। প্রবলবেগে মলয় প্রবাহিত হইতেছে। একটি পক্ষী উড়িতে চাহিলেও পারিতেছে না। দূরে একটি শৃগাল থামিয়া থামিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

খ. চলিত ভাষা : মৌখিক ভাষাকে সাধারণত চলিত ভাষা বলে। হালকা বৈশিষ্ট্যের সংকুচিত ক্রিয়াপদ দিয়ে মুখের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যশীল বাংলা ভাষাকে চলিত ভাষা (Standard colloquial) বলা হয়। চলিত ভাষা বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসেবে বিবেচিত।

উদাহরণ : নদীর জল ছল ছল করছে। প্রবলবেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। একটি পাখি উড়তে চাইলেও পারছে না। দূরে একটি শিয়াল থেমে থেমে কাঁদছে।

উপসংহার : চলিত ভাষা সহজ-সরল এবং শ্রুতিমধুর। বর্তমানকালে সংবাদপত্র ও উন্নত সাহিত্যের প্রায় সকল ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। কথাবার্তা বা লেখার সময় সাধু ও চলিতরীতির যেন মিশ্রণ না ঘটে সে দিকে লক্ষ রাখা আবশ্যক।

▸▸ প্রশ্ন : ৩১ ॥ ভাষা কাকে বলে? সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৩]

অথবা, সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লেখ। [ফা. প. '১০, '১২, '১৪, '১৬, '১৮]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : জন্মের পরই মানবশিশু চিৎকার করে। সে চায় ভাব বিনিময় করতে, যোগাযোগ করতে। মানব মনে প্রতিনিয়ত ভাবের উদয় হয়। এসব ভাবের বিনিময় ও পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে যে শব্দ বা অর্থপূর্ণ ধ্বনি ব্যবহার করা হয়, তাকে ভাষা বলে।

ভাষার সংজ্ঞা

সাধারণ কথায়, মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করতে যেসব অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করে, তাকে ভাষা বলে। এ বিষয়ে নিচে কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা পেশ করা হলো–

১। **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অভিমত :** ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, "মনুষ্য জাতি যেসব ধ্বনি দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে, তার নাম ভাষা।"

২। **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত :** ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোনো বিশেষ জনসমাজের ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।"

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য

ব্যবহার ও লেখার বিচারে বাংলা ভাষা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। যথা– সাধু রীতি ও চলিত রীতি। নিচে উভয়ের পার্থক্য উপস্থাপন করা হলো–

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১। সংজ্ঞা	যে ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম-কানুন পুরোপুরি মেনে চলে, তাকে সাধু ভাষা বলে।	বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক ব্যবহৃত বা মৌখিক ভাষাকে চলিত ভাষা বলে।
২। ব্যাকরণ অনুসরণ	সাধু ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী।	চলিত ভাষা ব্যাকরণের অনুসারী নয়।
৩। শব্দের প্রয়োগ	সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।	চলিত ভাষায় তদ্ভব, অর্ধতৎসম দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রয়োগ হয়ে থাকে।
৪। স্থিরতা	সাধু ভাষা অপরিবর্তনীয়।	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৫। ব্যবহার	গদ্য, সাহিত্য, চিঠিপত্র ও দলিল লিখনে এ ভাষার ব্যবহার যথোপযুক্ত।	চলিত ভাষা বক্তৃতা, সংলাপ, আলোচনা ও নাট্য সংলাপের জন্য উপযুক্ত।
৬। পদবিন্যাস	সাধু ভাষায় পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্ধারিত।	চলিত ভাষায় পদবিন্যাস সর্বদা সুনির্ধারিত নয়।
৭। অনুসর্গ	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হইতে, থাকিয়া, চাইতে ইত্যাদি।	এ রীতিতে অনুসর্গ হচ্ছে– হতে, থেকে, চেয়ে ইত্যাদি।
৮। প্রকৃতি	সাধু ভাষা কৃত্রিম।	চলিত ভাষা কৃত্রিমতা বর্জিত।
৯। সন্ধি সমাসের ব্যবহার	সাধু ভাষায় সন্ধি ও সমাসের আধিক্য লক্ষণীয়।	চলিত ভাষায় সন্ধি, সমাস বর্জন করে সহজ করে লেখার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।
১০। কর্মবাচ্যের ব্যবহার	সাধু ভাষায় কর্মবাচ্যের ব্যবহার অপ্রচলিত নয়।	চলিত ভাষায় সংস্কৃতানুসারী 'এ' কর্মবাচ্যের ব্যবহার একেবারেই অচল।
১১। স্বর সঙ্গতি	সাধু ভাষায় স্বর সঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার বর্জনীয়।	চলিত ভাষায় স্বর সঙ্গতি ও অভিশ্রুতির ব্যবহার লক্ষণীয়।
১২। সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার এ ভাষায় পূর্ণাঙ্গরূপে হয়ে থাকে।	এ ভাষায় এদের আধুনিক ও সংকুচিতরূপ ব্যবহৃত হয়।
১৩। আঞ্চলিক প্রভাব	এ ভাষায় কোনো আঞ্চলিক প্রভাব নেই।	এটা আঞ্চলিক প্রভাবাধীন।
১৪। ধ্বনাত্মক শব্দ	সাধু ভাষায় ধ্বনাত্মক শব্দের প্রাধান্য নেই বললেই চলে।	চলিত ভাষায় ধ্বনাত্মক শব্দের প্রাধান্য বেশি যেমন– কনকন, ঝনঝন, ঠনঠন।
১৫। নব ও প্রাচীন	সাধু ভাষা বেশ প্রাচীন।	চলিত ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

পার্থক্যগত বিষয়	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১৬। বোধগম্যতা	সাধু ভাষা সকলের বোধগম্য নয়।	চলিত ভাষা সকলের বোধগম্য।
১৭। সময়গত	সাধু ভাষা বলতে ও লিখতে সময় বেশি লাগে।	চলিত ভাষা বলতে ও লিখতে সময় কম লাগে।
১৮। উদাহরণ	এখনো সে ফিরিয়া আসে নাই। তোমাকে কাছে পাইয়া আমি ধন্য হইলাম।	এখনো সে ফিরে আসেনি। তোমাকে কাছে পেয়ে আমি ধন্য হলাম।

উপসংহার : সাধু ও চলিত ভাষা নিজ নিজ বিশেষ নিয়ম অনুসারে বাংলা ভাষার দুটি বিশেষ ধারাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। তাই একই সঙ্গে এ দুটি ভাষার সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। তাই এদের অবকাঠামো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করে সচেতনতার সাথে এ দুটি রীতিকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে ব্যবহার করা উচিত।

» প্রশ্ন : ৩২ ॥ সাধু ও চলিত রীতি বলতে কী বোঝ? সাধু ও চলিত রীতির দুটি করে বৈশিষ্ট্য লেখ। [ফা. প. ২০১৯]

অথবা, সাধু ও চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০০১, '০৫]

উত্তর ।। উপস্থাপনা : পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই দুটি রীতি বিদ্যমান। তেমনি বাংলা ভাষাতেও দুটি রীতি রয়েছে। যেমন– সাধু ও চলিত ভাষা। প্রথমটি সাহিত্যের ভাষায় বা লেখায় ব্যবহৃত হয়; আর দ্বিতীয়টি মুখের কথায় ব্যবহৃত হয়। নিচে এ দুটি ভাষারীতির পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হলো–

সাধু ভাষা

'সাধু' শব্দের অর্থ শিষ্ট, মার্জিত, ভদ্ররীতিসম্মত। বাংলা ভাষায় পূর্ণ ক্রিয়াপদ সংবলিত গুরুগম্ভীর ভাষারীতিকে সাধারণত সাধু ভাষা (Standard Literary) বলা হয়।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "সাধারণত গদ্য সাহিত্যে ব্যবহৃত বাঙালা ভাষাকে সাধু ভাষা বলে।" সাধু ভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বেশি হয়ে থাকে। এর সর্বনাম ও ক্রিয়াপদসমূহ পূর্ণতর ও ভাবগম্ভীর। সাহিত্য ও লেখার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বেশি।

উদাহরণ : নদীর জল ছল-ছল করিতেছে। প্রবল বেগে মলয় প্রবাহিত হইতেছে। একটি পক্ষী উড়িতে চাহিলেও পারিতেছে না। দূরে একটি শৃগাল থামিয়া থামিয়া ক্রন্দন করিতেছে।

চলিত ভাষা

মৌখিক ভাষাকে সাধারণত চলিত ভাষা বলে। হালকা বৈশিষ্ট্যের সংকুচিত ক্রিয়াপদ দিয়ে মুখের ভাষার সাথে সামঞ্জস্যশীল বাংলা ভাষাকে চলিত ভাষা (Standard colloquial) বলা হয়। চলিত ভাষা বর্তমানে সর্বজনগ্রাহ্য ভাষা হিসেবে স্বীকৃত।

উদাহরণ : নদীর জল ছল-ছল করছে। প্রবল বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। একটি পাখি উড়তে চাইলেও পারছে না। দূরে একটি শেয়াল থেমে থেমে কাঁদছে।

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

সাধু ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। সাধু ভাষা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি, তবে আভিজাত্য বিদ্যমান।

২। সাধু ভাষা অঞ্চলবিশেষের প্রভাবমুক্ত।

৩। সাধু ভাষার রূপ অপরিবর্তিত, এর বাক্যরীতি সুশৃঙ্খল ও সুনির্ধারিত।
৪। সাধু ভাষা গম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।
৫। সাধু ভাষা মার্জিত, তবে সর্বজনবোধ্য নয়।
৬। সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদ দীর্ঘরূপে ব্যবহৃত হয়।
৭। সাধু ভাষা ব্যাকরণের সকল নিয়মকানুন মেনে চলে।
৮। সাধু ভাষার পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত।
৯। সাধু ভাষায় বানানরীতি সুনির্দিষ্ট।
১০। সাধু ভাষা বক্তৃতা বা কথোপকথনের অনুপযোগী।
১১। সাধু ভাষায় সংস্কৃত অব্যয়গুলো অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

চলিত ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ

১। চলিত ভাষা সাধারণত কৃত্রিমতাবর্জিত।
২। চলিত ভাষা অঞ্চলবিশেষে প্রভাবিত।
৩। চলিত ভাষার রূপ পরিবর্তনশীল।
৪। চলিত ভাষা সহজ-সরল, গতিশীল ও শ্রুতিমধুর।
৫। চলিত ভাষা সহজবোধ্য এবং সর্বজনবোধ্য।
৬। চলিত ভাষায় সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহৃত হয়।
৭। চলিত ভাষা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে চলে না।
৮। চলিত ভাষায় তদ্ভব ও দেশি শব্দের ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৯। চলিত ভাষা বক্তৃতা বা কথোপকথনের উপযোগী।
১০। চলিত ভাষা শ্রুতিমধুর।
১১। চলিত ভাষায় মনের কথা সহজে প্রকাশ করা যায়।
১২। শব্দ ব্যবহারে চলিত ভাষা উদার, যে-কোনো অঞ্চলের শব্দকে এ ভাষা আপন করে নেয়।
১৩। চলিত ভাষায় সমাসবদ্ধ পদ যথাসম্ভব সহজ করে ব্যবহার করা হয়।
১৪। চলিত ভাষায় বানান ভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন– গেলাম, গেলুম, গেলেম।

উপসংহার : সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার দুটি রূপই আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। তবুও দেখা যায়, সাধু ভাষা বর্তমানে পরিত্যক্ত না হলেও চর্চা কিছুটা স্থগিত প্রায়। আধুনিক লেখকদের মধ্যে সাধু ভাষার প্রবণতা ক্ষীণ। অপরদিকে চলিত ভাষা আপন গতিতে বিশাল সাহিত্য-সাগরে মিশে চলেছে।

প্রশ্ন : ৩৩ ॥ সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূষণীয়, এটি বর্জন অবশ্যকর্তব্য– আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনায় প্রাচীনকাল থেকেই দুটি রূপ বিদ্যমান রয়েছে। একটি সাধু, অপরটি চলিত। দুটি ভাষার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক রীতির সাথে অন্য রীতির মিশ্রণ ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে দূষণীয়। এতে উভয় ভাষারীতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এ মিশ্রণকে বলা হয় গুরুচণ্ডালী রূপ। নিচে এ দুটি রীতির মিশ্রণের অসুবিধাগুলো উপস্থাপিত হলো–

সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ

সাহিত্যে সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণে নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলো পরিদৃষ্ট হয়–

১। সাধু ও চলিত রীতির সংমিশ্রণে বাংলা গদ্যে যে 'তৃতীয় রূপের' প্রকাশ ঘটে, তা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট। এতে ভাষা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

২। এর ফলে বাক্যে ব্যাকরণগত ত্রুটি দেখা দেয় এবং ভাষার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়।

৩। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটলে প্রতিটি শব্দ পড়তে হোঁচট খেতে হয়।

৪। এতে ভাষার সহজ-সরল স্বাভাবিক গতি বিলুপ্ত হয়।

৫। এতে রচনা সুখপাঠ্য হয় না।

সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ দূর করার পদ্ধতি

১। প্রথমে জানতে হবে সাধু ও চলিত ভাষার উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে।

২। ক্রিয়াপদের রূপগত পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

৩। সর্বনাম পদের রূপগত সংকোচন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

৪। মনে রাখতে হবে, সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বেশি এবং চলিত ভাষায় তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশি। সাধু ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে।

৫। সাধু ভাষার সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের রূপ চলিত ভাষায় সংকুচিত হয়ে যায়। যেমন– তাহারা > তারা, আসিয়াছিলাম > এসেছিলাম।

৬। বাক্য গঠনের সময় মনে রাখতে হবে শব্দচয়ন, সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদের রূপের ব্যবহারে সামগ্রিক সামঞ্জস্য রক্ষা হচ্ছে কিনা।

৭। শব্দ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

উপসংহার : সাধু রীতি সাহিত্যের প্রাচীন পদ্ধতি। আর চলিত রীতি অতি আধুনিক পদ্ধতি। এ দুটির মিশ্রণ সাহিত্যে দূষণীয়। এতে ভাষা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গতি ও মাধুর্য হারিয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। তাই সাহিত্য রচনায় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

⏩ প্রশ্ন : ৩৪ ॥ সাধু ও চলিত ভাষার পরিবর্তনের নিয়মগুলো আলোচনা কর।
অথবা, সাধু রীতি থেকে চলিত রীতিতে পরিবর্তনের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

উত্তর ॥ সাধু ও চলিত ভাষার পরিবর্তন পদ্ধতি : সাধু ও চলিত ভাষার মূল পার্থক্য ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের আলাদারূপ ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল। যেমন–

১। পদের শেষে অ, আ, বা ও স্বরধ্বনি থাকলে পূর্ববর্তী 'ই' স্বরধ্বনি চলিত রীতিতে এ-তে পরিণত হবে। যেমন– ভিতরে>ভেতরে, লিখা >লেখা, ভিজা>ভেজা প্রভৃতি।

২। ক্রিয়াপদের মধ্যে স্বরধ্বনি 'উ' থাকলে তা সাধু ভাষা। উক্ত স্বরধ্বনি 'উ' বাদ দিলে চলিতরূপে রূপান্তরিত হবে। যেমন– থাউক>থাক, খাউক>খাক, হউক>হোক প্রভৃতি।

৩। ক্রিয়াপদের মধ্যে স্বরধ্বনি 'ই' থাকলে বুঝতে হবে তা সাধু ভাষা। একে চলিত ভাষায় রূপান্তর করতে হলে উক্ত 'ই' স্বরধ্বনি লোপ করতে হয়। যেমন– পাইব>পাব, যাইব>যাব, খাইব>খাব, করিব>করব, খেলিতে>খেলতে ইত্যাদি।

৪। পদের শেষে অ, আ বা এ স্বরধ্বনি থাকলে পূর্ববর্তী 'উ' চলিত রীতিতে 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন– বুঝা>বোঝা, উঠে>ওঠে, শুন>শোন প্রভৃতি।

৫। পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে চলিত রীতিতে 'আ' ধ্বনি এ-তে পরিবর্তিত হয়। যথা– খাইয়া>খেয়ে, ধরিয়া>ধরে, দিয়া>দিয়ে প্রভৃতি।

৬। পদের পূর্বে 'উ' বা 'উ' থাকলে তা চলিত রীতিতে শেষের 'আ' ধ্বনি 'ও' ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন– তুলা>তুলো, বুড়া>বুড়ো, সুতা> সুতো প্রভৃতি।

সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন করার অন্যান্য পদ্ধতি

সাধু ভাষাকে চলিত ভাষায় রূপান্তর করার ক্ষেত্রে বহু শব্দ পরিবর্তিত উচ্চারণে (বানানে) পরিবর্তন করে চলিত রূপ পরিগ্রহ করে। সাধু ভাষার বহু ক্রিয়াপদও সংক্ষিপ্ত ও পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে। এ সম্বন্ধে নিচে কিছু শব্দ সাধু ভাষা হতে চলিত ভাষায় রূপান্তর করে উপস্থাপন করা হলো–

সাধু ও চলিত ভাষার ক্রিয়ার রূপ

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
করিলাম	করলাম	পড়িব	পড়ব
পার হইয়া	পেরিয়ে	পড়িল	পড়ল
মচ্‌মচ্ করিয়া	মচ্‌মচ্ করে	ফুটিয়া রহিয়াছে	ফুটে রয়েছে
আসিল	আসলো	চাহিতেছে	চাচ্ছে
চাইয়া	চেয়ে	খাইয়া	খেয়ে
চলিতেছি	চলছি	বাজিতেছে	বাজছে
গাহিতাম	গাইতাম	হাসিয়া	হেসে
পাইতেছে	পাচ্ছে	লইলাম	নিলাম
গাইবে	গাবে	খেলিবে	খেলবে
বসিয়া	বসে	শুনিয়াছি	শুনেছি
যাইতেছে	যাচ্ছে	ফেলিব	ফেলব
আসিতেছি	আসছি	মরিয়া	মরে
লইব	নেব	সহিতে	সইতে
আসিও	এসো	ধরিয়া ফেল	ধরে ফেল
পাইলাম	পেলাম	উঠিয়া	উঠে/ওঠে

সাধু ও চলিত ভাষার সর্বনামের রূপ

তোমাদিগের	তোমাদের	তাহাদিগকে	তাদেরকে
তাহাদের	তাদের	তাহারা	তারা
ইহারা	এরা	ইহাকে	একে
আমাদিগকে	আমাদেরকে	কাহাদের	কাদের
যাহারা	যারা	ইহাদের	এদের
ইহার	এর	যাহাকে	যাকে
যাহাদের	যাদের	এই, ইহা	এ, এটা
যাহাদিগকে	যাদেরকে	তাহাতে	তাতে
যাহার	যার	যাহা	যা
তাহা	তা	উহাতে	ওতে
যাহাতে	যাতে	কাহাদিগকে	কাদেরকে

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত

কিছু পদ বা শব্দের সাধু ও চলিত রূপ

শুষ্ক/শুকনা	শুকনো	পূর্বেই	আগেই
মক্ষিকা	মাছি	ভিতর	ভেতর
বন্য	বুনো	বাহির	বাইর (বের)
উনান	উনুন	খোলস	খোসা
সহিত	সঙ্গে/সাথে	উঠান	উঠোন
নাই	নেই		

যৌগিক ও সংযোগমূলক ক্রিয়ার রূপান্তর

কাটিয়া ফেলিল	কেটে ফেলল	বসিয়া পড়িল	বসে পড়ল
বলিতে লাগিল	বলতে লাগল	লাগিয়া থাক	লেগে থাক
মৃত্যুমুখে পতিত হইল	মারা গেল	ভীত হইল	ভয় পেল

অনুসর্গের রূপান্তর

হইতে	থেকে/হতে	ভিতরে	ভেতরে
দিয়া	দিয়ে	কর্তৃক	দিয়ে
দ্বারা	দিয়ে	নিকট হইতে	কাছ থেকে
লাগিয়া	লেগে		

অব্যয় পদের রূপান্তর

তথাপি	তবুও	বরঞ্চ	বরং
মধ্যে	মাঝে	বলিয়া	বলে
যদ্যপি	যদিও	অনন্তর	তারপর
অদ্য	আজ	পিছনে	পেছনে
চাইতে	চেয়ে	লাগিয়া	লেগে

তৎসম শব্দকে তদ্ভব শব্দে রূপান্তর

হস্ত	হাত	হস্তী	হাতি
মৃত্তিকা	মাটি	চন্দ্র	চাঁদ
স্বর্ণ	সোনা	কৃষ্ণ	কানাই, কালো
গ্রাম	গাঁ	ভিতর	ভেতর
জ্যোৎস্না	জোছনা	পক্ষী	পাখি
বাটী	বাড়ি	পুরোহিত	পুরুত
নিমন্ত্রণ	নেমন্তন্ন	দ্বিপ্রহর	দুপুর
দধি	দই	অন্ধকার	আঁধার
মস্তক	মাথা	পদ	পা

সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
স্বরসঙ্গতি, সমীকরণ, অপিনিহিতি ইত্যাদির মাধ্যমে রূপান্তর			
লিখ	লেখ	করাইব	করাব
শিয়াল	শেয়াল	সিপাই	সেপাই
বুঝ	বোঝ	মিথ্যা	মিথ্যে, মিছা
মিছা	মিছে	ইচ্ছা	ইচ্ছে
আজি	আজ	উল্টা	উল্টো
দুয়ার	দোর	দেশি	দিশি
বিলাতি	বিলেতি	পূজা	পুজো
ফালি	ফাল	আসিয়াছে	এসেছে
সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দ ব্যবহার করে রূপান্তর			
সংবাদ	খবর	পুস্তক	বই
শয্যা	বিছানা	পত্র	চিঠি
পদ	পা	পদব্রজে	পায়ে হেঁটে
অশ্বারোহণে	ঘোড়ায় চড়ে	বিপণি	দোকান

সাধু রীতি হতে চলিত রীতিতে রূপান্তর

১। **সাধু রীতি :** যখন জলবেগ এমন মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহনা অতিক্রম করিয়া অনেক দূরে আসিয়াছিলেন। তখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কি না, এ বিষয়ে মীমাংসা আবশ্যক হইল। [বঙ্কিমচন্দ্র]

চলিত রীতি : যখন জলের বেগ এমন হয়ে এল যে, নৌকার গতি সামলানো যেতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহনা পেরিয়ে অনেক দূর চলে এসেছিলেন। এখন নবকুমারের জন্য ফেরা যাবে কিনা, এ বিষয়ে ঠিক করা দরকার হলো।

২। **সাধু রীতি :** আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এইটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? পশ্চিম হইতে যাহা কিছু শিখিবার আছে, জাপান তাহা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল। ইহার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তাহারা দেশীয় ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

চলিত রীতি : আমাদের এ ভীরুতা কি চিরদিনই থেকে যাবে? ভরসা করে এটুকু কোনোদিন বলতে পারব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করে নিতে হবে? পশ্চিম হতে যা কিছু শেখার আছে জাপান তা দেখতে দেখতে সারাদেশে ছড়িয়ে দিল। এর প্রধান কারণ, সে শিক্ষাকে তারা দেশীয় ভাষার আধারে বাঁধাই করতে পেরেছে।

৩। **সাধু রীতি :** আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতা-পুত্র বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য, প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না।

চলিত রীতি : আমরা এতে বুঝছি যে, চলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, বাপ বেটায় একসাথে বসে এরূপ ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। বুঝলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় বাপ-বেটায় বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথাবার্তা বলা উচিত, চলিত ভাষায় কথাবার্তা হতে পারে না।

৪। **সাধু রীতি :** দেশি ভাষা, বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে বাংলা গদ্য এতটা নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হইয়াছিল যে, ইহাদের সম্পাদিত পুস্তক এক সময়ে দেশবাসীর রসপিপাসা মিটাইবার সব সামর্থ্য লাভ করিয়াছিল।

চলিত রীতি : দেশি ভাষা, বিশেষ করে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য এ বিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা খুব চেষ্টা করেছিলেন। এদের অকৃত্রিম চেষ্টার ফলে বাংলা গদ্য এতোটা নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয়েছিল যে, এদের সম্পাদিত বই একসময় দেশবাসীর রসপিপাসা মেটানোর সব সামর্থ্য লাভ করেছিল।

৫। **সাধু রীতি :** সুখে থাকিয়া এবং পেট ভরিয়া খাইয়া কিছুদিনের মধ্যে ভিখুর দেহে পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল। তাহার ছাতি ফুলিয়া উঠিল, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নাচিয়া উঠিতে লাগিল। অবরুদ্ধ শক্তির উত্তেজনায় ক্রমে ক্রমে তাহার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল।

চলিত রীতি : সুখে থেকে এবং পেট ভরে খেয়ে কিছুদিনের ভেতর ভিখুর দেহে আগের স্বাস্থ্য ফিরে এলো। ছাতি ফুলে উঠল, প্রতিটি অঙ্গ নাড়াচাড়ায় হাতের ও পিঠের মাংসপেশি নেচে উঠতে লাগল। আটকে থাকা শক্তির উত্তেজনায় ধীরে ধীরে তার মেজাজ উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল।

৬। **সাধু রীতি :** আমি ভাষা ও ভাব পৃথক করিয়া আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু বাস্তবিক কবির নিকট ভাষা ও ভাবের ভিতর কোনো প্রভেদ নাই। কবিতার ভাষা ও ভাব পরস্পরের উপর পরস্পর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। ভাব মন্দ হইলে কবিতার ভাষা কখনো সুন্দর হইতে পারে না এবং ভাষা কদর্য হইলে ভাবও সম্পূর্ণরূপে কবিত্বপূর্ণ হইতে পারে না। কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তাহা ভাব হইতে পৃথক করিতে পারা যায় না। একটি ভাব দুই প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হইলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হইয়া যায়।

চলিত রীতি : আমি ভাষা ও ভাব আলাদা করে আলোচনা করেছি; কিন্তু আসলে কবির কাছে ভাষা ও ভাবের ভেতরে কোনো অমিল নেই। কবিতার ভাষা ও ভাব একের ওপর অন্যটি পুরোপুরি নির্ভর করে। ভাব মন্দ হলে কবিতার ভাষা কখনোই সুন্দর হতে পারে না এবং ভাষা কদর্য হলে ভাবও পুরোপুরি কবিত্বপূর্ণ হতে পারে না। কবিতায় ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, কিছুতেই তা ভাব হতে পৃথক করতে পারা যায় না। একটি ভাব দু'প্রকার ভাষায় ব্যক্ত হলে অর্থ সম্বন্ধে অনেকটা বিভিন্ন হয়ে যায়।

৭। **সাধু রীতি :** এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না?

চলিত রীতি : এরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতার কারণে বাঙলা সাহিত্য নীরস, সৌন্দর্যহীন, দুর্বল এবং বাঙলা সমাজে অপরিচিত হয়ে আছে। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এ বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখেছিলেন এবং বুঝেছিলেন। তিনি ভাবলেন, বাঙলার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হবে না?

৮। **সাধু রীতি :** ব্যক্তিবিশেষে তৈলের গুণে তারতম্য অনেক আছে। নিষ্কৃত্রিম তৈল পাওয়া অতি দুর্লভ। কিন্তু তৈলের এমনি একটি আশ্চর্য সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তাহাতে যে ইহা অন্য সকল পদার্থের গুণই আত্মসাৎ করিতে পারে। যাহার বিদ্যা আছে, তাহার তৈল আমার তৈল হইতে মূল্যবান। বিদ্যার উপর যাহার বুদ্ধি আছে, তাহারা আরও মূল্যবান। তাহার উপর যদি ধন থাকে, তবে তাহার প্রতি বিন্দুর মূল্য লক্ষ টাকা। কিন্তু তৈল না থাকিলে তাহার বুদ্ধি থাকুক, হাজার বিদ্যা থাকুক, হাজার ধন থাকুক, কেহই টের পায় না।

চলিত রীতি : ব্যক্তিবিশেষে তেলের গুণে তারতম্য অনেক। খাঁটি তেল পাওয়া বেশ কঠিন। কিন্তু তেলের এমনি এক অদ্ভুত সম্মিলনীশক্তি আছে যে, তা অন্য সব পদার্থের গুণই আত্মস্থ করতে পারে। যার বিদ্যা আছে তার তেল আমার তেল হতে দামি। বিদ্যার ওপর যার বুদ্ধি আছে, তারা আরো দামি। তার ওপর যদি সম্পদ থাকে, তবে তার এক ফোঁটার দাম লাখ টাকা। কিন্তু তেল না থাকলে তার বুদ্ধি থাক, হাজার বিদ্যা থাক, হাজার সম্পদ থাক, কেউই টের পায় না।

৯। **সাধু রীতি :** বৎস! তোমার কিছুমাত্র দয়া ও মমতা নাই। যখন তুমি এত সত্বর চলিয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলে, তখন তোমার সংসারে না আসাই সর্বাংশে উচিত। তুমি স্বল্প সময়ের জন্য আসিয়া সকলকে কেবল মর্মান্তিক বেদনা দিয়া গিয়াছ। আমি যে তোমার অদর্শনে কত যাতনা ভোগ করিতেছি তাহা তুমি একবারও ভাবিতেছ না।

চলিত রীতি : বাছাধন! তোমার সামান্য দয়া-মায়া নেই। যখন তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলে স্থির করে রেখেছিলে, তখন তোমার বাড়ি না আসাই উচিত ছিল। তুমি সামান্য সময়ের জন্য এসে সবাইকে শুধু অসহনীয় জ্বালা দিয়ে গিয়েছ। আমি যে তোমার দেখা না পেয়ে কত কষ্ট ভোগ করছি তা তুমি একবারও ভাবলে না।

১০। **সাধু রীতি :** আমরা ক্ষণকালের মধ্যে আটক করিয়া ধরিয়া যাহাকে জমাট করিয়া দেখি, বস্তুত তাহার সেই রূপ নাই; কেননা সত্যই তাহা বদ্ধ হইয়া নাই এবং ক্ষণকালেই তাহার শেষ নহে। আমরা দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য তাহাকে স্থির করিয়া স্বতন্ত্র করিয়া তাহাকে যে নাম দিতেছি, সে নাম তাহার চিরকালের সত্য নাম নহে। এই জন্যই আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি, জানিতেছি বলিয়া স্থির করিয়াছি তাহাকে মায়া বলা হইয়াছে।

চলিত রীতি : আমরা অল্প সময়ের মধ্যে আটক করে ধরে যাকে জমাট করে দেখি, মূলত তার সে রূপ নেই; কেননা সত্যিই তা আটক হয়ে নেই এবং অল্প সময়ে তার শেষ নয়। আমরা দেখার জন্য, জানার জন্য তাকে স্থির করে আলাদা করে তাকে যে নাম দিচ্ছি, সে নাম তার চিরকালের প্রকৃত নাম নয়। এ জন্যই আমরা যা কিছু দেখছি, জানছি বলে স্থির করেছি তাকে মায়া বলা হয়েছে।

১১। **সাধু রীতি :** বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম চলিত ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা; দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন দ্বিতীয়টির কোনো চিহ্ন পাওয়া যাইত না।

চলিত রীতি : বাঙালার লেখ্য এবং কথ্য ভাষায় যতটা পার্থক্য দেখা যায়, অন্যত্র ততোটা নয়। বলতে গেলে, কিছুকাল আগে দুটি আলাদা ভাষা বাঙালায় চালু ছিল। একটির নাম সাধু ভাষা; অপরটির নাম চলিত ভাষা। একটি লেখার ভাষা; দ্বিতীয়টি কথা বলার ভাষা। বইয়ে প্রথম ভাষাটি ছাড়া, দ্বিতীয়টির কোনো ছাপ পাওয়া যেত না।

১২। **সাধু রীতি :** এক সময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটি গোলমাল উঠিল। তারপর রাণী দেখিলেন, সেই পাহাড়ের রাস্তায়, বনের অন্ধকার হইতে মহারাজার কালো ঘোড়াটা তীরের মতো ছুটিয়া বাহির হইয়া ঝড়ের মতো কেল্লায় ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

চলিত রীতি : একসময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল। তারপর রাণী দেখলেন, সে পাহাড়ের রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে মহারাজের কালো ঘোড়াটা তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

১৩। **সাধু রীতি :** এক রাজা তাহার হেকিমের একখানি পুস্তক কোনোক্রমেই বাগাইতে না পারিয়া তাহাকে খুন করেন। পুস্তক হস্তগত হইল। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পুস্তকটি পড়িতেছেন; কিন্তু পাতায় পাতায় এমন জুড়িয়া গিয়াছে যে, বারবার অঙ্গুলি দ্বারা মুখ হইতে থুথু লইয়া জোড়া ছাড়াইয়া পাতা উল্টাইতেছেন। এইদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছিলেন।

চলিত রীতি : এক রাজা তার হেকিমের একখানা বই কিছুতেই বাগাতে না পেরে তাকে খুন করেন। বই হস্তগত হলো। রাজা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বইখানা পড়ছেন; কিন্তু পাতাগুলো এমনি জুড়ে গেছে যে, রাজা বারবার আঙুল দিয়ে মুখ থেকে থুথু নিয়ে জোড়া ছাড়িয়ে পাতা উল্টাচ্ছেন। এদিকে হেকিম আপন মৃত্যুর জন্য তৈরি ছিলেন বলে প্রতিশোধের ব্যবস্থাও করে গেছেন।

১৪। **সাধু রীতি :** এই চক্র ছিন্ন তো করিতেই হইবে। করিবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন। কারণ ঐ দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা লইতে নারাজ।

চলিত রীতি : এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন। কারণ ওই দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ।

১৫। **সাধু রীতি :** মিনিট পনেরো এইভাবে কাটিল। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছিলাম, প্রায়ই দেখিতেছি কাছাকাছি একটা জনার ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া ছপাৎ করিয়া শব্দ হইতেছে।

চলিত রীতি : মিনিট পনেরো এভাবে কাটল। আর একটা জিনিস দেখছিলাম, প্রায়ই দেখছি কাছাকাছি একটা জনার ভুট্টা গাছের ডগা ভয়ানক নড়েচড়ে ছপাৎ করে শব্দ হচ্ছে।

১৬। **সাধু রীতি :** অতএব দাঁড়াইল এই যে, আমাদের বই পড়িতেই হইবে। কেননা বই পড়া ব্যতীত সাহিত্য চর্চার উপায়ন্তর নাই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে; দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাদুঘরে; কিন্তু

সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। এই চর্চা মানুষ কারখানাতেও করিতে পারে না; চিড়িয়াখানাতেও নহে।

চলিত রীতি : অতএব দাঁড়াল এরূপ যে, আমাদের বই পড়তেই হবে। কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্যচর্চার উপায়ন্তর নেই। ধর্মের চর্চা চাই কি মন্দিরের বাইরেও করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্যের চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরি। এ চর্চা মানুষ কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।

১৭। **সাধু রীতি :** মানুষ কোনোদিন উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে নাই; থাকিতে পারে না। উপাস্যের সন্ধানে ও নির্বাচনে তাহার ভুল হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আত্মার অভ্যন্তরীণ তৃষ্ণার্ত মানুষ চিরদিন বৃহত্তর শক্তির সম্মুখে দেহ ও মস্তক অবনত করিয়া আসিতেছে।

চলিত রীতি : মানুষ কোনোদিন উপাসনা না করে থাকতে পারেনি, থাকতে পারে না। উপাস্যের সন্ধানে ও নির্বাচনে তার ভুল হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু আত্মার অভ্যন্তরীণ পিপাসিত মানুষ চিরদিন বৃহত্তর শক্তির সামনে দেহ ও মাথা অবনত করে আসছে।

১৮। **সাধু রীতি :** প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সর্পের মস্তকে মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে; কিন্তু তাই বলিয়া মণি লাভের নিমিত্ত বিষধর সর্পের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে।

চলিত রীতি : প্রবাদ আছে যে, কোনো কোনো বিষধর সাপের মাথায় মণি থাকে। মণি মহামূল্যবান পদার্থ বটে; কিন্তু তা বলে মণি লাভের জন্য বিষধর সাপের সাহচর্য করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

১৯। **সাধু রীতি :** বার্ধক্য তাহাই– যাহা পুরাতনকে, মৃত্যুকে, মিথ্যাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে। বৃদ্ধ তাহারাই– যাহারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নহে, বিঘ্ন; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলিবার ছন্দে ছন্দ মিলাইয়া যাহারা কুচকাওয়াজ করিতে জানে না, পারে না।

চলিত রীতি : বার্ধক্য তাই– যা পুরাতনকে, মৃত্যুকে, মিথ্যাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। বৃদ্ধ তারাই– যারা মায়াচ্ছন্ন নব মানবের অভিনব জয়যাত্রার শুধু বোঝা নয়, বাধা; শতাব্দীর নব যাত্রীর চলার ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে যারা কুচকাওয়াজ করতে জানে না, পারে না।

২০। **সাধু রীতি :** তিনি পথভ্রষ্ট অগণিত মানুষের চিত্তকে দেবপূজার রক্তদেবী হইতে সরাইয়া এক আল্লাহর দিকে রুজু করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় মানুষ অজ্ঞতার কুহেলি কাটাইয়া আলোর দিকে আগাইয়া চলিতেছে, তবুও তাঁহার মনে প্রশ্ন জাগে তিনি কি তাঁহার কর্তব্য সঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন।

চলিত রীতি : তিনি পথভ্রষ্ট অগণিত মানুষের চিত্তকে দেব পূজার রক্তদেবী হতে সরিয়ে এক আল্লাহর দিকে রুজু করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় মানুষ অজ্ঞতার কুহেলি কাটিয়ে আলোর দিকে এগিয়ে চলেছে, তবুও তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে তিনি কি তাঁর কর্তব্য সঠিকভাবে শেষ করতে পেরেছেন।

২১। **সাধু রীতি :** একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি এটা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময়

পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না। লজ্জাবশত আমি তাহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

চলিত রীতি : একদিন আশ্রয়দাতা আমাকে বললেন, এ সময় বহু লোক বাগদাদ যাচ্ছে। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আপনি এর চেয়ে বেশি সুবিধার সময় পাবেন না। আমি রাজি হলাম। আমার সাথে কোনো অর্থ ছিল না, লজ্জায় আমি তাঁর কাছে সে কথা প্রকাশ করতে পারলাম না।

২২। **সাধু রীতি :** কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার আঁচল ধরিয়া কে টানিতেছে; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন।

চলিত রীতি : কয়েক পা গিয়ে, শকুন্তলার যাওয়া থেমে গেল। শকুন্তলা, আমার আঁচল ধরে কে টানছে, এ বলে মুখ ফেরালেন।

২৩। **সাধু রীতি :** তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তাহারই যাহার শক্তি অপরিমেয়, গতি ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যাহার আশা, ক্লান্তিহীন যাহার উৎসাহ, বিরাট যাহার ঔদার্য, অফুরন্ত যাহার প্রাণ, অটল যাহার সাধনা, মৃত্যু যাহার মুঠি তলে।

চলিত রীতি : তরুণ নামের জয়মুকুট শুধু তারই যার শক্তি অপরিমেয়, গতি ঝঞ্ঝার ন্যায়, তেজ নির্মেঘ আষাঢ় মধ্যাহ্নের মার্তণ্ডপ্রায়, বিপুল যার আশা, ক্লান্তিহীন যার উৎসাহ, বিরাট যার ঔদার্য, অফুরন্ত যার প্রাণ, অটল যার সাধনা, মরণ যার মুঠো তলে।

২৪। **সাধু রীতি :** মাধুরী উঠিয়া দাঁড়ায় এবং অগ্রসর হইয়া আসে। নিস্তব্ধ বিশ্রামাগারে দুঃসহ মুহূর্তগুলির পেষণ হইতে যেন তাহার আত্মা এতক্ষণে মুক্তি পাইয়াছে। শতদলের স্বচ্ছন্দ হাসির শব্দে মাধুরীর ক্লিষ্ট মনের গাম্ভীর্য ভাঙ্গিয়া যায়। শতদলের হাত হইতে গ্লাসটি লইয়া হাসিমুখেই বলে, তুমি বস।

চলিত রীতি : মাধুরী উঠে দাঁড়ায় এবং এগিয়ে আসে। নিস্তব্ধ বিশ্রামাগারে দুঃসহ মুহূর্তগুলোর পেষণ থেকে যেন তার আত্মা এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে। শতদলের স্বচ্ছন্দ হাসির শব্দে মাধুরীর ক্লিষ্ট মনের গাম্ভীর্য ভেঙে যায়। হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে হাসিমুখেই বলে, তুমি বস।

২৫। **সাধু রীতি :** দেখিয়াছি, ইতিহাসে যখন প্রভাত হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গেই উত্তরে-দক্ষিণে-পশ্চিমেও আলো ছড়াইয়া পড়ে। এক এক ইঞ্চি করিয়া ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হইত, তবে মহাকালকেও হার মানিতে হইত।

চলিত রীতি : দেখেছি, ইতিহাসে যখন ভোর হয় সূর্য তখন পূর্বদিকে ওঠে বটে; কিন্তু সে সাথেই উত্তরে-দক্ষিণে-পশ্চিমেও আলো ছড়িয়ে পড়ে। এক এক ইঞ্চি করে ধাপে ধাপে যদি জাতির উন্নতি হতো, তবে মহাকালকেও হার মানতে হতো।

২৬। **সাধু রীতি :** প্রতিটি সমাজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থা এবং বিভিন্ন প্রকৃতির লোকসকল বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অভ্যন্তরে বিবিধরূপে পরিবর্তন সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্তনস্রোত চিরকাল সমান বেগে চলে না।

চলিত রীতি : সব সমাজেই নানা অবস্থার আর নানা মেজাজের লোক থাকে। তাদের একে অন্যের মেলামেশায় সমাজের ভেতর নানারকম বদল হয়। কিন্তু সেরূপ বদলের ধারা সবসময় সমান বেগে চলে না।

২৭। **সাধু রীতি :** আমি যৌবনের পূজারী কবি বলিয়াই যদি আমায় আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই।

চলিত রীতি : আমি যৌবনের পূজারী কবি বলেই যদি আমাকে আপনারা আপনাদের মালার মধ্যমণি করে থাকেন, তাহলে আমার অভিযোগ করার কিছুই নেই।

২৮। **সাধু রীতি :** দেখিলাম, এই সতেরো বৎসরের মেয়েটির উপরে যৌবনের সমস্ত আলো আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল হইতে সে জাগিয়া উঠে নাই। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু বরফ এখনো গলিল না।

চলিত রীতি : দেখলাম, এ সতেরো বছরের মেয়েটির ওপর যৌবনের সমস্ত আলো এসে পড়েছে, কিন্তু এখনো কৈশোরের কোল থেকে সে জেগে ওঠেনি। ঠিক যেন শৈলচূড়ার বরফের উপর সকালের আলো ঠিকরিয়ে পড়ছে; কিন্তু বরফ এখনো গলল না।

২৯। **সাধু রীতি :** তিনি বলিলেন, "যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। এখন ফিরিয়া তাকাইতে গেলে দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিতে যাইবার মত এমন বিড়ম্বনা আর নাই।"

চলিত রীতি : তিনি বললেন, "যা দিলাম তা উজাড় করেই দিলাম। এখন ফিরে তাকাতে গেলে দুঃখ পেতে হবে। অধিকার ছেড়ে দিয়ে অধিকার রাখতে যাওয়ার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নেই।"

৩০। **সাধু রীতি :** তাহাকে আমি সব দিতে পারি; কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না—তাহা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সেই জন্যই কলকাতার গলিতে ঐ গরাদের ফাঁক দিয়া নির্বাক আকাশের সঙ্গে তাহার নির্বাক মনের কথা হয় এবং এক এক দিন রাত্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দেখি, সে বিছানায় নাই; হাতের উপর মাথা রাখিয়া আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলিয়া ছাদে শুইয়া আছে।

চলিত রীতি : তাকে আমি সব দিতে পারি; কিন্তু মুক্তি দিতে পারি না— তা আমার নিজের মধ্যে কোথায়? সে জন্যই কলকাতার গলিতে ওই গরাদের ফাঁক দিয়ে নির্বাক আকাশের সাথে তার নির্বাক মনের কথা হয় এবং এক-এক দিন রাতে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি, সে বিছানায় নেই; হাতের উপর মাথা রেখে আকাশভরা তারার দিকে মুখ তুলে ছাদে শুয়ে আছে।

৩১। **সাধু রীতি :** শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোল হইল; কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোল, সমাজের ষোল নহে। কেহ তাহাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হইতে পরামর্শ দেয় নাই, সেও আপন বয়সটার দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

চলিত রীতি : শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলো হলো; কিন্তু সেটি স্বভাবের ষোলো, সমাজের ষোলো নয়। কেউ তাকে আপন বয়সের জন্য সতর্ক হতে পরামর্শ দেয়নি, সেও আপন বয়সটির দিকে ফিরেও তাকাত না।

৩২। **সাধু রীতি :** যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়া প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর দ্বারেই স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরিয়া গৌরব করিবার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরো হইয়া আছে; এখন শুধু ইংরেজকে কষিয়া গালিগালাজ করিতে পারিলে দেশটা উদ্ধার হইয়া যায়।

চলিত রীতি : যুগে যুগে সঞ্চিত হয়ে প্রায় প্রত্যেক পল্লিবাসীর কাছেই স্তূপাকার হয়ে উঠেছে। এই দক্ষিণ বঙ্গের অনেক পল্লিতে অনেকদিন ঘুরে গৌরব করার মতো অনেক বড় বড় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। চরিত্রেই বল, ধর্মেই বল, সমাজেই বল, আর বিদ্যাতেই বল, শিক্ষা একেবারেই পুরো হয়ে আছে; এখন শুধু ইংরেজকে কষে গালাগাল করতে পারলে দেশটি উদ্ধার হয়ে যায়।

৩৩। **সাধু রীতি :** যেই প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনো হয় নাই তাহার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হইলেও তাহা অল্পশিক্ষিত লোককে বুঝানো যায় না। সরল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ্য হইতে পারে। যাহাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি সবগুলির উত্তর নাও জানিতে পারেন।

চলিত রীতি : যে প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনো হয়নি তার উত্তর দেওয়া অবশ্য অসম্ভব। অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর হলেও তা অল্পশিক্ষিত লোককে বোঝানো যায় না। সরল প্রশ্নের উত্তরও অতি দুর্বোধ্য হতে পারে। যাকে প্রশ্ন করা হয় তিনি সবগুলোর উত্তর নাও জানতে পারেন।

চলিত রীতি হতে সাধু রীতিতে রূপান্তর

১। **চলিত রীতি :** সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভেতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে সেটি ভুলে গেলেই লেখকরা নিজে খেলা না করে পরের জন্য খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।

সাধু রীতি : সাহিত্যের উদ্দেশ্য সবাইকে আনন্দ দেওয়া, কাহারও মনোরঞ্জন করা নহে। এই দুইয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে সেইটি ভুলিয়া গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করিয়া পরের জন্য খেলনা তৈয়ার করিতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করিতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হইয়া পড়ে তাহার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নহে।

২। **চলিত রীতি :** আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নেই। এমনকি, এক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নেই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তার বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

সাধু রীতি : আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেহ কাহাকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। আজিকার বাজারে বিদ্যাদাতার অভাব নাই। এমনকি, এই ক্ষেত্রে দাতাকর্ণেরও অভাব নাই এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাহাদের দ্বারস্থ করিয়াই নিশ্চিত থাকি এই বিশ্বাসে যে, সেইখান হইতে তাহারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিবে, যাহার সুদে তাহার বাকি জীবন আরামে কাটাইয়া দিতে পারিবে। কিন্তু এই বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক।

৩। **চলিত রীতি :** ফুটো কলসিতে জল তুলতে গেলে জল যে পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের ওপর চোখ রাঙিয়ে লাভ কী? গরজ আমাদের যতই থাক, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের মতোই ব্যবহার করবে।

সাধু রীতি : ছিদ্রযুক্ত কলসিতে জল উত্তোলন করিতে গেলে জল যে পড়িয়া যায়, তাহা লইয়া জলের উপরে চোখ রাঙাইয়া লাভ কী? প্রয়োজন আমাদের যতই থাকুক, ছিদ্রটা স্বভাবত ছিদ্রের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

৪। **চলিত রীতি :** তপুকে আবার ফিরে পাবো, একথা ভুলেও ভাবিনি কোনোদিন। তবু সে আবার ফিরে এসেছে আমাদের মাঝে। ভাবতে অবাক লাগে, যাকে জীবনে দেখবো বলে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি, সেই তপু ফিরে এসেছে।

সাধু রীতি : তপুকে ফিরিয়া পাইব, এই কথা ভুলিয়াও ভাবি নাই কোনোদিন। তথাপি সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে আমাদের মধ্যে। ভাবিতে অবাক লাগে, যাহাকে জীবনে দেখিব বলিয়া স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই, সেই তপু ফিরিয়া আসিয়াছে।

৫। **চলিত রীতি :** যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তাছাড়া, বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না, তখন অন্তত একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি।

সাধু রীতি : যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিলিলে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিলিলে কেন যে তাহা কবিতা না হইয়া পদ্য হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাহা ছাড়া, বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মিলে না, তখন অন্তত একটা স্থান থাকা প্রয়োজন যেখানে তাহা মিলিবে এবং সেই দেশ হইতেছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি।

৬। **চলিত রীতি :** সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডেকে আনল এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর, সে খ্রিস্টান হবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করলে; উপদেশ দিলে, ধর্ম ত্যাগ ভালো নয়– শোনা কথা বলছি, ধরে নাও তা হতেও পারে। নৌকা ঠেলে দিয়ে বিয়াইকে 'আজ থাকলে হতো' বলার মতো।

সাধু রীতি : সৌদামিনী ব্রাদার জনকে ডাকিয়া আনিল এক সপ্তাহ অপেক্ষার পর। সে খ্রিস্টান হইবে। ব্রাদার জন প্রথমে বারণ করিল, উপদেশ দিল, ধর্ম ত্যাগ ভালো নহে– শোনা কথা বলিতেছি, ধরিয়া নাও তাহা হইতেও পারে। নৌকা ঠেলিয়া দিয়া বিহাইকে "অদ্য থাকিলে হইত" বলিবার মতো।

৭। **চলিত রীতি :** ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত ঝরেছিল, সেদিন থেকেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা।

সাধু রীতি : ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। প্রথম যেইদিন বাংলা ভাষার জন্য বাঙালির রক্ত ঝরিয়াছিল, সেই দিন হইতেই দীর্ঘ পরাধীনতার পর বাঙালির স্বাধীনতার পথে যাত্রা।

৮। **চলিত রীতি :** সে ছেলেবেলায় কবে কোনকালে দেখেছি রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে নীল-সাদায় নক্‌শা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গা-ময় ফুটো, উপরে টানিয়ে রাখত। ভেতরে চোঙের মতো কি একটা ছিল, তাতে খাবার দেওয়া হত। পাখিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বেরুচ্ছে।

সাধু রীতি : সেই ছেলেবেলায় কবে কোনকালে দেখিয়াছি রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে নীল-সাদায় নকশা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গাত্রময় ছিদ্র, উপরে টাঙ্গাইয়া রাখিত।

ভিতরে চোঙের মত কি একটা ছিল, তাহাতে খাদ্য দেওয়া হইত। পাখিরা সেই ছিদ্র দিয়া আসিত আর খাবার খাইয়া অন্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকিতেছে আর বাহির হইতেছে।

৯। **চলিত রীতি :** সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলে সুন্দরের স্বর্গলোকে যেতে চায় না। সে বলে, স্বর্গ যদি থাকেই তবে আমাদের সাধনা দিয়ে এই ধুলার ধরাতেই নামিয়ে আনব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তার দাসীপনা করেছে, আজ তাকেই এনে আমাদের মাটির মায়ের দাসী করব।

সাধু রীতি : সে এই দুঃখের ধরণীকে ফেলিয়া সুন্দরের স্বর্গলোকে যাইতে চাহে না। সে বলে, স্বর্গ যদি থাকেই তবে আমাদের সাধনা দিয়া এই ধূলির ধরাতেই নামাইয়া আনিব। আমাদের পৃথিবীই চিরদিন তাহার দাসীপনা করিয়াছে, আজ তাহাকেই আনিয়া আমাদের মাটির মায়ের দাসী করিব।

১০। **চলিত রীতি :** একসময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটি গোলমাল উঠল। তারপর রানি দেখলেন, সেই পাহাড়ের রাস্তায়, বনের অন্ধকার হতে মহারাজের কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বের হয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

সাধু রীতি : একসময় হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটি গোলমাল উঠিল। তাহার পর রাণী দেখিলেন, সেই পাহাড়ের রাস্তায়, বনের অন্ধকার হইতে মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মত ছুটিয়া বাহির হইয়া ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

১১। **চলিত রীতি :** বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারিনে। কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তাছাড়া যা আছে তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না।

সাধু রীতি : বার্ধক্যকে বাল্যের পার্শ্বে আনিয়া ফেলিলেও আমরা তাহার মিলন সাধন করিতে পারি না। কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়া দুইটি পদকে জুড়িয়া এক করা যায় না। এতদ্ব্যতীত যাহা আছে তাহা নাই বলিলেও তাহার অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায় না। এই বিশ্বকে মায়া বলিলেও তাহা অস্পৃশ্য হইয়া যায় না এবং আত্মাকে ছায়া বলিলেও তাহা অদৃশ্য হইয়া যায় না।

১২। **চলিত রীতি :** এ চক্র ছিন্ন তো করতেই হবে। করবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন। কারণ ওই দিয়ে সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা নিতে নারাজ।

সাধু রীতি : এই চক্র ছিন্ন তো করিতেই হইবে। করিবে কে? প্রকাশক না ক্রেতা? প্রকাশকের পক্ষে করা কঠিন। কারণ উহা দিয়া সে পেটের ভাত যোগাড় করে। সে ঝুঁকিটা লইতে নারাজ।

১৩। **চলিত রীতি :** একজন চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে সনেট লেখতেন। একদিন হঠাৎ দেখেন তিনি আর লেখতে পারছেন না। ভাব আছে প্রচুর; কিন্তু তার অভিব্যক্তি নেই। তার একজন বন্ধুকে তিনি বললেন, তার মনে ভাব-সম্পদের অভাব নেই; কিন্তু কেন যেন তা প্রকাশ পাচ্ছে না।

সাধু রীতি : একজন চিত্রকর ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে সনেট লিখিতেন। একদিন হঠাৎ দেখিলেন তিনি আর লিখিতে পারিতেছেন না। ভাব আছে অতিশয়; কিন্তু তাহার অভিব্যক্তি নাই। তাহার একজন বন্ধুকে তিনি বলিলেন, তাহার মনে ভাব-সম্পদের অভাব নাই; কিন্তু কেন যেন তাহা প্রকাশ পাইতেছে না।

আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা

» প্রশ্ন : ৩৫ ॥ আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা : ভাষা নদীর স্রোতের ন্যায় সর্বদা প্রবহমান। পৃথিবীর প্রায় সব স্বীকৃত ভাষারই নিজস্ব একাধিক রূপ রয়েছে। আবহমানকালের ধারায় জাতি, অঞ্চল ও সংস্কৃতিভিত্তিক এ রূপগুলো গড়ে ওঠে। তেমনি বাংলা ভাষারও বিভিন্ন রূপ রয়েছে। বাংলায় লেখ্য ভাষার নির্দিষ্ট একটা রূপ থাকলেও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষার সেরকম কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষার যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়, তাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলে। 'উপভাষা' শব্দটি প্রথম ইংরেজিতে ব্যবহৃত হয় ষোলো শতকে। গ্রিক ভাষায় 'উপভাষা'র অর্থ ছিল 'কথা বলার প্রকৃতি'। প্রাচীন ইংরেজিতে 'উপভাষা'র অর্থ ছিল 'কথা বলার ধরন'– বিশেষ সম্প্রদায় দ্বারা অনুসৃত ভাষারূপ।

কোনো মূল ভাষার একটি বড় অঞ্চলের অনেক লোকের মুখের ভাষাই আঞ্চলিক ভাষা। পৃথিবীর সব ভাষারই এমন আঞ্চলিক ভাষা রয়েছে। ভাষার জীবন্ত রূপ এর মধ্যেই পাওয়া যায়। মাতৃদুগ্ধ পান করে শিশু যেমন তার দেহমন গড়ে তোলে, তেমনি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে মানুষ তার আবেগ ও মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সমূলার বলেছেন– The real and natural life of language is in its dialect. যে-কোনো ভাষার এক বা একাধিক বৈচিত্র্যের গুচ্ছ ফসল হলো আঞ্চলিক বা উপভাষা।

বাংলাদেশের উপভাষাসমূহে রূপতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য অধিক এবং তা তিনটি ক্ষেত্রে সর্বাধিক– সর্বনাম, কারক বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি। যেমন– সর্বনামের 'আমি' উপভাষার রূপ বরিশালে 'মুই' নোয়াখালীতে 'আঁই'। 'আমার' শব্দটি বরিশালে 'মোর', নোয়াখালীতে 'আঁর'। 'আমাদের' শব্দটি রংপুরে 'হামরার', ময়মনসিংহে 'আমরার', কুমিল্লায় 'আমাগো', বরিশালে 'মোগো' ইত্যাদি।

আঞ্চলিক ভাষার নমুনা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে আঞ্চলিক ভাষার নমুনা দিয়েছেন এভাবে–

সাধু ভাষা	:	একজন লোকের দুইটি ছেলে ছিল।
কলকাতা-নদীয়া	:	অ্যাকজন লোকের দুটো ছেলে ছিল।
খুলনা-যশোর	:	অ্যাকজন মান্‌সির দুটো ছাওয়াল ছিল।
মানভূম	:	এক লোকের দুটো বেটা ছিল।
মেদিনীপুর	:	এক লোক্কার দুট পো থাইল।
মালদহ	:	য়্যাক ঝোন ম্যানশের দুটো ব্যাটা আছ্‌লো।
বগুড়া	:	য়্যাক ঝনের দুই ব্যাটা ছৈল আছিল।
রংপুর	:	একজন ম্যানশের দুইক্‌না ব্যাটা আছিলো।
ময়মনসিংহ	:	য়্যাক জনের দুই পুৎ আছিল্‌।
সিলেট	:	এক মানুশর দুই পোয়া আছিল।
চট্টগ্রাম	:	এগুয়া মানশের দুয়া পোয়া আছিল্‌।
নোয়াখালী	:	একজনের দুই হুত আছিল্‌।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৬ ॥ বাংলা উপভাষার প্রধান প্রধান শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।

উত্তর ।। বাংলা উপভাষার শ্রেণিবিভাগ : অন্যসব ভাষার মতো বাংলা ভাষারও উপভাষা রয়েছে। বাংলা ভাষার শ্রেণিবিভাগে যাদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তারা হলেন– জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও পরেশচন্দ্র মজুমদার।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ODBL' গ্রন্থে চারটি প্রধান শাখায় বাংলা উপভাষার শ্রেণিকরণের নির্দেশ করেছেন। নিচে তার নির্দেশিত উপভাষার বিভাজন দেখানো হলো–

ক. **রাঢ়ী উপভাষা :** ১. দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা, দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুর। ২. রাঢ়ী পশ্চিম অঞ্চলীয় উপভাষা দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– পশ্চিম প্রান্তীয় অঞ্চল ও পূর্ব প্রান্তীয় অঞ্চল। এ অঞ্চলগুলো হলো– সাঁওতাল পরগনা, পশ্চিম বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম, সিংভূম ও উত্তর মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম নদীয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, কোলকাতাসহ চব্বিশ পরগনা।

খ. **বরেন্দ্রীয় উপভাষা :** মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা ও বগুড়া।

গ. **কামরূপ উপভাষা :** কামরূপ উপভাষা পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল– এ দুই শাখায় বিভক্ত। পূর্বাঞ্চলে আসাম এবং পশ্চিমাঞ্চলে জলপাইগুড়ি, পূর্বপূর্ণিয়া, দক্ষিণ দার্জিলিং, দিনাজপুর, কুচবিহার, রংপুর ও পশ্চিম গোয়ালপাড়া অন্তর্ভুক্ত।

ঘ. **বঙ্গ উপভাষা :** বঙ্গ উপভাষা পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্বাঞ্চলীয় ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় এ দুটি শাখায় বিভক্ত। পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম উপশাখার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলগুলো হলো– ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, উত্তর-পূর্ব নদীয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, সন্দ্বীপ ও উত্তর-পশ্চিম সিলেট। পূর্ব-সিলেট, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম (চাকমা) পূর্বাঞ্চলীয় ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় শাখাভুক্ত অঞ্চল।

▸▸ প্রশ্ন : ৩৭ ॥ আঞ্চলিক ভাষাচর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

উত্তর ।। আঞ্চলিক ভাষাচর্চার ইতিহাস : আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা চর্চার ইতিহাস বহু প্রাচীন। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় উপভাষা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর শব্দ, অর্থ, উচ্চারণ, শব্দগঠন প্রকৃতি ও বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়।

প্রথম উপভাষা চর্চার ইতিহাস শুরু হয় ১৮৭৬ সালে জার্মান উপভাষাবিদ জর্জ ওয়েংকারের (George Wenker) Deutscher sprachatlas প্রকাশের মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে তার পদ্ধতিগত দুর্বলতা সংশোধিত হয় জুলস গিলেরঁও (Jules Gillieron)-এর "Atlas Linguistique dela France" (১৯০২-১৯১০) গবেষণা গ্রন্থে। পরবর্তীকালে জ্যাবার্গ (Jaberg) ও জাড (Jud) নামে দুজন সুইস বিশেষজ্ঞ ইতালি ও দক্ষিণ সুইজারল্যান্ডের উপভাষা সংগ্রহ করে (১৯২৫-১৯৪০) উপভাষা গবেষণায় অগ্রগতি সাধন করেন।

'ইংলিশ ডায়ালেক্ট সোসাইটি' উপভাষা সমিতির মধ্যে সর্বপ্রাচীন। ইংলিশ ডায়ালেক্ট সোসাইটির অবলুপ্তির পর 'ইয়র্কশায়ার ডায়ালেক্ট সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৭ সালে। আমেরিকায় উপভাষা সংকলনের নিমিত্ত ১৮৮৯ সালে গঠিত হয় 'আমেরিকান ডায়ালেক্ট সোসাইটি'।

ইউরোপ-আমেরিকার মতো বাংলা উপভাষা সংগ্রহ ও চর্চায় তেমন ব্যাপকতা লক্ষ করা যায় না। বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক চট্টগ্রাম, সিলেট, নোয়াখালী, রাজশাহী ও ঢাকা অঞ্চলের উপভাষার ওপর গবেষণা করলেও উপভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ব্রিটিশ আমলে স্যার জর্জ এ. গ্রীয়ার্সন এগারো খণ্ডে ভারতীয় উপভাষার বিশ্লেষণ করেন (লিঙ্গুয়িসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া)। প্রথম খণ্ডগুলোতে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার নমুনা ও

ভারতীয় ভাষার বিশ্লেষণ উপস্থাপিত। পরবর্তীকালে গ্রীয়ার্সন ছাড়া অন্য কোনো ভাষাতত্ত্ববিদ এমন বিস্তৃতভাবে ভারতীয় ভাষার বিশ্লেষণ করেননি। অতঃপর বাংলা একাডেমির উদ্যোগে শব্দ সংগ্রহের জন্য একটি নমুনা ফর্ম তৈরি করা হয় এবং তা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক, ক্লাব ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়। প্রথম পর্যায়ে ছিয়ানব্বই জন সংগ্রাহকের একুশ হাজার শব্দ এবং পরবর্তী পর্যায়ে ৪৫৩ জন সংগ্রাহকের ১,৬৬,২৪৬টি আঞ্চলিক শব্দের একটি অভিধান সংকলনের দায়িত্ব প্রদানের পর ১৯৬৫ সালে অভিধানের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। প্রথমদিকে ছোট ছোট খণ্ডে আঞ্চলিক অভিধান প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তী পর্যায়ে মোট দুই খণ্ডে এ অভিধান প্রকাশিত হয়।

এখানে উল্লেখ্য, জর্জ গ্রীয়ার্সন ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আঞ্চলিক ভাষা-বিশ্লেষণ ও আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রণয়ন ছাড়া আঞ্চলিক ভাষার মানচিত্র বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দিকের ওপর তেমন বিস্তৃত কাজ হয়নি।

▸▸প্রশ্ন : ৩৮ ॥ নিচের আঞ্চলিক শব্দগুলোর অর্থ চলিত ভাষায় প্রকাশ কর।

উত্তর ॥ আঞ্চলিক শব্দগুলোর অর্থ চলিত ভাষায় প্রকাশ : নিচে প্রদত্ত আঞ্চলিক শব্দগুলোর অর্থ চলিত ভাষায় প্রকাশ করা হলো–

আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা	আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা
অনেরা	আপনারা	অকতিয়া	সাময়িক
অক্‌খন্	এখন	আবাগী	অভাগী
আঁই	আমি	আসলে	বাস্তবিক
আঁডু	হাঁটু	ইচা মাছ	চিংড়ি
ইলসা	ইলিশ মাছ	উরুম	মুড়ি
এউগা	একটা	কনথে	কোথা হতে/ কোত্থেকে
কনে	কোথায়	কামলা	মজুর
কেইছা	কেঁচো	কৈতর/কতুর	কবুতর
কুত্তা	কুকুর	কাউয়া	কাক
কলুই	কলাই	কাদো	কর্দম
কাঁকুই	চিরুনি	খসখসা	অমসৃণ
খড়ি	জ্বালানি	খাড়া	দাঁড়ান
খাপ	মলাট	খাম	ঘরের খুঁটি
খামখা	অনর্থক	খেদান	তাড়াইয়া দেওয়া
ঘলু	কলু	গাছা	কাঁটা
গিরু	গাঁইট	গোসা	অভিমান
গোম	গম	গৈয়া	পালাগান বিশেষ
ঘুড্ডি	ঘুড়ি	ঘাও	ঘা
ঘিলু	মস্তিষ্ক	ঘুট্‌ঘুটা	খুব আঁধার

আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা	আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা
চঙ্গা	মই	চাকু	ছুরি
চিক্কার	চিৎকার	চুকা	টক
চেংরাপানা	ছেলেমি	চোট্টা	প্রবঞ্চক
চোচা	ফলের খোসা	চট্	মাদুর
ছঞ্চা	ঘরের চালের অধোপ্রান্ত	ছাও	ছানা, শাবক
ছেমড়া	ছোকরা	ছোচা	লোভী
ছ্যামায়	ছায়ায়	ছাইপোকা	ছারপোকা
ছোন	খড়	জামির	জাম্বুরা
জিগাইলে	জিজ্ঞেস করলে	জুনিপোকা	জোনাকি পোকা
জুইত	সুবিধা	ডর	ভয়
ঢাহা	ঢাকা	তগো	তোমাদের
তর	তোর	তগো লাইগা	তোমাদের জন্য
ত্যানা	ন্যাকড়া	থাপ্পড়	চপেটাঘাত
থাপা	থাবা	থোওন	রাখন
পলান	লুকিয়ে থাকা	পেরথম	প্রথম
পাও	পা	পালান	বাগিচা
পোলা	ছেলে	পোলাপান	ছেলেপিলে
পানিকাউর	পানকৌড়ি	ফলনা দফনা	অমুক তমুক
ফাল	লাফ	ফালা	ছিন্ন
ফুটা	ছিদ্র	ফাৎরা লোক	খারাপ লোক
বউল	মুকুল	বরই	কুল
বাঙ্গি	ফুটি	বীচি	বীজ
বিহান	প্রাতঃকাল/ সকাল	বেবাক	সমুদয়
বোচা	খাঁদা নাক	বাইগুন	বেগুন
বইন	বোন	বল্লা	বোলতা
বিলাই	বিড়াল	মস্তরাম	খুব বড়
ম.ইচা	চেয়ার	মাইয়া	মেয়ে
মাইনষে	মানুষে	মাজা	কোমর
মাকর	মাকড়শা	মিস্তি	মুটে, কুলি
মোছ	গোঁফ	মোটে	কেবল
যুয়ান	যুবক	যাতা লাগা	চাপ পাওয়া

আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা	আঞ্চলিক/ উপভাষা	চলিত ভাষা
রান্ধারঘর	রান্নাঘর	লগে	সঙ্গে
লাইগা	লাগি	লোগ	আঙুল
শলা	বড় ঝাঁটা	শরীল	শরীর
শুধাশুধি	মিছামিছি	সামলান	লুকিয়ে রাখা
সারোক	শালিক	সেলেট	স্লেট
হ	হ্যাঁ	হাউস	সাধ
হাচন	ঝাঁটা	হানি	পানি
হান	পান	হিমড়াঁ	পিঁপড়া

▸▸ প্রশ্ন : ৩৯ ॥ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বা উপভাষার কতিপয় নমুনা উল্লেখ কর।

উত্তর ॥ বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা : বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বা উপভাষার কিছু নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা	চলিত রূপ
আঁই কাইল আসিয়ুম।	আমি কাল আসব।
আঁই তোয়ার পোলা না, বা-জান?	আমি তোমার ছেলে না, বাবা?
আমারে মিয়া মাইর‍্যা ফালাইছে এক্কেরে।	আমারে ভাই মেরে ফেলেছে একেবারে।
ঠিক করলাম, রাস্তার লইগ্যা দিমু জমিটা ছাড়ইয়া।	ঠিক করলাম, রাস্তার জন্য জমিটা ছেড়ে দেব।
থুইয়া দেও হের কথা। নোতুন কোনো জিনিস করতে গেলে একদল মানুষ চাইর দিক দিয়া এরহম বাধা দেয়ই।	রেখে দাও তার কথা। নতুন কোনো কিছু করতে গেলে একদল মানুষ চারদিক দিয়ে এ রকম বাধা দিয়েই থাকে।
সড়ক কী এয়ার লাইগ্যা বানাইছেলাম আমরা?	সড়ক কি এর জন্য আমরা বানিয়েছিলাম?
যদি হুজুর ফিরাইয়া দিতে কন তহন নাহয় কানে আইট্যা ফিরত দিয়া যাইমু।	যদি হুজুর ফিরিয়ে দিতে বলেন, তখন না হয় কানে ধরে ফেরত দিয়ে যাব।
বা'জান কেমুন কইর‍্যা লেইখ্যা রাখছিল?	বাবা, কেমন করে লিখে রেখেছিল?
দ্যাহো, চুলের লাহান সোতের গেরো।	দেখ, চুলের মতো স্রোতের গিঁট।
বড় জবর পীরিত, মিয়া বাই, শাদী করেন এবার। ভাবী-সাব ত বহুত জমানা এনতাকাল করছেন।	বড়ো বেশি ভালোবাসা, মিয়া ভাই, বিয়ে করেন এবার। ভাবী সাহেব তো অনেক দিন হয় মারা গেছেন।
হুজুর নদীর লগে হব গ্যাছে গ্যা।	হুজুর নদীর সাথে সব চলে গেছে।
ডর না করস, বা-জান। হাইল ঝিক্যা দে।	ভয় না করিস, বাবা। বৈঠা জোরে টান দে।
মহাজনের কেরায়া নাউ, নইলে দ্যাহাইতাম হালী নাউ চালান কারে কয়।	মহাজনের ভাড়া করা নৌকা, না হলে দেখাতাম শ্যালিকা নৌকা চালানো কাকে বলে।
বাজান আমার কান্ধার পর হাত রাইখা সাঁতার দিতার।	বাবা, আমার কাঁধের উপর হাত রেখে সাঁতার দিতে পার।

আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা	চলিত রূপ
বিয়ান অইতে দে। আমিও যামু তর লগে।	সকাল হতে দে। আমিও যাব তোর সঙ্গে।
ফের উয়ার সাথে বাতচিত করলি জানে মাইরা দিমু, আল্লার কিরে।	আবার যদি ওর সাথে কথা কাটাকাটি করবি, জীবনে মেরে ফেলব, আল্লাহর কসম।
আর কত দেখবাম?	আর কত দেখব?
বেইল কদ্দুর অইলো?	বেলা কতটুকু হলো?
মগজটা চিলকায়।	মাথাটা চিনচিন করে।
তুমি আঁসতাছো যে?	তুমি হাসছ যে?
নাও লইয়া আইছ, নিয়া যাইবায় বুঝি?	নৌকা নিয়ে এসেছে, নিয়ে যাবে বুঝি?
অ বনমালী সেওৎখান তাড়াতাড়ি বাইর কর।	ও বনমালী, সেঁউতিটি তাড়াতাড়ি বের কর।
শত্তুর শত্তুর। ইটা আমার শত্তুর। অখনই মরুক।	শত্রু, শত্রু। এ আমার শত্রু। এখনি মরুক।
ভাত বাড়নের কত দেরি! কড়া ডিগা মানুষ। ভুখে মরতাছে।	ভাত বাড়তে কত দেরি! ছোট বাচ্চা মানুষ। ক্ষিদেয় মরছে।
আইজ্জের দিনখান সইয়া থাক।	আজকের দিনটি ধৈর্য ধর।
দিশ কইরা পা বাড়াইবি অনন্ত, না হইলে পইড়া যাইবি! যে পিছলা।	সাবধানে পা বাড়াবি অনন্ত, না হলে পড়ে যাবি! যে পিচ্ছিল।
আরে বেইমান কাউয়া, এই সগল কথা তোরে কে শিখাইল, কোন বান্দিনীর ঝিয়ে শিখাইল?	আরে বেঈমান কাক, এসব কথা তোকে কে শেখাল? কোন বাঁদির মেয়ে শেখাল?
ইস, গাও যে আগুনের মত তত্তা	আহা, শরীর যে আগুনের মতো গরম।
জিরানের লাইগা মরস ক্যান ক দেহি? বাড়িত গিয়া সারাডা দিন জিরাইস।	বিশ্রামের জন্য হাপিত্যেশ কেন, বল দেখি? বাড়িতে গিয়ে সারাটা দিন বিশ্রাম করিস।
মাইজাবাবু নি আমাগো বাড়ি আহে তাই জিগায়। ইবার জিগাইলে একদলা পাঁক দিমুনে ছুইড়া মুখের মধ্যে।	মেঝবাবু কি আমাদের বাড়ি আসে তাই জিজ্ঞেস করে। এবার জিজ্ঞেস করলে একদলা কাদা দেবো মুখের উপর ছুঁড়ে।
আমারে না নিয়া ফিরা আলি কুবির?	আমাকে না নিয়ে ফিরে এলি কুবের?
তরেও দিমুনে ব্যানুন।	তোকেও তরকারি দেব।
দিবানি নিয্যস?	সত্যিই কি দিবে?
আলেন আর বিষ্যুদবারে।	এলাম গত বৃহস্পতিবারে।
আমি ময়নাদ্বীপি যামু না কইয়া থুইলাম।	আমি ময়নাদ্বীপে যাবো না বলে রাখলাম।
জান দিয়া তোমাগো দরদ করি, অ্যানে আইজ তোমরা ঘা দিলা, এই দিলের মদ্যি।	জীবন দিয়ে তোমাদের মায়া করি, এখানে আজ তোমরা আঘাত করলা, এই মনের মধ্যে।
আঁই কিচ্ছি?	আমি কী করেছি?
অ্যারে হোন, তুই ঢাকা য্যাই কি করস?	এই শোন, তুই ঢাকাতে কী করিস?
গোপীর লাইগা পেরানডা পোড়ায় মাঝি, স্যায় বুঝি ডরাইয়া কাইন্দা মরে।	গোপীর জন্য প্রাণটা কাঁদে মাঝি, সে বুঝি ভয় পেয়ে কেঁদে মরে।
ময়নাদ্বীপ যামু গিয়া কুবির, কাইজা মনে থুইও না, কসুর মাপ কইরো বাই।	ময়নাদ্বীপ যেতে চাই কুবের, ঝগড়া মনে রেখো না, অপরাধ ক্ষমা করো ভাই।

আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা	চলিত রূপ
তরে চিনা গেলাম কপিলা, পরনাম কইয়রা গেলাম তরে।	তোকে চিনে গেলাম কপিলা, প্রণাম করে গেলাম তোকে।
অগগুয়া বেদোমা জামাইর পরচতাপ।	একজন নির্বোধ জামাইয়ের প্রস্তাব।
এক বাঁঅনর অগগুয়া মুনিষ পোয়া আছিল	এক ব্রাহ্মণের একজন বেটা ছেলে ছিল।
পোয়াউয়ার লেয়া-পরা কিছু না জাননে বউৎ কষ্টে তারে বিআ করান গে-ইল।	ছেলেটা লেখাপড়া কিছু না জানায় বহু কষ্টে তার বিয়ে করানো গেল।
উটান জা'ইছ না বে মেগ'র মাঝে।	বৃষ্টির মধ্যে উঠানে যাসনে।
তুর মাত বুঝি না রে বো।	তোর কথা বুঝিনে।
মা অত গাইলাইন রে বো।	মা খুব গাল দেন রে।
হুরুরতার জ্বালায় আর তাকতাম পালাম না।	ছোট ছেলেমেয়েদের জ্বালায় আর থাকতে পারলাম না।
কও দেখিলো রাজার ঝি, কৈতর লয়্যা করবাম কি?	বল দেখি গো রাজার ঝি, পায়রা লয়ে করব কি?
তোমার সঙ্গে করিয়ে প্রেম নায়ের হল্য মানা	তোমার সাথে প্রেম করায় বাপের বাড়ি যাওয়া নিষেধ।
মনাছিব ছেমরী পাল্যে দরদ ছাড়ে কেডা?	মনের মতো যুবতি পেলে মমতা কে ছাড়ে?
বাবা হোলারে এ্যাকডা কতা জিগাইসে।	বাবা ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করেছে।
গত কাইল রাইত ডাহা থাইক্যা বড় ভাইজান অইচুইন। তাইন আমরার জন্য মেলা কিছু আনচুইন।	গতকাল রাতে ঢাকা থেকে বড় ভাই এসেছেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু এনেছেন।

গ. বাংলা ব্যাকরণ

শব্দ ও শব্দগঠন প্রক্রিয়া

▸▸ প্রশ্ন : ৪০ ॥ শব্দ কাকে বলে? সংক্ষেপে বাংলা শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধির ইতিহাস আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানুষ তার মনের ভাবকে অন্যের নিকট প্রকাশ করার জন্য কথা বলে। এ কথাগুলো হলো কতিপয় অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি। আর এ অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। শব্দ ভাষার অন্যতম মৌলিক উপাদান। বাংলা ভাষা একটি সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ভাষা। হাজার বছরের নানা পরিবর্তন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নানা ভাষী ও জাতির সংস্পর্শে এ ভাষার শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ, উন্নত ও পরিপূর্ণ হয়েছে।

শব্দের সংজ্ঞার্থ

সাধারণ কথায়, মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে শব্দ বলে। যেমন– কলম, আমরা, মা, গোলাপ ইত্যাদি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনি-সমষ্টিকে শব্দ বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে সেই সমাজের নরনারীর ভাষায় শব্দ।"

৩। অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।"

বাংলা শব্দভাণ্ডারের সমৃদ্ধির ইতিহাস

যে ভাষার শব্দভান্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ, সে ভাষা তত উন্নত। ড. হুমায়ুন আজাদের মতে, "যে রাজকোষে যত বেশি মুদ্রা, সে রাজকোষ তত বেশি ধনাঢ্য। ভাষার রাজকোষ ভরে থাকে শব্দে। সোনালি শিকির মতো শব্দ, রুপালি আধুলির মতো শব্দ, ঝলমল করে, চকচক করে। যে ভাষার ভান্ডারে যত বেশি শব্দ সে ভাষা তত বেশি ধনী।"

বাংলা ভাষা একটি শব্দসমৃদ্ধ ভাষা। হাজার বছরের নানা পরিবর্তন-বিবর্তনের মাঝে অজস্র শব্দ জমেছে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারে। নদীর স্রোতের ন্যায় প্রতিটি সজীব ভাষাও বারবার তার ধারা বদল করে। পুরানো খাত ছেড়ে নতুন পথে বয়ে চলে। যুগে যুগে ভাষার মধ্য থেকে আবার অনেক শব্দ হারিয়ে যায়, জন্ম হয় নতুন শব্দ। শব্দ-সমৃদ্ধির এ ইতিহাস খুবই বিচিত্র, চিত্রাকর্ষক। এর পেছনে লুকানো থাকে অতীত সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বস্তু ব্যবহারের নানান গোপন তথ্য।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রাচীন ভারতীয় আর্য শাখার ক্রম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা বর্তমান রূপলাভ করেছে। তাই এ ভাষায় সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি অসংখ্য শব্দের উপস্থিতি বিদ্যমান। প্রাচীনকাল থেকেই সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গরূপে স্থান করে নেয়। তেরো শতকে বঙ্গে মুসলিম শাসনের পর থেকে আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দের প্রভাব বাড়তে থাকে। ষোলো শতকে বঙ্গ অঞ্চলে পর্তুগিজদের আনীত শব্দাবলি বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। সতেরো শতকে এ অঞ্চলে বিদেশিদের আগমন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও ইংরেজি শব্দের প্রভাব বাড়তে থাকে। আঠারো/উনিশ শতকে ইংরেজদের শাসনের ফলে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ইংরেজি শব্দ প্রবেশ করে। এভাবে বর্জন নয় গ্রহণের নীতিতে, মৌচাকে মধু সঞ্চয়ের পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে।

উপসংহার : ভাষা তার আপন গতিতে চলে এবং কালক্রমে বিবর্তিত হয়।

⏩ প্রশ্ন : ৪১ ॥ শব্দ কাকে বলে? ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : মানুষ মনের ভাবকে সার্থকভাবে প্রকাশ করতে যেসব অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে, তাকে শব্দ বলে। শব্দ ভাষার মৌলিক উপাদান। আর ধ্বনি শব্দের প্রাণ। ধ্বনি ও শব্দ উভয়টি বাক্য গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও উভয়ের মাঝে কতিপয় সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে।

শব্দের সংজ্ঞার্থ

সাধারণ কথায়, মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে শব্দ বলে। যেমন– কলম, আমরা, মা, গোলাপ ইত্যাদি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে সেই সমাজের নরনারীর ভাষায় শব্দ।"

৩। অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।"

ধ্বনি ও শব্দের পার্থক্য

ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নরূপ–

ধ্বনি	শব্দ
১। মানুষের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশের নাম ধ্বনি।	১। এক বা একাধিক অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা বর্ণ মিলে তৈরি হয় শব্দ।
২। ধ্বনি তৈরি হতে বাগযন্ত্রের সাহায্য লাগে।	২। বাগযন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও শব্দ তৈরি হতে পারে।
৩। ধ্বনির লিখিত রূপের নাম বর্ণ।	৩। একাধিক বর্ণের মিলনে গঠিত হয় শব্দ।
৪। একাধিক ধ্বনি একত্রিত হয়ে তৈরি হয় শব্দ।	৪। একাধিক শব্দ মিলিত হয়ে গঠিত হয় বাক্য।
৫। ধ্বনি শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ।	৫। শব্দ বাক্যের ক্ষুদ্রতম অংশ।
৬। ধ্বনি উচ্চারিত হলে তা কেবল শ্রুতিগোচর।	৬। কিন্তু শব্দ উচ্চারিত হলে তা শ্রুতিগোচর ও শব্দের লিখিত রূপ দৃশ্যগোচর।
৭। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ধ্বনির মিলনে হয় সন্ধি।	৭। আর পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক শব্দের মিলনে হয় সমাস।

উপসংহার : ধ্বনি ও শব্দ উভয়েই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও রয়েছে।

» প্রশ্ন : ৪২ ॥ শব্দ কাকে বলে? শব্দের শ্রেণিবিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কী কী? শব্দগঠনের পদ্ধতিগুলো কী কী?

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলে থাকে। এ কথাগুলো হলো কতিপয় অর্থবোধক শব্দের সমষ্টি। আর ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই হলো শব্দ। নিচে প্রশ্নানুসারে শব্দ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপনা করা হলো–

শব্দের সংজ্ঞার্থ

মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। যেমন– মা, ইহা, আমরা ইত্যাদি।

শব্দের শ্রেণিবিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি

সাধারণত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে শব্দের শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। যথা–

১। উৎপত্তি বিচারে, ২। গঠনের দিক হতে, ৩। অর্থের দিক হতে।

বাংলা শব্দগঠনের পদ্ধতি

বাংলা ভাষায় শব্দগঠন নানারূপে সাধিত হয়েছে। প্রধান কয়েকটি উপায়ে বাংলা শব্দগঠন পদ্ধতির নাম নিচে প্রদত্ত হলো–

১। প্রত্যয়গঠিত শব্দ
২। সমাসগঠিত শব্দ
৩। উপসর্গগঠিত শব্দ
৪। সন্ধিগঠিত শব্দ
৫। পদ পরিবর্তনে শব্দগঠন।

উপসংহার : শব্দই হলো প্রতিটি ভাষার মৌলিক সম্পদ। বাংলা ভাষায় সাধারণত উপরিউক্ত পাঁচটি উপায়ে শব্দ গঠিত হয়ে শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন : ৪৩ ॥ শব্দ কাকে বলে? উৎস অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১৪]

অথবা, উৎপত্তি অনুযায়ী বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকার শব্দের সংজ্ঞার্থ ও উদাহরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানুষ মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বলে। এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত হয় অর্থপূর্ণ এককেকটি শব্দ। শব্দই হলো প্রতিটি ভাষার মৌলিক সম্পদ। নিচে শব্দ সম্পর্কিত আলোচনা প্রদত্ত হলো–

শব্দের সংজ্ঞার্থ

মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিই হলো শব্দ। যেমন– মা, ইহা, আমরা ইত্যাদি।

উৎপত্তি অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

উৎস বা উৎপত্তিগত দিক বিচারে বাংলা শব্দগুলো পাঁচভাগে বিভক্ত। যেমন– ১। তৎসম শব্দ, ২। অর্ধতৎসম শব্দ, ৩। তদ্ভব শব্দ, ৪। দেশি শব্দ, ৫। বিদেশি শব্দ। নিচে প্রত্যেক প্রকারের শব্দের সংজ্ঞার্থ উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো–

১। **তৎসম শব্দ :** তৎসম অর্থ তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান। যেসব সংস্কৃত শব্দ অপরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয়ে আসছে ওই শব্দগুলোকে তৎসম শব্দ বলে। যেমন– সমুদ্র, চন্দ্র, কৃষ্ণ ইত্যাদি।

২। **অর্ধতৎসম শব্দ :** যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদেরকে অর্ধতৎসম শব্দ বলে। যেমন– গৃহিণী থেকে গিন্নী, জ্যোৎস্না > জোছনা, প্রণাম > পেন্নাম ইত্যাদি।

৩। **তদ্ভব শব্দ :** যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে উৎপত্তি হয়ে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই শব্দগুলোকে তদ্ভব শব্দ বলে। যেমন– (সং) হস্ত > (প্রাঃ) হত্থ > (তদ্ভব) হাত; (সং) চন্দ্র > (প্রাঃ) চান্দ > (তদ্ভব) চাঁদ; (সং) পন্থা > (প্রাঃ) পন্থ (তদ্ভব) পথ ইত্যাদি।

৪। **দেশি শব্দ :** যেসব শব্দ এ দেশের আদিম অধিবাসী অনার্যদের ভাষা থেকে বাংলায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে দেশি শব্দ বলে। যেমন– ঘুড়ি, ঢিল, ঢোল ইত্যাদি।

৫। **বিদেশি শব্দ :** যেসব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে বাংলায় এসেছে সেগুলোকে বিদেশি শব্দ বলে। বিশেষ করে ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও বাণিজ্যিক কারণে বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় এসেছে। এতে বহু বিদেশি শব্দ বাংলায় মিশে গেছে যেমন– ইংরেজি, পর্তুগিজ, ফারসি, উর্দু, আরবি ও চীনাসহ বিভিন্ন ভাষার বহু শব্দ এখন বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। যেমন– নামাজ, অজু, চেয়ার, অফিস, দারোগা, আইন, আদালত, চা, আনারস ইত্যাদি।

উপসংহার : বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম একটি শব্দসমৃদ্ধ ভাষা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার মিলন সরোবরের ভূমিকা পালন করে এ ভাষার শব্দভাণ্ডার সুশোভিত হয়েছে।

প্রশ্ন : ৪৪ ॥ শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ কর। [ফা. প. ২০১২, '১৬]

অথবা, শব্দের গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : কথা বলতে গেলে আমাদেরকে শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। শব্দ হলো ভাষার মৌলিক সম্পদ। বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয়েকটি শ্রেণির অধীনে গঠিত হয়ে থাকে।

নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

শব্দের সংজ্ঞার্থ

মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে শব্দ বলে। যেমন– কলম, আমরা, মা, গোলাপ ইত্যাদি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে সেই সমাজের নরনারীর ভাষায় শব্দ।"

৩। অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।"

গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। মৌলিক শব্দ, ২। সাধিত শব্দ। নিচে দু'প্রকার শব্দের বর্ণনা প্রদত্ত হলো–

১। **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ একেবারেই স্বকীয়, যাকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। অর্থাৎ উৎপত্তিগতভাবে মৌলিক এবং যাতে বা যার সাথে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি বা উপসর্গ যুক্ত থাকে না তাদেরকে মৌলিক শব্দ বলে। যথা– হাত, পা, আলো, নদী ইত্যাদি।

২। **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ উৎপত্তিগতভাবে যা মৌলিক নয়; বরং মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সাথে উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ হয়ে অথবা সমাস-নিষ্পন্ন হয়ে যেসব শব্দ গঠিত হয়, তাদেরকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন– স্বাগত (সু + আগত), বিদ্যালয় (বিদ্যা + আলয়) ইত্যাদি সাধিত শব্দ। শব্দ সাধারণত তিনভাবে সাধিত হয়ে থাকে। যথা–

ক. প্রত্যয়যোগে সাধিত শব্দ। যেমন– বাঘ + আ = বাঘা, অতি + অন্ত = অত্যন্ত ইত্যাদি।

খ. উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন শব্দ। যেমন– পরা + জয় = পরাজয়, অধি + কার= অধিকার ইত্যাদি।

গ. সমাসসাধিত শব্দ। যেমন– মহৎ যে জন = মহাজন, সমান উদর যার= সহোদর ইত্যাদি।

উপসংহার : প্রকৃত অর্থে, মৌলিক শব্দ এবং সাধিত শব্দ হলো বাংলা শব্দের গঠনমূলক ভিত্তি। সব শ্রেণির শব্দই এ দু'শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

⏩ প্রশ্ন : ৪৫ ॥ অর্থানুসারে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

[ফা. প. ২০১৯]

অথবা, অর্থগত দিক থেকে বাংলা শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০০৮, '১৫]

অথবা, অর্থের পার্থক্য বিচারে বাংলা শব্দ কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : মানুষ শব্দ ছাড়া মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে না। অর্থের দিক বিবেচনায় বাংলা শব্দের মধ্যে বেশ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাই ব্যাকরণবিদগণ অর্থগত দিক বিবেচনায় শব্দকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন।

অর্থগতভাবে শব্দের প্রকারভেদ

অর্থের দিক দিয়ে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ১। যৌগিক শব্দ, ২। রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ ও ৩। যোগরূঢ় শব্দ।

১। **যৌগিক শব্দ :** যেসব শব্দের অর্থ প্রকৃতি প্রত্যয় হতে পাওয়া যায়, তাদেরকে যৌগিক শব্দ বলে। যেমন– কৃ + তব্য= কর্তব্য; অর্থাৎ যা করা উচিত।

২। **রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ :** প্রত্যয় বা উপসর্গযোগে সাধিত অনেক শব্দ যেগুলোর উপাদানভুক্ত অংশ দুটি অনুগামী না হয়ে অন্য কোনো বিশিষ্ট অর্থ–জ্ঞাপন করলে সেসব শব্দকে বলা হয় রূঢ় বা রূঢ়ি শব্দ। যেমন– হস্তী (হস্ত + ইন) অর্থ হস্ত আছে যার। কিন্তু হস্তী বলতে একটি পশুবিশেষকে বোঝায়।

৩। **যোগরূঢ় শব্দ :** সমাসনিষ্পন্ন যেসব শব্দ সম্পূর্ণভাবে পদসমূহের অর্থের অনুগামী না হয়ে কোনো বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করে, সেগুলোকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। যেমন– পঙ্কজ অর্থ– পঙ্কে জন্মে যা। পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মায়; কিন্তু সাধারণত পদ্মফুল অর্থে এটিকে ব্যবহার করা হয়। জলধি– জল ধারণ করে যে। কিন্তু সাধারণত সমুদ্র অর্থে জলধি ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার : শব্দ হচ্ছে ভাষার সম্পদ সম্ভার। আর অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দের প্রকার উল্লিখিত তিনটি। শব্দ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে উল্লিখিত প্রকারত্রয় সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

» প্রশ্ন : ৪৬ ॥ কী কী উপায়ে বাংলা ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করা যায়? উদাহরণসহ বর্ণনা কর। [ফা. প. ২০১১]

অথবা, শব্দগঠন প্রক্রিয়ার উপাদান কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. '০৯]

অথবা, শব্দগঠন প্রক্রিয়া বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. '০৭]

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? কোন কোন প্রক্রিয়ায় বাংলা ভাষায় শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, শব্দগঠন বলতে কী বোঝ? বাংলা শব্দগঠনের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শব্দ ভাষার ঐশ্বর্যময় সম্ভার। শব্দ ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে। এ ঐশ্বর্যময় শব্দসম্ভারে অর্থবোধক শব্দই হচ্ছে ভাব বা অনুভূতির প্রতীক। এ প্রতীকের সাহায্যে রচিত হয় বাক্য। শব্দের অর্থবৈচিত্র্যের জন্য তার রূপ ও রূপান্তর সাধন করা হয়। এভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্য শব্দ তৈরি করার প্রক্রিয়াকে এক কথায় শব্দগঠন বলা হয়।

শব্দগঠন প্রক্রিয়া : যেসব রীতিতে সাধিত শব্দ গঠিত হয় সেসব রীতিকে শব্দগঠন রীতি বলে। বাংলা ভাষায় শব্দগঠন নিচে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় বা উপায়ে সংগঠিত হয়ে থাকে। যেমন– উপসর্গযোগে, প্রত্যয়ের সাহায্যে, সমাসের সাহায্যে, সন্ধির সাহায্যে, বিভক্তিযোগে, পদের দ্বিরুক্তিতে ও পদ পরিবর্তনের সাহায্যে। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত উপস্থাপিত হলো–

১। **উপসর্গযোগে শব্দগঠন :** মূল শব্দের পূর্বে উপসর্গ যোগ করে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। যেমন– প্র-প্রকার, প্রতাপ; অপ-অপকার, অপমৃত্যু; বি-বিজন, বিনয় ইত্যাদি।

২। **প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দগঠন :** মূল শব্দ বা ধাতুর শেষে প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত হয়। যেমন– মুড় + অক = মোড়ক, ফাট + অক = ফাটক, বস + অত = বসত, চল + অন = চালন, ফুট + অন্ত = ফুটন্ত, দোকান + দার = দোকানদার, চল + অন্ত = চলন্ত ইত্যাদি।

৩। **সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** সমাসের সাহায্যেও নতুন শব্দ গঠন করা যায়। যেমন– মাতা ও পিতা = মাতাপিতা, মহান যে ঋষি = মহর্ষি, বিলাত হতে ফেরত = বিলাতফেরত, পা হতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক, পাপে মতি যার = পাপমতি,

জলের সাথে বিদ্যমান = সজল, মৃগের মতো নয়ন যার = মৃগনয়না, শোকের দ্বারা আকুল = শোকাকুল, বিদ্যার নিমিত্ত আলয় = বিদ্যালয় ইত্যাদি।

৪। **সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন :** দুটি শব্দের পরস্পর সংমিশ্রণে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। যেমন- হিম + আলয় = হিমালয়, নর + অধম = নরাধম, রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র, পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, দিক + অন্ত = দিগন্ত, সম + তান = সন্তান, পরি + কার = পরিষ্কার, মনঃ + যোগ = মনোযোগ, ইতঃ + তত = ইতস্তত, সিংহ + আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

৫। **বিভক্তিযোগে শব্দগঠন :** ডাঙায় বাঘ, জলে কুমির। এখানে ডাঙা + য় = ডাঙ্গায় এবং জল + এ = জলে; যথাক্রমে 'য়' ও 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

৬। **পদের দ্বিরুক্তিতে শব্দগঠন :** গ্রামে-গ্রামে, ভালোয়-ভালোয়, ভাইয়ে-ভাইয়ে ইত্যাদি।

৭। **পদ পরিবর্তনের সাহায্যে শব্দগঠন :** লোক-লৌকিক, মুখ-মৌখিক, জাতি-জাতীয়, ভদ্র-ভদ্রতা, বিবাহ-বিবাহিত, মেধা-মেধাবী ইত্যাদি।

উপসংহার : বাংলা ভাষায় বিভিন্ন উপায়ে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে। এসব শব্দ বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

⏩ প্রশ্ন : ৪৭ ॥ মৌলিক ও সাধিত শব্দ বলতে কী বোঝ? সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া উদাহরণসহ লেখ। [ফা. প. ২০১০]

অথবা, গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কত প্রকার ও কী কী? সন্ধির দ্বারা শব্দ গঠন করা যায় কীভাবে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : কথা বলতে গেলে আমাদেরকে শব্দ উচ্চারণ করতে হয়। শব্দ হলো ভাষার মৌলিক সম্পদ। বাংলা ভাষার শব্দসমূহ কয়েকটি শ্রেণির অধীনে গঠিত হয়ে থাকে। শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে সন্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

শব্দের সংজ্ঞার্থ

মানুষের মুখনিঃসৃত এক বা একাধিক ধ্বনি বা বর্ণ মিলিত হয়ে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে, তবে তাকে শব্দ বলে। যেমন- কলম, আমরা, মা, গোলাপ ইত্যাদি।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "অর্থবোধক ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "অর্থবোধক ধ্বনিকে শব্দ (Word) বলে। কোনো বিশেষ সমাজের নরনারীর কাছে যে ধ্বনির স্পষ্ট অর্থ আছে, সেই অর্থবোধক ধ্বনিই হচ্ছে সেই সমাজের নরনারীর ভাষায় শব্দ।"

৩। অশোক মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এক বা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে শব্দ বলা হয়।"

গঠন অনুসারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ

গঠন অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১। মৌলিক শব্দ, ২। সাধিত শব্দ। নিচে দু'প্রকার শব্দের বর্ণনা প্রদত্ত হলো-

১। **মৌলিক শব্দ :** যেসব শব্দ একেবারেই স্বকীয়, যাকে ভাঙা বা বিশ্লেষণ করা যায় না। অর্থাৎ উৎপত্তিগতভাবে মৌলিক এবং যাতে বা যার সাথে কোনো প্রত্যয়, বিভক্তি বা উপসর্গ যুক্ত থাকে না তাদেরকে মৌলিক শব্দ বলে। যথা- হাত, পা, আলো, নদী ইত্যাদি।

২। **সাধিত শব্দ :** যেসব শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় অর্থাৎ উৎপত্তিগতভাবে যা মৌলিক নয়; বরং মৌলিক শব্দ বা ধাতুর সাথে উপসর্গ বা প্রত্যয় যোগ হয়ে অথবা সমাসনিষ্পন্ন হয়ে যেসব শব্দ গঠিত হয়, তাদেরকে সাধিত শব্দ বলে। যেমন– স্বাগত (সু+আগত), বিদ্যালয় (বিদ্যা+আলয়) ইত্যাদি সাধিত শব্দ। শব্দ সাধারণত তিনভাবে সাধিত হয়ে থাকে। যথা–

ক. প্রত্যয়যোগে সাধিত শব্দ। যেমন– বাঘ+আ = বাঘা, অতি+অন্ত = অত্যন্ত ইত্যাদি।

খ. উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন শব্দ। যেমন– পরা + জয় = পরাজয়, অধি + কার = অধিকার ইত্যাদি।

গ. সমাসসাধিত শব্দ। যেমন– মহৎ যে জন = মহাজন, সমান উদর যার = সহোদর ইত্যাদি।

৩। **সন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন :** দুটি শব্দের পরস্পর সংমিশ্রণে নতুন শব্দ গঠন করা হয়। যেমন– হিম + আলয় = হিমালয়, নর + অধম = নরাধম, রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র, পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়, দিক + অন্ত = দিগন্ত, সম + তান = সন্তান, পরি + কার = পরিষ্কার, মনঃ + যোগ = মনোযোগ, ইতঃ + তত = ইতস্তত, সিংহ + আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

উপসংহার : মৌলিক শব্দ এবং সাধিত শব্দ হলো বাংলা শব্দের গঠনমূলক ভিত্তি। সকল শ্রেণির শব্দই এ দু'শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। আর সন্ধির সাহায্যে গঠিত শব্দ ভাষাকে শ্রুতিমধুর ও সমৃদ্ধ করে।

উপসর্গ

⏩ প্রশ্ন : ৪৮ ॥ উপসর্গ কাকে বলে? উপসর্গ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শব্দ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করে। বাংলা ভাষার শব্দসমূহ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়ে থাকে। অর্থহীন অব্যয়সূচক কিছু শব্দাংশের সাহায্যে বাংলা ভাষার অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো–

উপসর্গের সংজ্ঞার্থ

উপসর্গ অর্থ উপসৃষ্টি। যেসব অর্থহীন অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক নানা অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন– আ + হার = আহার, বি + হার = বিহার। এখানে 'আ' ও 'বি' উপসর্গ।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

১। ড. মুহম্মদ এনামুল হক উপসর্গের সংজ্ঞায় বলেন, "যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নাম-পদের পূর্বে বসে শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, সম্প্রসার বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে।" (ব্যাকরণ মঞ্জরী)

২। ড. রামেশ্বর শ' বলেন, "শব্দ ও ধাতুর আদিতে যা যোগ হয়, তাকেই বলে উপসর্গ।" (সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা)

৩। ড. অশোক মুখোপাধ্যায় উপসর্গের সংজ্ঞায় বলেন, "কিছু অব্যয় আছে যারা ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থ বদল করে দেয়, এদেরকেই বলা হয় উপসর্গ।" (সংসদ ব্যাকরণ অভিধান)।

উপসর্গের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় সাধারণত তিন প্রকারের উপসর্গ রয়েছে। যথা– ১। খাঁটি বাংলা উপসর্গ, ২। সংস্কৃত উপসর্গ ও ৩। বিদেশি উপসর্গ।

১। **খাঁটি বাংলা উপসর্গ :** খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে মোট একুশটি। যেমন– অ, অঘা, অজ, অনা, আন, আড়, আব, কু, নি, পাতি, বি, ইতি, আর, সু ইত্যাদি।

উদাহরণ : অ + পয়া = অপয়া, আন + মনা = আনমনা, কু + কথা = কুকথা ইত্যাদি।

২। **সংস্কৃত উপসর্গ :** বাংলা ভাষায় মোট ২০টি সংস্কৃত উপসর্গ রয়েছে। যেমন– প্র, পরা, অপ, সম, নি, প্রতি, অভি, উপ, ইত্যাদি।

উদাহরণ : উপ + হার = উপহার, প্রতি + কূল = প্রতিকূল, অপ + বাদ = অপবাদ, প্র + কাশ = প্রকাশ ইত্যাদি।

৩। **বিদেশি উপসর্গ :** বাংলা ভাষায় যেমন প্রচুর বিদেশি শব্দ রয়েছে, তেমনি বহু বিদেশি উপসর্গও রয়েছে। যেমন–বে, ফি, বদ, আম, খাস, ফুল, হেড, হর, গর ইত্যাদি।

উদাহরণ : বদ + নাম = বদনাম, বে + নামী = বেনামী, ফুল + শার্ট = ফুলশার্ট ইত্যাদি।

উপসংহার : শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনাই উপসর্গের কাজ। এরা শব্দাংশ বা ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পূর্ণতা সাধন করে।

⏩ প্রশ্ন : ৪৯ ॥ উপসর্গের সংজ্ঞার্থ দাও। বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৮, '১৩, '১৭]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : উপসর্গ বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলা ভাষার শব্দসমূহ বিভিন্ন উপায়ে গঠিত হয়ে থাকে। অর্থহীন অব্যয়সূচক কিছু শব্দাংশের সাহায্যে বাংলা ভাষার অনেক শব্দ গঠিত হয়েছে। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো–

উপসর্গের সংজ্ঞার্থ

উপসর্গ অর্থ উপসৃষ্টি। যেসব অর্থহীন অব্যয়সূচক শব্দাংশ ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠনপূর্বক নানা অর্থের সৃষ্টি করে, তাকে উপসর্গ বলে। যেমন– আ + হার = আহার, বি + হার = বিহার। এখানে 'আ' ও 'বি' উপসর্গ।

১। ড. এনামুল হক উপসর্গের সংজ্ঞায় বলেন, "যে সকল অব্যয় শব্দ কৃদন্ত বা নামপদের পূর্বে বসে শব্দগুলির অর্থের সংকোচন, সম্প্রসার বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে, ঐ সকল অব্যয় শব্দকে বাংলা ভাষায় উপসর্গ বলে।" (ব্যাকরণ মঞ্জরী)

২। ড. রামেশ্বর শ' বলেন, "শব্দ ও ধাতুর আদিতে যা যোগ হয়, তাকেই বলে উপসর্গ।" (সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা)

৩। ড. অশোক মুখোপাধ্যায় বলেন, "কিছু অব্যয় আছে যারা ধাতু বা শব্দের আগে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থ বদল করে দেয়, এদেরকেই বলা হয় উপসর্গ।" (সংসদ ব্যাকরণ অভিধান)।

বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা

উপসর্গগুলো নিজে অর্থহীন; কিন্তু যখন এগুলো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে তখন অর্থযুক্ত হয়। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই বলে এরা কখনো পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনাই উপসর্গের কাজ। উপসর্গের প্রভাবে একটি শব্দের যে পরিবর্তন হয় তা হলো–

১। নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি হয়।
২। শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধিত হয়।
৩। শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটে।
৪। শব্দের অর্থের সংকোচন ঘটে।
৫। শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটে।

উদাহরণ : 'কাজ' একটি শব্দ। এর আগে 'কু' বা 'অ' অব্যয় যুক্ত করলে হবে কুকাজ বা অকাজ। যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। 'পূর্ণ' শব্দের আগে 'পরি' উপসর্গ যোগ করায় হয়েছে 'পরিপূর্ণ'। এটি 'পূর্ণ' শব্দের সম্প্রসারিত রূপ। 'হার' শব্দের আগে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা) 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ) বিভিন্ন অর্থে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে।

উপসংহার : শব্দগঠনে অর্থের দিক থেকে বৈচিত্র্য আনয়নই উপসর্গের কাজ। এরা শব্দাংশ বা ধাতুর পূর্বে বসে অর্থের পরিবর্তন, সংকোচন, সম্প্রসারণ বা পূর্ণতা সাধন করে।

» প্রশ্ন : ৫০ ॥ উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : উপসর্গ ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপসর্গ ও প্রত্যয় দুটোই বাংলা নতুন শব্দগঠনের অন্যতম উপাদান। এরা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য

উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

পার্থক্যের ভিত্তি	উপসর্গ	প্রত্যয়
১। পরিচয়গত	ধাতুর পূর্বে যেসব অব্যয়জাতীয় শব্দাংশ যুক্ত হয় তাদেরকে উপসর্গ বলে।	প্রকৃতির সাথে যেসব স্বরবর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদেরকে প্রত্যয় বলে।
২। অবস্থানগত	উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসে।	প্রত্যয় ধাতু ও শব্দ উভয়ের পূর্বে বসে।
৩। অর্থগত	উপসর্গ অর্থ শব্দাংশ।	প্রত্যয় অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি।
৪। প্রকারভেদগত	উপসর্গ তিন প্রকার, যথা– খাঁটি বাংলা, তৎসম বা সংস্কৃত ও বিদেশি।	প্রত্যয় দু'প্রকার, যথা– কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।
৫। উদাহরণ	অ+কাজ = অকাজ এখানে 'অ' হলো উপসর্গ।	কাঁদ+অন = কাঁদন, এখানে 'অন' হলো প্রত্যয়।

উপসংহার : উপসর্গ ও প্রত্যয়ের কাজ হলো শব্দগঠন। এদের মাধ্যমে অসংখ্য শব্দ গঠিত হয়ে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ হয়েছে।

» প্রশ্ন : ৫১ ॥ 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'– বিশ্লেষণ কর। [ফা. প. ২০১১, '১৪, '১৮]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : উপসর্গ হলো অব্যয়বাচক শব্দাংশ। এরা শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে। এদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই।

প্রশ্নোদ্ধৃত উক্তিটির তাৎপর্য

উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে এদের অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি হয়। যেমন– কাজ একটি শব্দ। এর আগে 'অ' উপসর্গটি যুক্ত হলে হয় অ-কাজ, যার অর্থ নিন্দনীয় কাজ। এখানে অর্থের সংকোচন হয়েছে। অপকর্ম (মন্দ কাজ)। এখানে কর্ম (কাজ) শব্দের পূর্বে 'অপ' যোগ করায় নেতিবাচক অর্থ হয়েছে। পূর্ণ (ভরা) শব্দের আগে 'পরি' যোগ করায় পরিপূর্ণ হলো। এটি পূর্ণ শব্দের সম্প্রসারিত রূপ। 'হার' শব্দের আগে 'আ' যুক্ত করে 'আহার' (খাওয়া), 'প্র' যুক্ত করে 'প্রহার' (মারা), 'বি' যুক্ত করে 'বিহার' (ভ্রমণ), 'পরি' যোগ করে 'পরিহার' (ত্যাগ), 'উপ' যুক্ত করে 'উপহার' (পুরস্কার),'সম' যোগ করে 'সংহার' (হত্যা) ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন শব্দ তৈরি হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, নাম বা কৃদন্ত শব্দের সাথে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে থাকলে উপসর্গের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু কৃদন্ত বা নাম শব্দের সাথে যুক্ত হলেই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি করে। তাই বলা হয়, উপসর্গের অর্থবাচকতা নাই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।

ব্যতিক্রম : বাংলা ভাষায় 'অতি' ও 'প্রতি' এ দুটি উপসর্গের কখনো কখনো স্বাধীন প্রয়োগ হতে পারে। যেমন– মাথাপ্রতি পাঁচ টাকা খরচ। অতি বাড়া ভালো নয়।

উপসংহার : উপসর্গের অর্থবাচকতা না থাকলেও অবশ্যই অর্থদ্যোতকতা আছে।

⏩ প্রশ্ন : ৫২ ॥ অনুসর্গ কাকে বলে? বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা আছে কী? উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা ভাষায় অব্যয় শ্রেণির একজাতীয় শব্দ আছে যারা শব্দের শেষে বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয়, তবে এরা বিভক্তি নয়। নিচে এদের পরিচয় প্রদত্ত হলো–

অনুসর্গের সংজ্ঞার্থ

বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসর্গ। বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। যেমন– দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, বিনা, ব্যতীত, চেয়ে ইত্যাদি।

অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা বহুবিধ। যথা–

১। **বিভক্তির ন্যায় ব্যবহৃত হয় :** বাংলা ভাষায় অনুসর্গগুলো বিভক্তির কাজ করে বিধায় বাক্য গঠনে এদের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন– তোমাকে যেতে হবে।

২। **তুলনা বোঝাতে :** অভাব, তুলনা ইত্যাদি বোঝাতে বাংলা ভাষায় অনুসর্গের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন– তুমি বিনা কে আছে আমার।

৩। **বাক্য গঠনে :** বাংলা ভাষায় অনুসর্গ বাক্য গঠনে সহায়তা করে। অনুসর্গ ছাড়া বাক্য গঠন কল্পনা করা যায় না। যেমন– দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

৪। **কারকের অর্থ প্রকাশে :** কারকের অর্থ প্রকাশ করতে অনুসর্গের ভূমিকা রয়েছে। যেমন– করণ কারকে দ্বারা, দিয়া কর্তৃক ইত্যাদি।

উপসংহার : অনুসর্গ বাক্যের অর্থ প্রকাশে সহায়তা করার মাধ্যমে বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

⏩ প্রশ্ন : ৫৩ ॥ উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : উপসর্গ ও অনুসর্গ বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষাকে মাধুর্য দান করা এবং ভাষায় নতুন শব্দ গঠন করতে অনুসর্গ এবং উপসর্গের ভূমিকা অপরিসীম। উপসর্গ ও অনুসর্গের মধ্যে কতকগুলো পার্থক্য বিদ্যমান। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ–

উপসর্গ	অনুসর্গ
১। বাংলা ভাষায় যেসব অব্যয় ধাতুর পূর্বে বসে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে সেসব অব্যয়কে উপসর্গ বলে।	১। বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদরূপে আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে সেগুলোকে অনুসর্গ বলে।

উপসর্গ	অনুসর্গ
২। উপসর্গ কোনো শব্দ নয়, শব্দের অংশ মাত্র।	২। অনুসর্গ অর্থযুক্ত শব্দ।
৩। উপসর্গ তিন প্রকার	৩। অনুসর্গ দু'প্রকার।
৪। উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই	৪। অনুসর্গের নিজস্ব অর্থ আছে।
৫। উপসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহার হতে পারে না।	৫। অনুসর্গ স্বাধীনভাবে ব্যবহার হতে পারে।
৬। উপসর্গ বিভক্তির ন্যায় কাজ করে না।	৬। অনুসর্গ বিভক্তির মতো ব্যবহৃত হয়।
৭। উপসর্গ ধাতুর পূর্বে বসে।	৭। অনুসর্গ ধাতুর পরে বসে।
৮। উপসর্গের উদাহরণ : পরা, নি, অব, অনু, নির ইত্যাদি।	৮। অনুসর্গের উদাহরণ : প্রতি, বিনা, বিহনে, দ্বারা, দিয়া ইত্যাদি।

উপসংহার : উপসর্গ ও অনুসর্গ উভয়েই বাংলা ভাষার নতুন শব্দগঠনে সাহায্য করে। বাংলা ভাষায় উভয়ের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়

» প্রশ্ন : ৫৪ ॥ প্রত্যয় কাকে বলে? প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।
অথবা, প্রত্যয় বলতে কী বোঝ? প্রত্যয় কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শব্দ প্রকৃতি তথা শব্দমূলের সাথে উপসর্গ, বিভক্তি বা প্রত্যয় ইত্যাদি যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে। এতে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগসুবিধা ঘটে।

প্রত্যয়ের সংজ্ঞা

প্রত্যয় শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস। ধাতু বা শব্দের সাথে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয় সে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছকে প্রত্যয় বলে। যেমন– √চল্+অন্ত= চলন্ত, এখানে 'অন্ত' শব্দগুচ্ছটি হলো প্রত্যয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রত্যয়-এর সংজ্ঞায় বলেন, "ধাতু বা শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমূহ যুক্ত হয়ে শব্দ প্রস্তুত হয় তাদেরকে প্রত্যয় বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যা ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে নাম শব্দ (বা নতুন ধাতু) গঠন করে কিংবা নাম শব্দের উত্তর যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে বলে প্রত্যয়।"

৩। ড. শাহজাহান মুনিরের মতে, "ধাতু বা শব্দের সাথে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণ-সমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয় সে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলে।"

মোট কথা, প্রকৃতির সাথে যেসব বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে অর্থজ্ঞাপক নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে। যেমন– চল্ + অন্ত= চলন্ত। এখানে 'অন্ত' শব্দগুচ্ছটি হলো প্রত্যয়।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ

প্রত্যয় দু'প্রকার। যথা– ১। কৃৎ প্রত্যয়, ২। তদ্ধিত প্রত্যয়।

১। **কৃৎ প্রত্যয় :** ধাতুর সাথে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে কৃৎপ্রত্যয় বলে। যেমন–√নাচ্ + অন= নাচন। কৃৎ প্রত্যয় আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– ১। সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়, যেমন– গৈ + অক = গায়ক। ২। বাংলা কৃৎ প্রত্যয়, যেমন– ঢাক্ + না = ঢাকনা।

২। **তদ্ধিত প্রত্যয় :** শব্দের শেষে যে প্রত্যয় যুক্ত হয়, তাকে তদ্ধিত প্রত্যয় বলে। যেমন– পাতল + আ = পাতলা, গোয়াল + আ = গোয়ালা ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয় তিন ভাগে বিভক্ত। যথা–

১। সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন– মনু + ষ্ণ(অ) = মানব।

২। বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়, যেমন– বাবু + আনা = বাবুয়ানা।

৩। বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়। যেমন– রিক্শা + ওয়ালা = রিকশাওয়ালা।

উপসংহার : যে ভাষার শব্দ-সম্ভার যত বেশি, সে ভাষা তত বেশি সমৃদ্ধ। প্রত্যয়ের মাধ্যমে নতুন নতুন শব্দ গঠিত হয়ে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে।

⏩ প্রশ্ন : ৫৫ ॥ প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : প্রকৃতির শেষে প্রত্যয় যোগ হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করলেও প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য বিদ্যমান। বস্তুত প্রকৃতি ও প্রত্যয় একেবারেই আলাদা আলাদা বিষয়।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের মধ্যে পার্থক্য : নিচে প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

পার্থক্যের ভিত্তি	প্রকৃতি	প্রত্যয়
১। সংজ্ঞার্থ	শব্দের বা ধাতুর ক্ষুদ্রতম অংশকে প্রকৃতি বলে।	শব্দ বা ধাতুর পরে যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাকে প্রত্যয় বলে।
২। অর্থগত	যেহেতু প্রকৃতি শব্দ, তাই তার একটি অর্থ আছে।	অপরপক্ষে প্রত্যয় অর্থহীন।
৩। অবস্থান	শব্দগঠনে প্রকৃতি প্রত্যয়ের আগে বসে।	প্রত্যয় শব্দগঠনের উদ্দেশ্যে প্রকৃতির পরে বসে।
৪। বিশ্লেষণ	প্রকৃতি হচ্ছে মৌলিক শব্দ, এর বিশ্লেষণ চলে না।	প্রত্যয় মৌলিক শব্দের পরে যুক্ত হয়ে ভাবের প্রসারণ, সংকোচন বা পরিবর্তন ঘটায়।
৫। উদাহরণ	যেমন– ঢাকা (প্রকৃতি) + ইয়া।	যেমন– ঢাকা+ইয়া (প্রত্যয়)।

উপসংহার : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এর একটি হলো মৌল শব্দ আর অপরটি মৌল শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

⏩ প্রশ্ন : ৫৬ ॥ প্রকৃতি ও প্রত্যয় কাকে বলে? তিনটি পৃথক পৃথক উদাহরণের সাহায্যে প্রকৃতি ও প্রত্যয় এবং উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, তা আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : প্রকৃতি ও প্রত্যয় বাংলা ব্যাকরণের একটি আলোচিত বিষয়। প্রকৃতি ও প্রত্যয় দুটি ভিন্ন হলেও এরা একের সাথে অপরের মিলন ব্যতীত নতুন শব্দ গঠন করতে পারে না। নিচে এদের পরিচয় ও পার্থক্য আলোচনা করা হলো–

প্রকৃতির সংজ্ঞার্থ

শব্দ বা ধাতুর মূল যে অংশকে আর বিভাজন করা যায় না, তাকে প্রকৃতি বলে। অর্থাৎ শব্দ বা ধাতুর মূলই হলো প্রকৃতি। যেমন– ঢাকা শব্দের মূল ঢাক্ এবং লিখা শব্দের মূল √লিখ্। এ মূলগুলোই প্রকৃতি।

প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ

ধাতু বা শব্দের সাথে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হয় সে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছকে প্রত্যয় বলে। যেমন– √চল্+অন্ত= চলন্ত, এখানে 'অন্ত' শব্দগুচ্ছটি হলো প্রত্যয়।

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পার্থক্য : প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের পার্থক্য নিচে উপস্থাপন করা হলো–

উদাহরণ	প্রকৃতি	প্রত্যয়
১। নী+অক = নায়ক	এখানে 'নী' ধাতুমূলটি হলো প্রকৃতি। এর অর্থ আছে।	এখানে 'অক' বর্ণগুচ্ছটি হলো প্রত্যয়। এর কোনো অর্থ নেই।
২। কাঁদ্+অন = কাঁদন	এখানে 'কাঁদ' ধাতুমূলটি হলো প্রকৃতি। এর অর্থ আছে।	এখানে 'অন' বর্ণগুচ্ছটি হলো প্রত্যয়। এর কোনো অর্থ নেই।
৩। পাগল + আ = পাগলা	এখানে 'পাগল' শব্দমূলটি হলো প্রকৃতি। এটি অর্থবোধক।	এখানে 'আ' বর্ণটি হলো প্রত্যয়। এটি অর্থহীন। তবে গঠিত নতুন শব্দ একটি বিশেষ অর্থ প্রদান করেছে।

উপরিউক্ত উদাহরণ তিনটির ব্যাখ্যা করলে আমরা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের যে পার্থক্য খুঁজে পাই তা হলো–

১। শব্দ বা ধাতুর ক্ষুদ্রাংশ প্রকৃতি, আর বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের সমষ্টি হলো প্রত্যয়।
২। প্রকৃতির অর্থ আছে কিন্তু প্রত্যয়ের নিজস্ব অর্থ নেই।
৩। প্রকৃতি আগে বসে, আর প্রত্যয় প্রকৃতির পরে বসে।

উপসর্গ ও প্রত্যয়ের পার্থক্য : উপসর্গ ও প্রত্যয়ের পার্থক্য নিম্নরূপ–

উপসর্গ	প্রত্যয়
১। উপসর্গ অব্যয়বাচক শব্দাংশ।	প্রত্যয় অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি।
২। উপসর্গ শুধুমাত্র ধাতুর পূর্বে বসে।	কিন্তু প্রত্যয় ধাতু ও শব্দ উভয়ের পরে বসে।
৩। উপসর্গ তিন প্রকার। যথা– খাঁটি বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি।	কিন্তু প্রত্যয় দু' প্রকার। যথা– কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়।

উপসংহার : প্রকৃতি ও প্রত্যয় দুটি ভিন্ন হলেও এরা মিলিত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে।

▸▸ প্রশ্ন : ৫৭ ॥ প্রত্যয়যোগে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ যে-কোনো পাঁচটি নিয়ম আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা শব্দ গঠনে প্রত্যয়ের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহের একটি বিপুল অংশই প্রত্যয়জাত শব্দ। প্রত্যয় কখনো শব্দের শেষে আবার কখনো ধাতুর শেষে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে। নিচে প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠনের পাঁচটি নিয়ম উপস্থাপিত হলো–

১। **'ইনী' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ :** 'ইনী' প্রত্যয়যোগে সাধারণত স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। এর ফলে শব্দের বানানে পরিবর্তন হয়ে থাকে। যেমন– বন্দি + ইনী = বন্দিনী, গৃহ + ইনী = গৃহিণী, প্রণয় + ইনী = প্রণয়িনী ইত্যাদি।

২। **'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ :** 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দের বানান পরিবর্তিত হয় এবং মূল শব্দ সংকুচিত হয়। যেমন– কুসুম + ইত = কুসুমিত, কণ্টক + ইত = কণ্টকিত, তরঙ্গ + ইত = তরঙ্গিত ইত্যাদি।

৩। **'ইক' (ষ্ণিক) প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ :** 'ইক' বিশেষ্যকে বিশেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর ফলে প্রায়ই মূল শব্দের আদি স্বর বৃদ্ধি পায়। আদি অ–ধ্বনি হয়ে যায় আ, উ/ ঊ/ ও হয় ঔ এবং ই / ঈ / এ হয় ঐ। যেমন– অর্থ + ইক = আর্থিক, অনুষ্ঠান + ইক = আনুষ্ঠানিক, বিপ্লব + ইক = বৈপ্লবিক, জীবন + ইক = জৈবনিক, উপনিবেশ + ইক = ঔপনিবেশিক, বেদান্ত + ইক = বৈদান্তিক ইত্যাদি।

৪। **'য' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ :** 'য' প্রত্যয়যোগে অন্য পদকে বিশেষ্য পদে পরিণত করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত মূল শব্দের আদি স্বর বৃদ্ধি পায়। যেমন– √কৃ + য = কার্য, √ভুজ + য = ভোজ্য, √ত্যজ + য = ত্যাজ্য ইত্যাদি।

৫। **'তা' প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ :** 'তা' প্রত্যয় অন্য পদকে বিশেষ্য বা বিশেষণ পদে পরিণত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এ রকম ক্ষেত্রে মূল শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে তা ই-কার হয়ে যায়। যেমন– সহযোগী + তা = সহযোগিতা, সভ্য + তা = সভ্যতা, উর্বর + তা = উর্বরতা ইত্যাদি।

উপসংহার : প্রত্যয় নানাবিধ উপায়ে শব্দ গঠনে সহায়তা করে। তাই বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে শব্দভাণ্ডারকে আরো বৃদ্ধি করতে প্রত্যয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

▸▸ প্রশ্ন : ৫৮ ॥ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর।

উত্তর ॥

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
	অ	
অগ্রণী	অগ্র+নী	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
অতিথি ['১৪, '১৬]	অত+ইথিন্	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
অজানা	অ+জান্+আ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
অচেনা	অ+চিন্+আ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
অগ্র	অগ্+র	কৃৎ প্রত্যয়
অগ্রিম	অগ্র+ইম	তদ্ধিত প্রত্যয়
অলৌকিক	অ + লৌকিক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
অর্ঘ্য	অর্ঘ+ষ্ণ্য(য)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
অণুমাত্র	অণু+মাত্র	তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্তিম	অন্ত+ইম	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্যথা	অন্য+থা	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
অন্ত্য	অন্ত+য	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
অনুচর	অনু+চর+অ	কৃৎ প্রত্যয়
অত্যন্ত	অতি+অন্ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
	আ	
আঠাল	আঠা+ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
আসমানি	আসমান+ঈ	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়
আফিমখোর	আফিম+খোর	তদ্ধিত প্রত্যয়
আতরদান	আতর+দান	তদ্ধিত প্রত্যয়
আকাশী	আকাশ+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
আগামী	আ+গম+ইন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
আসন	আস+অন	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
আধুলি	আধ+উলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
আবাসিক	আবাস+ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
আফগানিস্তান	আফগানি+স্থান	তদ্ধিত প্রত্যয়
আকস্মিক	অকস্মাৎ+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
আড়তদার	আড়ত+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
আড়াল	আড়+আল	কৃৎ প্রত্যয়
আগুয়ান	আগ+ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
আগ্নেয়	অগ্নি+ষ্ণেয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
আঁটনি	আঁট্+অনি	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
আটক	আট্+অক	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
আত্মবৎ	আত্ম+বৎ	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
আত্মসাৎ	আত্ম+সাৎ	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
আদিম	আদি+ম	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
আঁটুনি	আঁট্+উনি	কৃৎ প্রত্যয়
আত্মীয় [ফা. প. '১১, '১৬]	আত্ম+ঈয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
আদুরে	আদর+ইয়া=আদরিয়া >আদুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
আলস্য	অলস+ষ্ণ	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
আর্থিক	অর্থ + ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

ই, ঈ

ইচ্ছুক	ইচ্ছা+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
ইতরামি	ইতর+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঈদগাহ	ঈদ+গাহ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঈশ্বর	ঈশ+বরচ্ (বর)	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

উ

উক্ত	বচ্+ক্ত	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
উড়ু	উড়্+উয়া	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
উতরাই	উতর+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
উজান	উজ্+আন	কৃৎ প্রত্যয়
উড়ন্ত	উড়্+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
উদ্ভিদ	উৎ+ভিদ	কৃৎ প্রত্যয়
উচ্চতম	উচ্চ+তম	তদ্ধিত প্রত্যয়
উড়ান	উড়্+আন	কৃৎ প্রত্যয়
উক্তি	বচ্ + ক্তি (ত)	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
উপ্ত	উপ্+ত	কৃৎ প্রত্যয়
উঠতি	উঠ্+তি	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

এ, ঐ, ও

একহারা	এক+হারা	তদ্ধিত প্রত্যয়
এঁটেল	আঠা+ল=আঠাল> এঁটেল	তদ্ধিত প্রত্যয়
এমন	এ+মন	তদ্ধিত প্রত্যয়
একত্র	এক+ত্র	তদ্ধিত প্রত্যয়
একাকিন	এক+আকিন	তদ্ধিত প্রত্যয়
একদা	এক+দা	তদ্ধিত প্রত্যয়
একুশে	একুশ+এ	তদ্ধিত প্রত্যয়
একলা	এক+লা	তদ্ধিত প্রত্যয়
একক	এক+ক	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐতিহাসিক ['১৯]	ইতিহাস+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐচ্ছিক	ইচ্ছা+ইক	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ঐহিক	ইহ + ইক	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ওকালতি	ওকালত+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ওড়না	ওড়্+না	কৃৎ প্রত্যয়
ওস্তাদী	ওস্তাদ+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ওকালতনামা	ওকালত+নামা	বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়

ক

কুম্ভকার	কুম্ভ+কৃ+অণ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কাণ্ডারি	কাণ্ডার+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঁসারি	কাঁসা+আরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঠুরিয়া	কাঠ+উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
কুলীন	কুল+ঈন	তদ্ধিত প্রত্যয়
কেজো	কাজ+উয়া=কাজুয়া>কেজো	তদ্ধিত প্রত্যয়
কৌশল	কুশল + অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কলমদানি	কলম + দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্কশ	কর্ক+শ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঠুরে	কাঠ+উড়িয়া>কাঠুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
কর্তা	কৃ+তৃচ্	কৃৎ প্রত্যয়
কাঁদন	কাঁদ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
কাঁদুনি	কাঁদ্+অনি> কাঁদুনি	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
কাঁদুনে	কাঁদ+উনে	তদ্ধিত প্রত্যয়
কারক	কৃ+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কৃষক	কৃষ+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কৃপণ	কৃপ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
কমতি	কম+তি	কৃৎ প্রত্যয়
কাব্য	কবি+য	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
কদাচিৎ	কদা+চিৎ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কিঞ্চিৎ	কনা+চিৎ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কথা	কথন+আ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কারিগর	কারি+গর	বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
কাঁপন	কাঁপ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
কুঠিয়াল	কুঠি+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
কার্য	কৃ+য	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ক্রেতা	ক্রী+তৃচ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ক্রমশ	ক্রম+অশ	তদ্ধিত প্রত্যয়
কাটা	কাট্+আ	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়
করণীয়	কৃ+অনীয়	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কর্তব্য ['১৯]	কৃ+তব্য	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
কান্না ['১৯]	কাঁদ্+না	কৃৎ প্রত্যয়
কুঁজো	কুঁজ+উয়া = কুঁজুয়া>কুঁজো	তদ্ধিত প্রত্যয়

খ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
খোঁজা	খুঁজ+আ	কৃৎ প্রত্যয়
খাওয়া	খা+আ	কৃৎ প্রত্যয়
খেলোয়াড়	খেল+ওয়াড়	কৃৎ প্রত্যয়
খেলনা	খেল্+অনা	কৃৎ প্রত্যয়
খ্যাতি	খ্যা+তি	কৃৎ প্রত্যয়
খাসমহল	খাস+মহল	তদ্ধিত প্রত্যয়
খাদক	খাদ্+অক	কৃৎ প্রত্যয়
খাটুনি	খাট+উনি	কৃৎ প্রত্যয়
খাগড়া	খাক্+ড়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
খোদাই	খোদা+আই	কৃৎ প্রত্যয়
খেচর	খে+চর	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
খেকো	খা+উকা = খাউকা>খেকো	কৃৎ প্রত্যয়
খুদিত	খুদ্+ইত	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
	গ	
গড়ান	গড়া+আন	কৃৎ প্রত্যয়
গুণবান	গুণ+বান	তদ্ধিত প্রত্যয়
গোলাপি	গোলাপ+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
গেছো	গাছ+উয়া = গাছুয়া > গেছো	তদ্ধিত প্রত্যয়
গন্তব্য [ঢা. প. '১১, '১৬, '১৯]	গম্+তব্য	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
গেঁয়ো	গাঁ+উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
গোঁয়ার	গাঁও+আর	তদ্ধিত প্রত্যয়
গায়ক	গৈ+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
গোয়ালা	গোয়াল+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
গম্য	গম্+য	কৃৎ প্রত্যয়
গাছটি	গাছ+টি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাইয়ে	গাহ্+ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
গৃহস্থালি	গৃহস্থ+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
গৌরব	গুরু+ষ্ণ (অ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
গ্রামীণ	গ্রাম+ঈন	তদ্ধিত প্রত্যয়
গ্রাম্য	গ্রাম+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
গরিমা	গুরু+ইমন্	তদ্ধিত প্রত্যয়
গমন	গম্+অনট (অন)	কৃৎ প্রত্যয়
গরবিনী	গরব্+ঈনী	তদ্ধিত প্রত্যয়
গাড়োয়ান	গাড়ি+ওয়ান	তদ্ধিত প্রত্যয়
গত	গম্+ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
গালিচা	গালা+ইচা	তদ্ধিত প্রত্যয়
গোলামি	গোলাম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
গর্ত	গম+ত	কৃৎ প্রত্যয়
গণনা	গণন+আ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
	ঘ	
ঘাতক	হন্+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ঘরোয়া	ঘর+ওয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘটক	ঘট্+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ঘটনা	ঘটন+আ	কৃৎ প্রত্যয়
ঘটকালি	ঘটক+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘুষখোর	ঘুষ+খোর	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘরামি	ঘর+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ঘামাচি	ঘাম+আচি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঘেরাও	ঘির্+আও	কৃৎ প্রত্যয়
ঘুমন্ত	ঘুম্+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ঘাটতি	ঘাট্+তি	কৃৎ প্রত্যয়
ঘোলাটে	ঘোলা+টে	তদ্ধিত প্রত্যয়

চ

চীনা	চীন+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চালবাজ	চাল+বাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাঁদিমা	চাঁদ+ইমা	তদ্ধিত প্রত্যয়
চলতি	চল্+তি	কৃৎ প্রত্যয়
চাঁদা	চাঁদ+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাঁদোয়া	চাঁদ+ওয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাপাবাজি	চাপা+বাজি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চৌকিদার	চৌকি+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
চলন্ত	চল্+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
চাকা	চাক+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
চতুরালি	চতুর+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চষা	চষ+আ	কৃৎ প্রত্যয়
চরিত্র	চর+ইত্র	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
চুমুক	চুম্+উক	কৃৎ প্রত্যয়
চুকতি	চুক্+তি	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
চরণ	চর+অন	কৃৎ প্রত্যয়
চাকরি	চাকর+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চোরাই	চোর+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চোরামি	চোর+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চালান	চাল্+আন	কৃৎ প্রত্যয়
চলচ্চিত্র	চলৎ+চিত্র	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাটাই	চাটা+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাঁদপনা	চাঁদ+পনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
চালাকি	চালাক+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়া+খানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
চেনা	চিন+আ	কৃৎ প্রত্যয়
চিরুনি	চির্+উনি	কৃৎ প্রত্যয়
চড়াই	চড়্+আই	কৃৎ প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
চড়াও	চড়্+আও	কৃৎ প্রত্যয়
চলতি	চল্+তি	কৃৎ প্রত্যয়
চালু	চল্+উ	কৃৎ প্রত্যয়
চাষি	চাষ্+ই	কৃৎ প্রত্যয়
চামার	চাম+আর	তদ্ধিত প্রত্যয়
চামড়া	চাম+ড়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
চালাকি	চালাক+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চিন্ময়	চিৎ+ময়	কৃৎ প্রত্যয়
চাকুরে	চাকর+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
চলনসই	চলন+সই	তদ্ধিত প্রত্যয়
চৈতালি ['১১, '১৪]	চৈত+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাষাড়ে	চাষ+উড়িয়া>উড়ে	তদ্ধিত প্রত্যয়
চাউনী	চা+উনী	কৃৎ প্রত্যয়

ছ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ছাউনি	ছা+উনি	কৃৎ প্রত্যয়
ছেলেমি	ছেলে+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছাঁটাই	ছাঁট+আই	কৃৎ প্রত্যয়
ছটফটে	ছটফট্+ইয়া= ছটফটিয়া>ছটফটে	কৃৎ প্রত্যয়
ছাত্র	ছাত্র+অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছুটি	ছুট্+ই	কৃৎ প্রত্যয়
ছোঁয়াচ	ছোঁয়া+আচ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছেদন	ছেদ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
ছাতি	ছাতা+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ছটফটানি	ছট্‌ফট+আনি	কৃৎ প্রত্যয়
ছোড়ান	ছোড়+আন	কৃৎ প্রত্যয়

জ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জমাট	জমা+আট	তদ্ধিত প্রত্যয়
জয়	জি+অ (অল)	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
জাতীয়	জাতি+ঈয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
জটিলা	জট+লা	তদ্ধিত প্রত্যয়
জলা	জল+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
জলীয়	জল+ঈয়	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
জয়ী	জি+ইন	তদ্ধিত প্রত্যয়
জনতা	জন+তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
জাঁকাল	জাঁক+আল	কৃৎ প্রত্যয়
জমিদার	জমি+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
জমানো	জম+আনো	তদ্ধিত প্রত্যয়
জলময়	জল+ময়	তদ্ধিত প্রত্যয়
জেলখানা	জেল্+খানা	তদ্ধিত প্রত্যয়
জানান	জান+আন	কৃৎ প্রত্যয়
জবানবন্দি	জবান+বন্দি	তদ্ধিত প্রত্যয়
জনক	জন+অক	কৃৎ প্রত্যয়
জিয়ানো	জিয়া+আনো	তদ্ধিত প্রত্যয়
জ্ঞানী	জ্ঞান+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
জ্যান্ত	জী+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জেলে	জাল+ইয়া = জালিয়া>জেলে	তদ্ধিত প্রত্যয়
জ্বলন্ত	জ্বল+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জাফরানি	জাফরান+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
জীবন্ত	জীব+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
জটিল	জটা+ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
জুয়াড়ি	জুয়া+আড়ি	তদ্ধিত প্রত্যয়

ঝ

ঝাঁকুনি	ঝাঁক+উনি	কৃৎ প্রত্যয়
ঝলক	ঝল+অক	কৃৎ প্রত্যয়
ঝাঁকানি	ঝাঁক+আনি	কৃৎ প্রত্যয়
ঝাপসা	ঝাপ+সা	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝালাই	ঝাল+আই	কৃৎ প্রত্যয়
ঝুলন	ঝুল+অন	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝাড়ুদার	ঝাড়ু+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝড়ো	ঝড়+উয়া = ঝড়োয়া>ঝড়ো	কৃৎ প্রত্যয়
ঝিয়ারী	ঝি+আরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝগড়াটে	ঝগড়া+টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঝরনা	ঝর্+না	কৃৎ প্রত্যয়
ঝাড়ন	ঝাড়+অন	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

ট, ঠ

টেকসই	টেক+সই	কৃৎ প্রত্যয়
টেকো	টাক্+উয়া = টাকুয়া>টেকো	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
টনক	টান+অক	কৃৎ প্রত্যয়
ঠাকুরালি	ঠাকুর+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঠকা	ঠক+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
	ড	
ডাকাত	ডাক+আইত = ডাকাইত >ডাকাত	কৃৎ প্রত্যয়
ডুবুরি	ডুব+উড়ি	কৃৎ প্রত্যয়
ডুবন্ত	ডুব্+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ডাক্তারি	ডাক্তার+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডিঙা	ডিঙি+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকাতি	ডাকাত+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ডাকু	ডাক্+উ	কৃৎ প্রত্যয়
	ঢ	
ঢাকাই ['০৮, '১৫, '১৮]	ঢাকা+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকি	ঢাক+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢুলি	ঢোল+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকুনি	ঢাকুন+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
ঢাকনা	ঢাক্+না	কৃৎ প্রত্যয়
ঢালাই	ঢাল+আই	কৃৎ প্রত্যয়
ঢালু	ঢাল+উ	তদ্ধিত প্রত্যয়
	ত	
তবলচি ['১৪]	তবল+চি	তদ্ধিত প্রত্যয়
তারুণ্য	তরুণ+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
তক্তা	তক্ত+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
তরল	তৃ+অল	কৃৎ প্রত্যয়
তামাটে	তামা+টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
তালব্য	তালু+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
ত্যাজ্য	ত্যজ্+য	কৃৎ প্রত্যয়
	দ	
দ্রাঘিমা	দীর্ঘ+ইমন+(ইমা)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
দিশি	দিশ+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দেশি	দেশ+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্পণ	দৃপ্+অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
দুষ্টামি	দুষ্ট+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
দাতব্য	দা+তব্য	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
দালালি	দালাল+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈত্য	দিতি+ষ্ণ্য (অ)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈন্য	দিন+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
দোলনা	দুল্+অনা	কৃৎ প্রত্যয়
দুঃখিত	দুঃখ+ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
দেনাদার	দেনা+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
দয়ালু	দয়া+আলু	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শন	দৃশ্+অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
দিব্য	দিব+য	কৃৎ প্রত্যয়
দাগী	দাগ+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দামি	দাম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
দাবাড়ু	দাবা+আড়ু	তদ্ধিত প্রত্যয়
দাঁতাল	দাঁত+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দাঙ্গাবাজ	দাঙ্গা+বাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শক	দৃশ্+ণক (অক)	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
দুধাল	দুধ+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দুগ্ধ	দুহ্+ক্ত	কৃৎ প্রত্যয়
দৈনিক	দিন+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
দর্শনীয়	দৃশ্+অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
দিশারি	দিশ্+আরি	কৃৎ প্রত্যয়
দাতা	দা+তৃচ্	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
দুধেল	দুধ+আল = দুধাল>দুধেল	তদ্ধিত প্রত্যয়
দারোয়ান	দার+ওয়ান	বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
দৈহিক	দেহ+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়

ধ

ধোঁয়াটে	ধোঁয়া+টে	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধোয়া	ধু+আ	কৃৎ প্রত্যয়
ধোঁকাবাজ	ধোঁকা+বাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধার্মিক ['১৯]	ধর্ম+ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধৈর্য	ধীর+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
ধর্তব্য	ধৃ+তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
ধুনুরি	ধুন্+আরি/ওরি	কৃৎ প্রত্যয়
ধাতব	ধাতু+ষ্ণ (অ)	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
	ন	
নয়ন	নী+অন (অনট)	কৃৎ প্রত্যয়
নাচিয়ে	নাচ্+ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
নাবিক	নৌ+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
নর্তক	নৃৎ+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
নকলনবীশ	নকল+নবীশ	তদ্ধিত প্রত্যয়
নোনতা	নুন+তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নাটুকে	নাটক+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
নজরানা	নজর+আনা	তদ্ধিত প্রত্যয়
নাজুক ['১৮]	নাজ+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেয়ে	নাও+উয়া= নউয়া>নেয়ে	তদ্ধিত প্রত্যয়
নিমাই	নিম+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
নায়ক	নী+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
নশ্বর	নশ্ + বরচ্ (বর)	কৃৎ প্রত্যয়
নাচন	নাচ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
নিন্দুক	নিন্দা+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
নীলিমা	নীল+ইমন	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
নবীন	নব+ঈন	তদ্ধিত প্রত্যয়
নেতা	নী+তৃচ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
নিড়ানী	নিড়্+আনি	কৃৎ প্রত্যয়
	প	
পাণ্ডব	পাণ্ডু+অ	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাচক	পচ্+অক	কৃৎ প্রত্যয়
পানীয় ['১৪, '১৬, '১৮]	পা+অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
প্রাচ্য	প্রাচ্+ষ্ণ্য (য)	তদ্ধিত প্রত্যয়
পশমি	পশম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
পবন	পো+অন	কৃৎ প্রত্যয়
পাঠক	পাঠ+অক	কৃৎ প্রত্যয়
পানসা/পানসে	পানি+সা = পানিসা>পানসা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পড়ন্ত	পড়্+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
প্রেম	প্রিয়+ইমন	তদ্ধিত প্রত্যয়
পিচ্ছিল	পিচ্ছা+ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
পানতা	পানি+তা	তদ্ধিত প্রত্যয়
পায়া	পা+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
পাথুরে	পাথর+ইয়া = পাথরিয়া > পাথুরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
পিপাসা	পিপাস+আ	কৃৎ প্রত্যয়
পড়ুয়া	পড়্+উয়া	কৃৎ প্রত্যয়
পার্থিব [ফা. প. '১১, '১৬]	পৃথিবী+ষ্ণ (অ)	তদ্ধিত প্রত্যয়
পেটুক	পেট+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাকামো	পাক+আমো	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাগলামি	পাগল+আমি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পিকদানি	পিক+দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পূজারি	পূজা+আরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাঠ্য	পাঠ+ষ্ণ্য (য)	কৃৎ প্রত্যয়
পথিক	পথ+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
প্রত্যয়	প্রতি+অয়	কৃৎ প্রত্যয়
পণ্ডিত	পণ্ডা+ইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
পঙ্কিল	পঙ্ক+ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
পাথেয়	পথ + ষ্ণেয়	তদ্ধিয় প্রত্যয়
প্রচলিত	প্র+চল্+ইত	কৃৎ প্রত্যয়
পরিশ্রমী	পরিশ্রম+ঈ	বাংলা কৃৎ প্রত্যয়

ফ

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
ফাটল	ফাট+ল	কৃৎ প্রত্যয়
ফুলদানি	ফুল+দানি	তদ্ধিত প্রত্যয়
ফলন্ত	ফল+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ফলন	ফল+অন	কৃৎ প্রত্যয়
ফেনিল	ফেনা+ইল	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ফিরত	ফির+অত	কৃৎ প্রত্যয়
ফুটন্ত	ফুট+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
ফিরতা	ফির+তা	কৃৎ প্রত্যয়

ব

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বর্তমান ['১৪, '১৬]	বৃত+মান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোম্বাই	বোম্বে+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুনো	বন+উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোকামি	বোকা+মি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈচিত্র্য	বিচিত্র+য	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
বিজ্ঞান	বি+জ্ঞা+অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
বোনাই	বোন+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বাবুয়ানা	বাবু+আনা	বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
বেঙাচি	বেঙ+আচি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বারমেসে	বারমাস+এ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বর্ষণ	বৃষ্+অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
বাঁশরী	বাঁশ+রী	তদ্ধিত প্রত্যয়
বুদ্ধিমান	বুদ্ধি+মান	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাগিচা	বাগ+চা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বন্দিনী	বন্দি+নী	তদ্ধিত প্রত্যয়
বার্ষিক	বর্ষ+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
বড়াই	বড়+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাদলা	বাদল+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বহতা	বহ+তা	কৃৎ প্রত্যয়
বাঁধন	বাঁধ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
বকুনি	বকা+উনি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঘা	বাঘ+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙ্গাল	বঙ্গ+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঙালি	বাঙাল+ই	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
বাড়ন্ত	বাড়+অন্ত	কৃৎ প্রত্যয়
বাগিচা	বাগ+চা	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈঠক	বৈঠ্+অক	কৃৎ প্রত্যয়
বসতি	বস+তি	কৃৎ প্রত্যয়
বাহন	বাহ্ + অন	কৃৎ প্রত্যয়
বাজনা	বাজ+না	কৃৎ প্রত্যয়
বাজিয়ে	বাজ+ইয়ে	কৃৎ প্রত্যয়
বৈমাত্রেয়	বিমাতা+ষ্ণেয় / বিমাতৃ+ষ্ণেয় (এয়)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
বাঁধাই	বাঁধ+আই	কৃৎ প্রত্যয়
বাঁশি	বাঁশ+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বোমারু	বোমা+আরু	তদ্ধিত প্রত্যয়
বাবুগিরি	বাবু+গিরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
বৈজ্ঞানিক	বিজ্ঞান+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তব্য ['০৮, '১৫]	বচ্+তব্য	কৃৎ প্রত্যয়
বাহাদুরি	বাহাদুর+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বক্তা	বচ্+তৃচ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
বাদামি	বাদাম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
বাবুর্চি	বাবু+চি	বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়
বাংলাদেশি	বাংলাদেশ+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
বসত	বস+ত	কৃৎ প্রত্যয়
বাছাই	বাছ+আই	কৃৎ প্রত্যয়
বদন	বদ+অন	কৃৎ প্রত্যয়
	ভ	
ভক্তি ['০৮, '১৫]	ভজ+তি	কৃৎ প্রত্যয়
ভাজি	ভাজ্+ই	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ভেতো	ভাত+উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভৌগোলিক	ভূগোল+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
ভরাট	ভর্+আট	কৃৎ প্রত্যয়
ভীরু	ভী+রু	কৃৎ প্রত্যয়
ভাতুরে	ভাত+উড়িয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাণ্ডার	ভাণ্ড+আর	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভোজন	ভোজ+অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ভাড়াটে	ভাড়া+টিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
ভাটিয়াল	ভাটি+আল	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়
ভিখারি	ভিক্ষা+আরি	কৃৎ প্রত্যয়
ভয়	ভী+অ	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
ভাবুক ['০৮, '১৫, '১৮]	ভাব+উক	কৃৎ প্রত্যয়
	ম	
মিঠাই	মিঠা+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মোড়ক	মুড়+অক	কৃৎ প্রত্যয়
মাথাল	মাথা+ল	তদ্ধিত প্রত্যয়
মাতা	মাত+আ	কৃৎ প্রত্যয়
মানত	মান+ত	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানব ['১৪, '১৮]	মনু+ষ্ণ (অ)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
মামলাবাজ	মামলা+বাজ	তদ্ধিত প্রত্যয়
মহিমা	মহৎ+ইমন	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
মেয়ে	মা+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিথ্যুক	মিথ্যা+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেয়েলি ['১৯]	মেয়ে+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিতালি	মিতা+আলি	তদ্ধিত প্রত্যয়
মাধুর্য	মধুর+য	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
মড়ক	মড়+অক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মৌখিক	মুখ+ইক	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
মেটে	মাটি+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঠো	মাঠ+উয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেধাবী	মেধা+বিন	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
মিশাল	মিশ+আল	কৃৎ প্রত্যয়
মোগলাই	মোগল+আই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেঘলা	মেঘ+লা	তদ্ধিত প্রত্যয়
মেছো	মাছ+উয়া = মাছুয়া>মেছো	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুগ্ধ	মুহ্+ক্ত	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
মদীয়	মদ+ঈয়	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
মশারি	মশা+আরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
মানানসই	মানান+সই	তদ্ধিত প্রত্যয়
মিশুক	মিশ+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
মুক্ত	মুচ্+ক্ত	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
মন্ত্রী	মন্ত্র + ইন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

য

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
যশস্বী	যশ+[illegible]	তদ্ধিত প্রত্যয়
যোগ	যোগ+অ	কৃৎ প্রত্যয়
যোগান	যোগ+আন	কৃৎ প্রত্যয়
যৌবন	যুব+ষ্ণ (যুবন + ষ্ণ)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
যাচাই	যাচ্+আই	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়

র

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
রুষ্ট	রুষ+ত	কৃৎ প্রত্যয়
রচনা	রচন+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঙানি	রাঙা+আনি	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাঁধা	রাঁধ+আ	কৃৎ প্রত্যয়
রান্না ['১৪, '১৮]	রাঁধ+না	কৃৎ প্রত্যয়
রসাল	রস+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
রোগাটে	রোগা+টিয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
রাখাল	রাখ+আল	কৃৎ প্রত্যয়
রেশমি	রেশম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
রমণীয়	রম+অনীয়	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
রোগা	রোগ+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
	ল	
লাজুক [ফা. প. '১১, '১৬, '১৯]	লাজ+উক	তদ্ধিত প্রত্যয়
লঘিমা	লঘু+ইমন	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
লেঠেল	লাঠি+আল = লাঠিয়াল> লেঠেল	তদ্ধিত প্রত্যয়
লড়াই	লড়া+আই	তদ্ধিত কৃৎ প্রত্যয়
লঘিষ্ঠ	লঘু+ইষ্ঠ	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
লৌকিক	লোক+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
লেখক	লিখ্+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
লাঠিয়াল	লাঠি+আল	তদ্ধিত প্রত্যয়
লটকানো	লটকা+আনো	কৃৎ প্রত্যয়
লবণ	লো+অন	কৃৎ প্রত্যয়
লোনা	লুন+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
লালিমা	লাল+ইমন (ইমা)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
লিখা	লিখ+আ	কৃৎ প্রত্যয়
	শ	
শোনা	শোন+আ	কৃৎ প্রত্যয়
শোচনীয়	শুচ্ + অনীয়	কৃৎ প্রত্যয়
শৈল্পিক	শিল্প+ইক	তদ্ধিত প্রত্যয়
শান্তি	শম+তি	কৃৎ প্রত্যয়
শুকনা	শুক+না	বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়
শীতল	শীত+ল	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
শহুরে	শহর+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্যামলা	শ্যাম+লা	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
শাঁখারি	শাঁখা+আরি	তদ্ধিত প্রত্যয়
শ্রবণ	শ্রু+অনট (অন)	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
শৈশব	শিশু+ষ্ণ (অ)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
শয়ন	শী + অন	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
শিক্ষক	শিক্ষ+অক	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
শুননি	শুন+আনি	কৃৎ প্রত্যয়
শ্যামল	শ্যাম+ল	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
শাঁসাল	শাঁস্ + আল	কৃৎ প্রত্যয়
	স	
সাপুড়ে ['০৮, '১৫]	সাপ+উড়িয়া=সাপুড়িয়া> সাপুড়ে	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌন্দর্য	সুন্দর+য	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
সাঁতারু	সাঁতার+আরু	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহেবি	সাহেব + ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৃষ্টি	সৃজ্ + তি	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
স্থানীয়	স্থান+ঈয়	তদ্ধিত প্রত্যয়
স্রষ্টা	সৃজ্+তৃ	কৃৎ প্রত্যয়
সরোজ	সরস্+জন+অ	কৃৎ প্রত্যয়
সোনালি	সোনা+আলী	তদ্ধিত প্রত্যয়
সহিষ্ণু	সহ্+ইষ্ণু	সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয়
সাহিত্যিক	সাহিত্য+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
সত্তা	সৎ+আ	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাহায্য	সহায়+য	তদ্ধিত প্রত্যয়
সেবাইত	সেবা+আইত	তদ্ধিত প্রত্যয়
সিক্ত	সিচ্+ক্ত	কৃত প্রত্যয়
স্বপ্নিল	স্বপ্ন+ইল	তদ্ধিত প্রত্যয়
সওদাগর	সওদা+গর	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাংবাদিক	সংবাদ+ষ্ণিক (ইক)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
সেকেলে	সেকাল+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়
সেলামি	সেলাম+ই	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌভাগ্য	সুভগ+য	কৃৎ প্রত্যয়
সমঝদার	সমঝ+দার	তদ্ধিত প্রত্যয়
সাপ্তাহিক	সপ্তাহ+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
সৌর	সূর্য+ষ্ণ (অ)	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়

হ

হিমেল	হিম+এল	তদ্ধিত প্রত্যয়
হিসাবী	হিসাব+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
হস্তী	হস্ত+ঈ	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাঁচি	হাঁচ+ই	কৃৎ প্রত্যয়
হন্তা	হন্+তৃচ	কৃৎ প্রত্যয়
হাটুরে	হাট্+উরে	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতুড়ে	হাত+উড়িয়া>উড়ে	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতান	হাত+আন	কৃৎ প্রত্যয়
হিংসুক	হিংসা+উক	সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতিয়ার	হস্ত+ইয়ার	তদ্ধিত প্রত্যয়

প্রদত্ত শব্দ	প্রকৃতি + প্রত্যয়	প্রত্যয়ের নাম
হারামখোর	হারাম+খোর	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাসি	হাস্+ই	কৃৎ প্রত্যয়
হৈমন্তিক	হেমন্ত+ষ্ণিক (ইক)	তদ্ধিত প্রত্যয়
হাতল	হাত+অল	তদ্ধিত প্রত্যয়
হলদে ['১৯]	হলুদ+ইয়া	তদ্ধিত প্রত্যয়

সমাস

▸▸প্রশ্ন : ৫৯ ॥ সমাস কাকে বলে? সমাস কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সমাস ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমাস বহু পদকে একপদে পরিণত করে। সমাস না হলে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। নিচে সমাসের পরিচয় ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো–

সমাসের সংজ্ঞার্থ

পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট অন্বয়যুক্ত দুই বা বহু পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন– আমি, তুমি ও সে = আমরা। এখানে আমি, তুমি ও সে শব্দ তিনটির মিলনেই 'আমরা' হয়েছে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

সমাসের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ নিম্নরূপ–

১। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সমাসের সংজ্ঞায় বলেছেন, "পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহুপদকে একটি পদ করার নাম সমাস।"

২। শ্রী সুকুমার সেন বলেন, "পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে অর্থযুক্ত) দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।"

৩। ড. শাহজাহান মুনির বলেন, "পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা বহুপদ মিলিত হয়ে এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।"

সমাসের প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে সমাস ছয় প্রকার। যথা–

১। **অব্যয়ীভাব সমাস :** যে সমাসের পূর্ব পদে অব্যয় থাকে এবং অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবলমাত্র অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়। যেমন– মরণ পর্যন্ত = আমরণ ইত্যাদি।

২। **কর্মধারয় সমাস :** যেখানে বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের সমাস হয় এবং পরপদের (বিশেষ্যের) অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন– মহান যে পুরুষ = মহাপুরুষ, খাস যে মহল = খাসমহল, যে শান্ত সেই শিষ্ট = শান্তশিষ্ট।

৩। **তৎপুরুষ সমাস :** যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে ফুটে ওঠে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন– মন দ্বারা গড়া = মনগড়া, বনের পতি = বনস্পতি, মেঘ থেকে মুক্ত = মেঘমুক্ত।

৪। **দ্বিগু সমাস :** সমাহার (সমষ্টি) বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন– শত অব্দের সমাহার = শতাব্দী, চার রাস্তার সমাহার = চৌরাস্তা, পঞ্চ নদের সমাহার = পঞ্চনদ ইত্যাদি।

৫। **দ্বন্দ্ব সমাস :** প্রত্যেক সমস্যমান পদের প্রাধান্য বজায় রেখে দুই বা ততোধিক পদের সমন্বয়ে যে সমাস হয়, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন– হাট ও বাজার = হাটবাজার, ভাই ও বোন = ভাইবোন, মাতা ও পিতা = মাতাপিতা ইত্যাদি।

৬। **বহুব্রীহি সমাস :** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ বা প্রাধান্য না বুঝিয়ে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন– দশ আনন যার = দশানন, কানে কানে যে কথা = কানাকানি।

উপসংহার : বাংলা ভাষায় সমাসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার ক্ষেত্রে সমাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

▸▸ প্রশ্ন : ৬০ ॥ সমাস কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণে সমাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমাস বহু পদকে এক পদে পরিণত করে। সমাস না হলে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নিচে সমাসের সংজ্ঞার্থ ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো–

সমাসের সংজ্ঞার্থ

পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট অন্বয়যুক্ত দুই বা বহু পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন– আমি, তুমি ও সে = আমরা। এখানে আমি, তুমি ও সে শব্দ তিনটির মিলনেই 'আমরা' হয়েছে।

১। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহুপদকে একটি পদ করার নাম সমাস।"

২। শ্রী সুকুমার সেন বলেন, "পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে অর্থযুক্ত) দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।"

বাংলা ভাষায় সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ব্যাকরণে তথা ভাষায় সমাস অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রয়োজনীয়তা নিচে তুলে ধরা হলো–

১। **বাক্য সংক্ষেপণ :** সমাস শব্দের অর্থই হলো সংক্ষেপণ। সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহারে বাক্য সংক্ষিপ্ত হয়। কাজেই বাক্য বা বাক্যাংশের সংক্ষেপণে সমাস বিশেষ প্রয়োজনীয়। যেমন– স্ত্রীর সাথে বর্তমান যে = সস্ত্রীক ইত্যাদি।

২। **নতুন নতুন শব্দ গঠন :** নতুন নতুন শব্দ গঠনে ভাষার প্রকাশশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সমাস সে উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে। যেমন– জায়া ও পতি = এ দুটো শব্দের মিলনে সমাস সাধিত শব্দ = দম্পতি।

৩। **শব্দের শ্রুতিমাধুর্য বর্ধন :** সমাস শব্দের শ্রুতিমাধুর্য বৃদ্ধি করে। এতে বক্তব্য সুন্দর করে পেশ করার সুবিধা হয়। বাংলা ভাষায় সমাস মণিহারস্বরূপ। এটা ভাষাকে শ্রুতিমধুর, প্রাঞ্জল ও ছন্দোময় করে তোলে। যেমন– ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা চাল, না বলে ঢেঁকিছাঁটা চাল বললে শুনতে খুবই ভালো শোনায়।

৪। **পরিভাষা গঠন :** পরিভাষা গঠনে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন– চার বাহু দ্বারা রচিত ক্ষেত্র না বলে যদি চতুর্ভুজ বলা হয়, তাতে একটি নতুন পরিভাষাও তৈরি হয়।

৫। **সহচর শব্দ গঠন :** সহচর শব্দ গঠনেও সমাসের গুরুত্ব অনেক বেশি। যেমন– পুঁথি ও পুস্তক = পুঁথিপুস্তক ইত্যাদি।

৬। **বিশেষ্য ও বিশেষণ গঠন :** বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ গঠনে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যেমন- বে (নাই অর্থে) ঈমান যার = বেঈমান ইত্যাদি।

৭। **ভাষাকে সুদৃঢ়করণ :** সমাস ব্যবহারে ভাষা শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হয়। শালীন ও চমৎকার শব্দ সৃষ্টিতে সমাসের ভূমিকা অনন্য।

৮। **দুই পদে তুলনাকরণে :** দুই পদের মধ্যে তুলনাকরণে সমাস ব্যবহৃত হয়। যেমন- কুসুমের ন্যায় কোমল = কুসুমকোমল।

৯। **সুন্দর উপস্থাপনে :** সমাসবদ্ধ শব্দ গুরুগম্ভীর শব্দকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। যেমন- জেলার সদৃশ = উপজেলা বললে ভালো শোনায়।

১০। **ভাষাকে গতিশীলকরণে :** সমাস ভাষাকে গতিশীল করে। যেমন- রাজা 'সিংহ চিহ্নিত যে আসন তাতে বসে আছেন' না বলে, 'সিংহাসনে বসে আছেন' বললে ভাষা গতিশীল হয়।

উপসংহার : বাংলা ভাষায় সমাস অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। সমাস না হলে ভাষার সৌন্দর্য ক্ষুণ্ন হয়। ভাষায় গতিশীলতার পরিবর্তে গতি মন্থর হয়ে পড়ে।

▸▸প্রশ্ন : ৬১ ॥ উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য নিরূপণ কর।

উত্তর ॥ উপমান, উপমিত ও রূপক কর্মধারয় সমাসের পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	উপমান কর্মধারয় সমাস	উপমিত কর্মধারয় সমাস	রূপক কর্মধারয় সমাস
১। সংজ্ঞার্থ	উপমান পদের সাথে সাধারণ ধর্মের যে সমাস হয় তাকে বলে উপমান কর্মধারয় সমাস।	সাধারণ ধর্মের উল্লেখ না থেকে উপমান ও উপমেয় পদে যে সমাস হয় তাকে উপমিত সমাস বলে।	উপমান ও উপমেয় পদ অভেদ কল্পিত হয়ে যে কর্মধারয় সমাস হয় তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে।
২। পদের অবস্থান	উপমান সমাসে উপমেয় পদের উল্লেখ থাকে না, এখানে পূর্ব পদটি সাধারণ অর্থবোধক বিশেষণ হয়।	এক্ষেত্রে উপমেয় পদটি সাধারণত পূর্বে বসে, উপমান পদটি পরে বসে। তবে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই।	রূপক কর্মধারয় সমাসে উপমান পদ পূর্বে এবং উপমেয় পদ পরে বসে।
৩। ব্যাসবাক্য	ন্যায়, মতো, সদৃশ ইত্যাদি ব্যাসবাক্যে ব্যবহার করে উপমান কর্মধারয় সমাস নির্ণয় করা হয়।	সাধারণত ন্যায়, মতো, সদৃশ ইত্যাদি ব্যাসবাক্যে ব্যবহৃত হয়, তবে এক্ষেত্রে এগুলো প্রায়ই পরে বসে।	এক্ষেত্রে সমস্যমান পদের মধ্যে রূপ অথবা ই যোগ করে ব্যাসবাক্য গঠন করতে হয়।
৪। পদের কাজ	এখানে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদে সমাস হয়।	এখানে বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের তুলনা করা হয়।	এখানে পূর্ব পদ ও উত্তর পদ উভয়ই বিশেষ্য হয়ে থাকে।
৫। উদাহরণ	রক্তের মতো লাল = রক্তলাল। তুষারের ন্যায় ধবল = তুষার ধবল।	পুরুষ সিংহের ন্যায় = পুরুষসিংহ, মানব লৌহ সদৃশ = লৌহমানব।	মন রূপ মাঝি = মনমাঝি। ভব রূপ নদী = ভবনদী ইত্যাদি।

উপসংহার : উল্লিখিত সবকটিই কর্মধারয় সমাসের অন্তর্গত। এর প্রত্যেকটি অপরটি থেকে কতিপয় ব্যাপারে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে।

প্রশ্ন : ৬২ ॥ সমাস কাকে বলে? শব্দগঠনে সমাসের গুরুত্ব আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণে সমাসের আলোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সমাস অর্থ সংক্ষিপ্তকরণ, একাধিক পদ একপদীকরণ। সমাস নতুন শব্দ গঠনের একটি বিশেষ উপায়। সমাসের সাহায্যে দুই বা ততোধিক পদের মিলনে একটি নতুন পদ তৈরি হয়। যা ভাষাকে গতিশীল, বাক্যকে সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল করে তোলে।

সমাসের সংজ্ঞার্থ

পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট অন্বয়যুক্ত দুই বা বহু পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। যেমন– আমি, তুমি ও সে = আমরা। এখানে আমি, তুমি ও সে শব্দ তিনটির মিলনেই 'আমরা' হয়েছে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ

সমাসের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞার্থ নিম্নরূপ–

১। জ্ঞানতাপস ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সমাস-এর সংজ্ঞায় বলেছেন, "পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহুপদকে একটি পদ করার নাম সমাস।"

২। শ্রী সুকুমার সেন বলেন, "পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট (অর্থাৎ ঘনিষ্ঠভাবে অর্থযুক্ত) দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।"

৩। ড. শাহজাহান মুনির বলেন, "পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুই বা বহুপদ মিলিত হয়ে একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে।"

শব্দগঠনে সমাসের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় শব্দগঠনের যেসব উপায় রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো সমাস। এর দ্বারা দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি হয়। এটি শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের একটি বিশেষ রীতি। এতে সংক্ষেপে আমরা অধিকতর অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ পাই এবং ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল, বোধগম্য ও প্রাঞ্জল হয়। 'সমাস' শব্দের প্রকৃতিগত অর্থ একত্রে অবস্থান। যেমন– 'স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর' না বলে 'স্বর্ণাক্ষর' বললে অর্থ ব্যঞ্জনাময় ও সংক্ষিপ্ত হয়ে নতুনরূপ পরিগ্রহ করে। নতুন নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে সমাস ভাষার শব্দ-ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ও পরিভাষা ব্যবহারের জন্য সমাস নতুন শব্দ গঠন করতে সহায়তা করে। তাই বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে সমাসের গুরুত্ব অত্যধিক।

উপসংহার : নব নব শব্দ তৈরি করে ভাষার সমৃদ্ধি সাধন, ভাষার সংক্ষিপ্ততা, শ্রুতিমাধুর্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও অলঙ্করণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

প্রশ্ন : ৬৩ ॥ সমাসের সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০১০]

উত্তর ।। উপস্থাপনা : সমাস শব্দ গঠনের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া। সমাস দুই বা ততোধিক শব্দের সমন্বয়ে নতুন অর্থবোধক পদ সৃষ্টি করে। এ প্রক্রিয়ায় নতুন অনেক শব্দগঠন সম্ভব হয়, যা বাংলা ভাষার শব্দভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। সমাসের সাহায্যে যে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে সমাসবদ্ধ শব্দ বলে।

সমাসযোগে শব্দ গঠনের উদাহরণ

১। **দ্বন্দ্ব সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** বন ও বাদাড় = বনবাদাড়, জীবন ও মরণ = জীবনমরণ, হাট ও বাজার = হাটবাজার ইত্যাদি।

২। **কর্মধারয় সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** নীল যে উৎপল = নীলোৎপল, মহান যে বীর = মহাবীর, সিদ্ধ যে আলু = আলুসিদ্ধ, সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন ইত্যাদি।

৩। **তৎপুরুষ সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** চিরকাল ব্যাপীয়া সুখী = চিরসুখী, আগা হতে গোড়া = আগাগোড়া, রাজার পুত্র = রাজপুত্র, জলে চরে যে = জলচর ইত্যাদি।

৪। **দ্বিগু সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, সে (তিন) তারের সমাহার = সেতার, পঞ্চ বটের সমাহার = পঞ্চবট ইত্যাদি।

৫। **অব্যয়ীভাব সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** জীবন পর্যন্ত = আজীবন, কূলের সমীপে = উপকূল, রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি ইত্যাদি।

৬। **বহুব্রীহি সমাসের সাহায্যে শব্দগঠন :** নদী মাতা যার = নদীমাতৃক, কানে কানে যে কথা = কানাকানি, সমান উদর যার = সহোদর, ন (নাই) জ্ঞান যার = অজ্ঞান ইত্যাদি।

উপসংহার : শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে সমাস নতুন নতুন শব্দ গঠন করে ভাব প্রকাশে সহায়তা করে এবং ভাষাকে করে সমৃদ্ধ।

» প্রশ্ন : ৬৪ ॥ ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর।

উত্তর ।। বিগত কয়েক বছরে বোর্ড প্রশ্নে আগত এবং গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সমাসের ব্যাসবাক্য ও নামসহ সমাস নির্ণয়ের উদাহরণ–

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
	অ	
অগ্নিপরীক্ষা	অগ্নিতে পুড়িয়ে পরীক্ষা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অগ্রজ ['১২]	অগ্রে জন্ম যার	কর্মধারয়
অল্পায়ু	অল্প আয়ু যার	বহুব্রীহি
অকাতর	ন কাতর	নঞ তৎপুরুষ
অজানা	ন জানা	নঞ তৎপুরুষ
অনাদর	ন আদর	নঞ তৎপুরুষ
অভাব	ন ভাব	নঞ তৎপুরুষ
অভদ্র	নয় ভদ্র	নঞ তৎপুরুষ
অস্থির	নয় স্থির	নঞ তৎপুরুষ
অন্যমনা	অন্যদিকে মন যার	বহুব্রীহি
অবিশ্বাস	ন বিশ্বাস	নঞ তৎপুরুষ
অনুরূপ	রূপের যোগ্য	অব্যয়ীভাব
অষ্টাদশ	অষ্ট অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
অরুণরাঙা	অরুণের ন্যায় রাঙা	উপমান কর্মধারয়
অনাথাশ্রম	অনাথের নিমিত্ত যে আশ্রম	চতুর্থী তৎপুরুষ
অক্লান্ত	নয় ক্লান্ত	নঞ তৎপুরুষ
অপয়া	নেই পয়া (ভাগ্য) যার	নঞ তৎপুরুষ
অদৃষ্টপূর্ব	পূর্বে অদৃষ্ট	সপ্তমী তৎপুরুষ
অনুকূল	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অনাদি	আদি নেই যার	নঞ বহুব্রীহি
অসাধ্য	ন সাধ্য	নঞ তৎপুরুষ
অন্যায়	নয় ন্যায়	নঞ তৎপুরুষ
অনুসরণ	পশ্চাৎ সরণ	অব্যয়ীভাব
অকূল	নেই কূল	নঞ তৎপুরুষ
অনুগমন	পশ্চাৎ গমন	অব্যয়ীভাব
অজমূর্খ	অজের ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়
অব্যয়	ন ব্যয়	নঞ তৎপুরুষ
অনশন	ন অশন	নঞ তৎপুরুষ
অল্পবুদ্ধি	অল্প বুদ্ধি যার	বহুব্রীহি
অর্ধপথ	অর্ধ যে পথ	কর্মধারয়
অনেক	ন এক	নঞ তৎপুরুষ
অনভিজ্ঞ	নয় অভিজ্ঞ	নঞ তৎপুরুষ
অজ্ঞান	নেই জ্ঞান	নঞ তৎপুরুষ
অহিনকুল	অহি ও নকুল	দ্বন্দ্ব
অনুচিত	নয় উচিত	নঞ তৎপুরুষ
অনধিক	নয় অধিক	নঞ তৎপুরুষ
অকালমৃত্যু	অকালে মৃত্যু	সপ্তমী তৎপুরুষ
অকাল	ন কাল	নঞ তৎপুরুষ
অসুখ	নয় সুখ	নঞ তৎপুরুষ
অবুঝ	নয় বুঝ	নঞ তৎপুরুষ
অনাবৃষ্টি	নেই বৃষ্টি	নঞ তৎপুরুষ
অনর্থ	ন অর্থ	নঞ তৎপুরুষ
অকৃতজ্ঞ	নয় কৃতজ্ঞ	নঞ তৎপুরুষ
অহোরাত্র	অহো ও রাত্র	দ্বন্দ্ব
অনন্ত	নয় অন্ত	নঞ তৎপুরুষ
অভিমুখ	মুখের দিকে	নিত্য
অর্থাভাব	অর্থের অভাব	অব্যয়ীভাব
অলৌকিক	ন লৌকিক	নঞ তৎপুরুষ
অর্থনীতি	অর্থের নীতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
অন্তরীপ	অন্তর্গত অপ যার	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
অবোধ	নেই বোধ যার	নঞ তৎপুরুষ
অচল	নয় চল	নঞ তৎপুরুষ
অনৈক্য	নয় ঐক্য	নঞ তৎপুরুষ
অনুর্বর	নয় উর্বর	নঞ তৎপুরুষ
অর্ধচন্দ্র	চন্দ্রের অর্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
অধ্যয়নরত	অধ্যয়নে রত	সপ্তমী তৎপুরুষ
অধর্ম	নয় ধর্ম	নঞ তৎপুরুষ
অনুক্ষণ	ক্ষণে ক্ষণে	অব্যয়ীভাব
অনাচার	নয় আচার	নঞ তৎপুরুষ
অকালকুষ্মাণ্ড	অকালে জাত কুষ্মাণ্ড	মধ্য পদলোপী কর্মধারয়
অশ্বডিম্ব	অশ্বের ডিম্ব	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

আ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আঁখিপাখি	আঁখি রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
আজকাল	আজ ও কাল	দ্বন্দ্ব
আমরণ ['১২]	মরণ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আমূল	মূল পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আপাদমস্তক	পা হতে মাথা পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আগাগোড়া	আগা হতে গোড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
আগাছা	নয় গাছা	নঞ তৎপুরুষ
আমরা ['১৭, '১৯]	আমি, তুমি ও সে	দ্বন্দ্ব
আলুভাজা	ভাজা যে আলু	কর্মধারয়
আইন আদালত	আইন ও আদালত	দ্বন্দ্ব
আজানু	জানু পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আজীবন	জীবন পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আকাশবাণী	আকাশের বাণী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
আটচালা	আট চাল বিশিষ্ট যা	বহুব্রীহি
আসমুদ্র	সমুদ্র পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আকণ্ঠ	কণ্ঠ পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আজন্ম	জন্ম পর্যন্ত	অব্যয়ীভাব
আনাড়ী	নাড়ী জ্ঞান নেই যার	বহুব্রীহি
আলুনি	নুনের অভাব	অব্যয়ীভাব
আয়কর	আয়ের ওপর কর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আটঘাট	আট ও ঘাট	দ্বন্দ্ব
আলুসিদ্ধ	সিদ্ধ যে আলু	কর্মধারয়
আনাগোনা	আনা ও গোনা	দ্বন্দ্ব
আবালবৃদ্ধবণিতা	আবাল, বৃদ্ধ ও বণিতা	দ্বন্দ্ব
আদ্যন্ত	আদি হতে অন্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
আশীবিষ	আশীতে বিষ যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
আনত	ঈষৎ নত	কর্মধারয়
আত্মগত	আত্মাকে গত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
আয়তলোচন	আয়ত লোচন যার	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
আনন্দমেলা	আনন্দের জন্য যে মেলা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
আলিঙ্গন	অঙ্গে অঙ্গে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
আকাল	অপকৃষ্ট কাল	অব্যয়ীভাব

ই, ঈ

ইটকাঠ	ইট ও কাঠ	দ্বন্দ্ব
ইন্দ্রজিৎ	ইন্দ্রকে জয় করেছে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ইস্পাত কঠিন	ইস্পাতের ন্যায় কঠিন	উপমান কর্মধারয়
ইত্যাদি	ইতি হতে আদি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ইতর ভদ্র	ইতর ও ভদ্র	দ্বন্দ্ব
ইন্দ্রজাল	ইন্দ্রের জাল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ইন্দ্রধনু	ইন্দ্রের ধনু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঈদগাহ	ঈদের নিমিত্ত গাহ	চতুর্থী তৎপুরুষ
ঈশ্বরপ্রাপ্ত	ঈশ্বরকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

উ, ঊ, ঋ

উপকথা	কথার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপজাতি	জাতির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপকণ্ঠ ['০৯]	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপগ্রহ	গ্রহের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপবন	বনের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপকূল ['১৭]	কূলের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপদ্বীপ	দ্বীপের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপনদী ['১৯]	নদীর সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উপভাষা	ভাষার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উচ্ছৃঙ্খল	শৃঙ্খলাকে অতিক্রম	অব্যয়ীভাব
উপবিধি	বিধির অন্তর্গত	অব্যয়ীভাব
উত্তরকাল	কালের উত্তর ভাগ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
উদ্বেল	বেলাকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উনিশবিশ	উনিশ এবং বিশ	দ্বন্দ্ব
উপসাগর	সাগরের সদৃশ	অব্যয়ীভাব
ঊর্ণনাভ	ঊর্ণ নাভিতে যার	বহুব্রীহি
ঊনপাঁজুরে	ঊন পাঁজুরে যার	বহুব্রীহি
উপকণ্ঠ	কণ্ঠের সমীপে	অব্যয়ীভাব
উপজেলা	জেলার সদৃশ	অব্যয়ীভাব
উৎখাত	খাতকে অতিক্রান্ত	অব্যয়ীভাব
উড়োজাহাজ	উড়ে যে জাহাজ	কর্মধারয়
উদ্বাস্তু	বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঋষিকবি	যিনি ঋষি তিনি কবি	কর্মধারয়
ঋষিকেশ	ঋষির কেশের মতো কেশ যার	বহুব্রীহি
ঋণমুক্ত	ঋণ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ঋষিমন	ঋষির তুল্য মন	কর্মধারয়
	এ	
একচোখা	এক চোখ যার	বহুব্রীহি
একমুঠো	এক মুঠো পরিমাণ যা	বহুব্রীহি
একাগ্রচিত্ত	এক আগ্রহে নিবিষ্ট চিত্ত	কর্মধারয়
একমণি	একমণ ওজন যার	বহুব্রীহি
একমাত্র	কেবল মাত্র	নিত্য
এতিম	পিতামাতা হারিয়েছে যে শিশু	বহুব্রীহি
একগজী	এক গজের পরিমাপ যার	বহুব্রীহি
এক ঘরে	এক ঘরে যে	বহুব্রীহি
এক-কম	এক দ্বারা কম	তৃতীয়া তৎপুরুষ
	ঐ, ও, ঔ	
ঐতিহাসিক	ইতিহাস সম্পর্কিত যা	বহুব্রীহি
ওঠাবসা	ওঠা ও বসা	দ্বন্দ্ব
ওলকপি	ওলের মতো কপি	উপমান কর্মধারয়
ওষ্ঠাগত	ওষ্ঠে আগত	সপ্তমী তৎপুরুষ
ঔষধালয়	ঔষধের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঔপন্যাসিক	উপন্যাস লিখেন যিনি	বহুব্রীহি
	ক	
কাগজ কলম	কাগজ ও কলম	দ্বন্দ্ব
কাপুরুষ	কু যে পুরুষ	কর্মধারয়
করকমল	কর কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
করপল্লব	কর পল্লবের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
কলাবেচা	কলাকে বেচা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কালান্তর	কালের অন্তর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কানাকানি ['০৯, '১৩]	কানে কানে যে কথা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ক্রোধানল	ক্রোধ রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
কান্নাহাসি	কান্না ও হাসি	দ্বন্দ্ব
কানাকড়ি	কানা যে কড়ি	কর্মধারয়
কালসর্প	কাল রূপ সর্প	রূপক কর্মধারয়
কর্ণফুলী	কর্ণে ফুল আছে যার	কর্মধারয়
কদাচার	কু যে আচার	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
কোলাকুলি	কোলে কোলে যে মিলন	ব্যতিহার বহুব্রীহি
কালনাগ	কাল যে নাগ	কর্মধারয়
কুসুমকালো	কুসুমের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
কুন্দশুভ্র	কুন্দের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
কৃতবিদ্যা	কৃত হয়েছে বিদ্যা যার	বহুব্রীহি
কাপড় কাঁচা	কাপড়কে কাঁচা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
কবিশ্রেষ্ঠ	কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ	সপ্তমী তৎপুরুষ
কর্মকর্তা	কর্মের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কাঁচামিঠা	যা কাঁচা তা-ই মিঠা	কর্মধারয়
কাঁচকলা	কাঁচা যে কলা	কর্মধারয়
কুসুম কোমল	কুসুমের ন্যায় কোমল	উপমান কর্মধারয়
করদ	কর দান করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কুম্ভকার	কুম্ভ করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
কাঠফাটা	কাঠ ফাটায় যে	উপপদ তৎপুরুষ
কলুর বলদ	কলুর বলদ	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
কালচক্র	কাল রূপ চক্র	রূপক কর্মধারয়
কাঁচা পাকা	যা কাঁচা তা-ই পাকা	কর্মধারয়
কালসাপ	কাল রূপ সাপ	রূপক কর্মধারয়
কাজল কালো	কাজলের ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
কোকিল কণ্ঠী	কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যার	বহুব্রীহি
কটাচোখ	কটা চোখ যার	বহুব্রীহি
কোলেপিঠে	কোলে ও পিঠে	অলুক দ্বন্দ্ব
কাগজপত্র	কাগজ ও পত্র	দ্বন্দ্ব
কবিগুরু	কবিদের গুরু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

খ

খড়্গহস্ত	খড়্গ হস্তে যার	বহুব্রীহি
খোদাভক্তি	খোদাকে ভক্তি	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
খোশমেজাজ	খোশ মেজাজ যার	বহুব্রীহি
খাতাপত্র	খাতা ও পত্র	দ্বন্দ্ব
খাসমহল ['১৩]	খাস যে মহল	কর্মধারয়
খেলার মাঠ	খেলার নিমিত্ত যে মাঠ	চতুর্থী তৎপুরুষ
খয়ের-খাঁ	খয়ের খাঁ যে	কর্মধারয়
খালকাটা	খালকে কাটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
খেচর	আকাশে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
খেয়াঘাট	খেয়ার ঘাট	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
খবরবার্তা	খবর ও বার্তা	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
খাইখরচ	খাওয়ার জন্য খরচ	চতুর্থী তৎপুরুষ
খাপছাড়া	খাপ থেকে ছাড়া	পঞ্চমী তৎপুরুষ
খুনাখুনি	খুনে খুনে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
খনার বচন	খনার বচন	অলুক তৎপুরুষ
খরস্রোত	খর যে স্রোত	কর্মধারয়
খেয়াতরী	খেয়া পারাপারের তরী	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

গ

গৃহান্তর	অন্য গৃহ	নিত্য
গোঁফ-খেজুরে	গোঁফে খেজুর পড়ে থাকলেও খায় না যে	বহুব্রীহি
গা-ঢাকা	গাকে ঢাকা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
গায়ে হলুদ ['০৯, '১৭]	গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	বহুব্রীহি
গরমিল	মিলের অভাব	অব্যয়ীভাব
গণ্যমান্য	গণ্য যিনি মান্যও তিনি	কর্মধারয়
গৃহকর্তা	গৃহের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গায়ে পড়া	গায়ে পড়ে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গোবেচারা	গো যে বেচারা	কর্মধারয়
গুরুশিষ্য	গুরু ও শিষ্য	দ্বন্দ্ব
গাছপাকা	গাছে পাকা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গণতন্ত্র	গণের তন্ত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গালভরা	গালে ভরা	সপ্তমী তৎপুরুষ
গৃহস্থ	গৃহে থাকে যে	উপপদ তৎপুরুষ
গজমূর্খ	গজের ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়
গ্রামান্তর	অন্য গ্রাম	নিত্য
গরহাজির	হাজিরের অভাব	অব্যয়ীভাব
গলাগলি	গলায় গলায় ধরে যে ভাব	বহুব্রীহি
গ্রন্থাগার	গ্রন্থের আগার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গড়াগড়ি	গড়িয়ে গড়িয়ে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
গদিচ্যুত	গদি থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
গুরুজন	গুরু যে জন	কর্মধারয়
গৃহশত্রু	গৃহের শত্রু	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
গামছা	গা মোছা হয় যাতে	বহুব্রীহি
গুণমুগ্ধ	গুণে মুগ্ধ	সপ্তমী তৎপুরুষ

ঘ

ঘরমুখো	ঘরের দিকে মুখ যার	বহুব্রীহি
ঘোড়াগাড়ি	ঘোড়ার গাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঘরজামাই ['১৭]	ঘরে আশ্রিত যে জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘরে বাইরে	ঘরে ও বাইরে	দ্বন্দ্ব
ঘোড়ার ডিম	ঘোড়ার ডিম	অলুক ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘিভাজা	ঘি দ্বারা ভাজা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ঘরদোর	ঘর ও দোর (দুয়ার)	দ্বন্দ্ব
ঘরছাড়া	ঘর ছেড়েছে যে	বহুব্রীহি
ঘরপোড়া	ঘর পোড়া যার	বহুব্রীহি
ঘিভাত	ঘি মাখা ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ঘোলাটে	ঘোলা হয়েছে যা	বহুব্রীহি
ঘুষখোর	ঘুষ খায় যে	উপপদ তৎপুরুষ
ঘুমকাতুরে	ঘুমে কাতর যে	বহুব্রীহি
ঘনঘটা	ঘনের ঘটা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঘুষাঘুষি	ঘুষিতে ঘুষিতে যে দ্বন্দ্ব	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঘুম পাড়ানী	ঘুম পাড়ায় যে বা যা	উপপদ তৎপুরুষ
ঘর্মাক্ত	ঘর্ম দ্বারা অক্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ

চ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চরমপত্র	চরম যে পত্র	কর্মধারয়
চালভাজা	ভাজা যে চাল	কর্মধারয়
চৌমুহনী	চার মোহনার সমাহার	দ্বিগু
চতুষ্পদ	চার পদ যার	বহুব্রীহি
চরণকমল	চরণ কমলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চিরস্মরণীয়	চিরকাল ব্যাপী স্মরণীয়	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চা-বাগান	চায়ের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চরণাশ্রিত	চরণকে আশ্রিত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চৌরাস্তা ['১৯]	চৌ (চার) রাস্তার সমাহার	দ্বিগু
চিত্রশিল্পী	চিত্রের শিল্পী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
চন্দ্রসূর্য	চন্দ্র ও সূর্য	দ্বন্দ্ব
চাঁদবদন	চাঁদের ন্যায় বদন	উপমিত কর্মধারয়
চন্দ্রচূড়	চন্দ্র চূড়ায় যার	বহুব্রীহি
চালাকচতুর	যিনি চালাক তিনি চতুর	কর্মধারয়
চিড়িয়াখানা	চিড়িয়ার খানা	চতুর্থী তৎপুরুষ
চিরশত্রু	চিরকাল ব্যাপী শত্রু	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চারহাতি	চার হাত পরিমাণ যার	বহুব্রীহি
চিরসুখ	চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
চৌমাথা	চৌ (চার) মাথার সমাহার	দ্বিগু
চাঁদমুখ	মুখ চাঁদের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
চালকুমড়া	চালে ধরে যে কুমড়া	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
চোখের বালি	চোখের বালি	অলুক তৎপুরুষ
চন্দ্রমুখ	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
চিন্তামগ্ন	চিন্তায় মগ্ন	সপ্তমী তৎপুরুষ
চুলাচুলি	চুলে চুলে টেনে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চোখাচোখি	চোখে চোখে যে দেখা	ব্যতিহার বহুব্রীহি
চতুর্ভুজ	চারভুজের সমাহার	দ্বিগু

ছ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ছায়াতরু	ছায়া প্রধান তরু	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ছেলেভুলানো	ছেলেকে ভুলানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ছায়াশীতল	ছায়া দ্বারা শীতল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ছাগদুগ্ধ	ছাগীর দুগ্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছায়াছবি	ছায়া ও ছবি	দ্বন্দ্ব
ছাত্রাবাস	ছাত্রের জন্য আবাস	চতুর্থী তৎপুরুষ
ছা-পোষা	ছা-কে পোষা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ছেলেধরা ['১৯]	ছেলে ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ছেলেমেয়ে	ছেলে ও মেয়ে	দ্বন্দ্ব
ছত্রভঙ্গ	ছত্রের ভঙ্গ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ছদ্মবেশ	ছদ্ম যে বেশ	কর্মধারয়
ছন্নছাড়া	ছন্নকে ছাড়া	দ্বিতীয় তৎপুরুষ
ছলচাতুরি	ছল ও চাতুরি	দ্বন্দ্ব

জ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জন্মমৃত্যু	জন্ম ও মৃত্যু	দ্বন্দ্ব
জমকালো	জাঁকজমকপূর্ণ যে আলো	কর্মধারয়
জ্ঞানলোক	জ্ঞানরূপ আলোক	রূপক কর্মধারয়
জীবনবীমা	জীবন রক্ষার্থে বীমা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
জন্মোৎসব	জন্মের স্মরণে যে উৎসব	কর্মধারয়
জলকর	জলের নিমিত্ত কর	চতুর্থী তৎপুরুষ
জন্মান্ধ	জন্ম হতে অন্ধ	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জেলমুক্ত	জেল হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জায়াপতি	জায়া ও পতি	দ্বন্দ্ব
জলচর	জলে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জ্ঞানশূন্য	জ্ঞান দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জলদ	জল দেয় যে	উপপদ তৎপুরুষ
জনাকীর্ণ	জন দ্বারা আকীর্ণ	তৃতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
জেলফেরত	জেল হতে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জনৈক	জন যে এক	কর্মধারয়
জনমানব ['০৯]	জন ও মানব	দ্বন্দ্ব
জীয়নকাঠি	জীয়নের নিমিত্ত যে কাঠি	চতুর্থী তৎপুরুষ
জাতিসংঘ	জাতিসমূহের সংঘ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জেলখালাস	জেল হতে খালাস	পঞ্চমী তৎপুরুষ
জজ সাহেব	যিনি জজ তিনি সাহেব	কর্মধারয়
জাহাঁপনা	জাহানের পনা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জনপথ	জনগণের পথ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জ্বলজ্বলে	জ্বল জ্বল করেছে যে	বহুব্রীহি
জগদ্দল	জগৎ দলে যে	উপপদ তৎপুরুষ
জনশূন্য	জন দ্বারা শূন্য	তৃতীয়া তৎপুরুষ
জাতমারা	জাতকে মারা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
জ্ঞানতাপস	জ্ঞানের তাপস	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
জয়ধ্বনি	জয়সূচক ধ্বনি	কর্মধারয়
জলধি	জলের আধার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ঝ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঝগড়া বিবাদ	ঝগড়া ও বিবাদ	দ্বন্দ্ব
ঝড়ঝাপটা	ঝড়ের ঝাপটা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝিঙেফুল	ঝিঙের ফুল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ঝাল মেটান	ঝালকে মিটান	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ঝিকিমিকি	ঝিকি ও মিকি	দ্বন্দ্ব

ট, ঠ, ড, ঢ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
টিপসই	টিপের সাহায্যে সই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
টানাটানি	টেনে টেনে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
টাকা পয়সা	টাকা ও পয়সা	দ্বন্দ্ব
টকমিষ্টি	টক ও মিষ্টি	দ্বন্দ্ব
ঠেলাঠেলি	ঠেলায় ঠেলায় যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
ঠোঁটকাটা	ঠোঁট কাটা যার	বহুব্রীহি
ঠাকুরদাদা	ঠাকুরের যে দাদা	কর্মধারয়
ডাকঘর	ডাকের নিমিত্ত ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাকমাশুল	ডাকের জন্য মাশুল	চতুর্থী তৎপুরুষ
ডাকগাড়ি	ডাক বহনকারী গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ডাকপিয়ন	ডাক বিলি করে যে পিয়ন	কর্মধারয়
ডাক্তার সাহেব	যিনি ডাক্তার তিনি সাহেব	কর্মধারয়
ঢাকানগরী	ঢাকাই নগরী	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
ঢেঁকিছাঁটা	ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ঢাকপেটা	ঢাককে পেটা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
	ত	
তেপান্তর	তে (তিন) প্রান্তরের সমাহার	দ্বিগু
তালতমাল	তাল ও তমাল	দ্বন্দ্ব
তুষার শীতল	তুষারের ন্যায় শীতল	উপমান কর্মধারয়
ত্রিজগৎ	তে (তিন) জগতের সমাহার	দ্বিগু
তেমাথা	তে (তিন) মাথার সমাহার	দ্বিগু
তুষারশুভ্র	তুষারের ন্যায় শুভ্র	উপমান কর্মধারয়
তুষারধবল	তুষারের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
ত্রিভুবন	ত্রি (তিন) জগতের সমাহার	দ্বিগু
তুষানল	তুষের অনল	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ত্রিকাল	ত্রি (তিন) কালের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিফলা	ত্রি (তিন) ফলের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিরত্ন	ত্রি (তিন) রত্নের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিভুজ	ত্রি (তিন) ভুজের সমাহার	দ্বিগু
তেপায়া	তে (তিন) পায়ার সমাহার	দ্বিগু
তপোবন	তপের নিমিত্ত যে বন	চতুর্থী তৎপুরুষ
ত্রিপদী	ত্রি (তিন) পদের সমাহার	দ্বিগু
ত্রিকোণ	ত্রি (তিন) কোণের সমাহার	দ্বিগু
তিলার্ধ	তিলের অর্ধ	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
তৃণভোজী	তৃণ ভোজন করে যে	বহুব্রীহি
তেলে বেগুনে	তেলে ও বেগুনে	অলুক দ্বন্দ্ব
তালিকাভুক্ত	তালিকায় ভুক্ত	সপ্তমী তৎপুরুষ
তেলেভাজা	তেলে ভাজা	অলুক তৎপুরুষ
তনুলতা	তনু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
তৈলচিত্র	তৈল রঙে আঁকা চিত্র	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
	দ	
দেশপ্রেম ['০৯]	দেশের জন্য প্রেম	চতুর্থী তৎপুরুষ
দ্বীপ	দু'দিকে অপ (জল) যার	নিপাতনে সিদ্ধ বহুব্রীহি
দেশান্তর	অন্য দেশ	নিত্য
দলছুট	দল হতে ছুট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দুধভাত	দুধ মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দেখাদেখি	দেখে দেখে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
দ্রুতগামী	দ্রুত গমন করে যে	কর্মধারয়
দশহাতী	দশ হাত পরিমাণ যা	বহুব্রীহি

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
দ্বাদশ	দুই অধিক দশ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
দুগ্ধধবল	দুগ্ধের ন্যায় ধবল	উপমান কর্মধারয়
দম্পতি	দম (জায়া) ও পতি	দ্বন্দ্ব ['০৭]
দর্শনমাত্র	কেবল দর্শন	নিত্য
দশানন ['১২]	দশ আনন (মুখ) যার	বহুব্রীহি
দুধেভাতে	দুধে ও ভাতে	অলুক দ্বন্দ্ব
দুর্ভিক্ষ	ভিক্ষার অভাব	অব্যয়ীভাব ['০৭]
দেশ বিদেশে	দেশে ও বিদেশে	দ্বন্দ্ব
দশগজি	দশ গজ পরিমাণ যার	বহুব্রীহি
দেশগৌরব	দেশের গৌরব	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
দেখন হাসি	দেখা হলেই হাসে এমন যে	বহুব্রীহি
দু'আনি	দু'আনার সমাহার	দ্বিগু
দোয়াত কলম	দোয়াত ও কলম	দ্বন্দ্ব
দিলদরিয়া	দিল রূপ দরিয়া	রূপক কর্মধারয়
দেবদত্ত	দেবকে দত্ত	চতুর্থী তৎপুরুষ
দুগ্ধজাত	দুগ্ধ হতে জাত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
দ্বীপান্তর	অন্যদ্বীপ	নিত্য
দিনভর	সারা দিন	নিত্য
দ্বিপ্রহর	দুই প্রহরের সমাহার	দ্বিগু
দয়ামায়া	দয়া ও মায়া	দ্বন্দ্ব
দলাদলি	দলে দলে মিলে যে কাজ	ব্যতিহার বহুব্রীহি
দোভাষী	দুই ভাষায় বিজ্ঞ যে	বহুব্রীহি
দু'মনা	দু'দিকে মন যার	বহুব্রীহি
দানপাত্র	দানের জন্য পাত্র	চতুর্থী তৎপুরুষ

ধ

ধরাবাঁধা	ধরা ও বাঁধা	দ্বন্দ্ব
ধুতিচাদর	ধুতি ও চাদর	দ্বন্দ্ব
ধর্মবুদ্ধি	ধর্মে বুদ্ধি যার	বহুব্রীহি
ধামাধরা	ধামা ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ধর্মভীরু	ধর্মে ভীরু	সপ্তমী তৎপুরুষ
ধর্মঘট	ধর্ম রক্ষার্থে ঘট	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ধৈর্যচ্যুত	ধৈর্য থেকে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
ধূলিমাখা	ধূলি দ্বারা মাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ধর্মানুরাগী	ধর্মে অনুরাগী	সপ্তমী তৎপুরুষ

ন

নীলাকাশ	নীল যে আকাশ	কর্মধারয়
নবরত্ন	নব (নয়) রত্নের সমাহার	দ্বিগু

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
নিরুপায়	নেই যার উপায়	নঞ বহুব্রীহি
নৌবহর	নৌ এর সমাহার	দ্বিগু
নদ-নদী	নদ ও নদী	দ্বন্দ্ব
নয়-ছয়	নয় ও ছয়	দ্বন্দ্ব
নিরুৎসাহ	উৎসাহের অভাব	অব্যয়ীভাব
নীলপদ্ম	নীল যে পদ্ম	কর্মধারয়
নবান্ন	নব যে অন্ন	কর্মধারয়
নির্দয়	নেই দয়া যার	নঞ বহুব্রীহি
নিমরাজি	নিম রূপ রাজি	রূপক কর্মধারয়
নীলাম্বর	নীল যে অম্বর	কর্মধারয়
নাতজামাই	নাতি পর্যায়ের যে জামাই	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
নিরামিষ	আমিষের অভাব	অব্যয়ীভাব
নির্ভয়	নেই ভয়	নঞ তৎপুরুষ
নতজানু	নত যে জানু	কর্মধারয়
নির্ভুল	নেই ভুল	নঞ তৎপুরুষ
নির্জন	নেই জন	নঞ তৎপুরুষ
নির্দোষ	নেই দোষ যার	নঞ বহুব্রীহি
নীলকণ্ঠ	নীল কণ্ঠ যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
নদীমাতৃক	নদী মাতা যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ['০৭]
নীতিবাক্য	নীতি বিষয়ক বাক্য	কর্মধারয়
নাতিদীর্ঘ	নয় অতি দীর্ঘ	নঞ তৎপুরুষ
নিখুঁত	নেই খুঁত	নঞ তৎপুরুষ
নতশির	নত যে শির	কর্মধারয়
নৃতত্ত্ব	নৃ বিষয়ক তত্ত্ব	কর্মধারয়

প

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
পথচারী	পথে চরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পকেটমার	পকেট মারে যে	উপপদ তৎপুরুষ
পাঁচফোড়ন	পাঁচ ফোড়নের সমাহার	দ্বিগু
প্রত্যহ	অহ অহ	অব্যয়ীভাব
পোড়াকপাল	পোড়া কপাল যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
পদ্মআঁখি	পদ্মের ন্যায় আঁখি	উপমান কর্মধারয়
পরোক্ষ	অক্ষির অগোচরে	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পাঁচকম	পাঁচ দ্বারা কম	অব্যয়ীভাব
প্রেমডোর	প্রেম রূপ ডোর	রূপক কর্মধারয়
পদ্মনাভ	পদ্ম নাভিতে যার	ব্যধিকরণ বহুব্রীহি
পথঘাট	পথ ও ঘাট	দ্বন্দ্ব

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
প্রতিজন	জন জন	অব্যয়ীভাব
প্রতিবাদ	প্রতি যে বাদ	কর্মধারয়
পঞ্চবটি	পঞ্চবটের সমাহার	দ্বিগু
পঞ্চনদ	পঞ্চ নদের সমাহার	দ্বিগু
পাপমতি	পাপে মতি	সপ্তমী তৎপুরুষ
পীতাম্বর	পীত অম্বর যার	সমানাধিকরণ বহুব্রীহি
পার্শ্বচর	পার্শ্বে বিচরণ করে যে	বহুব্রীহি
প্রতিমূর্তি	মূর্তির সদৃশ	অব্যয়ীভাব
পাঁচহাতী	পাঁচ হাত পরিমাণ যা	বহুব্রীহি
পদচ্যুত	পদ হতে চ্যুত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
প্রশ্নকর্তা	প্রশ্নের কর্তা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
পলান্ন	পল মিশ্রিত অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পুরুষসিংহ	পুরুষ সিংহের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
প্রিয়সখা	প্রিয় যে সখা	কর্মধারয়
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যা	উপপদ তৎপুরুষ
পদদলিত	পদ দ্বারা দলিত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
প্রীতিভোজ	প্রীতি উপলক্ষে ভোজ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
পরানপাখি	পরান রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রগতি	প্র (প্রকৃষ্ট) যে গতি	প্রাদি
প্রভাত	প্র (প্রকৃষ্ট) যে ভাত	প্রাদি
প্রাণপাখি	প্রাণ রূপ পাখি	রূপক কর্মধারয়
প্রাণপ্রিয়	প্রাণ রূপ প্রিয়	রূপক কর্মধারয়
পথভ্রষ্ট	পথ হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
পুণ্যভূমি	পুণ্য যে ভূমি	কর্মধারয়
পরাধীন	পরের অধীন	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
প্রবাসী	প্রবাসে থাকে যে	বহুব্রীহি

ফ

ফুলবাগান	ফুলের বাগান	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ফিবছর	বছর বছর	অব্যয়ীভাব
ফুলবাবু	বাবু ফুলের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
ফুলকুমারী	ফুলের মতো কুমারী	উপমান কর্মধারয়
ফিকানীল	ঈষৎ নীল	অব্যয়ীভাব
ফুলকপি	ফুল যে কপি	কর্মধারয়
ফুলকলি	ফুলের কলি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ফুল তোলা	ফুলকে তোলা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
	ব	
বহুব্রীহি ['১৭, '১৯]	বহু ব্রীহি (ধান) আছে যার	বহুব্রীহি
বনজাত	বনে জাত	সপ্তমী তৎপুরুষ
বিদ্যাধন	বিদ্যা রূপ ধন	রূপক কর্মধারয়
বাদুরচোষা	বাদুর দ্বারা চোষা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বৃষ্টিধৌত	বৃষ্টি দ্বারা ধৌত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বিদ্যাহীন	বিদ্যা দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বিয়েপাগল	বিয়ের জন্য পাগল	চতুর্থী তৎপুরুষ
বাগদত্তা	বাগ দ্বারা দত্তা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বহুরূপী	বহুরূপ ধরে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বিড়ালতপস্বী	বিড়ালের ন্যায় তপস্বী	উপমান কর্মধারয়
বাহুলতা	বাহু লতার ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
বজ্রকণ্ঠ	বজ্রের ন্যায় কণ্ঠ	উপমান কর্মধারয়
বিশ্রী	শ্রীর অভাব	অব্যয়ীভাব
বিষাদসিন্ধু	বিষাদ রূপ সিন্ধু	রূপক কর্মধারয়
বজ্রাহত	বজ্র দ্বারা আহত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
বনচর	বনে চরে যা	বহুব্রীহি
বিশ্বগ্রাসী	বিশ্বকে গ্রাস করে যা	বহুব্রীহি
বিপত্নীক	বি (গত) পত্নী যার	বহুব্রীহি
বিজয় পতাকা	বিজয়সূচক পতাকা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বোঁটাখসা	বোঁটা হতে খসা	পঞ্চমী তৎপুরুষ
বকধার্মিক	বকের ন্যায় ধার্মিক	উপমান কর্মধারয়
বিলাত ফেরত	বিলাত হতে ফেরত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
বনস্পতি ['১৩]	বনের প্রতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বৌভাত	বৌয়ের আগমন উপলক্ষে যে ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
বেতার	বে (নেই) তার যার	নঞ বহুব্রীহি
বীণাপাণি	বীণা পাণিতে যার	বহুব্রীহি
বেহায়া	বে (নেই) হায়া (লজ্জা) যার	নঞ বহুব্রীহি ['০৭]
বুদ্ধিজীবী	বুদ্ধি জীবিকা যার	বহুব্রীহি
বস্তাবন্দি	বস্তায় বন্দি	সপ্তমী তৎপুরুষ
বাজিকর	বাজি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বর্ণচোরা	বর্ণ চুরি করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
বসতবাড়ি	বসতের জন্য বাড়ি	চতুর্থী তৎপুরুষ
বেয়াদব	নেই আদব যার	নঞ বহুব্রীহি
বেহিসাবী	নয় হিসাবী	নঞ তৎপুরুষ
বজ্রাঘাত	বজ্রের ন্যায় আঘাত	উপমান কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
বয়স্কশিক্ষা	বয়স্কদের জন্য শিক্ষা	চতুর্থী তৎপুরুষ
বোধোদয়	বোধের উদয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
বিশ্রী	বি (গত) শ্রী যার	বহুব্রীহি
	ভ	
ভূতপূর্ব	পূর্বে ভূত	সপ্তমী তৎপুরুষ
ভবনদী	ভব রূপ নদী	রূপক কর্মধারয়
ভোজনবিলাসী	ভোজনে বিলাসী	সপ্তমী তৎপুরুষ
ভিক্ষান্ন	ভিক্ষায় লব্ধ অন্ন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
ভোটাধিকার	ভোটের অধিকার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভক্তিসুধা	ভক্তি রূপ সুধা	রূপক কর্মধারয়
ভিক্ষালব্ধ	ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
ভারপ্রাপ্ত	ভারকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ভূচিত্র	ভূ-এর চিত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভদ্রোচিত	ভদ্র জনের উচিত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ভারবাহী	ভার বহন করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
ভদ্রলোক	ভদ্র যে লোক	কর্মধারয়
ভাগ্যচক্র	ভাগ্যের চক্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
	ম	
মনমাঝি ['১৯]	মন রূপ মাঝি	রূপক কর্মধারয়
মুখচন্দ্র	মুখ চন্দ্রের ন্যায়	উপমিত কর্মধারয়
মনগড়া	মন দ্বারা গড়া	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মধুমাখা	মধু দ্বারা মাখা	তৃতীয়া তৎপুরুষ
মনমরা	মনে মরা	সপ্তমী তৎপুরুষ
মহানবি	মহান যে নবি	কর্মধারয়
মালগাড়ি	মালের গাড়ি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মায়েঝিয়ে	মায়ে ও ঝিয়ে	অলুক দ্বন্দ্ব
মৌচাক	মৌ (মধু)-এর চাক	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মৌমাছি	মৌ (মধু) আশ্রিত মাছি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মহাজন	মহান যে জন	কর্মধারয়
মহাপুরুষ ['১২]	মহান যে পুরুষ	কর্মধারয়
মহাত্মা	মহা যে আত্মা	কর্মধারয়
মহাকাব্য	মহা যে কাব্য	কর্মধারয়
মেঘমুক্ত	মেঘ হতে মুক্ত	পঞ্চমী তৎপুরুষ
মোমবাতি	মোম নির্মিত বাতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মহামানব	মহান যে মানব	কর্মধারয়
মৌলভি সাহেব	যিনি মৌলভি তিনি সাহেব	কর্মধারয়

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
মিঠাকড়া	যা মিঠা তাই কড়া	কর্মধারয়
মিশকালো	মিশির ন্যায় কালো	উপমান কর্মধারয়
মানি-ব্যাগ	মানি (টাকা) রাখার ব্যাগ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
মতামত	মত ও অমত	দ্বন্দ্ব
মাতৃভাষা	মাতার ভাষা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
মোহনিদ্রা	মোহ রূপ নিদ্রা	রূপক কর্মধারয়
মন্ত্রমুগ্ধ	মন্ত্র দ্বারা মুগ্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ

য

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
যুধিষ্ঠির	যুদ্ধে স্থির মন যার	বহুব্রীহি
যুগান্তর	অন্য যুগ	নিত্য
যথাশক্তি	শক্তিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথারীতি	রীতিকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথাসাধ্য	সাধ্যকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথাক্রম	ক্রমকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যথেচ্ছা	ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে	অব্যয়ীভাব
যাদুকর	যাদু করে যে	উপপদ তৎপুরুষ
যুবজানি	যুবতি জায়া যার	বহুব্রীহি
যুক্তিসঙ্গত	যুক্তিতে সঙ্গত	সপ্তমী তৎপুরুষ
যমদূত	যমের দূত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
যুক্তিহীন	যুক্তি দ্বারা হীন	তৃতীয়া তৎপুরুষ

র

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রক্তকমল	রক্ত বর্ণের যে কমল	কর্মধারয়
রাজাবাদশা	রাজা ও বাদশা	দ্বন্দ্ব
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গা যে মাটি	কর্মধারয়
রোগমুক্তি	রোগ হতে মুক্তি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
রাজনীতি	রাজ্য পরিচালনার যে নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রাষ্ট্রপতি	রাষ্ট্রের পতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাষ্ট্রনীতি	রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় যে নীতি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রবাহূত	রব দ্বারা আহূত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
রাজকুমার	রাজার কুমার	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাজাবাহাদুর	যিনি রাজা তিনি বাহাদুর	কর্মধারয়
রথদেখা	রথকে দেখা	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
রাজকবি	রাজার কবি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রক্তলাল	রক্তের ন্যায় লাল	উপমান কর্মধারয়
রক্তাক্ত	রক্ত দ্বারা অক্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ
রাজপুত্র	রাজার পুত্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
রাজ হাঁস	হাঁসের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রজনীগন্ধা	রজনীতে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে যার	বহুব্রীহি
রাজর্ষি	যিনি রাজা তিনিই ঋষি	কর্মধারয়
রাজপথ ['১৯]	পথের রাজা	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রান্নাঘর ['১৯]	রান্নার জন্য ঘর	চতুর্থী তৎপুরুষ
রাজধানী	রাজার ধানী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
রাতকানা	রাতে কানা	সপ্তমী তৎপুরুষ
রেলগাড়ি	রেলের উপর চলে যে গাড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
রম্যরচনা	রম্য যে রচনা	কর্মধারয়
রক্তকরবী	রক্ত বর্ণের করবী	কর্মধারয়
রাশিচক্র	রাশির চক্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ল

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
লোকভয়	লোকের ভয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লোকারণ্য	লোকের অরণ্য	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লাটসাহেব	যিনি লাট তিনি সাহেব	কর্মধারয়
লালপেড়ে	লাল পাড় যাতে	বহুব্রীহি
লোক দেখানো	লোককে দেখানো	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
লাভালাভ	লাভ ও অলাভ	দ্বন্দ্ব
লক্ষ্মীছাড়া	লক্ষ্মী ছেড়েছে যাকে	উপপদ তৎপুরুষ
লেজঝোলা	লেজ ঝোলানো যার	বহুব্রীহি
লেনদেন	লেন ও দেন	দ্বন্দ্ব
লক্ষ্যভ্রষ্ট	লক্ষ্য হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
লালটুপি	লাল যে টুপি	কর্মধারয়
লেখাপড়া	লেখা ও পড়া	দ্বন্দ্ব
লোকালয়	লোকের আলয়	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
লাঠালাঠি	লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ	ব্যতিহার বহুব্রীহি

শ, ষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
শতাব্দী ['১২, '১৩]	শত অব্দের সমাহার	দ্বিগু
শশব্যস্ত	শশকের ন্যায় ব্যস্ত	উপমান কর্মধারয়
শোকাতীত	শোকের অতীত	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শাকভাত	শাক মিশ্রিত ভাত	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
শোকাকুল	শোক দ্বারা আকুল	তৃতীয়া তৎপুরুষ
শোকানল	শোক রূপ অনল	রূপক কর্মধারয় ['০৫]
শিরোধার্য	শিরে ধারণযোগ্য	অব্যয়ীভাব
শোকার্ত	শোক দ্বারা আর্ত	তৃতীয়া তৎপুরুষ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
শিক্ষামন্ত্রী	শিক্ষার মন্ত্রী	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শান্তশিষ্ট	যে শান্ত সেই শিষ্ট	কর্মধারয়
শ্রমলব্ধ	শ্রম দ্বারা লব্ধ	তৃতীয়া তৎপুরুষ
শিক্ষাকেন্দ্র	শিক্ষার কেন্দ্র	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
শতবার্ষিকী	শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠান	বহুব্রীহি
শাপমুক্তি	শাপ থেকে মুক্তি	পঞ্চমী তৎপুরুষ
শুভদৃষ্টি	শুভ যে দৃষ্টি	কর্মধারয়
শৈশব স্মৃতি	শৈশবের স্মৃতি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ষড়রিপু	ষড় রিপুর সমাহার	দ্বিগু
ষড়যন্ত্র	ষড় যে যন্ত্র	কর্মধারয়
ষড়ঋতু	ছয় ঋতুর সমাহার	দ্বিগু

স

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
সতীর্থ	সমান তীর্থ যার	বহুব্রীহি
সিংহদ্বার	সিংহ চিহ্নিত দ্বার	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সিদ্ধহস্ত	সিদ্ধ যে হস্ত	কর্মধারয়
সহোদর	সমান উদর যার	বহুব্রীহি
স্বর্গভ্রষ্ট	স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট	পঞ্চমী তৎপুরুষ
সবিনয়	বিনয়ের সহিত বর্তমান	বহুব্রীহি
সমতল	সম যে তল	কর্মধারয়
সেতার	সে (তিন) তারের সমাহার	দ্বিগু
সস্ত্রীক	স্ত্রীর সাথে বর্তমান	বহুব্রীহি
সপত্নী	সমান পতি যার	বহুব্রীহি
সুগন্ধা	সুগন্ধ যার	বহুব্রীহি
সুহৃদ	সুন্দর হৃদয় যার	বহুব্রীহি
স্মৃতিসৌধ	স্মৃতি রক্ষার্থে প্রস্তুত যে সৌধ	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সোনামুখ	সোনা তুল্য মুখ	উপমিত কর্মধারয়
সোনার বাংলা	সোনার মতো বাংলা	উপমিত কর্মধারয়
স্বর্ণাক্ষর	স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল অক্ষর	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সপ্তাহ	সপ্ত অহের সমাহার	দ্বিগু
সবান্ধব	বান্ধবসহ বর্তমান	বহুব্রীহি
সত্যনিষ্ঠ	সত্যে নিষ্ঠা আছে যার	বহুব্রীহি
সিংহাসন	সিংহ চিহ্নিত আসন	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
সর্বশ্রেষ্ঠ	সর্ব হতে শ্রেষ্ঠ	পঞ্চমী তৎপুরুষ

হ

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
হাতঘড়ি	হাতে পরা হয় যে ঘড়ি	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হররোজ	রোজ রোজ	অব্যয়ীভাব ['০৭]

প্রদত্ত শব্দ	ব্যাসবাক্য	সমাসের নাম
হাসাহাসি	হাসতে হাসতে যে ক্রিয়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হজ্জযাত্রা	হজ্জের জন্য যাত্রা	চতুর্থী তৎপুরুষ
হাটবাজার ['১৩]	হাট ও বাজার	দ্বন্দ্ব
হাতেখড়ি	হাতে খড়ি দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে	অলুক বহুব্রীহি
হাতপাখা	হাতে চালিত পাখা	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হিতাহিত	হিত ও অহিত	দ্বন্দ্ব
হৃত সর্বস্ব	হৃত হয়েছে সর্বস্ব যার	বহুব্রীহি
হলুদ বাটা	বাটা যে হলুদ	কর্মধারয়
হাঁটুজল	হাঁটু পরিমাণ জল	মধ্যপদলোপী কর্মধারয়
হতবুদ্ধি	বুদ্ধিতে হত যে	কর্মধারয়
হরিণ চপল	হরিণের ন্যায় চপল	উপমান কর্মধারয়
হাভাত	ভাতের অভাব	অব্যয়ীভাব
হস্তিমূর্খ	হস্তীর ন্যায় মূর্খ	উপমান কর্মধারয়
হরতাল	তালের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাঘর	ঘরের অভাব	অব্যয়ীভাব
হা-অন্ন	অন্নের অভাব	অব্যয়ীভাব
হাতাহাতি	হাতে হাতে যে ঝগড়া	ব্যতিহার বহুব্রীহি
হৃষ্টপুষ্ট	যা হৃষ্ট তা পুষ্ট	কর্মধারয়
হাসিমুখ	হাসিযুক্ত মুখ	কর্মধারয়
হস্তলিপি	হস্তের লিপি	ষষ্ঠী তৎপুরুষ

ক্ষ

ক্ষমতাপ্রাপ্ত	ক্ষমতাকে প্রাপ্ত	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ক্ষতবিক্ষত	ক্ষত ও বিক্ষত	দ্বন্দ্ব
ক্ষণস্থায়ী	ক্ষণকাল ব্যাপীয়া স্থায়ী	দ্বিতীয়া তৎপুরুষ
ক্ষুধানল	ক্ষুধা রূপ অনল	রূপক কর্মধারয়
ক্ষুধিত পাষাণ	ক্ষুধিত যে পাষাণ	কর্মধারয়
ক্ষীর সাগর	ক্ষীরের সাগর	ষষ্ঠী তৎপুরুষ
ক্ষণজন্মা	ক্ষণকালে জন্ম যার	বহুব্রীহি

সন্ধি

▸▸প্রশ্ন : ৬৫ ॥ সন্ধি কাকে বলে? সন্ধি কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শব্দের উচ্চারণ-সুবিধা ও অর্থ প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে একাধিক বিচ্ছিন্ন শব্দকে সন্ধির মাধ্যমে একত্র করা হয়। একে বলা হয় সন্ধি। নিচে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো :

সন্ধির সংজ্ঞা

'সন্ধি' অর্থ মিলন বা সংযোগ। পরস্পর নিকটবর্তী দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, "দুটি বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্তী হলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা উভয়ে মিলে এক বর্ণ হয় অথবা তাদের রূপান্তর হয় কিংবা একের লোপ হয় অথবা উভয়ের রূপান্তর হয়। এরূপ বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলে।"

২। ড. সুকুমার সেনের মতে, "পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।"

৩। ড. অমিত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন– "বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলনকেই সন্ধি বলে।"

সারকথা, উচ্চারণের সুবিধা বা ধ্বনিগত নৈকট্যের কারণে পরস্পর দু'বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যথা– বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয় ; রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ইত্যাদি।

সন্ধির প্রকারভেদ

সন্ধি প্রধানত দু'প্রকার। যথা– ১। স্বর সন্ধি, ২। ব্যঞ্জন সন্ধি।

কেউ কেউ বলেন, সন্ধির আরেকটি প্রকার আছে, তা হলো 'বিসর্গ সন্ধি'। আসলে এটি ব্যঞ্জন সন্ধিরই একটি অংশ মাত্র।

১। **স্বর সন্ধি :** স্বরবর্ণের সাথে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে স্বর সন্ধি বলে। যথা– বিদ্যা+আলয়=বিদ্যালয়, (আ+আ=আ), রবি+ইন্দ্র = রবীন্দ্র (ই+ই=ঈ) ইত্যাদি।

২। **ব্যঞ্জন সন্ধি :** ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে ব্যঞ্জন সন্ধি বলা হয়। যথা– উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস, দিক+অন্ত = দিগন্ত, উৎ+ছেদ = উচ্ছেদ ইত্যাদি। আরো দুপ্রকার সন্ধির প্রচলন রয়েছে। এ দুটি হলো–

১। **বিসর্গ সন্ধি :** বিসর্গের সাথে পরবর্তী স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনকে বিসর্গ সন্ধি বলে। যথা– নিঃ + রস = নীরস। আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ ইত্যাদি।

২। **নিপাতনে সন্ধি :** সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমে যেসব সন্ধি হয় তাকে নিপাতনে সন্ধি বলে। যথা– এক+দশ = একাদশ, বন+পতি = বনস্পতি ইত্যাদি।

উপসংহার : তাড়াতাড়ি উচ্চারণের ফলে পাশাপাশি দুটি ধ্বনি মিলে এক হয় এবং একটির প্রভাবে অপরটি বদলে যায়। কাছাকাছি বর্ণের এই মিলনই সন্ধি নামে অভিহিত। সন্ধি ধ্বনির পরিবর্তন করে ভাষার মাধুর্য ঘটায়।

⏩ প্রশ্ন : ৬৬ ॥ সন্ধি কাকে বলে? বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা কী? বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণে সন্ধি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সন্ধিতে বাংলা ভাষা উচ্চারণের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। শব্দের উচ্চারণ-সুবিধা ও অর্থ প্রকাশে স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যে একাধিক বিচ্ছিন্ন শব্দকে সন্ধির মাধ্যমে একত্রিত করা হয়। নিচে সন্ধি সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হলো :

সন্ধির সংজ্ঞা

'সন্ধি' অর্থ মিলন বা সংযোগ। পরস্পর নিকটবর্তী দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সন্ধির সংজ্ঞায় বলেন, দুইটি বর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্তী হইলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক বর্ণ হয় অথবা উহাদের রূপান্তর হয় কিংবা একের লোপ হয়। অথবা উভয়ের রূপান্তর হয়। এরূপ বর্ণদ্বয়ের মিলনকে সন্ধি বলে।

২। ড. সুকুমার সেনের মতে, "পরস্পর অত্যন্ত সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।"

৩। ড. অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, "বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলনকেই সন্ধি বলে।"

সারকথা, উচ্চারণের সুবিধা বা ধ্বনিগত নৈকট্যের কারণে পরস্পর দু'বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। যথা– বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়; রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা

বাংলা ভাষায় সন্ধির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিচে সন্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো–

১। **উচ্চারণ সুবিধা :** সন্ধি শব্দের উচ্চারণগত সুবিধা করে দেয়। যেমন– দিগন্ত শব্দটি উচ্চারণে যতটা সুবিধা, এর বিচ্ছেদ রূপ (দিক + অন্ত) উচ্চারণ ততটা সুবিধাজনক নয়।

২। **অর্থ প্রকাশে সহায়তা :** সন্ধি শব্দের অর্থ সাবলীল করে প্রকাশ করে। যেমন– নীরস বলতে সহজে আমরা রসহীন অবস্থা বুঝি। কিন্তু শব্দটির সন্ধিপূর্ব অবস্থার (নিঃ + রস) অর্থ খানিকটা দুর্বোধ্য।

৩। **গতিশীলতা :** সন্ধির ফলে ভাষা গতিশীল হয়।

৪। **শব্দের ধ্বনিগত মাধুর্যবর্ধন :** সন্ধির ফলে শব্দের ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি হয়।

৫। **শ্রুতিমধুরতা :** সন্ধি শব্দকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও শ্রুতিমধুর করে তোলে।

৬। **নতুন শব্দের সৃষ্টি :** সন্ধির ফলে ভাষায় নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয়। এভাবে সন্ধি ভাষাকে গতিশীল করে তোলে।

৭। **আকার :** সন্ধি শব্দের আকারকে সংক্ষিপ্ত করে।

৮। **অলঙ্কার :** সন্ধি ভাষার অলঙ্কার সৃষ্টি করে।

৯। **সহজ ও ছন্দময় :** সন্ধি উচ্চারণকে দ্রুত, সহজ ও ছন্দময় করে তোলে।

১০। **শব্দ ভাণ্ডার :** সন্ধি নতুন শব্দ তৈরি করে ভাষায় শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

১১। **আকর্ষণ ও আগ্রহ :** সন্ধি ভাষা প্রয়োগে মানুষের আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি করে।

১২। **সমৃদ্ধ ও উন্নত :** সন্ধি ভাষাকে করে তোলে আকর্ষণীয়, সমৃদ্ধ ও উন্নততর।

উপসংহার : সন্ধির মাধ্যমে বাংলা ভাষা উচ্চারণের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তবে সন্ধি শুধু উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর করে না, বরং ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।

⏩ প্রশ্ন : ৬৭ ॥ সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য উদাহরণসহ বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : সন্ধি ও সমাস বাংলা ব্যাকরণের প্রধান দুটি বিষয়। সন্ধি অর্থ মিলন। বাংলা ব্যাকরণে পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলা হয়। আর পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট অন্বয়যুক্ত দুই বা বহু পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। নিচে এদের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

সন্ধি ও সমাসের পার্থক্য

সন্ধি ও সমাসের মধ্যে কতিপয় পার্থক্য রয়েছে। এসব পার্থক্য নিম্নরূপ–

পার্থক্যের ভিত্তি	সন্ধি	সমাস
১। সংজ্ঞাগত	পাশাপাশি দুটি বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে।	পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা বহু পদের মিলনকে সমাস বলে।
২। প্রকৃতিগত	সন্নিহিত দু'বর্ণের মিলন ঘটে।	পরস্পর অর্থসঙ্গতিপূর্ণ একাধিক পদের মিলন ঘটে।
৩। সংক্ষেপণ	সন্ধিতে বর্ণের আংশিক বা পূর্ণ মিলন হয়। কখনো কোনো বর্ণ পরিবর্তিত হয়।	সমাস সবসময় অর্থসম্পর্কপূর্ণ দুই বা বহু পদে একত্রিত হয়।

পার্থক্যের ভিত্তি	সন্ধি	সমাস
৪। গুরুত্বের দিক	সন্ধি উচ্চারণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।	সমাস অর্থের প্রতি গুরুত্বারোপ করে।
৫। বিভক্তি	সন্ধিতে পদের বিভক্তি লোপ পায় না।	অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাসে বিভক্তি লোপ পায়।
৬। সূত্রের প্রয়োজন	সন্ধিতে সূত্রের প্রয়োজন হয়।	সমাসে ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয়।
৭। কাজ	সন্ধি শব্দকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর, স্বচ্ছন্দ, সহজ উচ্চারণযোগ্য করে তোলে।	সমাস বাক্যকে সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও শ্রুতিমধুর করে।

উপসংহার : সন্ধি ও সমাসের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও এ উভয়টি বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

⏩ প্রশ্ন : ৬৮ ॥ শব্দগঠনে সন্ধির ভূমিকা উদাহরণসহ আলোচনা কর। [ফা. প. ২০০৯]
অথবা, সন্ধির সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ উল্লেখ কর। [ফা. প. ২০১০]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : শব্দগঠনে সন্ধির ভূমিকা অপরিসীম। সন্ধি মূলত এক ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন। দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুটো ধ্বনির মিলনে ধ্বনিগত পরিবর্তন আসে, ফলে সন্ধির নিয়মে নতুন সন্ধিজাত শব্দ গঠিত হয়। সন্ধিজাত শব্দগঠন শব্দগঠনের তিনটি পদ্ধতির (উপসর্গ, প্রত্যয় ও সমাস) মধ্যে পড়ে। যেমন–

বাংলা স্বরসন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

সন্ধিজাত শব্দ	শব্দগঠন
অর্ধেক	অর্ধ + এক
মিথ্যুক	মিথ্যা + উক
হিন্দুয়ানি	হিন্দু + আনি
মায়ে	মা + এ
ঢাকেশ্বরী	ঢাকা + ঈশ্বরী

বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

পাঁজ্জন	পাঁচ + জন
বড়গাছ	বট + গাছ
নাদবউ	নাত + বউ
নাজ্জামাই	নাত + জামাই
বজ্জাত	বদ + জাত

সংস্কৃত স্বরসন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

অতীত	অতি + ইত
অন্যান্য	অন্য + অন্য
কারাগার	কারা + আগার
লঘূর্মি	লঘু + ঊর্মি
মতৈক্য	মত + ঐক্য

সংস্কৃত ব্যঞ্জনসন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

উন্নতি	উৎ + নতি
প্রচ্ছদ	প্র + ছদ

সন্ধিজাত শব্দ	শব্দগঠন
উচ্চারণ	উৎ + চারণ
তৎকাল	তদ + কাল
দিঙনির্ণয়	দিক + নির্ণয়

সংস্কৃত বিসর্গসন্ধির সাহায্যে শব্দগঠন

মনোনয়ন	মনঃ + নয়ন
নীরব	নিঃ + রব
নিরীহ	নিঃ + ঈহ
দুর্গত	দুঃ + গত
নিশ্চয়	নিঃ + চয়

উপসংহার : শব্দ গঠনে সন্ধি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্ধির ফলে ভাষায় নতুন নতুন শব্দের সৃষ্টি হয় এবং এভাবে ভাষাকে গতিশীল করে তোলে।

বিভক্তি

» প্রশ্ন : ৬৯ ॥ বিভক্তি কাকে বলে? এটা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণে বিভক্তি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে বাক্য গঠনের জন্য পদ সৃষ্টি করে সেগুলোই বিভক্তি নামে পরিচিত। বাংলা শব্দগঠনে বিভক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিভক্তির সংজ্ঞা

"বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে অন্বয় বা সম্পর্ক সাধনের জন্য যেসব অর্থহীন বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতু বা শব্দের শেষে যুক্ত হয়, সেগুলোকে বিভক্তি বলে।" যেমন– বইতে দেখ। এখানে 'বই' শব্দের সাথে 'তে' যুক্ত হয়ে 'বইতে' পদ তৈরি হয়েছে। 'তে' এখানে বিভক্তি। বাক্যটিতে ক্রিয়াপদ **'দেখ'** এর সাথে বইয়ের সম্পর্ক বের করার জন্য 'তে' বিভক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

বিভক্তির প্রকারভেদ

বিভক্তি প্রধানত দু'প্রকার। যথা– শব্দ বা নাম বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি। তবে ব্যবহারের দিক বিবেচনায় ব্যাকরণবিদগণ বিভক্তিকে মোট তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা–

১। **শব্দ বিভক্তি :** শব্দের পরে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। যেমন– গাছ + এ = গাছে।

২। **ক্রিয়া বিভক্তি :** ক্রিয়া বা ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হলে তাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন– ভর + ইতেছি = ভরিতেছি।

৩। **কারক বিভক্তি :** বাক্যে ব্যবহৃত শব্দে যখন বিভক্তি যুক্ত হয় তখন তাকে কারক বিভক্তি বলে। যেমন– টাকায় কী না হয়। এখানে (টাকা + য় = টাকায়) য় কারক বিভক্তি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বাংলা ভাষায় বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিভক্তির প্রয়োজন রয়েছে।

» প্রশ্ন : ৭০ ॥ কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ের সহজ উপায় কী? বর্ণনা কর।

উত্তর ।। কারক ও বিভক্তি নির্ণয়ের সহজ উপায় : কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করতে হলে কতিপয় মৌলিক বিষয় মনে রাখতে হবে। যেমন–

১। ক্রিয়াকে 'কে' দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা কর্তৃকারক।
২। ক্রিয়াকে 'কী' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা কর্মকারক।
৩। ক্রিয়াকে 'কীসের দ্বারা বা সাহায্যে' প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা করণকারক।
৪। ক্রিয়াকে 'কাকে বা কার জন্য' (স্বত্বত্যাগ অর্থে) প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা সম্প্রদান কারক।
৫। ক্রিয়াকে 'কোথা বা কী হতে' প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা অপাদান কারক।
৬। ক্রিয়াকে 'কোথায়, কীসে, কখন' প্রশ্ন করে উত্তর পেলে তা অধিকরণ কারক।

'বাক্যের অন্তর্গত ক্রিয়াপদের সাথে নামপদের অন্বয়কে কারক বলে।' কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করার সময় এ সংজ্ঞা অনুযায়ী ক্রিয়ার সাথে কী ধরনের অন্বয়, তা বুঝে কারক নির্ধারণ করতে হবে। তারপর বিভক্তির চিহ্ন অনুযায়ী বিভক্তি ধরতে হবে। যেমন– '**মুখ দিয়ে** একটি কথাও বের হলো না।' এ বাক্যে 'মুখ দিয়ে' অর্থাৎ 'মুখ হতে' অপাদান কারক এবং 'দিয়ে' তৃতীয়া বিভক্তি। অতএব মোটা অক্ষরে লেখা পদটি 'অপাদানে তৃতীয়া।'

» প্রশ্ন : ৭১ ॥ বিভক্তিযোগে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ বিভক্তিযোগে শব্দ গঠন : বাক্যস্থিত বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পরস্পর অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের পরে যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয় তাদের বিভক্তি বলে। বাংলা বাক্য ও শব্দ গঠনে বিভক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত না হলে তা বাক্যে ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে না। আবার বাক্যের অর্থানুসারে একই শব্দের সঙ্গে কখনো বিভক্তি চিহ্ন যোগ হয় কখনো হয় না। যেক্ষেত্রে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যোগ হয় না, সেক্ষেত্রে শূন্য বিভক্তি বা প্রথমা বিভক্তি যোগ হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়। এভাবে বাংলা ভাষায় সর্বনাম এবং ক্রিয়া শব্দ বিভক্তি থেকে নতুন শব্দ গঠনের মাধ্যমে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

তোমাকে (কে বিভক্তি) যেতে হবে।

পাখি (শূন্য বিভক্তি) সব করে রব।

বিভক্তি প্রধানত দু'প্রকার। যথা– ১। শব্দ বিভক্তি ও ২। ক্রিয়া বিভক্তি।

১। **শব্দ বিভক্তি :** শব্দের পরে যেসব বিভক্তি যোগ হয়ে নতুন শব্দরূপ গঠন করে, তাকে শব্দ বিভক্তি বলে। শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা–

ক. প্রথমা বিভক্তি : (শূন্য, অ, আ, ই)
বাক্যে প্রয়োগ : সুমন বই পড়ে। কামাল **ভাত** খায়।

খ. দ্বিতীয়া বিভক্তি : (কে, রে, এরে)
বাক্যে প্রয়োগ : সকলকে মরতে হবে। **তোমাকে** খেতে হবে।

গ. তৃতীয়া বিভক্তি : (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক)
বাক্যে প্রয়োগ : তোমা **দ্বারা** এ কাজ হবে না। এ **কলম দিয়ে** ভালো লেখা হয় না।

ঘ. চতুর্থী বিভক্তি : (কে, রে, এরে)
বাক্যে প্রয়োগ : তোমাকে মরলে চলবে না। **জলকে** চল।

ঙ. পঞ্চমী বিভক্তি : (হতে, থেকে, চেয়ে)
বাক্যে প্রয়োগ : আমা হতে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। **গাছ হতে** ফল পড়ে।

চ. ষষ্ঠী বিভক্তি : (র, এর)
বাক্যে প্রয়োগ : আমার যাওয়া হবে না। **রাস্তার** রাজা।

ছ. সপ্তমী বিভক্তি : (এ, য়, তে)

বাক্যে প্রয়োগ : পাগলে কি না বলে। গাছে পাকা।

২। **ক্রিয়া বিভক্তি :** ধাতু বা ক্রিয়ামূলের সঙ্গে যেসব বিভক্তি যোগ হয়ে নতুন শব্দরূপ গঠন করে তাদের ক্রিয়া বিভক্তি বলে। যেমন– করিতেছে (ইতেছে) > কর + ইতেছে, যাইতেছি (ইতেছি) > যা + ইতেছি, করি (ই) > কর + ই, ঘুমাইতেছেন (ইতেছেন) > ঘুম + ইতেছেন, চলছে (ছে) > চল + ছে ইত্যাদি।

বচন

⏩ প্রশ্ন : ৭২ ॥ বচন বলতে কী বোঝ? বচন কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বচন বাংলা ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় দখল করে আছে। প্রতিটি ভাষায়ই বচনের ব্যবহার লক্ষণীয়। গণনা করা সম্ভব এমন ব্যক্তি বা বস্তুরই বচন থাকে। বাংলা ভাষায় বিভিন্ন পদের মধ্যে কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ আছে। কিন্তু অন্য কোনো পদের বচনভেদ নেই। নিচে বচন সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

বচনের সংজ্ঞা

বচন মানে সংখ্যার ধারণা। পদের যে বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংখ্যা নিরূপিত হয়, তাকে বচন বলে। বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের শেষে এক বা একাধিক সংখ্যা নিরূপণ করার জন্য শেষে বর্ণ বা শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বচন নির্দেশিত হয়।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১। জ্যোতিভূষণ চাকী বচনের সংজ্ঞায় বলেন, "বচন মানে যা সংখ্যা বলে দেয়, শব্দের যে রূপের দ্বারা তার সংখ্যাবোধ হয়, তাকে বচন বলে।"

২। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "যার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাকে বচন (Number) বলে। বচনদ্যোতক প্রত্যয় বা শব্দের দ্বারা কোনো বস্তুর একত্ব বোঝা যায়।"

৩। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "বচন ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। এর অর্থ সংখ্যার ধারণা। ব্যাকরণে বিশেষ্য বা সর্বনামের সংখ্যাগত ধারণা প্রকাশের উপায়কে বচন বলে।"

বচনের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় বচন দু'প্রকার। যথা– ১। একবচন ও ২। বহুবচন।

১। **একবচন :** যে শব্দ দ্বারা একটিমাত্র ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম বোঝায়, তাকে একবচন বলে। যেমন– ছেলেটি, কলমটি, বইটি, গাছটি ইত্যাদি।

২। **বহুবচন :** যে শব্দ দ্বারা একাধিক ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনামকে বোঝায় তাকে বহুবচন বলে। যেমন– ছেলেগুলো, কলমগুলো, বইগুলো ইত্যাদি।

বাংলা ভাষায় কোনো দ্বিবচন নেই। তাই দুটি সংখ্যা বোঝাতে দুই, দ্বয়, জোড়া, যুগল ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হলেও এদের দ্বিবচন বলা হয় না। এগুলো বহুবচনের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার : বচন সংখ্যার ধারণা প্রদান করে। বচনের সাহায্যে আমরা ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যা নিরূপণ করতে পারি। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় একবচন, দ্বিবচন, বহুবচনের ব্যবহার থাকলেও বাংলা ভাষায় শুধু এক ও বহুবচনের ধারণাই বিদ্যমান।

» প্রশ্ন : ৭৩ ॥ একবচন কাকে বলে? একবচন শব্দ গঠনের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বাংলা ভাষায় সংখ্যার ধারণা বোঝাতে একবচন ও বহুবচন ব্যবহার হয়ে থাকে। একক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝাতে একবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন উপায়ে একবচনের শব্দ গঠিত হতে পারে।

একবচনের সংজ্ঞা

যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর (অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের) একটিমাত্র সংখ্যা বোঝায়, তাকে একবচন বলে। অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা একত্বের বোধ হয় তা একবচন। যেমন– আমি, সে, তুমি, বালক, আমটি, ছেলেটি ইত্যাদি।

একবচন শব্দ গঠনের নিয়মাবলি

বিভিন্ন নিয়মে একবচনের শব্দ গঠন করা যায়। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো–

১। শব্দের মূল রূপটিতে একবচন নির্দেশ করে অর্থাৎ শব্দের মূল রূপে একবচন হয়। যেমন– গাছ, আম, ছেলে, মেয়ে, কলম, বই ইত্যাদি।

২। বিশেষ্যের পূর্বে সংখ্যাবাচক শব্দ 'এক' বসিয়ে একবচন নির্দেশ করে। যেমন– এক লোক। এক কলম। এক কথা বল। এক ছিলেন রাজা ইত্যাদি।

৩। বিশেষ্যের সাথে টা, টি, খান, খানা, খানি, গাছা, গাছি, ছড়া ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয়যোগে একবচন নির্দেশ করে। যেমন– ছেলেটা, মানুষটি, চিঠিখানা, বইখানি, কাপড়খান, চুড়িগাছি, হারছড়া ইত্যাদি।

৪। সংখ্যাবাচক শব্দ 'এক' এর সাথে টা, টি, খানা, খানি, গাছা, গাছি যুক্ত করে বিশেষ্যের পূর্বে ব্যবহার করে একবচনের শব্দ গঠন করা হয়। যেমন– একটা গরু, একটি ফুল, একখানা বই, একখানি চিঠি, একগাছি চুড়ি ইত্যাদি।

৫। একবচনের বিভক্তিযোগে একবচন নির্দেশিত হয়। যেমন– লোককে, সিংহকে ইত্যাদি।

৬। **বহুবচনরূপে একবচন :** কখনো কখনো রূপের দিক থেকে বহুবচনবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে একবচনই বোঝায়। যেমন– আপনারা জ্ঞানীগুণী লোক। এখানে 'রা' প্রত্যয় বহুবচন গঠিত হলেও মূলত বলা হয়েছে একজনকেই।

উপসংহার : এভাবে বস্তু ও প্রাণীকে নির্দেশ করতে বিভিন্ন উপায়ে একবচনের শব্দ গঠিত হয় এবং বহুবচন থেকে একবচনের বস্তুটি পৃথক হয়।

» প্রশ্ন : ৭৪ ॥ বহুবচনের সংজ্ঞা দাও। বহুবচনবোধক শব্দ গঠনের নিয়মাবলি আলোচনা কর।

উত্তর ।। উপস্থাপনা : বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য শব্দশেষে ব্যবহৃত বর্ণ বা শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বচন নির্দেশিত হয়। বাংলা ভাষায় বচন দু'প্রকার। নিচে বহুবচনের সংজ্ঞা ও এর শব্দ গঠনের নিয়মাবলি উপস্থাপিত হলো–

বহুবচনের সংজ্ঞা

যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর (তথা বিশেষ্য ও সর্বনামের) একের অধিক সংখ্যা বোঝায়, তাকে বহুবচন বলে। অর্থাৎ বহুবচন বলতে বহুত্বের বোধ বোঝায়। যেমন– ফুলগুলো, লোকেরা, কলমগুলো ইত্যাদি। যা সংখ্যা দ্বারা গণনার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য তারই কেবল বহুবচন হয়, যা সংখ্যা বা গণনায় পরিমাপ করা চলে না তার বহুবচন হয় না।

'লোকেরা' বহুবচন। কেননা তা সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য, কিন্তু 'দুধেরা' বহুবচন নয়। কেননা তা সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য নয়।

বহুবচনবোধক শব্দ গঠনের নিয়মাবলি

বাংলায় একবচন হতে বহুবচনের শব্দ গঠন করার নিয়মাবলি নিচে উপস্থাপিত হলো–

১। **বিভক্তি বা প্রত্যয়যোগে :** বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে রা, এর, এরা, দিগকে, দের, দেরকে, এদের প্রভৃতি বিভক্তি বা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– জেলেরা, ছেলেদের, তাহারা, আমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদেরকে, রহিমদের (এদের) ইত্যাদি।

২। অপ্রাণিবাচক ও প্রাণিবাচক বিশেষ্য ও সর্বনামের সাথে বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়– গুলা, গুলো, গুলি ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন করা হয়। যেমন– বইগুলো, টাকাগুলো, লোকগুলি ইত্যাদি।

৩। বিশেষ্যের পূর্বে সব, সকল, সমস্ত প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক পদ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– সব নদী, সকল মানুষ, সমস্ত পথ ইত্যাদি।

৪। বিশেষ্য পদের পূর্বে একের অধিক সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– পাঁচজন মানুষ, দশজন ছাত্র, দুটো পত্রিকা ইত্যাদি।

৫। বিশেষ্য পদের পূর্বে সর্বনামজাত বহুত্বজ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– এত টাকা, কত লোক, কত বই ইত্যাদি।

৬। **সমষ্টিবাচক শব্দযোগে :** বিশেষণ নয় এমন কতকগুলো সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষ্য পদের পরে বসে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– কুল, গণ, দল, পাল, পুঞ্জ, মণ্ডলী, মালা, রাজি, বৃন্দ, বর্গ, শ্রেণি, সমূহ, সব, রাশি, সকল, মহল, আবলি ইত্যাদি। যেমন– পক্ষীকুল, অলিকুল, জনগণ, দেবগণ, ছাত্রদল, যাত্রীদল, মেষপাল, পতঙ্গপাল, তারকাপুঞ্জ, শিক্ষকমণ্ডলী, আলোকমালা, পঙ্ক্তিমালা, রত্নরাজি, বৃক্ষরাজি, পরিচালকবৃন্দ, খেলোয়াড়বৃন্দ, বন্ধুবর্গ, মন্ত্রীবর্গ, তরুশ্রেণি ইত্যাদি।

৭। **একবচনের রূপে বহুবচন :** কখনো কখনো একবচনরূপে প্রকাশিত হয়েও বহুবচন বোঝায়। যেমন– পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। এখানে কোনো বহুবচন চিহ্ন জ্ঞাপিত হয়নি। কিন্তু 'পাগলে' এবং 'ছাগলে' বলতে 'সকল পাগল' ও 'সকল ছাগলকে' বোঝানো হয়েছে।

৮। **ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের মাধ্যমে :** সাধারণত ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বিশেষ ব্যবহারে বহুবচন জ্ঞাপিত হয়। যেমন– কামালরা/কামালেরা পাঁচ ভাই। এখানে 'কামালরা' বলতে কামাল ও অন্যান্য ভাইদের বোঝানো হয়, অর্থাৎ বহুবচন বোঝায়।

৯। **একত্ববোধের মাধ্যমে বহুবচন :** কখনো কখনো একবচনরূপে বললেও বহুবচন জ্ঞাপিত হয়। যেমন– মেয়েটি ফুল কুড়াচ্ছে। এখানে 'ফুল' একবচনরূপে প্রকাশিত হলেও অনেক 'ফুল' বোঝায়। তেমনি সে টাকা গুনছে। এখানে 'টাকা' বলতে অনেক টাকা বোঝায়।

» প্রশ্ন : ৭৫ ॥ বিভিন্ন পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমে বহুবচন নির্ণয় কর।

উত্তর ॥ বিভিন্ন পদের দ্বিরুক্তি দ্বারা গঠিত বহুবচন : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদ দু'বার ব্যবহার করে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন–

বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি : জিজ্ঞাসিব জনে জনে, ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে, লোকে লোকে লোকারণ্য। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে প্রভৃতি।

বিশেষণের দ্বিরুক্তি : ছোট ছোট ফুল, বড় বড় কলা, নতুন নতুন বই ইত্যাদি।

সর্বনামের দ্বিরুক্তি : যারা যারা এসেছে, তারা তারা খেয়েছে, কে কে যাবে, যে যে যাবে সে সে টাকা পাবে প্রভৃতি।

ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি : লোকটি খেটে খেটে মারা গেল। মেয়েটি নেচে নেচে গান করে। ছাত্রটি দেখে দেখে পড়ে ইত্যাদি।

অব্যয়ের দ্বিরুক্তি : যখন যখন আসবে তখন তখন মার খাবে। যেখানে সেখানে থুথু ফেল না ইত্যাদি।

সমার্থক পদের বহুবচন : কখনো কখনো সমার্থক পদযোগে বহুবচন গঠিত হয়। যেমন– বন্ধুবান্ধব, চিঠিপত্র, বইপুস্তক ইত্যাদি।

পদ

⏩ প্রশ্ন : ৭৬ ॥ পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও। [ফা. প. ২০১৮]

অথবা, পদ কাকে বলে? পদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও। [ফা. প. ২০১৩, '১৬]

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : পদ বাংলা ব্যাকরণের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। কারণ বাংলা বাক্য গঠনে পদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পদ ব্যতীত বাক্য কল্পনাও করা যায় না। অর্থপূর্ণ ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে শব্দ বলে। আর এই শব্দ যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে পদ বলে। নিচে পদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো–

পদের সংজ্ঞা

বাংলা বাক্যের অন্তর্গত অর্থবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দকে পদ বলা হয়। অন্য কথায়, বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। যেমন– সবাই মাছ ধরবে। এখানে 'সবাই', 'মাছ', 'ধরবে'–তিনটি শব্দ। এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি পদ।

পদের প্রকারভেদ

বাংলা ব্যাকরণে পদ মোট পাঁচ প্রকার। যথা–১। বিশেষ্য পদ, ২। বিশেষণ পদ, ৩। সর্বনাম পদ, ৪। অব্যয় পদ ও ৫। ক্রিয়াপদ। নিচে এসব পদের সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো–

১। **বিশেষ্য পদ :** যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য পদ বলা হয়।
উদাহরণ : আসাদ, সিরাজ, খুলনা, বৃহস্পতিবার, আঙ্গুর ইত্যাদি।

২। **বিশেষণ পদ :** যে পদ দ্বারা বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অব[স্থা] পরিমাণ, ধরন ইত্যাদি বোঝায়, তাকে বিশেষণ পদ বলে।
উদাহরণ : ভালো, মন্দ, সুন্দর ইত্যাদি।

৩। **সর্বনাম পদ :** যে পদ বিশেষ্যের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাকে সর্বনাম পদ বলে।
উদাহরণ : আমি, তুমি, সে, যিনি, তিনি ইত্যাদি।

৪। **অব্যয় পদ :** কোনো অবস্থাতেই যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে। বাংলা ভাষায় এমন কতকগুলো শব্দ আছে যেগুলোর পুরুষ, বচন, [লিঙ্গ,] বিভক্তি ইত্যাদি ভেদে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে।
উদাহরণ : এবং, ও, যেহেতু, সহসা, আহ, সম্ভবত, ঠিক ইত্যাদি।

৫। **ক্রিয়াপদ :** যে পদ দ্বারা করা, খাওয়া, যাওয়া, হওয়া ইত্যাদি কাজ বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

উদাহরণ : খাওয়া, পড়া, ওঠা, বসা, চলা, করা, ধরা ইত্যাদি।

উপসংহার : পদ শব্দের অর্থ 'পা'। প্রাণিকুল যেমন পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়ায়, বাক্যও তেমনি পদের ওপর নির্ভরশীল। তাই বাংলা বাক্যের সঠিক বিন্যাসে পদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

» প্রশ্ন : ৭৭ ॥ ভাব বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ ভাব বিশেষণ : যে পদ বিশেষ্য ও সর্বনাম ভিন্ন অন্য পদকে বিশেষিত করে, তাকে ভাব বিশেষণ বলে। ভাব বিশেষণ চার প্রকার। যথা–

ক. ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যেমন–

ধীরে ধীরে বায়ু বয় [ক্রিয়া সংঘটনের ভাব]।
পরে একবার এসো [ক্রিয়া সংঘটনের কাল]।

খ. বিশেষণীয় বিশেষণ : যে পদ নাম বিশেষণ অথবা ক্রিয়া বিশেষণকে বিশেষিত করে, তাকে বিশেষণের বিশেষণ বা বিশেষণীয় বিশেষণ বলে। যেমন–

সামান্য একটু দুধ দাও। [নাম বিশেষণের বিশেষণ]
ট্রেন **অতি** দ্রুত চলে। [ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ]

গ. অব্যয়ের বিশেষণ : যে ভাব বিশেষণ অব্যয় পদ অথবা অব্যয় পদের অর্থকে বিশেষিত করে, তাকে অব্যয়ের বিশেষণ বলে। যেমন– ধিক তারে **শত ধিক্ নির্লজ্জ** যে জন। ['যে' অব্যয়কে বিশেষিত করছে]

ঘ. বাক্যের বিশেষণ : কখনো কখনো বিশেষণ পদ একটি সম্পূর্ণ বাক্যকে বিশেষিত করতে পারে, তখন তাকে বাক্যের বিশেষণ বলে। যেমন– **বাস্তবিকই** আজ আমাদের কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন।

» প্রশ্ন : ৭৮ ॥ বাক্যে ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার এবং ক্রিয়া বিশেষণের গঠনরূপ বর্ণনা কর।

উত্তর ॥ বাক্যে ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার : বাক্যে নিম্নলিখিতভাবে ক্রিয়া বিশেষণ ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন–

১। **ক্রিয়া সংঘটনের ভাব :** কাজটি কীভাবে সংঘটিত হলো তা বোঝায়। যেমন– সে **দ্রুত** দৌড়াতে পারে। এটা **ভালোভাবে** বোঝা যাবে না ইত্যাদি।

২। **ক্রিয়া সংঘটনের সময় : আজ** যখন সে আসবে **তখন** তাকে থাকতে বলো। **সেদিন** তোমাকে পাইনি ইত্যাদি।

৩। **ক্রিয়া সংঘটনের স্থান :** আমার **সামনে** দাঁড়াও। **এখানে** বস ইত্যাদি।

৪। **বাক্যের বিশেষণ :** এ প্রকার বিশেষণ একটি বাক্যকে বিশেষিত করে এবং এজন্য ধরা যেতে পারে যে, এটি বাক্যটিতে সংঘটিত পুরো কাজটিকে বিশেষিত করে। তাই এটিকেও ক্রিয়া বিশেষণ বলতে হয়। যেমন– **ফলত** তার রোগ আর সারলো না। **সত্যিই** তুমি মহান উদার বাদশা আলমগীর ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিশেষণের গঠনরূপ

১। **বিভক্তিহীন শব্দযোগে :** বিভক্তি ছাড়াও ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হতে পারে। যেমন–

ভাবজ্ঞাপক : সে **অবশ্য** আসবে। তুমি **ঠিক** জান না ইত্যাদি।

সময়জ্ঞাপক : ক্রমাগত ভুল করো না। আজ তুমি যাও ইত্যাদি।

স্থানবাচক : হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

২। **–এ বিভক্তিযোগে :** 'এ' বিভক্তিযোগে বিশেষ্য পদ থেকে ক্রিয়া বিশেষণ গঠন করা যায়। যেমন–

বিশেষ্য	ভাবজ্ঞাপক ক্রিয়া বিশেষণ
তাল (তাল মিলিয়ে চলা)	তালে (সমান তালে চলা)
সুখ (সুখ চাই শুধু)	সুখে (সুখে থাকতে চাই)

নাম বিশেষণ পদ থেকে ক্রিয়া বিশেষণ :

নাম বিশেষণ	ক্রিয়া বিশেষণ
সমান	সমানে
চরম	চরমে ইত্যাদি।

৩। **–রূপে, –ভাবে, –সহকারে, –পূর্বক** ইত্যাদি পদ দ্বারা সমাস করেও ক্রিয়া বিশেষণ গঠন করা হয়। যেমন– উত্তমরূপে, সুন্দরভাবে, মনোযোগ সহকারে, প্রদর্শনপূর্বক ইত্যাদি।

৪। **–ত, –থা, –ধা, –শ, –ত্র, –বৎ, –মতো প্রত্যয়ান্ত** পদ দ্বারাও ক্রিয়া বিশেষণ গঠিত হয়। যেমন– সাধারণত, দৃশ্যত, অন্যথা, শতধা, প্রায়শ, ক্রমশ, সর্বত্র, একত্র, দণ্ডবৎ, মৎস্যবৎ, ঠিকমতো, সুন্দরমতো ইত্যাদি।

৫। **বিশেষ্য বা বিশেষণের সঙ্গে –করে, –ইয়ে** যোগ করেও ক্রিয়া বিশেষণ গঠন করা হয়। যেমন– ভালো **করে**, হঠাৎ **করে**, ফলিয়ে (ফল + **ইয়ে**), তলিয়ে (তল + **ইয়ে**), ছলছলিয়ে ইত্যাদি।

▶▶ প্রশ্ন : ৭৯ ॥ বিশেষণের অতিশায়ন বলতে কী বোঝ? খাঁটি বাংলা ও তৎসম শব্দের অতিশায়নের নিয়মসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ বিশেষণের অতিশায়ন : বিশেষণ পদ যখন দুই বা দু'য়ের অধিক বিশেষ্য পদের মধ্যে তুলনায় (গুণ, অবস্থা, পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে) একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোঝায়, তখন তাকে বিশেষণের অতিশায়ন (Comparision of Adjectives) বা তারতম্য বলে। যেমন– শফিক **সৎলোক**। শফিক নাসিরের **চেয়ে সৎ**। শফিক সবার মধ্যে সবচেয়ে সৎ।

অতিশায়নের নিয়ম

সাধারণত দু'য়ের তুলনায় 'তর' এবং বহুর তুলনায় 'তম' প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন– যমুনা একটি **দীর্ঘ**নদী, পদ্মা **দীর্ঘতর** এবং সুরমা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী।

বাংলায় ব্যবহৃত অতিশায়ন দু'প্রকার। যেমন– ১। খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়ন এবং ২। তৎসম শব্দের অতিশায়ন।

১। **খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়ন**

ক. খাঁটি বাংলা শব্দের অতিশায়নে দু'য়ের মধ্যে চেয়ে, চাইতে, হতে, থেকে, অপেক্ষা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে দু'য়ের মধ্যে তারতম্য বোঝাতে প্রথম বিশেষ্যটিতে সাধারণত ৬ষ্ঠী বিভক্তি হয় এবং মূল বিশেষণের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন– গরুর **চেয়ে** ঘোড়ার দাম বেশি। বাঘের **চেয়ে** সিংহ বলবান।

খ. দুটি বস্তুর অতিশায়নে জোর দিতে হলে মূল বিশেষণের আগে অনেক, অধিক, অল্প, কম এবং অধিকতর ইত্যাদি বিশেষণীয় বিশেষণ যোগ করতে হয়। যেমন– পদ্মফুল গোলাপ থেকে **অনেক** সুন্দর।

গ. কখনো কখনো ৬ষ্ঠী বিভক্তির '-এর' বা '-র' অতিশায়নের কাজ করে। যেমন- এ মাটি **সোনার** মাটি।

ঘ. বহুর মধ্যে অতিশায়ন : বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ করতে হলে বিশেষণের পূর্বে সবচেয়ে, সবার চেয়ে, সর্বাপেক্ষা শব্দ যোগ করতে হয়। যেমন- একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল **সবচেয়ে** বুদ্ধিমান।

২। **তৎসম শব্দের অতিশায়ন**

ক. তৎসম শব্দের অতিশায়নে বিশেষণ পদের সাথে বিভিন্ন প্রত্যয়, যেমন- '-তর', '-তম' ইত্যাদি যুক্ত হয়। সাধারণত দু'য়ের মধ্যে '-তর' এবং বহুর মধ্যে '-তম' প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- দীর্ঘ → দীর্ঘতর → দীর্ঘতম।

খ. বহুর মধ্যে অতিশায়নে তুলনীয় বস্তুর উল্লেখ না করেও 'তম' প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। যেমন- সুরমা বাংলাদেশের **দীর্ঘতম** নদী। দেশসেবার **মহত্তম** ব্রতই সৈনিকের দীক্ষা।

গ. কিছু কিছু সংস্কৃত '-তর', '-তম'যুক্ত বিশেষণ পদ বাংলায় তাদের তুলনার ভাব হারিয়ে সাধারণ বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- হত্যা করা **গুরুতর** অপরাধ। সেবা একটি **উত্তম** কাজ।

ঘ. তৎসম শব্দে দুয়ের মধ্যে তুলনায় আবার পুংলিঙ্গে '-ঈয়স্' ও স্ত্রীলিঙ্গে '-ঈয়সী' এবং বহুর মধ্যে তুলনায় '-ইষ্ঠ' যুক্ত হয়। বাংলায় শুধু '-ইষ্ঠ' দ্বারা নিষ্পন্ন বিশেষণগুলো ব্যবহৃত হয়। যেমন-

মূল বিশেষণ	বহুর মধ্যে তুলনায়
লঘু	লঘিষ্ঠ
গুরু	গরিষ্ঠ
শ্রেয়	শ্রেষ্ঠ

⏩ প্রশ্ন : ৮০ ॥ সর্বনাম ও বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত 'কী' শব্দের তিনটি ও অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত 'কি' শব্দের তিনটি প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর ॥ সর্বনাম ও বিশেষণ পদ হিসেবে 'কী'-এর ব্যবহার : সর্বনাম ও বিশেষণ পদ হিসেবে ব্যবহৃত 'কী' শব্দটির বানানে দীর্ঘ-ঈ-কার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. মনুষ্যত্ব অর্জনের পন্থাটা **কী**? (কোন্ রকম)।

খ. কিন্তু প্রশ্ন, এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি হয় **কী** প্রকারে? (কোন প্রকারে)

গ. বই যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি না হলে বইয়ের দাম কমাব **কী** করে? (কেমন করে)?

ঘ. আমি নিজে **কী** করি? (কোন কাজ)?

অব্যয় পদ হিসেবে 'কি'-এর ব্যবহার

অব্যয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত 'কি' শব্দের বানানে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন- ক. তুমি কি কথাটি শুনেছ? (সংশয়) খ. এমন আনন্দ কি আর পাব? (সংশয়) গ. বইটা পড়েছ কি? (উত্তর হাঁ বা না) ঘ. অন্ধের কাছে কি দিন কি রাত- দুই-ই সমান (কিংবা)।

⏩ প্রশ্ন : ৮১ ॥ নির্দেশক সর্বনাম 'এ' এবং 'এই' এর প্রয়োগ দেখিয়ে দুটি করে বাক্য রচনা কর এবং বাক্যে অব্যয় হিসেবে 'এই' এর প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর ॥ নির্দেশক সর্বনাম 'এ' এবং 'এই' : নির্দেশক সর্বনাম সাধারণত বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করে এবং একই সঙ্গে বিশেষণের মতোও কাজ করে। যেমন-

ক. এ উন্নতি অঞ্চলনিরপেক্ষ। খ. এ আকাশ উদার। গ. এ কথার অর্থ এই নয় যে, এরা পরস্পর বিরোধী। ঘ. উভয় পক্ষের এই মনোভাব গোঁড়া ও একপেশে। ঙ. এই জায়গাতেই ঘটনাটা ঘটেছিল ইত্যাদি।

'এই' শব্দের অব্যয়রূপী ব্যবহার

'এই' কখনো তাচ্ছিল্য সম্বোধনসূচক অব্যয় শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– এই শোনো তো।

'এই' কখনো কখনো ভয় বা আনন্দ ইত্যাদি প্রকাশ করে। যেমন– এই রে, ব্যাটা পালিয়েছে। এই তো ভাইয়া ফিরে এসেছেন ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ৮২ ॥ 'বাক্যের মধ্যে নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হওয়াই সর্বনামের একমাত্র কাজ নহে।' –ব্যাখ্যা কর।

উত্তর ॥ বাক্যের মধ্যে অথবা পূর্ববাক্যে ব্যবহৃত কোনো নাম পদের (অর্থাৎ বিশেষ্য বা বিশেষ্যার্থক কোনো পদের বা পদসমূহের) পরিবর্তে, অথবা পূর্ববর্তী কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ কিংবা প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখের প্রয়োজন হলে, তার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করে তার পরিবর্তে– সে, সব, ইহা, এই, উহা, তা ইত্যাদি যে সমস্ত পদ ব্যবহৃত হয়, তাদের বলে সর্বনাম বা প্রতিনাম। সর্বনাম পদ ব্যবহার করাতে একই কথার বারবার উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হওয়াই সর্বনামের একমাত্র কাজ নয়। এর আরো কাজ রয়েছে। যেমন–

ক. সর্বনাম কোনো বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন– যাকে তুমি চাও না সেই এসেছে। এখানে 'যাকে' বাক্যাংশের পরিবর্তে বসেছে।

খ. সর্বনাম বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন– যত চাও তত লও। যত গর্জে তত বর্ষে না ইত্যাদি।

গ. সর্বনাম ক্রিয়া বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন– এমন লোক দেখিনি।

প্রশ্ন : ৮৩ ॥ অব্যয় পদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লেখ। বাংলা ভাষায় কত প্রকার শব্দের অব্যয় হয়ে থাকে? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ॥ অব্যয় পদের সংজ্ঞা : অব্যয় শব্দের অর্থ– যার নয় ব্যয়। কোনো ব্যয় নেই। বাংলা ভাষায় লিঙ্গ, বচন বা কারকভেদে কোনো অবস্থাতেই যে পদের আকৃতির ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় পদ বলে। যেমন– এবং, বা, ও, আহা, ওগো, কিন্তু, বলে ইত্যাদি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অব্যয় পদের সংজ্ঞায় বলেন, "যে পদের কোনো অবস্থায় আকৃতির ব্যয় বা পরিবর্তন হয় না, তাকে অব্যয় বলে।"

অব্যয় পদের বৈশিষ্ট্য

ক. অব্যয় পদ হলো– এবং, ও, আর, তাই, সুতরাং, অতএব, ফলত, কার্যত, কিন্তু, কিংবা, নইলে, অথবা, নতুবা, বা, না হয়, নয়তো, যদি, যদিও, যেন ইত্যাদি। এ পদগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

খ. অব্যয় পদগুলোর সঙ্গে কোনো বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত হয় না।

গ. এর একবচন বা বহুবচন, পুরুষ ও লিঙ্গান্তর হয় না।

ঘ. এদের কাজ হলো বাক্যের শোভাবর্ধন এবং বাক্যাংশের সংযোগ সাধন করা। যেমন– ফুলটা তো ভারি সুন্দর (বাক্যের শোভাবর্ধন)। শুধু তুমি আর আমি সেখানে যাচ্ছি (বাক্যাংশের সংযোগ-সাধন)।

বাংলা ভাষায় অব্যয় শব্দের প্রকারভেদ

বাংলা ভাষায় তিন প্রকার অব্যয় শব্দ রয়েছে। বাংলা, তৎসম ও বিদেশি অব্যয় শব্দ।

১। **বাংলা অব্যয় শব্দ :** আর, আবার, ও, হাঁ, না ইত্যাদি।

২। **তৎসম অব্যয় শব্দ :** যদি, যথা, সদা, সহসা, হঠাৎ, অর্থাৎ, দৈবাৎ, বরং, পুনশ্চ, আপাতত, বস্তুত ইত্যাদি। 'এবং' ও 'সুতরাং' তৎসম শব্দ হলেও বাংলায় এগুলোর অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে। সংস্কৃতে 'এবং' শব্দের অর্থ এমন, আর 'সুতরাং' অর্থ অত্যন্ত, অবশ্য। কিন্তু এবং = ও (বাংলা), সুতরাং = অতএব (বাংলা)।

৩। **বিদেশি অব্যয় শব্দ :** আলবত, বহুত, খুব, শাবাশ, খাসা, মাইরি, মারহাবা ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ৮৪ ॥ অব্যয় শব্দের গঠনপদ্ধতি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর ॥ অব্যয় শব্দের গঠন

অব্যয় পদ বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে। যেমন–

১। একটিমাত্র বর্ণ বা শব্দখণ্ড বা শব্দ দ্বারা। যেমন– তো, বটে, হ্, হা ইত্যাদি।

২। একাধিক অব্যয় শব্দযোগে। যেমন– নতুবা, অথবা, অতএব, তথাপি ইত্যাদি।

৩। একই শব্দের দু'বার প্রয়োগে। যেমন– হায় হায়, ছি ছি, ধিক্ ধিক্, বেশ বেশ ইত্যাদি।

৪। দুটো ভিন্ন শব্দযোগে। যেমন– যাহোক, যেহেতু, নইলে, মোটকথা, হয়তো ইত্যাদি।

৫। অনুকার শব্দযোগে। যেমন– ঝমঝম, টুপটাপ, কুহুকুহু, গুনগুন, ঘেউ ঘেউ, শনশন, ছলছল, কনকন ইত্যাদি।

৬। তৎসম প্রত্যয়ের সঙ্গে 'ত' প্রত্যয় যোগ করে। যেমন– ধর্মত, প্রথমত, স্পষ্টত, সাধারণত ইত্যাদি।

» প্রশ্ন : ৮৫ ॥ বিভিন্ন অর্থে 'না' ও 'কি/কী' অব্যয়ের প্রয়োগ দেখাও।

উত্তর ॥ নিচে বিভিন্ন অর্থে 'না' ও 'কি/ কী' অব্যয়ের প্রয়োগ দেখানো হলো–

বিভিন্ন অর্থে 'না'-এর প্রয়োগ

১। তুই না ফেল করেছিস? (প্রশ্ন)

২। কি না কি ব্যাপার! (বিস্ময়)

৩। চোখ না হাসের ডিম। (উপমা)

৪। ওকে ডেকো না। (নিষেধ)

৫। না আছে টাকা, না আছে সুনাম। (বাক্যান্বয়ী)

৬। সে নাকি আর বেঁচে নেই। (সংশয়)

৭। তুই না একটা আস্ত গাধা। (বাক্যালঙ্কার)

৮। তুমি কী খাবে– কলা না আম? (বিকল্প)

৯। তুমি না সেদিন এসেছিলে? (অনুমান)

১০। যতই বল না, সে করবে না। (বিরোধ)

১১। তার কাণ্ডকারখানা দেখ না। (বিরক্তি)

বিভিন্ন অর্থে 'কি/কী'–এর প্রয়োগ

১। সে কি পাস করেছে? (প্রশ্ন)

২। কী বিপদ, লোকটা যে পিছু ছাড়ে না। (বিরক্তি)

৩। কি ধনী কি গরিব সবাইকে মরতে হবে। (সাকুল্য অর্থে)
৪। অন্ধের কাছে কি দিন কি রাত দুই-ই সমান। (কিংবা)
৫। কী এক সমস্যায় পড়েছি! (বিড়ম্বনা)
৬। তুমি কি কথাটি শুনেছ? (সংশয়)
৭। তুই কি কাজ করবি, না মার খাবি? (ক্রোধ)

» প্রশ্ন : ৮৬ ॥ ক্রিয়াপদ কাকে বলে? ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা ব্যাকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ হলো ক্রিয়াপদ। বাংলা বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়াপদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নিচে এর পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপিত হলো–

ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা

যেসব শব্দ দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১। ড. শাহজাহান মুনিরের মতে, "যে পদ দ্বারা কোনো বিশেষকালে সম্পন্ন ক্রিয়া বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।"

২। যে পদের সহায়তায় কোনোকিছু করা বা হওয়া বা কোনো কাজ বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন– আ. করিম বই **পড়ে**। সে বল **খেলে**। সাঈদ অঙ্ক **করে**।

ভাব প্রকাশের দিক দিয়ে ক্রিয়াপদের প্রকারভেদ

ভাব প্রকাশের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দু'প্রকার। যথা– ১। সমাপিকা ক্রিয়া ও ২। অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের (মনোভাবের) পরিসমাপ্তি জ্ঞাপিত হয়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আ. হাসান মন দিয়ে **লেখাপড়া করছে**। আসাদ কাল **এসেছে**। এখানে, 'লেখাপড়া করছে' ও 'এসেছে' সমাপিকা ক্রিয়া।

২। **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের গঠন সম্পূর্ণ হয় না, বক্তার আরো বলার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– নাসিম ভাত **খেয়ে** ......। প্রভাতে সূর্য **উঠলে** ......। এখানে 'খেয়ে' ও 'উঠলে' অসমাপিকা ক্রিয়া।

উপসংহার : সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া ক্রিয়াপদের অন্যতম দুটি প্রকার। সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্য ছাড়া অসমাপিকা ক্রিয়া বাক্য সম্পন্ন করতে পারে না।

» প্রশ্ন : ৮৭ ॥ ক্রিয়াপদ বলতে কী বোঝায়? ক্রিয়াপদ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ক্রিয়াপদ বাংলা বাক্যের প্রাণস্বরূপ। তাই বাক্য তৈরিতে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নিচে প্রশ্নালোকে ক্রিয়াপদের বর্ণনা প্রদত্ত হলো–

ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা

যেসব শব্দ দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদন বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।

প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১। ড. শাহজাহান মুনিরের মতে, "যে পদ দ্বারা কোনো বিশেষকালে সম্পন্ন ক্রিয়া বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।"

২। মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে, "যে পদের দ্বারা কোনো কার্যসম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।"

৩। যে পদের সহায়তায় কোনোকিছু করা বা হওয়া বা কোনো কাজ বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন– করিম বই **পড়ে**। সোহান 'সাঁতার' **কাটে**।

ক্রিয়াপদের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিন্যাস হয়ে থাকে। ক্রিয়াকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ক. ভাবের ওপর ও খ. কর্মের ওপর।

ক. ভাবের ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। সমাপিকা ক্রিয়া ও ২। অসমাপিকা ক্রিয়া।

১। **সমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– আমি বাড়ি **যাই**। সে স্কুলে **যায়**।

২। **অসমাপিকা ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় না, তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন– নাসিম ভাত **খেয়ে**।

খ. কর্মের ওপর নির্ভর করে ক্রিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। সকর্মক ক্রিয়া, ২। অকর্মক ক্রিয়া ও ৩। দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

১। **সকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন– আনিস **বল** খেলে, রুবি **বাড়ি** যায় ইত্যাদি।

২। **অকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন– আনিস **খেলে**, নাহার **লেখে**।

৩। **দ্বিকর্মক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। যেমন– রকিব **মাকে** চিঠি লিখেছে।

এছাড়া আরো দুটি ক্রিয়া আছে। যথা– ১। প্রযোজক ক্রিয়া ও ২। মিশ্র ক্রিয়া।

১। **প্রযোজক ক্রিয়া :** যে ক্রিয়া একজনের চালনায় বা প্রযোজনায় অন্যের দ্বারা শেষ হয়ে থাকে, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন– মা ছেলেকে চাঁদ **দেখাচ্ছেন**।

২। **মিশ্র বা যৌগিক ক্রিয়া :** অসমাপিকা ক্রিয়ার সাথে সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে মিশ্র বা যৌগিক ক্রিয়াপদ বলে। যেমন– লোকটি **চলে** গেল।

উপসংহার : ক্রিয়াপদের প্রকারসমূহ মোটামুটি উপরিউক্তরূপ। বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের প্রকারসমূহ এবং এর ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন : ৮৮ ॥ বাক্যে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব কতখানি? বাংলা ক্রিয়াপদ গঠনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর ॥ বাক্যে ক্রিয়াপদের গুরুত্ব : ক্রিয়াপদকে বাক্যের প্রাণ বলা হয়। তাই বাক্য তৈরির জন্য ক্রিয়াপদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। যে-কোনো বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই। তবে কখনো কখনো হয়তো তার আকৃতি চোখে পড়ে না, তার সাহচর্য ঘটে আড়ালে। যেমন– আ. রহিম ভালো ছেলে। এখানে ক্রিয়াপদটি উহ্য, আ. রহিম হয় ভালো ছেলে– এমন লেখা হলে 'হ' ধাতু থেকে তৈরি ক্রিয়াপদটি দৃষ্টিগোচর হতো। কিন্তু বাক্য গঠনে 'হয়' ক্রিয়াপদটির প্রয়োজন নেই। বাক্যে সাধারণত 'হ' এবং 'আছ' ধাতুগঠিত ক্রিয়াপদ উহ্য থাকে।

আমরা জানি, শব্দগুলো যখন বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তা বিভক্তিযোগে পদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বাক্যে এ পদগুলোতে যখন কোনোকিছু করা বা হওয়া বা কোনো কাজ করা বোঝায়, তখন তাকে ক্রিয়াপদ বলে। ক্রিয়াপদ ব্যতীত বাক্যই হবে না। তাই বাংলা বাক্যে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

ক্রিয়াপদ গঠনের প্রক্রিয়া

সমাপিকা ক্রিয়ার গঠন : সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক, অকর্মক ও দ্বিকর্মক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎকালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন– শফিক বই পড়ে (সকর্মক ক্রিয়া, বর্তমান কাল)। নাসির সারাদিন খেলেছিল। (অকর্মক ক্রিয়া, অতীত কাল)। আমি তোমাকে একটি বই উপহার দেব (দ্বিকর্মক ক্রিয়া, ভবিষ্যৎ কাল)।

অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন : ধাতুর সঙ্গে কালনিরপেক্ষ –ইয়া (য়ে), –ইতে (তে) অথবা –ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন– মুখ **ধুয়ে** পড়তে বস। যত্ন **করলে** রত্ন মেলে। তাকে খুঁজে নিয়ে **আসতে** চেষ্টা করবে ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়ার গঠন : অসমাপিকা ক্রিয়ার পরে যা, পড়্, দেখ, লাগ, ফেল, আস, উঠ, দি, লহ্, তাক্ প্রভৃতি ধাতু থেকে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়ে উভয়ে মিলিতভাবে যৌগিক ক্রিয়া তৈরি করে এবং এসব যৌগিক ক্রিয়া বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন–

সমাপ্তি অর্থে– বৃষ্টি **থেমে গেল**। অবিরাম অর্থে– গায়ক **গেয়ে যাচ্ছেন**। ক্রমশ অর্থে– চা **জুড়িয়ে যাচ্ছে**। সম্ভাবনা অর্থে– এখন যাওয়া যেতে পারে।

⏩ প্রশ্ন : ৮৯ ॥ ক্রিয়ার ভাব বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, ক্রিয়ার ভাব বলতে কী বোঝ? এটা কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ক্রিয়ার ভাব অনুসারে বাক্যের ভাব প্রকাশিত হয় এবং কর্তার কর্মের প্রতিফলন ঘটে। তাই বাক্যে ক্রিয়ার ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ক্রিয়ার ভাব

যে অবস্থার মাধ্যমে ক্রিয়ার কার্য ঘটার ধরন, প্রকার বা রীতি প্রকাশ পায় তাকে ক্রিয়ার ভাব বলে।

ক্রিয়ার ভাবের প্রকারভেদ

ক্রিয়ার ভ ব মোট চার প্রকার। যথা–

১। নির্দেশক ভাব ২। আকাঙ্ক্ষা ভাব ৩। অনুজ্ঞা ভাব ৪। অনির্দেশক ভাব।

১। **নির্দেশক ভাব :** যে ক্রিয়ায় সাধারণভাবে কোনো কাজ বোঝায়, তাকে নির্দেশক ভাব বলে। যেমন– মাসুম ক্রিকেট খেলে।

২। **আকাঙ্ক্ষা ভাব :** যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের কর্তার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তাকে আকাঙ্ক্ষা ভাব বলে। যেমন– আমি কক্সবাজার যাব।

৩। **অনুজ্ঞা ভাব :** ক্রিয়ার যে ভাব দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ পায়, তাকে অনুজ্ঞা ভাব বলে। যেমন– সদা সত্য কথা বলবে।

৪। **অনির্দেশক ভাব :** যখন একটি ক্রিয়া আর একটি ক্রিয়ার শর্তের ওপর নির্ভর করে তখন তাকে অনির্দেশক ভাব বলে। যেমন– সে আসলে আমি যাব। তাকে দেখলে সম্মান করবে ইত্যাদি।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাব অনুসারে ক্রিয়ার ব্যবহার বক্তব্যকে যথার্থ করে তোলে।

⏩ প্রশ্ন : ৯০ ॥ ক্রিয়ার কাল কী? বাংলায় ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

অথবা, ক্রিয়ার কাল বলতে কী বোঝ? ক্রিয়ার কাল কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : ক্রিয়ার কাল বাংলা ব্যাকরণের প্রধান একটি অধ্যায়। 'কাল' মানে সময়। ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে বাংলা ব্যাকরণে 'ক্রিয়ার কাল' বলা হয়। নিচে 'ক্রিয়ার কাল'-এর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো–

কাল-এর সংজ্ঞা

ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে ব্যাকরণের পরিভাষায় কাল বলা হয়। অন্য কথায়, ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার বিভিন্ন সময়কে কাল (Tense) বলে।

যেমন- নাজমা বই পড়ছে। রীতা ঢাকা গিয়েছিল। হিমু বেড়াতে যাবে। এখানে উদাহরণগুলোতে পড়ছে, গিয়েছিল ও যাবে ক্রিয়াপদগুলো যথাক্রমে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সময় বা কাল নির্দেশ করছে।

ক্রিয়ার কাল-এর প্রকারভেদ

ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার। যথা- ১। অতীতকাল, ২। বর্তমান কাল ও ৩। ভবিষ্যৎ কাল।

১। **অতীতকাল (Past Tense) :** অতীতকালে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছিল বোঝালে ক্রিয়ার সে কালকে অতীতকাল বলে। যেমন- গত মাসে আমি সিলেটে গিয়েছিলাম।

২। **বর্তমান কাল (Present Tense) :** ক্রিয়া যখন বর্তমান সময়ে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বোঝায়, তখন তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন- মিলি স্কুলে যাচ্ছে।

৩। **ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense) :** ভবিষ্যৎ কালে কোনো কাজ সংঘটিত হবে এমন বোঝালে তাকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন- আমি টেলিফোন করব।

কালত্রয়ের পূর্ণ প্রকারভেদ

উল্লিখিত তিনটি কালের প্রত্যেকটি আবার চার ভাগে বিভক্ত। নিচে ছকের মাধ্যমে উক্ত প্রকারসমূহ দেখানো হলো-

কালের নাম	চারটি ভাগ	উদাহরণ
বর্তমান কাল	১। সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ২। ঘটমান বর্তমান ৩। পুরাঘটিত বর্তমান ৪। বর্তমান অনুজ্ঞা।	সে পড়ে, সে পড়ছে, সে পড়েছে, সে পড়ুক।
অতীত কাল	১। সাধারণ অতীত ২। ঘটমান অতীত ৩। পুরাঘটিত অতীত ৪। নিত্যবৃত্ত অতীত	সে পড়ল, সে পড়ছিল, সে পড়েছিল, সে পড়ত।
ভবিষ্যৎ কাল	১। সাধারণ ভবিষ্যৎ ২। ঘটমান ভবিষ্যৎ ৩। পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ৪। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা।	সে পড়বে, সে পড়তে থাকবে, সে পড়ে থাকবে, সে সফল হবে।

উপসংহার : ক্রিয়া সাধারণত যেসব কালে সংঘটিত হয় তা সবই উল্লিখিত বারো প্রকারের আওতায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

▸▸ প্রশ্ন : ৯১ ॥ অনুজ্ঞা কাকে বলে? বাংলা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য নির্ণয় করে প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : বাংলা ক্রিয়ার কালের একটি অবস্থা হলো অনুজ্ঞা। তবে অনুজ্ঞা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ দু'কালে ব্যবহৃত হয়। নিচে প্রশ্নানুসারে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো-

অনুজ্ঞার সংজ্ঞা

অনুজ্ঞা অর্থ- আদেশ, অনুমতি, সম্মতি ইত্যাদি। বাংলা ব্যাকরণের পরিভাষায় যে ক্রিয়াপদ দ্বারা কোনো কাজ সম্পাদনের আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ বোঝায়, তাকে অনুজ্ঞা বলে। যেমন- সত্য কথা বল। এখানে 'বল' ক্রিয়াটি অনুজ্ঞা।

জ্যোতিভূষণ চাকীর মতে, "যে ভাব আবেদন, অনুমতি, অনুরোধ, আদেশ, আমন্ত্রণ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে অনুজ্ঞা বলে।"

বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার পার্থক্য

বাংলা ভাষায় বর্তমান অনুজ্ঞা ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়–

পার্থক্যের ভিত্তি	বর্তমান অনুজ্ঞা	ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা
১। সংজ্ঞাগত	বর্তমানে কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ ইত্যাদি বোঝালে তাকে বর্তমান অনুজ্ঞা বলে।	ভবিষ্যতে কোনো ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য আদেশ, উপদেশ বা অনুরোধ ইত্যাদি বোঝালে তাকে ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা বলে।
২। সময়	এটা বর্তমান কালের সাথে সম্পৃক্ত।	এটা ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্পৃক্ত।
৩। উদাহরণ	ক. আদেশ– তাড়াতাড়ি মাদরাসায় যাও। খ. অনুরোধ– দয়া করে আমাকে যেতে দিন। গ. উপদেশ– কুরআন হাদীস মেনে চল।	ক. আদেশ– আগামীকাল এসো। খ. অনুরোধ– লোকটি আসলে এ টাকাটা দিয়ে দেবেন। গ. উপদেশ– গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিও।

উপসংহার : বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার মৌলিক পার্থক্য হলো কালগত। এদের মধ্যে উত্তম পুরুষ ব্যবহৃত হয় না।

» প্রশ্ন : ৯২ ॥ উদাহরণসহ মৌলিক কাল ও যৌগিক কালের পার্থক্য নির্দেশ কর।

উত্তর ॥ উপস্থাপনা : রূপ ও অর্থ অনুসারে ক্রিয়ার কালকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। মৌলিক কাল ও ২। যৌগিক কাল। নিচে উভয়ের পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

পার্থক্যের ভিত্তি	মৌলিক কাল	যৌগিক কাল
১। সংজ্ঞা	ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তার কালকে মৌলিক কাল বলে।	মূল ধাতুর সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু ও ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তার কালকে যৌগিক কাল বলে।
২। সংযুক্তি	ধাতুর সঙ্গে, ই, ইলাম, ইব যুক্ত হয়।	মূল ধাতুর সঙ্গে ইয়া, ইতে যুক্ত হয়।
৩। প্রকারভেদ	মৌলিক কাল চারভাগে বিভক্ত।	যৌগিক কালের রূপ দশটি।
৪। উদাহরণ	ক. আমি করি। খ. পাষাণ কারা ভাঙিব।	ক. লোক জুটেছিল কম নয়। খ. আমাকে দেখে তুমি হাসতে থাক কেন?

উপসংহার : মৌলিক কাল ও যৌগিক কাল যেহেতু গঠনগত ও রূপগতভাবে হয়ে থাকে, তাই এদের প্রত্যেকটি যে-কোনো কালকে অন্তর্ভুক্ত করে।

» প্রশ্ন : ৯৩ ॥ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও ক্রিয়াবাচক বিশেষণ বলতে কী বোঝ, উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর ॥ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায়, তাকেই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন– এত দিন পরে মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য এসেছ, এমন আসার কোনো অর্থ নেই। অনেক পড়া হয়েছে, এখন কিছুটা লেখ। এ উদাহরণদ্বয়ে 'আসা' ও 'পড়া' মূলত ক্রিয়া হলেও এখানে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্রিয়া বিশেষণ : যে পদ ক্রিয়া সংঘটনের ভাব, কাল বা রূপ নির্দেশ করে, তাকে ক্রিয়া বিশেষণ বলে। যথা– **ধীরে ধীরে** বায়ু বয় [ক্রিয়া সংঘটনের ভাব]। **পরে** একবার এসো [ক্রিয়া সংঘটনের কাল]।

▸▸ প্রশ্ন : ৯৪ ॥ অনুজ্ঞা পদের গঠনপদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর ।। অনুজ্ঞা পদের গঠনপদ্ধতি নিচে উপস্থাপিত হলো–

অনুজ্ঞা পদের গঠন :

১। মধ্যম পুরুষের তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক সর্বনামের অনুজ্ঞায় ক্রিয়াপদে কোনো বিভক্তি যোগ হয় না। মূল ধাতুটিই ক্রিয়াপদরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– মধ্যম পুরুষ তুচ্ছার্থক বা ঘনিষ্ঠার্থক – তুই (বই) পড়্। তোমরা (বই) পড়। কিন্তু অনুরোধ, আদেশ বা অনুরূপ অর্থে সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম আপনি বা আপনারা এবং সাধারণ মধ্যম পুরুষের সর্বনাম তুমি বা তোমরা পদের সঙ্গে যে অনুজ্ঞা পদের ব্যবহার হয়, তাতে বিভক্তি যুক্ত থাকে। যেমন– সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষ– আপনি (আপনারা) আসুন (আস্ + উন)। সাধারণ মধ্যম পুরুষ– তুমি (তোমরা) আস (আস্ + অ)।

২। প্রাচীন বাংলা রীতিতে মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় ক্রিয়ার সঙ্গে 'হ' যোগ করার নিয়ম ছিল। এই 'হ' বর্তমানে অ এবং ও -তে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন–

ক. করহ (কর) আপন কাজ, তাতে কিবা ভয় লাজ।

খ. অধম সন্তানে মাগো দেহ (দাও) পদচ্ছায়া।

৩। ক. উত্তম পুরুষের অনুজ্ঞা পদ হতে পারে না, কারণ কেউ নিজেকে আদেশ করতে পারে না।

খ. অপ্রত্যক্ষ বলে নামপুরুষের অনুজ্ঞা হয় না। তবে এ মত সবাই সমর্থন করেন না।

৪। ক. মধ্যম ও নাম পুরুষের অনুজ্ঞার রূপ–

ধরন	সর্বনাম	বিভক্তি	উদাহরণ (ক্রিয়াপদ)
১। সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	–উন, –ন	যাউন, যান
২। সাধারণ	তুমি, তোমরা	–অ, –ও	কর, করো, যাও
৩। তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–০ (শূন্য)	কর্, যা
৪। সাধারণ	সে, তারা	–উক	করুক

উল্লেখ্য, ক. নির্দেশক ভাবের সাধারণ বর্তমান কালের সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের বিভক্তি– এন। যেমন– আপনি দেখেন। সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞা পদের বিভক্তি– উন। যেমন– আপনারা দেখুন।

খ. চলিত ভাষায় ধাতুর মূল স্বর এ-কারান্ত বা ও–কারান্ত হলে উক্ত পার্থক্য লোপ পায়। যেমন– নেন, লন, নিন > লউন, লোন।

খ. মধ্যম ও নাম পুরুষের ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞার রূপ–

		বিভক্তি		ক্রিয়াপদ	
ধরন	সর্বনাম	সাধু	চলিত	সাধু	চলিত
সম্ভ্রমাত্মক	আপনি, আপনারা, তিনি, তাঁরা	–ইবেন	-বেন	করিবেন	করবেন
সাধারণ	তুমি, তোমরা	–ইও	–ও	করিও	করো
তুচ্ছার্থক/ঘনিষ্ঠার্থক	তুই, তোরা	–ইস	–স	করিস্, খাইস্	খাস্
সাধারণ	সে, তারা	–ইবে	–বে	করিবে	করবে

» প্রশ্ন : ৯৫ ॥ ক্রিয়ার কর্ম বলতে কী বোঝ? ক্রিয়ার কর্ম কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

অথবা, উদাহরণসহ কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

উত্তর ॥ ক্রিয়ার কর্ম : বিশেষ্য পদ অথবা যা কিছু বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়ার কর্ম বলে। যেমন–

ক. বিশেষ্য– করো না সুখের আশ, পরো না দুখের **ফাঁস**।

খ. সর্বনাম– তিনি আমাকে **উঠালেন**।

গ. নাম বিশেষণ– **ধনীকে** লোকে ভয় করে, কিন্তু **জ্ঞানীকে** সম্মান করে।

কর্মের স্বরূপ বা প্রকৃতি : কর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি অনুসারে বাংলায় কর্ম বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা–

১। **মুখ্য ও গৌণকর্ম :** বাংলা দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে, একটি বস্তুবাচক এবং অপরটি ব্যক্তিবাচক। বস্তুবাচক কর্মকে বলা হয় মুখ্য কর্ম এবং ব্যক্তিবাচক কর্মকে বলা হয় গৌণ কর্ম বলে। যেমন– **শফিককে খবর** দাও। এই বাক্যে 'শফিককে' গৌণ কর্ম এবং 'খবর' মুখ্য কর্ম।

২। **উদ্দেশ্য ও বিধেয় কর্ম :** কোনো ক্রিয়ার দুটি পরস্পর আপেক্ষিক কর্ম থাকলে প্রধান কর্মটিকে বলা হয় উদ্দেশ্য কর্ম এবং তার আপেক্ষিক কর্মকে বলা হয় বিধেয় কর্ম। যেমন– মিথ্যাবাদীরা **দিনকে রাত, রাতকে দিন** করতে পারে। এই বাক্যে দিনকে ও রাতকে উদ্দেশ্য কর্ম এবং রাত ও দিন বিধেয় কর্ম।

৩। **সমধাতুজ কর্ম :** যদি কর্ম ও ক্রিয়া একই ধাতু থেকে উৎপন্ন হয় তবে তাকে সমধাতুজ কর্ম বলে। যেমন– সে **কাঠহাসি** হাসল।

উপসংহার : অতএব যেসব পদ বিশেষ্যের মতো ব্যবহৃত হয়, তা-ই ক্রিয়ার কর্ম।

» প্রশ্ন : ৯৬ ॥ "বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার কালভেদে রূপান্তর হয়, কিন্তু লিঙ্গভেদে হয় না"– আলোচনা কর।

উত্তর ॥ যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে। কালভেদে অর্থাৎ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন সাধিত হয়, কিন্তু লিঙ্গভেদে অর্থাৎ পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ার রূপ অপরিবর্তিত থাকে। নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমে এর প্রমাণ উপস্থাপন করা হলো :

কাল	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
বর্তমান কাল	আসাদ (পুং) গান শোনে।	নাবিলা (স্ত্রী) গান শোনে।
অতীত কাল	আসাদ (পুং) গান শুনছিল।	নাবিলা (স্ত্রী) গান শুনছিল।
ভবিষ্যৎ কাল	আসাদ (পুং) গান শুনবে।	নাবিলা (স্ত্রী) গান শুনবে।

উল্লিখিত উদাহরণে দেখা যায় 'বাংলা সমাপিকা ক্রিয়ার কালভেদে রূপান্তর হয়, কিন্তু লিঙ্গভেদে হয় না।'



অনুবাদ : ইংরেজি হতে বাংলা

▶২টি অনুচ্ছেদ দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির অনুবাদ করতে হবে ৫ × ১ = ৫

অনুবাদ কী?

এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তর করাই অনুবাদ। তবে এক ভাষার শব্দের স্থলে অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে দিলেই অনুবাদ হয় না। সুন্দর ও যথার্থ অনুবাদ করতে হলে সে ভাষার গতিময়তা, গঠনরীতি, পদবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রকারভেদ :

অনুবাদ মূলত দু' প্রকার। যথা– ১। ভাবানুবাদ ও ২। আক্ষরিক অনুবাদ।

১। **ভাবানুবাদ :** যে ধরনের অনুবাদে মূল বিষয় ঠিক রেখে বা মূলভাষার ভাব যথাযথ রেখে অপর ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দে অনুবাদ করা হয়, তাকে ভাবানুবাদ বলে। ভাবানুবাদের অপর নাম ভাবগত অনুবাদ।

২। **আক্ষরিক অনুবাদ :** যে ধরনের অনুবাদে মূল বিষয় পুরোপুরিভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়, বা মূল ভাষার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদের অপর নাম শাব্দিক অনুবাদ।

অনুবাদের সময় লক্ষণীয় : অনুবাদের সময় যেসব বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে তা হলো–

ক. অনুবাদ কেমন হবে তা নির্ভর করে অনুবাদের বক্তব্য বিষয়ের ওপর।

খ. অনুবাদ হবে মৌলিক।

গ. এর ভাষা হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল।

অনুবাদ করার নিয়ম :

ক. অনুবাদের পূর্বে উদ্ধৃত বিষয়টি কয়েকবার পড়তে হবে।

খ. অনুবাদ করার সময় বাক্যের ভাবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

গ. শব্দ ধরে অনুবাদ করলে চলবে না।

ঘ. সবসময় ভাবকে গুরুত্ব দিয়ে মূল বিষয়ের দিকে খেয়াল রেখে অনুবাদ করতে হবে।

ঙ. There, it, the, is, am, are, a, an ইত্যাদি শব্দের অনুবাদ বাংলায় দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

চ. ভাষার মাধুর্যের দিকে খেয়াল রেখে অনুবাদ করতে হবে।

ছ. ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা করতে হবে।

জ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তি অনুবাদে একইভাবে থাকবে।

ঝ. ক্রিয়ার কাল অনুবাদেও অনুসরণ করতে হবে।

অনুবাদের সময় আরো যেসব বিষয় লক্ষ রাখতে হবে তা নিচে উপস্থাপিত হলো–

- একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ থাকে, সেক্ষেত্রে উপযুক্ত শব্দটিকে যথাযথভাবে নির্বাচন করে ব্যবহার করতে হবে। যেমন– Give an account of your college. আমরা জানি, account শব্দটিকে Noun ও Verb হিসেবে ব্যবহার করা যায়। Account যদি Verb হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে এর অর্থ হবে– হিসাব করা, বিবেচনা করা, দায়ী হওয়া ইত্যাদি। আলোচ্য Sentence-এ account হলো Noun এবং Noun হিসেবে এর যে অর্থটি আমরা গ্রহণ করতে পারি তা হলো বিবরণ, অর্থাৎ Sentence-টির অর্থ দাঁড়ায়– তোমার কলেজের একটি বিবরণ দাও।
- অনুবাদ করার সময় সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। যেমন– I am not reading but playing games in computer now. এই Sentence-টির অর্থ সাধু ভাষায় অথবা চলিত ভাষায় লিখতে হবে। তবে চলিত ভাষাই অধিক গ্রহণযোগ্য। এক্ষেত্রে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। অর্থাৎ 'আমি এখন পড়িতেছি না; বরং কম্পিউটারে গেইম খেলছি'– লেখা যাবে না। লিখতে হবে– 'আমি এখন পড়ছি না; বরং কম্পিউটারে গেইম খেলছি।'
- কোনো শব্দের একাধিক অর্থ জানা না থাকলে বাক্যের ভাবানুসারে অনুবাদ করা যেতে পারে। যেমন– Rice is our staple food. Noun ও Adjective হিসেবে staple-এর সম্ভাব্য অর্থগুলো হলো– উৎপন্ন দ্রব্য, কাঁচামাল, প্রধান উপাদান, আঁশ, সুতা এবং প্রধান। অর্থ জানা থাকলে Sentence-টির Context (প্রসঙ্গ) অনুসারে আমরা বলতে পারি যে, এখানে staple-এর অর্থ প্রধান। তাহলে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় 'ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য।'
- সরলতা এবং স্পষ্টতা ভাষার শ্রেষ্ঠ গুণ। তাই অনুবাদের ভাষা যাতে কৃত্রিম ও আড়ষ্ট না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখতে হবে। যেমন– He teaches us.–এই Sentence-টির অর্থ 'তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেন' লিখলে ভাষাটা কৃত্রিম বা বানানো বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা যদি লিখি 'তিনি আমাদেরকে পড়ান' – তাহলে ভাষাটিকে অনেক সরল ও প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বলে মনে হয়।
- সঠিক পারিভাষিক শব্দ জানা না থাকলে, এমন প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে হবে যাতে মূল শব্দটির অর্থ অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন– 'Director' ও 'Laboratory' শব্দ দুটির পারিভাষিক অর্থ হলো যথাক্রমে 'অধিকর্তা' ও 'প্রয়োগশালা'। তবে এই পারিভাষিক অর্থগুলো জানা না থাকলেও আমরা এগুলোর পরিবর্তে যথাক্রমে 'পরিচালক' ও 'গবেষণাগার' ব্যবহার করেও মূল শব্দগুলোর অর্থ পরিস্ফুট করতে পারি।
- ইংরেজি প্রবাদ বাক্যের মূল অর্থটি আত্মস্থ করে বাংলা ভাষার কোন প্রবাদটি ওই বাক্যের নিকটতম ভাবার্থ প্রদান করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন– Black will take no other hue. (কয়লা ধুলে ময়লা যায় না।)
- ইংরেজিতে সকর্মক ক্রিয়ার পর কর্ম বসে, কিন্তু বাংলায় ক্রিয়ার পূর্বে কর্ম বসে। যেমন– I have a computer. (আমার আছে একটি কম্পিউটার)। কিন্তু বাংলায় অনুবাদ হবে– 'আমার একটি কম্পিউটার আছে।' সুতরাং বাংলার নিজস্ব গঠনরীতি অনুসারে বাক্য গঠিত হবে।

- ইংরেজিতে সত্তাবাচক ক্রিয়াপদ থাকে, কিন্তু বাংলায় তা থাকে না। যেমন- He is my brother, বাংলায়- সে আমার ভাই। এসব ক্ষেত্রে is-এর প্রতিশব্দ (হয়) বাংলায় উহ্য থাকে।
- ইংরেজি Introductory 'there'-এর বাংলায় কোনো অনুবাদ নেই। There is a mad man in our town. (সেখানে হয় একটা পাগল আমাদের শহরে।) এভাবে না হয়ে বাংলায় হবে- আমাদের শহরে একটা পাগল আছে।
- তুমি, তোমরা, আপনি, তুই, আপনারা- এর প্রত্যেকটির প্রতিশব্দ ইংরেজিতে নেই, ইংরেজিতে you দিয়েই এগুলো বোঝানো হয়। বাংলায় ভাব ও অবস্থা অনুসারে you-এর বদলে তুই, তুমি, তোমরা, আপনি ইত্যাদি ব্যবহৃত হবে। যেমন-You must have read good books. (এখানে 'You' তুমি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)- তোমার অবশ্যই ভালো বই পড়া উচিত।
- অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজির বহুবচন বাংলায় বর্জন করতে হবে। যেমন- Grapes are sour. অনুবাদে- 'আঙ্গুরগুলো হয় টক' না লিখে লিখতে হবে 'আঙ্গুর টক'। তবে নির্দিষ্ট করে বোঝালে বাংলায় বহুবচন ব্যবহৃত হয়। যেমন- Those are my books.- ওই বইগুলো আমার।
- ইংরেজি জটিল বাক্যকে বাংলায় খণ্ড খণ্ড করে সরল বাক্যে পরিণত করতে হয়।
- ইংরেজিতে পরপর দুটি বহুবচন পদ ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু বাংলায় একই বাক্যে দুটি বহুবচন ব্যবহৃত হলে বাক্য ভুল হবে। যেমন- Many students have come. অর্থাৎ, 'অনেক ছাত্ররা এসেছে।' এভাবে না বলে বাংলায় বলতে হবে- 'অনেক ছাত্র এসেছে।'
- Who- এর পরে Singular Verb থাকলে who-এর বাংলা 'কে' এবং Plural Verb থাকলে 'কারা' ব্যবহৃত হবে। যেমন- Who **has** broken the chair?-কে চেয়ারটি ভেঙেছে? Who **have** broken the chair?- কারা চেয়ারটি ভেঙেছে? বা, কে কে চেয়ারটি ভেঙেছে?
- ইংরেজি শর্তবাচক বাক্যের অনুবাদে যদি/তবে ব্যবহার না করেও বাংলা বাক্য তৈরি করা যায়। যেমন-If you want to go, do so.- যেতে চাইলে যাও।
- ইংরেজি Impersonal pronoun-কে বাংলায় পরোক্ষভাবে অনুবাদ করতে হয়। যেমন- One should love **one's** parents-এর ক্ষেত্রে লিখতে হবে- 'মা-বাবাকে ভালোবাসা উচিত।'
- মূল রচনার Phrase, Clause ও Compound word-কে বাংলায় সমাসবদ্ধ পদের সাহায্যে অনুবাদ করা দরকার।
- নামের অনুবাদকালে মূল উচ্চারণ ঠিক রেখে বাংলা অক্ষরে তা লেখার নিয়ম। কিন্তু ইংরেজি ও বাংলা উচ্চারণ এক না হলে অনুবাদে বাংলা উচ্চারণই ব্যবহার করতে হবে। যেমন- Chittagong- চট্টগ্রাম, (চাটগাঁ বা চিটাগং নয়); Calcutta- কলকাতা (ক্যালকাট্টা নয়)।
- কিছু কিছু ইংরেজি নামের বাংলা অনুবাদে বাংলায় প্রচলিত নাম ব্যবহৃত হয়। যেমন- Egypt- মিসর; India- ভারত; United states- যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি।
- কিছু ইংরেজি শব্দ বাংলায় প্রচলিত নিয়মে হবে। যেমন- Doctor- ডাক্তার; Hospital- হাসপাতাল; Table- টেবিল ইত্যাদি।

ইংরেজি হতে বাংলায় অনুবাদ

[Translation From English to Bengali]

1. A newspaper is a store-house of knowledge. We can know the conditions, manners, customs of other countries of the world from newspaper. In fact, it is the summary of all current history. It supplies information to all classes of people. The businessman finds the condition of the world market about his goods.

অনুবাদ : সংবাদপত্র হলো জ্ঞানের ভান্ডার। আমরা সংবাদপত্র থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের অবস্থা, আচার-আচরণ, প্রথা সম্পর্কে জানতে পারি। বস্তুত, সংবাদপত্র চলতি ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার। সকল শ্রেণির লোকের কাছে এটা সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। ব্যবসায়ী তার পণ্য সম্পর্কে বিশ্ববাজারের অবস্থা জানতে পারে।

2. Man is the architect of his own life. If he makes proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to prosper in life. But, if he does otherwise he is sure to repent, when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day. [ফা. প. ২০১৩, '১৯]

অনুবাদ : মানুষ তার নিজ জীবনের নির্মাতা। সে যদি তার সময়কে সঠিকভাবে ভাগ করে এবং তদনুসারে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে, তবে অবশ্যই জীবনে উন্নতি করবে। কিন্তু সে যদি এর অন্যথা করে, তবে অবশ্যই তাকে অনুতাপ করতে হবে যখন আর কিছুই করার থাকবে না এবং তাকে দিনের পর দিন দুর্বিষহ জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।

3. Jute is the main cash crop of Bangladesh. Three-fourth of the total jute of the world grows in Bangladesh. Bangladesh earns a lot of foreign currency by exporting jute and jute–made goods. This is why, jute is called 'The golden fibre of Bangladesh.' The soil of Mymensingh, Tangail, Faridpur, Dhaka, Comilla and Noakhali is very suitable for jute cultivation.

অনুবাদ : পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিশ্বের মোট তিন-চতুর্থাংশ পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। এ জন্যই পাটকে 'বাংলাদেশের সোনালি আঁশ' বলা হয়। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলার মাটি পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

4. Early rising is beneficial to health. The boy who rises early enjoys the pure air of the morning. He can take a walk by the river side or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see the beautiful sight of the sunrise. All these can make him healthy and cheerful [ফা. প. ২০০৯, '১১, '১৫]

অনুবাদ : সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যে ছেলে সকালে ওঠে সে সকালের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করতে পারে। সে নদীর তীরে বা খোলা মাঠে ভ্রমণ করতে পারে। সে পাখিদের মধুর গান শুনতে পারে এবং সূর্যোদয়ের সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারে। এ সবকিছুই তাকে স্বাস্থ্যবান এবং প্রফুল্ল করে তুলতে পারে।

5. Honesty is the best policy. An honest man is respected by all. Everyone trusts him. No one can prosper in life, unless he is honest. An honest shop-keeper is liked very much by his customers. All go to his shop and buy things from him. They begin to trust him. His credit grows and his business flourishes.

অনুবাদ : সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। একজন সৎব্যক্তি সবার শ্রদ্ধা লাভ করেন। প্রত্যেকেই তাকে বিশ্বাস করে। সৎ না হলে কেউ জীবনে উন্নতি করতে পারে না। একজন সৎ দোকানি ক্রেতাদের নিকট খুব বেশি পছন্দের হয়ে থাকেন। সবাই তার দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কিনে। তারা তাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তার সুনাম বৃদ্ধি পায় এবং তার ব্যবসায় উন্নতি হয়।

6. One night when Hazi Mohsin was asleep, a thief entered into his room. The thief opened the box, brought out the money and was about to run away. But by a certain sound Mohsin's sleep broke suddenly. He opened the eyes and saw the thief and asked, "Who are you and why have you entered into my room?"

অনুবাদ : এক রাতে যখন হাজী মহসিন ঘুমিয়ে আছেন, তখন তার ঘরে এক চোর ঢুকল। চোরটি বাক্স খুলে টাকা বের করল এবং তা নিয়ে পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু হঠাৎ একটি শব্দে মহসিনের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলেই তিনি চোরটিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে এবং কেন আমার ঘরে প্রবেশ করেছ?"

7. None can be happy without friends. The heart is formed for love and cannot be happy without the opportunity of giving and receiving affection. But you also cannot find other to love unless you love them. Love is only to be obtained by giving love in return. You cannot be happy without it.

অনুবাদ : বন্ধু ছাড়া কেউ সুখী হতে পারে না। হৃদয় ভালোবাসার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে এবং স্নেহের আদান-প্রদানের সুযোগ না পেলে সুখী হতে পারে না। কিন্তু তুমি যদি অন্যদের ভালো না বাস তবে তুমিও তাদের ভালোবাসা পাবে না। ভালোবাসার বিনিময়েই কেবল ভালোবাসা পাওয়া যায়। এটা ছাড়া তুমি সুখী হতে পারবে না।

8. We should bear the courage to say the right thing. We need not fear men, or care for what others think of us. So long as our purpose is honest, Allah will be on our side, and with his help we shall be able to encourage the weak. Thus, we shall be able to march in life and reach its goal.

অনুবাদ : সত্য কথা বলার মতো সাহস আমাদের থাকা উচিত। মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন আমাদের নেই, কিংবা অন্যেরা আমাদের নিয়ে কী ভাবছে তা-ও পরোয়া করার দরকার নেই। যতক্ষণ আমাদের উদ্দেশ্য সৎ থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ আমাদের পক্ষে থাকবেন এবং তাঁর সহায়তায় আমরা দুর্বলকে উৎসাহিত করতে পারব। এভাবে আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারব এবং এর লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হব।

9. Man is the best of all creations. Allah has given men some noble virtues. Kindness is one of them. Allah is kind to him who is kind to

others. Everyone should try to acquire this noble virtue and be kind to others. Without kindness a man cannot attain perfection.

অনুবাদ : মানুষ সকল সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে কিছু মহৎ গুণ দিয়েছেন। দয়া তার মধ্যে অন্যতম। যে অন্যের প্রতি সদয় হয় আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন। প্রত্যেকেরই এই মহৎ গুণটি অর্জনের চেষ্টা করা এবং অন্যের প্রতি সদয় হওয়া উচিত। দয়া-মায়া ছাড়া একজন মানুষ পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না।

10. A garden is not a source of beauty only. It is also a source of income to men. Men for their great love of flowers decorate their homes with them on occasions. Men love flowers, for they are the symbols of beauty and purity. A village home without any garden looks bare and poor. A garden is useful for other purposes also.

অনুবাদ : বাগান কেবল সৌন্দর্যের উৎস নয়। এটা মানুষের আয়েরও উৎস। মানুষ ফুলকে ভালোবাসে বলেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে এর দ্বারা ঘর সাজায়। মানুষ ফুল ভালোবাসে, কেননা এটা সৌন্দর্য ও শুদ্ধতার প্রতীক। বাগান ছাড়া কোনো গ্রামের বাড়িকে একদম ফাঁকা ও জীর্ণ দেখায়। অন্য কাজের জন্যও বাগানের উপকারিতা রয়েছে।

11. Sher-e-Bangla Fazlul Huq was born in the district of Bakergonj. He was very meritorious. He respected his parents very much. He loved his country more than his life. He was a friend of the poor. He did a lot of things for the benefit of the people. He died at the age of eighty-nine. We still remember him.

অনুবাদ : শেরে বাংলা ফজলুল হক বাকেরগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি পিতামাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। নিজের প্রাণের চেয়েও তিনি দেশকে অধিক ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন গরিবের বন্ধু। জনগণের মঙ্গলের জন্য তিনি অনেক কিছু করে গেছেন। তিনি উননব্বই বছর বয়সে মারা যান। আমরা এখনও তাঁকে স্মরণ করি।

12. The proverb says, Allah helps them who help themselves. A man who relies on his own ability and does his work by himself is helped by Allah. Such a man is always crowned with success. This great virtue creates in him the confidence which is essential for success in life. It is a self-confident man who only reaps the fruit of his labour in full.

অনুবাদ : প্রবাদ আছে, আল্লাহ তাদেরই সাহায্য করেন, যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করেন। যিনি নিজের কর্মক্ষমতার ওপর আস্থাশীল এবং নিজের কাজ নিজেই করেন, আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেন। এ ধরনের মানুষ সব সময় বিজয়ের মুকুট লাভ করেন। এ মহৎ গুণটি তার মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে যা জীবনের সফলতার জন্য আবশ্যকীয়। আত্মপ্রত্যয়ী মানুষই তার শ্রমের পূর্ণ ফল লাভ করে।

13. Dogs may be of great use, when well trained. In some cold countries dogs are taught to draw cart over the ice. You all know how carefully the dog guards your house at night. But perhaps you have never heard of a dog showing the way dark night with lantern in his mouth.

অনুবাদ : ভালো প্রশিক্ষণ পেলে কুকুর অনেক কাজে লাগতে পারে। কোনো কোনো শীতপ্রধান দেশে কুকুরকে বরফের ওপর দিয়ে গাড়ি টানতে শেখানো হয়। তোমরা

সবাই জানো কুকুর কেমন সতর্কতার সাথে তোমাদের বাড়িঘর রাতে পাহারা দেয়। কিন্তু একথা বোধহয় তোমরা কখনো শোনোনি যে, কুকুর আঁধার রাতে মুখে লণ্ঠন নিয়ে পথ দেখিয়ে থাকে।

14. Japan is to the east of our country. Among the countries of Asia, sunrise is first seen in Japan. So Japan is called 'The country of sunrising.' The children of Japan are very modest and gentle. They do not know how to weep.

অনুবাদ : জাপান আমাদের দেশের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে জাপানেই প্রথম সূর্যোদয় দেখা যায়। তাই জাপানকে 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলা হয়। জাপানের শিশুরা খুব নম্র ও ভদ্র। তারা কাঁদতে জানে না।

15. Parents are the source of our life on the earth. It is they who have brought us in the world. They have brought us up in our childhood. They look after us from our infancy with greatest care and love. Without their taking care our existence on this earth would be impossible.

অনুবাদ : এ পৃথিবীতে পিতামাতাই আমাদের জীবনের উৎস। তারাই আমাদেরকে এ পৃথিবীতে এনেছেন। আমাদের শৈশবে তারাই আমাদের লালন-পালন করেছেন। শৈশব থেকেই তারা আমাদের সর্বাধিক যত্নে ও ভালোবাসায় তত্ত্বাবধান করেন। তাদের যত্ন-আত্তি ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব হয়ে পড়ত।

16. Books are men's best companions in life. You may have good friends but you cannot get them when you need them. They may not speak gently to you. One or two may prove false and do you much harm. But books are always ready to be by your side. Some books may make you laugh, some other may give you much pleasure. Others again may give you knowledge and new ideas.

অনুবাদ : বই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সহচর। আপনি ভালো বন্ধু পেতে পারেন; কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাদেরকে পাবেন না। তারা আপনার সাথে ভদ্রভাবে কথা বলতে নাও পারে। তাদের মধ্যে দু-একজন অসাধু বলে প্রমাণিত হতে পারে এবং আপনার অনেক ক্ষতিও করতে পারে। কিন্তু বই সর্বদা আপনার পাশে থাকবার জন্য প্রস্তুত। কিছু বই আপনাকে হাসাতে পারে, কিছু বই প্রচুর আনন্দ দান করবে। আবার কতকগুলো বই আপনাকে জ্ঞান ও নতুন নতুন ধারণা দিতে পারে।

17. I am fond of collecting foreign stamps. I have chosen it because it is both interesting and instructive. If one goes on collecting stamps, he comes in direct touch with geographical, historical and social conditions of various countries. The pictures of various things of interest- rare animals, beautiful sights-all these are thought provoking.

অনুবাদ : আমি বিদেশি ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে পছন্দ করি। আমি এটা পছন্দ করি কারণ এটা আনন্দদায়ক এবং শিক্ষামূলক উভয়ই। কেউ যদি ডাকটিকেট সংগ্রহে নামে তাহলে সে বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। ডাকটিকিটের বিভিন্ন আকর্ষণীয় জিনিসের ছবি- দুর্লভ প্রাণী, সুন্দর দৃশ্য– এসবই চিন্তাশক্তি বাড়ায়।

18. Work is life. It is the true source of health and happiness. Man cannot be all together idle. They must have something to do or think upon. An idle man is busy with evil thoughts and goes to ruin.

অনুবাদ : কর্মই জীবন। এটিই স্বাস্থ্য ও সুখের প্রকৃত উৎস। মানুষ পুরোপুরি অলস হতে পারে না। তাদের কাজ করা বা চিন্তা করার মতো কিছু থাকতে হবে। একজন অলস মানুষ কু-চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং সর্বস্বান্ত হয়।

19. There are many ways of taking physical exercise. It can be secured either by walking or gymnastics. Walking is the best suited to all kinds of health. Both the young and the old can walk and help their body function as long as they live. On the other hand, gymnastic exercises are best suited to young people only.

অনুবাদ : বহু উপায়ে শারীরিক ব্যায়াম অনুশীলন করা যায়। হেঁটে বা শরীরচর্চার মাধ্যমে এটা লাভ করা যেতে পারে। সব রকমের স্বাস্থ্যের জন্য হাঁটা সবচেয়ে উপযোগী। যুবক, বৃদ্ধ উভয়েই হাঁটতে পারে এবং যতদিন বেঁচে থাকে তাদের দৈহিক ক্রিয়াকে এভাবে সাহায্য করতে পারে। অপরপক্ষে, শারীরিক ব্যায়াম কেবল যুবকদের জন্যই সবচেয়ে বেশি উপযোগী।

20. Here is my mother. There is none else like my mother. How affectionate she is to me! She always takes care of me. If I fall ill, mother grows very anxious.

অনুবাদ : এই আমার মা। আমার মায়ের মতো আর কেউ নেই। তিনি আমার প্রতি কতই না স্নেহপরায়ণ! তিনি সর্বদা আমার যত্ন নেন। আমি অসুস্থ হলে মা বড়ই উদ্বিগ্ন হন।

21. Knowledge is vaster than an ocean. The more we gather knowledge, the more our thirst for it increases. So, any kind of restriction on the persuit of knowledge is not at all desirable. Everybody has the right to walk freely in the ocean of knowledge.

অনুবাদ : জ্ঞান সমুদ্রের চেয়েও বিশাল। আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি, আমাদের জ্ঞানতৃষ্ণা ততই বেড়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। জ্ঞানসমুদ্রে অবাধ বিচরণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

22. It was so dreadfully cold. It was snowing and the evening was beginning to darken. It was the last-evening of the year too New Year's Eve. Through the cold and the dark, a poor little girl with bare head and naked feet was wandering along the road.

অনুবাদ : ভয়ানক রকমের ঠান্ডা ছিল। বরফ পড়ছিল এবং সন্ধ্যা আরো ঘনীভূত হতে শুরু করেছিল। এটা ছিল নববর্ষের প্রাক্কালে বছরের সর্বশেষ সন্ধ্যা। হতভাগ্য ছোট্ট একটি বালিকা ঠান্ডা ও অন্ধকারের মাঝে খালি মাথায় ও খালি পায়ে রাস্তায় চলছিল।

23. Poverty is a great problem in our country. But we hardly realise that this miserable condition is our creation. Many do not try to better their condition by hard labour and profitable business. They only curse their fate.

অনুবাদ : দারিদ্র্য আমাদের দেশের এক বিরাট সমস্যা। কিন্তু আমরা কদাচিৎ উপলব্ধি করি যে, এ শোচনীয় অবস্থা আমাদেরই সৃষ্ট। কঠোর পরিশ্রম ও লাভজনক ব্যবসার মাধ্যমে অনেকেই তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে না। তারা কেবল তাদের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে থাকে।

24. In this life there are no gain without pains. Life indeed, would be dull if there were no difficulties. Games lose their interest, if there is no struggle and if the result is a forgone conclusion. Both winner and loser enjoy a game most if it is closely contested to the last.

অনুবাদ : এ জীবনে কষ্ট ছাড়া কিছুই লাভ করা যায় না। বাস্তবিক পক্ষে, বাধা-বিঘ্ন না থাকলে জীবন নিরানন্দ হয়ে পড়ে। খেলায় যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে আর পূর্বেই ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়, তবে সেখানে কোনো আনন্দ থাকে না। একটি খেলায় শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে বিজয়ী এবং বিজিত উভয় দলই দারুণ আনন্দ উপভোগ করে।

25. Having finished his dinner, he again stretched out on the sofa, but he could not sleep. He lay motionless with his face buried in the pillow. He kept day dreaming, and his daydreams were all so strange, mostly he imagined himself to be in Africa, in Egypt in some sort of oasis.

অনুবাদ : ভোজন শেষ করে সে পুনরায় সোফার ওপর (দেহ) প্রসারিত করলো, কিন্তু ঘুমোতে পারল না। মুখখানি বালিশের মধ্যে গুঁজে দিয়ে সে স্থবির হয়ে রইল। সে দিবাস্বপ্ন দেখছিল এবং তার দিবাস্বপ্ন সবই ছিল খুব অদ্ভুত; বেশির ভাগই সে নিজেকে কল্পনা করতো যেন আফ্রিকায়, মিসরের এক ধরনের মরূদ্যানের মধ্যে সে অবস্থান করছে।

26. A student is a learner. He must mind his studies first. He should go through with his home work and attend school regularly. A good student reads a lot even outside his prescribed textbooks. He loves knowledge for the sake of knowledge. He loves his teachers as he loves his parents.

অনুবাদ : একজন ছাত্র হলো শিক্ষার্থী। তাকে প্রথমেই লেখাপড়ায় মনোযোগী হতে হবে। সে নিয়মমাফিক বাড়ির কাজ করবে এবং স্কুলে উপস্থিত থাকবে। একজন ভালো ছাত্র ক্লাসের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও যথেষ্ট পড়াশোনা করে থাকে। সে জ্ঞানার্জনের জন্যই জ্ঞান পছন্দ করে। সে তার বাবা-মার মতোই শিক্ষকবৃন্দকেও ভালোবাসে।

27. One day Rabeya Basri (Rh) climbed up a hill to enjoy the sight of the beauties of nature. At that time many beasts came flocking there from all sides and stood surrounding her like her closest friends. But as soon as the famous saint Hasan Basri (Rh) came up there by another way, the beasts and birds retreated to a distance.

অনুবাদ : একদিন রাবেয়া বসরী (র) প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের জন্য একটি পাহাড়ে আরোহণ করলেন। এমন সময় অনেকগুলো পশুপাখি চারদিক থেকে সেখানে এসে ভিড় করল এবং তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু প্রখ্যাত দরবেশ হাসান বসরী (র) যেইমাত্র অন্যপথে সেখানে উপস্থিত হলেন, অমনি পশুপাখিগুলো সেখান হতে দূরত্বে চলে গেল।

28. Punctuality is to be cultivated and formed into a habit. This quality is to be acquired through all our work from our boyhood. Boyhood is the seed time. The habit formed at this time will continue all through our life.

অনুবাদ : নিয়মানুবর্তিতার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন; আর এভাবেই একে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। আমাদের ছেলেবেলা হতেই সমস্ত কর্মের ভেতর দিয়ে এই গুণ

আয়ত্ত করতে হবে। ছেলেবেলাই হলো বীজ বপনের সময়। এ সময়ে গড়ে ওঠা অভ্যাস আমাদের সারাজীবন ধরেই চলতে থাকবে।

29. In Bangladesh only one person in every four can write and read. Many people who leave school before they finish class five, forget what they have learnt. After ten or fifteen years it is very natural to forget how to write and read.

অনুবাদ : বাংলাদেশে প্রতি চারজনের মাঝে মাত্র একজন লোক লিখতে ও পড়তে পারে। অনেকেই পঞ্চম শ্রেণি শেষ করার আগে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দেয়, ফলে তারা আগে যা শিখেছিল তা-ও ভুলে যায়। দশ-পনেরো বছর পরে লিখতে ও পড়তে ভুলে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।

30. There was once an African king who was very arrogant. One day an old Negro came to him and said, "All men are servants to one another. So, I am your servant." "Am I?" asked the king, "Prove it before sun-set or I will kill you." The Negro said, "Very well."

অনুবাদ : কোনো একসময় আফ্রিকায় এক ভয়ানক দাম্ভিক রাজা ছিলেন। একদিন এক বৃদ্ধ নিগ্রো তার কাছে এসে বলল, "সব লোক একে অপরের চাকর। সুতরাং আমি তোমার চাকর।" "আমিও?" রাজা প্রশ্ন করলেন, "সূর্যাস্তের আগে তুমি এটা প্রমাণ করবে নইলে আমি তোমায় খুন করব।" নিগ্রো লোকটি বলল, "ঠিক আছে।"

31. One day the Prophet (Sm) went out for a walk. He had many men with him. It was the dinner time on the way. Then all of them began to arrange cooking. Someone prepared the oven, someone prepared bread and someone brought water. The Prophet (Sm) said, "I shall also do work." Afterwards he selected the hardest of all the works.

অনুবাদ : একদিন নবি (স) বেড়াতে বের হলেন। তাঁর সাথে অনেক লোক ছিলেন। পথে খাওয়ার সময় হলো। তখন সবাই রান্নার আয়োজন করতে লাগলেন। কেউ চুলা প্রস্তুত করলেন, কেউবা রুটি, আবার কেউবা পানি আনলেন। নবি (স) বললেন, "আমিও কাজ করব।" পরে তিনি সবচেয়ে কঠিন কাজটি বেছে নিলেন।

32. Socrates did not teach in a school, instead he taught in the streets, in the market places, where the young men were likely to be found. He taught that man must be good to be happy. He often said that he was wiser than other men, because he understood how little he really knew.

অনুবাদ : সক্রেটিস কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষা না দিয়ে বরং রাজপথে, হাট-বাজারে, যেখানে যুবকদের পাওয়া যেত সেখানেই শিক্ষাদান করতেন। তিনি শিক্ষা দিতেন যে, মানুষকে সুখী হতে হলে অবশ্যই ভালো হতে হবে। তিনি সবসময় বলতেন যে, তিনি অন্য মানুষের চেয়ে জ্ঞানী। কারণ তিনি যে বাস্তবিক পক্ষে কত কম জানতেন তা বুঝতে পেরেছিলেন।

33. Students have many duties. Parents, teachers and superiors should be obeyed. Instruction of teachers should be carefully carried out. They should not read immoral books. They should cease to take

excessive food. They should not, as it were, be always busy with books. They should take rest after reading a great deal of time.

অনুবাদ : ছাত্রদের অনেক কর্তব্য রয়েছে। মাতাপিতা, শিক্ষক ও গুরুজনদের মান্য করতে হবে। শিক্ষকদের নির্দেশ সযত্নে পালন করতে হবে। তাদের বাজে বই পড়া উচিত নয়। তারা অধিক আহার থেকে বিরত থাকবে। সবসময় বই নিয়ে যেন তারা ব্যস্ত না থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পড়ার পর তাদের বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন।

34. We live in Bangladesh. It is a beautiful country. Our country has fertile land. We grow rice, jute and sugarcane. We grow wheat, potato, pulse, groundnut and other crops too. We also grow vegetables and fruits. There are hills in Sylhet and Chittagong. We grow tea there.

অনুবাদ : আমরা বাংলাদেশে বাস করি। এটি একটি সুন্দর দেশ। আমাদের দেশে উর্বর জমি আছে। আমরা তাতে ধান, পাট ও আখ জন্মাই। আমরা গম, আলু, ডাল, চীনাবাদাম এবং অন্যান্য শস্যাদিও জন্মাই। আমরা শাকসবজি ও ফলমূলও ফলাই। সিলেট ও চট্টগ্রামে পাহাড় আছে। সেখানে আমরা চা জন্মাই।

35. Bees are very industrious creatures. They lead a busy life from morning till evening. They gather honey from flowers and store it in honey combs. In every honey comb, there is a queen bee.

অনুবাদ : মৌমাছি খুব পরিশ্রমী প্রাণী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা ব্যস্ত জীবন কাটায়। তারা ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করে এবং তা মৌচাকে সঞ্চয় করে। প্রত্যেক মৌচাকে একটি রানি মৌমাছি থাকে।

36. Allah has created us. He loves all. He has created the earth, the sun and the moon. He has created the birds and the beasts. We do not see Him but He can see us. We are alive because of His mercy.

অনুবাদ : আল্লাহ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি সবাইকে ভালোবাসেন। তিনি পৃথিবী, সূর্য এবং চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। তিনি পশু ও পাখি সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁকে দেখি না; কিন্তু তিনি আমাদেরকে দেখতে পান। আমরা তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি।

37. The lion is the king of beasts. One day a lion was sleeping. A mouse was playing nearby. The mouse got upon the body of the lion. This roused the lion from sleep. He became very angry. He caught hold of the mouse.

অনুবাদ : সিংহ পশুর রাজা। একদিন এক সিংহ ঘুমাচ্ছিল। নিকটেই একটি ইঁদুর খেলছিল। ইঁদুরটি সিংহের গায়ের উপর উঠল। এতে সিংহের ঘুম ভেঙে গেল। তার ভারী রাগ হলো। সে ইঁদুরটিকে ধরে ফেলল।

38. Most people do not get enough nutrition from what they eat. Many children become blind because they do not get enough nutrition. Diarrhoea is a very common disease. This is because many people do not get safe water to drink or they eat dirty food. Such people usually suffer from diarrhoea.

অনুবাদ : অধিকাংশ মানুষই তাদের আহার্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি পায় না। যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টি পায় না বলে অনেক ছেলেমেয়ে অন্ধ হয়ে যায়। উদরাময়

একটি অতি সাধারণ রোগ। কারণ, বহু লোকই নিরাপদ পান উপযোগী পানি পায় না, কিংবা তারা নোংরা খাবার খেয়ে থাকে। এরাই সাধারণত উদরাময়ের কষ্ট ভোগ করে।

39. Education is the backbone of a nation. No prosperity is possible without education. Ignorance is like darkness. So the light of education is necessary for society. Everybody will have to appreciate this truth. Students both boys and girls must be conscious of their responsibility. Otherwise the nation will not be able to see the light of hope.

অনুবাদ : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। অজ্ঞতা অন্ধকারের মতো। তাই সমাজের জন্য শিক্ষার আলো প্রয়োজন। প্রত্যেককে এ সত্য অনুধাবন করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রী উভয়কেই তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। নতুবা জাতি আশার আলো দেখতে পাবে না।

40. In ancient times, men were very helpless in life. There was not much difference between them and the beasts. They were constantly in fear on account of the wild animals. They did not know how to build houses and make their dresses. They passed nights in trees and in caves.

অনুবাদ : প্রাচীনকালে মানুষ বড় অসহায় ছিল। তখন পশু এবং মানুষের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। বন্য জীবজন্তুর ভয়ে তারা সব সময় ভীত থাকত। তারা ঘরবাড়ি এবং তাদের পোশাকপরিচ্ছদ তৈরি করতে জানত না। তারা গাছপালা এবং গুহার মধ্যে রাত কাটাত।

41. To tell a lie is a sin. Never tell a lie. Nobody believes a liar. Everybody hates him. He cannot prosper in life. Even Allah becomes displeased with him. Are you not aware of it? Be determined now that you will never tell a lie. May Allah help you.

অনুবাদ : মিথ্যা কথা বলা পাপ। কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকেই তাকে ঘৃণা করে। সে জীবনে উন্নতি করতে পারে না। এমন কি আল্লাহ্ তায়ালাও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এ বিষয়ে তুমি কি জ্ঞাত নও? এখনই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও যে, কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

42. A truly active man always finds time for everything. He is never in a hurry and never behind hand. Such a man never spends a single moment for nothing. He never leaves a letter unanswered. He does not set his hand to many things at a time but when he once undertake to do a thing he does not rest till it is well finished.

অনুবাদ : একজন সত্যিকারের কর্মঠ ব্যক্তি সবকিছু করার সময় পান। তিনি কখনও ব্যস্ত হয়ে পড়েন না, আবার হাত গুটিয়েও থাকেন না। এমন লোক অনর্থক মুহূর্তের জন্যও কালক্ষেপণ করেন না। তিনি কোনো কাজ ফেলে রাখেন না। তিনি একই সাথে অনেক কাজ হাতে নেন না; কিন্তু কোনো কাজ হাতে নিলে সুসম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেন না।

43. A man's sight is the greatest treasure. There is no greater misfortune in life than blindness. A blind person cannot see the beauties of

nature. He cannot discover the treasure of human thought lying in books. He cannot write to express his thought.

অনুবাদ : একজন মানুষের দৃষ্টিশক্তি তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। অন্ধত্বের চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য জীবনে আর কিছু নেই। একজন অন্ধ লোক প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখতে পায় না। গ্রন্থের মধ্যে নিহিত মানবচিন্তার সম্পদ সে উদঘাটন করতে পারে না। সে তার মনের ভাব লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে না।

44. A patriot always loves his country. The patriots love their country more than their lives. They are always ready to die for the welfare of the country. Everybody honours them. We always keep them on our mind. [ফা. প. ২০১৬, '১৯]

অনুবাদ : একজন দেশপ্রেমিক সর্বদা তার দেশকে ভালোবাসে। দেশপ্রেমিকগণ তাদের দেশকে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন। দেশের কল্যাণের জন্য জীবন দিতেও তারা সর্বদা প্রস্তুত। প্রত্যেকেই তাদের সম্মান করে। আমরা সর্বদাই তাদেরকে আমাদের অন্তরে ধারণ করি।

45. We all are peace loving people. We must maintain peace among us. We have many duties and responsibilities to our society. We all are dependent on each other. We all should keep our world peaceful. [ফা. প. ২০১৬]

অনুবাদ : আমরা সবাই শান্তিপ্রিয় লোক। আমাদের অবশ্যই নিজেদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখা উচিত। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমরা সবাই পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত এই বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ রাখা।

46. A good teacher is one of the most important people in any country. Bangladesh needs good teachers. A good teacher makes lessons interesting. He keeps pupils and students awake. He also makes them confident and proves them clever. Everybody has something valuable in him. A good teacher discovers the treasure, hidden inside each student.

অনুবাদ : একজন ভালো শিক্ষক যে-কোনো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের একজন। বাংলাদেশে ভালো শিক্ষকের প্রয়োজন। একজন ভালো শিক্ষক পাঠ্যবিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের সজাগ রাখেন। তিনি তাদেরকে আত্মবিশ্বাসী এবং চালাক-চতুর করে তোলেন। প্রত্যেকের মাঝেই মূল্যবান কিছু থাকে। একজন ভালো শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের মাঝে লুকিয়ে থাকা সম্পদকে উদঘাটন করেন।

47. An ant lived on the bank of a tank. By chance she fall into water and was about to die. A pigeon sat in a tree. He dropped a leaf close to the ant. She got onto the leaf and came to the bank.

অনুবাদ : একটি জলাধারের তীরে একটি পিঁপড়ে বাস করতো। হঠাৎ সে পানিতে পড়ে গেল এবং প্রায় মারা যাচ্ছিল। গাছের উপর একটি কবুতর বসা ছিল। সে পিঁপড়েটির কাছে একটি পাতা ফেলল। সে (পিঁপড়েটি) পাতার উপর উঠল এবং তীরে ফিরে এলো।

48. A student may be very bad at subject like history, geography and even English. But he may be very clever with his hands; he may be able to make excellent models of aeroplane or of trains. If so, he might become a useful teacher at wood work, rather than an unhappy clerk in an office.

অনুবাদ : একজন ছাত্র ইতিহাস, ভূগোল এমনকি ইংরেজির মতো বিষয়ে খুব দুর্বল হতে পারে। কিন্তু সে বিভিন্ন শৈল্পিক কাজে দক্ষ হতে পারে; সে উড়োজাহাজ কিংবা ট্রেনের চমৎকার নমুনা তৈরিতে দক্ষ হতে পারে। যদি এমন হয়, তবে কোনো অফিসের অসুখী কেরানি হওয়ার চেয়ে সে কাঠের কাজের ভালো একজন ওস্তাদ হতে পারে।

49. Bangladesh is the land of our birth. The blue sky and the fresh air of this land are very dear to us. It is our duty to build up our dear Bangladesh. It is our sacred duty. If we do our respective duties, only then our country will make progress.

অনুবাদ : বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। এ দেশের নীল আকাশ আর নির্মল বাতাস আমাদের অতি প্রিয়। প্রিয় বাংলাদেশকে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি, তবেই আমাদের দেশ উন্নত হবে।

50. Bangladesh has its own National Flag. It stands for our sovereignty and is the symbol of our national pride and prestige. It is the symbol of our national hopes and ideals. All the Bangladeshis honour the National Flag. It is also honoured by the people of all other countries of the world as we do their National Flags. [ফা. প. ২০০৯]

অনুবাদ : বাংলাদেশের নিজস্ব পতাকা রয়েছে। এটা আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক। এটা আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আদর্শের প্রতীক। সকল বাংলাদেশী জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে। বিশ্বের অপরাপর দেশের নাগরিকবৃন্দও আমাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করে, যেমনিভাবে আমরা তাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান করি।

51. Cleanliness is a virtue. It is the habit of keeping the body and all other things free from dirts. Without a clean body one can-not have a pure mind. Cleanliness keeps health. It is also a mark of politeness. Good health keeps mind healthy.

অনুবাদ : পরিচ্ছন্নতা একটি গুণ। এটা শরীর ও অন্য সবকিছু ময়লামুক্ত রাখার একটি অভ্যাস। পরিচ্ছন্ন দেহ ছাড়া কেউ পবিত্র মন পেতে পারে না। পরিচ্ছন্নতা স্বাস্থ্য রক্ষা করে। এটা ভদ্রতারও একটি লক্ষণ। সুস্বাস্থ্য মনকে সুস্থ রাখে।

52. For your mental health, you have to control your emotions. Without controlling your emotions, you cannot enjoy good mental health. You have to have patience and respect for other people's feeling. Without having patience, you cannot work properly.

অনুবাদ : মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য তোমার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবেগের নিয়ন্ত্রণ ছাড়া তুমি ভালো মানসিক সুস্থতা উপভোগ করতে পারবে না। তোমার ধৈর্য

থাকতে হবে এবং অন্যের অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ধৈর্য ছাড় তুমি যথাযথভাবে কাজ করতে পারবে না।

53. Allah did not create us to eat, drink and be merry only. But to ear our bread by the sweat of our brow. Nobody becomes a slave b working. So, the question of slavery should not arise at all whe students work according to the direction of their teachers.

অনুবাদ : আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়া, পান করা এবং আনন্দ-উল্লাস করার জন্যই সৃ করেননি বরং কপালের ঘাম ঝরিয়ে জীবিকা উপার্জনের জন্য আমাদের সৃষ্টি করেছেন কাজ করে কেউ কখনো ক্রীতদাস হয় না। সুতরাং ছাত্ররা যদি শিক্ষকের নির্দেশমতে কাজ করে তাহলে তাদের ক্রীতদাস হওয়ার প্রশ্ন তোলা আদৌ উচিত নয়।

54. He who loves his country is a patriot. The patriots love their countr more dearly than their lives. They are ready to lay down their live for the welfare of their country. Everybody honours them. They live even after their death. [ফা. প. ২০১২

অনুবাদ : দেশপ্রেমিক তিনিই যিনি তার দেশকে ভালোবাসেন। দেশপ্রেমিকের দেশকে তাদের জীবনের চাইতে অধিক ভালোবাসেন। তারা দেশের মঙ্গলের জন তাদের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সবাই তাদেরকে সম্মান করে। এমনকি মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকেন।

55. He closed the magazine and put it away. He looked at his watch with a little impatience. It was about six o'clock. There was a bearded man sitting next to him. He was looking at his watch frequently.

অনুবাদ : সাময়িকীটি বন্ধ করেই তিনি ছুঁড়ে ফেললেন। কিছুটা উৎকণ্ঠার সাথে তিনি ঘড়িটার দিকে তাকালেন। তখন প্রায় ছ'টা বাজে। তার পাশেই একজন দাড়িওয়াল লোক বসেছিলেন। তিনি তার ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন।

56. Honesty is a noble virtue. It is the secret of success in every sphere of life. The value of honesty is very great. It wins love, respect and fearlessness. An honest man passes his days in respect o happiness. Honesty is the best policy.

অনুবাদ : সততা একটি মহৎগুণ। এটা হলো জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাফল্যের গোপন রহস্য। সততার মূল্য অনেক বেশি। এর দ্বারা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভীকতা জয় করা যায়। একজন সৎ ব্যক্তি সুখে তার দিন অতিবাহিত করে। সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

57. Health is wealth. A good health is a guarantee for happiness. A healthy poor man is more happy than a sick moneyed man. A healthy man is an asset to his family. On the other hand a sick man is a liability to all.

অনুবাদ : স্বাস্থ্যই সম্পদ। ভালো স্বাস্থ্য সুখের নিশ্চয়তা দেয়। একজন স্বাস্থ্যবান দরিদ্র মানুষ রুগ্ণ ধনী ব্যক্তির চেয়ে বেশি সুখী। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট একটি সম্পদ। পক্ষান্তরে একজন রুগ্ণ ব্যক্তি সবার নিকট দায়স্বরূপ।

58. I remember the day when Kabuliwalah and my Mini first met. When she had gone, Rahmat left a deep sigh and sat down on the floor. The

idea had suddenly came to him that his daughter too must have grown in this long time.

অনুবাদ : কাবুলিওয়ালা এবং মিনির প্রথম সাক্ষাতের দিনটির কথা আমার মনে পড়ে যায়। যখন সে চলে গেল, রহমত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মেঝেতে বসে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হলো, তার মেয়েও এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক বড় হয়েছে।

59. It is very difficult to be a great. Some qualities are required to become a great. Honesty and courage are two of them. People of former times possessed these qualities. Now these qualities are very rare.

অনুবাদ : মহৎ হওয়া খুবই কঠিন। মহৎ হতে হলে কিছু ভালো গুণ অর্জন করতে হয়। সততা আর সাহসিকতা এদের মধ্যে দুটি। অতীতে মানুষ এসব গুণাবলির অধিকারী ছিল। এখন এসব গুণাবলি খুবই বিরল।

60. It is night and everybody is asleep. I am sitting up late before the window. The garden is full of scent. The air is warm. The whole world seems to me still.

অনুবাদ : এখন রাত এবং সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আমি জানালার ধারে জেগে বসে আছি। বাগান সুগন্ধিময়। বাতাস উষ্ণ। সারাবিশ্বকে আমার মনে হলো স্থির ছবির মতো।

61. It is impossible to describe the beauty of the TajMahal in words. It has been called a 'dream in marble' and a 'tear drop on the cheeks' of time but the fairest phrases fail to do justice to the surpassing creation of art. The TajMahal is best seen by moonlight when the dazzling white of the marble is mellowed into a dreamy softness. The most charming view, perhaps, is obtained from the palace on the opposite bank of the river.

অনুবাদ : তাজমহলের সৌন্দর্য ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। এটাকে বলা হয়ে থাকে 'মার্বেল পাথরের মধ্যে স্বপ্ন' এবং সময়ের 'কপোলে এক ফোটা অশ্রু'; কিন্তু এ চমৎকার শব্দগুচ্ছও শিল্পকলার এ অনন্য সৃষ্টির প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। জ্যোৎস্না রাতে যখন মার্বেল পাথরের চোখ-ধাঁধানো শুভ্রতা স্বপ্নময় কোমলতায় আবিষ্ট হয়, তখন তাজমহল সর্বোত্তম রূপে অবলোকন করা যায়। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি চমৎকার দৃশ্য দেখা যায় নদীর অপর তীরের প্রাসাদ থেকে।

62. Kamal ordered that all superstitions about clothing and mode of life should be given up. He made the women give up their veils, walk about and breathe freely in the same way as men. He made education free and compulsory for all children. He brought sweeping improvement in the country. He worked with the energy of a giant and wisdom of a sage.

অনুবাদ : কামাল নির্দেশ দিলেন যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত সব কুসংস্কার পরিহার করতে হবে। তিনি মহিলাদের ঘোমটা পরিহার করে পুরুষদের মতো স্বাধীনভাবে চলার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের পথ করে দিলেন। তিনি শিক্ষাকে সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করে দিলেন। দেশে তিনি উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দিলেন। অসুরের শক্তি ও জ্ঞানীর প্রজ্ঞার সাহায্যে তিনি কাজ করতেন।

63. Modern science is teaching us that no one can live alone. Co-operation between individual and families is essential to the life of man. Co-operation among nations is essential for continuing life on earth.

অনুবাদ : আধুনিক বিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে মানুষ একা বাঁচতে পারে না। মানবজীবনে ব্যক্তিগত ও পরিবারের পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য। পার্থিব জীবন চলিষ্ণু রাখতে হলে জাতিসমূহের মধ্যেও সহযোগিতা অপরিহার্য।

64. Many difficulties may stand on the way of performing work. But a man of perseverance is never discouraged by it. He goes on trying until he attains his success. No great work can be accomplished without repeated attempts. Perseverance teaches us how to fight these difficulties.

অনুবাদ : কাজ করার সময় অনেক ধরনের প্রতিকূলতা আসতে পারে। কিন্তু একজন অধ্যবসায়ী এতে নিরুৎসাহিত হন না। সফল না হওয়া পর্যন্ত তিনি চেষ্টা চালিয়ে যান। কোনো মহৎ কাজই বারবার চেষ্টা ছাড়া হয় না। অধ্যবসায় আমাদের এসব প্রতিকূলতা কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে তা শিক্ষা দেয়।

65. Many people put off for tomorrow the work they can do today. Students also very often put off their class lessons for tomorrow. Nothing is more injurious than this habit. Men do not know what will happen tomorrow. A lot of troubles and dangers may come and upset everything.

অনুবাদ : অনেকেই যে কাজটি আজ করতে পারে, তা আগামীদিনের জন্য রেখে দেয়। ছাত্ররাও অনেক সময় তাদের ক্লাসের পড়া আগামীদিনের জন্য ফেলে রাখে। এ অভ্যাসের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছুই নেই। মানুষ জানে না আগামীকাল কী ঘটবে। অনেক কষ্ট ও বিপদ এসে সব এলোমেলো করে দিতে পারে।

66. Man cannot live alone. So, he likes to keep company. He cannot do without the help of other even for a day. For this reason men have been living together for many days. This is called social life. None can act according to his sweet will in the society.

অনুবাদ : মানুষ একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। তাই সে সঙ্গী পছন্দ করে। অন্যের সাহায্য ছাড়া সে একদিনও চলতে পারে না। এ কারণেই মানুষ বহুদিন থেকে একত্রে বসবাস করে আসছে। একেই বলে সমাজজীবন। সমাজে কেউ তার খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারে না।

67. Milk is an ideal food. It is called an ideal food beacuse it contains all the vitamins in it . We get milk from cow. We have to rear cows if we want to get pure milk. Cow milk stands incomparable in point of preservation of our health.

অনুবাদ : দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। এতে সকল খাদ্যপ্রাণ থাকে বলে একে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। গাভী থেকে আমরা দুধ পাই। খাঁটি দুধ পেতে হলে আমাদেরকে গাভী পালন করতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গাভীর দুধ অতুলনীয়।

68. No man can live alone. When we are children the family protects us. When we grow up, we need the help of all the people around us. If

we try to live alone, our lives are no other than those of animals. Our fathers and mothers and teachers, and our government– all of them teaches us to perform our duty.

অনুবাদ : কোনো মানুষ একাকী জীবনযাপন করতে পারে না। আমরা যখন শিশু তখন পরিবার আমাদেরকে রক্ষা করে। আমরা যখন বেড়ে উঠি, তখন চারপাশের লোকজনের সাহায্য আমাদের দরকার হয়। একাকী বাঁচার চেষ্টা করলে আমাদের জীবন পশুর জীবনের চেয়ে আলাদা কিছু হবে না। আমাদের পিতা-মাতা, শিক্ষকমণ্ডলী এবং আমাদের সরকার– এরা সবাই আমাদেরকে আমাদের কর্তব্য পালনের জন্য শিক্ষা দেয়।

69. "Hey people! listen attentively to what I say. I feel that it will no longer be possible for me to participate in the Hajj after this. Listen, all the evil customs of the age of ignorance is abolished from today. One should not be punished for the offence of another."

অনুবাদ : "হে জনগণ! আমি যা বলি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমার মনে হচ্ছে এরপর আমার পক্ষে আর কোনো হজে অংশগ্রহণ সম্ভব হবে না। অজ্ঞতার যুগের সকল প্রথা আজ হতে দূরীভূত হলো। একের দোষে অন্য একজন শাস্তি ভোগ করবে না।"

70. Once a crow was very thirsty. After a while he found a jar. But when he flew to it, he found that there was little water at the bottom of the jar. So, he could not have a drink. Then fetching a few pebbles he dropped them one after another into the jar.

অনুবাদ : একদিন একটি কাক খুব তৃষ্ণার্ত ছিল। কিছুক্ষণ পর সে একটা পাত্র দেখতে পেল। কিন্তু সে পাত্রটির কাছে গিয়ে দেখল, পাত্রের তলায় সামান্য একটু পানি রয়েছে। তাই সে পান করতে পারল না। তারপর সে কিছু নুড়ি এনে পাত্রের মধ্যে একটি একটি করে ফেলল।

71. One day a lad went to a famous teacher to acquire knowledge from him. The learned man, wishing to find out what sort of ability he had, asked him where God was. The lad replied, 'I will answer you, if you first tell me where He is not.' The teacher was satisfied and according to the boy's wish made him perfect in his studies.

অনুবাদ : একদিন এক বালক একজন বিখ্যাত শিক্ষকের নিকট জ্ঞানার্জনের উদ্দেশে গমন করল। বিদ্বান ব্যক্তিটি বালকটির মাঝে কোন ধরনের যোগ্যতা রয়েছে তা যাচাইয়ের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করলেন, বিধাতা কোথায় আছেন। বালকটি উত্তর দিল, "আমি আপনাকে তখনই এই প্রশ্নের উত্তর দিব, যখন আপনি বলবেন কোথায় বিধাতা নেই।" শিক্ষক সন্তুষ্ট হলেন এবং বালকের ইচ্ছে অনুযায়ী শিক্ষায় পারদর্শী করে তুললেন।

72. Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our human environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When their relationship are disturbed, life becomes difficult and impossible. By keeping the environment safe, man can ensure a healthier and happier life. [ফা. প. ২০০৮]

অনুবাদ : আমাদের সমগ্র পরিবেশ আমাদের জীবন এবং জীবনধারণের পদ্ধতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। মানব পরিবেশের প্রধান উপাদানগুলো হলো– মানুষ,

প্রাণী, গাছপালা, মাটি, বাতাস এবং পানি। এসব উপাদানের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন এদের মধ্যকার সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়, জীবন তখন কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিবেশ নিরাপদ রাখার মাধ্যমে মানুষ স্বাস্থ্যকর ও সুখী জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

73. Rivers come to our use in many ways. We bathe in the water of the river. We drink it and use it in many ways for agriculture with the help of irrigation. Rivers help us in many ways in respect of trade and commerce. The things which we produce in access are exported to foreign countries through river ways.

অনুবাদ : নদী বিভিন্নভাবে আমাদের উপকারে আসে। আমরা নদীর পানিতে গোসল করি। আমরা নদীর পানি পান করি এবং সেচের সাহায্যে নদীর পানিকে বিভিন্নভাবে কৃষিকাজে ব্যবহার করি। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নদী আমাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে থাকে। আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপাদিত জিনিস নদীপথে বিদেশে রপ্তানি করে থাকি।

74. Religion is a necessity. Man is by nature religious. It is a great necessity for his spiritual existence. Without religion a man can be turned a beast. An irreligious man is not better than a inferior animal.

অনুবাদ : ধর্ম অত্যাবশ্যকীয়। মানুষ সহজাত কারণেই ধার্মিক। এটা তার আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের জন্য খুবই প্রয়োজন। ধর্ম ছাড়া মানুষ পশুতে পরিণত হতে পারে। একজন অধার্মিক ব্যক্তি একটি নিকৃষ্ট জন্তুর চেয়ে উত্তম নয়।

75. The man who smokes is in a great danger. For, smoking can cause various dangerous diseases like cancer and heart disease. This is not a mere assumption; rather, it is the result of research of a long time. So strong determination is enough for giving up smoking.[ফা. প. '১১]

অনুবাদ : ধূমপায়ী ব্যক্তি অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। কারণ, ধূমপানের ফলে ক্যান্সার ও হৃদরোগের মতো মারাত্মক রোগ হতে পারে। এটা কল্পনাপ্রসূত কোনো বিষয় নয়– বরং এটা দীর্ঘদিনের গবেষণার ফল। সুতরাং ধূমপান ত্যাগ করার জন্য সংকল্পের দৃঢ়তাই যথেষ্ট।

76. Smoking is a dangerous habit. People addicted to smoking may become victims of cancer. And that cancer is a fatal disease needs not telling. So, vigorous campaign against smoking is a crying need.

অনুবাদ : ধূমপান একটি বিপজ্জনক অভ্যাস। ধূমপানে আসক্ত ব্যক্তিরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে। আর ক্যান্সার যে একটা মারাত্মক ব্যাধি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই ধূমপানের বিরুদ্ধে জোর অভিযান চালানো বিশেষ জরুরি।

77. Socrates never believed that all men are equal. If all were treated as equal there would be one flock and no shepherd. This opinion of Socrates gave offence to many people. Socrates was regular in prayer and had a firm belief in God. He held that only God knows what is good for us. So, our prayer should simply be–"Give me what is good."

অনুবাদ : সক্রেটিস কখনোই বিশ্বাস করতেন না যে সব মানুষ সমান। যদি সবাইকে সমান ভাবা হতো, তাহলে পৃথিবীতে একটি মাত্র দল থাকত যার কোনো দলনায়ক

থাকত না। সক্রেটিসের এ মতামত অনেক মানুষ কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছে। সক্রেটিস নিয়মিত প্রার্থনা করতেন এবং ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। তার ধারণা ছিল যে, কোনটি আমাদের জন্য মঙ্গলজনক, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাই আমাদের সাধারণ প্রার্থনা এরকম হওয়া উচিত– "আমাকে তাই দাও যা মঙ্গলজনক।"

78. Smoking is very harmful. It is expensive too. It pollutes the environment. Those who smoke cannot live long. So everyone should give up smoking.

অনুবাদ : ধূমপান অত্যন্ত ক্ষতিকর। এটি ব্যয়বহুলও। এটি পরিবেশকে দূষিত করে। ধূমপায়ীরা বেশিদিন বাঁচতে পারে না। তাই প্রত্যেকের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত।

79. Self-reliance means depending on one's ownself. It is a great virtue. Self help is the best help. Allah helps them who help themselves. So, everybody must rely on his own abilities to be self-reliant. A self-reliant man has confidence in his own abilities. He takes heart in the face of difficults.

অনুবাদ : আত্মনির্ভরশীলতা বলতে কারোর নিজের ওপর নির্ভরশীলতা বোঝায়। এটা একটি মহৎ গুণ। স্বাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেন যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। সুতরাং প্রত্যেককেই নিজের সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তির নিজের সামর্থ্যের ওপর বিশ্বাস থাকে। সে সাহসিকতার সাথে প্রতিকূলতাসমূহ মোকাবেলা করে।

80. Truthfulness is the greatest of all virtues in a man's life. It means the quality of speaking the truth. The true happiness and prosperity of a man entirely depends on it. It enables one's character and gives one a high position in the society. Truthfulness may lead the whole world to peace and happiness. [ফা. প. ২০০৭]

অনুবাদ : সত্যবাদিতা একজন মানুষের জীবনের সর্বাপেক্ষা মহৎ গুণ। এটা সত্য বলার গুণকে বোঝায়। একজন মানুষের সত্যিকারের সুখ ও উন্নতি এর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এটি ব্যক্তি চরিত্রের দৃঢ়তা আনে এবং সমাজের উঁচুস্থানে তাকে পৌছে দেয়। সত্যবাদিতা পুরো বিশ্বকে সুখ-শান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

81. The greatest results in life are usually attained by simple means and the exercise of ordinary qualities. The common life of everyday with its cares, necessities and duties afford ample opportunity for acquiring experience of the best kind.

অনুবাদ : জীবনের সবচেয়ে বড় ফলাফলগুলো সাধারণত সহজ উপায়ে এবং সাধারণ গুণাবলির চর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। পরিচর্যা, আবশ্যকতা ও কর্তব্যপূর্ণ প্রতিদিনকার সাধারণ জীবন শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রচুর সুযোগ প্রদান করে।

82. A patriot always loves his country. The patriots love their country more than their lives. They are prepare to die for the welfare of their country. Everybody honours them. We always keep them on our mind.[ফা. প. ২০১

অনুবাদ : একজন দেশপ্রেমিক তার দেশকে সবসময়ই ভালোবাসে। দেশপ্রেমিকর তাদের দেশকে তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। তারা দেশের মঙ্গলের

জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত। সকলেই তাদের শ্রদ্ধা করে। আমরা সবসময়ই তাদের কথা স্মরণ করি।

83. The great advantage of early rising is the good start it gives in our day's work. The early riser can do huge quantity of hard work before other men have got out of bed. In early morning the mind is fresh and there are fewer disturbances. So, the work done at that time is generally will be done properly. By begining so early, he knows that he has plenty of time to do all the work throughly. He is not, therefore, tempted to hurry over any part of it.

অনুবাদ : ভোরে ঘুম থেকে ওঠার বড় সুবিধা হলো– আমাদের দিনের কাজে এটা শুভ সূচনা উপহার দেয়। অন্যেরা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই ভোরে ঘুম থেকে জাগরণকারী অনেক কঠিন কাজ সেরে ফেলে। প্রাতঃকালে মন সতেজ থাকে এবং গোলমাল কম থাকে। কাজেই এ সময় কোনো কাজ করলে সাধারণত তা যথার্থভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে খুব ভোরে কাজ শুরু করে, সে জানে, তার কাজ পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার মতো প্রচুর সময় তার আছে। তাই কোনো কাজে তাকে তাড়াহুড়া করতে হয় না।

84. Two friends took a journey through a forest. On the way they saw a bear approaching them. One did not care for his friend's safety. He quickly climbed up a tree and concealed himself among the branches.

অনুবাদ : দুই বন্ধু বনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে তারা তাদের দিকে একটি ভল্লুককে অগ্রসর হতে দেখল। এক বন্ধু অপর বন্ধুর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করল না। সে তাড়াতাড়ি একটি গাছে ওঠে পড়ল এবং ডালপালার মধ্যে নিজেকে আড়াল করল।

85. Once there was a bald-headed man. One day he sat under a tree after day's work. A fly came and sat on his bald-head and teased him. The man gave a blow to the fly, but the blow only struck his head. Again the fly vexed him. But this time the man acted wisely, and said to himself. 'You will injure yourself if you quarrel with small enemies.'

অনুবাদ : একদা একজন টেকো লোক ছিল। দিনের কাজ শেষে একদিন সে একটি গাছের নিচে বসল। একটি মাছি এসে তার টাক মাথায় বসল এবং তাকে বিরক্ত করতে লাগল। লোকটি মাছিটিকে থাপ্পর মারল; কিন্তু সে থাপ্পর শুধু তার নিজের মাথায় লাগল। পুনরায় মাছিটি তাকে বিরক্ত করল। কিন্তু এবার সে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করল এবং নিজেকে বলল, "যদি তুমি ক্ষুদ্র শত্রুর সাথে ঝগড়া কর তাহলে তোমারই ক্ষতি হবে।"

86. The necessity of learning English cannot be over-stated. English is an international language. It is essential in our day-to-day activities. We must know English in order to join for any job. There is hardly any situation where the employees can do without English.

অনুবাদ : ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলে শেষ করা যায় না। ইংরেজি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। আমাদের দৈনন্দিন কাজগুলোতে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যে-কোনো কাজে যোগদানের পূর্বে আমাদেরকে অবশ্যই ইংরেজি জানতে হবে। এমন অবস্থা খুব কমই রয়েছে যেখানে কর্মচারীরা ইংরেজি ছাড়া চলতে পারে।

87. The newspaper is a very useful thing. At present we find many newspapers in Bangladesh. Newspaper helps the progress of a nation. People are eager to know what is going on in the world. They can know this and that by reading the newspaper. It gives us all sorts of news of our own land as well as foreign lands.

অনুবাদ : সংবাদপত্র খুবই উপকারী। বর্তমানে বাংলাদেশে আমরা অনেক ধরনের সংবাদপত্র পাই। সংবাদপত্র জাতির উন্নয়নে সহায়তা করে। মানুষ পৃথিবীর চলমান খবরগুলো সম্পর্কে জানতে খুবই আগ্রহী। সংবাদপত্র পাঠ করে তারা এটা-সেটা জানতে পারে। এটি আমাদের দেশের এবং বিদেশের সবধরনের খবর দিয়ে থাকে।

88. The life of a student is a time of preparation for the struggle of life. To make him well balanced for struggle education is necessary. Student of today will lead the nation tomorrow. But if they do not complete their education would they be able to lead the country to peace and prosperity?

অনুবাদ : ছাত্রজীবন জীবনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতির সময়। জীবনযুদ্ধের জন্য তাকে যথাযোগ্য করতে শিক্ষা অপরিহার্য। আজকের ছাত্ররাই আগামী দিন জাতির নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু তারা যদি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা না নেয় তাহলে তারা কি দেশকে শান্তি ও সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে? [ফা. প. ২০১৭]

89. Bangladesh declared independence on 26 March, 1971. It became free from Pakistan on 16 December 1971 after a great liberation war. It is a democratic country with many kinds of people. Bangladesh is also a beautiful country with many resources. It has rich deposit of oil, gas and coal. It can utilize these resources and become prosperous.

অনুবাদ : ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। একটি মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এটি পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়। অনেক ধরনের মানুষ নিয়ে এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। অনেক সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ একটি সুন্দর দেশও। এদেশে রয়েছে তেল, গ্যাস ও কয়লার সমৃদ্ধ ভান্ডার। এ সকল সম্পদ ব্যবহার করে এটি সমৃদ্ধিশালী হতে পারে। [ফা. প. ২০১৫]

90. It was the 16th December, 1971. On that day the Pakistani soldiers surrendered their arms. It will go down in history as a memorable day. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

অনুবাদ : দিনটি ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। সেদিন পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের অস্ত্র-সমর্পণ করেছিল। ইতিহাসে এ দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্য যিনি সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের দাবিদার তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। [ফা. প. ২০১৭]

91. The main thing about habits is that they should be acquired quite early in life. The mind is then like clay in a potter. You can give any shape you like. There is also the need of a good atmosphere at home

for the child forming the right sorts of habit. Education is also a factor in habit formation.

অনুবাদ : অভ্যাস সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এগুলো জীবনের প্রথমদিকে অর্জন করতে হয়। মন তখন কুমারের হাতের মাটির মতো থাকে। তুমি তাকে যেমন ইচ্ছা তেমন রূপ দিতে পার। বাড়িতে শিশুদের যথার্থ অভ্যাস গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ থাকা দরকার। শিক্ষাও অভ্যাস গঠনের একটা নিয়ামক।

92. There is a proverb, 'Cut your coat according to your cloth.' We should be satisfied with what we earn in an honest way. In a developing country like ours, luxuries of all kinds should be avoided. The rich should not forget the pitiable condition of the common people. Some people earn money in the most unfair way.

অনুবাদ : একটি প্রবাদ আছে, 'আয় বুঝে ব্যয় কর।' আমরা যা সৎ উপায়ে আয় করি তা নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে সব ধরনের বিলাসিতা এড়িয়ে চলা উচিত। সাধারণ মানুষের শোচনীয় অবস্থা ধনীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কিছু লোক অত্যন্ত অসাধু উপায়ে অর্থ উপার্জন করে।

93. The wind and the sun had a quarrel as to who was the stronger. Just then a man came walking along the road. The sun said, "Do you see the man? Let us see which of us can make him take off his coat. He who succeed is the stronger."

অনুবাদ : বাতাস এবং সূর্যের মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী তা নিয়ে এদের মধ্যে একবার ঝগড়া লেগেছিল। ঠিক তখনই একজন লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসল। সূর্য বলল, "তুমি কি লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ? আস দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে তার গায়ের কোট খোলাতে পারে? যে এটা করতে পারবে সে-ই বেশি শক্তিশালী।"

94. We must make the best use of our animals. Bangladesh is an agricultural country. There is almost no machinery cultivation. All the works of cultivation depend on animal power. That is why, working animals are badly needed.

অনুবাদ : আমাদেরকে অবশ্যই পশুদের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে হবে। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। দেশে প্রায় কোনো যান্ত্রিক চাষাবাদ নেই। চাষাবাদের সকল কাজ পশু-শক্তির ওপর নির্ভরশীল। এজন্য কর্মঠ পশু জরুরি প্রয়োজন।

95. Wealth perishes very soon while knowledge lasts and does not perish. A man without learning is like a beast. Knowlegde in the beast is like sun in the sky. Wealth may be stolen but learning cannot be stolen.

অনুবাদ : জ্ঞান টিকে থাকে এবং ধ্বংস হয় না কিন্তু সম্পদ শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যায়। বিদ্যাহীন ব্যক্তি পশুর মতো। পশুদের মধ্যে জ্ঞান হচ্ছে, আকাশে থাকা সূর্যের মতো। সম্পদ চুরি হয়ে যেতে পারে কিন্তু বিদ্যা চুরি হতে পারে না।

96. We all know that eye of Allah always upon us. But this knowledge does no good to us if we do not keep it in mind. Keeping it in mind, we cannot do any wrong. It always holds us back from sins. Thus it does much good to us.

অনুবাদ : আমরা সবাই জানি যে, আল্লাহর দৃষ্টি সর্বদা আমাদের ওপরে রয়েছে। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের কোনো উপকারে আসে না যদি তা আমরা মনের মধ্যে ধরে

না রাখি। মনের মধ্যে একে ধরে রাখলে আমরা কোনো ভুল করতে পারব না। এটা আমাদের সব সময় পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। এভাবে এটা আমাদের উপকারে আসে।

97. We are the citizen of an independent country. Independence is the birth-right of a man. But no nation can achieve independence without efforts. Again, the people of a country must be determined to preserve that independence. It is the sacred duty of every citizen to preserve the independence of his motherland.

অনুবাদ : আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক। স্বাধীনতা একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু চেষ্টা ব্যতীত কোনো জাতিই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। আবার একটি দেশের জনগণকে এ স্বাধীনতা ধরে রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রতিটি নাগরিকেরই পবিত্র কর্তব্য।

98. Youth is the best time of life. There is freshness and vigour in mind and body in youth. This is the time when it is most necessary for us to remember the truth of the maxim– 'As you sow so you reap'.

অনুবাদ : যৌবন হচ্ছে জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। যৌবনে মনে ও দেহে থাকে সজীবতা ও কর্মশক্তি। "যেমন কর্ম তেমন ফল"– এ বাক্যটির সত্যতা স্মরণ রাখাই হচ্ছে এ সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়।

99. Students should practice the rules of health. They should get up early in the morning and then go out for a morning walk. They are to be industrious. Industry is the root of all progress. A man who is idle can never make any progress in life.

অনুবাদ : ছাত্রদের উচিত স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা। তাদের প্রত্যুষে শয্যা হতে ওঠা এবং তারপর প্রাতঃভ্রমণ করা উচিত। তাদের পরিশ্রমী হতে হবে। পরিশ্রম সকল উন্নতির মূল। অলস ব্যক্তি জীবনে কোনো উন্নতি লাভ করতে পারে না।

100. We live in the society. So we must maintain peace among its members. We have many duties and responsibilities to the society. We are dependent on each other. To build up a peaceful society is our mission. [ফা. প. ২০১৩]

অনুবাদ : আমরা সমাজে বাস করি। তাই এর সদস্যদের মাঝে আমাদের শান্তি বজায় রাখতে হবে। সমাজের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমরা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের উদ্দেশ্য একটা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠন করা।

101. It is dawn. The sun has arisen. The gentle breeze is blowing. The birds are flying hither and thither. The ducks are swimming in the pond. Some travellers are going along the road. They will have to go a long distance. Suddenly the whole sky was covered with clouds. It will rain ghastly. The passers-by began to walk quickly.

অনুবাদ : ভোর হয়েছে। সূর্য উঠেছে। মৃদু বাতাস বইছে। পাখিরা এখানে-সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছে। হাঁসগুলো পুকুরে সাঁতার কাটছে। কিছুসংখ্যক পথিক রাস্তা দিয়ে চলছে। তাদেরকে অনেকদূর যেতে হবে। হঠাৎ সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। শীঘ্রই জোরে বৃষ্টি নামবে। পথচারীরা দ্রুতগতিতে পথ চলতে লাগল।

102. Now small family is an ideal family. Because population is the main problem of our country. Now, it is the time of competition. It is not possible to bear the expenses of five to seven members with the income of one person only. Man and woman, everybody of a family should earn according to their ability. Late marriage is now a simple matter.

অনুবাদ : বর্তমানে ছোট পরিবার একটা আদর্শ পরিবার। কারণ জনসংখ্যা আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা। এখন প্রতিযোগিতার সময়। একজনের রোজগারে পরিবারের পাঁচ-সাতজনকে প্রতিপালন করা সম্ভব নয়। পরিবারের নারীপুরুষ সকল সদস্যের সাধ্যমতো রোজগার করা উচিত। বিলম্ব বিবাহ এখন একটা সাধারণ ব্যাপার।

103. It has been drizzling for about an hour. It is now 10 a.m. by my watch. I have to go to college today. I have no umbrella with me, rickshaws are not seen on the street. So I am thinking how I shall go to college.

অনুবাদ : প্রায় একঘন্টা যাবৎ টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। আমার ঘড়িতে এখন সকাল ১০টা। আজ কলেজে যেতেই হবে। আমার কাছে ছাতা নেই, রাস্তায় রিক্‌শাও দেখছি না। কীভাবে কলেজে যাব আমি তাই ভাবছি।

104. Health is the root of all happiness. Regular exercise is necessary to maintain a good health. Moreover, balanced food and fruits should be eaten. Strong health is the key to success. An unhealthy man cannot enjoy life.

অনুবাদ : স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল। স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হলে নিয়মিত ব্যায়াম করা দরকার। তদুপরি সুষম খাদ্য ও ফলমূল খাওয়া উচিত। সুস্বাস্থ্য সাফল্যের চাবিকাঠি। স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তি জীবন উপভোগ করতে পারে না।

105. We live in the age of science. We see the influence of science in every sphere of life. Science is the constant companion of our everyday life. We have made the impossible things possible by means of science. The modern civilization is a contribution of science. We have to prevail poverty and disease with the help of science. Science is to be utilized for the greater welfare of mankind.

অনুবাদ : আমরা বিজ্ঞানের যুগে বাস করি। সর্বক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাই। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করেছি। বর্তমান সভ্যতা বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের দারিদ্র্য ও ব্যাধিকে জয় করতে হবে। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করতে হবে।

106. Tea is a popular drink. We take tea to remove our fatigue. But drinking too much of tea is harmful for health. A large quantity of tea is produced in Bangladesh. Bangladesh earns a lot of foreign exchange by exporting tea.

অনুবাদ : চা একটা জনপ্রিয় পানীয়। আমরা ক্লান্তি দূর করার জন্য চা পান করি। কিন্তু অতিরিক্ত চা পান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। এই চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে।

107. War is a curse on human civilization. In ancient times war was confined to the soldiers only. But now a days both millitary

personnel and the civilians fall victim to it. None can escape from the air-raids of the enemy planes. The prosperous cities, the corn fields, the magnificient buildings all these are totally destroyed and demolished. All people male or female, young or old are killed without any discrimination. The civilization that men built up after prolonged efforts through the ages are fade away from the surface of the earth in the twinkling of an eye.

অনুবাদ : যুদ্ধ মানব সভ্যতার জন্য একটা অভিশাপ। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামরিক ও বেসামরিক সবাইকে যুদ্ধের শিকার হতে হয়। শত্রুর বোমারু বিমানের হামলা হাত থেকে কারো অব্যাহতি নেই। সমৃদ্ধ নগরী, শস্যশ্যামল প্রান্তর, সুরম্য প্রাসাদ– এ সবই সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সবাইকেই নির্বিচারে হত্যা করা হয়। শত শত বছরের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় মানুষ যে সভ্যতার নিদর্শন গড়ে তুলেছে, নিমেষের মধ্যেই তা ধ্বংস হয়ে যায়।

108. English is an international language. There is no country in the world where English is not taught. If any one finds any taste in this language once, he cannot help learning it more. We should have a good command over this language, if we want to enrich our own language. Don't you like speaking English?

অনুবাদ : ইংরেজি একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই যেখানে ইংরেজি শেখানো হয় না। কেউ একবার আনন্দ পেলে, এই ভাষা না শিখে সে পারবে না। আমাদের নিজস্ব ভাষা সমৃদ্ধ করার জন্য ভালোভাবে ইংরেজি শেখা উচিত। তুমি কি ইংরেজি বলা পছন্দ কর না?

109. Who does not want to shine in life? Proper education is necessary for success. No one can prosper in life without education. Honesty and industry are other qualities for success. Industry is the key to success. One success begets another success. We expect all of you to be honest and industrious.

অনুবাদ : জীবনে সফল হতে কে না চায়? সফলতার জন্য ভালোভাবে লেখাপড়া করা প্রয়োজন। লেখাপড়া ছাড়া কেউ জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে না। উন্নতির জন্য আরও দরকার সততা ও পরিশ্রম। পরিশ্রম হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি। একটি সফলতা আরেকটি সফলতার দ্বার খুলে দেয়। আমরা আশা করি তোমরা সবাই সৎ ও পরিশ্রমী হবে।

110. Student life is the proper time to acquire education. Study is the main task of student life. This period is very valuable. Future life depends on student life. It is the time to make life active. To get good marks in the examination is not a great thing. Both the acquisition of knowledge and formation of character are necessary.

অনুবাদ : ছাত্রজীবন শিক্ষালাভের উপযুক্ত সময়। অধ্যয়নই ছাত্রজীবনের প্রধান কাজ। এ সময়টি অতি মূল্যবান। ভবিষ্যৎ জীবন ছাত্রজীবনের ওপর নির্ভর করে। জীবনকে কর্মক্ষম করে তোলার সময় এটাই। শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়াই বড় কথা নয়। জ্ঞানলাভ ও চরিত্র গঠন উভয়ই প্রয়োজন।

111. Many of us think that a man cannot be great if he wishes to be so. But they are great fools. Their idea of this kind is quite wrong. Proper initiative is required to materialise the wish into action. One cannot ascend the mountain if he wishes to do so only. For this he has to work hard.

অনুবাদ : আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করে যে, বড় হওয়ার ইচ্ছা থাকলেই বড় হওয়া যায় না। কিন্তু এসব লোক বড় নির্বোধ। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে হলে যথার্থ উদ্যোগের প্রয়োজন। কেউ শুধু ইচ্ছা করলেই পর্বতে আরোহণ করতে পারে না। এজন্য তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

112. As soon as the night came to an end Abdullah's mother woke up. She hurridly cooked some rice and then went to call Abdullah. It was quite dark all around ever then. Abdullah got up at his mother's call and sat on his bed. He said, "Where shall I go so early in the morning?"

অনুবাদ : রাত শেষ না হতেই আবদুল্লাহর মা শয্যাত্যাগ করলেন। তাড়াতাড়ি কিছু ভাত রেঁধে তিনি আবদুল্লাহকে ডাকতে গেলেন। তখনও চারদিকে বেশ অন্ধকার। মায়ের ডাকে আবদুল্লাহ ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসল। সে বলল, "এত সকালে কোথায় যাব?"

113. Illiteracy is a curse. About eighty percent people of Bangladesh are poor. They live in the villages. Most of them are farmers who are mainly illiterate. They have chosen agriculture as their profession leaving their education from their childhood for their livelihood. For their economic safety the elders encourage even their children to come to the field and help them instead of going to school. This illiteracy is a great obstacle to the way of development.

অনুবাদ : নিরক্ষরতা একটা অভিশাপ। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ লোক গরিব। তারা গ্রামে বাস করে। এদের অধিকাংশই কৃষক যারা প্রধানত নিরক্ষর। জীবিকার জন্যই তারা শিক্ষার পরিবর্তে কৃষিকে ছোটবেলা হতেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠরা তাদের সন্তানদেরও বিদ্যালয়ে পাঠানোর পরিবর্তে মাঠে তাদের কাজে সাহায্য করতে উৎসাহ যোগায়। এ নিরক্ষরতা উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায়।

114. We eat to preserve our health. A balanced diet is very helpful for health. We must remember that good food does not mean costly food. Food to satisfy hungry and food to maintain health does not mean the same thing. So our food should always be balanced.

অনুবাদ : আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাই। সুষম খাবার স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দামি খাবার মানেই ভালো খাবার নয়। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাওয়া এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাওয়া কখনো এক কথা নয়। তাই আমাদের খাবার সর্বদাই সুষম হওয়া উচিত।

115. One day Dukhu Miah arrived at a town. The name of the town is Ashanshol. He was completely new there. He never saw that town before. In spite of that he was not perplexed at all.

অনুবাদ : একদিন দুখু মিয়া এক শহরে গিয়ে হাজির হলো। শহরের নাম আসানসোল। সেখানে সে ছিল একেবারে নতুন। এর আগে সে কোনোদিন এ শহর দেখেনি। তাই বলে সে মোটেই ঘাবড়ালো না।

116. It is education to make the life beautiful and successfull. There is no utility of education if it does not improve our moral character. Have you turned your eyes to our society? I know, you are getting disheartened to see everything there. No one wants to pay due respect to the superiors. It is a matter of great regret.

অনুবাদ : জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করার জন্যই শিক্ষা। আমাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি না হলে বিদ্যার কোনো মহিমাই থাকে না। আমাদের সমাজের দিকে কি একবার চেয়ে দেখেছ? আমি জানি তুমি সবকিছু দেখে বড় নিরাশ হয়েছ। গুরুজনদের উপযুক্ত মর্যাদা কেউ দিতে চায় না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

117. Trees need light. They cannot live without light. Trees try best to get a little light. If you put a plant in a tub near a window, you will see the branches moving towards light from darkness. If you go to the forests you will see the trees are raising their heads quickly to get light.

অনুবাদ : গাছেরা আলো চায়। আলো না হলে এরা বাঁচতে পারে না। গাছের প্রধান চেষ্টা কি করে একটু আলো পাওয়া যায়। যদি জানালার টবে একটা গাছ রাখ, তবে দেখবে ডালগুলো অন্ধকার ছেড়ে আলোর দিকে যাচ্ছে। বনে গিয়ে দেখবে গাছগুলো তাড়াতাড়ি মাথা তুলে আলো পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে।

118. The 21st February is a red letter day in our national life. We remember this day with respect every year. The day is a public holiday. On this day the national flag remains half mast. Flowers and floral wreaths cover each and every Shahid Minar. Those who sacrificed their lives for the language are immortal. [ফা. প. ২০১২]

অনুবাদ : একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় জীবনে একটা স্মরণীয় দিন। প্রতি বছর এ দিনটি আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকে। ফুল ও ফুলের মালায় প্রতিটি শহিদ মিনার ঢেকে যায়। যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন তারা অমর হয়ে আছেন।

119. Flood is a natural calamity. The flood attacks Bangladesh every year. During flood men and other animals suffer from untold misery. Crops are also damaged heavily. After flood, diseases like dysentry and cholera break out in epidemic form. Therefore flood is a very serious problem for our country. Our government is trying to solve this problem.

অনুবাদ : বন্যা একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতি বছর বাংলাদেশ এই বন্যায় আক্রান্ত হয়। বন্যার সময় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করে। ফসলেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার পর আমাশয় ও কলেরার ন্যায় নানা প্রকার রোগ মহামারি আকারে দেখা দেয়। কাজেই বন্যা আমাদের দেশের পক্ষে একটা মারাত্মক সমস্যা। সরকার এ সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করছে।

120. We see many stars in the sky at night. In fact, they are very big, though they look very small. The sun is equal to thirteen lakh earths.

Each star in the sky is a sun. Of these stars someone is equal to the sun and someone is bigger than the sun.

অনুবাদ : রাতের আকাশে আমরা অনেক তারা দেখতে পাই। দেখতে ক্ষুদ্র হলেও সেগুলো সত্যি সত্যিই অনেক বড়। সূর্য আয়তনে ১৩ লাখ পৃথিবীর সমান। আকাশের একেকটি তারা একেকটি সূর্য। এই তারাগুলোর কোনোটি সূর্যের সমান আবার কোনোটি সূর্য অপেক্ষা বড়।

121. During the rule of Akbar there lived a poor Muslim in Persia. In those days the poor Muslims of that area came to India to become rich within a short time. This gentlemen also did the same. While coming to Delhi with his wife, a daughter was born on the way. He had no means to feed the baby and keep her alive. Finding no alternative, he left the baby on the road and went away.

অনুবাদ : আকবরের সময়ে পারস্য দেশে এক গরিব মুসলমান ছিলেন। তখন সেখানকার গরিব মুসলমানরা হঠাৎ ধনী হওয়ার জন্য ভারতবর্ষে আসছিলেন। এই ভদ্রলোকটিও তাই করলেন। সস্ত্রীক দিল্লী আসার পথে তার এক কন্যা সন্তান জন্ম নিল। কন্যাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচায়, এরূপ সঙ্গতি তার ছিল না। নিরুপায় হয়ে তিনি মেয়েটিকে পথের মাঝে ফেলে রেখে চলে গেলেন।

122. The flower is most valuable gift of the Creator. All of us love flowers. Flowers are used in various occasions. Flowers are of different kinds, different colours and different scents. Now a days flowers are cultivated extensively in Bangladesh. It may be a great source of income. So we should pay more attention to the cultivation of flowers.

অনুবাদ : ফুল সৃষ্টিকর্তার এক অমূল্য দান। আমরা সবাই ফুল ভালোবাসি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহৃত হয়। ফুলগুলো নানা রকমের, রংয়ের ও গন্ধের। বাংলাদেশে বর্তমানে এর ব্যাপক চাষ হচ্ছে। এটি আয়ের একটি ভালো উৎসও হতে পারে। তাই ফুল চাষে আমাদের আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

123. Mother's love is never exhausted. It never fatigues; it never tires. The father may turn his back from his child. Brothers and sisters may become deadly enemies but mother's love exists in all the circumstances.

অনুবাদ : মায়ের ভালোবাসা কখনো নিঃশেষ হয় না। এর কোনো ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই। পিতা সন্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন। ভাই-বোনেরাও ঘোর শত্রুতে রূপান্তরিত হতে পারে; কিন্তু সব পরিস্থিতিতেই মায়ের ভালোবাসা টিকে থাকে।

124. It was the month of Ashar. The whole sky was covered with cloud. The passer-by was looking again and again at the sky. He was going alone towards the destination. There was no house near by. He was walking very fast. But no sooner had he gone to a little distance than it began to rain cats and dogs. The helpless passer-by stood under a tree. Darkness descended gradually but it was raining non-stop.

অনুবাদ : এটা ছিল আষাঢ় মাস। সারা আকাশ ছিল মেঘে ঢাকা। পথিক বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছিল। সে একাকী গন্তব্যস্থলের দিকে চলছিল। নিকটে কোনো

বাড়িঘর ছিল না। সে খুব দ্রুত হাঁটছিল। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। অসহায় পথিক একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রইল। ধীরে ধীরে অন্ধকার ঘনিয়ে আসলেও অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছিল।

125. Malaria is a kind of fever. In the past, it was very fatal. Then the cause of Malaria was not known. An English Doctor named Ronald Ross discovered the cause of this disease. He proved that the germ of Malaria is carried by a kind of mosquito. At present malaria is not so deadly as in the past.

অনুবাদ : ম্যালেরিয়া এক প্রকার জ্বর। অতীতে এ রোগটি খুব মারাত্মক ছিল। ম্যালেরিয়ার কারণ তখন জানা ছিল না। রোনাল্ড রস নামক একজন ইংরেজ ডাক্তার এই রোগের কারণ আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, একজাতীয় মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহিত হয়। বর্তমানে ম্যালেরিয়া আগের মতো ততোটা মারাত্মক নয়।

126. There is no life without hope. There are hopes in everyone's life. Someone wants to be a doctor, someone wants to be an engineer and someone wants to be an officer. But majority of the people desire to be rich. Now a days, many adopt dishonest policy to be rich all on a sudden.

অনুবাদ : আশাবিহীন জীবন নেই। প্রত্যেকের জীবনেই আশা থাকে। কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় আবার কেউবা কর্মকর্তা হতে চায়। তবে বেশিরভাগেরই ইচ্ছে ধনী হওয়া। হঠাৎ করে ধনী হওয়ার জন্য আজকাল অনেকেই অসৎ পন্থা অবলম্বন করে।

127. Dear brethren. listen to my words. I am afraid, it will not be possible for me to perform Hajj any more. Know it for certain today, all unholy practices of the days of ignorance are declared vanished. No one can be punished for another man's crime. Henceforth the son will not be liable for the offence committed by the father and the same rule shall be obeyed in the case of the father. Be careful, let there be not exceeding the limit as regards religion.

অনুবাদ : প্রিয় ভাইয়েরা, আমার কথা মন দিয়া শোন। আমার আশঙ্কা, এরপর আমার পক্ষে হজে যোগ দেওয়া সম্ভব হবে না। শোন, আজ হতে মূর্খতা যুগের সকল অনাচার বাতিল হয়ে গেল। একজনের অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়া যাবে না। এরপর থেকে পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং একইভাবে পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলবে না। সাবধান, ধর্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করো না।

128. Our life is short. But we have many things to perform. Human life is nothing but a collection of moments. So we must not spend a single moment in vain. To kill time is to shorten life. Time and tide wait for none.

অনুবাদ : আমাদের জীবনকাল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। মানবজীবন কতকগুলো মুহূর্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। সেজন্য আমরা একটা মুহূর্তও বৃথা অপচয় করব না। সময়ের অপচয় করাই হলো জীবনকে সংক্ষিপ্ত করা। সময় ও স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

129. Long long ago the people of Arab forgot Allah. They used to quarrel and do many evil deeds. The prophet (sm) was born in that Arabia. He called the people of his country to the path of Allah and advised them to lead their lives properly. Many people rectified themselves. But the wicked people did not pay heed to him. They began to torture him in many ways. The prophet (sm) tolerated all these with a smiling face.

অনুবাদ : অনেকদিন আগের কথা, আরবের লোকেরা তখন আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। তারা কেবলই ঝগড়া করতো এবং নানারকম খারাপ কাজ করতো। সেই আরব দেশেই নবি (স.) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর দেশের লোকজনকে আল্লাহর পথে ডাকলেন এবং ভালোভাবে চলতে উপদেশ দিলেন। অনেকেই সংশোধিত হলো। কিন্তু দুষ্ট লোকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলো না। তারা তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল। নবিজি (স.) সবই হাসিমুখে সহ্য করতেন।

130. Education is not confined within the schools, colleges and universities only. We get education from family, society and everything in the world. The education that we derive from our practical life is more important than that we get from schools and colleges. Always we are learning something. These trends of education remain life long. [ফা. প. ২০০৮, '১৪]

অনুবাদ : শিক্ষা শুধু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, সমাজ ও পৃথিবীর সবকিছু থেকেই আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকে তার গুরুত্ব বেশি। আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু শিখছি। আজীবন শিক্ষার এই ধারা অব্যাহত থাকে।

131. Education is not confined within the schools, colleges and universities only. We get education from family, society and everything in the world. The education that we derive from our practical life is more important than that we get from schools and colleges. The whole world is place of learning for us. Always we are learning something. [ফা. প. ২০১৮]

অনুবাদ : শিক্ষা শুধু স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিবার, সমাজ ও পৃথিবীর সবকিছু থেকেই আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, স্কুল-কলেজের শিক্ষা থেকে তার গুরুত্ব বেশি। সমগ্র পৃথিবীই আমাদের শিক্ষার স্থান। আমরা সব সময়ই কিছু না কিছু শিখছি।

132. We have achieved the freedom of Bangladesh. The blue sky over our head, the vast green fields, the pure gentle breeze– all these are so dear to us. Every nation loves its mother land dearly. Bangladesh is also very dear to us. So the responsibility to build it up depends on all of us.

অনুবাদ : আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পেয়েছি। বাংলাদেশের নীল আকাশ, বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, নির্মল বায়ু সবই আমাদের কাছে প্রিয়। প্রত্যেক জাতির কাছে তার জন্মভূমি প্রিয়। বাংলাদেশও আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। সুতরাং একে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের ওপর বর্তায়।

133. The rains have set in after a long period of drought. Now, it rains everyday. Mamun is a peasant. He is very active and industrious. He has some pieces of land of his own. He has ploughed his land and sowed paddy seeds there. He hopes, this year he will get more crops. The growth of paddy will be increased. He will buy a radio of small size after selling his paddy. He is very optimist.

অনুবাদ : দীর্ঘ খরার পর বর্ষাকাল শুরু হয়েছে। এখন প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়। মামুন একজন কৃষাণ। সে অত্যন্ত কর্মঠ ও পরিশ্রমী। তার নিজস্ব কিছু জমি আছে। জমিতে চাষ দিয়ে সে ধানের বীজ বপন করেছে। সে আশা করে যে, এবার সে খুব ভালো ফসল পাবে। ধানের ফলন বৃদ্ধি পাবে। ধান বিক্রি করে সে একটি ছোট্ট রেডিও কিনবে। সে খুবই আশাবাদী।

134. The bees fly about from flower to flower. They take no rest from morning till evening. All day long they are at work. They gather honey from flowers. From the accumulation of a very insignificant quantity of honey gathered by the bees, a huge bee-hive becomes filled with honey. We have thus a lot of things to learn from the lives of such small insects and from their works.

অনুবাদ : মৌমাছি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের কোনো বিশ্রাম নেই। সারাদিন কেবল তাদের কাজ আর কাজ। ফুল থেকে তারা মধু সংগ্রহ করে। বিন্দু বিন্দু মধু সঞ্চয়ে একদিন প্রকাণ্ড মৌচাক ভরে ওঠে। মৌমাছির মতো ছোট্ট পোকামাকড়ের জীবন এবং তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে।

135. Haider Ali was the ruler of Mysore. He was brave as a lion and a warrior of noble heart. His son Tipu Sultan was also as brave as his father. He could never entertain the British rule. So he fought valiantly to uphold the honour and sovereignty of the motherland by shedding the last drop of his blood. He stands as a symbol of freedom and a source of inspiration. We still remember him with deep respect.

অনুবাদ : হায়দার আলী মহীশূরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সিংহের মতোই সাহসী এবং একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। তার পুত্র টিপু সুলতানও পিতার মতোই সাহসী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশদেরকে শাসক হিসেবে কখনো মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মাতৃভূমির সম্মান ও সার্বভৌমত্বের জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক ও অনুপ্রেরণার উৎস। আমরা এখনো গভীর শ্রদ্ধার সাথে তাকে স্মরণ করি।

136. Bangladesh is our land of birth. The blue sky above, the green fields, the murmuring sound of the rivers and above all, the simple minded people of this land are so dear to us. A man who loves his country is regarded as a patriot. A true patriot loves his country more than his own life. So we should consider it a sacred duty to devote our lives for the welfare and prosperity of our motherland.

অনুবাদ : বাংলাদেশ আমাদের জন্মভূমি। আমরা ভালোবাসি এ দেশের নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, নদীর কুলকুল ধ্বনি– আর সরল মানুষকে। যে দেশকে ভালোবাসে সে

দেশপ্রেমিক। একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক নিজের জীবনের চেয়ে তাঁর দেশকে বেশি ভালোবাসে। সুতরাং জন্মভূমির মঙ্গল ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে দেখা উচিত।

137. Illiteracy is a curse. In Bangladesh, the year 1992 has been declared as the year for universal education. For this, an upazilla has been taken in every district. Every child between the ages from five to seven are taught there. It is compulsory. Every child will get the light of education by degrees. The curse of illiteracy is to be removed from the country.

অনুবাদ : নিরক্ষরতা একটি অভিশাপ। বাংলাদেশে ১৯৯২ সালে সর্বজনীন শিক্ষার বছর হিসেবে শুরু হয়েছে। এজন্য প্রতি জেলা থেকে একটা করে উপজেলা নেওয়া হয়েছে। সেখানে পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের প্রতিটি শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এটা বাধ্যতামূলক। ক্রমশ সকল শিশুই শিক্ষালাভ করবে। দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে হবে।

138. Almost all the students of our country are habituated to memorising answers. They do not prepare the answers themselves. They get them prepared by their teachers. Their paying tutors exercise their brain in preparing the answers. As a result, their thinking power does not develop. They may cut a good figure in the examination, but they earn no knowledge.

অনুবাদ : আমাদের দেশের প্রায় সকল ছাত্রই উত্তর মুখস্থ করতে অভ্যস্ত। উত্তরগুলো তারা নিজেরা তৈরি করে না। তারা তাদের শিক্ষককে দিয়ে তা করিয়ে নেয়। তাদের পক্ষে তাদের মাইনে করা শিক্ষকরা মাথা খাটান। ফলে ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে না। পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও আসলে তারা কোনো জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

139. Everybody desires success, but a few attain it. One of the reasons is that most people are lacking in strength of will. A weak-minded person is frightened away by the initial difficulties. Then he gives up the attempt. If a man faces the difficulties bravely, he will be able to overcome them and succeed at the end.

অনুবাদ : সবাই কৃতকার্য হতে চায়, কিন্তু খুব কমসংখ্যকই তা লাভ করে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে অধিকাংশ লোকের মধ্যেই দৃঢ় সংকল্পের অভাব। দুর্বলচিত্ত লোক একটু বিপদের আশঙ্কা দেখেই রণে ভঙ্গ দেয়। তখন সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু যে সাহসিকতার সাথে সকল বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করে, সে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়।

140. Happiness is a matter of relativity. Some become happy by possessing wealth and riches, some get happy by having power, some grow happy by living peacefully. Virtually happiness is a matter of mind to feel or to perceive. If anybody thinks that he is happy, it will be easier on his part to be happy really. Those, who are selfish

are the most unhappy people in the world. One can find happiness in self-abnegation. In other words, happiness lies in satisfaction.

অনুবাদ : সুখ বিষয়টা আপেক্ষিক। কেউ ধন-সম্পদে সুখী, কেউ ক্ষমতায় সুখী, কেউ শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পেরে সুখী। আসলে সুখ হলো মনের অনুভব বা উপলব্ধির ব্যাপার। কেউ যদি মনে করে যে, সে সুখী; তাহলে তার জন্য সত্যিকারের সুখী হওয়া খুব সহজ। স্বার্থপর মানুষ হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে অসুখী। ত্যাগের মাঝেই প্রকৃত সুখ পাওয়া যায়। অন্য কথায়, সন্তুষ্টিতেই সুখ।

141. One succeeds if one tries. Allah helps those who help themselves. It is lesson that we learn from the lives of all who have become great in the world. Be it learning or wealth, no one can have it without making any effort and this is what all of us should bear in mind.

অনুবাদ : চেষ্টা করলে সফলকাম হওয়া যায়। যারা চেষ্টা করে আল্লাহ তাঁদের সহায় হন। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন তাঁদের জীবনী হতে আমরা এ শিক্ষাই পেয়ে থাকি। বিদ্যাই হোক আর ধনই হোক চেষ্টা না করলে কেউই তা অর্জন করতে পারে না। বিষয়টি আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

142. The only language that we want to learn for the most part other than our mother tongue is English. Our objectives of learning English are earning for living, conversing with people of other countries and acquiring mastery in different branches of knowledge. We are supposed to use our mother tongue with the people of our native land. But those who mean to get higher education or want to keep communication with the people of other countries must learn English.

অনুবাদ : আমরা মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানত একটা ভাষা শেখার চেষ্টা করি তা হলো ইংরেজি। ইংরেজি শেখার উদ্দেশ্য– জীবিকা নির্বাহ, ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা। আমাদের দেশের মানুষের সঙ্গে মাতৃভাষাতেই আলাপ করতে হবে। কিন্তু যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে কিংবা অন্যান্য দেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে চান তাদের অবশ্যই ইংরেজি শিখতে হবে।

143. The thing that is needed to acquire proficiency in a foreign language is to gain a first-hand knowledge of its vocabulary. The reason is that we express our ideas through the medium of words. He who has earned mastery over a great number of words finds it easy to grasp the meaning of that language and at the same time he finds it easy to communicate his thoughts and ideas. But mere knowledge of the words is not enough. One must know the appropriate use of the words. The stock knowledge of our students as regards to English vocabulary is very limited.

অনুবাদ : যে-কোনো বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করতে হলে ওই ভাষার শব্দভান্ডার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ ভাব প্রকাশের জন্য আমরা শব্দ ব্যবহার করি। যিনি যত বেশি শব্দ জানবেন তার পক্ষে ওই ভাষা বোঝা ও ভাব প্রকাশ করা তত সহজ হবে। কিন্তু শব্দের অর্থ শিখলেই হবে না তাকে অবশ্যই শব্দের যথাযথ ব্যবহার জানতে হবে। আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইংরেজি শব্দ-ভান্ডার সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত।

144. This earth is peopled by mankind for millions of years. But in the past the society was chaotic and uncivilized. The history of civilization has a long tradition and man would not have come to the present position if there had been no efforts of man for self-development. The supersonic aeroplanes, the rockets, the bullet trains, computers, nuclear energy– all these are wonderful contributions of human civilization. But we must not forget that for all these we owe to those noble hearts who dedicated their whole lives to the welfare of mankind.

অনুবাদ : লাখ লাখ বছর ধরে মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে। কিন্তু অতীতে সমাজ ছিল বিশৃঙ্খল এবং সভ্যতা বিবর্জিত। সভ্যতার ইতিহাস অতি দীর্ঘ এবং মানুষ বর্তমান অবস্থানে এসে দাঁড়াত না যদি তার আত্মোন্নয়নের প্রচেষ্টা না থাকত। সুপারসনিক বিমান, মহাকাশ যান, বুলেট ট্রেন, কম্পিউটার, পারমাণবিক শক্তি সবকিছুই সভ্যতার বিস্ময়কর অবদান। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এ সবকিছুর জন্যই আমরা সেইসব মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের কাছে ঋণী, যাঁরা তাঁদের সারা জীবন মানবজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করেছেন।

145. Poverty has many faces, many roots. It's now a poor life style in deprivation for about forty percent of Bangladesh's population. Not only here in this country, poverty is the burning socio-economic issue in other South Asian countries like Africa, Latin America and Caribbean countries. Bangladesh at present faces four poverty related challenges, according to a report of the ADB, published last year. The report alleged that the poverty reduction was minimum in the country despite considerable flow of resources into rural and urban areas over the recent past.

অনুবাদ : দারিদ্র্যের রয়েছে অনেক ধরন, অনেক উৎস। বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় চল্লিশ শতাংশ বর্তমানে বঞ্চনাপূর্ণ একটি দারিদ্র্যময় জীবনযাপন করে। শুধু এখানেই এ দেশেই নয়, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের দেশগুলোর মতো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশেও দারিদ্র্য বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক সমস্যা। গত বছর এডিবি প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ বর্তমানে দারিদ্র্য-সংশ্লিষ্ট চারটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। রিপোর্টটিতে দাবি করা হয় যে, নিকট অতীতে গ্রামীণ ও শহর এলাকাগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের প্রবাহ সত্ত্বেও দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল যৎসামান্য।

146. Perhaps a smile is the only thing in the world that has no bad effect. Many wise persons have described the smile as another essence of heavenly beauty. A happy smile, with all its sour-catching power, can bear any heart at any time. In presenting a good smile, a pleasing appearance is not necessarily needed. A smile can be a good substitute for a good and attractive face.

অনুবাদ : সম্ভবত পৃথিবীতে মৃদু হাসিই একমাত্র জিনিস যার কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিই মৃদু হাসিকে স্বর্গীয় সৌন্দর্যের আরেক বহিঃপ্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। একটি সুখের হাসি তার সকল তিক্ততা গ্রাসের ক্ষমতা দ্বারা যে-

কোনো সময় যে-কোনো আঘাত সইতে পারে। একটি ভালো হাসি দেওয়ার জন্য একটি মনোরম চেহারা আবশ্যক নয়। হাসি হতে পারে একটি ভালো এবং আকর্ষণীয় চেহারার বিকল্প।

147. The message of social justice has become urgent for us in Bangladesh, as we have failed to make much progress in our poverty alleviation drives. With such a large number of people still living below the poverty line on the one hand, a small segment of the population acquiring more and more wealth on the other. The issue of economic fairness and justice has become crucial for us. Over the years, our poor have been unable to benefit much from whatever economic growth we have had in the past. This must change in the future. Our democracy should not only entail the political empowerment of our people, but also must include a bigger stake for the poor in our economic growth.

অনুবাদ : দারিদ্র্য বিমোচনে যেহেতু আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছি, তাই বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচারের বাণী জরুরি হয়ে পড়েছে। একদিকে যেমন বিপুলসংখ্যক লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে অন্যদিকে জনগণের একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রচুর পরিমাণে সম্পদের মালিক হচ্ছে। আর এ প্রেক্ষিতে, অর্থনৈতিক নিরপেক্ষতা এবং ন্যায়ানুবর্তিতা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। পূর্বের বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যাই হোক না কেন, আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তার ফায়দা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতে এর পরিবর্তন আবশ্যক। আমাদের গণতন্ত্র কেবল জনগণের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য নয়; বরং আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটা বিরাট অংশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

148. Knowledge is like light, weightless and intangible. It can easily travel the world, enlightening the lives of people everywhere. Yet billion of people still live in the darkness of poverty unnecessarily. Knowledge about how to treat such a simple ailment as diarrohea has existed for centuries, but millions of children continue to die from it because their parents do not know how to save them. Poor countries, and poor people, differ from rich ones not only because they have less capital but because they have less knowledge. Knowledge is often costly to create, and that is why much of it is created in industrial countries. But developing countries can acquire knowledge overseas as well as create their own at home.

অনুবাদ : জ্ঞান আলোর মতো, ওজনহীন এবং স্পর্শাতীত। সর্বত্র মানুষের জীবনকে আলোকিত করে এটা সহজেই বিশ্বভ্রমণ করতে পারে। তথাপি কোটি কোটি লোক অনাবশ্যকভাবে এখনো পর্যন্ত দারিদ্র্যের অন্ধকারে নিপতিত রয়েছে। ডায়রিয়ার মতো একটা সামান্য রোগের চিকিৎসা কীভাবে করতে হয় কয়েক শতাব্দী ধরে তার জ্ঞান বিদ্যমান থাকলেও লাখ লাখ শিশু এ রোগে মরেই চলেছে। কারণ তাদের পিতামাতা জানে না তাদেরকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়। দরিদ্র দেশ এবং দরিদ্র মানুষ ধনীদের থেকে আলাদা কেবল সম্পদের স্বল্পতার জন্য নয়; বরং তাদের জ্ঞানের স্বল্পতার জন্য। অনেক সময় জ্ঞান-সৃষ্টি ব্যয়সাধ্য এবং এ জন্যই অধিকাংশ

শিল্পোন্নত দেশেই জ্ঞান-সৃষ্টি হয়। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো বিদেশ থেকে জ্ঞানার্জন করতে পারে এবং তাদের নিজের দেশেও তা সৃষ্টি করতে পারে।

149. The Grameen bank is a rural bank in Bangladesh that provides credit and organisational help to the poor, who are otherwise excluded from the formal credit system because they lack material collateral. This financial institution has replaced physical collateral requirements with group responsibility; by organising poor individuals into groups, it has created the social and financial conditions enabling them to receive loans. The Grameen Bank also promotes social development by making the poor individually and socially accountable. Such intermediation improves the productivity and income of the poor. This, in turn, also improves their loan repayment rate and, hence, contributes to the Grameen Bank's financial viability.

অনুবাদ : গ্রামীণ ব্যাংক হলো বাংলাদেশের একটি পল্লি ব্যাংক, যা গরিবদের ঋণ ও সাংগঠনিক সহায়তা দিয়ে থাকে, যারা জামানত স্বল্পতার কারণে গতানুগতিক ঋণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়। এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাহ্যিক জামানত পদ্ধতি দলগত দায়িত্বে স্থানান্তর করেছে; বিচ্ছিন্ন দরিদ্র ব্যক্তিদেরকে দলে সংগঠিত করে তাদের অনুকূলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ গ্রহণে সহায়তা করছে। এছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক গরিবদের মধ্যে ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে দায়বদ্ধতা সৃষ্টির মাধ্যমেও সামাজিক উন্নয়ন ঘটায়। এরূপ মধ্যস্থতায় উৎপাদনের উন্নয়ন ঘটে এবং গরিবদের আয় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে, তাদের ঋণ পরিশোধের হারের উন্নতি হয় এবং গ্রামীণ ব্যাংকের আর্থিক উন্নয়নে তা সহায়তা করে।

150. Liberty does not descend upon a nation; people must raise themselves to it. It is a fruit that must be earned before it can be enjoyed. That freedom means freedom only from foreign rule is an outworn idea. It is not merely government that should be free, but people themselves should be free. And no freedom has any real value for the common man or woman unless it also means freedom from want, disease and ignorance.

অনুবাদ : স্বাধীনতা কোনো জাতির ওপর নেমে আসে না; জাতিকে স্বাধীনতার পর্যায়ে উন্নীত হতে হয়। এটি এমন একটা ফল যা ভোগ করার পূর্বে অর্জন করতে হয়। স্বাধীনতার অর্থ বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি– এটি একটি সেকেলে ধারণা। শুধু সরকার স্বাধীন হবে না, জনসাধারণ নিজেরাও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা যদি অভাব, রোগ ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি না বোঝায় তবে সাধারণ নর-নারীর কাছে সেই স্বাধীনতার প্রকৃত কোনো মূল্য নেই।

151. Our character is very much affected by the company we keep. The mind of the youth is very susceptible, is capable of quickly receiving impressions, hence a youth quickly imbibes the disposition of his companions. Boys are spoiled in youth if they keep company with bad boys, and improve if their companions are of good disposition and character. In the choice of friends and playmates boys cannot be

solely depended upon, for their judgement is not ripe and they cannot resist temptations which bad companions put on their way. The paths of vice are full of charms for the youth and boys like such companions as lead them to these paths.

অনুবাদ : আমাদের সঙ্গই আমাদের চরিত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যুবকদের চিত্ত বড়ই সংবেদনশীল ও দ্রুত অনুধাবনে সক্ষম। এ কারণেই যুবকেরা তার সঙ্গীর স্বভাব শীঘ্রই মনোমধ্যে গ্রহণ করে থাকে। তরুণ বয়সে খারাপ সংস্পর্শে থাকলে চরিত্র খারাপ হয় এবং চরিত্রবানের সঙ্গে থাকলে ছেলেদের চরিত্রের উন্নতি হয়। বন্ধু ও খেলার সঙ্গী নির্বাচনে ছেলেদের ওপর নির্ভর করা যায় না। কারণ তাদের বিচার-বুদ্ধি পাকা নয় এবং দুষ্ট সঙ্গীরা তাদের যে প্রলোভন দেখায় তা তাদের পক্ষে দমন করা কঠিন হয়। তরুণদের কাছে পাপের পথ আনন্দপূর্ণ মনে হয় বলে যেসব ব্যক্তি তাদেরকে এ পথে নিয়ে যায় তাদেরকে তারা পছন্দ করে।

152. The best teachers have always emphasised the importance of self-culture and of stimulating the student to gain knowledge by the exercise of his own faculties. They have relied more upon training than upon talking and have tried to make their pupils active partners in the work of their own education but not passive receivers of information. This was the spirit in which Dr. Arnold, the great Headmaster of Rugby worked.

অনুবাদ : শ্রেষ্ঠ শিক্ষকগণ সর্বদা স্ব-সংস্কৃতি অনুশীলন এবং নিজেদের ধীশক্তি ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জনে ছাত্রদেরকে উদ্দীপ্ত করার ওপর সবসময় জোর দিয়েছেন। তারা কথার চেয়ে প্রশিক্ষণের ওপর বেশি নির্ভর করেছেন এবং ছাত্রদেরকে নিষ্ক্রিয় তথ্য গ্রহণকারী নয়; বরং নিজস্ব শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হিসেবে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। এ চেতনার ওপর রাগবির বিখ্যাত প্রধান শিক্ষক ড. আর্নল্ড কাজ করেছিলেন।

153. In view of the fast changing global economic scene leading to polarisation of economic interest of the developed nations, it is high time for the Islamic Ummah to have their own mechanism for mutual co-operation in the fields of trade and commerce. Such a step will I am sure, also counter the impact of the impending threat upon the poor nations. By the grace of Allah, the Muslim countries have the potential resources for the mobilisation of a common market for the Muslim countries. The whole efforts will need a lot thinking pros and cons; sacrifices in the light of the teachings of Islam.

অনুবাদ : দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পটভূমিকায়, উন্নত জাতিগুলো অর্থনৈতিক স্বার্থের মেরুকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মাহর ব্যবসা-বাণিজ্যের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নিজস্ব কৌশল নির্ধারণের এটাই উপযুক্ত সময়। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, এ জাতীয় পদক্ষেপ গরিব রাষ্ট্রগুলোর ওপর আসন্ন হুমকির প্রভাবকে মোকাবেলা করবে। আল্লাহর কৃপায় একটি অভিন্ন বাজার গঠনের সম্ভাব্য সম্পদ মুসলিম জাতিসমূহের রয়েছে। এ পুরো কার্যক্রমের জন্য মুসলিম জাতিকে যা করতে হবে তা হলো– এ সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয়ে ব্যাপক

চিন্তা-ভাবনা করতে হবে এবং ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তাদেরকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

154. As to the books which you should read, there is hardly anything definite that can be said. Any good book, any book that is wiser than yourself, will teach you something, directly or indirectly, if your mind be open to learn. This old counsel of Johnson is also good and universally applicable : "Read the book you do honestly feel a wish and curiosity to read." Flimsy desultory readers who fly from foolish books to foolish books, get good of none and mischief of all.

অনুবাদ : কী ধরনের বই তোমাদের পড়া উচিত সে বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। যে-কোনো ভালো বই– যে বইয়ে তোমাদের জ্ঞানের চেয়ে বেশি জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তোমাদেরকে কিছু শিক্ষা দেবে। অবশ্য যদি তোমার মন শেখার জন্য উন্মুখ থাকে। "যে বই পড়ার জন্য তোমাদের মনে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে সে বই-ই তোমরা পড়বে,"– জনসনের এ প্রাচীন উপদেশটি অতি চমৎকার এবং সবখানেই প্রযোজ্য। দুর্বল এবং অস্থির চিত্তের পাঠকেরা, যারা এক অসার বই থেকে অন্য অসার বইয়ে উড়ে বেড়ায়, তারা কোনো বই থেকেই কল্যাণ আহরণ করতে পারে না বরং অকল্যাণ আহরণ করে সবগুলো থেকেই।

155. The strength of character which we call moral courage, sometimes instead of being respected makes us the object of ridicule. This is because men do not think but follow the fashion. They follow the ideas which prevail in the world or in that small part where they happen to live. The consequence is that any new thing which does not accord with the thought of the time is commonly however good, simply because it is new.

অনুবাদ : চরিত্রের যে দৃঢ়তাকে আমরা নৈতিক সাহস আখ্যা দিই, তা অনেক সময়ই আমাদের সম্মানিত না করে উপহাসের পাত্র করে তোলে। এর কারণ, মানুষ চিন্তা করে না– কেবল গতানুগতিক রীতিটাকে অনুসরণ করে চলে। জগতের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা কিংবা যে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তারা বাস করে, সেখানকার চিন্তাধারাই তারা মেনে চলে। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, কোনো নতুন জিনিস, যা যুগের চিন্তাধারার সাথে খাপ না খেলেও সাধারণভাবে তা ভালো, শুধুমাত্র নতুন কিছু বলেই।

156. There are about a million blind people in Bangladesh. Apart from being born blind, one may become blind due to illness or accident. Blindness may be total or partial. The nature of treatment is not the same for all kinds of blindness. Vitamin 'A' deficiency often causes blindness. We should, therefore, try to take vitamin 'A' in our daily meals.

অনুবাদ : বাংলাদেশে প্রায় ১০ লাখ অন্ধ লোক রয়েছে। জন্মান্ধ ছাড়াও কেউ অসুস্থতা অথবা দুর্ঘটনার কারণে অন্ধ হতে পারে। অন্ধত্ব পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক হতে পারে। সকল প্রকার অন্ধত্বের চিকিৎসার ধরন একরকম নয়। ভিটামি… 'এ'-র অভাব প্রায়ই অন্ধত্বের কারণ হয়ে থাকে। সুতরাং প্রতিদিনের খাবারের …ঙ্গে আমাদের ভিটামিন 'এ' গ্রহণের চেষ্টা করা উচিত।

157. In the modern world women have proved that they can go ahead with men shoulder to shoulder. It is not that their only duty is to serve as a mother and wife. They have many things to do. There remain many ways open for them. They can work in offices, schools, colleges and universities. They have formed a great asset for the nation.

অনুবাদ : আধুনিক বিশ্বে মহিলারা প্রমাণ করেছে যে, তারা পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। শুধু মা ও স্ত্রী হিসেবে কাজ করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য নয়। তাদের অনেক কিছুই করার আছে। তাদের জন্য অনেক পথই খোলা রয়েছে। তারা অফিস, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে পারে। জাতির জন্য তারা এক বিশাল সম্পদ তৈরি করেছে।

158. Our manpower is a great resource. But like land and water we must use it properly. The water of canal is of no use. It must come to everyone, who is thirsty and every paddy field that looks dry. So, we must have the right people in the right places.

অনুবাদ : আমাদের জনশক্তি এক বিরাট সম্পদ। কিন্তু ভূমি এবং পানির মতো আমাদেরকে অবশ্যই এর সঠিক ব্যবহার করতে হবে। খালের পানি কোনো কাজে ব্যবহার হচ্ছে না। এটা অবশ্যই প্রত্যেকের কাছে সুলভ করা উচিত, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট এবং যেসব ধানক্ষেত শুষ্ক দেখায়। সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক জায়গায় সঠিক লোক নিয়োগ দিতে হবে।

159. Dhaka is an ancient city. It stands by the side of Buriganga. The population of this city is increasing rapidly. People of different caste live here. There are many eductional institutions in Dhaka. [ফা. প. ২০১০]

অনুবাদ : ঢাকা একটি প্রাচীন শহর। এটি বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। এ শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন জাতির লোক এখানে বাস করে। ঢাকায় প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

160. It is known to all that the present age is an age of science. The more a nation is skilled in science and technology the more it is developed. Though our Bangladesh is small in area it is prosperous in manpower. If we try we can also acquire competence in science and technology. We can build up our Sonar Bangla of our dreams.

অনুবাদ : এটি সবারই জানা যে, বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। যে জাতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে যত দক্ষ, সে জাতি তত বেশি উন্নত। বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্র হলেও জনশক্তিতে সমৃদ্ধিশালী। চেষ্টা করলে আমরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। আমরা আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে পারি।

161. Do you think that invisible creatures exist only in fairy tales? Then look up in the sky. See the white clouds floating way up there. What is pushing them? The Invisible One. When it crosses a field, the wheat bows low to it; when it passes through a forest, the trees bend down their heads. You've surely guessed what it is by now. It is the wind, the invisible current of air that moves around the earth.

অনুবাদ : তুমি কি মনে কর অদৃশ্য বস্তুসমূহের অস্তিত্ব কেবল রূপকথার গল্পেই থাকে? তাহলে আকাশের দিকে তাকাও। ভেসে বেড়ানো শুভ্র মেঘপুঞ্জের প্রতি লক্ষ

কর। তাদের কীসে ধাক্কা দিচ্ছে? একটি অদৃশ্য কিছু এসব করছে। যখন এটা কোনো মাঠ অতিক্রম করে, তখন গম গাছগুলো এর বশ্যতা স্বীকার করে। যখন এটা কোনো বন অতিক্রম করে, তখন গাছেরা তাদের মাথা অবনমিত করে। তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছ এটা কী? এটা বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর অদৃশ্য গতিপ্রবাহ যা পৃথিবীর চারদিকে ঘূর্ণায়মান।

162. Bangladesh is a land of rivers. The rivers fall into the Bay of Bengal. Many towns, ports and villages stand on both the sides of these rivers. In the rainy season, these rivers assume a terrible look but in winter they remain quite calm.

অনুবাদ : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীগুলো বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এই সমস্ত নদীর উভয় পাশে অনেক শহর, বন্দর এবং গ্রাম অবস্থিত। বর্ষাকালে এসব নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে; কিন্তু শীতকালে এগুলো বেশ শান্ত থাকে।

163. Paper is a very essential material. We cannot do without it. In the past, there was no use of paper in our country. Paper was first introduced in China. At present a huge quantity of papers are available in our country. [ফা. প. ২০১০]

অনুবাদ : কাগজ একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। এটি ছাড়া আমরা চলতে পারি না। অতীতে আমাদের দেশে কাগজের কোনো ব্যবহার ছিল না। চীনে সর্বপ্রথম কাগজ আবিষ্কার হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে কাগজ পাওয়া যায়।

164. A man came into a wood one day with an axe in his hand, begged all the trees to give him a small branch which he wanted for a particular purpose. The trees were good-natured and gave him one of their branches. What the man did fixed it into the axe-head and soon he set to work cutting down trees. Then the trees saw how foolish they had been in giving their enemy the means of destroying them.

অনুবাদ : একদিন এক লোক একটি কুঠার হাতে নিয়ে এক বনে প্রবেশ করল এবং বৃক্ষরাজির কাছে তার বিশেষ কাজে একটি ছোট ডাল দেওয়ার জন্য আবেদন করল। বৃক্ষরাজি ছিল ভালো প্রকৃতির এবং তারা তাকে তাদের ডালসমূহ থেকে একটি ডাল প্রদান করল। কিন্তু লোকটি যা করল তা হলো, সে ডালটি কুঠারের মাথায় প্রতিস্থাপন করল এবং যথাশীঘ্র বৃক্ষগুলো কাটতে লাগল। এরপর বৃক্ষরাজি অনুধাবন করল যে তারা তাদের ধ্বংসের জন্য শত্রুকে উপকরণ প্রদান করে কী বোকামির পরিচয় দিয়েছে।

165. Land and water, these are the two resources that the nation in Bangladesh has. Whatever else it claims as its resource is a product of one or the other or of a combination of the two. Yet there are nations the resource endowment of which are as poor, if not poorer and which are prosperous. [ফা. প. ২০০৭]

অনুবাদ : ভূমি এবং পানি, এই দুটি সম্পদ বাংলাদেশে আছে। যাই হোক না কেন, আমরা দাবি করতে পারি যে, এই দুটি সম্পদের একটি বা অপরটি বা কখনো যৌথভাবে পণ্য উৎপাদন করে। এমন অনেক জাতি রয়েছে যেখানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সমৃদ্ধিশালী হয়েছে।

166. A man had several sons. The sons were not on good terms with one another but they would always quarrel among themselves. The man always advised them to be on good terms with one another, but they would not listen to him. Then he decided that he would explain to them not only in words but also with examples.

অনুবাদ : এক ব্যক্তির কয়েকজন পুত্র ছিল। ওই পুত্রদের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব তো ছিলই না; বরং তারা সব সময় নিজেদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ করতো। লোকটি তাদের একে অপরের সাথে সদ্ভাব রাখার জন্য উপদেশ দিতেন, কিন্তু তারা তার কথা শুনত না। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কেবল কথায় না বলে তাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাবেন।

167. The Civil War was such a momentus event in the history of the United States that it might be argued that it separated two nations : the one before the war and the other after it. Put another way, one might say that the first halp of American history leads up to the war, and that a new America emerges after the war.

অনুবাদ : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ এমনই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যে, এ সম্বন্ধে যুক্তি দেওয়া যায় যে, এটা দুটি জাতিকে পৃথক করে ফেলেছে– একটি যুদ্ধের পূর্বে, অপরটি যুদ্ধের পরে। অন্যভাবেও কেউ বলতে পারেন যে, আমেরিকান জাতির ইতিহাসের প্রথমার্ধ তাদের যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে এবং যুদ্ধের পরই নতুন আমেরিকার পত্তন (সৃষ্টি) হয়।

168. It is useful for students to take part in social service. By taking part in social service they can benefit themselves as well as the society. Student life is the period of preparation for future life. If the student life is the period of preparation for future life. If the students do some social work they will be better prepared for giving service to the society after completion of their studies. [ফা. প. ২০১৪]

অনুবাদ : ছাত্রছাত্রীদের সমাজসেবায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজসেবায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি সমাজও উপকৃত হয়। ছাত্রজীবন হচ্ছে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিকাল। ছাত্রছাত্রীরা যদি কিছু কিছু সামাজিক কাজে অংশ নেয়, তবে তা তাদের ছাত্রজীবন শেষে সমাজসেবামূলক কাজের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতির সহায়ক হয়।

169. Bangladesh is a small South-Asian country. It's area is 1,47,570 sq. km. It got its independence on 16 December, 1971. The climate of the country is hot and humid. The main occupation of the people in general is agriculture. There are some other professions too, such as service, technical and industrial work. The main attraction of the country is its natural beauty. [ফা. প. ২০১৮]

অনুবাদ : বাংলাদেশ দক্ষিণ-এশিয়ার একটি ছোট দেশ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এটি ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। এদেশের আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র। সাধারণত কৃষিই জনগণের প্রধান পেশা। অন্য কিছু পেশাও আছে, যেমন– চাকরি, প্রযুক্তিগত এবং শিল্পকর্ম। এ দেশের প্রধান আর্কষণ এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য।

বিরচন



প্রবন্ধ রচনা

▶৫টি শিরোনাম দেওয়া থাকবে; যে-কোনো ১টির উত্তর দিতে হবে – ২০ × ১ = ২০

০১ ইসলাম ও শান্তি [ফা. প. ২০১৫]

অথবা, শান্তির ধর্ম ইসলাম [ফা. প. ২০০৮]

অথবা, ইসলাম : একটি শাশ্বত জীবনব্যবস্থা [ফা. প. ২০১৭]

উপস্থাপনা : اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ আল্লাহর নিকট প্রিয় ধর্ম ইসলাম। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যা ইসলামে নেই। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্যই ইসলামের অবতারণা। সাগরের যেমন উদারতা, পাহাড়ের যেমন ঔদার্য, বৃক্ষের যেমন বিশালতা– মানবতার জন্য ইসলাম ঠিক তেমনি। তাইতো কবি নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে–

"ইসলাম সে তো পরশ মানিক
তারে যে পেয়েছে খুঁজি
পরশে তার সোনা হল যারা
আমরা তাদেরই বুঝি।"

ইসলামের পরিচয় : 'ইসলাম' আরবি শব্দ। এটি سِلْم (সিলমুন) ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এর আভিধানিক অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, মেনে নেওয়া, আনুগত্য করা। আর পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তাঁর নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ-নিষেধসমূহ মেনে চলা।

পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা : "Islam is the complete code of life." ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো দিক ও বিভাগ নেই যেখানে ইসলামের দৃপ্ত ও সমাধানপূর্ণ পদচারণা নেই। তাই আল কুরআনে বলা হয়েছে, "ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত জীবনবিধান।" মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক তথা সকল দিকেই ইসলাম এক অতুলনীয় আদর্শ উপস্থাপন করেছে।

ইসলামে শোষণমুক্ত অর্থনীতি : মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো অর্থনীতি। ইসলাম ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মাঝে সহাবস্থানের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। তাই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক ইসলামি অর্থনীতির ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন– The Muslim economic system seems to have a great merit the western world should study it. Perhaps to adopt it in a whole or a part.

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে ইসলাম সকলের জন্য মৌলিক মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিয়েছে। রাসুলে আকরাম (স)-এর বিদায় হজের ভাষণই তার সুন্দর দলিল। অথচ আজ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। যেমন : বসনিয়ায় নির্বিচারে গণহত্যা; ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে

স্বাধীনতাকামীদের ওপর নির্যাতন; আলজেরিয়ায় ইসলামের পক্ষে জনতার বিপুল রায় সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক অধিকারের স্বীকৃতি না দেওয়া। মূলত ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

ইসলাম ও সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা : মহান আল্লাহর প্রতি প্রেম ও আনুগত্য থাকলেই সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসা যায়। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– To love man is to love God. মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য সাধনার্থে সৃষ্টিকে ভালোবাসা ও তার কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শান্তি ও কল্যাণের শাসন।

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার : ইসলামের দৃষ্টিতে পাশাপাশি বসবাসকারী চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত জনগোষ্ঠীর সকলেই প্রতিবেশী। ইসলামি সমাজে একজন প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীর আমানতস্বরূপ। বিপদাপদে সাহায্য করবে, অসুস্থ হয়ে পড়লে সেবা-শুশ্রূষা করবে, তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতিতে কল্যাণ কামনা করবে– এটাই অপর ভাইয়ের আমানত। যদি একজন প্রতিবেশী এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তাহলে সমাজজীবনে অশান্তি থাকতে পারে না।

ইসলামে শান্তির ধারণা : ইসলাম অর্থ শান্তি– এটি একটি মৌলিক ও ব্যাপকভিত্তিক ধারণা। দ্বীন ইসলামের প্রকৃতির সাথে শান্তির ধারণা গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাই মহান আল্লাহ যুগে যুগে নবি রাসুলগণের মাধ্যমে পথহারা, শান্তিহারা মানবজাতিকে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আহ্বান জানিয়েছেন।

ইসলাম মানেই শান্তি : ইসলাম হলো অনুপম শান্তি ও প্রেমের ধর্ম। ইসলাম অন্যকে ভালোবাসতে শেখায় এবং মানবপ্রীতি, সমাজপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ও বিশ্বপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত করে। আর ইসলামের বিধান মানলে সমাজ থেকে সকল অশান্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ও হানাহানি দূরীভূত হয়। ফলে আপনা-আপনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অধিকারহারা মানুষের কল্যাণে ইসলাম : ইসলাম মানুষকে উত্তমরূপে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। মহানবি (স) যখন এ পৃথিবীর বুকে আগমন করেন তখন সাধারণ মানুষ ছিল নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও অধিকারহারা। এমনি এক সংকটময় মুহূর্তে মহানবি (স) মানুষের দুঃখ লাঘব ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণে উপস্থাপন করলেন ন্যায়নীতির এক আদর্শ জীবনব্যবস্থা ইসলাম।

বড়দের সম্মান ছোটদের স্নেহ : ইসলাম বড়দের প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছে আর ছোটদেরকে স্নেহ করতে বলেছে। মহানবি (স) বলেছেন, যে বড়কে সম্মান এবং ছোটদের আদর-স্নেহ করে না, সে আমার উম্মত নয়।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলাম বলেছে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এছাড়া ইসলাম সাম্যের নীতিতে বিশ্বাসী। ধনী-গরিব, রাজা-প্রজা, উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ ধূলিসাৎ করে ইসলামই সর্বপ্রথম মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা দিয়েছে। তাই ইসলামের এই ভ্রাতৃত্ববোধ লক্ষ করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে–

ইসলামে নাই আশরাফ আতরাফ
এই ভেদজ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
কর মিসমার সাফ।

মানবমুক্তির একমাত্র পথ : দুনিয়ার বুকে মিথ্যা ও সত্যের, পাপ ও পুণ্যের পথকে সূচারুরূপে তুলে ধরার প্রেক্ষিতে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বারবার দুর্যোগ নেমে এসেছে।

বিবদমান দুনিয়া অসহনীয় যন্ত্রণায় বারবার উঠেছে কুঁকিয়ে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাই তিনি যুগের এক ক্রান্তিলগ্নে পৃথিবীর বুকে একজন অসামান্য ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন। বিশ্বের সামগ্রিক সমস্যাকে বিদূরিত করে কায়েম করলেন ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম। অন্যায়, শোষণ, নিপীড়ন তথা জাহেলিয়াতের শৃঙ্খল হতে মানবতা পায় চিরমুক্তি। মহান আল্লাহ এই সাথে ঘোষণা করে দিলেন, "আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা হলো ইসলাম।" প্রকৃতপক্ষে ইসলামই মানবমুক্তির একমাত্র পথ।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলামই নারীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামই একমাত্র জীবনবিধান যে ধর্মে নারীর জীবনের অধিকার, কাজের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতাসহ সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে– স্ত্রীরা হলো তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে– 'তাদের অধিকার পুরুষদের দায়িত্বে যেভাবে পুরুষের অধিকারও তাদের দায়িত্বে। [সূরা বাকারা-২২৮]

তৎকালীন জাহেলীযুগে কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করা হতো। নবি করীম (স) তা রোধ করে নারীদের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। নবি করীম (স) বলেন, সন্তানের বেহেশত মায়ের পায়ের নিচে। নারীরা হলো পুরুষের একান্ত সাথি। [নাসায়ি]

সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ইসলাম : ইসলাম সাম্য ও ন্যায়ের ধর্ম। পরিপূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে ইসলাম সমাজে কল্যাণকর শান্তি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমরা যখন নিজেদের মধ্যে বিচার অথবা আপসরফা কর তখন ন্যায়ের সাথে কর।"

উপসংহার : ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণের ধর্ম। মানবকল্যাণের যতগুলো বাস্তব দিক আছে সবগুলোই ইসলামে উপস্থিত। তাই সেই কল্যাণ ও সাফল্যের প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেই মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে–

এই ধরাতে আসবে সুদিন বাজবে ধরা নব সাজে
ঘুচবে সেদিন দুঃখ বেদনা
আসবে শান্তির জোয়ার।

০২ কুরআন ও বিজ্ঞান

[ফা. প. ২০০০]

উপস্থাপনা : The Al Quran is the source of science. বিজ্ঞানের উৎস আল কুরআন। আল কুরআনুল কারীমে মানবজীবনের সার্বিক বিষয়সহ মহাকাশ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে সকল দিকনির্দেশনা রয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর আজকের বিজ্ঞানের উৎকর্ষের মূলে রয়েছে কুরআনভিত্তিক বিজ্ঞানের গবেষণা। তাই বিজ্ঞান পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিচে বিজ্ঞানময় কুরআনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো :

আল কুরআনের পরিচয় : মহান আল্লাহ প্রেরিত আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে অন্যতম পবিত্র কুরআন। যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে রাসুল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। মানবজীবনের সঠিক পরিমণ্ডলে এ কুরআনের কর্তৃত্ব অদ্বিতীয় ও অবিসংবাদিতরূপে পরিগণিত। এর প্রতিটি বাণীই হেকমতপূর্ণ এবং প্রজ্ঞাময়, যা জটিল সমস্যা সমাধানে যুক্তিপূর্ণ তত্ত্ব, তথ্য, দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করে।

বিজ্ঞানের পরিচয় : সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলতে বিশেষ জ্ঞান বোঝায়। অনুসন্ধিৎসু মানুষের বস্তুজগৎ সম্পর্কে ধারণা এবং বিচিত্র কৌশলে তার ওপর আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা থেকে বিশ্বের তাবৎ জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের প্রয়োজনে, মানুষের

অভাববোধ থেকে। এ ধরনের আবিষ্কারই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাররূপে পরিচিত এবং এর যাবতীয় কলাকৌশলই বিজ্ঞান।

কুরআনের সাথে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সম্পর্ক : কুরআন শুধু ইহলৌকিক বা পারলৌকিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেয়নি, পাশাপাশি মানবজাতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, মহাকাশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ও এতে আলোচিত হয়েছে। তাই বলা যায়, কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষভাবে জড়িত। নিচে কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক উপস্থাপন করা হলো :

১। **কুরআন ও প্রাণিবিজ্ঞান :** আধুনিক বিজ্ঞান প্রাণিজগৎ ছাড়াও সৃষ্টি জগতের প্রতিটি কণা-অণুকণার মধ্যে যে প্রচণ্ড শক্তি আবিষ্কার করেছে, তা প্রাণশক্তির বিকল্প হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এসব আবিষ্কারের বহুকাল পূর্বেই কুরআন ঘোষণা করেছে–

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ـ

শুধু তাই নয়, আমরা অনড় নিশ্চল শিলাখণ্ডকে নির্জীব নিষ্প্রাণ বলে মনে করি। কিন্তু পবিত্র কুরআন সেগুলোকে প্রাণবন্ত বলে অভিহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে– يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ

২। **কুরআন ও জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান :** আধুনিক বিজ্ঞানের ধারণা মতে, পৃথিবী স্বীয় অক্ষের ওপর নির্দিষ্ট কক্ষপথে সর্বক্ষণ ঘুরছে। অথচ আল কুরআনে বহু পূর্বেই এ কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ـ

বিজ্ঞানীদের মতে, মহাশূন্যে অসংখ্য নক্ষত্র তীব্র গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে। পবিত্র কুরআন এ ধারণা দিয়েছে বহু পূর্বেই। যেমন কুরআনের ভাষায়–

وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَسْبَحُوْنَ ـ

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। [সূরা ইয়াসীন-৪০]

আল কুরআনে মহাশূন্যে চলমান সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহপুঞ্জের অবস্থানের দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে– بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ

কুরআনে মহাশূন্যে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহপুঞ্জের জন্য প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কক্ষপথের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে–

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ـ

অর্থাৎ, শপথ বুরূজবিশিষ্ট আকাশের। [সূরা বুরুজ-১]

মহাশূন্যের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং গ্রহ উপগ্রহপুঞ্জের ওপর এক অদৃশ্য সত্তার সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ফলে কেউ কাউকে অতিক্রম করার সুযোগ নেই। বিজ্ঞানের এ সত্যগুলোও আল কুরআনে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন–

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ـ

অর্থাৎ, সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং চন্দ্রের পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা। [সূরা ইয়াসীন-৪০]

বিশাল এ সৃষ্টিজগতের পানি থেকে বাষ্প এবং বাষ্প থেকে মহাশূন্যে গঠিত নীহারিকাপুঞ্জ থেকে জগতের অনেক তথ্যের কথা আল কুরআনে বলা হয়েছে। যেমন– وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ـ

এছাড়াও আল কুরআন বিভিন্ন গ্রহ ও মহাকাশ সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশ করেছে। আজকের বিজ্ঞানীরা পৃথিবী সৃষ্টির যে প্রক্রিয়া ও রহস্য নিয়ে গবেষণা করছে, পবিত্র কুরআন সে বিষয়েও সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছে।

৩। **আল কুরআন ও পৃথিবী :** বিজ্ঞানীদের মতে, ভূগর্ভের অন্তর্গত গর্ভস্তরই পর্বত সৃষ্টির মূল কারণ। ভূগর্ভে রয়েছে গরম ও তরল পদার্থ। অথচ উপরে কত নরম ত্বক এবং নানান সবুজ গাছগাছালি। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে–

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থাৎ, আমরা কি এই পৃথিবীকে বিছানা আর পর্বতগুলোকে খুঁটির ন্যায় সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিনি? [সূরা নাবা-৬-৭]

আল কুরআনে আরও বলা হয়েছে–

اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتّٰى ـ

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য রাস্তা করে দিয়েছেন, তাতেই ফলাদির বৃক্ষ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

৪। **আল কুরআন ও মানব সৃষ্টি :** মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছে, চারটি পদার্থ যথা– মৃত্তিকা, পানি, বায়ু ও তাপ থেকে প্রথমে একজন মানব সৃষ্টি করা হয়েছে। তারপর একজন মানবী সৃষ্টি করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ যুগল মানব-মানবীর মহামিলন প্রক্রিয়ায় বংশধারা চলে আসছে। আল কুরআন মানব সৃষ্টি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা উপস্থাপন করেছে। সূরা আলাক-এ বলা হয়েছে– خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

অর্থাৎ, সৃষ্টি করেছেন মানুষ আলাক হতে (সূরা আলাক-২৬)

৫। **আল কুরআন ও অন্যান্য বিজ্ঞান :** সব ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথাই পবিত্র কুরআনে আলোচিত হয়েছে। যেমন– চিকিৎসা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সমর, গার্হস্থ্য, মনোবিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আল কুরআনে রয়েছে।

৬। **বিজ্ঞানচর্চায় কুরআনের অনুপ্রেরণা :** আল কুরআনে শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়নি। মানুষকে বিজ্ঞানচর্চায় অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। আল কুরআনের প্রতিটি আয়াত এক একটি নিদর্শন, যার মাধ্যমে মহান প্রভুর অস্তিত্ব এবং প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য উদঘাটিত হয়। মূলত কুরআন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার। মানুষকে আল কুরআনই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করেছে। কুরআনে বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا

অর্থাৎ, তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা-ভাবনা করেন না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। (সূরা মুহাম্মাদ-২৪)

উপসংহার : পবিত্র কুরআন শুধু ইহকাল আর পরকাল নিয়ে আলোচনা করে না; বরং এ পৃথিবীর সবরকম জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্রমবিকাশ, উৎপত্তি, ধারণাক্রম ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়েও দিকনির্দেশনা দিয়েছে। আজকের পৃথিবীর সকল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আধুনিকায়নের মূলে রয়েছে আল কুরআন।

০৩ ইসলাম ও মানবাধিকার [ফা. প. ২০১৪]

অথবা, ইসলামে মানবাধিকার [ফা. প. ২০০৬, '১৬]

উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্বে 'মানবাধিকার' একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় এবং গণতন্ত্রের জয়যাত্রার পর মানবাধিকার আজ আলোচনার মুখ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বধর্ম হিসেবে ইসলামি জীবনব্যবস্থা বিশ্বজনীন এ মানবাধিকারের সাথে পুরোপুরিভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। ইসলাম শুধু বিধিবিধান, ধর্মতত্ত্ব এবং শাসননীতি সম্পর্কে আলোচনা করেনি, বরং মানবিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও শিক্ষা দিয়েছে। নিচে পাশ্চাত্য মানবাধিকারের অসারতা এবং ইসলামে মানবাধিকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো–

১। **পাশ্চাত্যে মানবাধিকার :** আমরা জানি যে, পাশ্চাত্য সমাজে মানবাধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে তারা মানবাধিকার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতনতা দেখালেও বাস্তবে সেখানে বর্ণবৈষম্য, পেশা এবং নৃতাত্ত্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। যেমন– নেলসন ম্যান্ডেলার মতো বিশ্ববরেণ্য নেতাকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই কাটাতে হয়েছে কারাগারে শুধুমাত্র বর্ণের কারণে।

২। **ইসলাম ও মানবাধিকার :** ইন্দোনেশিয়ান ইসলামি চিন্তাবিদ আবদুর রহমান ওয়াহিদ বলেছেন, ইসলামের কয়েকটি মৌলিক নীতিই বিশ্বজনীন মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন–

ক. আইনের শাসন : ইসলামি তত্ত্ব অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় আইনের ভিত্তিতে। তাই আইন রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ওপর সমভাবে প্রযোজ্য। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান হলো, নির্মোহ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ায় আইনের প্রয়োগ করতে হবে।

খ. একত্ববাদ : ইসলামের মৌল ভিত্তি হলো একত্ববাদ। মিসরের দার্শনিক হাসান হানাফীর মতে, তৌহিদ বা একত্ববাদের আরেকটি অর্থ রয়েছে, তা হলো যে-কোনো নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে মুক্তির ঘোষণা।

গ. মানব কল্যাণ : ইসলামে মানবকল্যাণ সাধনের কথা বলা হয়েছে। একজন মুসলমান কখনো অন্য মুসলমানের অকল্যাণ সাধন করতে পারে না। ইসলাম বলেছে, একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের কল্যাণসাধনের মাধ্যমেই স্রষ্টার নিকটবর্তী হতে পারে।

ঘ. পরিবারের পবিত্রতা : পরিবারই হলো ইসলামি সমাজের প্রধান উপাদান। পরিবারের পবিত্রতা এবং পরিবারের মৌল বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ ইসলামের মহান আদর্শ। পরিবারই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকশিত করে। ব্যক্তিত্বের সবুজ দলগুলো পরিবারেই পরিণতরূপ লাভ করে। পরিবারেই ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাসের কুঁড়ি ক্রমে ক্রমে সুদৃশ্য বিকশিত গুচ্ছরূপ লাভ করে। সুতরাং পরিবারের পবিত্রতা সংরক্ষণকারী ইসলামি নীতি মানবাধিকারের পরিপন্থী নয়।

ঙ. ব্যক্তিস্বাধীনতা : ইসলামে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা স্বীকৃত। স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মাধ্যমেই ব্যক্তিজীবনের লক্ষ্য স্থির করা হয়। যেহেতু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ইসলামে স্বীকৃত, সেহেতু সে পথ ধরেই স্বীকৃত ব্যক্তিগত দায়িত্বের সূত্র এবং এসবই মানবাধিকারের সাথে জড়িত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইসলাম ও মানবাধিকার একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

চ. **শিশুর অধিকার :** পশ্চিমা বিশ্ব মানবাধিকারের বুলি আওড়ালেও প্রকৃতপক্ষে সেখানে তারা একজন শিশুকে চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সেখানে সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন না থাকায় একজন শিশু জন্ম নিয়েই অনেক ক্ষেত্রে পিতৃহীন অবস্থায় পতিত হয়। আবার পশ্চিমা অনুসারী অনেক মাতা নিজের সৌন্দর্য রক্ষার্থে শিশুকে বুকের দুধ হতে বঞ্চিত করে। অথচ ইসলাম একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ লাভে তার পিতামাতা উভয়ের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে মানবাধিকার সংরক্ষণ করেছে।

ছ. **নারীর অধিকার :** নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-স্বাধীনতার নামে বর্তমান বিশ্বে নারীকে চরম দুর্দশা ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। আর ইসলাম নারীকে ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগদানের মাধ্যমে মানবাধিকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "নারীরা তোমাদের (পুরুষদের) বসনস্বরূপ আর তোমরা (পুরুষরা) নারীর বসনস্বরূপ।" মহানবি (স) বলেছেন, পুরুষদের প্রতি নারীর সেরূপ অধিকার রয়েছে যেরূপ অধিকার রয়েছে নারীর প্রতি পুরুষের।

জ. **প্রতিবেশীর অধিকার :** সাধারণত প্রতিবেশীরা পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব সচেতন না হলে একজনের দ্বারা অন্যজনের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়ে থাকে। এজন্য ইসলাম প্রতিবেশীর প্রতি কিছু বাড়তি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মহানবি (স) বলেছেন– সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যার মুখ ও হাত হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। এভাবে ইসলাম মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন বিধিবিধান প্রবর্তন করেছে।

৩। **সর্বজনীন মানবাধিকার :** ইসলাম বর্ণ, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে সকলের মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিয়েছে। অথচ আজ বিশ্বের দিকে দিকে মানবাধিকার ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। বসনিয়া, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন ও আলজেরিয়া এর বাস্তব প্রমাণ। মূলত ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠিত না থাকায় বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

৪। **ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার :** ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে ইজ্জত ও সম্মানের গ্যারান্টি দিয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন– "হে মুমিনগণ! না পুরুষ ব্যক্তি অপর পুরুষ ব্যক্তিদের বিদ্রুপ করবে; হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় ভালো হবে। আর না মহিলারা অন্যান্য মহিলাদের ঠাট্টা করবে; হতে পারে যে, সে তাদের তুলনায় উত্তম হবে। নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের ওপর অভিসম্পাত করো না। না একজন আরেকজনকে খারাপ উপনামে ডাকবে। ঈমানের পরে ফাসেকী কাজে খ্যাতিলাভ অত্যন্ত খারাপ কথা। (সূরা আল হুজুরাত-১১) বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহর রাসুল (স) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "হে মানব মণ্ডলী, তোমাদের জন্য অপরের জানমাল, ইজ্জত অপরের আব্রুর ওপর হস্তক্ষেপ হারাম ঘোষণা করা হলো।"

উপসংহার : ইসলাম এক জীবন-ঘনিষ্ঠ বিশ্বধর্ম। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলাম-নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব। পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজে মানবাধিকার যেমন বাস্তবায়িত হয়, তেমনি কোনো কোনো সমাজে এর রুচিহীন বিকৃতিও লক্ষণীয়। মুসলিম বিশ্বেও রয়েছে মানবাধিকার চর্চার উর্বর ক্ষেত্র, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৌলিক মানবাধিকারের চরম অবমাননা। বিশ্বধর্ম হিসেবে এজন্য ইসলাম দায়ী নয়; বরং ইসলামই মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশের এক উজ্জ্বল দীপশিখা।

০৪ ইসলাম ও মানবতাবোধ [ফা. প. ১৯৯৭, '০২]

অথবা, ইসলামে মানবতাবোধ [ফা. প. ২০১১, '১৯]

উপস্থাপনা : Islam is the complete code of life. মানবজীবনের জন্য ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার আলোচনা ইসলামে নেই। কবি বলেন–

ইসলাম সে তো পরশ মানিক
তারে যে পেয়েছে খুঁজি,
পরশে তার সোনা হল যারা,
আমরা তাদেরই বুঝি।

ইসলামের অন্যতম বুনিয়াদী শিক্ষা হলো, নৈতিক চরিত্র সংশোধন করে মানুষের মাঝে মানবতাবোধ সৃষ্টি করা। মৌলিক মানবীয় গুণাবলি বিকাশে ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবন চলার সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে ইসলাম। ইসলাম মানুষের অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, নৈতিকতা ইত্যাদি নিশ্চিত করে।

ইসলামের পরিচয় : 'ইসলাম' আরবি শব্দ। আভিধানিক অর্থ– আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশসমূহ মেনে সেগুলোর পূর্ণ আনুগত্য করাই ইসলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই হলো ইসলামের মূলভিত্তি। অন্য কথায়, আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করলে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য।" (সূরা বাকারা- ১০৭)

মানবতাবোধের পরিচয় : মানুষের মানবিক ও নৈতিক বোধই মূলত মানবতাবোধ। মানুষের যাবতীয় সদগুণ ও সচ্চরিত্রের মাধ্যমেই মানবতাবোধ প্রকাশ পায়। সততা, ন্যায়, ইনসাফ, পরোপকারিতা, দয়া, ক্ষমা, মহানুভবতা, সহিষ্ণুতা, বিনয়, নম্রতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, আমানতদারি, প্রেম, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সমবেদনা ইত্যাদি মানবতাবোধের প্রকাশক।

ইসলামে মানবতাবোধ

ইসলামে সততা : ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সর্বদা সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে। মিথ্যা কথা বলা এবং অসৎ পথে চলার ফলস্বরূপ কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স) পৃথিবীর ইতিহাসে যে সততার উপমা পেশ করেছেন, তা একেবারেই বিরল। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাই আইয়ামে জাহেলিয়াতেও তাঁকে আরববাসী 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অঙ্গীকার বা ওয়াদা রক্ষা করা : ইসলামে মানবতাবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, অঙ্গীকার রক্ষা করা। মানবসমাজের মাঝে পারস্পরিক শৃঙ্খলা যাতে রক্ষা হয় সেজন্য অঙ্গীকারের ব্যাপারে কঠোর বিধান রয়েছে। ওয়াদা রক্ষা করার মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক আস্থা স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে পারে।

ইসলামে সাম্যনীতি : ইসলামেই সাম্যবাদের উপস্থাপনা ও বাস্তবায়ন বিদ্যমান। ইসলাম হাবশী গোলাম ও কুরাইশদের আলাদাভাবে দেখেনি; বরং বর্ণবৈষম্য বিলোপ করে মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছে ইসলাম।

সদাচার ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা : ইসলামি সমাজব্যবস্থা বংশ, বর্ণ এবং ভৌগোলিক জাতীয়তার পরিবর্তে ইনসাফভিত্তিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। সমঅধিকারের

ভিত্তিতে কোনোপ্রকার বর্ণ-বৈষম্য ছাড়াই শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলামই অগ্রগণ্য। তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন–

ইসলামে নাই আশরাফ আতরাফ
এই ভেদ জ্ঞান নিষ্ঠুর হাতে
কর মিসমার সাফ।

সত্যকে স্বাগত মিথ্যাকে পদানত : সত্য ও ন্যায়কে স্বাগত জানানো আর মিথ্যা ও অন্যায়কে পদানত করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ইসলামেই রয়েছে। সত্য কথা বলতে, সৎ হয়ে চলতে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। কারণ সৎ জীবনযাপন করলে আপনা-আপনিই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ : ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলামি সমাজব্যবস্থা নিছক পুলিশের দায়িত্বই পালন করে না, শুধু আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সীমান্ত রক্ষা তার কাজ নয়; বরং একটি আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, সামাজিক সুবিচার, ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ সাধনও করে থাকে। কারণ ন্যায়ের বিকাশ ও অন্যায়ের বিনাশ সাধন করতে না পারলে মানব সমাজে শান্তি নিশ্চিত হয় না।

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন : ইসলামি মানবতাবোধের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং অপরাধীদের অপরাধ ক্ষমা করা। যেমন– রাসুল (স)-এর ওপর একজন তায়েফবাসী বৃষ্টির মতো পাথর নিক্ষেপ করে তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে অভিশাপ দেননি; বরং বলেছিলেন, "প্রভু! এদের জ্ঞান দাও, এদের ক্ষমা কর।" এটা মানবতাবোধের এক বিরল দৃষ্টান্ত।

ইসলামে বিনয় ও নম্রতা : মানবতাবোধের ভূষণ বলা যায় বিনয় ও নম্রতাকে। বিনয় ও নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া মানবতাবোধের বিকাশ ঘটে না। ব্যক্তিত্ব প্রকাশেরও অন্যতম দিক হলো বিনয় এবং নম্রতা। আর বিনয়ের অর্থ হলো– আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের তুলনায় নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করা। সকল প্রকার গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত থেকে তদস্থলে বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন করার জন্য ইসলাম উৎসাহিত করেছে।

পরস্পর আমানতদারি : ইসলামি মানবতাবোধের একটি বিশেষ গুণ আমানতদারি। যিনি তাওহীদের আমানতদার হবেন তিনি অবশ্যই ইসলামের সকল মানবতাবোধের প্রতি যত্নশীল হবেন। এছাড়া অন্য মুসলিমের জানমালের হেফাজত, অন্য ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ইত্যাদি আমানতদারিও রক্ষা করতে হবে।

ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন : ইসলামই ঘোষণা করেছে মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সহোদর ভাইয়ের মাঝে যেমন অনুপম সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বিরাজ করে অনুরূপভাবে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনও সুদৃঢ়। পৃথিবীতে এমন বিরল ধারা অন্য কোনো জাতির মাঝে লক্ষ করা যায় না। তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থে তাদের মধ্যে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-বিবাদ নেই। এ সম্পর্কে ইসলামে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অন্যের বিপদে সাহায্য করা : আজকের বিশ্বের সর্বত্র দেখা যায় অসহায়, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের আহাজারি। ইসলামি মানবতাবোধের দাবি হলো অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : ইসলাম মানবতাবোধের বিকাশ সাধন করে। ইসলাম এমন এক জীবনবিধান যেখানে মানবতাবোধের সকল দিক গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। ইসলাম সাম্যের ধর্ম। এ সাম্যের ভিত্তিতে ইসলাম পৃথিবীর বুকে মানবতাবোধের সমাজ গড়তে সক্ষম।

০৫ ইসলাম ও গণতন্ত্র [ফা. প. ১৯৯৯, '০৩]

অথবা, ইসলামে গণতন্ত্র [ফা. প. ২০০৫]

উপস্থাপনা : "Islam is a universal religion." ইসলাম একটি শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের সকল বিষয়ে এটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। বর্তমান বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় গণতন্ত্র সম্পর্কেও ইসলাম সুনির্দিষ্ট ধারণা দিয়েছে। গণতন্ত্র একটি শাসন পদ্ধতির নাম। জনগণের সমর্থনে জনগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় এ শাসনব্যবস্থা।

ইসলামের পরিচয় : 'ইসলাম' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ– আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায়, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশসমূহ মেনে সেগুলোর আনুগত্য করাই ইসলাম। আল্লাহর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ই হলো ইসলামের মূলভিত্তি। অন্য কথায় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম। আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করলে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বিঘ্নিত হয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, "তুমি কি জান না যে, আল্লাহর জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য।" (সূরা বাকারা ১০৭)

গণতন্ত্রের পরিচয় : গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো– Democracy। এটি গ্রিক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উদ্ভূত হয়েছে। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratia অর্থ শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy বা গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন–

ক. অধ্যাপক শেলী বলেন– Democracy is government in which everyone has a share অর্থাৎ, গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সকলের অংশগ্রহণ রয়েছে।

খ. C.F. Strong-এর মতে, শাসিতের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলে।

গ. আব্রাহাম লিংকন বলেন– Democracy is a government of the people by the people and for the people. অর্থাৎ, জনগণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থাই হলো গণতন্ত্র।

মোট কথা, জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের নাম 'গণতন্ত্র'। যেমন– প্রাণ ছাড়া প্রাণী হয় না, জনমত তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব ছাড়াও তেমনি গণতন্ত্র হয় না। এটাই গণতন্ত্রের মূলভিত্তি।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য : ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতিগতভাবে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

বিশ্বাসগত পার্থক্য :

১। গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো 'জনমত' আর ইসলামের মূলভিত্তি হলো আল্লাহর অভিপ্রায়।

২। সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি সমর্থনের নাম গণতন্ত্র, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম।

৩। গণতন্ত্রে সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, কিন্তু ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।

৪। গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ, ইসলামে সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ তায়ালা।

৫। গণতান্ত্রিক বিশ্বাস– মানব-রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি, আর ইসলামি বিশ্বাস হলো আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।

আদর্শ ও নীতিগত পার্থক্য :

১। গণতন্ত্রে মত প্রকাশে ভোটদান ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত। ইসলামে এসব অধিকার স্বীকৃত হলেও যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণিজনেরা বিশেষভাবে মূল্যায়িত হবেন।

২। উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষে কোনো পার্থক্য গণতন্ত্রে নেই, কিন্তু ইসলামে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

৩। পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোনো বালাই গণতন্ত্রে নেই। যেমন– জরায়ুর স্বাধীনতা, সমকামিতা, কোনো মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র। কিন্তু ইসলামে শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্মত পরমত সমাদৃত। অনৈতিক পরমত ইসলামে সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

৪। গণতন্ত্রে গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদণ্ড, কিন্তু ইসলামে শাশ্বত বা প্রত্যাদিষ্ট বিধান গরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।

৫। গণতন্ত্রে মানবরচিত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু ইসলামে আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত।

৬। গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামি বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি 'খলিফা', প্রতিনিধি। কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।

গণতন্ত্রের প্রসার : সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যুর পর বিশ্ব আজ ইসলাম ও গণতন্ত্র এ দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আজকে গণতন্ত্র বলতে বোঝানো হয়– প্রত্যক্ষ নির্বাচন, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, জবাবদিহিমূলক সরকার, স্বাধীনতা, প্রগতি ইত্যাদিকে। গণতন্ত্র ক্ষমতায়নের মোহে সাধারণের অহংবোধ জাগ্রত করে এবং স্বাধীনতার নামে সামষ্টিক স্বেচ্ছাচারিতাকে বৈধ জ্ঞান করতে শেখায়। প্রগতি ও মুক্তচিন্তার নামে মূলত সাধারণের অহংকেই প্রতিষ্ঠা করে। তাই সর্বত্রই আজ জনগণ গণতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। প্রসারিত হচ্ছে গণতন্ত্রের দিগন্ত।

ইসলামি গণতন্ত্র : ইসলামের মূলভিত্তি হলো আল্লাহর ইচ্ছা বা অভিমত, অন্যদিকে গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো জনগণের ইচ্ছা বা জনমত। দর্শনের বিচারে ইসলামি গণতন্ত্রকে একটি যৌগ দর্শন বিবেচনা করলে বুঝতে হবে এ দর্শনে ইসলামের মৌলিকত্ব এবং গণতন্ত্রের মৌলিকত্ব সমভাবে বিপন্ন হয়েছে। কেননা গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব হলো জনগণের, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব গণতন্ত্র স্বীকার করে না। অপরপক্ষে ইসলামে সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। জনমত দ্বারা ইসলাম প্রভাবিত হতে পারে না। তাই প্রচলিত গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

উপসংহার : নতুন বিশ্বব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিজয় মানেই গণমানুষের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বিসর্জিত। গণতন্ত্র নৈতিকতার দ্বন্দ্বকে মোহগ্রস্ত গরিষ্ঠের দাবির মুখে বিসর্জন দিয়ে সভ্যতাকে কৌশলে অনাচারগ্রস্ত করে। তবে ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র একটি মতবাদের নাম। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানব জাতির কল্যাণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, একটি ধর্মের নাম। তাই এ দুটির মধ্যে তুলনা চলে না।

০৬ ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ
অথবা, ভ্রাতৃত্ব
অথবা, বিশ্বভ্রাতৃত্ব

উপস্থাপনা : সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার ধর্ম ইসলাম। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। ইসলামের মূল লক্ষ্য হলো অন্যকে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। তাই জনৈক দার্শনিক ইসলামের এ ভ্রাতৃত্বকে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন–

"No distance breaks the tie of blood
Brothers and brothers evermore."

ভ্রাতৃত্বের পরিচয় : মানবতাবোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভ্রাতৃত্ব। পারিভাষিক অর্থে পরস্পরের সহমর্মিতা ও সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়াকে ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। ইসলাম এ ভ্রাতৃত্ব রক্ষার জন্য উৎসাহিত করেছে। রাসুল (স) বলেন, اَلْمُسْلِمُ اَخُ الْمُسْلِمِ মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই।

ভ্রাতৃত্বের রূপরেখা : ভ্রাতৃত্ব প্রধানত দুই প্রকার। যথা–

ক. **ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব :** ঔরসজাত দু'ভাইয়ের মাঝে যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠে তাকে ঔরসজাত ভ্রাতৃত্ব বলে।

খ. **আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব :** মানুষ যখন সত্যকে আঁকড়ে ধরার জন্য এক আদর্শের অনুসারী হয় তা-ই আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধের ধারণা : ইসলামে ভ্রাতৃত্ববোধ বা ভ্রাতৃত্ববন্ধন বোঝানোর জন্য আরবি 'উখওয়াত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটি ইখওয়াতুন মূল থেকে উৎপন্ন। ইসলামের পরিভাষায় মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়াকে ভ্রাতৃত্ববন্ধন বা উখওয়াত বলা হয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পরস্পরের মাঝে সংশোধন কর।"

ঐক্য গঠনে ভ্রাতৃত্ব : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব পরস্পরের মাঝে সম্প্রীতি স্থাপন করে। এই মানসিকতার ভিত্তিতে মানুষের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলে। মহানবি (স) আরবের সেই শতধাবিভক্ত ও কলহে লিপ্ত জাতিকে একই কালেমার সোনালি সূত্রে গ্রথিত করে একটি ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ হিসেবে সংগঠিত করেছিলেন।

ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ঈমানের অনিবার্য দাবি : পরস্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ঈমানের অনিবার্য দাবি। এর তাৎপর্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে, পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে।

ইসলাম প্রসারে ভ্রাতৃত্ব : বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে ইসলামি ভ্রাতৃত্ব এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক।

সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা সৃষ্টি : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব সমাজে এক অনুপম শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়ন করে। যে সমাজের মানুষ একতার ভিত্তিতে পরস্পর সহমর্মিতার নিরিখে কাজ করবে, সে সমাজে শান্তির ফল্গুধারা সৃষ্টি হবেই।

স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন করে ন্যায় ও সাম্যের সমাজ গঠন করে। ইসলামে স্বার্থপরতার স্থান নেই। তাই ইসলাম নিঃস্বার্থভাবে ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করেছে।

পারস্পরিক কল্যাণ কামনা : ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অনুসারীদের পরস্পরের মান-সম্মানের নিরাপত্তা বিধান, দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সমালোচনা ও উপদেশ-নসীহত, অসুস্থ ভাইয়ের সেবা, সালাম, সাক্ষাৎ, মুসাফাহা, উপঢৌকন ইত্যাদি ব্যাপারে পরস্পরের জন্য প্রার্থনা ও কল্যাণ কামনা একান্ত কর্তব্য।

অপরকে সাহায্য করা : ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য ইসলাম অপরের সুখ-দুঃখে এগিয়ে আসার জন্য উৎসাহিত করে। অন্যের বিপদ-আপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে বলে।

মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা : ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অনুসারী ব্যক্তিরা অনধিকার হস্তক্ষেপ, অন্যায় রক্তপাত, কটু ভাষা, গালাগাল, গিবত, চোগলখুরি, অপরের ক্ষতি সাধন, অন্যকে কষ্ট দেওয়া, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে।

ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ : ইসলামি ভ্রাতৃত্ব ইহলৌকিক কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির সহায়ক। মানুষকে ভালোবাসলে আল্লাহকে ভালোবাসা হয়। আর আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যমে ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি নিশ্চিত হয়।

সম্প্রীতি স্থাপন : সহোদর ভাইয়ের মধ্যে যেমন সৌহার্দ-সম্প্রীতি বিরাজ করে, তেমনি ইসলামি ভ্রাতৃত্ব তুচ্ছ পার্থিব স্বার্থ ও পরস্পরের হিংসা ও হানাহানি পরিহার করে মানুষের মাঝে শান্তি আনয়ন করে। ফলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা : ইসলামই প্রথম বিশ্বভ্রাতৃত্বের ধারণা দিয়েছে। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বিশ্বভিত্তিক ভ্রাতৃত্বের সমাজ বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছে ইসলাম। ভ্রাতৃত্বের এ মূল্যবোধ পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইকবাল বলেন–

ভ্রাতৃত্বের বিশ্বব্যাপকতা প্রেম প্রাচুর্য
এই হলো মুসলমানের মূল তত্ত্ব;
রক্ত ও বর্ণ বিচূর্ণ কর,
আত্মবিলোপ কর মুসলিম মিল্লাতের মাঝে,
তোমার পরিচয় হবে না তুরানি, ইরানি, আফগানি বলে।

উপসংহার : মানবতার সেবায় নিয়োজিত মানুষই ভ্রাতৃত্বের অভিব্যক্তি ও পূর্ণ বিকাশের সহায়ক। ভ্রাতৃত্বের অভাবে আজ বিশ্বে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। সুতরাং এক অখণ্ড ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়তে হবে। তাহলেই পৃথিবীর বুকে শান্তি ফিরে আসবে।

০৭ ইসলামে আধুনিকতা

অথবা, যুগোপযোগিতায় ইসলাম

অথবা, আধুনিকতা ও ইসলাম

[ফা. প. ২০০৪]

উপস্থাপনা : "Islam is the complete code of life." ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধানই সর্বাধুনিক ও বাস্তবসম্মত।

ভারসাম্যহীন, অদূরদর্শী ও মানবকল্যাণবিরোধী কোনো বিধিবিধান ইসলাম সমর্থন করে না। এজন্য ইসলাম একটি আধুনিক ও বাস্তবসম্মত সমাজ গঠনে মানবতাকে তত্ত্ব ও বাস্তবতা শেখায়। নিচে ইসলামে আধুনিকতার বিধিবিধান এবং তথাকথিত উগ্র আধুনিকতার সাথে এর পার্থক্য সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হলো–

আধুনিকতার সংজ্ঞা : আধুনিকতা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ Modernism। এর অর্থ হলো উৎকর্ষ বা সাম্প্রতিকতা। অর্থাৎ ঐতিহ্যকে উৎকর্ষ সাধন করে, মনোলোভা করে গর্বিত রীতি ও নিয়মের প্রচলন ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার নাম আধুনিকতা বা Modernism।

Oxford Advanced Learners Dictionary তে Modernism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– Modern ideas or methods in contrast to traditional ones, specially in out or religion.

ইসলাম ও আধুনিকতা : চির আধুনিক একটি সমাজব্যবস্থা নিয়ে এসেছে ইসলাম। আধুনিকতার লক্ষ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন। তেমনি ইসলাম মানবতার সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। সব ধরনের প্রগতি ও গ্রহণযোগ্য ঐতিহ্যকে ইসলামে সমর্থন করা হয়। ইসলামের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক সবকিছুই আধুনিকতার ধারায় প্রণীত। কিন্তু ইসলাম-বিদ্বেষী একশ্রেণির জ্ঞানপাপী ইসলামকে আধুনিকতা ও প্রগতির অন্তরায় বলে মনে করে।

ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ : ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত সংবিধানে বিশ্বাসী। প্রচলিত সকল রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে ইসলামি গণতন্ত্র একটি আধুনিকতম রাজনৈতিক ধারার প্রচলন করে। আধুনিক গণতন্ত্রে একজন মূর্খ ও দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি অর্থবলে গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে সক্ষম হলেও ইসলামি গণতন্ত্রে তা অসম্ভব। ইসলাম আল্লাহভীরু, মানব কল্যাণে নিবেদিত সুশিক্ষিত লোককে প্রতিনিধি নির্বাচনে যোগ্য বলে ঘোষণা করে। রাসুল (স) প্রবর্তিত এ রাজনৈতিক ধারার প্রশংসা করে Oriental Religions গ্রন্থের লেখক বলেন– His (Muhammad) thoroughly democratic conception of divine Government, the University of religious ideal, his simple humanity– all affiliate him modern world.

আধুনিক অর্থব্যবস্থা ও ইসলাম : প্রচলিত পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মূলত শোষণ ও নিপীড়নের হাতিয়ার। এর বিপরীতে ইসলামি অর্থব্যবস্থা কল্যাণমুখী ধারার প্রবর্তক। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ যখন সুদকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ঘোষণা করে, ইসলাম সেখানে প্রায় দেড় সহস্রাধিক বছর পূর্বেই সুদকে হারাম করেছে।

সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম : আধুনিক ব্যবস্থায় সামাজিক ভারসাম্য রক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান। ইসলাম সামাজিক ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মদ্যপান, ব্যভিচার, চুরি, ছিনতাইকে মহাপাপ ঘোষণা করেছে। অধ্যাপক H. A. R Gibb যথার্থই মন্তব্য করেছেন– Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilizaion.

মানবাধিকার ও ইসলাম : আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় মানবাধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলামই সর্বপ্রথম মানবাধিকারের ঘোষণা দিয়েছে। মহানবি (স)-এর মদিনা সনদ ও বিদায় হজের ভাষণ আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের উৎস সনদ হিসেবে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ।

নৈতিকতা ও ইসলাম : আধুনিকতার নামে বিশ্বব্যাপী নৈতিকতার যে বিপর্যয় চলছে, ইসলাম তা সমর্থন করে না। ইসলাম উগ্র আধুনিক এসব অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মাদকতা,

পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের ঘোষণা দেয়। এইডসসহ বিভিন্ন মহামারির প্রেক্ষিতে আধুনিক সেক্যুলার বুদ্ধিজীবীগণও আজ ইসলামের পবিত্র নৈতিকতাকে গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন। অধ্যাপক হেনরি যথার্থই বলেছেন– Islam has known something very similar to the modern system of public prosecution.

ইসলাম ও আন্তর্জাতিকতা : ইসলাম বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃসংঘের আলোকে আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলতে চায়। ইসলাম সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে। Mariol Lousing স্বীকার করেছেন যে– From the time of its founding Muhammadism was a religion with a world outlook. It soon become a strong missionary faith.

ইসলাম ও বর্ণবাদ : ইসলাম ধর্মে বর্ণ-বৈষম্যবাদের কোনো স্থান নেই। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী ঘোষণা করেছে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রীতদাসও বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্যের সেনাপতি হতে পারে, শাসক হতে পারে। কৃষ্ণাঙ্গ হযরত বেলাল (রা) প্রথম মুয়াযযিন। অথচ তথাকথিত আধুনিকতার ধ্বজাধারী ব্রিটেন, আমেরিকা বর্ণবাদে দোষী। ইসলাম বর্ণ, গোত্র, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাইকে সমান চোখে দেখে। কারণ বর্ণ-বৈষম্য সমাজকে কলুষিত করে।

ইসলামে নারীর অবস্থান : ইসলামের নারীনীতি ও নারীদের পর্দার বিধানকে প্রগতির অন্তরায় বলে সমালোচনা করা হয়। অথচ ইসলামে নারীর যত অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে অন্য কোনো ধর্মে তা নেই। ইসলাম নারীকে তার স্বকীয় মর্যাদায় সমাসীন করতে চায়। আর এ কারণেই ইসলাম পর্দার বিধানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ইসলামে পর্দার অর্থ নারীকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দি রাখা নয়; বরং বৈধ ও নিরাপদ সকল কর্মকাণ্ডেই নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ইসলাম দিয়েছে, শুধু তার সম্ভ্রম রক্ষা করতেই পর্দাব্যবস্থাকে আবশ্যক করা হয়েছে। অথচ তথাকথিত আধুনিক সমাজে উগ্র আধুনিকতা ও নারী-স্বাধীনতার নামে নারীদেহ প্রদর্শন করার জন্য উৎসাহিত করা হয়। কথিত আধুনিকতাবাদীরা মূলত এর মাধ্যমে বাণিজ্যের প্রসার এবং নারীদের সর্বব্যাপী ভোগ করে থাকে। ইসলাম এহেন বেহায়াপনাকে বন্ধ করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পর্দার বিধান চালু করেছে।

ইসলামি আধুনিকতার মূল্যায়ন : ইসলাম যে আধুনিকতার কথা বলে তা মানুষের জন্য অত্যন্ত কল্যাণজনক। কারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে মানবসমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই হলো আধুনিকতার মূল লক্ষ্য। অথচ ইসলামবিদ্বেষীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিধিবিধানকে আধুনিকতার অন্তরায় বলে প্রচার করে থাকে।

উপসংহার : ইসলাম একটি আধুনিক ও মানবতাবাদী ধর্ম। আধুনিক বিশ্ব প্রগতি, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে চলতে পারে কেবল ইসলামের অনুসরণের মাধ্যমেই। জর্জ বার্নার্ড'শ যথার্থই বলেছেন–

I belive that if a man like Muhammad were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it much needed peace and happiness.

তিনি আরও বলেন– I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be accepted to the Europe of today.

০৮ নারীর অধিকার [ফা. প. ২০১০, '১৫, '১৮]
ইসলামে নারীর মর্যাদা [ফা. প. ১৯৯৫, '৯৮, '০০]
ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার [ফা. প. ২০০৭]

উপস্থাপনা : জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেন–

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।

মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। এ মানবজাতিকে নারী-পুরুষ দুটি সত্তায় সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলত নারী ও পুরুষকে একে অন্যের সহযোগী হিসেবে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ, তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাকস্বরূপ।

ইসলামে নারীর মর্যাদা :

কন্যা হিসেবে : ইসলাম পুত্রের তুলনায় কন্যাকে কোনো অংশে খাটো করে দেখেনি। মহানবি (স) বলেছেন, "যাকে কন্যা সন্তান দেওয়া হলো আর সে তাদের সাথে সদাচরণ করল, তার মেয়েরা পিতার বা সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির পাথেয় হবে।" এ হাদীসের মাধ্যমে ইসলামে নারীর মর্যাদা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

স্ত্রী হিসেবে : স্ত্রী হিসেবেও ইসলাম নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ কর।" রাসুল (স) বলেছেন, "নারীর ওপর যেমনি পুরুষের অধিকার রয়েছে, তেমনি নারীরও পুরুষের ওপর অধিকার রয়েছে।"

মাতা হিসেবে : মাতা হিসেবে ইসলাম নারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদান করেছে। জনৈক সাহাবী কর্তৃক সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে রাসুল (স) প্রথম তিন বার বলেছিলেন মায়ের কথা। চতুর্থ বার বলেছেন পিতার কথা। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, ইসলাম মাতাকে পিতা অপেক্ষা তিন গুণ বেশি মর্যাদা প্রদান করেছে। রাসুল (স) বলেছেন– اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

অর্থাৎ, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।

নিরাপত্তা বিধান : ইসলামপূর্ব জাহেলিয়া যুগে নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তা ছিল না। ইসলাম এসে তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে, জীবন হরণ করা তো দূরের কথা, তাদের শরীরে সামান্যতম আঘাত করতেও বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন–

لَاتَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَاتُقَبِّحْ وَلَاتَهْجُرْ اِلَّا فِى الْبَيْتِ ـ

অর্থাৎ, তুমি স্ত্রীর মুখমণ্ডলের উপর আঘাত করো না। তাকে অশ্লীল গালিগালাজ করো না এবং ঘরে ব্যতীত অন্য কোথাও তাকে পৃথক করে রেখো না।

বাইরে গমন : ইসলাম নারীদেরকে গৃহে অবস্থান করতে বলেছে সত্য, তবে প্রয়োজনে পর্দা করে সংযত হয়ে বাইরে যাওয়ারও অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং পর্দাহীন ও খুব সেজেগুজে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থাৎ, আর তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করবে। পূর্বের জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদের সাজিয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করবে না।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ : প্রয়োজনের তাগিদে ইসলামি বিধান অনুযায়ী নারীগণ ধর্মযুদ্ধেও অংশগ্রহণ করতে পারবে। যেমন– উহুদের যুদ্ধে বহু মুসলমান নারী যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেছে এবং আহতদের সেবাযত্ন করেছেন।

সম্পত্তির অধিকার : ইসলামপূর্ব যুগে নারীদেরকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, এমনকি বর্তমান যুগেও অন্যান্য ধর্মে সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার স্বীকৃত নয়। কিন্তু ইসলামি শরীয়তে নারীদের যথাযোগ্য মর্যাদাসহ তাদের পৈতৃক ও স্বামীর সম্পত্তিতে অংশ নির্ধারিত হয়েছে।

শিক্ষার অধিকার : ইসলাম নারীকে শিক্ষার অধিকার দিয়েছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্যও বিদ্যাশিক্ষা ফরজ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ -

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলিম (নর-নারী)-এর জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।

চাকরির অধিকার : ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যথাসম্ভব পর্দার সাথে উপার্জন-কর্মে নিয়োজিত হওয়ার অধিকারও প্রদান করেছে।

সংসারের তত্ত্বাবধান : ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী পরস্পরের প্রতিযোগী নয়; বরং সহযোগী। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেছেন, স্ত্রী তার স্বামীর পরিজনবর্গের এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী। (বুখারী ও মুসলিম)

মোহরানা প্রদান : জাহেলী যুগে বিয়ের ব্যাপারে কোনো স্থায়ী বিধান না থাকায় নারীদের জীবন ছিল অনিশ্চিত। পরবর্তীতে ইসলাম পুরুষ কর্তৃক নারীকে মোহরানা দিয়ে বিয়ে করার প্রথা প্রচলন করে তাদের মর্যাদাকে উন্নত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রদান করবে। যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা সানন্দে ভোগ করতে পারবে।"

নারী-উন্নয়ন : নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইসলামের প্রধানতম এজেন্ডা। বস্তুত মানবতার মুক্তির জন্যই ইসলামের আগমন। বিশেষ করে নারীরা যখন ছিল অধিকারহারা, বঞ্চিত, নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, তখন নারী-উন্নয়নের বার্তা ঘোষণা করেছে ইসলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইসলামপ্রদত্ত এ অধিকার থেকে নারীদেরকে বঞ্চিত করে তথাকথিত নারীবাদিরা নারী-উন্নয়নের নামে উল্টো পথে যাত্রা শুরু করেছে। তাদের বক্তব্য, "সম্পত্তিতে পুরুষের চেয়ে নারীকে অর্ধেক দিয়ে নারীকে ঠকানো হয়েছে।" অথচ ইসলাম নারীকে অধিকার দিয়েছে পিতার সম্পত্তিতে, স্বামীর সম্পত্তিতে এবং পুত্রের সম্পত্তিতেও। সম্পত্তিতে অধিকার প্রদানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক যাবতীয় কর্তব্য থেকে নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসলাম। অর্থাৎ নারী অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে বাধ্য নয়। পক্ষান্তরে পুরুষকে সম্পত্তিতে কেবল অধিকার দিয়েই তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়নি; বরং পিতামাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয়দের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন তার জন্য অবধারিত করা হয়েছে। এভাবে নারী-পুরুষের অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষার জন্যই মূলত পুরুষের তুলনায় নারীকে সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষশাসিত বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মুসলিম পরিবারই নারীর জন্য ইসলামপ্রদত্ত

এই অংশ হতে বঞ্চিত করে নারী-উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। নারী অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে শারিরীক ও মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সুতরাং নারী-উন্নয়নের জন্য ইসলামপ্রদত্ত অধিকার আদায়ের বিকল্প নেই।

উপসংহার : ইসলাম নারীকে বিভিন্নভাবে উন্নত মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত প্রগতিশীল অপশক্তি নারীমুক্তির নামে নারীকে আবার প্রাক-ইসলাম যুগের সেই অমর্যাদাকর জীবনে ফিরিয়ে নেওয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিধিবিধান মতো চললেই নারী তার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা ও সম্মান ফিরে পাবে এবং শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ হবে।

০৯ রোজার তাৎপর্য

অথবা, সিয়াম সাধনা

উপস্থাপনা : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ– কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত-এর মধ্যে রোজা অন্যতম। রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের সওগাত নিয়ে প্রতিবছর আমাদের মাঝে আসে সিয়াম সাধনার মাস রমজান, যে মাসে আল্লাহ তায়ালা রোজা রাখা ফরজ করেছেন। এ রোজার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনেক। নিচে রোজার আভিধানিক ও পারিভাষিক পরিচয়সহ এর উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো :

রোজার আভিধানিক সংজ্ঞা : রোজা ফারসি শব্দ। আরবিতে এর প্রতিশব্দ 'সাওম'। যার বহুবচন হচ্ছে সিয়াম। এর আভিধানিক অর্থ– বিরত থাকা, আত্মসংযম, কঠোর সাধনা করা ইত্যাদি।

রোজার পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায়– সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসহ আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (স) কর্তৃক নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকার নামই রোজা।

রোজার উদ্দেশ্য : রোজার বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্য রয়েছে। সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. তাকওয়া অর্জন : ইসলাম ধর্মে রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা : ১৮৩)

খ. রিপুকে দমন : রোজা মানুষের রিপুকে দমন করে। পূর্ণ একমাস প্রশিক্ষণ নিয়ে মুসলমানগণ পরবর্তী ১১ মাস চলার পাথেয় সঞ্চয় করে রোজার মাধ্যমে।

গ. ধৈর্যশীল হওয়া : রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়।

ঘ. ত্যাগের মহিমা : রোজা মানুষকে ত্যাগের মহিমায় উজ্জীবিত করে।

রোজার তাৎপর্য ও গুরুত্ব : রোজার তাৎপর্য অনেক। যেমন–

ক. ফরযে আইন : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রোজা তৃতীয়। মহান আল্লাহ শুধু আমাদের ওপরই রোজার বিধান দেননি; বরং আমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিও রোজা ফরজ করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, "রোজা তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর।" তাই রোজা পালন করা প্রত্যেকের ওপর ফরযে আইন।

খ. রোজা একমাত্র আল্লাহর জন্য : রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, "রোজা আমার জন্য; আর আমিই তার প্রতিদান দেব।" অর্থাৎ রোজা আদায় করতে কোনো লৌকিকতা বা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য থাকে না, একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসাতেই বান্দা রোজা রাখে। তাই আল্লাহ নিজেই রোজার প্রতিদান দেবেন।

গ. রোজা ঢালস্বরূপ : যে ব্যক্তি রোজা রাখে, সে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। নিজেকে সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি কুরিপু থেকে রক্ষা করে। তাই হাদীসে এসেছে, اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ রোজা (আত্মরক্ষার) ঢালস্বরূপ।

ঘ. খোদাভীতি সৃষ্টি : রোজা আদায়ের মাধ্যমে মানব হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় বান্দা এসব থেকে বিরত থেকে রোজা পালন করে। আল্লাহকে ভয় করার নামই তাকওয়া বা খোদাভীতি। আর রোজার মাধ্যমে যে খোদাভীতি অর্জন করা যায় সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন পূর্ববর্তীদের ওপর ফরজ করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পার।"

ঙ. গুনাহ মাফের মাধ্যম : রোজা আদায় করলে আল্লাহ তাঁর বান্দার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। রাসুল (স) ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সাথে রোজা পালন করে, সে পূর্বেকৃত সকল গুনাহ মাফ করে নিল।"

চ. সমাজ গঠনে রোজা : রোজা এমন এক ইবাদত, যা পালন করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠন করা যায়। মানুষ যখন কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা, বিদ্বেষ, মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, গীবত, ঝগড়া-ফাসাদ, অশ্লীলতার চর্চা, অনাচার, ব্যভিচার ইত্যাদি অসৎ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকে, তখন সমাজে সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধি বিরাজমান থাকে। গঠিত হয় আদর্শ সমাজ।

ছ. সাম্য ও সহানুভূতি সৃষ্টিতে রোজা : রোজাদার যখন উপোস করে তখন সে ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কষ্ট সম্পর্কে অবহিত হয়। ফলে ভিক্ষুক, এতিম, অসহায় উপবাসী ও অভাবীদের প্রতি রোজাদারের মনে সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। তাই সাম্য ও সহানুভূতি সৃষ্টিতে রোজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জ. আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ : রোজা পালনের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। এতে সে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সময়ানুবর্তিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার গুণ অর্জন করে।

ঝ. আল্লাহ প্রেমের শিক্ষা : রোজা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রেম ও ভালোবাসারই নিদর্শন। এটা কোনো লোক দেখানো ইবাদত নয়। তাই মহান আল্লাহ হাদীসে কুদসীতে বলেন, "রোজা আমার জন্য আর আমিই এর প্রতিদান দেব।" রাসুল (স) ইরশাদ করেন, "রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালার নিকট মৃগনাভীর চেয়েও প্রিয়।"

ঞ. চরিত্র গঠনের হাতিয়ার : রোজা উত্তম চরিত্র গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রোজাদার ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে যাবতীয় অন্যায় ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়। ফলে সে ভালো চরিত্রবান হয়ে ওঠে।

ট. সুস্বাস্থ্যের সহায়ক : রোজার মাসে পরিপাকতন্ত্র প্রতিদিন প্রায় বারো ঘণ্টা বিশ্রাম পায়, যা সুস্বাস্থ্য গঠনের সহায়ক। এছাড়া কর্মজীবীদের কর্মঘণ্টা কিছুটা হ্রাস পায় বলে এ মাসে তাদের অধিক সময় বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : ইসলামে রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক। কারণ রোজা শুধু আল্লাহর উদ্দেশ্যে রাখা হয়। এতে লোক দেখানোর কোনো সুযোগ থাকে না। রোজা মানুষের মধ্য হতে পাপ-পঙ্কিলতা দূর করে খাঁটি মুমিন হিসেবে জীবন গঠন করার অনুপম শিক্ষা দিয়ে থাকে।

১০ ঈদুল ফিতর

[ফা. প. ১৯৯৩]

উপস্থাপনা : মুসলমানদের ঈদ বা খুশির ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর অন্যতম। ঈদুল ফিতর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় উৎসবগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়ে থাকে। কবির ভাষায়–

জীবনে যাদের হররোজ রোজা
ক্ষুধায় আসেনি নিদ
মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে আজ ঈদ।

নিচে ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্যসহ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো :

ঈদুল ফিতর : মুসলমানরা দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র হৃদয়ে ঈদুল ফিতর পালন করে থাকে। একমাস ধরে সিয়াম সাধনায় উত্তীর্ণ হয়ে এ আনন্দ যেন স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় প্রবাহিত হয়।

'ফিতর' শব্দটি 'ফিতরা' শব্দ থেকে এসেছে। গরিব-দুঃখীকে খুশিতে শামিল করার ব্যবস্থাই ফিতরা। ঈদুল ফিতর অর্থ রোজা ভাঙার খুশি। রোজাদার মুসলমান নর-নারীকে ঈদের আনন্দে শরীক করার জন্য ইসলাম নির্ধারিত ফিতরা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। আর সে অনাবিল আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে আলোচ্য কবিতার মতো করে– ঈদের আনন্দে মন নেচে ওঠে

পথে পথে আজ হাঁকিব বন্ধু
ঈদ মোবারক। আসসালাম।

উদ্‌যাপন :

ক. এদিন ফজর নামাজ শেষে গোসল করে নতুন জামা-কাপড় পরে মিষ্টান্ন দ্রব্য মুখে দিয়ে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দু'রাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায় করতে ঈদগাহে গমন করে। এরপর সবাই একত্রে নামাজ আদায় করে।

খ. সম্পদশালীরা জাকাত ও ফিতরা আদায় করে। সর্বত্র আনন্দ উচ্ছ্বাসের সাথে ঈদ উদযাপিত হয়। কবির ভাষায়–

সারাটি ধরা মাঝে বাঁশরি বাজিয়াছে, জেগেছে প্রাণে নব ছন্দ,
উতলা সমীরণে আনিছে ক্ষণে ক্ষণে বহিয়া নন্দন-গন্ধ।

ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি : নামাজ শেষে ধনী-গরিব, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই একে অপরের সাথে বুকে বুক মিলিয়ে কোলাকুলি করে। এতে প্রমাণিত হয় মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। একে অন্যের অতি আপনজন। মানবতাবোধের এমন নজির মুসলমানদের ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা যায় না। তাই জনৈক ইংরেজ দার্শনিক মুসলমানদের এ ভ্রাতৃত্ববন্ধন দেখে বলেছেন–

"No distance breaks the tie of blood
Brothers and brothers are evermore."

ঈদুল ফিতরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য : ঈদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অশেষ। এ উৎসব কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, জাতীয় জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের এক

গুরুত্বপূর্ণ ও অনাবিল আনন্দের উৎসব। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর ঈদের আগমন ঘটে। রোজার মাধ্যমে যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষালাভ হয়, তারই পূর্ণতা সাধনে যেন আমাদের মাঝে নেমে আসে ঈদুল ফিতর। আনন্দঘন এ ঈদ আমাদের মাঝে এনে দেয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এ ঈদ মূলত আমাদের মাঝে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কল্যাণবার্তা নিয়ে আসে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য জাতীয় জীবনেও ছড়িয়ে পড়ে। সবাই একই ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে এক শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার স্পৃহা লাভ করে। তাই কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন–

জগৎ জোড়া ভ্রাতৃত্ব বিশ্ব জোড়া ভাব
দেশে বিদেশে থাকবে নাকো সম্প্রীতির অভাব।

ঈদুল ফিতরের মহান শিক্ষা : শান্তির অনুপম বার্তাবাহী ঈদুল ফিতর আমাদের মাঝে এনে দেয় এক সুদৃঢ় ঐক্য। এদিন ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, উঁচু-নীচু সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই প্রভুর উদ্দেশ্যে অবনত হয়। ফলে পরস্পরের মাঝে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

ঈদুল ফিতর এক অসীম প্রেরণা : ঈদুল ফিতর মুসলমানদের মাঝে অসীম প্রেরণা সৃষ্টি করে। এদিন প্রতিটি মুসলিম সত্তা নব উৎসাহ-উদ্দীপনায় জেগে ওঠে। নবি করীম (স)-এর যুগের দিকে তাকালে দেখা যায়, এদিন মানুষ সকল ভেদাভেদ ভুলে নবজাগরণে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ইসলামের প্রসার : ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। এ সর্বজনীনতার মূলে রয়েছে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী কৃষ্টি। ঈদুল ফিতর এর অন্যতম। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মনে এ ঈদ সুদূরপ্রসারী কল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে। সুষ্ঠু নিয়মতান্ত্রিকতা, সুনির্ধারিত কার্যকলাপ, ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ইসলামের বিজয় সম্ভব হয়েছে।

ঈদের তাৎপর্য : মুসলমানরা দিনে-রাতে পাঁচবার মসজিদে অথবা স্বগৃহে নামাজ আদায় করেন। আর ঈদ উপলক্ষে বছরে দু'বার জমায়েত হয়ে মুসলিম উম্মাহ দুরাকাত ওয়াজিব নামাজ আদায়ের মাধ্যমে এক অসীম প্রেরণা লাভ করে। ইসলাম ভ্রাতৃত্বের যে শিক্ষা দিয়েছে, ঈদের দিনে তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটে।

ঈদের মূল বাণী ও আহ্বান : ঈদের মূল বাণী হলো সাম্য, ন্যায়, ত্যাগ ও কুরবানি। আমরা ঈদের দিন যেভাবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি, সেরূপ যদি সারা বছর করি, তাহলে সত্য ও সুন্দরের অনাবিল হাসিতে ভরে ওঠবে গোটা বিশ্ব সমাজ।

উপসংহার : ইসলাম সকল মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আল্লাহর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেয়। ঈদের দিনে আমরা সে আদর্শের চর্চা করে থাকি। কিন্তু এ আদর্শের কথা ভুলে কেবল আনন্দ কলরবে মত্ত হলে ঈদের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১১ মহররম
অথবা, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা
অথবা, কারবালা

উপস্থাপনা : কারবালার ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে মর্মান্তিক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মানব ইতিহাসের উষালগ্ন থেকে বিভিন্ন রোমাঞ্চকর ও বেদনাদায়ক ঘটনাকে বুকে ধারণ করে যে মাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে তার নাম মহররম। এ মাস ত্যাগ ও ঐতিহ্যের চেতনার প্রতীক হিসেবে মুসলিম মিল্লাতের প্রেরণার অন্যতম উৎস। নিচে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো–

মহররমের পরিচয় : আরবি বছরের প্রথম মাসের নাম মহররম। এ মাসের সম্মানে আরবের লোকেরা অন্যায়, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকত বিধায় এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে মহররম। এ মাসের দশম দিবসকে আশুরা বলা হয়।

মহররমের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি : মহররম ত্যাগ ও ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম মাস। আশুরা তথা এ মাসের দশম তারিখের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করেই মাসটি ইসলামের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এ দিনের তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নিচে উপস্থাপিত হলো–

১। এদিন আল্লাহ তায়ালা আসমান-জমিন ও লাওহ্-কলম সৃষ্টি করেছেন।

২। এদিন হযরত আদম (আ)-কে আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

৩। হযরত আদম (আ)-এর তওবা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়।

৪। হযরত নূহ (আ)-এর নৌকা ঝড়-তুফান থেকে রক্ষা পায়।

৫। হযরত আইয়ুব (আ) কঠিন রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেন।

৬। হযরত ইউনূস (আ) এদিন মাছের পেট থেকে মুক্তি পান।

৭। মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) খোদাদ্রোহী বাদশাহ নমরূদের অগ্নিকুণ্ড থেকে এদিন মুক্তি পান।

৮। হযরত ইয়াকুব (আ) হারানো দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান।

৯। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর ইচ্ছায় আসমানে উত্থিত হন।

১০। হযরত মুসা (আ) মিসরের ফিরাউনের দুশমনী থেকে মুক্তি পান এবং ফিরাউন সদলবলে নীলনদে নিমজ্জিত হয়ে মারা যায়।

১১। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রা) সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে সপরিবারে মর্মান্তিকভাবে ইয়াযিদের হাতে কারবালা প্রান্তরে এ দিনেই শহিদ হন।

কারবালার পটভূমি : হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর মৃত্যুর পর ইমাম হোসাইন (রা)-কে মুসলিম মিল্লাতের খলিফা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা)-এর পুত্র ইয়াযিদ তা মেনে নিতে পারেনি। সে তা অস্বীকার করে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করে। এতে মুসলিম বিশ্বে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে হযরত ইমাম হোসাইন (রা) কুফাবাসীদের আহ্বানে তথায় গমনের পথে দিকভ্রান্ত হয়ে ফোরাত নদীর তীরে মরুময় কারবালা প্রান্তরে পৌছেন।

ঘটনার বিবরণ : হিজরী ৬০ সালের ১০ মহররম। কারবালার সুবিশাল মরু প্রান্তরের চতুর্দিকে ইয়াযিদের পাষণ্ড সৈন্যবাহিনীর পদচারণা চলতে থাকে। ইমাম হোসাইন (রা) কারবালার এক প্রান্তে তাঁবু স্থাপন করেন। এমতাবস্থায় শত্রুরা ফোরাত নদীর দু'কূল অবরোধ করে রাখে। এদিকে ইমাম হোসাইন (রা)-এর পরিবারে পানির অভাবে হাহাকার পড়ে যায়; এমনকি ছোট শিশুরা ছটফট করতে থাকে। একপর্যায়ে ইমাম হোসাইনের সহচরবৃন্দ ইয়াযিদের সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুমুল যুদ্ধ চলতে থাকে। ইমাম হোসাইন (রা)-এর অনুচরবৃন্দ একে একে প্রাণ দিতে লাগল। ইমাম হোসাইন (রা) ইসলামের আদর্শকে রক্ষা করার জন্য সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি ইয়াযিদের বহু সৈন্য হত্যা করে ফোরাতকূল সৈন্যমুক্ত করেন। অবশেষে তিনি ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লে ইয়াযিদের সমর্থক পাষণ্ড সীমারের বর্শাঘাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন।

বিশ্বপ্রকৃতিতে শোকের ছায়া : ইমাম হোসাইনের নির্মম হত্যাকাণ্ডে ধরায় নেমে আসে শোকের বন্যা। যেন হায় হোসেন! হায় হোসেন! ধ্বনিতে প্রকৃতিকে আকুল করে তোলে।

কবির ভাষায়–

মোহররম কারবালা! কাঁদে "হায় হোসেনা।
দেখো মরু সূর্য এ খুন যেন শোষে না।

হায় হোসেন, হায় হোসেন প্রকম্পন সীমারের অসির মাঝেও যেন ভীতির সঞ্চার করে। আল্লাহর আরশ কেঁপে ওঠে। কাজী নজরুলের ভাষায়–

"নীলসিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।"

মহররমের তাৎপর্য ও শিক্ষা : মহররম আমাদের নিকট ত্যাগের শিক্ষা নিয়ে আগমন করে। তাই এর তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কবির ভাষায়– "ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।" এ মাসের মর্মান্তিক ঘটনা থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষা পাই–

ক. সত্যের সাথে মিথ্যার দ্বন্দ্ব চিরন্তন।

খ. আমাদেরকেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ত্যাগ ও কুরবানির জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। যেমন কবি নজরুল বলেন–

আসগর সম দিব বাচ্চারে কোরবান
জালিমের দাদ নেবো, দেব আজ গোর জান।

গ. সত্যের পথ গোলাপের বিছানা নয়; বরং কণ্টকাকীর্ণ। তাই সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে হলে পর্বতসম দুর্লঙ্ঘ্য বাধা অতিক্রম করতে হবে। কবি বলেন–

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য
হুঁশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাঁক
শহীদের দিনে সব লালে লাল হয়ে যাক!

ঘ. ইমাম হোসাইনের শাহাদাতের পরও মহান আল্লাহ ইসলামকে রক্ষা করেছেন। এভাবে সাময়িক বিপর্যয় হলেও আল্লাহ আমাদের একদিন বিজয় দেবেন। আল্লামা ইকবালের ভাষায়– "ইসলাম জিন্দা হোতা হায় হার কারবালাকে বাদ।"

উপসংহার : মহররম শব্দটি মুসলিম হৃদয়ে কারবালার মর্মান্তিক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যা মহাপ্রলয়ের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতকে সত্যের সংগ্রামে ত্যাগের অনুপ্রেরণা যোগাবে। ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠায় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেন যেভাবে সোচ্চার হয়ে মরণপণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এখন সময় এসেছে তাঁর সেই রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য মুসলিম মিল্লাতকে তাঁর মতো সংঘবদ্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ার।

১২ মাদরাসা শিক্ষা

অথবা, যুগোপযোগী মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

[ফা. প. ১৯৯৪, '০২, '১৩]

অথবা, বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা

উপস্থাপনা : "Education is the backbone of a nation. Without education, a man is like a beast." মেরুদণ্ডহীন প্রাণী যেমন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা ব্যতীত কোনো জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। মাদরাসা শিক্ষা নৈতিকতা বিকাশে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। তাই মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক। নিচে এ সম্পর্কিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

মাদরাসা শিক্ষা : বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থায় দুটো ধারা বিদ্যমান। সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মাদরাসা শিক্ষা গড়ে উঠেছে। মূলত যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা মনে করে নিজেকে ইসলামি রীতিনীতি অনুযায়ী গড়ে তোলার দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয়, তা-ই ইসলামি শিক্ষা। মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হয়। এজন্য একে মাদরাসা শিক্ষা বলা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার পটভূমি : ইংরেজ শাসনামলে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের শাসন ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য মুসলিম আমলের ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা সমূলে বিনাশ করে তৎপরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত করে তুলে 'ভারতীয় ইংরেজ' তৈরি করা। এমতাবস্থায়, তৎকালীন ধর্মপ্রাণ মুসলমান তথা পীর মাশায়েখগণ ইসলাম রক্ষার স্বার্থে জীবনবাজি রেখে মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখেন।

মাদরাসা শিক্ষার বিভিন্ন দিক : বর্তমানে মাদরাসায় ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ, আরবি, বাংলা, ইংরেজি, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে পাঠদান করা হয়ে থাকে। সর্বোপরি মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে সর্বাধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষার একটি সমন্বয় সাধন করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার ধরন : আমাদের দেশে চার ধরনের মাদরাসা শিক্ষা প্রচলিত আছে। যথা–

ক. **ফোরকানিয়া মাদরাসা :** ফোরকানিয়া মাদরাসায় পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক ইসলামি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

খ. **হাফেজী/নূরানী মাদরাসা :** হাফেজী/নূরানী মাদরাসায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে কুরআন হেফজ করার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রতিবছর অসংখ্য কুরআনে হাফেজ এসব মাদরাসা থেকে আল্লাহর কালাম মুখস্থ করে ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

গ. **কওমী মাদরাসা :** এ শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ জনগণের সাহায্য-সহায়তা নির্ভর। এ ব্যবস্থায় কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহসহ ইসলামি শিক্ষার প্রায় সব বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক কওমী মাদরাসায় বাংলা, ইংরেজি ও গণিতও শিক্ষা দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় বেফাক বোর্ড ছাড়াও কওমী মাদরাসা পরিচালনার জন্য আঞ্চলিক বোর্ড রয়েছে।

ঘ. **আলিয়া মাদরাসা :** এ শিক্ষাব্যবস্থা মূলত আধুনিকতার সমন্বয়। এতে কুরআন, হাদীস, ইংরেজি, গণিত, বাংলা, বিজ্ঞানসহ সব ধরনের জ্ঞানের সমন্বয়ে পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের দেশে আলিয়া মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং এর পরিচালনার জন্য সরকার অনুমোদিত একটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে।

পাকিস্তান আমলে মাদরাসা শিক্ষা : পাক-ভারত উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনে মুসলমানদের বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষিতদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ১৮৫৭ সালের মহা আযাদী আন্দোলনে যারা শাহাদাতবরণ করেছেন তাদের স্মৃতি স্তম্ভ ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে এখনো বিদ্যমান। তাদের আন্দোলনের উত্তরাধিকার সূত্র ধরেই ১৯৪৭ সালের দেশ স্বাধীনের পর ঢাকায় আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আমলে মাদরাসা শিক্ষা : বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনকল্পে 'কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। এ কমিশন ছিল ইসলাম ও ইসলামি শিক্ষার প্রতি চরম বিদ্বিষ্ট, এমনকি এ কমিশন মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। ফলে এ দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়।

বঞ্চিত মাদরাসা শিক্ষক ও এ দেশের প্রতিবাদী মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে অবশেষে ১৯৭৮ সালে মাদরাসা শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষার মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৯৮৪ সালে দাখিল শ্রেণিকে এসএসসি এবং ১৯৮৬ সালে আলিম শ্রেণিকে এইচএসসি'র সমমান কার্যকর করা হয়। এতে মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মর্যাদায় ফাযিল-কামিল : মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন এবং এতে উচ্চতর শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে ফাযিল শ্রেণিতে ডিগ্রির সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু নানান প্রতিকূলতায় ফাযিলকে ডিগ্রির সমমান দেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০০৬ সালে তৎকালীন সরকার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-এর অধীনে ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমমান প্রদান করে। এতে ফাযিল শ্রেণিতে ১৪০০ নম্বরের তিন বছর মেয়াদি বি.এ, বি.এস.এস, বি.এসসি. ও বি.বি.এস. ডিগ্রির কোর্স চালু করা হয়। ২০০৬-'০৭ শিক্ষাবর্ষের ফাযিল শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তার সূচনা হয়। আর কামিল শ্রেণিতে নতুন ও সম্প্রসারিত সিলেবাস অনুযায়ী দুবছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) ডিগ্রির কোর্স চালু করা হয় এবং এটিকে এম.এ.'র সমমান প্রদান করা হয়।

মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :

ক. ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষা : বাংলাদেশে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থা নামে দু'প্রকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। এক্ষেত্রে মাদরাসা শিক্ষাই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষা, সঠিক আকিদা শিক্ষা দেওয়া, ইসলামি কৃষ্টি-কালচারের লালন-পালন এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের দীক্ষা প্রদান করে। তাই দ্বীনের প্রয়োজনে এ শিক্ষার গুরুত্ব সীমাহীন।

খ. জীবনে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান : মানুষের ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির জন্য মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ রাখে না; বরং মানুষ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন কীভাবে পরিচালনা করবে তারও দিকনির্দেশনা দেয়।

গ. নৈতিক শিক্ষা দান : নৈতিকতার শিক্ষা পাওয়া যায় মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহকে চিনতে পারে এবং রাসুল (স)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে পারে।

ঘ. সামাজিক অবক্ষয়রোধ : মানুষ হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ, ফরজ-ওয়াজিব যাবতীয় শরয়ী বিধান সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন করতে পারে মাদরাসা শিক্ষার মাধ্যমে। মূলত মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নীতির প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

ঙ. বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় শামিল : দেশের প্রচলিত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষার মতো মাদরাসাগুলোও বিজ্ঞানচর্চা করে যাচ্ছে। বর্তমানে মাদরাসা থেকে দাখিল ও আলিম (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক) পরীক্ষা পাস করে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

চ. সঠিক সেবা প্রদান : ফাযিল ও কামিল শ্রেণিকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মর্যাদা প্রদান করায় মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য বি.সি.এস.সহ সকল প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সঠিকভাবে সেবা প্রদান করে দেশ ও জাতিকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তারা সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে অন্যায়, অত্যাচার ও দুর্নীতি দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

ছ. **কৃষি উন্নয়ন :** বর্তমান মাদরাসা শিক্ষায় কৃষিবিজ্ঞান পাঠ্যসূচি করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষিতরা যাতে এক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা পরিচালিত করতে পারে তার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

জ. **মাদরাসা শিক্ষার সীমাবদ্ধতা :** কতিপয় লোকের হীনম্মন্যতা এবং সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে মাদরাসা শিক্ষা হাজারো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষার্থীরা এখনো নানা বৈষম্যের শিকার। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষায় মাদরাসার ছাত্ররা কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেও তাদেরকে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

উপসংহার : মাদরাসা শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা কল্পনা করা যায় না। মুসলমানদের নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি রক্ষার্থে সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামি বিধান কায়েম করতে, দেশ-জাতিকে দুর্নীতি, অন্যায়-অনাচার থেকে রক্ষা করতে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবনকে বিকশিত করতে মাদরাসা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৩ পরীক্ষায় নকলরোধে ইসলামি মূল্যবোধ

অথবা, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ও ইসলাম [ফা. প. ২০০১]

উপস্থাপনা : ন্যায়নীতি এবং সত্য চিরদিনই একটি বিশেষ স্থান দখল করে এসেছে। নীতিহীন জীবনের যেমন কোনো মূল্য নেই, তেমনি নীতিহীন মানুষ সমাজকে কলুষিত করে। দুর্নীতি ও অনৈতিকতার বিষবাষ্প আজ শিক্ষাঙ্গনে সংক্রমিত হচ্ছে। পরীক্ষায় নকল ও অনিয়মকে আজ একশ্রেণির ছাত্র যেন তাদের অধিকার হিসেবে দেখছে। ইসলাম নকল ও অনিয়ম প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থার পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নকল প্রবণতা : পরীক্ষায় নকল প্রবণতা একটি মারাত্মক অপরাধমূলক কাজ। ইসলামে একে প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তির পর্যায়ে গণ্য করা হয়। আবার যখন কোনো ছাত্র বলপ্রয়োগ, অস্ত্র প্রদর্শনপূর্বক প্রকাশ্যে নকল করে তখন তা রাহাজানি বা ডাকাতি বা সন্ত্রাসের পর্যায়ে পড়ে। ইসলাম এ ধরনের প্রতারণা, চুরি অথবা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাস্বরূপ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান রেখেছে।

নকল প্রতিরোধে ইসলামি মূল্যবোধ :

নকল চুরির নামান্তর : নকল করা চুরি করারই নামান্তর। আর স্বভাবগত চুরি ইসলামে হারাম। সুতরাং নকল করা ইসলামি বিধান মোতাবেক হারাম। আর হারাম কাজ সর্বক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য।

নকল এক ধরনের প্রতারণা : পরীক্ষায় নকল করা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের প্রতারণা সামাজিক শান্তি ও ভারসাম্য নষ্ট করে। বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। রাসুল (স) বলেন– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। (মুসলিম)

অপরের অধিকার হরণ : নকলের মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মূলত অপরের অধিকার হরণের শামিল। প্রকৃত মেধাবী কোনো ছাত্র সৎ উপায়ে পরীক্ষা দিয়ে যে মেধাস্থান অধিকার করে, নকলবাজ কোনো ছাত্র তাকে সে স্থান লাভে বঞ্চিত করে। এভাবে নকলবাজ ছাত্ররা অপরের অধিকার আত্মসাৎ করে।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ : নকলকারী ছাত্রকে শাস্তি পেতে হবে। একজন ছাত্রের বহিষ্কার যেন অন্যদেরকে সচেতন করে সে ব্যবস্থা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি দূর করে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন ছাত্রের জীবন অত্যন্ত মূল্যবান।

হারাম রোজগার : নকলের মাধ্যমে অর্জিত সনদ হারাম। আর এ ধরনের হারাম সনদ প্রদর্শন করে চাকরি গ্রহণপূর্বক বেতন গ্রহণ এবং সব ধরনের রোজগারও হারাম হবে। সেই হারাম রোজগারে তার পরিবার, সন্তান-সন্ততি ও বাবা-মায়ের ভরণপোষণ করা হলে গোটা পরিবার ও সমাজ কলুষিত হয়।

দণ্ডনীয় অপরাধ : চৌর্যবৃত্তির ন্যায় নকল করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। সুতরাং পরীক্ষায় নকল করাকে একাধারে চুরি, অপরের অধিকার হরণ ও প্রতারণা হিসেবে গণ্য করে যথাযথ শাস্তি বিধান করা ইসলামি সরকারের দায়িত্ব।

নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ : ইসলাম সুন্দর ও অনুপম নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। এর বিপরীতে নকল করা নৈতিকতাবিবর্জিত ও গর্হিত কাজ। এহেন নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে ধ্বংস করে। রাসুল (স) বলেন, "যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তাহলে পার্থিব কোনো জিনিস তোমার হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। তা হলো– ক. আমানতের হেফাযত, খ. সত্য ভাষণ, গ. উত্তম চরিত্র, ঘ. পবিত্র রিযিক।" (আহমাদ)

অথচ পরীক্ষায় নকল করা উল্লিখিত ৪টি বিষয়েরই পরিপন্থী কাজ। ইসলাম এহেন নৈতিকতাবিবর্জিত কাজকে চরমভাবে ঘৃণা করে।

নকল সন্ত্রাসকে উৎসাহিত করে : বর্তমানে আমাদের শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসীদের আখড়া। ছাত্ররা পড়ালেখা বাদ দিয়ে নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে গেলে কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষক মহোদয়গণ তার কাজে বাধ সাধেন, তখন সে পাস করা অথবা প্রতিশোধের নেশায় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালায়, যা জাতির জন্য চরম অবমাননাকর।

বাস্তবতাবিবর্জিত জ্ঞান ইসলামে নিষিদ্ধ : নীতি নৈতিকতাহীন বাস্তবতা-বিবর্জিত শিক্ষার্জনে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। পক্ষান্তরে নৈতিকতা-সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণে ইসলাম শুধু উৎসাহিতই করেনি; বরং তা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ করা হয়েছে।

নকল বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর : শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর নকল প্রবণতা সে মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। ফলে নকলে অভ্যস্ত শিক্ষার্থী প্রকৃত জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত হয়। তার জীবন হয়, শিক্ষার নামে স্বীয় সত্তা ও জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা মাত্র।

নকল– আত্মপ্রবঞ্চনা : শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো, এমন আত্মোপলব্ধি লাভ করা যদ্দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টির রহস্য ভেদ করা যায়। যেমন বলা হয়–'مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ' অথচ নকলে অভ্যস্ত শিক্ষার্থী আত্মপ্রবঞ্চনায় লিপ্ত।

নকল প্রতিরোধে দায়িত্ব : পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে শিক্ষক, অভিভাবক, আলেম সমাজ, সরকার এবং সর্বোপরি সৎ ছাত্রদেরকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। কারণ নকল করা যেমন জুলুম, নকল করতে দেওয়াও তেমনি জুলুম।

উপসংহার : সত্যিকারার্থে নকল একটি জঘন্য অনৈতিক কাজ এবং বড় ধরনের অপরাধ। এহেন অপরাধ প্রতিরোধে আমাদেরকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও মূল্যবোধে জাগ্রত হয়ে সব ধরনের প্রতারণা, চুরি, পরের অধিকার হরণমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহভীতির অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে।

১৪ নকলবিহীন পরীক্ষা সৎ জীবনের সোপান [ফা. প. ২০০২]

অথবা, নকলমুক্ত পরীক্ষাব্যবস্থা

অথবা, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা

উপস্থাপনা : "Honesty is the best policy" 'সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা' আমরা সবাই জানি, কিন্তু মানার প্রবণতটা আমাদের মাঝে খুব কম। পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা নকল (copying)-এর মাধ্যমে অসৎ উপায় অবলম্বন করে পাস করার প্রচেষ্টা চালায়। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করার জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের অসদুপায় অবলম্বন করার ফলে এ ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নকলমুক্ত পরীক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসা। অবশ্য এ ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকেই বেশি সচেতন ও নৈতিক মূল্যবোধে বলীয়ান হতে হবে।

১। **পরীক্ষার উদ্দেশ্য :** ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষা শিক্ষার্থীর অর্জিত বিদ্যা ও যোগ্যতার মাপকাঠি। পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে যাচাই এবং তার জ্ঞানের পরিমাপ করে সনদ প্রদান করা হয়। এ সনদ তার কর্মজীবনে প্রবেশের চাবিকাঠি।

২। **পরীক্ষায় নকল কী :** শিক্ষার্থী কর্তৃক লেখাপড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন না করে অন্য কোনো উপায়ে উত্তরপত্র ভরাট করার অপচেষ্টাকে নকল বলা হয়ে থাকে।

৩। **পরীক্ষায় দুর্নীতি :** পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করাই পরীক্ষায় দুর্নীতি। বিগত সময়ে বাংলাদেশে পরীক্ষায় যেভাবে নকল প্রসার লাভ করেছিল, তাতে পরীক্ষাকে প্রহসন বললে অত্যুক্তি হতো না। শিক্ষক মহল থেকে শুরু করে অভিভাবকমণ্ডলী, প্রশাসন সবাই এ দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকত। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের নৈতিকতার চরম অবনতি ঘটেছিল।

৪। **পরীক্ষায় নকল প্রবণতার কারণ :** পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকল প্রবণতার বহুবিধ কারণ রয়েছে। যেমন–

ক. আর্থ-সামাজিক অবস্থা : আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় দোষ হলো, তারা যে-কোনো উপায়ে সার্টিফিকেট অর্জন করাকে গৌরবের মনে করে। তারা মনে করে, উৎকোচ বা মামার জোরে চাকরি পেয়ে যাবে।

খ. অভিভাবকদের উদাসীনতা : আমাদের দেশের অভিভাবকরা বাল্যকাল থেকে তাদের সন্তানদের নৈতিক জ্ঞান শিক্ষা দেন না বলে তারা নকলের মতো অসদুপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন না। অভিভাবকদের প্রশ্রয় পেয়ে তারা পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে ওঠে এবং নকলের আশ্রয় নেয়।

গ. শিক্ষকদের কর্তব্যে অবহেলা : প্রাইভেট টিউশনির ব্যাপক প্রচলনের ফলে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে ভালোভাবে পাঠ দান করেন না। প্রাইভেট পড়ার ফলে শিক্ষকদের সাথে সেইসব ছাত্রদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় এবং পরীক্ষার হলেও শিক্ষকের পক্ষে সে ঘনিষ্ঠতা অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। ফলে পরীক্ষার হলে শিক্ষকদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না।

ঘ. ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া : লেখাপড়ায় মনোযোগ না দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ছাত্র-রাজনীতিতে যোগদানের ফলে তাদের পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। যার ফলে তারা পরীক্ষায় নকলের অবলম্বন ছাড়া পরীক্ষা দিতে পারে না।

ঙ. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি :** আমাদের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, অধিকাংশ ছাত্রই পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। যার ফলে, সারাবছর পড়াশোনা না করে তারা পরীক্ষার হলে নকলের আশ্রয় নেয়।

৫। **পরীক্ষায় নকল প্রবণতা দূর করার উপায় :** শিক্ষাঙ্গনকে নকলমুক্ত করতে হলে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে–

ক. ছাত্র-ছাত্রীদের সারাবছর ধরে মাঝে মাঝে পরীক্ষা নিয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত রেখে অশুভ রাজনীতি ও সন্ত্রাসের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে।

খ. অভিভাবকগণকে অবশ্যই আপন সন্তানের পড়াশোনা ও পরীক্ষার ফলাফল ও নীতি-নৈতিকতার বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

গ. শিক্ষকগণকে তাদের দায়িত্ব পালনে আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে।

ঘ. পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে শিক্ষার্থীদের মেধা পরীক্ষার জন্য নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে।

ঙ. সর্বোপরি সরকারকে এ ব্যাপারে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চ. শিক্ষকদের সাথে অভিভাবকদের নিয়মিত যোগাযোগ পদ্ধতি চালু করতে হবে, বিশেষ করে প্রতিটি পরীক্ষার পর।

৬। **পরীক্ষায় নকল প্রবণতার কুফল/ক্ষতিকর দিক :** পরীক্ষায় নকল প্রবণতা আমাদের সমাজে একটি সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দেশের মানুষ যে পরিমাণ শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-গরিমায় উন্নত হচ্ছে, দেশ সেই মানে উন্নত হচ্ছে না। পরীক্ষায় নকলের মাধ্যমে যে ছাত্রটি পাস করল, কোনো বিষয়েই তার থেকে গঠনমূলক কিছু আশা করা যায় না। পরীক্ষায় নকলের সমারোহ শিক্ষার পরিবেশকে করে কলুষিত। এতে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে সদ্ভাব বজায় থাকে না। ফলে ছাত্রদের থেকে উত্তম আচরণ কিংবা আদর্শ আশা করা সুদূরপরাহত। মূলত এ দুর্নীতি ছাত্রদেরকে কর্মজীবনেও দুর্নীতিতে অভ্যস্ত করে তোলে। সমাজে তখন নৈতিকতা বলতে কিছুই থাকে না।

৭। **নকলবিহীন পরীক্ষার গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :** নকলবিহীন পরীক্ষা-পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মান যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম। পরীক্ষায় যদি নকলের কোনো অবকাশ না থাকে তাহলে ছাত্ররা পরীক্ষা পাসের জন্য অধ্যবসায়ে ব্রতী হয়। একজন ছাত্র অধ্যবসায়ে মনোযোগী হলে সে কখনো পরীক্ষায় নকল করতে পারে না। নকলের কলঙ্ক থেকে মুক্ত ছাত্র মাত্রই একজন আদর্শ ছাত্র। আর আদর্শ ছাত্রই সৎ জীবনযাপন করতে সক্ষম। শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ ও নৈতিকতার প্রশ্নটি একাত্ম করে তুললে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হবে নির্মল। শিক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষায় পাসের উপযুক্ত জ্ঞান প্রদান এবং দুর্নীতিযুক্ত পরীক্ষা পদ্ধতিকে কঠোর হস্তে দমন, এক্ষেত্রে অনেকটা সুফল বয়ে আনতে পারে।

৮। **পরীক্ষায় দুর্নীতির পরিণতি :** পরীক্ষায় নকল করে পাশ করা জাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা যে পাশ করে সে তো নিজের ক্ষতি করেই, আবার যারা পড়াশোনা করে তাদের মনোবলও নষ্ট করে। তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এ অবস্থা দীর্ঘদিন চলতে থাকলে জাতি একসময় মেধাশূন্য হয়ে পড়বে। তখন দেশের ধ্বংস অনিবার্য। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে নকলরোধ করতে হবে।

উপসংহার : একমাত্র সৎ ও অধ্যবসায়ী ছাত্ররাই শ্রেষ্ঠ নাগরিক হতে পারে। সততাকে মূলধন করেই ছাত্রদের এগিয়ে যেতে হবে। তাদের উপলব্ধি করতে হবে– পরীক্ষা পাস শুধু ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয়; প্রকৃত শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য।

১৫ শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতা [ফা. প. ২০০৭]

উপস্থাপনা : শিক্ষা একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করার উদ্দেশ্যেই শিক্ষার আবিষ্কার। মানুষকে মানবীয় গুণাবলিতে বিকশিত করার মাধ্যমে পাশবিকতা থেকে মুক্ত রেখে শিক্ষা উন্নত নৈতিকতা, চরিত্র ও মানসিক উন্নয়ন ঘটায়। এ কারণে শিক্ষাকে আলোক এবং মূর্খতাকে অন্ধকার হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষা ও নৈতিকতা একে অন্যের পরিপূরক। উন্নত নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষার অস্তিত্ব অর্থহীন।

শিক্ষার সংজ্ঞা : শিক্ষা হলো এমন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের দেহ, মন, আত্মা ও আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং বিকাশ সাধিত হয়। ইংরেজি Education শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ শিক্ষা। Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Eden এবং Ducer-Duc থেকে এসেছে। এগুলোর উৎপত্তিগত অর্থ হলো যথাক্রমে বের করা, বিকশিত করা, পথপ্রদর্শন করা। এ পর্যন্ত Education বা শিক্ষার যত সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে তার সারকথা হলো প্রবৃদ্ধি দান করা, উন্নত করা, পূর্ণতা আনয়ন করা, জাগিয়ে তোলা, অভ্যাস করানো, উপদেশ দেওয়া, অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত রাখা, সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করা, সম্প্রসারিত করা, পথ প্রদর্শন করা, প্রেরণা দান করা, সন্ধান দান করা, নিয়মানুবর্তী করা, সৌজন্য শেখানো, বিনয়ী ও অমায়িক বানানো, আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বানানো, প্রথাসিদ্ধ করা, মানসিক ও শারীরিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করা, বিবেচনা বোধ ও বিচার-শক্তি বৃদ্ধি করা, উদ্ভাবন করা, গবেষণামুখী করা ইত্যাদি।

শিক্ষা সম্বন্ধে মনীষীদের অভিমত : শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন মনীষী মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে, "মানুষের 'খুদী' বা রূহের উন্নয়ন ঘটানোর প্রক্রিয়ার নামই শিক্ষা।" আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সাইয়েদ মুহাম্মদ কুতুব-এর মতে, "শিক্ষার ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শের কাজ হলো, পরিপূর্ণ মানব সত্তার লালন করে এমনভাবে গড়ে তোলা, যা এমন একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি যে, মানুষ তা দেহ, বুদ্ধিবৃত্তি এবং আত্মা তার বস্তুগত ও আত্মিক জীবন এবং পার্থিব জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের কোনোটিই পরিত্যাগ করে না।"

কতিপয় পশ্চিমা শিক্ষাবিদ উপরিউক্ত সংজ্ঞার সাথে সংগতিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। মহাকবি মিল্টন বলেছেন– Education is the harmonious development of body, mind and soul. অর্থাৎ, দেহ, মন ও আত্মার সমন্বিত উন্নয়ন সাধনই শিক্ষা। Herman H. Horne বলেছেন, "শিক্ষা হচ্ছে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত, মুক্ত, সচেতন মানবসত্তাকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে উন্নত যোগসূত্র রচনা করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া; যেমনটি প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগগত এবং ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধীয় পরিবেশে।" ড. জন পার্ক বলেন, "শিক্ষা হচ্ছে নির্দেশনা ও অধ্যয়ন বা Study-র মাধ্যমে জ্ঞান ও অভ্যাস অর্জন বা প্রদানের কলাকৌশল বা প্রক্রিয়া।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, দৈহিক, বস্তুগত, প্রযুক্তিগত বা ভাষাগত ব্যুৎপত্তি অর্জনের পাশাপাশি একজন মানুষের দেহ, মন, আত্মা ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ও উন্নতির নামই শিক্ষা।

শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতা : একটি রাষ্ট্র বা জাতির শিক্ষাপদ্ধতি, মূলনীতি, লক্ষ্য, ভাষা, কারিকুলাম, সিলেবাস, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন সবকিছু মিলে গড়ে উঠে সে দেশ বা জাতির শিক্ষাব্যবস্থা। যে-কোনো দেশ বা জাতির

বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য, তাহজীব-তমদ্দুন ও জাতীয় প্রয়োজন– এসবই সে দেশ বা জাতির শিক্ষাব্যবস্থার মূলভিত্তি। এসব মূল উপাদানের ভিত্তিতে উক্ত দেশ ও জাতির শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে মানুষের শিক্ষাব্যবস্থায় এমনসব শিক্ষা উপাদান থাকা জরুরি যার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ পবিত্র আত্মা ও চরিত্রবান হিসেবে গড়ে ওঠার দীক্ষা পেতে পারে। এজন্য শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম, নৈতিকতা, আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর ঐশী হেদায়াত– যার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে মানুষ ভালোমন্দ বা হক-বাতিলের জ্ঞানার্জনের সুযোগ পেয়েছে– এসবকিছুর সম্মিলন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রাগৈতিহাসিক যুগের দার্শনিক প্ল্যাটো বলেছেন, "কোনো মানুষ বা জাতির বিশ্বাস বা Commitment এবং তার দেশ পরিচালনার জন্য রচিত সংবিধানই হওয়া উচিত শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি।"

শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিকতার গুরুত্ব :

১। **নৈতিক পরিশুদ্ধিই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য :** শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মানবীয় মূল্যবোধের বিকাশ সাধন ও তার আচরণ থেকে পাশবিক প্রবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করা। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষের নৈতিক চরিত্রকে পাশবিকতামুক্ত, উন্নত ও পবিত্র করা সম্ভব। যুগে যুগে এ উদ্দেশ্যেই নবি-রাসুলগণের আবির্ভাব ঘটেছিল। মহান আল্লাহ বলেন, "তিনিই মহান সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসুল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত পাঠ করে শোনান এবং তাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন অথচ ইতঃপূর্বে তারা সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল।" (সূরা জুমুয়া– ২)

২। **নৈতিকতাবর্জিত শিক্ষা বর্বরতার নামান্তর :** শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে খাঁটি মানুষে পরিণত করা। পাপাচার, শঠতা, প্রতারণা, দুর্বৃত্তপনা, সন্ত্রাস, রাহাজানি, মিথ্যাবাদিতা, পাশবিকতা ইত্যাদি অসৎ গুণাবলি থেকে মানবাত্মাকে পবিত্র রেখে উন্নত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অথচ ধর্মীয় নৈতিকতাবিবর্জিত শিক্ষা বর্বরতার নামান্তর। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ Stanly Hull বলেছেন– If you teach your children the three R's (Reading, Writing and Arithmetic), and leave the fourth 'R' (Religion), you will get a fifth 'R' (Rascality).

৩। **আদর্শহীন শিক্ষা ব্যর্থ শিক্ষাব্যবস্থা :** আদর্শ-বিবর্জিত শিক্ষা একটি ব্যর্থ শিক্ষাব্যবস্থা। যে শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো নৈতিক আদর্শ নেই, মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার চূড়ান্ত লক্ষ্য নেই, তার যত ডিগ্রিই থাকুক, তার শিক্ষা ও জীবন দুটোই ব্যর্থ। M.V.C Jaffreys অভিযোগ করে বলেছেন, "আধুনিক পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এর লক্ষ্যের অনিশ্চয়তা।" তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তাই মানুষকে বস্তুগত লালসা নিবৃত্তির প্রচেষ্টারত হিংস্র একেকজন দানবীয় মানবে রূপান্তর করে।

৪। **নৈতিক আদর্শ-বিবর্জিত শিক্ষার পরিণতি :** শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নৈতিক আদর্শের সংযোগ একান্তই অপরিহার্য। নৈতিক আদর্শ-বিবর্জিত শিক্ষাব্যবস্থায় ভয়াবহ এক দানবীয় পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ ডাকাতদের গ্রাম; ছাত্র নামধারী দানবেরা সেখানে মানুষের সবকিছু লুণ্ঠন আর খুন করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে; মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করে ধর্ষণের সেঞ্চুরি পালন করে। শিক্ষকদেরকে বেধড়ক মারধর করতেও তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না।

আবার কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে হতাশার সৃষ্টি করছে। মহান আল্লাহ মানবরূপী এসব হায়েনাদেরকে পশুর চেয়েও অধম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসবই নৈতিক আদর্শ-বিবর্জিত শিক্ষার স্বাভাবিক পরিণতি।

৫। **নৈতিকতাপূর্ণ সুশিক্ষার সুফল :** অজ্ঞতার অমানিশা থেকে মানব সভ্যতাকে আজকের উন্নতির শীর্ষমার্গে উত্তরণের পথপ্রদর্শক নিঃসন্দেহে শিক্ষা। এক্ষেত্রে শিক্ষার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য তথা মানবতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, কল্যাণ, উন্নত নৈতিক আদর্শ, বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি পরকালীন সাফল্য অর্জন, মূল্যবোধ সৃষ্টি– এসব আদর্শই সক্রিয় থাকে। সভ্যতার বিকাশ, বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও বিভিন্ন আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থার উদ্ভাবন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি এসবই শিক্ষার প্রত্যক্ষ অবদান। বিশ্বের ইতিহাসে যুগে যুগে নৈতিকতার বলে বলীয়ান শত সহস্র নবি-রাসুল এবং বিজ্ঞ ব্যক্তি মানবজাতিকে সভ্য ও সামাজিক হিসেবে গড়ে তুলতে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন।

৬। **সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা :** নৈতিকতাপূর্ণ সুশিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমাদের মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষকতার মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "নৈতিক চরিত্রের পরিপূর্ণতা দানের জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।" হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, এক দীর্ঘ হাদিসে মহানবি (স) বলেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জন কর। কেননা জ্ঞান হচ্ছে অজ্ঞানতা থেকে হৃদয়কে রক্ষা করার উপায়, অন্ধকারে আলো জ্বালানোর প্রদীপ। জ্ঞানের দ্বারাই বান্দা দুনিয়া ও আখেরাতে শ্রেষ্ঠ ও মহৎ লোকদের মর্যাদায় উন্নীত হয়। .... জ্ঞানই কাজের পথপ্রদর্শক। কাজ জ্ঞানকেই অনুসরণ করে। সৌভাগ্যশালীরাই জ্ঞান অর্জন করে আর হতভাগারাই তা থেকে বঞ্চিত হয়।"

উপসংহার : শিক্ষাব্যবস্থা ও নৈতিকতা পরস্পর পরিপূরক শব্দ। আকৃতিগত একজন মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্য অনুসারে প্রকৃত অর্থে মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য নৈতিকতাপূর্ণ ও আদর্শিক শিক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রকৃত মানুষ, সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্য মানুষ, সংস্কৃতিমান বা রুচিশীল মানুষ, সৃষ্টিকর্তার সাথে যোগাযোগ ও তাঁর ইচ্ছা পূরণের যোগ্য মানুষ, শত সহস্র বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত রচনা করার যোগ্য মানুষ তৈরি হয় শুধুমাত্র নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। এ কারণেই মহানবি (স) শিক্ষা অর্জন করাকে প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

১৬ গ্রন্থাগার

অথবা, শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

অথবা, শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

উপস্থাপনা : গ্রন্থাগার হলো গ্রন্থ বা বইয়ের আগার বা বই রাখার স্থান, যেখানে নদীর স্রোতের মতো জ্ঞান থাকে, গ্রন্থ থাকে, বই থাকে। বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে টলস্টয় বলেছেন, Three things are essential for man–they are book, book and book. অর্থাৎ মানুষের জন্য তিনটি বিষয় খুবই প্রয়োজনীয়। আর সেগুলো হচ্ছে– বই, বই এবং বই। সুতরাং বইয়ের আধার লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম।

গ্রন্থাগারের পরিচয় : 'গ্রন্থাগার' শব্দটি সংস্কৃত 'গ্রন্থ' ও 'আগার' শব্দযুগলের সমন্বয়। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Library' যার শাব্দিক অর্থ গ্রন্থ রাখার স্থান। আর পারিভাষিক অর্থে 'গ্রন্থাগার' বলতে এমন একটি স্থানকে বোঝায়, যেখানে জ্ঞানরাজ্যের বহু শাখার বিচিত্র গ্রন্থরাজি সংগৃহীত থাকে। গ্রন্থ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয় সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে। এখানে সুচয়িত বইগুলো পাঠকের হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে। গ্রন্থাগারে পাঠকের জন্য পাঠের অনুকূল ব্যবস্থাও থাকে।

গ্রন্থাগারের ইতিহাস : গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মূলত গ্রন্থের উদ্ভবের সাথে সাথেই গ্রন্থাগারের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের দিকে রোমে গ্রন্থাগারের যাত্রা শুরু হয়। এ ছাড়াও মিসর, গ্রিক, ব্যাবিলন ও চীনের প্রাচীন সভ্যতায় গ্রন্থাগার থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের আবির্ভাবের পর লাইব্রেরিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়। আব্বাসীয় শাসনামলে বাগদাদে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি গড়ে উঠেছিল। প্রাচীনকালে মুদ্রণ যন্ত্রের অভাবে হাতে লেখা গ্রন্থ পঠিত হতো। গ্রন্থের অনুলিপির দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই লাইব্রেরির জন্ম হয়। বর্তমানে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে গ্রন্থবিপ্লব সূচিত হলেও গ্রন্থাগারের গুরুত্ব কমেনি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ হচ্ছে এবং বর্তমানে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা ডাটাবেইজ পদ্ধতিতে করা হচ্ছে। অনেক গ্রন্থের ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে বিধায়, আধুনিক গ্রন্থাগারসমূহে সর্বাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সুবিধা সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের শ্রেণিবিভাগ : লাইব্রেরি বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সংগ্রহশালাকে। এ সংগ্রহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংগঠনিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীনেও হতে পারে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক গ্রন্থাগার সীমিত পরিসরের। কিন্তু সাধারণ বা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার অনেক বড়। আজকাল ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারেরও প্রচলন ঘটেছে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও জ্ঞানচর্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য : জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহাসমুদ্র হলো গ্রন্থাগার। জ্ঞানপিপাসুদের জ্ঞানের চর্চার অন্যতম প্রিয় স্থান এটি। লাইব্রেরিতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য খোরাক, আছে দুরূহ জিজ্ঞাসার উত্তর। জ্ঞানের ক্ষুধা নিবৃত্তির বিপুল আয়োজন কেবল গ্রন্থাগারেই লাভ করা যায়। বিশ্বের মানুষের অফুরন্ত ভাবরাশি অবলম্বনে রচিত হয়েছে অসংখ্য গ্রন্থ। যেসব গ্রন্থ কোনো মানুষের একার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় গ্রন্থাগার সে প্রয়োজন সাধন করে এবং বহু মানুষের যৌথ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। সেখানে অসংখ্য মানুষের প্রয়াসে সংগৃহীত গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পায় নানা বয়সের, নানা রুচির মানুষ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, "মহাসমুদ্রের শত বছরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত, যেন সে ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত। তবে সেই নীরব মহাশব্দের সাথে এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এইখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে। মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া আছে।"

বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগারসমূহ : আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন কর্তৃক বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমা' নামক গ্রন্থাগারের নাম আজও অবিস্মরণীয়। বর্তমান বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থাগারসমূহের অন্যতম হচ্ছে–

মাকতাবাতুল আযহার – মিসর।
ন্যাশনাল ডিন লাইব্রেরি – জাপান।
লেনিন স্টেট লাইব্রেরি – মস্কো।

বিবলিওটিক ন্যাশনাল	–	প্যারিস।
ব্রিটিশ মিউজিয়াম	–	বৃটেন।
নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি	–	নিউইয়র্ক।
রয়্যাল লাইব্রেরি	–	স্টকহোম।

বাংলাদেশের প্রধান লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে রয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গণপাঠাগার ইত্যাদি।

শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা : গ্রন্থাগারের অপর নাম হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অতীত জাতিসমূহের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য সার্বিক কর্মকাণ্ড গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই যুগ থেকে যুগান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। যে-কোনো ধরনের শিক্ষায় গ্রন্থপাঠ অপরিহার্য। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ হয় গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক পাঠাভ্যাসে। উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার কাজে গ্রন্থাগারই হয়ে ওঠে প্রধান সহায়ক। পাঠ্যক্রমভিত্তিক কিংবা পাঠ্যক্রমবহির্ভূত বিদ্যাচর্চা উভয় ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার ব্যবহার অত্যন্ত উপযোগী। গ্রন্থাগারের গ্রন্থরাজি স্বশিক্ষিত হওয়ার সাধনাকে সহায়তা করে। বিশ্বের সকল কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ঐতিহাসিকের সৃষ্টির সাথে আজকের মানুষের পরিচয় করিয়ে দেয় গ্রন্থাগার। তাদের অসামান্য সৃষ্টিতে অবগাহন করে পাঠকসমাজ লাভ করে অপরিমেয় আনন্দ। গ্রন্থাগার কৌতূহলী ও জ্ঞানপিপাসু পাঠককে আত্মিক তৃপ্তি দান করে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বলেন, "গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হাসপাতালের চেয়ে বেশি। কারণ হাসপাতালে কেবল দেহের চিকিৎসা হয়, আর গ্রন্থাগার মানুষের সুস্থ মন গড়ে তোলে।" এভাবে গ্রন্থাগার শিক্ষিত, মার্জিত, উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

জ্ঞানের সর্বাধুনিক প্রতিষ্ঠান : প্রতিনিয়ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিধি বাড়ছে, বাড়ছে গ্রন্থ, পত্রিকা প্রভৃতি। শিক্ষার্থীদের সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত ও বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সম্পৃক্ত হতে হলে পড়তে হয় সর্বাধুনিক বইপত্র, সাময়িকী ও জার্নাল। ব্যক্তিগতভাবে সকলের পক্ষে সকল প্রকার বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে পড়া অসম্ভব। তাছাড়া শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স বই দুষ্প্রাপ্য। প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক লাইব্রেরিগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা সহজেই কাঙ্ক্ষিত বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করে শিক্ষাজীবনকে সফল করে তুলতে পারে। লাইব্রেরিগুলো সর্বাধুনিক ম্যাগাজিন-সাময়িকী, পত্রিকা, বই এবং ইন্টারনেটের সংযোগে জ্ঞানসমুদ্রের সকল শাখার সর্বশেষ তথ্য পেতে সহায়তা করে।

উপসংহার : গ্রন্থাগার অতীত জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক হিসেবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্ঞানের প্রজ্জ্বলিত শিখায় সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করে। অতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যোগসূত্র স্থাপন করে জ্ঞানের সকল শাখাকে বিকশিত করে। যে জাতির গ্রন্থাগার যত উন্নত ও সমৃদ্ধ, বিশ্বের বুকে সে জাতি তত উন্নত ও সমৃদ্ধ। তাই আলোকিত সমাজ ও জাতি গঠনে চাই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা এবং জ্ঞানের চর্চা।

১৭ বাংলাদেশের লোকসাহিত্য

[ফা. প. ১৯৯৭]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের নিভৃত পল্লির আনাচে-কানাচে কৃষক, ফকির, বাউল মাঝি প্রভৃতি অসংখ্য মানুষ শিক্ষিত সমাজের পর্দার পেছনে থেকে যে মূল্যবান সাহিত্য-সম্পদ সৃষ্টি করে গেছেন তা নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের লোকসাহিত্য। শ্যামল বনানীর অসংখ্য পাখির

কল-কাকলিতে, খোলা আকাশের নিচে দিগন্তপ্রসারী সবুজ মাঠের উদাস হাওয়ায়, ধানের সবুজ পাতার ছন্দময় আন্দোলনে সরল পল্লিবাসীর মনে ভাবের যে লীলা চলছে, তাতেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য গীতিকবিতা, কিসসা কাহিনি, পুঁথিপত্র, ছড়া, হেঁয়ালি, মারফতি, ভাটিয়ালি, জারি প্রভৃতি সাহিত্যের অগণিত নিদর্শন।

লোকসাহিত্যের পরিচয় : ইংরেজি Folk-Lore কথাটির অনুবাদ বা প্রতিশব্দ হিসেবে লোকসাহিত্য, লোকবিজ্ঞান, লোককাহিনি ব্যবহার করা হয়। ফোকলোর বলতে জনসাধারণের মুখে প্রচলিত গাথাকাহিনি, গান, ছড়া, বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবাদ ইত্যাদি বোঝানো হয়। সাধারণত কোনো সম্প্রদায় বা জনগোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্যই হলো আমাদের বাংলাদেশের লোকসাহিত্য।

লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু : লোকসাহিত্যের বিষয়বস্তু সমাজের পরিবেশ থেকে গৃহীত হয়। সমসাময়িক নয়, বহুদিন পূর্বের কোনো ঘটনা বা কাহিনি লোক পরম্পরায় কল্পনা-রূপক মিশ্রিত হয়ে লোকসাহিত্যে স্থান পায়। মানবজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা কোনো কাহিনি, গান, ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির আশ্রয়ে মৌলিক আকৃতি ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে থাকে।

বাংলা লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য : বাংলাদেশের লোকসাহিত্যের ঐতিহ্য হাজার বছরের। বাংলা ভাষা সৃষ্টির প্রাথমিক যুগের মানবজাতি মুখে মুখে সাহিত্য রচনা করতো। প্রেম-বিরহ থেকে আরম্ভ করে সকল কল্পকাহিনি তাদের রচনায় স্থান পেত। লোক সাহিত্য সাধারণত কোনো ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়, তা সংহত সমাজের সামাজিক সৃষ্টি।

হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ : বাস্তবতার নিষ্ঠুর যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে কল্পনাবিলাসী মানুষ যখন তার কল্পনাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখনই লোকসাহিত্য তার সামনে কল্পনার রহস্য নিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে ধ্বনিত হয় তাদের প্রাণের কথা, মনোব্যথা, ঘাটের কথা, মাঠের কথাসহ আরও কত কথা। এতে আছে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের বহিঃপ্রকাশ এবং এক অকৃত্রিম দুর্লভ সৌন্দর্যের ফল্গুধারা।

লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : লোকসাহিত্যে অসংখ্য অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা–

ক. লোকসাহিত্য সাধারণ মানুষের অলিখিত বোধের উন্মেষ।

খ. লোকসাহিত্যের প্রকাশ সংক্ষিপ্ত ও অনেকটা অগোছালো।

গ. লোকসাহিত্য জনশ্রুতির ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়।

ঘ. সমাজের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে লোকসাহিত্যে।

ঙ. অলিখিত সাহিত্যমাত্রই লোকসাহিত্য।

চ. এর বিষয়বস্তু সমাজ ও জীবনগাথা দর্পণের বহিঃপ্রকাশ।

ছ. লোকসাহিত্যের রচনাকালের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ থাকে না।

লোকসাহিত্যের গুরুত্ব : লোকসাহিত্য মানব-সংস্কৃতির অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির বিকাশে লোকসাহিত্যের অবদান প্রচুর। এর মধ্যে আছে নিরাভরণ আনন্দের প্রস্রবণ। গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে এ সাহিত্য প্রাণোচ্ছল। এ সাহিত্য থেকে লাভ করা যায় সত্যিকার জাতীয় ইতিহাস।

লোকসাহিত্যের প্রকারভেদ : লোক সাহিত্যে শ্রেণি বিভাগ করলে লক্ষ করা যাবে যে, এর বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়ের প্রেক্ষিতে নানা ধরনের শ্রেণি-বিভাগ হতে পারে। লোক সাহিত্যের বৈচিত্র্যপূর্ণ নির্দশন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় শ্রেণি বিভক্ত। সেগুলো হচ্ছে– ছড়া, গান, গীতিকা, কথা, ধাঁধাঁ, প্রবাদ ইত্যাদি।

ক. **গীতিকা :** ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ময়নামতির গান, গোপীচাঁদের গান, মহুয়া প্রভৃতি লোকগাথা পল্লিজননীর ক্রোড়ে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। এগুলো আমাদের সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাপন প্রণালি, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কাহিনি খুব সহজ-সরল ভাষায় ভাবের গভীরতা নিয়ে রূপায়িত হয়েছে।

খ. **বিয়ের গীত :** বিয়ের গীত লোকসাহিত্যের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিয়ের পর মেয়ে বাবা-মাকে ছেড়ে যায়– হৃদয়ে তার সীমাহীন বেদনা। মেয়ের বিদায়ে বাবা-মার মন বেদনায় ভেঙে খান খান হয়ে যায়। এসব বিরহ-বেদনার চিত্র খুব সুন্দরভাবে কবিরা তাদের সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ. **পালা গান :** বাংলার পল্লির প্রত্যন্ত অঞ্চল কিংবা গ্রাম্য জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা-বেদনা ইত্যাদির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে পালাগান। এটি লোকসাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে।

ঘ. **ডাক ও খনার বচন :** ডাক ও খনার বচন এদেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিধিলিপি। গ্রাম-বাংলার জীবনপ্রণালির বাস্তব রূপ ও এদেশের আবহমান সংস্কৃতির ছাপ এতে সুস্পষ্ট। যেমন–

ষোলো চাষে মুলা
তার অর্ধেক তুলা
তার অর্ধেক ধান
বিনা চাষে পান।

ঙ. **ব্রতকথা :** ব্রতকথা বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ অংশ। যে-কোনো উপলক্ষকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দু পরিবারের মেয়েরা একটা না একটা ব্রত উদযাপন করতো। বাংলাদেশে বিচিত্রধর্মী ব্রতকথার প্রচলন ছিল। যেমন– মঙ্গলচণ্ডী, শুভাচণ্ডী, সাচিরব্রত, গোকুলব্রত, কার্তিকব্রত ইত্যাদি।

চ. **গান :** ভাটিয়ালি গানের পরিধি বেশ ব্যাপক। মাঝি নৌকা বেয়ে চলে অজানার পথে, কৃষক চাষ করে তার ফসলের জমি, তাদের কণ্ঠে ফুটে ওঠে ভাটিয়ালির উদাস করা সুরলহরি–

খেতে খেতে সোনার ফসল শীতল হাওয়া বয়
গাঁও গেরামের কত মানুষ কেহ আপন নয়।

ছ. **পল্লিগীতি :** পল্লিগীতির বিরাট অংশ জুড়ে আছে মারফতি-মুর্শিদি গান। বাউল কবিরা সাধনা করে যে সত্য উদঘাটন করেছেন তার করুণ সুরের আবেগে সবার মন অভিভূত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান–

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

জ. **ছড়া :** বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে ছড়া একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবনের রীতিনীতিই সাধারণত ছড়ার উপজীব্য। ইতিহাসের স্মৃতিও এতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যেমন–

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

ঝ. **পুঁথিসাহিত্য :** পুঁথিসাহিত্য লোকসাহিত্যের এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। 'জঙ্গনামা, 'কারবালা কাহিনি', 'সোনাভানের পুঁথি' ইত্যাদি বাংলাদেশের পল্লিমানুষের

কাছে যুগ যুগ ধরে সমাদৃত হয়ে এসেছে। যেমন–

অতি বড় ঘরনি না পায় ঘর
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

উপসংহার : এসব বিচিত্র নিদর্শন নিয়েই বাংলাদেশের লোকসাহিত্য গঠিত। যুগের পরিবর্তন সত্ত্বেও আজও এসব অম্লান হয়ে আছে। শিক্ষিত লোকের সমাদর থেকে এগুলো এতদিন বঞ্চিত থাকলেও আজ বিশ্বের দৃষ্টি এসবের ওপর পড়েছে। তাই লোকসাহিত্যের মূল্যায়নের জন্য এর সংগ্রহ এবং সংকলনের কাজ চলছে।

১৮ বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প

অথবা, বাংলা ছোটগল্পের বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্য

উপস্থাপনা : বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ শিল্প প্রকরণ হলো ছোটগল্প। জীবনের বিচিত্র বিপুল ঘটনাপুঞ্জ থেকে একটি বিশেষ খণ্ড মুহূর্ত তুলে এনে তাকে শিল্প নৈপুণ্যে গভীর তাৎপর্যময় করে তোলাই ছোটগল্পের মৌল ধর্ম। সংক্ষিপ্ততা, একমুখিতাই ছোটগল্পের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তার মধ্যে একটি গভীর ভাবব্যঞ্জনা আভাসিত করাও ছোটগল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের পরিচয়, সীমার মধ্যে অসীমের ইঙ্গিত, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর দর্শনই সার্থক ছোটগল্পের আদর্শ। বাংলা সাহিত্যে এ শিল্পরীতিটি নবাগত। স্বল্প সময়ের মধ্যে এর বিস্ময়কর সমৃদ্ধি বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটগল্পের পূর্বকথা : প্রকৃত প্রস্তাবে গল্প বলা ও শোনা হচ্ছে মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। হিংস্র পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ যখন পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, তখন নিশ্চয় তারা ভয়সঙ্কুল অপেক্ষাকালকে ধরে রেখেছিল গল্পে। আর তাই ছোটগল্পের জন্মলক্ষণও আলাদা। রেনেসাঁর ভেতর দিয়ে মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক ও কল্পিত স্বর্গ থেকে মানুষ ফিরে এল মর্ত্যলোকে। এ বাস্তব বিশ্বের উজ্জীবিত ব্যক্তিত্বের বহু পল্লবিত ধারার একটি ও অন্যতম হচ্ছে ছোটগল্পের শিল্পরূপ। ছোটগল্প শুধু গল্প নয়, গল্পের রেখাচিত্রে জীবনের কোনো ফলবান খণ্ড মুহূর্তের রূপায়ণ ও সেই তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসার অব্যর্থ সংযোজন।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা : সাহিত্যের কোনো বিষয় সম্পর্কে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা এক দুঃসাধ্য কাজ। কারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভা কোনো গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দিতে অনিচ্ছুক, প্রথাসিদ্ধতা প্রতিভার বিপরীত ধর্ম।

ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও কথাশিল্পী বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। যেমন–

১। আমেরিকান সাহিত্যিক এডগ্যার এলান পো বলেছেন, "যে গল্প এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করা যায়, তাকে ছোটগল্প বলে।"

২। শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, "একটি ক্ষুদ্র আখ্যানে সমগ্র জীবনের সমগ্র তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ছোটগল্পের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা।"

৩। প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বলেছেন– "আকৃতিতে ছোট হলেই তা ছোটগল্প হবে না। তাকে আকারে ছোট হতে হবে এবং গল্প হতে হবে।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ছোটগল্প : 'সোনার তরী' হলো রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্যতম একটি কাব্যগ্রন্থ। এ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতায় তিনি ছোটগল্পের সংজ্ঞা

দিয়েছেন এভাবে–

ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল।
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হইয়াও হইল না শেষ।

ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য : আমেরিকার প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এডগ্যার এলান পো-এর মতে, "ছোটগল্প শুধু কাঠামোসর্বস্ব নয়, এটি একটি সামাজিক ও ঐক্যবদ্ধ রূপ।" ছোটগল্প সাহিত্যের এমন একটি শাখা রচনা, যার মধ্যে জীবন আছে, জীবনের উপলব্ধি আছে, আছে জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতও; কিন্তু জীবনের বিস্তৃতি নেই। আকারে ছোট বলে অনেক পাত্রপাত্রীর ভিড় ছোটগল্পে থাকে না। এতে লেখক অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক ভাষা, অনাবশ্যক চরিত্র ও ঘটনা প্রভৃতিকে বর্জন করে শুধুমাত্র একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্তের বাস্তবরূপ দান করেন। এতে জীবনের কোনো এক মুহূর্তের আনন্দ-বেদনা রূপলাভ করে। আমাদের বাংলাদেশে ছোটগল্পের ইতিহাস দীর্ঘ নয়। দীর্ঘ না হলেও তা যথেষ্ট প্রসারলাভ করেছে। জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি স্থান পেয়েছে এ দেশের ছোটগল্পে। তাই সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের ছোটগল্পকে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ বলা যায়।

বাংলাদেশে ছোটগল্প ও গল্পকার : সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প হলো 'মধুমতী'। তারপরও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পকার। রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শেই ছোটগল্পের যেন ঘুম ভাঙল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো কাব্যসাহিত্য এবং কথা সাহিত্য উভয় দিকেই উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশের ছোটগল্পের লেখকগণ প্রায় সকলেই একাধারে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। তাদের মধ্যে আবুল মনসুর আহমদ, মবিন উদ্দীন আহমদ, আবু রুশদ, মতিন উদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শাহেদ আলী, শহীদ আখন্দ, শওকত আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, হাসান আজিজুল হক, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, রাহাত খান, আবু ইসহাক, মিন্নাত আলী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পকার।

আবুল মনসুর আহমদ বিভাগপূর্বকাল থেকেই ব্যঙ্গ গল্প রচয়িতা হিসেবে সুবিখ্যাত। সামাজিক অসঙ্গতি ও রাজনৈতিক ভণ্ডামি তার গল্পে তীব্রভাবে ফুটে ওঠেছে। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের একজন হলো সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। অপূর্ব কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন। তার গল্পের ব্যঞ্জনা ও শিল্পজিজ্ঞাসা গভীর। 'নয়ন চারা', 'দুই তীর' তার দুটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। কথাশিল্পী হিসেবে শওকত ওসমান অন্যতম। তার প্রতিটি গল্পেই অপূর্ব রসানুভূতি, ধারালো বক্তব্য, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং দরদি মনের পরিচয় মেলে। ফলে সামাজিক গলদ ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিত্র সুন্দররূপ লাভ করেছে তার গল্পে। তার 'জুনু আপা', 'সাবেক কাহিনি' 'ডিগ বাজী' সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। সরদার জয়েনউদ্দীন একজন সমাজ সচেতন গল্পকার। তিনি তার অনেক গল্পে সাধারণ গ্রামীণ চিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'নয়ান ঢুলি', 'খরস্রোতা', তার উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ।

আলাউদ্দিন আল আজাদ উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পেই বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। 'জেগে আছি', 'ধনী কন্যা', 'মৃগনাভি', 'অন্ধকার সিঁড়ি', 'ভজান তরঙ্গ', 'যখন সৈকত' তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। হাসান আজিজুল হকের 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ', জহির রায়হানের 'সূর্যগ্রহণ' প্রভৃতি সার্থক ছোটগল্প। এভাবে দেখা যায়, বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে সমৃদ্ধ ও উন্নত।

আধুনিককালের বাংলা ছোটগল্প : আধুনিককাল থেকে উত্তর আধুনিককালে উত্তরণ পর্বে বাংলা ছোটগল্প তার প্রচলিত পথ পরিত্যাগ করেছে। গল্পের ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকে এসেছে আমূল পরিবর্তন। বনফুলের অনুসরণে অনুগল্পের ধারাটি আজ বিস্ময়করভাবে সফল হয়েছে। পরাবাস্তববাদ, মনোবিকলন ও বিকৃতি ভাবনা ছোটগল্পকে নিয়ে গেছে এক ভিন্ন মাত্রায়। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লিটলম্যাগকে আশ্রয় করে ছোটগল্প নিয়ে নতুনত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। প্রথাবিরোধী এসব লিটলম্যাগপন্থি লেখক প্রথাকে অতিক্রম করে চলছে নবতর জীবন পথে। অতি আধুনিককালের গল্পকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মাহমুদুল হক, শামীম কবির, খন্দকার আশরাফ হোসেন, হুমায়ুন মানিক, মাসুদুল হক, মোস্তফা কামাল, জিয়া জামান, মহফিল হক প্রমুখ।

উপসংহার : বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের ক্ষেত্র আবিষ্কার করলে দেখা যায় যে, সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্প বয়সে অনেক ছোট হলেও অল্পসময়ের মধ্যে এর অতুলনীয় সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য ঘটেছে। বাংলাদেশের লেখকগণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গল্প লিখতে আরম্ভ করেছে। তাদের প্রায় সবাই বাস্তববাদী এবং সমাজ সচেতন। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও অনেকে ছোটগল্প লিখেছেন এবং তারা সফলও হয়েছেন। অদূর ভবিষ্যতে ছোটগল্প আরও বিকাশলাভ করবে এবং আরও জনপ্রিয় হবে।

১৯ মানবকল্যাণে সাহিত্যের অবদান [ফা. প. ১৯৯৬, '০৩]

উপস্থাপনা : সাহিত্য কথাটি ব্যাপক। সাহিত্যের রস-সৌন্দর্য আমরা উপভোগ করি বটে, কিন্তু তার স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্দেশ করা তত সহজ নয়। একদিকে গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা, প্রভৃতি যেমন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি জ্ঞান এবং বিচিত্র অনুভূতির ভাষাশ্রিত চিত্রই আমাদের কাছে সাহিত্য নামে পরিচিত। মানবকল্যাণেই এসব শিল্পকলার উৎপত্তি।

সাহিত্যের সংজ্ঞা : চিন্তাধারা ও কল্পনার সুবিন্যস্ত ও সুপরিকল্পিত লিখিত রূপ হচ্ছে সাহিত্য। সৃষ্টিধর্মী রচনাই সাহিত্য। ব্যাপক অর্থে যাকে কাব্য বলা হয়। পদ্যে রচনা না হলেও যে সকল রচনায় আমরা কল্পনীয় কিছু গড়ে উঠতে দেখি, যা বিশেষভাবে অনুভূতি সাপেক্ষ, যা আমাদের চিত্তে অন্য একপ্রকার গুরুগম্ভীর আনন্দময় অনুভূতির স্বীকৃতি জাগায়, তা-ই সাহিত্য। সাহিত্য হচ্ছে মানবজীবনের দর্পণ।

সাহিত্যে মানবকল্যাণ : আধুনিক যুগে মানুষ শুধু সাহিত্যের রস গ্রহণ করেই পরিতৃপ্ত নয়; বরং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজের হিতসাধন করতে প্রয়াসী। সুতরাং পাঠককে কেবল আনন্দ দেওয়াই নয়; বরং সভ্যতার পথে সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার গুরুদায়িত্বও সাধারণভাবে সাহিত্যিকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব ব্যক্তির কল্যাণসাধন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, তা পাঠ করা ক্ষতিকর। কেননা জাতি গঠনে সাহিত্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক : সমাজ ও সাহিত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজের মানুষের রীতিনীতি ও সংস্কার নিয়েই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যে বস্তুর নিবিড় ছোঁয়া না লাগলে তা

পূর্ণ সাহিত্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। মানুষের সুকুমার বৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভূতি বস্তুসত্তার স্পর্শেই সাহিত্যের প্রাণসত্তা লাভ করে। তাই সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক সুনিবিড়।

সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রকাশ : বর্তমান যুগে যা আমাদের যথার্থ আনন্দ দেয় তাই সুন্দর। যেখানে সুন্দরের ছোঁয়া বিদ্যমান সেখানেই রয়েছে মানুষের উৎকর্ষ। সাহিত্যের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে আনন্দদানের মাধ্যমে জীবন ও জগতের গভীরতম রসোপলব্ধি তুলে ধরা।

জীবনের প্রতিফলন : সাহিত্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ইত্যাদির সকল দিক প্রতিফলিত হয়। সাহিত্যে মানবজীবনের সুষ্ঠু-সুন্দর রূপ গঠনের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান। মানুষ তার জীবনপথের পাথেয় লাভ করে সাহিত্য থেকে। জাতীয় জীবনের আদর্শ যেমন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনি জাতীয় জীবনের দিশারি হলো সাহিত্য।

সাহিত্যচর্চা : সাহিত্যকে কেবল মানবকল্যাণের উপায় বলে মনে করলে সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপ অস্বীকার করা হয়। মূলত সাহিত্য থেকে সংস্কৃতিসম্পন্ন জনগণ কল্যাণ লাভ করে। যদিও প্রত্যক্ষভাবে কোনো সামাজিক, নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় শিক্ষাদান বা মতবাদ প্রচার করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, তথাপি সাহিত্যের ভেতর এমন এক সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি লুক্কায়িত, যার কল্যাণে মানুষের এ শিক্ষাগুলো পূর্ণতা লাভ করে। তাই সাহিত্য সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক নিবিড় ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করে, পরম মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করে পরম কল্যাণ সাধন করে।

সাহিত্যের প্রভাব : মানবসমাজের ওপর সাহিত্যের প্রভাব অনেক বেশি। যুগে যুগে বহু সাহিত্য মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে সাহায্য করেছে। কবি-সাহিত্যিকদের জ্বালাময়ী লেখনীর প্রভাবে অনেক বিপ্লব সাধিত করে সাহিত্য মানুষের সীমাহীন কল্যাণ সাধন করেছে। মানুষ নিজেকে চিরজীবী করার জন্য যুগ ও কালের শত রূপান্তরের বাধা অতিক্রম করে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকতে প্রয়াসী।

সৃজন ও মননশীলতা : চিরশাশ্বত সৌন্দর্য ও সত্যের পূজারী সৃজনশীলতা ও মননশীলতা একমাত্র সাহিত্যে প্রতিভাত হয়।

ভাবের বিকাশ : মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটাতে হলে প্রথমে বোধের উন্মেষ ঘটাতে হবে। সাহিত্যই পারে মানবতার হৃদয়ে বোধের উন্মেষ ঘটাতে। যথার্থ সাহিত্য ছাড়া এর স্বরূপ উন্মোচন হয় না। এজন্য ভালো সাহিত্য মানব হৃদয়কে পারে অনাবিল শান্তি দিতে এবং মহাকল্যাণের দ্বার উন্মোচিত করতে।

উপসংহার : মানবকল্যাণেই সাহিত্যের উৎপত্তি। বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যাবে, যুগে যুগে এই সাহিত্য মানুষের কল্যাণে কাজ করেছে। তাই বাংলা সাহিত্য বাঙালির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সার্থক প্রতিফলন। মানব জাতিকে আনন্দের মধ্য দিয়ে সমাজের সাথে একান্তভাবে পরিচালিত করার পথে সাহিত্যই যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

২০ বই পড়ার আনন্দ [ফা. প. ২০১৫]

অথবা, গ্রন্থ পাঠের আনন্দ

অথবা, আনন্দের জন্য পাঠ

উপস্থাপনা : সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে আসছে। এজন্যই মানুষ সামাজিক জীব। সে প্রতিনিয়ত অন্যের সঙ্গ ও সান্নিধ্য কামনা করে আসছে। মানুষের সঙ্গলাভের এ প্রবৃত্তি কেবল মানুষকে কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। যুগ যুগ ধরে সে গ্রন্থের সঙ্গও কামনা করে আসছে। কেননা মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি

নিজের বুকে নিয়ে অনাগত পাঠকের জন্য চির অপেক্ষমাণ হয়ে আছে বই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের জ্ঞানভান্ডার আজ মহাসমুদ্র হয়ে স্বল্পায়ু মানুষের জ্ঞান-পিপাসা মেটানোর অপেক্ষায় আছে বইয়ের রূপ ধারণ করে। জ্ঞানের মহাসমুদ্রের কল্লোল শোনা যায় বইয়ের পাতায়। মানুষ তার আত্মার আত্মীয়ের তথা বিশ্ব মানবের সাহচর্য ও সঙ্গলাভ করে গ্রন্থের মাধ্যমে। অনাদিকাল থেকেই গ্রন্থ পাঠে মানুষ অনাবিল শান্তি লাভ করে আসছে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।...../বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারই এক কোণ।/সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত আছে যাহে/অক্ষয় উৎসাহে–'

বইপড়ার উপকারিতা : মানুষের জ্ঞান বিকাশের ক্ষেত্রে বইয়ের অবদান ব্যাপক। এজন্য বলা হয়, বই জ্ঞানের আধার। গ্রন্থ পাঠে মানুষের মনে আসে আনন্দ-বেদনার কাব্যিক দার্শনিক সভ্যবোধ। গ্রন্থ পাঠের প্রভাবেই মানবজীবন সুন্দর ও নিখুঁত থাকে। গ্রন্থ পাঠই আমাদের মনে এনে দেয় নতি, সহানুভূতি, মায়া-মমতা ও প্রেম-প্রীতি। যুগে যুগে গ্রন্থ দিয়েছে ত্যাগের দীক্ষা, শিখিয়েছে সত্য ও সুন্দরের সাধনা। ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করে মানুষ মেটাচ্ছে তার মনের ক্ষুধা। গ্রন্থ পাঠ মানুষের দৃষ্টিকে করে উদার, মনকে করে উন্নত। দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ, হতাশা-অবসাদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীতে গ্রন্থ পাঠেই মানুষ আনন্দ লাভ করতে পারে। তাই বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তলস্তয় বলেছেন– *'Three things are essential for life & these are books, books & books.'*

বই পড়ার আনন্দ : বই যেমন মানুষকে জ্ঞান দান করে, তেমনি আনন্দও দেয় প্রচুর। ভিনসেন্ট স্টারেট বলেছেন, *'When we buy a book we buy pleasure.'* মানুষের আনন্দ লাভের পথ বহু বিচিত্র। গ্রন্থ পাঠ আনন্দ লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। এটা আমাদের নানাভাবে আনন্দ দান করে থাকে। এটি কর্মক্লান্ত দিনের ব্যস্ততা ও হানাহানির মধ্যে ক্লিষ্ট–পীড়িত চিত্তের ক্লান্তি দূর করে এনে দেয় অনাবিল প্রশান্তি। এটা মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে কাজ করে। জীবনের নানাবিধ অভিঘাত আমাদের যখন অবসন্ন করে তোলে তখন আমরা সান্ত্বনা, সহানুভূতি ও আনন্দের জন্য ছুটে চলি গ্রন্থাগারের দিকে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ যখন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, হতাশার চোরাবালিতে ডুবে যায়, তখন এই চোরাবালি থেকে মুক্তি দিতে পারে একটি ভালো বই। এ প্রসঙ্গে মনীষী বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা এ ড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে মনের ভেতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেওয়া এবং বিপদকালে তার ভেতর ডুব দেওয়া, যে যত বেশি ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভবযন্ত্রণা এড়ানোর ক্ষমতা তার ততই বেশি হয়।" আর গ্রন্থ পাঠই সেই ভুবন সৃষ্টিতে সর্বাধিক সাহায্য করে থাকে। মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলো চায় সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের আলো। আর বই সে আলোর পথ দেখায়, সত্যের পথ দেখায়। বলে দেয় নিজেকে বিশুদ্ধ করে গড়ে তোল; বলে দেয় জীবনের যত দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বেদনা, ব্যর্থতা সবই তাদের জন্য যারা জ্ঞানহীন।

ভালো বই নির্বাচন : বইয়ের পাঠকের জন্য ভালো বই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় মানুষের ধ্যান-ধারণার যে প্রতিফলন ঘটেছে তা স্থান পেয়েছে বইয়ের পাতায়। জগৎ ও জীবনের সান্নিধ্যে মানুষ যে বিপুল জ্ঞানার্জন করেছে তা বিধৃত হয়েছে বইয়ের কালো অক্ষরের মাধ্যমে। মানুষ তার জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পাবে বই থেকে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মানুষকে আনন্দ ও প্রকৃত সুখ দান করে বলে পাঠককে অবশ্যই উপযোগী বই নির্বাচন করে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর

উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য : "আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিস বাজারে চলছে। শুনি তার কাটতিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দান্ত ইচ্ছাকে রক্তমাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহমানে শয়তানে যে তফাত, আঙুরে ও শরাবে যে তফাত, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাত, আসল সাহিত্যে ও এই সকল সাহিত্যে সেই তফাত। হায়! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরির সুরের ন্যায় এই অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মতো নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে। সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসঞ্জীবনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়। এর চেয়ে ভয়ানক ভয়ানক জিনিস– একেবারে সাক্ষাৎ বিষ– নানা মনোহর নামে ও রূপে কাটতি হচ্ছে। পরখ করলেই অনায়াসে দেখা যাবে সেগুলোর ভেতর আছে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত করে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে।"

সভ্যতার বিকাশে বই : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে। গ্রন্থের সাহচর্যেই মানুষ অগ্রসর হয়ে চলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম-অগ্রযাত্রার পথে। আমাদের বৃহত্তর জীবনের যাত্রাপথের সবচেয়ে বড় সঙ্গী বরেণ্য মনীষীদের লেখা মূল্যবান বই। এসব বই পড়েই আমরা পরিচিত হতে পারি তাঁদের সঙ্গে। পরিচিত হতে পারি তাঁদের মহৎ চিন্তা-চেতনা ও মহৎ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে।

বই বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ মাধ্যম : গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারি। সমগ্র বিশ্বকে জানতে হলে গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। গ্রন্থপাঠের মাধ্যমেই আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও সাহিত্য সাধনার নীরব সাক্ষী বিশ্বের অজস্র গ্রন্থ। উন্নত ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সঙ্গে রাখীবন্ধন স্থাপন করে গ্রন্থপাঠ। এটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু গড়ে তোলে। অতীতের ঐতিহ্য, নানা অসৎ চিন্তার অনুশীলন ও বিচিত্র ভাবধারা নিহিত রয়েছে গ্রন্থরাজিতে। তাই বিচিত্র জাতি, দেশ ও সমাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য গ্রন্থের সাহায্য ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পাঠকচিত্তে গ্রন্থপাঠের প্রভাব : গ্রন্থ প্রভাব পাঠকচিত্তে একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে। মহাকবি গ্যাটে পাঠের মাধ্যমেই আনন্দ খুঁজে পেতেন। বিখ্যাত ফকীহ ইমাম জাহিজের বই পড়ার প্রতি এমন নেশা ছিল যে, ঘরের ছাদ পর্যন্ত বইয়ে ঠাসা ছিল এবং একসময় তিনি বইয়ের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। পারস্যের কবি ওমর খৈয়াম নিভৃতে বৃক্ষতলে স্বর্গ রচনার জন্য উপকরণের যে তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, তাতে একখানি কাব্যেরও স্থান ছিল। তাঁর মতে, গ্রন্থ ছাড়া স্বর্গীয় আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। তিনি বলেছেন–

"রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কাল চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে; কিন্তু একখানা বই অনন্তযৌবনা যদি তেমন বই হয়।"

সাহিত্য পাঠে মনীষীর উক্তি : সংসারের দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা, অবসাদ মানুষের মনকে যখন বিষিয়ে তোলে তখন গ্রন্থ পাঠই হয়ে ওঠে শান্তির উৎস। কোনো একজন মনীষী বলেছেন, 'সাহিত্য অমৃতায়মান শান্তির উৎস। শক্তির কল্পফলের রস।' তাই, এ চির আধি-ব্যাধি বিজড়িত, কর্ম তাপ-তপ্ত নৈরাশ্যে তুহিনাচ্ছন্ন সংসারে যে জাতি এ অমৃত পান করে, সে মরণ তন্দ্রার মধ্যেও বেঁচে ওঠে, অবসাদের মধ্যেও শান্তি পায়। মাতৃদুগ্ধের অমৃত ধারা মাতৃভাষার মধ্যে সঞ্চারিত আছে। তাই মাতৃভাষার সাহিত্যে যে ভাব প্রবাহ ছোটে তা জাতির প্রাণের মধ্যে স্পন্দন জাগায়। প্রত্যেক শোণিত বিন্দু চঞ্চল ও অধীর করে তোলে। সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা বলে। তাই প্রাণে প্রেরণা ছোটায়। আনাতোল ফ্রাঁস্

পুস্তক পাঠের আনন্দে আপ্লুত হয়ে বলেছেন– *'নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই আমি আয়ত্ত করতে থাকি, ততই একটা একটা করে আমার মনের চোখ ফুটতে থাকে।'*

উপসংহার : গ্রন্থপাঠে মানুষ আনন্দ লাভ করে থাকে সত্য, তবে আনন্দ উপলব্ধির জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। গ্রন্থের জগৎ থেকে আনন্দ লাভের জন্য মানুষকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থই মানুষকে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ দান করতে পারে। গ্রন্থ পাঠের আনন্দ দীর্ঘদিন মানুষের মনকে পুলকিত করে রাখে। তাই বিখ্যাত সাহিত্যিক মাক্সিম গোর্কি বলেছেন– *"আমার মধ্যে উত্তম বলে যদি কিছু থাকে তার জন্য আমি বইয়ের কাছেই ঋণী।"*

২১ বাংলা কাব্যে নাতে রাসুল [ফা. প. ১৯৯৭]

উপস্থাপনা : সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো কাব্য। বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য অনেক পুরাতন। বাংলাদেশে তুর্কী বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত হয়। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার সেন বংশের শাসক লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে বিনা বাধায় রাজধানী নদীয়া দখল করেন। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করে দিল্লির শাসনমুক্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ইসলামি সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধিত হয়। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ধারায় ইসলামি ঐতিহ্যের যে রূপ পরিণতি হয় তা এসেছে নানা সূত্রে ও বিচিত্রভাবে।

বাংলা কাব্যে নাতে রাসুল : 'মুহাম্মদ (স)' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যবহৃত হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুর দিকে– রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্যপুরাণ'-এর 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' কবিতায় এভাবে–

ব্রহ্মা হৈলা মঁহামাদ

পরবর্তীতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলিম কবি হিসেবে যাকে গণ্য করা হয় সেই শাহ মুহাম্মদ সগীর থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সকল কবির বাংলা কাব্যে প্রিয় নবি (স)-এর প্রসঙ্গে প্রশস্তি লক্ষ করা যায়। তাদের মধ্যে কবি জৈনুদ্দিন, দৌলত উজির বাহরাম খান, মহাকবি সৈয়দ আলাওল, মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, মুন্সি মেহেরুল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, কাজী কাদের নওয়াজ, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

শাহ মুহাম্মদ সগীর-(১৩৩৯-১৪০৯) : শাহ মুহাম্মদ সগীর তার সর্বপ্রথম প্রকাশিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে লিখেছেন– 'জীবাত্মার পরমাত্মা মুহাম্মদ নাম'/প্রথম প্রকাশ তথা হৈল অনুপাম। যত ইতি জীব আদি কৈল ত্রিভুবন/মুহাম্মদ ইস্তে কৈলা তা সব রতন'।

কবি জৈনুদ্দিন : পনেরো শতকের বিখ্যাত কবি জৈনুদ্দীন প্রথম 'রসূল বিজয়' কাব্য রচনা করেছেন। এর মাধ্যমে একাধারে ইসলামের ইতিহাস, ইসলামি সংস্কৃতি, ধর্ম-বিশ্বাস ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি লিখেন-

'রাসুল বিজয় বাণী অমৃতের ধার
গুণিগণ মনে আনন্দ অপার
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্যবন্দ হৃদি
শাহ মুহাম্মদ হল সর্বগুণ নিধি।'

দৌলত উজির বাহরাম খান : কবি দৌলত উজির বাহরাম খান তার বিশাল কাব্য (লায়লী মজনু) রচনা করেন। তাতে 'প্রণামহুঁ আল্লা' নিবেদনের পর মুহাম্মদ (স)-এর প্রশংসা করে

সাত অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

প্রণামহুঁ তান সখা মুহাম্মদ নাম
এ তিন ভুবনে নাহি যাহার উপাম।
আদি অন্তে মুহাম্মদ পুরুষ অতুল
স্থল শূন্য না আছিল, আছিল রুসুল।

কবি দৌলত উজির বাহরাম খানের কবিতা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে তুলনা করার মতো কোনো বস্তু তিন ভুবনের মধ্যে নেই। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত মহামানব।

মহাকবি সৈয়দ আলাওল (১৬০৭-১৬৮০) : মহাকবি আলাওল ছিলেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি। মুহাম্মদ (স)-এর পবিত্র নূর যে প্রথম সৃষ্টি এবং এ নূরে মুহাম্মদ থেকে যে তামাম পৃথিবী সৃষ্টি করা হয়েছে তা কবি আলাওল তার সুবিখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্যে অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার
ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার।
নিজ সখা মুহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা।
সেই জ্যোতির মূলে ভুবন নির্মিলা।

কবি হেয়াত মামুদ (১৬৮০-১৭৬০) : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল হচ্ছেন কবি হেয়াত মামুদ। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ মানবতার কবি ছিলেন। মুহাম্মদ (স)-এর অনুসরণ ব্যতিত যে পৃথিবীতে শান্তি আসতে পারে না, তা তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন– নবির চরণে বন্দো করিয়া ভকতি/যাহার চরণ বিনে অন্য নাহি গতি। মুক্তিপদ হত যার কালেমা পড়লে/অনন্ত কালে উদ্ধারিত উম্মত আপনে।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) : মীর মশাররফ হোসেন লেখেন "তুমি হে ইসলাম রবি হাবিবুল্লাহ শেষ নবি, নত শিরে তোমায় সেবী মুহাম্মদ ইয়া রাসুলুল্লাহ" মীর মশাররফ হোসেনের এই কবিতা আজও মীলাদ মাহফিলে গাওয়া হয়। যা রাসুল প্রেমিকের মনে তৃপ্তি যোগায়।

কবি কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) : কবি কায়কোবাদ তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'গওছ পাকের প্রেমের কুঞ্জি' এর প্রথম কবিতায় লিখেছেন-

"পান করে নে ওরে পথিক রাসুলের সেই প্রেমের সূরা
তুলনা যার নাইকো ভবে স্বর্গের সে শরাবান তহুরা"।

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যের আকাশে ধূমকেতুর ন্যায় আগমন করেন। তাঁর বিদ্রোহী চেতনায় বাংলা কাব্যে নাতে রাসুল (স) যেন নতুন প্রাণ লাভ করে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম অজস্র গানে, কবিতায় গেয়ে উঠলেন রাসুলের গুণগান। কবির ভাষায়–

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়
দেখ আমেনা মায়ের কোলে
দোলে শিশু ইসলাম দোলে
কচি মুখে শাহাদাতের বাণী সে শোনায়।

এছাড়া তিনি নবির জীবনাদর্শের বিচিত্র গুণ ফুটিয়ে তুলতে রচনা করেছেন অসংখ্য গান কবিতা। তিনি গেয়ে উঠেছেন–

তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম
মুর্শিদ মুহাম্মদের নাম।
এই নামের রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে।

এভাবে কাব্যের মধ্য দিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম নবিজির গুণকীর্তন করেছেন।

কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) : নবি করীম (স) একজন আদর্শ মহামানব। তাঁর আদর্শ কালের প্রবাহে ম্লান হয়ে যায়নি। আজ থেকে প্রায় পনেরোশ বছর পূর্বে ইসলাম যেভাবে এসেছিল, তদ্রূপ ইসলাম পৃথিবীর বুকে আজও অখণ্ডরূপে বিদ্যমান। নবি করীম (স)-এর আদর্শবলে ইসলাম আজ এক অনুপম বাস্তব ধর্ম। কবি গোলাম মোস্তফাও নবি করীম (স)-এর উজ্জ্বল আলোকময় আদর্শে মুগ্ধ হয়ে রচনা করেছেন–

নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি
আমার মুহাম্মদ রাসুল।
কুল মাখলুকের গুলবাগে যেন
একটি ফোটা ফুল।

নবি করীম (স) ছিলেন উত্তম চরিত্রের মূর্ত প্রতীক। সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা নিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।

ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪) : ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামি পুনর্জাগরণের কবি। নবিজির অনুকরণ অনুসরণযোগ্য আদর্শের বর্ণনা তাঁর কাব্য থেকে বাদ পড়েনি। তাই ফররুখ কাব্যে রাসুলের আদর্শ আমাদের সামনে সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এভাবে–

বজ্রের ধ্বনি ছিল সে অথবা,
ছিল সে সওতে হাদী,
আরবের মাটি কাঁপায়ে ছিল
রাসুল সত্যবাদী।
জাগাল সে এক নতুন লগ্ন সকলের অন্তরে
জাগায়ে গেল সে জনতাকে চির সুপ্তির প্রান্তরে।

উপসংহার : রাসুলের ভালোবাসায় লিখেছেন আরও অনেকেই। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্থান দখল করে আছেন– সৈয়দ আলী আহসান, দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ, আফজাল চৌধুরী, কবি আল মাহমুদ, কবি আবদুস সাত্তার, আবদুল মান্নান সৈয়দ, রুহুল আমীন খান, মতিউর রহমান মল্লিক, কবি রাগীব হোসেন চৌধুরী, আবদুল মুকিত চৌধুরীসহ আরও অনেকেই কবিতার মাধ্যমে মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শের বর্ণনা তুলে ধরেছেন সার্থকভাবে। বাংলা ভাষায় যুগে যুগে অসংখ্য কবি সাহিত্যিক রাসুলের শানে রচনা করেছেন বহু সাহিত্যকর্ম, যা বাংলা ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধিশালী।

২২ সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার [ফা. প. ১৯৯৫]

উপস্থাপনা :

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষে
পুরে কি আশা?

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এ দেশের সন্তান সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতসহ আরও অনেকে প্রাণ দিয়েছিল। তাই বাংলা ভাষার গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক। এজন্য আমাদের আশা স্বাধীন সার্বভৌম

বাংলাদেশের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটবে। কবির ভাষায়–
মাতৃভাষা সম্পর্কে কবি স্যামুয়েলসন বলেছেন–

My heart is inditing a great matter
My language is the pen of a ready writer.

বাংলা ভাষার ইতিহাস : বাংলা ভাষার জন্ম হয় আজ থেকে প্রায় এগারোশ বছর আগে। বৌদ্ধ ধর্মের নিগূঢ় বাণী প্রচারের জন্য এ ভাষার জন্ম হয় কবিতা হিসেবে। হিন্দু আমলে সংস্কৃত এবং মুসলমান আমলে ফারসি রাজভাষা থাকায় বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পায়নি। সময়ের আবর্তে একসময় মুসলিম রাজদরবারে বাংলা ভাষা পৃষ্ঠপোষকতা পায়। মধ্যযুগের বাঙালি কবি (দেশীভাষা উপদেশ মনে হিত অতি) সৈয়দ সুলতান (দেশী ভাষে এহি কথা কেহ না কহিল) সহ অনেকেই মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা থেকে বাংলায় কাব্য রচনায় ব্রতী হন। সতের শতকের শেষার্ধের কবি শেখ সেরবাজ চৌধুরী তাঁর কবিতায় বলেছেন–

সকলে না বুঝে দেখি ফারসি বচন
কহিমু বাঙ্গালা ভাষে বুঝিতে কারণ।
১৭০৩ সালে কাজী শেখ মনসুর ফারসি
'সির্নাক্ষ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন–
'বাঙ্গালে না বুঝে সব ফারসি কিতাব
না বুঝি কিতাব কথা মনে পাত্র তাপ।'
এভাবেই অনুবাদ ও মৌলিক

রচনার মাধ্যমে বাঙালি কবিগণ মাতৃভাষার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করেছেন। শত প্রতিকূলতার মাঝেও বাংলা ভাষাকে সাহিত্যে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষা একসময় সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্যগ্রন্থ 'গীতাঞ্জলি' নোবেল পুরস্কার পেলে বাংলা ভাষা বিশ্বসাহিত্য দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করে।

বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম : ১৯৪০ সালের পর বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু হয়। যদিও সে সময়ে দেশের সর্বত্র ইংরেজির দাপট ছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা ভাষা প্র তিষ্ঠা পায়। এরপর থেকে দেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলা ভাষার জয়যাত্রা : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। ফলে বাংলা ভাষা স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠে। বিভিন্নমুখী সমস্যা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্তে সর্বক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার শুরু হয়।

জাতীয় জীবনে বাংলা : পৃথিবীর বড় বড় জাতি নিজেদের মাতৃভাষাকে অনুশীলনের মাধ্যমেই উন্নতি করেছে। আমরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে জীবনের সকল প্রয়োজন মেটাই। ভাবের আদান-প্রদান করি, প্রাণের কথা বলি। জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্তরে এ ভাষার সহজ অধিকার। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরেজি ভাষা চর্চা করেও শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাতেই অমরত্ব লাভ করেন। তিনি বলেছেন–

হে বঙ্গ, ভান্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান : মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা সহজ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে। এ বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

"শিক্ষায় মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ"

মাতৃদুগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পুষ্টিকর, বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা তেমনি সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। কাজেই বিদেশি ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় কখনো সফলতা দান করতে পারে না। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা যথার্থ শিক্ষা হতে পারে।

সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে যে অন্তরায়গুলোর কথা সাধারণত উল্লিখিত হয়ে থাকে, তার একটি হলো পরিভাষার অভাব। বিশেষ করে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক বাংলা বই নেই বলে উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার প্রবর্তন প্রায় অসম্ভব মনে করেন অনেকেই। যে-কোনো বিদেশি ভাষায় বিধৃত জ্ঞান শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে তার মাতৃভাষায় অনূদিত হয়েই প্রবেশাধিকার পায়। এ প্রক্রিয়া বিড়ম্বিত হলে ভিন্নভাষায় রচিত যে-কোনো গ্রন্থ, তা যত মূল্যবান তত্ত্ব বা তথ্যসমৃদ্ধ হোক, একজন পাঠকের কাছে তা অর্থহীন হতে বাধ্য। বিদেশি শাসনামলে ইংরেজি লিখতে পারা একজন বাঙালি কর্মচারীর যোগ্যতার মাপকাঠি ধরা হতো। কিন্তু যে দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা সেখানেও ইংরেজির উৎকর্ষই কি প্রশাসনিক দক্ষতা মূল্যায়নের প্রতিমান হিসেবে গণ্য? জনগণের ভাষা ও প্রশাসনের ভাষা আলাদা রেখে কী করে জাতীয় কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব?

বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা : অনেকেই মনে করেন, বাংলা ভাষায় অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, ভূ-তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় না। এ কথার পেছনে কিছু যুক্তিও কাজ করে। বাংলা ভাষা বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাদানের পক্ষে হয়তো এ মুহূর্তে যথেষ্ট উপযোগী নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উচ্চতর শিক্ষাদানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলে তা সম্ভব হবে। কারণ বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ ও ধারণ ক্ষমতা বিশ্বের অন্য যে-কোনো শক্তিশালী ভাষার চেয়ে দুর্বল নয়।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা : বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কারিগরি জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। মূলত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা শুরু হলে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হবে, পরিভাষা সৃষ্টি হবে। অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি শব্দ যেখানে গ্রহণযোগ্য হয়েছে, সেখানে অন্যান্য শব্দ বাংলা ভাষায় গ্রহণ করলে ভাষার ধারণ ক্ষমতা, প্রকাশ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এভাবে বাংলা ভাষায়ও বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম হবে।

বিভিন্ন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় বই রূপান্তর : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিভিন্ন উন্নতমানের বই বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাকে সর্বজনীন করা সম্ভব। কারণ, জাপানিরা যদি তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে তবে আমাদের দেশে কেন সম্ভব নয়? বাংলা একাডেমি ছাড়াও আমাদের দেশের গবেষকগণ সহজেই তাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে উচ্চশিক্ষাসহ সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনে তাদের দক্ষতা, আন্তরিকতা ও সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে পারেন।

অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা : আমাদের দেশে সরকারিভাবে অফিস-আদালতে বাংলা ভাষার প্রচলন শুরু হয়েছে। সরকার ১৯৮৭ সালে বাংলা ব্যবহারের যে আইন পাস করেছে, তার ফলে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যাপক ব্যবহার ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি : বাংলা ভাষার রয়েছে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। আর এই বিবেচনায় বাংলা ভাষার ইতিহাসে সমুজ্জ্বল ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে পালনের জন্য ইউনেস্কো সাধারণ পরিষদে তাদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃতি দেয়।

উপসংহার : পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার দাবিতে আত্মবিসর্জনের ঘটনা শুধু ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতেই ঘটেছিল। বাংলা ভাষার জন্য আত্মবিসর্জনের সে ঘটনা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা বাঙালিদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। উর্দু ভাষা একসময় বাঙালিদের ওপর চাপানোর চেষ্টা হয়েছিল। পরিভাষার দোহাই দিয়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যেন তার পুনরাবৃত্তি না হয়। আজ তাই সকল ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের জন্য নতুন করে শপথ গ্রহণের সময় এসেছে।

২৩ শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

[ফা. প. ২০০০]

উপস্থাপনা : শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ। এ ভবিষ্যৎ নাগরিকদেরকে গড়ে তোলার প্রধান কেন্দ্র শিক্ষাঙ্গন। কিন্তু আমাদের শিক্ষাঙ্গন আজ নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে সন্ত্রাস অন্যতম। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

১। **সন্ত্রাসের পরিচয় :** বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তারের সহজ পন্থার নাম সন্ত্রাস। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠালাভের উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসীরা গায়ের জোরে, অস্ত্র প্রদর্শন করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসীদের মূলমন্ত্র হলো might is right. অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার।

২। **শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা :** সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গনকে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় বড় কলেজগুলোকে রাহুর মতো গ্রাস করছে। দেশের প্রায় প্রতিটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সব সময় অস্ত্রের ঝনঝনানি লেগেই আছে। সন্ত্রাসকবলিত শিক্ষাঙ্গনগুলোতে অস্ত্রের মজুদ দেখলে সেগুলোকে ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া কিছুই বলা যায় না। ফলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাহীন, অভিভাবকেরা আতঙ্কগ্রস্ত আর দিন দিন শিক্ষা কার্যক্রম অচল হওয়ার পথে।

৩। **শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের কারণ :**

ক. অসুস্থ রাজনীতি : একসময় বাংলাদেশের ছাত্র-রাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজনৈতিক মাঠের প্রধান খেলোয়াড়। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই রয়েছে ছাত্র সংগঠন। ফলে তারা ক্ষমতায় আরোহণ অথবা অধিষ্ঠিত থাকার জন্য ছাত্রসমাজকে ব্যবহার করে তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

খ. অর্থনৈতিক দৈন্যদশা : এ দেশের অধিকাংশ পিতার পক্ষে তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। ফলে সাময়িক সুবিধায় থাকার জন্য কিংবা অর্থের লোভে ছাত্ররা রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত তারা সন্ত্রাসী হয়ে দেশের সর্বনাশ করে অথবা লাশ হয়ে দরিদ্র পিতার কো.ল ফিরে আসে।

গ. আইন-শৃঙ্খলার অবনতি : আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সুযোগেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্ম হয়। প্রশাসন রাজনৈতিক নেতাদের ভয়ে অনেকসময় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ফলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে। সন্ত্রাসীরা সুযোগ নেয় আর ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক ও কর্মচারীরা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা হারায়।

ঘ. নৈতিক শিক্ষার অভাব : দেশে বর্তমানে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক শিক্ষার কোনো বালাই নেই। ধর্মীয় রীতিনীতি পালনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে মানবতাবোধ, মনুষ্যত্ববোধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস থেকে বিদায়

নিয়েছে এবং সে স্থান দখল করেছে সন্ত্রাস। ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, দয়া-মায়া এসব সুকুমার বৃত্তির অপমৃত্যু ঘটেছে।

ঙ. **আধিপত্যবাদী শক্তির ইন্ধন :** এ দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বারবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। আর তা রক্ষায় ছাত্রসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তাই এ দেশের ছাত্রসমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য আধিপত্যবাদী শক্তি গোপনে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রয়েছে, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস নেই।

চ. **প্রভাব বিস্তার :** একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করা মানুষের স্বভাব। মানুষ যখন অনুকূল পরিবেশ পায় তখন অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অবৈধভাবে চাঁদা আদায়ের প্রতিযোগিতাও প্রভাব সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ফলে সৃষ্টি হয় সন্ত্রাসের।

ছ. **কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা :** মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাও তরুণ ছাত্রসমাজকে অসহিষ্ণু করে তোলে। যখন তিন বছরের কোর্স সমাপন করতে চার-পাঁচ বছর লেগে যায়, তখন শিক্ষার্থীরা হতাশায় ভোগে এবং পড়াশোনায় মনোযোগ হারিয়ে অর্থের লোভে সন্ত্রাসী কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৪। **সন্ত্রাস প্রতিরোধের উপায় :**

ক. **রাজনৈতিক সদিচ্ছা :** সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলগুলোকে সদিচ্ছার পরিচয় দিতে হবে। প্রশাসন কোনো সন্ত্রাসীকে পাকড়াও করলে তার পক্ষে সাফাই গাওয়া যাবে না। অপরদিকে সরকারি দল প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে ঘায়েল করার জন্য মামলা, জেল-নির্যাতনের পথ বেছে নিলেও সন্ত্রাস দূর হবে না।

খ. **লেখাপড়ার বাধ্যবাধকতা :** নির্ধারিত সময়ে কোর্স সমাপ্ত ও পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে ছাত্ররা লেখাপড়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হবে। নিয়মিত অধ্যয়নকারী কোনো ছাত্র সন্ত্রাসী কর্মে লিপ্ত হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকদেরকে রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

গ. **প্রশাসনের নিরপেক্ষতা :** সন্ত্রাস দমনে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। কোনো প্রভাবশালী মহল বা সরকারি দলের নির্দেশে প্রতিপক্ষের ওপর নির্যাতন করা যাবে না। এক্ষেত্রে প্রশাসন যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হবে।

ঘ. **সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি :** সাধারণ ছাত্রদেরকে সচেতন করে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সন্ত্রাসীদের একঘরে করে শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে।

৫। **সন্ত্রাসের কুফল :** সন্ত্রাসের কুফল বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। দিন দিন সন্ত্রাস সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে জিম্মি করে তুলছে, এতে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। সন্ত্রাসের শিকার হয়ে মেধাবী ছাত্রদেরকে লাশ হয়ে ঘরে ফিরতে হচ্ছে। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ না থাকায় দেশের ছাত্রসমাজ বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হচ্ছে। এতে দেশীয় মেধা অধিক হারে বিদেশে চলে যাচ্ছে এবং দেশে মেধাশূন্যতা সৃষ্টি হচ্ছে।

উপসংহার : শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস অবাস্তব ও অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রমাণ। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করতে হবে। ছাত্রদের পড়াশোনা অবস্থায় সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনকে একমত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

২৪ জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা [ফা. প. ২০১১]
অথবা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ
অথবা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

উপস্থাপনা : দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও লাখো জনতার জীবনদানের এক রক্তিম ইতিহাস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। ইংরেজ শাসন অবসানের মধ্য দিয়ে স্বপ্নের পাকিস্তান সৃষ্টি হলেও পাকিস্তানি শাসকগণ পরিণত হয় শোষকে। তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ আর শোষণ নিস্পেষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আন্দোলনে গর্জে ওঠে বাংলার জনগণ। কালে তা রূপ নেয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। অবশেষে নয় মাস সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের পর উদিত হয় স্বাধীন বাংলার নবীন সূর্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বকথা : স্মরণাতীতকাল থেকেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন এবং বাঙালিরা ছিল শোষণ-বঞ্চনার শিকার। প্রায় দুশ বছরের ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালে জন্ম নেয় স্বাধীন পাকিস্তান, কিন্তু পাকিস্তানি শাসকদের একরোখা শাসননীতির ফলে আমরা ছিলাম শোষিত। আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে তারা স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে ১৯৫২ সালে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার জয়লাভ হয়। বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপিত হয়। ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে আটক করলে জনগণের তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা : গণআন্দোলনের মুখে জেনারেল আইয়ুব খানের পদত্যাগের পর জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৬৯ সালে পুনরায় সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা করলেন, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে যাবে।

১৯৭০-এর জাতীয় নির্বাচন : ইয়াহিয়া খানের ঘোষণানুযায়ী ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩৯০টি আসনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পি.পি.পি) ৮৮টি আসনে আর আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি : নির্বাচনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খান গড়িমসি শুরু করে ও ভুট্টোর ভেটো অব্যাহত থাকে।

অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর পরামর্শে ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। ইত্যবসরে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে শেখ মুজিবের সাথে আলাপ-আলোচনা করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যান, কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ পহেলা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন।

অসহযোগ আন্দোলন : পহেলা মার্চের ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় পূর্ব পাকিস্তানের জনতা হতবাক হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ : অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন–

- সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
- অবিলম্বে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।
- সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করতে হবে।
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ আহ্বানে সকল অফিস-আদালত, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে।

আলোচনার প্রহসন : ১৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে ১৬ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকে বসেন। তিনি ভুট্টো সাহেবকেও ঢাকায় ডেকে পাঠান। দীর্ঘ দশদিন পর্যন্ত আলোচনা চলে। এ আলোচনা ছিল প্রহসন মাত্র।

তীব্র আন্দোলন শুরু ও গণপ্রতিরোধ : আলোচনার নামে এহেন প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র গণআন্দোলন শুরু হলে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এ আন্দোলন চিরতরে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে ২৫শে মার্চ গভীর রাতে জনগণের ওপর সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে পাড়ি জমান। শেখ মুজিবকে তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমন্ত জনগণের ওপর সেনাবাহিনীর অতর্কিত হামলায় ঢাকা শহর ভয়াল মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণা : চট্টগ্রাম বেতারের গীতিকার, অধ্যাপক ও সাংবাদিক আবুল কাশেম সন্দীপ ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর 'ডিক্লারেশন অব-ওয়ার অব ইন্ডিপেনডেন্টস' নামক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রথম সংবাদ আকারে প্রচার করেন। পরদিন ২৭শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের "স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণাপত্র" পাঠ করেন।

অস্থায়ী সরকার গঠন : ১০ই এপ্রিল পূর্ব বাংলার নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যরা মুজিবনগরে এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয় এবং ১৭ই এপ্রিল বহুসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, গণপরিষদ সদস্য ও মুক্তিকামী জনতার উপস্থিতিতে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে আম বাগানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে এবং মেহেরপুরকেই মুজিবনগর নাম দিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করে।

মুক্তিবাহিনী গঠন ও চূড়ান্ত বিজয় : অস্থায়ী সরকার গঠনের পর মুক্তিবাহিনী গঠিত হয় এবং কর্নেল আতাউল গনি ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। এ দেশের অগণিত ছাত্র-জনতা, পুলিশ, ই.পি.আর, আনসার ও সামরিক-বেসামরিক লোকদের সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। তারা পাক-বাহিনীর মুখোমুখি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনীর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে পড়ে। আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর নিঃশর্তভাবে মিত্রবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রাপ্তি : পাকিস্তানি শোষকদের শোষণ-বঞ্চনা ও ভেদ-বৈষম্যের অবসান, অর্থনৈতিক মুক্তি, সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের

মূল চেতনা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তবতা হলো স্বাধীনতার চার দশক পরও মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এখনো এ দেশের মানুষ পথের ধারে ঘুমায়। শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের গুম, হত্যা করা হয়, রাজনৈতিক হীন স্বার্থে ঘর-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি যাত্রীবাহী যানবাহনেও ব্যাপক অগ্নি-সংযোগ করা হয়। এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়, গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, খাদ্যে ভেজালসহ সবধরনের অনাচার যেন নিত্য নৈমিত্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এসবই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি। এজন্যই কবি বলেন, "কী দেখার কথা কী দেখছি, কী শোনার কথা কী শুনছি, তিরিশ বছর পরেও আমি স্বাধীনতাটাকে খুঁজছি।"

উপসংহার : মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির ইতিহাসে এক সোনালি অধ্যায়। এ অধ্যায় বড় উজ্জ্বল, অত্যন্ত বেদনা ও আনন্দের। মুক্তিযুদ্ধ থেকেই বাঙালির সত্তায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চেতনা জন্ম নেয়। তবে স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতা অর্জন করা যেমন কঠিন, রক্ষা করাও তেমন কঠিন। এজন্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের জন্য দলমত ও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে নতুন করে শপথ নিতে হবে।

২৫ বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা [ফা. প. ২০০৯]
অথবা, বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ [ফা. প. ১৯৯৮, '১২, '১৬, '১৮]
অথবা, বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলন

উপস্থাপনা : সাহিত্য হলো দৈনন্দিন জীবনে মানুষের কার্যকলাপের বাস্তব চিত্র। একে মানবজীবনের দর্পণ বলা হয়। সাহিত্যে ব্যক্তি জীবনের পাশাপাশি জাতীয় জীবনের আলোচনাও স্থান পায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য জাতীয় জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত। বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ এক বিরাট স্থান দখল করে আছে।

সাহিত্যের সংজ্ঞা : সাহিত্য মানবজীবনের দর্পণস্বরূপ। তাই বলা হয়– Literature is the expansion of human character. অর্থাৎ, সাহিত্য হলো মানব চরিত্রের বিকাশ। মূলত সাহিত্য কথাটির অর্থ ব্যাপক। একদিকে যেমন গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা এর আওতায় পড়ে। অপরদিকে তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতির আলোচনাও এতে হয়ে থাকে। মানুষের ভাব ও ভাবনা, চিন্তা ও জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ভাষাশ্রিত রূপই সাহিত্য।

বাংলাদেশের সাহিত্য : বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশ। এর সাহিত্যে রয়েছে সমাজ, সভ্যতা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি রূপ, রস, সৌন্দর্য ইত্যাদি। বাংলাদেশের এসব নিয়ে ভাব ও কল্পনার সমন্বয়ে বাস্তবতার নিরিখে যে ভাষাশ্রিত রূপ আলোচিত হয়েছে তা-ই বাংলাদেশের সাহিত্য।

মুক্তিযুদ্ধের পরিচয় : ১৯৭১ সালে বাংলার মানুষ পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অনেক প্রাণের বিসর্জনের মধ্য দিয়ে অবশেষে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস একটি ত্যাগের ইতিহাস।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট : পলাশী যুদ্ধের পর থেকে ইংরেজরা এদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণ শাসন ক্ষমতা নিয়ে প্রায় দু'শ বছর এ অঞ্চল শাসন

করে। ইংরেজ শাসন হতে দেশ মুক্ত হওয়ার পর প্রায় ২৪ বছর পাকিস্তানিরা শাসন করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন হয়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে পাকিস্তানি সামরিক শাসন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মম গণহত্যা শুরু করে। আর তা প্রতিরোধেই শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ তথা দেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সাহিত্য : মুক্তিযুদ্ধকালীন বিধ্বস্ত পরিবেশে সাহিত্য রচনার তেমন সুযোগ ছিল না। তবে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে এবং দেশের অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার জন্য কবি-সাহিত্যিক-গীতিকারদের তৎপরতা লক্ষণীয় ছিল। দেশাত্মবোধক গান, কবিতা, নাটক, রম্যরচনা ইত্যাদি সে সময় দেশবাসীকে মুক্তি-সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ : মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় চেতনায় এক অনন্য স্থান দখল করে আছে। এটা ছিল অন্যায়, জুলুম, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দিক-নির্দেশক; স্বীয় ব্যক্তিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য অটুট রাখার শপথে বলীয়ান হওয়ার প্রেরণাদাতা। আমাদের দেশের সৃজনশীল কবি, সাহিত্যিক ও নাট্যকার তাদের ক্ষুরধার লেখনির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ ধরনের সাহিত্যকর্ম আমাদের নতুন প্রজন্মকে শোষণ, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রভাবিত সাহিত্য : আমাদের বর্তমান সাহিত্যাঙ্গনের অধিকাংশই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ কী– কেন হলো– কীভাবে হলো– কার ভূমিকা কেমন ছিল– এসব প্রশ্নের সঠিক তত্ত্ব পাই আমরা সাহিত্যকর্ম থেকে, যা আমাদের চলার পথে মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ কবি-সাহিত্যিক : মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে কতিপয় কবি-সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে জাগিয়ে তুলেছেন ঘুমন্ত জাতিকে, প্রেরণা যুগিয়েছেন তরুণ ও যুবসমাজকে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কবি-সাহিত্যিক হলেন– শওকত ওসমান, আনোয়ার পাশা, সৈয়দ শামসুল হক, রিজিয়া রহমান, মমতাজউদ্‌দীন আহমদ, আবদুল গাফফার চৌধুরী, শামসুর রাহমান, সৈয়দ আলী আহসান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, এম. আর. আখতার মুকুল, সেলিনা হোসেন, হাসান আজিজুল হক, জসীমউদ্‌দীন, হারুন হাবীব প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলি : মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এসব গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব চেতনা এবং আমাদের জাতীয়তাবোধ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– হাসান হাফিজুর রহমানের 'অব্যক্ত সূর্যোদয়', এম. এ. ভূঁইয়ার 'মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস', শাহিদা বেগমের 'যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস', শওকত ওসমানের 'জাহান্নাম হতে বিদায়' আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই', সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান', জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন', সেলিনা হোসেনের 'একাত্তরের ঢাকা' জুবাইদা গুলশান আরার 'বাতাসে বারুদ রক্তে উল্লাস' প্রভৃতি।

সংগীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন : দেশের বীর সন্তানদের অনেক তাজা রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। রচিত হয়েছে মনমাতানো সংগীত–"মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি," "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলব না।" রক্তের বন্যায় সেদিন অন্যায়ের স্তূপ ভেসে গিয়েছিল। আর শিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে গানে গানে মুখরিত করে দিয়েছিল

মুক্তিপাগল জনতাকে। চিত্তের প্রশান্তি এনে দিয়েছিল দেশাত্মবোধক বিভিন্ন সংগীত উপহার দিয়ে। এ ছাড়াও নাটক, উপন্যাস ও চিত্রকলায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে।

আমাদের দায়িত্ব : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদেরকে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এতে নতুন প্রজন্ম এসব সাহিত্য থেকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে, আর ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার শপথ নেবে। যে কারণে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিফলন ঘটে এমন সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পাশাপাশি পূর্বরচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যভান্ডার সংরক্ষণ করাও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

উপসংহার : বাংলাদেশের সাহিত্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতিফলনে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়; বরং নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকবৃন্দের আরও সচেষ্ট হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ সাহিত্য রচনায় তৎপর হওয়া আবশ্যক। যতদিন মানুষের মনে সাহিত্যপ্রেম, সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও জাগরিত থাকবে।

২৬ একুশে বইমেলা [ফা. প. ২০০৭]

অথবা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা

উপস্থাপনা : আমাদের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি একটি মহিমাময় দিন। এদিন মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলার বীর সন্তানেরা রক্ত দিয়েছিল। বাংলার সেই অমর শহিদদের স্মরণে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে যে বইমেলার আয়োজন করা হয়, সেটি অমর একুশে বইমেলা হিসেবে পরিচিত। দেশের হাজার হাজার বইপ্রেমী, লেখক, সাহিত্যিকের মিলনমেলায় পরিণত হয় এটি। আমাদের জীবনে বইয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে টলস্টয় বলেছেন– Three things are essential for man– they are book, book, and book.

একুশের চেতনা : ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে স্বাধীন পাকিস্তানের জন্ম হয়। এ সময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে থাকা পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করলে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা এর বিরোধিতা করে। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে এ দেশের ছাত্র-জনতা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পাকিস্তানি পুলিশ গুলি চালায়। এতে সালাম, রফিক, জব্বার, শফিকসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র শহিদ হন। দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এরপর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। ভাষা শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্যই প্রতিবছর একুশে বইমেলার আয়োজন করা হয়।

একুশে বইমেলার সূচনা : একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনার বহুমুখী বিকাশের লক্ষ্যে এ দেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সমাজ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা একাডেমি। বাংলা একাডেমি প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান প্রবর্তন করে। ১৯৭৫ সালে বাংলা একাডেমির একুশের অনুষ্ঠানকে ঘিরে কয়েকজন প্রকাশক, সাহিত্যিক, বিক্রেতা, বই বিক্রির উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে কয়েকটি স্টল খুলে এ প্রয়াস চালায় তারা। সেই থেকে বইমেলা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। এখনকার বিশাল আয়োজনের বইমেলা তারই ফসল।

বইমেলার সময়কাল ও স্থান : একুশে বইমেলা প্রতিবছর পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়। ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী মেলা চলতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্নিহিত বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একুশের বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। বইমেলায় কয়েক'শ প্রকাশক ও বিক্রেতা মেলা প্রাঙ্গণে স্টল স্থাপন করে বইয়ের বিপণন, প্রচার এবং পাঠক সৃষ্টিতে অবদান রাখেন। প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলে।

বইমেলার অন্যান্য দিক : একুশে বইমেলার একদিকে থাকে শত শত বইয়ের স্টল, অন্যদিকে থাকে একুশের মঞ্চ। মঞ্চে দেশবরেণ্য কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর একুশে পদক ঘোষণা করে। দেশের খ্যাতনামা লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সৃজনশীল কর্মের স্বীকৃতি লাভ করেন।

মেলার উৎসবমুখর পরিবেশ : মেলার সাজানো-গুছানো একেকটি স্টল যেন সবার সৌন্দর্যবোধকে নাড়া দেয়। মেলার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য কবিতা আবৃত্তি এবং দেশীয় গানেরও আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার পাঠক, বহু লেখক, সাহিত্যিকের সমাগম ঘটে মেলায়। সব মিলিয়ে একটা উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয় এ সময়। বিকেল বেলা মেলায় উপচেপড়া ভিড় লক্ষ করা যায়।

মেলার বহিরাঙ্গ দৃশ্য : মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশের প্রধান তোরণটি সাজানো হয় অত্যন্ত চমৎকারভাবে। ডান পাশের দেয়ালে ভাষা শহিদ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সংগ্রামী ইতিহাসকে ধারণ করে তৈরি করা হয় একটি সুদীর্ঘ দেয়াল নকশা। মেলার ভেতরে বটমূলে তৈরি করা হয় নজরুল মঞ্চ। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে বসে আড্ডা দেওয়ার জন্য স্থাপন করা হয় বাঁশের তৈরি মাচা।

বইমেলা প্রাণের মেলা : বইমেলা এ দেশের জাতীয় জীবনে অভাবনীয় গুরুত্বের অধিকারী একটি জাতীয় উৎসব। এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বইমেলা অবিচ্ছেদ্য একটি দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফেব্রুয়ারি মাসব্যাপী বিপুলসংখ্যক পাঠক, লেখক-প্রকাশকের অভূতপূর্ব এক মিলন মেলায় পরিণত হয় বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশে বইমেলা। বই-পিপাসু মানুষেরা এ মেলায় এসে তাদের পছন্দের লেখক ও তাদের প্রকাশিত বইয়ের সাথে পরিচিতি লাভ করে। পছন্দের বই ক্রয় করে নিজের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং অনেক সময় বইয়ের লেখকদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগপ্রাপ্ত হয়। সর্বোপরি বইয়ের পঠন-পাঠনে বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বইমেলার উপকারিতা : বইমেলায় সাধারণত সৃজনশীল বইয়ের সমাবেশ ঘটে থাকে। বিভিন্ন রুচির পাঠক তাদের পছন্দমতো বই সংগ্রহ করতে পারে বই মেলা থেকে। একুশের বইমেলায় নানা ধরনের অনেক বই পাওয়া যায়। এটি বই সংগ্রহের একটি উপযুক্ত সুযোগ। সকল শ্রেণির পাঠকই মেলায় এসে উপকৃত হতে পারে।

বইমেলার গুরুত্ব : একুশের বইমেলা বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একুশের বইমেলা উপলক্ষে লেখকরা তাদের বই প্রকাশে প্রকাশকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে প্রতিবছর দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন লেখক, গবেষক সৃষ্টি হয়। বইমেলার ব্যাপক প্রচারের ফলে অসংখ্য পাঠক মেলায় ভিড় করে এবং বই কেনে। ফলে প্রকাশকরা আর্থিকভাবে লাভবান হয়, তারা নতুন নতুন বই প্রকাশে উৎসাহ লাভ করে। এছাড়া এর ফলে বইপ্রেমিক ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। একুশের বইমেলা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমসমূহে ব্যাপক কাভারেজ পায়। ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষা ও এর সাহিত্য প্রচার-প্রসার লাভ করে।

উপসংহার : বইয়ের গুরুত্ব উপস্থাপন করতে গিয়ে কবি জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪) বলেছেন– A good book is the precious life-blood of a master-spirit, embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life. বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অমর একুশে এবং একুশে বইমেলা। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে মাতৃভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল, কালক্রমে তা স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে এ দিবসকে ঘিরে অনুষ্ঠেয় 'একুশের বইমেলা' আলোর মশাল হয়ে জাতিকে দিশা দেয় নিজস্ব সংস্কৃতির। একুশের অর্জন এবং এর অবদানকে বিশ্বসভাও স্বীকৃতি দিয়েছে। জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি এবং একুশের বইমেলা তাই বিশ্বব্যাপী আলোচিত এবং দেশবাসীর জন্য গর্বের এক ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষয়।

২৭ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস [ফা. প. ২০১১, '১৯]

অথবা, আমাদের ভাষা দিবস [ফা. প. ২০০৪]

অথবা, একুশে ফেব্রুয়ারি এবং বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস [ফা. প. ২০০১, '০৩]

উপস্থাপনা : প্রখ্যাত কবি স্যামুয়েলসন বলেছেন–

My heart is inditing a great matter
My tongue is the pen of a ready writer.

বস্তুত মাতৃভাষা আল্লাহর সেরা দান। এ বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার, বিভিন্ন জাতির আলাদা আলাদা ভাষা রয়েছে। প্রত্যেকের কাছেই তার মাতৃভাষা মহামূল্যবান। মহামূল্যবান এসব মাতৃভাষার যথার্থ স্বীকৃতি দেওয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ প্রতিবছর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের ঘোষণা দিয়েছে।

একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

বাংলা ভাষার সংগ্রামী ইতিহাস : জনসংখ্যার বিচারে বাংলা ভাষা বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ মাতৃভাষা। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৩০ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। কিন্তু বাংলা ভাষার উন্মেষ পর্বে ছিল এক কঠিন সংগ্রামী ইতিহাস। পূর্বকালে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃত ভাষাসেবীরা বাংলা চর্চার বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারা বাংলা চর্চাকারীদেরকে 'রৌরব নরকে' পতিত হওয়ার ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। মুসলিম কবি আবদুল হাকিম এসব বাংলা বিদ্বেষীদের উদ্দেশে বলেছিলেন–

যে সবে বঙ্গেত জন্মি, হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্ব : ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধীনতার প্রস্তাব নিয়ে ভারতে 'ক্যাবিনেট মিশন' আসে। পাকিস্তানের জন্ম-সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে, প. কিস্তান প্রতিষ্ঠা-লগ্নের অব্যবহিত পূর্বে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর জিয়া উদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করেন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ হতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন

করেন (১১ই শ্রাবণ, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ)। এভাবেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্কের সূচনা হয়।

বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা : ১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন "Urdu and only Urdu will be the State Language of Pakistan."। কিন্তু বাংলার জনগণ তা মেনে নিতে পারেনি। তারা প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ফলে এ আন্দোলন সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের মধ্যে এ আন্দোলনের সূচনা হলেও সমগ্র দেশ এর সমর্থন জানায়। ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর সরকারের যতই দমননীতি চলতে থাকে, ততই আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকে।

ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন : বিশ্বের একমাত্র মাতৃভাষা বাংলা, যার স্বীকৃতির জন্য এ দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছিল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সালাম, জব্বার, রফিক, বরকতসহ অনেক যুবক বাংলা ভাষার স্বীকৃতির জন্য প্রাণ দিয়েছিল। উর্দুভাষী পাক পুলিশের বুলেটের সামনে বুক পেতে দিয়েছিল সেদিন বাঙালি সন্তানরা। দৃপ্ত কণ্ঠে স্লোগান তুলেছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'।

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি : ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সালাম, জব্বার, রফিক ও বরকতসহ অনেকের শাহাদাতবরণের ঘটনায় সারা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে আতঙ্কিত সরকার ১৯৫৬ সালে প্রণীত পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাহ্যিক স্বীকৃতি দেয়।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' করার পরিকল্পনা : যে দিবসসহ অনেকগুলো আন্তর্জাতিক দিবস জাতিসংঘের উদ্যোগে পালিত হয়। এসব দিবসের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। বাংলা ভাষারও রয়েছে এক রক্তাক্ত ইতিহাস। আর এ বিবেচনায় বাংলা ভাষার ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিলাভের উদ্যোগ নেয় এ দেশের কতিপয় ব্যক্তি।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি যেভাবে পেল

ক. জাতিসংঘে আবেদনপত্র প্রেরণ : বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের চিন্তাটি প্রথমে আসে কানাডা প্রবাসী দু'জন বাঙালি যুবকের মাথায়। কানাডার দুজন বাঙালি যুবক জনাব রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম সর্বপ্রথম 'Mother language of the world' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি এ সংগঠনের পক্ষ থেকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠানো হয়। কফি আনান তাদেরকে ইউনেস্কোর সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন।

খ. বাংলাদেশের সরকারি প্রস্তাব : কফি আনানের পরামর্শ অনুযায়ী 'Mother language of the world' নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। এবার তারা সাতটি ভিন্ন ভাষার ১০ জনের স্বাক্ষরসহ ইউনেস্কোর কাছে আরেকটি আবেদনপত্র পাঠায়। ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট মিসেস আনান মারিয়া এ আবেদনের জবাবে জানান, কোনো বেসরকারি সংগঠনের প্রস্তাব ইউনেস্কো বিবেচনা করতে পারে না। তবে কোনো দেশের সরকার যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়, তখন প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে। এরপর জনাব রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে

যোগাযোগ করেন। শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীকে জানান। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবসহ শিক্ষামন্ত্রীকে প্যারিসে পৌছানোর নির্দেশ প্রদান করেন। অবশেষে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের প্রস্তাবটি ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে ইউনেস্কোর দফতরে পেশ করে। একই বছর ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

গ. **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি :** প্রাথমিকভাবে ২৭টি দেশ একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালনের বাংলাদেশের প্রস্তাব সমর্থন করে। ২৭টি দেশের সমর্থন নিয়ে প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদে আলোচিত হয়। অবশেষে ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের ৩০তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২০০০ সালে ১৮৮টি দেশ প্রথমবারের মতো 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উল্লেখ্য, ২০০২ সালের ১২ই ডিসেম্বর আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন বাংলাকে সে দেশের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে।

উপসংহার : পৃথিবীর ইতিহাসে মাতৃভাষার দাবিতে আত্মবিসর্জনের ঘটনা শুধুমাত্র ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতেই ঘটেছিল। বাংলা ভাষার জন্য আত্মবিসর্জনের সে ঘটনা আজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা বাঙালিদের জন্য একটি গৌরবের বিষয়। আজ তাই উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের জন্য নতুন করে শপথ গ্রহণের সময় এসেছে। সার্থক হয়েছে শিল্পীর গান–

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।"

২৮ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা

[ফা. প. ১৯৯৭]

অথবা, জাতীয় চেতনায় ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব
অথবা, জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারি
অথবা, আমাদের ভাষা দিবস

[ফা. প. ২০০৪]

উপস্থাপনা : ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও তৎকালীন পূর্ব বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশ) মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগণ পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে শোষণ করে তাদের একটি স্থায়ী কলোনিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। আর এ মানসিকতা থেকে তারা ব্রিটিশ শাসকদের মতোই বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাংলার জনগণ তাদের পরিকল্পনা সফল হতে দেয়নি। তাদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বাংলা ভাষার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সংখ্যাগরিষ্ঠের দাবি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ

অন্যায়ভাবে ১৯৪৮ সালের একুশে মার্চ ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করলেন, Urdu and only Urdu will be the State Language of Pakistan. "উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।"

পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগ আয়োজিত এক জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এতে সমগ্র ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ছাত্ররা দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দেয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে। ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা আইন ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে পড়ে। রাজপথ রক্তে রঞ্জিত করে সেদিন এদেশের দামাল ছেলেরা বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা : ভাষা আন্দোলন স্বাধীনতা সংগ্রামের দুর্দমনীয় সংকল্পের গভীরে প্রোথিত শিকড়ে রস সংগ্রহ করে দেশকে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের দিকে নিয়ে গেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একটি সফল আন্দোলন। পরবর্তীতে এ আন্দোলন বাঙালি জাতিকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারিতে সালাম, রফিকের বুকের রক্ত বৃথা যায়নি। ইতিহাস তার মূল্য দিয়েছে। শুধু বাংলা ভাষাকেই আমরা মাতৃভাষা হিসেবে পাইনি, বরং একুশের চেতনার যে বীজ সেদিন বপন করা হয়েছিল, তার বিশাল মহিরুহ পরবর্তীতে অমূল্য স্বাধীনতার স্নিগ্ধ ছায়ায় বেড়ে উঠেছে।

জাতীয় চেতনার উন্মেষ : কবি আল মাহমুদের ভাষায়–

ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায়
বরকতের রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে।

একুশের মহান চেতনা আমাদের জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে। একুশ দিয়েছে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। একুশ দিয়েছে আমাদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা। প্রতিবছর একুশ আসে। ফুলের অজস্র সম্ভার নিয়ে অশ্রুবিগলিত চিত্তে আমরা শহিদ মিনারে হাজির হই। দেশগড়ার দৃপ্ত শপথে ঐক্যবদ্ধ হই সবাই।

মুক্তিযুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব : ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। ভাষা আন্দোলনই বাঙালি জাতিকে অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলেই বাঙালি জাতি স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে স্বৈরাচারী পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে নিজেদের মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সাল হতে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তি আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে প্রেরণা যুগিয়েছে এই ভাষা আন্দোলনের রক্তমাখা ইতিহাস। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে তাই ভাষা আন্দোলনের ফল বলা যায়।

ভাষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : জাতীয় জীবনের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেশের সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ ও সংস্কৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। ভাষা আন্দোলন আমাদের

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জোয়ার এনেছে; আমাদের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, বুদ্ধিজীবীগণকে দিয়েছে লেখার ও ভাবনার নতুন উপকরণ।

৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক উত্তরণ : বিশ্বসভা কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'রূপে ঘোষণা বাংলা ভাষার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিগত সহস্রাব্দে সংস্কৃত, ফারসি, ইংরেজি ও উর্দু-হিন্দির আগ্রাসনে ক্ষত-বিক্ষত বাংলা ভাষা; এ ঘোষণার ফলে আশা করা যায়, তার প্রাপ্য মর্যাদা পাবে। আমাদের সহস্র বছরের কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি উপেক্ষা করে বিজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেওয়ার যে অনমনীয় মানসিকতা তদানীন্তন শাসকগোষ্ঠীর মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তারই গৌরবদীপ্ত প্রতিবাদের ফসল এ আন্দোলন; অতঃপর কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও আমাদের প্রত্যাশা : একুশ আমাদের চেতনা। রক্তমাখা, স্মৃতিঘেরা '৫২ থেকে ২০১৬ দীর্ঘ ৬৪ বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের দুয়ারে দুয়ারে, অন্তরে, সত্তায় অনুভবের অগ্নিগিরির মতো আসে আর যায়। একুশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় নব জীবনের নকশাকে, পথকে, স্থাপত্যকে, ভালোবাসার গানকে, আর জীবনের উন্মেষকে; বলে– "জাগো অনশন বন্দী ওঠরে যতো।" কিন্তু আমরা এসব ভুলে অন্ধ-কুটিল আর্তনাদে কণ্ঠ মিলিয়ে দিই। বর্তমানে আমাদের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অন্যায়-অবিচার ও বৈষম্য বিরাজমান। অথচ একুশ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো এবং তার প্রতিকারের এক দৃপ্ত প্রত্যয়।

উপসংহার : আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূলে রয়েছে একুশের চেতনা। ভাষার দাবির সূত্র ধরেই স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়। ফলে আমরা আজ স্বাধীন। স্বাধীন বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলনেরই উত্তরাধিকার।

২৯ স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ছাত্রসমাজ [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা [ফা. প. ১৯৯৯]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীর সৈনিক হিসেবে বাংলার ছাত্রসমাজও বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। শত শত ছাত্র বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে ছাত্রসমাজের আত্মত্যাগের কথা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ছাত্রসমাজের অতীত ঐতিহ্য : ছাত্ররা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারা যুগে যুগে দেশের সকল প্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ইংরেজ আমলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে তারাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে তারা নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অন্যান্যদের সাথে ছাত্ররাও। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাই জাতি এই ছাত্রসমাজের কাছে যথার্থই ঋণী।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও ছাত্রসমাজ : ১৯৪৭ সালে বেনিয়া ইংরেজদের শোষণ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঙালি জাতি পুনরায় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণে পতিত হয়। সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুখের বুলি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারই প্রতিবাদস্বরূপ হাজার হাজার ছাত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে ঢাকার রাজপথে নেমে পড়ে। ফলে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি শাসকগোষ্ঠীর লেলিয়ে দেওয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেয় বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বার।

অস্ত্র ও রাইফেলের গুলির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ছাত্রসমাজ কেবল হৃদয়ের শক্তিকে আশ্রয় করে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন গৌরবদীপ্ত আত্মোৎসর্গের নিদর্শন স্থাপন করে বাংলার ছাত্রসমাজ পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই শোষিত বাঙালি জাতির মধ্যে স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন চলতে থাকে। ১৯৬৯ সালে ঘটে গণঅভ্যুত্থান। ফলে ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এদেশে সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সে নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। কিন্তু ইয়াহিয়া সরকার ভোটের রায় অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং ৭১-এর পঁচিশে মার্চের কালরাতে তার সেনাবাহিনীকে বাংলার নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার ওপর লেলিয়ে দেয়; এবং এভাবেই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষকে এক রক্তাক্ত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ছাত্রসমাজ : ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খানের হানাদার সৈন্যবাহিনী হত্যা, লুটতরাজ, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে এদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। তাই তখনকার বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে এদেশের শ্রমিক, কৃষক, জনতার পাশাপাশি ছাত্রসমাজও মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধে শতকরা ৭০ ভাগই ছিল ছাত্র। প্রথমদিকে বাংলার দামাল ছাত্রসমাজ কোনো ট্রেনিং ছাড়াই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অস্ত্র হাতে নিয়েছিল।

ছাত্রদের আত্মত্যাগ : দিন নেই, রাত নেই, সময় নেই– কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে তাদের। এক পা, দুই পা করে শেষে হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে অগ্রসর হতে হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বুলেটবিদ্ধ করে ধরাশায়ী করেছে শত্রুকে। কখনো কখনো মাথার ওপর বৃষ্টি ঝরেছে– আহার নেই, নিদ্রা নেই, পরনে একখানি মাত্র লুঙ্গি। এ অবস্থায় কাঁধে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে উল্কার মতো ছুটতে হয়েছিল দানব হননের নেশায়। মাথার ওপর তীব্র অগ্নিঝরা দাহন, কিন্তু শত্রুর জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কখনো বা আত্মদান করতে হয়েছে তাদের।

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের গেরিলা যুদ্ধের সুযোগ নিতে হয়েছে। এভাবে যুদ্ধ করে শত্রুকে সহজে কব্জা করার কৌশল আয়ত্ত করে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ সাফল্য লাভ করেছিল। হয়তো ঝোপে-ঝাড়ে ক্যাম্প তৈরি করা হয়েছে অথবা কোনো পোড়াবাড়িতে স্থাপিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির। মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরুণ ছাত্র। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ যোদ্ধা। এভাবেই বাংলার ছাত্রসমাজ ধৈর্য, অধ্যবসায়, সাহস, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে বাংলার স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

অভিনব কৌশল অবলম্বন : জাগ্রত ছাত্রসমাজ এই বর্বর অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে থাকে। বিপুলসংখ্যক ছাত্র মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে চলে যায়। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হয়ে পশ্চিমা সেনাবাহিনীর ওপর গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ চালাতে থাকে। মুক্তিবাহিনীর ছাত্ররা বাইরে থেকে যেমন হামলা চালাতে থাকে তেমনি অসংখ্য মুক্তিসেনা দেশের বিভিন্ন অংশে হামলা চালিয়ে অনেক স্থান শত্রুমুক্ত করে। ফলে শত্রুবাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

উপসংহার : সুদীর্ঘ নয় মাসের কঠোর সংগ্রামের পর ছাত্র ও তরুণদের অবর্ণনীয় ত্যাগের ফলে বাংলার আকাশে উদিত হয় স্বাধীনতার লাল টকটকে সূর্য। ছাত্র-জনতাসহ ত্রিশ লাখ বাঙালির রক্তের অক্ষরে রচিত হয় এক নতুন ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে একটি নতুন দেশ। তার নাম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ছাত্রসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদানের কথা বাঙালি জাতি আজীবন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

৩০ আকাশ সংস্কৃতি [ফা. প. ২০০৩]

অথবা, আকাশ সংস্কৃতি ও আমাদের করণীয়

অথবা, আকাশ-সংস্কৃতি : অভিশাপ নাকি আশীর্বাদ

উপস্থাপনা : বর্তমান যুগকে Age of Science বা বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। কারণ বিজ্ঞানের জয়জয়কার অবস্থা এখন বিশ্বব্যাপী। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার (Electronic Media) বদৌলতে একটি নতুন ভাবনা ও বাস্তবতার সৃষ্টি হয়েছে, তা হলো আকাশ-সংস্কৃতি। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ভীষণ ব্যস্ত মানুষ আকাশ-সংস্কৃতির করাল আগ্রাসনের শিকার।

আকাশ-সংস্কৃতি : সংস্কৃতি শব্দের অর্থ বিনোদন, কর্ষণ, সংশোধন, শুদ্ধিকরণ। অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতিনীতি ও মার্জিত আচার-আচরণ ইত্যাদির উৎকর্ষ হলো কৃষ্টি (Culture) বা সংস্কৃতি।

নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Taylor) বলেন– "Culture is the complex which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom and any other capability and habits acquired by men as a member of society." এ হিসেবে আকাশ-সংস্কৃতি হলো আকাশের মাধ্যমে সৃষ্ট সংস্কৃতি। বলা বাহুল্য, বর্তমান বিশ্ব একটি Global village বা বিশ্বগ্রাম। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সুবাদে আকাশ-সংস্কৃতির নেটওয়ার্ক বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তৃত। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার অধিকারিগণ তাদের মতবাদ, ধ্যান-ধারণা, তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা ইত্যাদি উপস্থাপন করে বিশ্বমানব গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। মানুষ তা থেকে শিখছে এবং এসব সংস্কৃতি গ্রহণ করছে।

আকাশ-সংস্কৃতির সূচনা : প্রাচীন যুগে পায়রার পায়ে পত্র বেঁধে রাজায় রাজায় বা রণাঙ্গনে খবর পৌছানো থেকে আকাশ পথ ব্যবহারের ধারণা জন্মে। ইতালির বিজ্ঞানী জি. মার্কোনি বেতার আবিষ্কার (১৮৯৫) করলে আকাশ-সংস্কৃতির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। জন লগি বেয়ার্ড ১৯২৫ সালে টেলিভিশন আবিষ্কার করেন। এর ফলে আকাশ-সংস্কৃতিতে বিপ্লব সাধিত হয়। মানুষ এসব মাধ্যমে প্রচার করতে শুরু করে তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন তথ্য, বিষয়াদি, বুদ্ধিবৃত্তি, আবিষ্কার, বিনোদন সাধারণ দর্শক-শ্রোতার নিকট বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা চালায়।

আকাশ-সংস্কৃতির প্রকারভেদ : আকাশভিত্তিক মাধ্যমে (Media) বিভিন্নতার কারণে আকাশ-সংস্কৃতির বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। যথা– বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে শুধু তথ্য শ্রবণ করা যায়। টেলিভিশনের মাধ্যমে শোনার পাশাপাশি অনুষ্ঠান উপস্থাপক, পাত্রপাত্রী সবকিছু দেখাও যায়। আধুনিক কালের সর্বাধুনিক মাধ্যম (Media) ইন্টারনেটের মাধ্যমে শোনা, দেখা ছাড়াও তথ্য ডাউনলোড করে প্রিন্ট নেওয়া যায়।

আকাশ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক : আকাশ সংস্কৃতি বা আকাশভিত্তিক মাধ্যমে পরিচালিত অনুষ্ঠানাদির বিভিন্ন দিক ও বিভাগ রয়েছে। যথা–

ক. **সংবাদ :** আকাশভিত্তিক প্রচার মাধ্যমের অন্যতম দিক সংবাদ পরিবেশনা। আধুনিক আকাশ-সংস্কৃতির মাধ্যমসমূহ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে।

খ. **শিক্ষা :** আকাশ-সংস্কৃতির বিশেষ দিক হলো শিক্ষা। বর্তমান সময়ের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক প্রোগ্রামও প্রচারিত হয় বেতার ও টেলিভিশনে।

গ. **বিনোদন :** আকাশ-সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রভাবশালী বিষয় হলো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান। বাহারি অনুষ্ঠানাদি মানুষের চিত্তবিনোদনে সহায়ক হলেও যৌন-উদ্দীপক ও অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচার আকাশ-সংস্কৃতির সর্বাধিক ক্ষতিকর দিক হিসেবে চিহ্নিত।

ঘ. **অন্যান্য :** আকাশ-সংস্কৃতির মাধ্যমে আরও বিবিধ অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হয়। যেমন– খেলাধুলা, প্রামাণ্য অনুষ্ঠানাদি, ধর্মসংক্রান্ত বিষয়াবলি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, রাজনৈতিক তথ্যাদি, কৃষিতথ্য, বাজার ব্যবস্থা, আবহাওয়া ইত্যাদি।

আকাশ-সংস্কৃতি ও গোয়েবলসীয় তত্ত্ব : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে জার্মানির চ্যান্সেলর হিটলার তার প্রেস সেক্রেটারির দায়িত্ব দিয়েছিলেন গোয়েবলসের ওপর। গোয়েবলসের মতে, "একটি মিথ্যা সংবাদ বারবার প্রচার করলে তা সত্য হিসেবে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে।" বর্তমান আকাশ-সংস্কৃতির তথ্য সম্প্রচার গোয়েবলসীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষত ইসলামি আন্দোলন ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে চলছে নগ্ন তথ্যসন্ত্রাস। এমনি তথ্যসন্ত্রাসের শিকার আজ আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, লেবানন, মিসর, তুরস্ক, ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম দেশ। গোয়েবলসের আধুনিক প্রেতাত্মারা ১১ই সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে হামলার ধুয়ো তুলে প্রমাণহীনভাবে তা মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেয়।

অশ্লীল জাহেলী সংস্কৃতি : আধুনিক যুগে আকাশ-সংস্কৃতির ভয়াবহ দিক হলো অশ্লীলতার বিস্তার। অশ্লীল যৌনোদ্দীপক নৃত্য, নারীদেহের নগ্ন প্রদর্শনী ইত্যাদির ফলে যুবসমাজের চরিত্র ধ্বংস হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার পরিবর্তে যৌনাচারী অসভ্য জাহেলী বিকার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে উঠছে যুবসমাজ। ফলে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে ধর্ষণ, সম্ভ্রমহানী ও বেশ্যাবৃত্তির। আধুনিক সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে আকাশ-সংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমসমূহ।

সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিস্তার : আধুনিক আকাশ-সংস্কৃতি বিশেষত স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টিনার বিস্তারের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে সন্ত্রাসনির্ভর ও নৈরাজ্যকর। স্যাটেলাইট ডিশ অ্যান্টিনার বিভিন্ন চ্যানেলে মানুষ শিখছে সন্ত্রাস, অস্ত্রবাজি, মাদকদ্রব্যাদির বিস্তার, অন্যায় ও অশ্লীলতা। ফলে সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিস্তার লাভ করছে সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র শিক্ষা ছেড়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে সন্ত্রাসীদের। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, কিন্তু আকাশ-সংস্কৃতির ভয়াবহ ছোবলে চরিত্র গঠনের পরিবর্তে সৃষ্টি হচ্ছে শত শত ধর্ষণ সেঞ্চুরিয়ান মানিকের। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও রাজনৈতিক সংগঠনের এ ছাত্রনেতা একশবার ধর্ষণের পর সেঞ্চুরি অনুষ্ঠান পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলে। ইভটিজিং-এর শিকার হচ্ছে দেশের শত শত নারী, পরকিয়ার মাধ্যমে ভেঙে যাচ্ছে হাজারো সুখের সংসার, সম্ভ্রম হারাচ্ছে দেশের অগণিত মা-বোন, এসিড সন্ত্রাসের নির্মম শিকারে পরিণত হচ্ছে অসংখ্য তরুণী। এ হচ্ছে আকাশ-সংস্কৃতির নির্মম বাস্তবতা।

আকাশ-সংস্কৃতি ও আমাদের করণীয় : আকাশ-সংস্কৃতি মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে বড় ধরনের একটি চ্যালেঞ্জ। মুসলমানদের বড় শক্তি ঈমান ও তাকওয়াকে ধ্বংস করে দিচ্ছে আকাশ-সংস্কৃতি। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধে অব্যাহত মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটিয়ে একটি একটি করে মুসলিম দেশ সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গ্রাস করে নিচ্ছে, মেতে উঠেছে নব্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায়। একদিকে বিনোদনের নামে নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও নারীদেহের নগ্ন প্রদর্শনী; অপরদিকে তথ্যসন্ত্রাস চালিয়ে মুসলমানদেরকে কোণঠাসা করে ফেলার সর্বগ্রাসী ষড়যন্ত্রে মুসলিম উম্মাহ আজ দিশেহারা। এহেন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম উম্মাহকে সমান্তরাল ইতিবাচক (Parallel positive) পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আকাশ-সংস্কৃতির মাধ্যমসমূহে (Media) নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহে পর্যায়ক্রমে মুসলিম উম্মাহর শক্তিশালী প্রতিনিধিত্ব কায়েম করতে হবে। এসব প্রচার মাধ্যমে ইসলামের শাশ্বত সুন্দর আদর্শের শিল্পময় উপস্থাপন করার লক্ষ্যে সুযোগ্য ও প্রতিভাধর সাংস্কৃতিক কর্মীবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। অশ্লীলতা, নগ্নতা ও আধুনিক জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ শুরু করতে হবে। প্রকৃত ঘটনার বাস্তবানুগ উপস্থাপন করে পশ্চিমাদের তথ্যসন্ত্রাসের মোকাবেলায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে।

উপসংহার : বর্তমান দুনিয়ায় আকাশ-সংস্কৃতির প্রচার মাধ্যমসমূহের প্রায় সবটাই দখল করে আছে ইসলামের শত্রুরা। বিশেষত পরাশক্তি ব্রিটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়াসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে ইহুদিরা। তাদের নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী তাগুতি শক্তি কর্তৃক ইসলাম এবং মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করার সর্বনাশা এক নীল-নকশা প্রণীত হয়েছে। সে নীল-নকশা অনুসারে সুপরিকল্পিতভাবে আকাশ-সংস্কৃতির আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে। এমনি সংকটময় মুহূর্তে মুসলিম উম্মাহকে অনৈক্য ও হীনম্মন্যতার অবসান ঘটিয়ে বেতার-টেলিভিশনের জগতে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩১ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

অথবা, অপসংস্কৃতি [ফা. প. ১৯৯৫, '৯৮]

অথবা, অপসংস্কৃতি ও তরুণ সমাজ

উপস্থাপনা : সংস্কৃতি মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যুগ-যুগান্তরে লালিত মানুষের জীবনপ্রণালিই সংস্কৃতি। সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে, অনুভবে, প্রাণে প্রাণে সংস্কৃতি অনুরণিত হয়। আর সংস্কৃতির এ চেতনা যখন কলুষিত হয়, মহৎ উদ্দেশ্য যখন ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয় তখন তাকে বলা হয় অপসংস্কৃতি। আর এ অপসংস্কৃতির প্রভাবে যখন দেশের তরুণ সমাজ বিপথগামী হয়, তখন দেশের সার্বিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়।

সংস্কৃতির পরিচয়

আভিধানিক অর্থ : সংস্কৃতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Culture। এর আভিধানিক অর্থ– কর্ষণ করা। আরবিতে সংস্কৃতির প্রতিশব্দ হলো ثقافة (সাকাফাহ) এর অর্থ– সফল হওয়া, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পাওয়া।

বাংলায় সংস্কৃতি শব্দের আভিধানিক অর্থ– বিশোধন, সংশোধন এবং শুদ্ধিকরণ, পতিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করা, পরিষ্কার বা নির্মলকরণ, উৎকর্ষ সাধন, উন্নতি বিধান ইত্যাদি।

মোটকথা সংস্কৃতি মানে পরিশীলিত, মার্জিত, উন্নত ও রুচিসম্মত জীবনবোধ ও জীবনাচার।

পারিভাষিক সংজ্ঞা :

ক. কোনো জাতির বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার বিশেষ গুণান্বিত আঙ্গিকের পরিশীলিত ব্যবহারিক বহিঃপ্রকাশকে সংস্কৃতি বলা হয়।

খ. কার্ল মার্কস বলেছেন– Culture is earned behaviour অর্থাৎ, সংস্কৃতি হলো অর্জিত আচরণ।

গ. মেথিউ আরনল্ড বলেন, "পৃথিবী সম্বন্ধে যা উৎকৃষ্ট বলা বা চিন্তা করা হয়েছে, তা জানাই হচ্ছে সংস্কৃতি বা কৃষ্টি।" ইংরেজি Culture শব্দের প্রতিশব্দ সংস্কৃতি। একটি জাতির দীর্ঘদিনের জীবনযাত্রাপ্রণালির মধ্য দিয়ে যে মানবিক মূল্যবোধ সুন্দরের সাথে কল্যাণের পথে এগিয়ে চলে তা-ই সংস্কৃতি।

অপসংস্কৃতি : সংস্কৃতির বিকৃত রূপই অপসংস্কৃতি। আমাদের আত্মার সাথে, আচরণের সাথে, জীবনবোধের সাথে যার কোনো যোগ নেই, যা আমাদের জীবনকে কলুষিত করে, আমাদের জীবনে ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে, তা-ই অপসংস্কৃতি। স্থায়ীভাবে মনোমুগ্ধকর, আকর্ষণীয়, মোহনীয় ও হৃদয়গ্রাহী হলেও এ থেকে কোনো শুভফল আশা করা যায় না। অপসংস্কৃতি জীবনকে বিকশিত না করে শ্রীহীনতার দিকে টেনে নেয়।

অপসংস্কৃতির নিদর্শন : আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে যে অপসংস্কৃতির হিংস্র থাবা বিস্তার করে আছে তা সহজেই অনুমেয়। আমাদের সমাজের তরুণ-তরুণীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন, আচার-আচরণ দেখলেই অপসংস্কৃতির অশুভ প্রভাব লক্ষ করা যায়। দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে অবহেলা করে আমাদের তরুণসমাজ বিদেশি জীবনবোধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য স্টাইলে ডিসকো নাচ, গান ও অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে অহরহ।

অশ্লীল জাহেলী সংস্কৃতি : আধুনিক যুগে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতির ভয়াবহ দিক হলো অশ্লীলতার বিস্তার। অশ্লীল ও যৌনোদ্দীপক চালচিত্র, নৃত্য, নারীদেহের প্রদর্শন ইত্যাদির ফলে যুবসমাজে নৈতিক অধঃপতন ঘটছে। সুষ্ঠুভাবে সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠার পরিবর্তে তারা যৌনাচারী অসভ্য জাহেলী বিকার মানসিকতাসম্পন্ন হয়ে বেড়ে উঠছে। ফলে ব্যাপক বিস্তার ঘটছে ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, পরকীয়া প্রেম, ধর্ষণ, সম্ভ্রমহানী ও বেশ্যাবৃত্তির। আধুনিক সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড় করিয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও প্রচার মাধ্যমসমূহ।

অপসংস্কৃতির কুফল : সংস্কৃতি সুন্দরের পথ দেখায়, আর অপসংস্কৃতি অসুন্দরের পথে, অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। অপসংস্কৃতি স্থায়ী নয়, তা ক্ষণিক ও উত্তেজক। সেজন্যই তা ক্ষতিকর। সুষ্ঠু সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফলে লব্ধ সুন্দরের অনুদান। তা থেকে চ্যুত হলেই অপসংস্কৃতি প্রবেশাধিকার পায়। কোনো জাতির জীবনে অপসংস্কৃতি একবার ঢুকলে তা অপসারণ করা কঠিন। অপসংস্কৃতি মূল্যবোধের মৃত্যু ঘটায়, বিবেকের দরজায় অর্গল লাগায়। মানুষকে তার মা, মাটি ও দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

অপসংস্কৃতি ও তরুণ সমাজ : তরুণ সমাজ দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ, আগামী দিনের জাতির কর্ণধার, জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার কান্ডারি। অপসংস্কৃতির হিংস্র ছোবলে এ তরুণ সমাজ যদি বিপথগামী হয়, তাহলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আমাদের দেশের তরুণ সমাজ সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের নামে অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে নিজেদের জীবনবোধ, চিন্তা-চেতনাকে পাশ্চাত্য দর্শনের অনুকরণে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে।

দেশ ও মাটির সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক : সংস্কৃতি হলো পরিশীলিত জীবনবোধ, মানুষের দীর্ঘদিনের সাধনার ফল। আমরা যে শিক্ষা অর্জন করেছি, যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে জীবন গড়ে তুলেছি, তা যদি দেশকে ভালোবাসতে না শেখায়, দেশের মানুষের প্রতি দরদি হতে না শেখায়, জীবনকে প্রেমময় না করে, তাহলে এ শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে দেশের মাটি ও মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। এই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ ধরে আমরা নিজস্ব মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে শুরু করেছি।

অপসংস্কৃতি রোধের উপায় : বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে গণমাধ্যম ও প্রযুক্তির বদৌলতে অপসংস্কৃতির সহজ শিকার হওয়ার সব পথই খোলা রয়েছে। কিন্তু এ অপসংস্কৃতির হিংস্র প্রভাব থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত সমাজকে এ বিষয়ে সচেতন ও সোচ্চার হতে হবে। বিদেশি কোনো সংস্কৃতি গ্রহণ করার আগে দেখতে হবে তার সাথে জীবনের সম্পর্ক কতটুকু? যে সংস্কৃতি আমাদের জীবনবোধ উন্নত করবে, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমুন্নত করবে, সেগুলো গ্রহণ করে বাকিগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।

উপসংহার : সংস্কৃতি জীবনচেতনার প্রতিশ্রুতি। পরিশীলিত সংস্কৃতি চর্চা অত্যাবশ্যক। আমাদের তরুণ সমাজ যেহেতু জাতির আগামীদিনের কর্ণধার, তাই সংস্কৃতিচর্চার নামে তারা যেন বিধ্বংসী আচরণে লিপ্ত না হয় এজন্য তাদেরকে সচেতন করে তুলতে হবে। যে সংস্কৃতি জীবনকে মহিমা দেয়, হৃদয়কে প্রেমপূর্ণ করে, মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়, তরুণদেরকে সে সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে। তবেই তারা দেশপ্রেমিক ও দেশীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক হয়ে গড়ে উঠবে।

৩২ কৃষিকাজে বিজ্ঞান [ফা. প. ২০১১, '১৪]

অথবা, কৃষি উন্নয়নে বিজ্ঞান

অথবা, কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

উপস্থাপনা : আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিত্য নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে সভ্যতার চরম উন্নয়ন সাধন করেছে। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যেদিন মাটিতে বীজ বুনে ফল ও ফসল ফলাতে শুরু করল, সেদিন থেকেই ফসল উৎপাদনের কাজে নতুন পন্থার উদ্ভাবন হলো। শুরু হলো কৃষিকাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগ। ফলে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসল উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষিখাতে বিজ্ঞানের প্রভাব : একবিংশ শতাব্দীর এই ঊষালগ্নে বিশ্ববাসীর জীবনে বিজ্ঞান এতটাই প্রভাব ফেলেছে যে, বিজ্ঞান ছাড়া আজ সভ্য মানবজীবনই কল্পনা করা যায় না। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের প্রয়োগে ফসল উৎপাদনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগে আজ মরুভূমিও হয়ে উঠছে শস্যশ্যামল। মানুষ আজ উদ্দাম নদীস্রোতকে বশীভূত করে উষ্ণ মরুপ্রান্তরকে করছে পানিসিক্ত। অনুর্বর কঠিন ভূমিকে উর্বর করে তাকে করা হচ্ছে শস্যবতী। এতে শস্য উৎপাদনে সূচিত হয়েছে যুগান্তকারী বিপ্লব।

কৃষিকাজে বিজ্ঞানের প্রয়োজন : পৃথিবীতে জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ কৃষিজমি বাড়ছে না; বরং অধিক হারে বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে বলে কৃষিজমি ক্রমশ কমছে। অপরদিকে উৎপাদনও বাড়ছে না। বিশেষত আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল

দেশগুলোতে প্রাচীন পদ্ধতির চাষাবাদের ফলে উৎপাদিত শস্য বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। অথচ উন্নত দেশগুলোতে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে উৎপাদন বাড়ছে। আমাদের দেশেও মানুষের খাদ্যাভাব পূরণের জন্য কৃষিকাজে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যাপকভিত্তিতে ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কৃষিকাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার : উৎপাদনের সকল স্তরে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে চাষাবাদ পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে মান্ধাতা আমলের কাঠের লাঙল, বলদ, মই, নিড়ানি, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদির পরিবর্তে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, যেমন– জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ বোনার জন্য সিডলিং, মই দেওয়ার জন্য লেভেলার, পানি সেচের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, আগাছা পরিষ্কারের জন্য উইডার, ফসল সংগ্রহের জন্য হারভেস্টার, ফসল মাড়াইয়ের জন্য থ্রেসার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়।

বীজ উৎপাদনে বিজ্ঞান : উন্নতমানের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান রেখে চলেছে অসামান্য অবদান। এক্ষেত্রে ধান ও গমের উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদনের কথা না বললেই নয়। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মার্কিন বিজ্ঞানি নর্মান বেরলেগের উচ্চ ফলনশীল গম আবিষ্কার করে কৃষিকাজে বিজ্ঞানের মহতী উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইবি-৮ নামক উচ্চ ফলনশীল ধান আবিষ্কার করেছে। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এসব সাফল্য কৃষিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি গবেষণায় বিজ্ঞান : কৃষি গবেষণায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য। যেমন–

ক. কৃষিজাত দ্রব্য বা পণ্যের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও নতুন ধরনের বীজ উদ্ভাবন।

খ. অপ্রচলিত কৃষিজাত দ্রব্য বা পণ্যের ব্যবহার এবং চাষাবাদ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ।

গ. পরিবেশ ও আবহাওয়া দূষণের সাথে সম্পর্ক বিধান করে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী সার ও কীটনাশক প্রভৃতির প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষিকাজের গুরুত্ব : বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। এ দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা বলতে গেলে প্রায় সবটাই জোগান দেয় কৃষি। অথচ ক্ষুদ্রায়তন বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিপুলতা অপেক্ষা কৃষিজমির পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। আমাদের দেশ কোনো কোনো অঞ্চলে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখা গেলেও সার্বিক বিবেচনায় তা যথেষ্ট নয়। প্রচলিত প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সমতা বজায় রেখে কৃষিক্ষেত্রে ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। আমাদের মাটির তুলনায় জাপানের মাটির স্বাভাবিক উৎপাদন ক্ষমতা এক-চতুর্থাংশ। অথচ তারা কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে আমাদের চেয়ে কম জমিতে সর্বাধিক ফসল ফলিয়ে খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। তাই আমাদের দেশে উন্নত বীজ ও কৃষিক্ষেত্রের মান অনুযায়ী রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে।

উপসংহার : বিজ্ঞান জীবনের সকল দিকেই উন্নতির স্বাক্ষর রেখেছে। কৃষিকাজে বিজ্ঞানের অবদান অনন্য। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন সম্পূর্ণরূপে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে আমরা খাদ্য সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে পারি।

৩৩ দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব [ফা. প. ১৯৯৪]

অথবা, বিজ্ঞান ও আধুনিক সভ্যতা

উপস্থাপনা : আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তনে বিজ্ঞানের রয়েছে বিস্ময়কর শক্তি। হাক্সালি তার Brave New World গ্রন্থে বিজ্ঞানের এমন বিস্ময়কর অগ্রগতি কল্পনা করেছেন, যখন যন্ত্রে মানুষ সৃষ্টি হবে। তার কল্পিত ভবিষ্যৎ কোনোদিন বাস্তবে পরিণত হবে কিনা, তা চিন্তা না করে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আদিম যুগের অরণ্যচারী ও গুহাবাসী মানুষ বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই বর্তমান সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে। দার্শনিক Bertrand Russell বলেছেন– The whole civilization has been glorified and enriched with the wonders of science.

বিজ্ঞানের অতীত ও বর্তমান : অরণ্যচারী আদিম মানব ছিল অসহায় এবং প্রকৃতির খেয়ালের অধীন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে মানুষ আজ আপন প্রয়োজনে, উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের বাধা অতিক্রম করেছে, প্রতিটি রহস্যকে করেছে উন্মোচিত। জীবনের পথ চলার প্রতিটি মুহূর্তকে বিজ্ঞান পরিপূর্ণ করেছে নিজের আশীর্বাদে।

প্রাত্যহিক জীবন ও বিজ্ঞান : জীবনের সকল স্তরে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে বিজ্ঞান। একটি ব্যস্তদিনের কথাই ধরা যাক। আপনার ঘুম ভেঙেছে। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হচ্ছেন। বিজ্ঞান আপনার হাতে তুলে দিল টুথব্রাশ আর চমৎকার সৌরভের টুথপেস্ট। অফিসে যাওয়ার জন্য বিজ্ঞান আপনার জন্য তৈরি করেছে দ্রুতগামী বিলাসবহুল যানবাহন। অফিসে পৌঁছেও আপনি বিজ্ঞানের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হননি। আপনার মাথার উপর ঘুরছে ফ্যান, হাতের কাছে রয়েছে টেলিফোন। এছাড়াও কম্পিউটার, ফ্যাক্স ইত্যাদির উপস্থিতিতে আপনার অফিসের যে দৃশ্য তা হয়তো প্লেটোর দার্শনিক রাজ্যকেও হতবুদ্ধি করে দেবে।

আমাদের দেশ ও বিজ্ঞান : পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের বিজ্ঞান তার সম্ভাবনাময় আশীর্বাদে জাতীয় জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময়। দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বাস করে দারিদ্র্যসীমার নিচে। তারাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের কোনো না কোনো আশীর্বাদ উপভোগ করছে প্রাত্যহিক জীবনে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান তাদের জীবনে কোনো বৃহত্তর কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি। সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনসহ বিজ্ঞানের অনেক প্রাত্যহিক আশীর্বাদ এখনো তাদের নাগালের বাইরে। বিজ্ঞান নয় বরং দু'মুঠো অন্ন জোগাড় তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য তাদের এই দুর্দশার জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়; বরং সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানের সর্বাত্মক প্রয়োগের মাধ্যমে এ দুর্দশা থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব।

মানবজীবনে বিজ্ঞানের বহুমাত্রিক অবদান : সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের সাথে বিজ্ঞান জড়িত। মানবজীবন আর বিজ্ঞান একই সূত্রে গ্রথিত। যাতায়াত, কৃষি, শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রকৌশলসহ জীবনের হাজারো ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। নিচে এর কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো :

মানবকল্যাণে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ সাধন। বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে মানুষের জীবনকে সুখী-সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার জন্য। কীসে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে ওঠে, কেমন করে গোটা মানবসমাজ মিলেমিশে জীবনযাপন করতে পারে, প্রথম থেকেই বিজ্ঞান সে সাধনায় ব্রতী।

শিল্পক্ষেত্রে বিজ্ঞান : মানবজীবনের কল্যাণ সাধনে আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান সর্বাধিক। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞান নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়ে আবির্ভূত হয়। বিভিন্ন উন্নত যন্ত্রপাতি, কলকব্জা আবিষ্কার করে শিল্পজগতে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে বিশ্ববাসীকে উপহার দেওয়ার জন্য বিজ্ঞানের নিরলস প্রচেষ্টা আজ সফল। এজন্য বর্তমান যুগকে Age of Science বলা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান : আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করে বিজ্ঞান কৃষির উৎপাদন অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সেচ ও চাষাবাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি, উন্নতমানের রাসায়নিক সারের আবিষ্কার, উন্নত বীজ ও কীটনাশক আবিষ্কার কৃষিক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার : আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান সময় ও দূরত্বকে জয় করেছে। বৈজ্ঞানিকগণ তাদের মেধা খাটিয়ে আকাশযানের সাহায্যে বিহঙ্গের ন্যায় শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে। মাইকেল ফ্যারাডে বিদ্যুৎ আবিষ্কার করলেন, যা কাজে লাগালেন টমাস এডিসন। বিদ্যুৎ সর্বত্র আলো জ্বালাল, ট্রাম চালাল, পাখা ঘুরাল। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন প্রভৃতি বিদ্যুৎ তরঙ্গের রহস্যময় শক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার কম্পিউটার : বিজ্ঞান কম্পিউটার আবিষ্কারের মাধ্যমে মানুষের শ্রম ও সময়কে জয় করেছে। কম্পিউটার আধুনিক বিশ্বের অনন্য বিস্ময়। যানবাহন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, রেল ও বিমানের আসন সংরক্ষণ, খেলাধুলা, মুভি দেখা থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজ কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে ও ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিপ্লব এনে দিয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষ আজ অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুকে জয় করেছে। অধ্যাপক রঞ্জনের আবিষ্কৃত 'রঞ্জন রশ্মি', অধ্যাপক কুরী ও মাদাম কুরী আবিষ্কৃত 'রেডিয়াম' চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। রঞ্জন রশ্মি ও আলট্রাসনোগ্রাফির সহায়তায় শরীরের অদৃশ্য অংশ দৃশ্যমান হয়। রেডিয়ামের সাহায্যে ক্যান্সারের মতো ভয়ংকর ক্ষতের মারাত্মক বিষক্রিয়া অনেকাংশে প্রশমিত হয়। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি মহৌষধ মানুষকে নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞান : মুদ্রণযন্ত্র, ক্যালকুলেটর, কাগজ, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি সবকিছুই বিজ্ঞানের দান। কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় যুক্ত করেছে এক নতুন শিক্ষা পদ্ধতি। তাছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন বিখ্যাত লাইব্রেরির বই, বিখ্যাত শহর-বন্দর, বাণিজ্য, দেশ ইত্যাদি বিষয়ে মুহূর্তেই জানা সম্ভব হচ্ছে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত।

আণবিক শক্তির আবিষ্কার : আণবিক শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের আধুনিকতম কৃতিত্ব। আণবিক গবেষণার ভেতর দিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বচরাচরের অদৃশ্য শক্তি খুঁজে বের করেছে। এ শক্তি যদি কল্যাণমূলক কাজে লাগানো যায় তাহলে পৃথিবী শস্য, সম্পদ ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আণবিক বা এটমিক রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হতে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়। আণবিক শক্তির সংযত পরিচালনায় বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যাবে– বিজ্ঞানীরা এ আশাও ব্যক্ত করেন।

বিজ্ঞানের সার্থকতা : জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কল্যাণপ্রসূ করে তোলাই বিজ্ঞানের সার্থকতা। এ সার্থকতার পথ ধরেই বিজ্ঞান অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে চলেছে সম্মুখপানে। বিজ্ঞানের অপরিসীম ক্ষমতাবলে আজ মানুষ প্রকৃতির ওপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

বিজ্ঞানের অপকারিতা : বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য হলেও বিজ্ঞান বিশ্ব মানবের জন্য সর্বক্ষেত্রে সুফল বয়ে আনেনি। বিজ্ঞান অঢেল স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে দুর্দশাও ডেকে এনেছে। বিজ্ঞান মানবের জীবনযাত্রা জটিল এবং চিন্তাধারাকে কুটিল করেছে। যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে করেছে নির্দয় ও নিষ্ঠুর। বিজ্ঞানের অপব্যবহারের কারণেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা সম্ভব হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তারের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বায়ু ও শব্দ দূষণ। জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে রোগ-ব্যাধির প্রকোপ। এ সব কিছুর জন্য দায়ী বিজ্ঞানের প্রয়োগকারী, বিজ্ঞান নয়। তাই বিজ্ঞানের এ ধরনের নিষ্ঠুর ধ্বংসযজ্ঞ দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থা তাহার
লোভ জটিল বন্ধ।

উপসংহার : মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। পানি ও বাতাস বাদ দিলে যেমন জীবনের কাজকর্ম স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনি বিজ্ঞানকে বাদ দিলেও সভ্যজগৎ প্রাণহীন ও নিস্পন্দ হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই আমরা লাভ করেছি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন। অন্যদিকে বিজ্ঞানকে যদি কেউ অশুভ কাজে ব্যবহার করে, তাহলে তা মানবজাতির জন্য ধ্বংসও বয়ে নিয়ে আসতে পারে।

৩৪ মানবকল্যাণে বিজ্ঞান

[ফা. প. ২০০৯, '১২]

উপস্থাপনা : আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় আজ বিশ্বজগৎ বিস্ময়কর উন্নতির চরম শীর্ষে উপনীত হয়েছে। বিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় অবদান আজকের বিশ্বের মানুষের জীবনকে করেছে সহজ, সুন্দর ও সুখকর। বিজ্ঞানের উন্নতিতে আজ বিশ্বজগৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত। আজ মানবিক কল্যাণের প্রতিটি শাখা বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য।

বিজ্ঞানের পরিচয় : 'বিজ্ঞান' অর্থ বিশেষ জ্ঞান। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Science. মানুষের যে জ্ঞানের মাধ্যমে অভিনব আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে তার নাম-ই বিজ্ঞান।

বিজ্ঞানের অভিযান : মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত বিজ্ঞানের অভিযান দুরন্ত দুর্বার এবং বাধা-বন্ধনহীন। বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব, অপ্রতিরোধ্য বা অগম্য বলে কিছু নেই। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অভিযানে মানবসমাজ আজ বিস্মিত ও উদ্বেলিত।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার : সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় অগ্রসর হয়ে বিজ্ঞান বর্তমানে পূর্ণরূপে বিকশিত। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ সভ্যতার চেহারাকে পাল্টে দিয়েছে, মানবকল্যাণের পথকে ত্বরান্বিত করেছে আরও একধাপ। বিজ্ঞানের অপার কল্যাণে মানুষ আজ ঘরে বসে পৃথিবীর অপর প্রান্তের খবর শুনছে, ছবি দেখছে এবং আপনজনের সাথে কথা বলছে। উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। অত্যাধুনিক ওষুধ আবিষ্কার করে বিজ্ঞান অনেক মুমূর্ষু রোগীর রোগ-যন্ত্রণা লাঘব করছে। বিজ্ঞানের এসব আবিষ্কার মানবকল্যাণেই নিবেদিত।

বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীলতা : বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার নিপুণ হাত সম্প্রসারিত করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে প্রায় সকল ক্ষেত্রে আমরা বিজ্ঞানের ওপর

নির্ভরশীল। পড়ার টেবিল থেকে শুরু করে অফিস-আদালত, সড়কপথ, নৌপথ, আকাশপথ এবং কৃষির উন্নয়নে অতুলনীয় কল্যাণ দিচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। আমাদের প্রতিটি কাজের সহায়কই বিজ্ঞান এবং আমরা বিজ্ঞানের ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান : দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান আমাদের নিত্যসঙ্গী। দাঁত ব্রাশের জন্য সুঘ্রাণসমৃদ্ধ পেস্ট, রান্নার জন্য গ্যাস, অফিসে যেতে দ্রুততম এসি গাড়ি, ফ্যান, ফোন ও ফ্যাক্স এসবই তো বিজ্ঞানের কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে।

মানবকল্যাণে বিজ্ঞান : বিজ্ঞান মানবজাতির বিস্ময়কর সাফল্য। মানুষের প্রকৃত কল্যাণসাধনই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। আমাদের সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। মানব ইতিহাসের গোড়া থেকেই লক্ষ করা গেছে যে, বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য।

মানবকল্যাণে আধুনিক বিজ্ঞান : মানবজীবনের সর্বাধিক কল্যাণসাধনের জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান অপরিসীম। বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবজীবনকে অনেক সহজ, সুন্দর, সমৃদ্ধ ও সুখী করে তুলেছে। বিজ্ঞানের সীমাহীন শক্তির জোরে মানুষ বিশ্বজগতকে হাতের মুঠোয় এনেছে। মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য বিজ্ঞান নানাবিধ অভিনব কৌশল ও পথনির্দেশ করছে।

শিল্পে বিজ্ঞান : আধুনিক সভ্যতার উন্নতি ও মানবকল্যাণ অনেকাংশেই শিল্পের ওপর নির্ভরশীল। শিল্প-কারখানা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র, ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ শক্তির যোগান দিচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত শিল্প-কারখানায় কাজ করে অনেক মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে।

প্রকৌশল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশে প্রকৌশল বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৌশল বিজ্ঞান নানা অসম্ভবকে সম্ভব করে। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে নতুন নতুন দালানকোঠা। অত্যাধুনিক রাস্তা, হাইওয়ে এবং টুইন টাওয়ারের মতো বিচিত্র স্থাপনা। এসব প্রকৌশল কাজে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত কলাকৌশল ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বিজ্ঞান মানব সভ্যতাকে নিয়ে গেছে আরও একধাপ এগিয়ে।

কৃষিতে বিজ্ঞান : কৃষিকাজে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি বিজ্ঞানের অবদান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি চাষের জন্য ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, বীজ বপনের জন্য সিডলিং, মই দেওয়ার জন্য লেডার, পানি সেচের জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপ, পাওয়ার পাম্প, ফসল সংগ্রহের জন্য হারভেস্টার ইত্যাদি সবকিছুই বিজ্ঞানের আশীর্বাদ।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞান : চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি সমাজের চেহারাকে যেন বদলে দিয়েছে। আশ্চর্য সব আবিষ্কারের ফলে লাখ লাখ মুমূর্ষু রোগী আবার নতুন আশার আলো দেখছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারের ফলে আজ দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যান্সার-এর মতো মারাত্মক রোগ থেকে মানুষ মুক্তি পাচ্ছে। বিজ্ঞান শুধু দৈহিক বা বাহ্যিক স্বাচ্ছন্দ্যই দেয়নি, মানুষের মানসিক উৎকর্ষও আনয়ন করেছে।

যোগাযোগে বিজ্ঞান : বিজ্ঞান বিশাল পৃথিবীকে আজ আমাদের ঘরের কোণে নিয়ে এসেছে। মানুষ আজ লন্ডন থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে ওয়াশিংটন, ওয়াশিংটন থেকে বেইজিং চলে যাচ্ছে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। যোগাযোগ ব্যবস্থা হয়েছে আরও অনেক আধুনিক ও উন্নত। ঘরে বসে সেকেন্ডের মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরের কারো সাথে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুশল বিনিময় করা যায়। এসবই মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান।

পারিবারিক জীবনে বিজ্ঞান : আমাদের পারিবারিক জীবনের সর্বত্র বিজ্ঞান এনে দিয়েছে সভ্যতার স্পর্শ। ভোরের সংবাদপত্র সমগ্র পৃথিবীটাকে যেন আমাদের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে নিয়ে আসে। অন-লাইনে ঘরে বসেই আমরা রাত ১২ টার পর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর জানতে পারি। পৃথিবীর মানুষের সুখ-দুঃখের চিত্র বেতারে শুনি, টেলিভিশনে দেখি। এসবই মানুষের জন্য বিজ্ঞানের কল্যাণময় অবদান।

বিজ্ঞানের অভিশাপ : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বিজ্ঞান কখনো কখনো মানুষের জন্য অভিশাপ বয়ে আনে। যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হতে গিয়ে মানুষ ক্রমশই কর্মবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো বিজ্ঞানকে এখন ব্যবহার করা হচ্ছে সভ্যতার ধ্বংস ও অন্যায় যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে। তৈরি হচ্ছে পৃথিবীকে ধ্বংস করার মতো মারাত্মক অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, জঙ্গী বিমান ও ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসলীলা আধুনিক বিজ্ঞানেরই অভিশাপ। তবে বিজ্ঞানের এ অকল্যাণকর দিকটি মানুষের অজ্ঞানতা ও দাম্ভিকতার ফলাফল মাত্র।

উপসংহার : মানবকল্যাণে বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য। একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের বহুল প্রয়োগের যুগ। বিজ্ঞানকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার না করে বিজ্ঞানের ব্যবহারকে করতে হবে জীবনমুখী। বিজ্ঞানকে করতে হবে আমাদের জীবনের প্রগতির বাহন। তবেই মানবতার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হবে। আর পৃথিবী হবে সুন্দর ও উন্নত।

৩৫ প্রকৃতি ও বিজ্ঞান

উপস্থাপনা : প্রকৃতির নির্দিষ্ট নিয়মে মানুষের জন্ম হলেও প্রকৃতির সাথে চিরন্তন লড়াই করেই মানুষকে বাঁচতে হয়। প্রকৃতি থেকে বিজ্ঞানের জন্ম। বিজ্ঞান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার সুফল পেতে তৎপর। প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের জন্য তাই মানুষ আজ বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রকৃতি ও বিজ্ঞান : মানুষের ক্ষমতার বাইরে মহান স্রষ্টার কুদরতে সৃষ্টিই প্রকৃতি। অপরদিকে মানুষের জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা-ই বিজ্ঞান।

আদিম প্রকৃতি : আদিমকালে মানুষ পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে বাস করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে তারা ছিল অসহায়। হিংস্র পশুর সাথে যুদ্ধ করে, লতাপাতা, ফলমূল খেয়ে তাকে জীবন ধারণ করতে হতো। হিংস্র প্রাণী আর মানুষকে গুহায় বসবাস করতে হতো যাদেরকে বলা হতো গুহাবাসী মানুষ। বিরূপ প্রকৃতির হাত থেকে আত্মরক্ষা করার কৌশল সম্পর্কে তখন মানুষ ছিল অজ্ঞ।

আবিষ্কারের সূচনায় বিজ্ঞান : প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে করতে নানা প্রয়োজনে জন্ম হলে বিজ্ঞানের। এক শুভ স্থানে গাছে গাছে ঘর্ষণে আগুন দর্শনে মানুষ পাথরের সাথে পাথ ঘর্ষণ করে আগুন আবিষ্কার করল। এ আবিষ্কার মানব জীবনধারার রূপ পাল্টে দেয় এরপর এক এক করে মানুষ জীবজন্তুকে, আকাশের বিদ্যুৎকে করল করায়ত্ত, দূরকে নিক ও সারা পৃথিবীকে আনল হাতের মুঠোয়। প্রকৃতিকে জয় করার জন্য আজ মানুষ চালাচে বিরামহীন চেষ্টা।

প্রকৃতির ওপর বিজ্ঞানের প্রভাব : প্রকৃতির বিশাল রহস্য উন্মোচনের জন্য বিজ্ঞানের চে অবিশ্রান্ত। নব নব আবিষ্কার ও অভিযান চলছে প্রতিনিয়ত। আজ মানুষ মহাশূন্যের পাতালের রহস্যও ভেদ করে চলেছে। বিজ্ঞান কখনো প্রকৃতিকে বিনাশ করতে চায় না চায় আয়ত্তে আনতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে, মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে। বিজ্ঞানে

কল্যাণেই তাই আজ প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। মানুষের জীবনে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটছে ও জীবনযাত্রা সহজ হয়েছে।

প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা : প্রকৃতি আজ তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। দেখা দিচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। পারমাণবিক অস্ত্রের মতো তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার, বায়ু দূষণ, গাছপালার বিনাশে প্রকৃতির ভারসাম্য আজ বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে দেখা দিচ্ছে 'গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া।' তাই প্রকৃতি আজ হুমকির সম্মুখীন।

মৌলিক সমস্যার সমাধান : বিজ্ঞান আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উন্নত জীবনের দিকে ধাবিত করছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়েছে। ফলে বর্তমানে আমাদের জীবন আরও সহজ ও সুন্দর হয়েছে।

প্রাত্যহিক জীবনে বিজ্ঞান : বিজ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী। ঘুম থেকে উঠে ব্রাশ করা, গোসল করা, রাস্তায় যানবাহনে যাতায়াত, অফিসে কম্পিউটার, ল্যাপটপ, টেলিফোন ইত্যাদির ব্যবহার বিজ্ঞানেরই অবদান।

বিজ্ঞানের অকল্যাণ : বিজ্ঞানের আবিষ্কার শুধু মানুষের কল্যাণেই সীমাবদ্ধ নয়; সভ্যতার কিছু নরপিশাচ বিজ্ঞানকে মানুষের অকল্যাণে ব্যবহার করছে। অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, হাইড্রোজেন বোমা, আণবিক বোমা তৈরি করে মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে। মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা বিশ্বকে তৃতীয় মহাযুদ্ধ ও মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমায় ধ্বংসযজ্ঞ সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্ক লেপন করেছে। বিজ্ঞানের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পরাশক্তিগুলো পেশিশক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে আগ্রাসন চালাচ্ছে। তাই মানবতা আজ ধ্বংসের মুখে নিপতিত।

মানুষের করণীয় : প্রকৃতিকে ধ্বংস করা তো বিজ্ঞানের কাজ নয়; প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার করাই তার লক্ষ্য। মুষ্টিমেয় মানুষের প্রয়োজনে নয়, সামগ্রিকভাবে মানবজাতির প্রয়োজনেই বিজ্ঞানের ব্যবহার হবে। বসুন্ধরা বীরভোগ্য হয়তো সত্যই; কিন্তু সে বীরকে কেবল শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হলে চলবে না, হতে হবে জনকল্যাণে ও বিজ্ঞান-সাধনায় নিমগ্ন। বিজ্ঞান উচ্চ-নীচ ও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে।

উপসংহার : প্রকৃতিকে ধ্বংস করা বিজ্ঞানের কাজ নয়; প্রকৃতিকে মানুষের কাজে ব্যবহার করাই তার লক্ষ্য। তাই মানুষকে বিজ্ঞান সাধনায় হতে হবে উদার ও কল্যাণকামী। যাতে প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সমন্বিত প্রয়াসে গড়ে ওঠে সুখময় অনাবিল বিশ্ব।

৩৬ কম্পিউটার : তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লব [ফা. প. ২০০৪]
অথবা, কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা
অথবা, কম্পিউটার

উপস্থাপনা : বর্তমান সভ্যতার অন্যতম বিস্ময়কর আবিষ্কার কম্পিউটার। কম্পিউটার এমন অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে, এর নামানুসারে যুগের নামকরণ করা হয় কম্পিউটার যুগ। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজকর্মে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে কম্পিউটার। আজ যান্ত্রিক সভ্যতার চালিকাশক্তি হিসেবে কম্পিউটার ঘরে ঘরে স্থান করে নিয়েছে। কম্পিউটার মানুষের কাজকর্মে গতির সঞ্চার করেছে। মানব সভ্যতাকে আরেক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী বিস্ময় ও আধুনিকতম আবিষ্কার।

কম্পিউটার পরিচয় : ইংরেজি Computer শব্দটির বাংলা অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। মূলত 'কম্পিউটার' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Compute থেকে এসেছে। যার অর্থ গণনা করা। কিন্তু কম্পিউটার এখন শুধু গণনার কাজে ব্যবহৃত হয় না, এর প্রচলন আরও ব্যাপক। যেমন– তথ্য সংগ্রহ, পত্রপত্রিকা ও বই-পুস্তক ছাপানো, রোগ নির্ণয়, বিদ্যুৎ, গ্যাস, ফোন ইত্যাদির বিল প্রস্তুতকরণ; রেল, বাস ও বিমানের টিকিট সংরক্ষণ; জটিল ও সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ; ব্যাংক, বীমা এবং অফিস-আদালতের কাজকর্ম এখন কম্পিউটারেই করা হয়।

কম্পিউটার আবিষ্কার : গণিতবিদ প্যাসকেল (১৬২৩–৬২) এবং গডফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ (১৬৪৬–১৭১৬) যান্ত্রিক ডিজিটাল ক্যালকুলেটর উদ্ভাবনের পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত। আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসেবে পরিচিত চার্লস ব্যাবেজ (১৭৯২–১৮৭১)। কারণ তিনি এ ধরনের নির্মাণ এবং তাতে নেলিয়ার ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৯০৩ সালে তাপ হ্রাসকরণের বাল্ব উদ্ভাবনের ফলে নতুন সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৯৩১ সালে ইউন উইলিয়াম এ বাল্ব হিসেব কষার যন্ত্রে ব্যবহার করেন। হাওয়ার্ড আইকেন পরিকল্পিত কম্পিউটার পৃথিবীর প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার। এরপর ১৯৫০ সালে আরও নতুন পদ্ধতিতে কম্পিউটার আবিষ্কার হয় বাইনারি পদ্ধতিতে।

কম্পিউটারের বিভিন্ন প্রজন্ম : ১. ভ্যাকুউয়াম টিউব প্রযুক্তি ২. ট্রানজিস্টার ও প্রিন্টেড সার্কিট পদ্ধতি ৩. ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট প্রযুক্তি ৪. ভেরিলার্জ জেল ইমিগ্রেটেড প্রযুক্তি ৫. আর্কিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইত্যাদি।

কম্পিউটারের প্রকারভেদ : কার্যপ্রণালির ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. অ্যানালগ কম্পিউটার ২. ডিজিটাল কম্পিউটার ৩. হাইব্রিড কম্পিউটার।

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক : তথ্য আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন কম্পিউটার জালিকার ন্যায় একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে, তাকেই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলে। নেটওয়ার্ককে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ২. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক।

ইন্টারনেট : ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক। আন্তর্জাতিক স্তরে লাখ লাখ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কম্পিউটারের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে এ নেটওয়ার্কে। ইন্টারনেটে যোগ দিতে দরকার একটি ফোন, একটি পিসি, একটি মডেম, সফটওয়্যার এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার। ইন্টারনেটের সুবিধাসমূহ–

(ক) ই-মেইল, (খ) ইন্টারনেট সার্ভিস ফোরাম, (গ) ফাইল ট্রান্সফার, (ঘ) অন্য প্রোগ্রাম চালনা করা, (ঙ) দূরবর্তী কারো সাথে কথা বলা, (চ) বিশ্বের তথ্য ভান্ডার থেকে তথ্য আহরণ করা।

কম্পিউটারের বিবর্তন : চার্লস ব্যাবেজের সময়ও গণনাযন্ত্রের প্রচলন ছিল। তবে ব্যাবেজের সূত্র ধরে ১৯৪৬ সালে অবস্থিত যন্ত্রটি দ্রুত বিবর্তিত হয়েছে। গঠন ও আকৃতিতে এসেছে অভিনবত্ব। এর বিচরণ ক্ষেত্রে এসেছে ব্যাপকতা।

কম্পিউটারের অংশসমূহ : সাধারণত কম্পিউটারের পাঁচটি অংশ থাকে। যথা– স্টোর বা ভান্ডার, মিল, কন্ট্রোল, ইনপুট এবং আউটপুট। স্টোর, মিল ও কন্ট্রোলকে একত্রে বলা হয় কম্পিউটারের মগজ।

কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য : কম্পিউটার হচ্ছে কাজের মগজ। এর ডিস্ক নামক একটি স্মৃতিভান্ডার আছে। স্মৃতিভান্ডারে কাজ ও কাজের পদ্ধতি দেওয়া থাকে। কাজকে বলা হয় তথ্য, আর পদ্ধতিকে বলা হয় প্রোগ্রাম। কম্পিউটারের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তথ্য ও প্রোগ্রাম। এটি দিয়ে অন্য কাজও করা যায়।

বাংলাদেশে কম্পিউটার : বাংলাদেশে আশির দশকের শেষ দিকে কম্পিউটার ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। অফিস ব্যবস্থাপনা, রেকর্ড সংরক্ষণ, প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কম্পিউটার ব্যবহৃত হচ্ছে। কম্পিউটারের গুরুত্ব অনুধাবন করে মাদরাসা, স্কুল, কলেজগুলোতে এখন তা সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে।

কম্পিউটারের ব্যবহার : কম্পিউটার গণনাকারী যন্ত্র হিসেবে আবিষ্কৃত হলেও আজকের দিনে তা সকল কাজের উপযোগী হয়ে উঠেছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের সাধারণ হিসাব থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণায় তা কাজে লাগানো হচ্ছে। কম্পিউটার এখন প্রযুক্তিবিদ্যা, মহাকাশ বিজ্ঞান, কৃষি, রসায়ন, চিকিৎসাশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি এক কথায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বেকারদের জন্য কম্পিউটার : একজন বেকার যুবক কম্পিউটার শিখে সহজেই তার বেকারত্ব ঘুচাতে পারে। কম্পিউটারে দক্ষতা অর্জন করলে নিম্নলিখিত পদগুলোতে চাকরি পাওয়া যায়। যেমন– ১। ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, ২। কম্পোজ অপারেটর, ৩। অপারেটর, ৪। ডিজাইনার, ৫। ইনস্ট্রাকটর, ৬। শিক্ষক, ৭। হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ৮। সফট্ওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ৯। প্রোগ্রামার, ১০। সিস্টেম এনালিস্ট।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার : বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর জানার পরিধি অনেক ব্যাপক। এক্ষেত্রে কম্পিউটার তাকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান আহরণের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নামকরা লাইব্রেরিগুলো থেকে তথ্য আহরণ করে নিজের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে।

কম্পিউটারের অবদান : কম্পিউটার মানুষকে তাদের কাজের ক্রমধারায় যুগ যুগ সময় এগিয়ে দিয়েছে। যে কাজ দিনের পর দিন করতে হতো, কম্পিউটার তা নির্ভুলভাবে এক নিমেষেই করে দিচ্ছে। ফলে কম্পিউটার সময় বাঁচানো ও উন্নয়নের গতিবেগসম্পন্ন যন্ত্র।

কম্পিউটারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : কম্পিউটার যে সভ্যতাকে গতিশীল করার যন্ত্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কম্পিউটারের কোনো অলসতা বা ক্লান্তি নেই, ফলে এটি অনেক কাজ একসাথে করে ফেলতে পারে। দশজন মানুষের স্থলে যদি একটি কম্পিউটারই যথেষ্ট হয়, তাহলে সেই কম্পিউটার দশ জনকে বেকার করে দিল। ব্যাংক, বীমা, অফিস-আদালতে কম্পিউটারের ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি। যদিও কম্পিউটার পরিচালনার জন্য কিছু লোক দরকার হয়, তবুও এর কারণে বেকার হয়ে পড়ে অনেক বেশি। এজন্য অনেকে কম্পিউটারকে শ্রমিক উৎখাতের যন্ত্র বলেন।

উপসংহার : কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। এর অবদান সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্মে অসামান্য, অকল্পনীয় ও অভাবনীয়। আগামী দিনের এ কম্পিউটার আমাদেরকে দেবে আরও বিস্ময়কর ও চমৎকার উপহার।

৩৭ ইন্টারনেট : আধুনিক বিশ্বের বিস্ময় [ফা. প. ২০১৩]

অথবা, ইন্টারনেট

অথবা, ইন্টারনেট ও তথ্যের অবাধ প্রবাহ [ফা. প. ২০১১]

উপস্থাপনা : বিশ্বকে আজ হাতের মুঠোয় এনেছে যে প্রক্রিয়া তার নাম ইন্টারনেট। তথ্য প্রযুক্তির এ ক্ষেত্রটি আজ সারাবিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ইন্টারনেট ব্যবস্থা পৃথিবীর সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে একটি যোগাযোগ জাল (Communication net)-এ

আবদ্ধ করেছে। যোগাযোগ তথা তথ্য আদান-প্রদান, জ্ঞানের প্রসার, ব্যবসায় বাণিজ্যসহ যাবতীয় ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে এ ইন্টারনেট।

ইন্টারনেটের পরিচয় : ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী বৃহৎ কম্পিউটারের নেটওয়ার্ক বা International Computer Network Service. ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সমস্ত কম্পিউটার ইন্টারনেটের মাধ্যমে একে অপরের সাথে অতি দ্রুত যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। বিশ্বব্যাপী হাজার হাজার কম্পিউটারের বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক ব্যবসায় ও গবেষণার নেটওয়ার্ক পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ প্রয়োজনে নেটওয়ার্কিং পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ গতিশীল করে তুলেছে।

ইন্টারনেটের প্রযুক্তিকরণ : ইন্টারনেটে দুটি পদ্ধতিতে কম্পিউটারকে সংযুক্ত করা যায়। যথা–

১। On line Service বা প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্তি।

২। Off line Service বা পরোক্ষভাবে সংযুক্তি।

এছাড়া সাধারণত তিন ধরনের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম থেকে ইন্টারনেট সংযুক্তি হতে পারে। সেগুলো হলো–

১। LAN (local Area Network) : সাধারণত এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে একটি ছোট নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

২। MAN (Metropoliton Area Network) : এটি হচ্ছে কয়েক কিলোমিটারব্যাপী একটি নেটওয়ার্ক।

৩। WAN (Wide Area Network) : এটা বিশ্বব্যাপী একটি বিশাল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। এতে তথ্য প্রবাহের স্বাভাবিক গতি প্রায় ৯.৬ Kbps।

ইন্টারনেটের ইতিহাস : ১৯৬৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ সর্বপ্রথম ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে, যার উদ্দেশ্য ছিল পারমাণবিক আক্রমণ ঠেকানোর জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান করা। পেন্টাগন তখন টেলিফোনের বিকল্প হিসেবে ৪টি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান করতো। সেসময়ে এ যোগাযোগের নাম দেওয়া হয় 'ডার্পানেট'। তিন বছর পর এ প্রক্রিয়ার নাম হয় 'অর্পানেট'। আশির দশকের শেষের দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান হলে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন' সর্বসাধারণের জন্য নতুন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে। এর নাম দেওয়া হয় 'নেস্টেনেট'। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী এর গ্রাহকসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এর নাম দেওয়া হয় 'ইন্টারনেট'।

বাংলাদেশে ইন্টারনেট : বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে ইন্টারনেট চালু হলেও দীর্ঘদিন বাংলাদেশ অফলাইন ইন্টারনেটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মাধ্যমে শুধু E-Mail সার্ভিসের সুবিধা পাওয়া যেত। ১৯৯৬-এর ১৫ই জুন থেকে ISN (Information Service Network) নামক একটি ফার্ম একটি সার্ভার স্থাপন করে অনলাইন ইন্টারনেটের সংযোগ দেওয়া শুরু করে। বর্তমানে আরও অনেক প্রতিষ্ঠান অনলাইনে সংযোগ দিয়ে থাকে। এছাড়াও নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সরকারি উদ্যোগে ইতোমধ্যে তা সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এ তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়ক বাংলাদেশের জন্য তথ্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

যেভাবে ইন্টারনেটে প্রবেশ করতে হয় : বাসা বা অফিসে বসে ইন্টারনেট চালাতে হলে যে চারটি জিনিস প্রয়োজন, তা নিম্নরূপ–

কম্পিউটার : এটা তথ্যাদি টাইপ করতে সাহায্য করে এবং তার নিজস্ব মেমোরিতে রেখে দেয়। এরপর তা নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপকের কাছে তথ্যাদি পাঠানোর প্রাথমিক আয়োজন করে।

মডেম : এর পূর্ণনাম Modulator/Demodulator. সাধারণ টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে তথ্যাদি পাঠানোর উপযোগী করার জন্য এক কম্পিউটার থেকে অপর কম্পিউটারে তথ্যাদিকে ডিজিটাল থেকে এনালগ, আবার এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তরিত করার একটি ডিভাইস।

টেলিফোন লাইন : টেলিফোন বা সেলুলার লাইন ছাড়া ইন্টারনেটের কোনো প্রক্রিয়াই সম্ভব নয়। লাইনের স্পীড-এর ওপর তথ্যাদি দ্রুত স্থানান্তরিত হওয়া নির্ভর করে। এনালগের তুলনায় ডিজিটাল টেলিফোনে তথ্যাদি দ্রুত স্থানান্তরিত হয়।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার : এদের কাজ অনেকটা পোস্ট অফিসের মতো। এদের সদস্য হলে মাসিক বা ব্যবহৃত সময়ের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি চার্জ নিয়ে তাদের নিজস্ব শক্তিশালী কম্পিউটার ফাইবার অপটিক্স বা স্যাটেলাইটের (VSAT) মাধ্যমে দেশে-বিদেশে অন্যান্য ইন্টারনেট সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে অনলাইন ইন্টারনেট চালু হয়। এর পূর্বে অফলাইন ইন্টারনেট চালু ছিল। এখন ১২টির অধিক সংস্থা অনলাইনে সংযোগ দিয়ে থাকে।

ইন্টারনেটের বহুমুখী ব্যবহার : ইন্টারনেট একটি বিশাল ব্যাপার। একটি Software-এর পক্ষে সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটি সার্ভিসের জন্য পৃথকভাবে একটি করে Software প্রয়োজন। Software-এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে, এমন কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত IP (Internet Protocol) সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো–

১। Telenet (Telephone Network) : একটি কম্পিউটার যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অপর কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত হয়, এর মাধ্যমে তা ব্যবহার করা যায়। এর জন্য একটি Password প্রয়োজন হয়।

২। FTP Session (File Transfer Protocol) : এ Protocol-এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারের মধ্যে ফাইল আদান-প্রদান করা যায়।

৩। এটি এমন একটি Protocol, যা অসংখ্য ফাইলের Archive থেকে নির্দিষ্ট ফাইলটি খুঁজে পেতে সাহায্য করে।

৪। IRC (Internet Relay Chat) : এর মাধ্যমে অসংখ্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারী একই সাথে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে পারে।

৫। E-mail (Electronic Mail) : এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর যে-কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সাথে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

৬। Gophes : এর মাধ্যমে খুব সহজে ফাইল Copy করা যায়। কম্পিউটারে এর জন্য আলাদাভাবে Supporting Software থাকতে হবে।

৭। WWW (World Wide Web) : এটি একটি জনপ্রিয় এবং যুগল ব্যবহৃত Protocol। এখানে তথ্যগুলো Multimedia-এর মাধ্যমে একই সময়ে চিত্র ও শব্দ সহকারে পাওয়া যায়। তবে এর জন্য পৃথক Software প্রয়োজন হয়।

৮। Net News : এ Protocol-এর মাধ্যমে অতি সহজে News group-গুলোর মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। সাংবাদিকরা এ ইন্টারনেটের মূল ব্যবহারকারী।

ইন্টারনেটের সুবিধা : ইন্টারনেটের মাধ্যমে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যায়। আসলে প্রত্যেকটি আবিষ্কারের পেছনে কোনো না কোনো উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। তেমনিভাবে ইন্টারনেট

আবিষ্কারের মূল যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তা হলো দ্রুত তথ্য আদান-প্রদান করা। নিচে বর্তমান বিশ্বে ইন্টারনেট প্রযুক্তির কিছু সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরা হলো–

ক. **নিউজ গ্রুপ :** নিউজ গ্রুপ একটি তথ্য বা সংবাদ প্রদানকারী সংস্থা। ইন্টারনেটের News group ব্যবহার করে বিশ্বের খবরাখবর জানা সম্ভব।

খ. **বই পড়া :** লেখাপড়া ও গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন যথার্থ বই, যা সবসময় হাতের কাছে পাওয়া যায় না। ইন্টারনেট প্রযুক্তির ফলে কম্পিউটারের Key Board-এ চাপ দিয়ে বিশ্বের যে-কোনো লাইব্রেরির বই পড়া যায়।

গ. **ব্যবসায়-বাণিজ্য :** Web browser-এর commerce option-টির মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের কেনাকাটার অর্ডার দেওয়া যায়। এক প্রতিষ্ঠানের সাথে আরেক প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কিত লেনদেন সম্পাদন করা যায়।

ঘ. **আইন :** জটিল মামলার ক্ষেত্রে আইনী পরামর্শের জন্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশের আইনজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া যায়। আইনী প্রতিষ্ঠানের ইন্টারনেট কমান্ড করলেই Monitor-এ আইনগত নির্দেশনা ভেসে উঠবে।

ঙ. **বিদেশি পত্রিকা পাঠ :** ইন্টারনেট প্রযুক্তির কল্যাণে বাড়িতে বসে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ম্যাগাজিন, পত্রিকা পাঠ করতে পারি।

চ. **ভ্রমণ :** ভ্রমণ স্থানের আবহাওয়া, থাকার হোটেল, রিজার্ভেশন, রেন্ট-এ-কার, বিমানের টিকিট বুকিং, ট্রেন টিকেট, বাস টিকেট সবই এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা যায়।

ছ. **ফাইল খুঁজে বের করা :** হাজারো ফাইলের মধ্যে প্রয়োজনীয় ফাইলটি খুঁজে বের করার জন্য Archi পদ্ধতি ব্যবহার হয়।

জ. **চিকিৎসা সুবিধা :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা ঘরে বসেই পেতে পারি উন্নত বিশ্বের চিকিৎসা সুবিধা।

ঝ. **শিক্ষা :** বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে ইন্টারনেটের Website-এর Education Option-টি।

ঞ. **যোগাযোগ :** ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে অধিকাংশেরই ফেসবুক একাউন্ট আছে এবং বর্তমানে এটি সামাজিক যোগাযোগের একটি জনপ্রিয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার : বিংশ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর প্রযুক্তি ইন্টারনেট। অচিরেই বিশ্বের সব দেশে এ প্রযুক্তির আরও বিস্তার ঘটবে নিঃসন্দেহে। ফলে তথ্য আদান-প্রদান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রে ইন্টারনেট বিপ্লব ঘটবে।

৩৮ তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ

অথবা, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ [ফা. প. ২০১৯]

উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্ব হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশ্ব। সাবমেরিন ক্যাবল হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির অত্যাধুনিক মাধ্যম। এটি যে-কোনো দেশের তথ্য প্রযুক্তির সামগ্রিক উন্নয়নে এক অপরিহার্য হাতিয়ার। ২১শে মে ২০০৬ তারিখে কক্সবাজারে ল্যান্ডিং স্টেশন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যুক্ত হলো ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কের সঙ্গে। এর ফলে বহির্বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে বাংলাদেশ। যা দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নে একটি মাইলফলক এবং সেই সাথে জাতির সামনে উন্মুক্ত হয়েছে বিপুল সম্ভাবনার দুয়ার।

সাবমেরিন ক্যাবল : এটি একটি অপটিক্যাল ফাইবার লাইন, যা সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে স্থাপন করা হয়। এ ক্যাবল টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির অত্যাধুনিক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, অপটিক্যাল ফাইবার লম্বা চুলের মতো চিকন কাচের তৈরি এক ধরনের পদার্থ। এটি অত্যন্ত স্বচ্ছ, এর প্রস্তুতে এমন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়, যাতে তরঙ্গ পাঠানোর সময় পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে পুরোটাই ফাইবারের মধ্য দিয়ে চলতে পারে, কোনো সিগন্যালের অপচয় হয় না। চুলের মতো চিকন এক একটি অপটিক্যাল ফাইবার অবিশ্বাস্য রকম তথ্য বহন করতে পারে এবং অনেক বেশি পরিমাণ তথ্য আলোর গতিতে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

সাবমেরিন ক্যাবলের ইতিকথা : সাবমেরিন ক্যাবল প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বের একটি প্রযুক্তি। Trans-Atlantic Telephone Cable (TAT) অনেক পুরনো। ১৮৫০ সালে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম সংযোগ দেয় সাবমেরিন টেলিগ্রাফ কোম্পানি। তবে তিন দিনের মাথায় ফ্রান্সের জেলেদের কারণে এ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৮৫১ সালে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা হয়। ১৮৫২ সালে হলিহেড, ওয়ালস ও আইসল্যান্ডের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। এটিও তিন দিন পর ফল্ট করে। ১৮৫৩ সালে ডেনমার্কে এই প্রযুক্তি আসে। ১৮৫৪ সালে সুইডেন-ডেনমার্কের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ সালে মিসর, ১৮৫৬ সালে আমাজান নদী, ১৮৫৭ সালে সিলোন (Ceylon)-ভারত, ১৮৫৯ সালে কিউটা-স্পেন, সিঙ্গাপুর-বাটাভিয়া, কানাডা-আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়।

অবশ্য তখনকার এসব ক্যাবল ফাইবার অপটিকের ছিল না। প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে, যার নাম Trans-Atlantic Telephone Cable (TAT-1)। এটি সাধারণ টেলিফোন ক্যাবল, কিন্তু TAT-6 নামে প্রথম ফাইবার অপটিকের সাবমেরিন ক্যাবল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। এটির ফলে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে টেলিফোন সংযোগ সম্ভব হয়।

সাবমেরিন ক্যাবলে বাংলাদেশ : সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্ত হওয়ার প্রথম সুযোগ এসেছে ১৯৯০ সালে। তখন বাংলাদেশকে বিনামূল্যে এ ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার অফার দেয় সংযুক্তকারী কোম্পানিটি। এ লাইনটি বঙ্গোপসাগরের তলদেশ দিয়েই যাচ্ছিল। ১৯৯৮ সালে দ্বিতীয়বার অনুরূপ আরেকটি প্রস্তাব পায়। তখন মাত্র ১৬০ কোটি টাকায় লিংক স্থাপন করতে পারত। দীর্ঘসূত্রতার কারণে এ প্রস্তাবটি আর বেশিদূর এগোয়নি। ফলে বাধ্য হয়ে সরকার ২০০০ সালে সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমেরিকার কোম্পানি 'টাইকো সাবমেরিন সিস্টেম লিমিটেড'-এর সাথে ৯২১ কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে চুক্তিটি ক্ষতিকর মনে হওয়ায় পরবর্তীতে সরকার আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ এবং আইসিটি টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশকে গ্লোবাল ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের সাথে সংযোগের জন্য 'সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও পশ্চিম ইউরোপের ১৪টি দেশের মোট ১৬টি কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত কনসোর্টিয়ামে (SEA-ME-WE-4) যোগদান করতে ২০০২ সালে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০০২ সালের ১-৩ জুলাইয়ে দুবাইতে প্রথম এ ১৪টি দেশের SEA-ME-WE-4 মিটিং হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে জাকার্তায় BTTB (Bangladesh Telegraph and Telephone Board) SEA-ME-WE-4 Memorandum of understanding (MOU)-তে স্বাক্ষর করে।

সর্বশেষ ২৭শে মার্চ ২০০৪ তারিখে দুবাইতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম 'নির্মাণ' ও 'রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি'তে স্বাক্ষর করেন।

সাবমেরিন ক্যাবল-এর ক্ষমতা ও সম্ভাবনা : বাংলাদেশ SEA-ME-WE-4 ক্যাবলের প্রাথমিকভাবে যে ক্ষমতা পাবে, তার পরিমাণ 10 Gigabits per second সহজভাবে বললে বলা যায়, এ ক্ষমতা ব্যবহার করে একসঙ্গে ১ লাখের বেশি লোক কথা বলতে পারবে। বর্তমানে বাংলাদেশের স্যাটেলাইটভিত্তিক চ্যানেলসংখ্যা মাত্র ৮০০০, যা থেকে সহজেই অনুমেয় সাবমেরিন ক্যাবলের ক্ষমতা কত ব্যাপক। এই ক্যাপাসিটি পর্যায়ক্রমে আরও বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। এ মুহূর্তে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিটিটিবি যে সমস্ত সার্ভিস প্রদান করছে, তার মোট ক্ষমতা ৫৫০ Mbps' ভি-স্যাটের মাধ্যমে বিভিন্ন আইএসপি এবং কর্পোরেট ব্যবহারকারীবৃন্দ যে গতি ব্যবহার করছে তার সম্মিলিত ক্ষমতা আনুমানিক ২৫০ Mbps। অর্থাৎ এ মুহূর্তে বাংলাদেশের সর্বমোট ব্যবহার ৮০০০ Mbps-এর মতো। এমতাবস্থায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট ১০,০০০ Mbps নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য বিশাল ক্যাপাসিটি এবং তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের মহান সুযোগ।

সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে দেশের অভ্যন্তরীণ সংযোগ : কক্সবাজার ল্যান্ডিং স্টেশনকে ঢাকা তথা সারা দেশের সাথে যুক্ত করার জন্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের মধ্যে নতুন অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া এ রুটের মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্ব থেকেই ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার রয়েছে। এটিরও সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং সাবমেরিন ক্যাবল-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সার্ভিসের চার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বিদ্যমান গেটওয়ে এক্সচেঞ্জের সাথে সারা দেশের টেলিফোন Exchange সমূহ বিভিন্ন ট্রান্সমিশন লিংকের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে। তবে তা উন্নততর করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বর্তমানে সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার বসানো হচ্ছে। এসব অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে দেশের জেলা সদরের ডিজিটাল এক্সচেঞ্জসমূহকে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে এক্সচেঞ্জের সাথে যুক্ত করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ডাটা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। উপজেলাসমূহে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপনের কাজও চলছে। সকল ডিজিটাল এক্সচেঞ্জে ইন্টারনেট সুবিধা বিস্তৃত হবে। এভাবে সাবমেরিন ক্যাবলের সুবিধা দেশের সর্বত্র পৌঁছে যাবে। বিভিন্ন প্রাইভেট অপারেটর ও আইএসপিগণকে এক্সচেঞ্জসমূহে এডিডিএন লোডে সংযোগ প্রদান করা হবে। ফলে এসব অপারেটরগণের গ্রাহকগণ সাবমেরিন ক্যাবলের সুবিধা লাভ করবেন। তাছাড়া কর্পোরেট গ্রাহক ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আন্তর্জাতিক ডাটা লিজলাইন গ্রহণ করতে পারবেন। বিটিটিবি কর্তৃক সীমিত সম্পদের মধ্যে গেটওয়ে এক্সচেঞ্জ, আন্তসংযোগ সুবিধা, ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ, ডাটা নেটওয়ার্ক প্রভৃতি সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ অব্যাহত থাকবে।

সুবিধাদি : সাবমেরিন ক্যাবল থেকে বেশ কতকগুলো সুবিধা সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের তুলনায় সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে এর ভয়েস এবং ডাটা ট্রান্সফার অনেক দ্রুততর, সুলভ ও উন্নতমানের হবে। ইন্টারনেটের স্পীড অনেক বেড়ে যাবে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সার্কিট সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ব্রডব্যান্ড সার্ভিস যথা– কলসেন্টার, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, টেলিমেডিসিন, Software রপ্তানি ইত্যাদি কমমূল্যে ও সহজে চালু করা সম্ভব হবে।

উপসংহার : সাবমেরিন ক্যাবল আমাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনাময় সুযোগ এনে দিয়েছে। দেশে মোবাইল ফোনের প্রসার ঘটেছে, কিন্তু শুধু আন্তর্জাতিক ভয়েস দ্বারা সাবমেরিন ক্যাবলের বিশাল ক্যাপাসিটির পরিপূর্ণ ব্যবহার হবে না। এটা তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে যুব সমাজ তথ্য প্রযুক্তিমনস্ক হবে, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট প্রসারিত হবে এবং উদ্যোক্তাগণ তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন ব্যবসা ও সার্ভিস গ্রহণ করবেন। যার জন্য অধিক ব্রডব্যান্ড প্রয়োজন। এটা সম্ভব হলে একদিকে নতুন নতুন কর্মসংস্থান হবে, অপরদিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

৩৯ শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার [ফা. প. ২০১৭]

উপস্থাপনা : শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা। শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা। যার ফলে তারা ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা কার্যক্রমের মূল প্রক্রিয়ায় রয়েছে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার মাধ্যমে তাদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদান করা। শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন কথাবার্তা ও কাজের মাধ্যমে পরস্পর যোগাযোগ করেন– যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আয়ত্ত করতে সহায়তা করা। এই কাজটিকে সহজ, আকর্ষণীয় ও কার্যকর করতে শিক্ষকগণ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করার লক্ষ্য নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং শ্রেণি কার্যক্রমে তা ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি কী? : তথ্য প্রযুক্তি বলতে বোঝায় তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন ও বিস্তরণ তথা যোগাযোগের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিগত উপকরণ। তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কৃত হচ্ছে, তবে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত উপকরণগুলোর মধ্যে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তথ্যপ্রযুক্তিকে শুধুমাত্র কম্পিউটারের মধ্যে সীমিত না রেখে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশন, নেটওয়ার্কিং কিংবা সব তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ" করতে হবে। শিক্ষানীতিতে এইসব তথ্যপ্রযুক্তির হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রমে তা অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ : শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার নানাবিধ উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন দেশের সরকার তাদের নাগরিকদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায়, যার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা সহজে ও আনন্দের সাথে শিখতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির বহুবিধ প্রয়োগকে

তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে, যেমন– ১। তথ্য প্রযুক্তি জানা ও আয়ত্ত করা ; ২। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখা; এবং ৩। তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

১। **তথ্য প্রযুক্তি জানা ও আয়ত্ত করা :** UNESCO কর্তৃক গঠিত (Information and Communication on Education for Twenty-First Century-এর প্রতিবেদনে তথ্য প্রযুক্তিকে একবিংশ শতাব্দীর জন্য একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রস্তুত করার লক্ষ্য থেকে বিশ্বের প্রায় সব দেশের শিক্ষাক্রমে নতুন বিষয় হিসেবে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২-এর মাধ্যমিক স্তরে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার, এর বিভিন্ন অংশের পরিচয়, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের ধারণা ইত্যাদি পাঠ্য বিষয়ে সংযুক্ত করা হয়। আবার উচ্চশিক্ষা স্তরে জ্ঞানের পৃথক ক্ষেত্র হিসেবে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অধ্যয়নের সুযোগ রাখা হয়েছে।

২। **তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শেখা :** শিক্ষণ-শিখন (teaching-learning) কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করেছে তথ্য প্রযুক্তি। এটি ব্যবহার করে আকর্ষণীয় ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করা যায়, যা গতানুগতিক শিক্ষা উপকরণের চেয়ে যথেষ্ট কার্যকর। শিক্ষকগণ ডিজিটাল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে সফলভাবে শ্রেণিতে পাঠদান করতে পারেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (www) এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষ ও পাঠ্য পুস্তকের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে। আবার তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (যেমন : প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক) জন্য বিভিন্ন Computer Assisted Learning (CAL) এবং Computer Assisted Instruction (CAI) সফটওয়্যার প্রস্তুত করা যায়। ফলে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

৩। **তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা :** তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে শিক্ষাব্যবস্থায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এখন যে-কোনো মানুষ যে-কোনো সময় যে-কোনো স্থান থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। বাংলাদেশে বসেও এখন একজন শিক্ষার্থী চাইলে আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স করতে পারে। এটা সম্ভব হয়েছে তথ্য প্রযুক্তির বহুমুখী সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে। বাস্তবে একজন শিক্ষার্থী তার শিক্ষককে মুখোমুখি না দেখেও বরং ই-মেইল, চ্যাটিং, ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সাহায্যে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। অনলাইনে শিক্ষক তার শিক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ ও মূল্যায়ন করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারেন। আর এই ব্যবস্থাকে সহজভাবে Virtual Learning Environment (VLE) বলা হয়। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হচ্ছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশে Virtual University, Virtual library, Virtual Museum ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এ অনুরূপভাবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে (বাউবি) পর্যায়ক্রমে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব : বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ও ২০১০

সালে জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করা হয়, যেখানে শিক্ষার সকল স্তরে তথ্য প্রযুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'কে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে মাধ্যমিক স্তরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯-এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, "আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার পরিধি এবং মান দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা; শিক্ষার সর্বস্তরে এবং সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটার সাক্ষরতা নিশ্চিত করা; যথোপযুক্ত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতা উৎসাহিত করা; মেধাসম্পদ সৃষ্টি করা এবং জীবনের সব ক্ষেত্রে আইসিটি আত্মীকরণ।" উক্ত নীতিমালায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে আইসিটি কোর্স অন্তর্ভুক্ত করে দেশব্যাপী আইসিটি সাক্ষরতা সম্প্রসারণ করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যয়-সাশ্রয়ী উপায়ে আইসিটি-তে সাক্ষরতা নিশ্চিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত কারিগরি সহায়তা সহকারে ল্যাব ও ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সেইসাথে গণ-সাক্ষরতা এবং আজীবন শিক্ষাসহ প্রতিবন্ধী এবং বিশেষ সহায়তা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে তার অন্যতম নীতি হলো, "আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা" এবং সেখানে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের একটি হলো "শ্রেণি কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা।" উক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' অংশের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, "শিক্ষার্থীকে প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে আত্মবিশ্বাসী, উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল হিসেবে তৈরি করা।" মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য বর্ণিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যসমূহ হলো :

১। শিক্ষার্থীদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে অবগত করে বিশ্বের জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া।

২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সাধন করা।

৩। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সমর্থ করা।

৪। ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, মেধা ও সৃজনশীলতার বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

৫। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ঝুঁকি অনুধাবনে সক্ষম করা।

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিক আচরণের অভ্যাস গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

৭। বেকারত্ব নিরসন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা।

উক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৃহীত নীতিমালা এবং পরিমার্জিত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, শিক্ষা কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং শিক্ষার্থী সবাইকেই গুরুত্ব সহকারে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : আধুনিক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। শিক্ষার মাধ্যমে শুধু তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জন করা নয়, বরং তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন করার সময় এসেছে। সরকার এই বিষয়ে বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে এবং শিক্ষা কার্যক্রমেরও পরিমার্জন করা হয়েছে।

৪০ মহাকাশে বাংলাদেশ

অথবা, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট

অথবা, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিপ্লব

উপস্থাপনা : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে গত ১১ই মে, ২০১৮ মহাকাশ যুগে প্রবেশ করে বাংলাদেশ। জাতির ইতিহাসে স্থাপিত হয় গৌরবের এক সোনালি সোপান। স্যাটেলাইট অধিকারী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৭তম। এটি আমাদের এক অবিস্মরণীয় অর্জন। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ কার্যক্রম ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। এই স্যাটেলাইট ব্যবহারের মাধ্যমে দেশে ই-লার্নিং ও ই-মেডিসিনের ব্যাপক প্রসার ঘটবে। এছাড়াও টেলিভিশন চ্যানেল, ইন্টারনেট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ভি-স্যাট ও বেতারসহ বিভিন্ন সেবা পাওয়া যাবে।

স্যাটেলাইট কী ও কেন : যোগাযোগ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও গবেষণা ছাড়াও পৃথিবীর বাইরের নানা তথ্য-উপাত্ত জানতে মহাকাশে পাঠানো হয় কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ তথা স্যাটেলাইট। সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মতো এসব স্যাটেলাইট ঘূর্ণায়মান এবং গতিশীল। এসব স্যাটেলাইট নির্দিষ্ট গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ : ১১ই মে, ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চ কমপ্লেক্স ৩৯এ (39A) থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। তখন বাংলাদেশ সময় ছিল রাত ২ : ১৪ মি. উৎক্ষেপণের পর নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে রকেটের স্টেজ-১ খুলে যায়। এ সময় চালু হয় স্টেজ-২-এর ইঞ্জিন। স্টেজ-১ ফিরে আসে আটলান্টিকে ভাসমান ড্রোন শিপে। আর স্টেজ-২ স্যাটেলাইটটিকে নিয়ে যায় জিওস্টেশনারি ট্রান্সফার অরবিটে। সেখানে পেলোড থেকে স্যাটেলাইটটিকে অবমুক্ত করা হয়। এ পুরো প্রক্রিয়া সমাপ্ত হতে সময় লাগে ৩৩ মিনিট। রকেট থেকে উন্মুক্ত হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়ার তিনটি গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া হয়। উৎক্ষেপণের ১ ঘন্টা ১০ মিনিট পর গাজীপুর গ্রাউন্ড স্টেশন স্যাটেলাইটটি থেকে প্রাথমিক সংকেত গ্রহণ করে। মহাকাশের নির্ধারিত ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে নিজস্ব অরবিটাল প্লটে জায়গা করে নিতে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কে।

যেসব সুবিধা পাওয়া যাবে : সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে বাংলাদেশ প্রবেশ করেছে স্যাটেলাইট জগতে। আর নতুন এ যাত্রায় দেশ ও জাতি ইতোমধ্যে পেয়েছে বেশ কিছু সুবিধা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কক্ষপথে সফলভাবে স্থাপিত হওয়ায় টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতার অবসান হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ থেকে বাংলাদেশ ৪০ ধরনের সেবা পাবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো− DTH (Direct To Home) সেবা, রেডিও বা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সম্প্রচার, ইন্টারনেট সুবিধা, টেলিমেডিসিন, ভি-স্যাট, ই-লার্নিং, ই-গবেষণা, ভিডিও কনফারেন্স, দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় জরুরি যোগাযোগ, জাতীয় নিরাপত্তার

কাজে ব্যবহার, মাটি বা পানির নিচে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ, মহাশূন্যে অনুসন্ধান, ছবি তোলার কাজ, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (GPS), গামা-রে বিস্ফোরণ শনাক্তকরণ এবং পারমাণবিক বিস্ফোরণ, আসন্ন হামলা ছাড়াও স্থল সেনাবাহিনী ও অন্যান্য ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে আগাম সতর্কবার্তা, তেল-প্রাকৃতিক গ্যাস ও বিভিন্ন খনি শনাক্তকরণ, ডিজিটাল ম্যাপ তৈরি প্রভৃতি।

ওজন ও আকারের বৈচিত্র্য : কৃত্রিম উপগ্রহ নানা আকারের ও ওজনের হতে পারে। মহাকাশে সর্বনিম্ন ৬৪ গ্রাম ওজনের স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ থেকেও চৌঠা জুন, ২০১৭ 'ব্র্যাক অন্বেষা' নামে একটি এক কেজি ওজনের স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠানো হয়। তবে এগুলো খুদে স্যাটেলাইট বলে কার্যক্রম একেবারেই সীমিত। সাধারণত শিক্ষার্থীরা এ ধরনের খুদে স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠিয়ে থাকে। তবে পূর্ণ মাত্রায় বাণিজ্যিক ব্যবহারযোগ্য বাংলাদেশের উৎক্ষেপিত প্রথম স্যাটেলাইট হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-যার ভর ৩৫০০ কেজি।

যেভাবে কাজ করে স্যাটেলাইট : কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে এমনভাবে ঘোরে, যেন বহির্মুখী শক্তি একে বাইরের দিকে গতি প্রদান করে। মূলত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে এটি কক্ষপথ থেকে ছিটকে যায় না। বহির্মুখী ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি স্যাটেলাইটকে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। মহাকাশে পৃথিবীর মতো বায়ুমণ্ডল না থাকায় গতি ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। টিভি ও বেতার সংকেত প্রেরণ এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী কৃত্রিম উপগ্রহগুলো সাধারণত পৃথিবী থেকে ৩৬,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করে। তবে ভিন্ন ভিন্ন কাজের স্যাটেলাইট ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব ও গতিতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী থেকে মাত্র ৪৫০ কিলোমিটার ওপরেও অবস্থান করতে পারে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইট পৃথিবীর যত কাছে থাকে গতি তত বেশি হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কক্ষপথে অবস্থানের পর ঘণ্টায় ১১ হাজার কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। মূলত পৃথিবী থেকে যত উপরে উপগ্রহ অবস্থান করবে গতি তত কমতে থাকবে, যেমন– পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব অনেক বেশি, তিন লাখ ৮০ হাজার কিলোমিটার। সেজন্য চাঁদ ৩,৭০০ কিলোমিটার বেগে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

পৃথিবী থেকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে তথ্য পাঠানো হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ এ তরঙ্গ গ্রহণের পর তা পরিবর্ধন (Amplify) করে পৃথিবীতে পাঠায়। কৃত্রিম উপগ্রহ সব ধরনের ডাটা ও ছবি তরঙ্গ আকারে ভূ-কেন্দ্রে পাঠায়। এজন্য কৃত্রিম উপগ্রহ দুটি ভিন্ন কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ব্যবহার করে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পৃথিবীতে আসা সিগন্যাল অনেক দুর্বল থাকে। ভূ-কেন্দ্রে স্থাপিত ডিশ অ্যান্টেনা ব্যবহার করে সিগন্যালকে কেন্দ্রীভূত এবং পরে রিসিভার দিয়ে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা হয়।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর ধরন : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ হচ্ছে ভূ-স্থির যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট (Geostationary Communication Satellite)।

অবস্থান ও ফুটপ্রিন্ট : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর অবস্থান ইন্দোনেশিয়ার পূর্বপ্রান্তের ভূ-পৃষ্ঠের ওপর। এটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩৫,৭৮৬ কিলোমিটার উচ্চতায় ১১৯.১° পূর্ব দ্রাঘিমায় ক্লার্ক অরবিটে অবস্থিত। ক্লার্ক অরবিট হচ্ছে ভূ-স্থির উপগ্রহের জন্য কক্ষপথ। এটি বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক ও পদার্থবিজ্ঞানী আর্থার সি. ক্লার্কের নামানুসারে হয়েছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর কভারেজ হবে ইন্দোনেশিয়া থেকে তাজিকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত।

আয়ুষ্কাল : মহাকাশে স্যাটেলাইটের কার্যকারিতার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল থাকে। ৩৫০০ কেজি ভরের এবং ১৬০০ ওয়াট ক্ষমতার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মেয়াদকাল হবে ১৫ বছর। তবে এর ডিজাইন আয়ুষ্কাল ১৮ বছর।

ট্রান্সপন্ডার : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর স্যাটেলাইটে ট্রান্সপন্ডার ৪০টি, যার ১৪টি 'সি' ব্যান্ডের (C-band) এবং ২৬টি 'কে-ইউ' ব্যান্ডের (KU-band)। কে-ইউ ব্যান্ড বাংলাদেশসহ বঙ্গোপসাগর, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। অপরদিকে এর সি-ব্যান্ড বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান এবং কাজাখস্তানের একটি অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে। এগুলোর মধ্যে প্রাথমিকভাবে ২০টি ব্যবহার করবে বাংলাদেশ, অন্য ২০টি ট্রান্সপন্ডার ভাড়া দেওয়া হবে।

সক্ষমতা : প্রতিটি ট্রান্সপন্ডার থেকে ৪০ মেগাহার্টজ হারে তরঙ্গ বরাদ্দ (ফ্রিকোয়েন্সি) সরবরাহ পাওয়া যাবে। এ হিসাবে ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মোট ফ্রিকোয়েন্সি ক্ষমতা হলো ১,৬০০ মেগাহার্টজ। কিছু কারিগরি সীমাবদ্ধতার কারণে ১,৬০০ মেগাহার্টজ পুরোটা ব্যবহার করা যাবে না, তবে কমপক্ষে ১,৪০০ মেগাহার্টজ ব্যবহার করা যাবে।

নির্মাতা : ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস (Thales Alenia space) বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মূল নির্মাতা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি SpaceX-এর সাথে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের দায়িত্বে ছিল এ প্রতিষ্ঠান। এছাড়া বাংলাদেশ থেকে স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণে নির্মিত দুটি গ্রাউন্ড স্টেশনের নকশাও তৈরি করে তারা।

নির্মাণসহ উৎক্ষেপণ ব্যয় : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণে সর্বমোট ব্যয় হয় ২,৭৬৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে স্যাটেলাইটটি নির্মাণ করতে খরচ হয় ১,৯৫১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

গ্রাউন্ড স্টেশন : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে গাজীপুরের তালিবাবাদ ও রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় দুটি গ্রাউন্ড স্টেশন নির্মাণ করা হয়। এর মধ্যে গাজীপুর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এবং বেতবুনিয়া বিকল্প কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে দুটি ভূ-উপগ্রহ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

পরিচালনায় : বর্তমানে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে ফ্রান্সের থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস। স্যাটেলাইটটি সম্পূর্ণ চালু হওয়ার পর এর নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের গ্রাউন্ড স্টেশনে হস্তান্তর করা হবে। তখন বাংলাদেশের গ্রাউন্ড স্টেশন থেকেই এটি নিয়ন্ত্রিত হবে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর কার্যক্রম পরিচালনা, স্থল স্টেশন থেকে উপগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ, বিপণন ও বিক্রয় সেবা ইত্যাদির জন্য বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (BCSCL) নামে একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। ১০ই আগস্ট, ২০১৭ BCSCL যাত্রা শুরু করে। পদাধিকার বলে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর সুফল : এখন দেশে প্রায় ৩০টি স্যাটেলাইট চ্যানেল সম্প্রচারে রয়েছে। এসব চ্যানেল সিঙ্গাপুরসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে স্যাটেলাইট ভাড়া নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ফলে প্রতি মাসে একটি চ্যানেলের ভাড়া বাবদ ব্যয় হয় তিন থেকে ছয় হাজার মার্কিন ডলার। সব মিলিয়ে বছরে চ্যানেলগুলোর খরচ হয় ২০ লাখ ডলার বা প্রায় ১৭ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ চালুর ফলে এই ব্যয়ের পরিমাণ কম হবে। এছাড়াও এ স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে ২০টি ভাড়া দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনে এই স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার বিক্রির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপসংহার : বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে মহাকাশে বাংলাদেশের যে যাত্রা শুরু হয়েছে তা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশাল প্রতিশ্রুতির বিপ্লব নিয়ে এসেছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখা এবং স্যাটেলাইটটির সর্বোচ্চ ব্যবহার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। সেই দিন হয়তো আর বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশের তরুণ বিজ্ঞানিগণ নিজেদের তৈরি নভোযানে চেপে দূর মহাবিশ্বে পাড়ি জমাতে সক্ষম হবে।

৪১ বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ : প্রেক্ষাপট ও প্রতিকার

[ফা. প. ২০০৭]

অথবা, পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

উপস্থাপনা : বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্ব যেসব ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি তার মধ্যে পরিবেশ দূষণ অন্যতম। পরিবেশ মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবজীবনের বিকাশে পরিবেশই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে। কিন্তু আজ বিশ্ব পরিবেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত। শিল্প-কলকারখানার ধোঁয়া, গাড়ির জ্বালানি, শব্দদূষণ, বায়ু দূষণ প্রভৃতির ফলে মানবজীবন আজ বিপন্ন। তাই এর প্রতিকার করা খুবই জরুরি।

পরিবেশ দূষণের স্বরূপ : আমাদের চারপাশের আলো, বাতাস, মাটি, পানি, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা, সাগর, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের সমন্বয়ে সৃষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনাই হলো পরিবেশ। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা এ পরিবেশের রূপ পাল্টে দিয়েছে। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। তবে বর্তমান শতকেই এটি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। মানুষের ধ্যানধারণা, চিন্তাচেতনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে মানুষ প্রবেশ করেছে এক নতুন যুগে, নতুন সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে। এর ফলে আরম্ভ হয়েছে নগরায়ণ, গড়ে উঠেছে শিল্প কলকারখানা। যাতায়াতের সুবিধার্থে পথে নেমেছে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন। ফলে পরিবেশ দূষণও বেড়ে চলছে এবং তা ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

পরিবেশ দূষণ ও বাংলাদেশ : পাশ্চাত্য সভ্যতার হাত ধরে প্রকৃতির স্বর্গপুরী চির-শ্যামল-সবুজ বাংলাদেশেও শিল্পায়নের দৈত্য নিয়ে এসেছে চির নিঃশ্বাসের মহামারী। এদেশে আজ স্থাপিত হচ্ছে অজস্র ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ ভারী-শিল্প কারখানা। আমাদের বৈষয়িক অগ্রগতির স্বার্থে এসব করা হলেও পরিবেশ দূষণ চরম আকার ধারণ করেছে। অন্যদিকে ফারাক্কা বাঁধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণের প্রকোপ থেকে বাংলাদেশও আজ মুক্ত নয়। সর্বোপরি, মারাত্মক আকার ধারণ করেছে বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ।

পরিবেশ দূষণের কারণ : দেশে দিন দিন মানুষ বাড়ছে, বাড়ছে তাদের চাহিদা, বাড়ছে যানবাহন ও শিল্পকারখানা। ফলে অতিরিক্ত মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে সবকিছুর ওপরই চাপ পড়ছে। পরিবেশ দূষিত হয় মূলত বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পানিদূষণ, মাটিদূষণ, যুদ্ধসংঘর্ষ, বনজসম্পদ ধ্বংস ইত্যাদি কারণে নিচে পরিবেশ দূষণের কারণগুলো উপস্থাপন করা হলো–

শব্দদূষণ : শব্দদূষণের ফলে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। কলকারখানার শব্দ, গাড়ির হর্ণ, বোমাবাজির আওয়াজ, রেডিও টেলিভিশনের শব্দ, মাইকের বিকট আওয়াজ ইত্যাদি শব্দদূষণের প্রধানতম কারণ। এগুলো মানুষের শ্রবণশক্তি হ্রাস, মানসিক বিপর্যয়, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বায়ুদূষণ : আমরা বায়ুমন্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করেই বেঁচে থাকি। কিন্তু দ্রুত শিল্পায়ন এবং অন্যান্য কারণে বায়ুমন্ডল ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। বায়ুদূষণ সংক্রান্ত সাম্প্রতিক এক তথ্যে

প্রকাশ পেয়েছে রাজধানী ঢাকা বিশ্বের দ্বিতীয় দূষিততম নগরী। প্রথম স্থানে রয়েছে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। যানবাহনের কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষণের জন্য বিশেষভাবে দায়ী। শিশুসহ সব বয়সের নাগরিকদের শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন রোগের মূল কারণ যানবাহন ও কলকারখানা নির্গত ধোঁয়া। ইতোমধ্যে জাপান ধোঁয়াবিহীন গাড়ি আবিষ্কারে সক্ষম হয়েছে যা পরিবেশ দূষণের হাত থেকে কিছুটা রেহাই দেবে।

পানিদূষণ : এই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশেই রয়েছে পানি এবং বাকি এক ভাগে রয়েছে স্থল। কিন্তু খাল-বিল, নদী-সমুদ্রের পানিদূষণের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায়– জল-স্থল উভয় স্থানের প্রাণীর জীবন আজ-বিপন্ন। নদী ও সমুদ্রের তীরে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে রাসায়নিক বর্জ্য, পৌর কর্পোরেশনের আবর্জনা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। দেশের খাল, বিল ও জলাশয়গুলোও দুষণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। এসব দূষণ রোধে কার্যকর কোনো পদক্ষেপও দেখা যাচ্ছে না।

মাটি দূষণ : অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলানোর জন্য মাটিতে কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে মাটির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া এসব রাসায়নিক দ্রব্য পানির সাথে মিশে ভূ-অভ্যন্তরে গ্যাসীয় পদার্থের চাপ বৃদ্ধি করছে– যা ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে।

যুদ্ধ সংঘর্ষ : জান-মালের ক্ষতির পাশাপাশি যুদ্ধ পরিবেশেরও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। কারণ যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা রসায়নিক অস্ত্রের জীবাণু মানবজীবন ও পরিবেশকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে, ফলে পরিবেশ দূষিত হয়।

বনজ সম্পদ ধ্বংস : বনজ সম্পদ ধ্বংস করা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে বা দাবানলে শত শত হেক্টর বনভূমি পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ১৭ শতাংশ বনভূমি রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই প্রয়োজনীয় বনভূমি নেই। অথচ মানুষ আজ বনজ সম্পদ বিনষ্টের মাধ্যমে আত্মঘাতী কাজ করছে, আগামীর জন্য তা যেমন বিপজ্জনক, তেমনি হতাশাজনকও বটে। জীবনের অস্তিত্বের জন্য যে অক্সিজেন প্রয়োজন, পরিবেশে যদি তার ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পরিবেশ হয়ে উঠবে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণের অনুপযোগী। এছাড়া বায়ুতে বেড়ে যাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। অর্থাৎ ধীরে ধীরে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ হয়ে উঠবে ভারসাম্যহীন। সূর্যের আলো ওজন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে পতিত হলে সে তাপে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতো পৃথিবী হয়ে উঠবে উত্তপ্ত। বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্যান্সারসহ নানাবিধ রোগের প্রকোপ বাড়বে।

দেশে জনসংখ্যার অপরিমিত বৃদ্ধিও পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। অপরিমিত জনসংখ্যার কারণে নগরায়ণ বৃদ্ধি পায়, নগরে জনসংখ্যার ঘনত্ব স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করে। তখন অতিরিক্ত জনসংখ্যা শব্দ, বায়ু ও পানি দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশ্ব পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক সংগঠনের ভূমিকা : ১৯৭২ সালে স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয় United Nations Conference on the Human Environment. এ সম্মেলনে গৃহীত ঘোষণায় বলা হয়– "সকল রাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে যে, তাদের কার্যকলাপ অন্যান্য রাষ্ট্রের পরিবেশ বিনষ্ট করছে না সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেওয়া।" ১৯৭৫ সালে UNEP পরিবেশ দূষণরোধে প্রণীতব্য পরিবেশ আইনের প্রতিরোধক চরিত্রটির ওপর গুরুত্বারোপ করে। ১৯৮৭ সালে CFC গ্যাসের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে Montreal

Agreement স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে অনুষ্ঠিত UN Conference on Environment & Development (UNCED) এ পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা Agendum-21 গৃহীত হয়। ২০০৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে তিন পৃষ্ঠার এক অঙ্গীকারনামার ১২টি শর্তকে বাংলাদেশ অনুমোদন দেয়। সম্মেলনে বাংলাদেশ দাবি করে যে, জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য ২০২০ সাল পর্যন্ত দরিদ্র দেশগুলোকে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার (সাত লাখ কোটি টাকা) সাহায্য প্রদানের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। চুক্তিতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পরিবেশের বিরূপ প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠার জন্য জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক (COP) পরবর্তী সম্মেলন ১১-২২ নভেম্বর ২০১৯ চিলিতে অনুষ্ঠিত হবে। আশা করা যায়, উক্ত সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

পরিবেশ দূষণ প্রতিকার : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের কতিপয় করণীয় রয়েছে। আমরা যদি পূর্ব থেকেই এ সম্পর্কে সচেতন না হই, তাহলে অতি শীঘ্রই নানাবিধ মারাত্মক সংকটের সম্মুখীন হব। এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত উপায়গুলো অবলম্বন করা যেতে পারে–

১। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করা। ২। প্রস্তাবিত পরিবেশ বিভাগের আওতায় পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থা জোরদার করা। ৩। গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানো। ৪। একটি পরিবেশ মনিটরিং সেল ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা। ৫। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির কথা বিবেচনা করা। ৬। সারাদেশে গ্রাম ও ওয়ার্ডভিত্তিক 'পরিবেশ রক্ষা' বিষয়ক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন। ৭। কলকারখানা স্থাপনের পূর্বে Cost-benefit ratio ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা করা। ৮। ব্যাপক হারে বৃক্ষ রোপণ করা। ৯। পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন আরও শক্তিশালী ও তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। ১০। কাঠের বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ। ১১। পরিকল্পিত নগরায়ণ। ১২। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। ১৩। ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাস। ১৪। নদী ও খাল-বিল ও সমুদ্রে বর্জ্য ফেলা কঠোরভাবে দমন। ১৫। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ জোরদারকরণ। ১৬। কমিউনিটি বনায়ণ প্রকল্প জোরদারকরণ। ১৭। পরিবেশ বিষয়ক সরকারি ও বেসরকারি কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।

উপসংহার : পরিবেশ দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ে তুলতে হলে বিশ্ববাসীকে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিতর্ক ভুলে উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বকে নিঃস্বার্থভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণরোধে প্রচলিত আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তা হলেই গড়ে উঠবে বাসযোগ্য সুন্দর পৃথিবী।

৪২ দূষিত পরিবেশ ও বিপন্ন পৃথিবী [ফা. প. ২০১০, '১৫]

উপস্থাপনা : পরিবেশ মানবজীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবেশ মানুষের জীবনের বিকাশকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। ভালো পরিবেশ সুস্থ মানুষ আর খারাপ পরিবেশ অসুস্থ মানুষ তৈরি করে। পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রথম ও প্রধান

পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ প্রশান্ত পরিবেশ, কিন্তু নানাবিধ কারণে প্রতিনিয়ত আমাদের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য সুস্থতার প্রয়োজন, কিন্তু দূষিত পরিবেশ ক্রমেই তা হারিয়ে ফেলছে। তাই সঙ্গত কারণেই বিশ্বব্যাপী মানুষ পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে; পাশাপাশি পরিবেশের সুস্থতা রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এ উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ধরিত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হলো।

পরিবেশের স্বরূপ : আমরা যে স্থানে বসবাস করি সে স্থান এবং তার আশপাশের অবস্থাকে পরিবেশ বলা হয়। ঘরবাড়ি, দালানকোঠা, গাছপালা, নদীনালা, মাটি, বায়ু, বিষয়-সম্পত্তি এ সবকিছু মিলেই তৈরি হয় পরিবেশ। মানুষের আচার-ব্যবহার ও জীবনধারণ পদ্ধতি পরিবেশ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। আবার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহারে সমাজ দ্বারাও পরিবেশ প্রভাবিত হয়।

পরিবেশ দূষণের কারণ : পরিবেশ দূষণের নানাবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো– জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজসম্পদ হ্রাস, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার, যুদ্ধ ও সংঘর্ষ এবং গ্রিন হাউস ইফেক্ট ইত্যাদি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। কারণ অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বেড়ে চললে বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সংকট দেখা দেয়। বাড়তি মানুষের চাহিদা মেটাতে বনজসম্পদ ধ্বংস, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ পড়ে। যার ফলে পরিবেশ দূষিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটিরও বেশি যা স্বাধীনতার সময়কার জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। মাত্র ৪৮ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি উন্নীত হয়েছে। শুধু রাজধানী ঢাকাতেই প্রায় দুই কোটি জনগণের বসবাস। যা ধারণক্ষমতার দ্বিগুণেরও বেশি। ক্রমবর্ধমান যানবাহন ও মানুষের চাপ একটি লোকালয়ের প্রকৃতি ও পরিবেশ কতখানি বিনষ্ট করতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের রাজধানী ঢাকা। পরিসংখ্যানবিদদের মতে, এ শহরে অতিরিক্ত জনসংখ্যার পরিমাণ এক কোটিরও বেশি। ঘর-বাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাজার, পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, যাতায়াত, অবসর ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা এগুলো পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু রাজধানীর শতকরা ৯০ জনের জন্য তা নেই। বস্তুত দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও অভাব অনটন আমাদের পরিবারকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলেছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, শুধু রাজধানীর জীবনই নয়, গোটা বাংলাদেশের পরিবারকেন্দ্রিক সমাজজীবন এক বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।

বনজ সম্পদ হ্রাস : বাঁচার পথ খুঁজতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর নির্মম হস্তক্ষেপ করছে। পৃথিবীর সর্বত্রই এটা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের অধিবাসীরা শিল্পায়নের জন্য বায়ুর ওজোনস্তরের ব্যাপক ক্ষতি করছে, যা নিয়ে সারা বিশ্বই শঙ্কিত। অন্যদিকে অনুন্নত দেশের মানুষেরা জ্বালানির জন্য এবং বসতবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য বনজ সম্পদ ধ্বংস করছে। ফলে প্রতিনিয়ত পরিবেশ ভারসাম্য হারাচ্ছে।

রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহার : ভালো ও উন্নত জাতের ফসল ফলানো এবং কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য কৃষকেরা অপরিকল্পিত এবং ব্যাপক হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এসব ব্যাপক হারে ব্যবহারের ফলে মাটি, পানি ও ফসল দূষিত হচ্ছে এবং জীবজগৎ, প্রাণিজগৎ এবং পরিবেশ দারুণ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে।

রাসায়নিক দ্রব্যের অপব্যবহার : আমাদের পরিবেশ দূষণকারী দ্রব্যগুলোর মধ্যে সীসা, পারদ, সালফার-ডাইঅক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে কতকগুলো আবার আমাদের মলমূত্র ও শরীরের পচন থেকে উৎপন্ন। এগুলো প্রতিনিয়ত বায়ু দূষিত করছে। এ বায়ুদূষণ চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে। কার্বন থেকে শুরু করে ভারী ধাতু, জটিল জৈব যৌগ, জীবাশ্ম জ্বালানি, নিউক্লিয় আবর্জনা, ক্লোরোফ্লুরোমিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, আলোক রাসায়নিক ধোঁয়া ইত্যাদি বায়ুদূষণের প্রধান কারণ। এর ফলে আবহাওয়ার তাপমাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফলে পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

যুদ্ধ ও সংঘর্ষ : যুদ্ধ ও সংঘর্ষ জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি পরিবেশও দূষিত করে। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক অস্ত্র মানবজীবন ও পরিবেশকে দারুণ প্রভাবিত করে। প্রমাণস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির ওপর নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার কথা বলা যায়। তা ছাড়া ইরান ও ইরাক যুদ্ধ এবং সিরিয়া, আফগানিস্তান ও ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কর্তৃক ক্লাস্টার বোমা নিক্ষেপের কারণেও পরিবেশ দূষিত হয়েছে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট : 'গ্রিন হাউস' বা 'সবুজ ঘর' বলতে কাচে ঘেরা ঘরকে বোঝায়, যার ভেতরে সবুজ গাছপালা, শাকসবজি ইত্যাদি সীমিতভাবে চাষ করা হয়। কাচঘেরা ঘরে সূর্যের কিরণ সহজেই প্রবেশ করে, কিন্তু ভেতর থেকে বিকিরণ কাচ ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে গ্রিন হাউজের ভেতরে উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। একইভাবে সূর্যরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে সহজে পৌছে, কিন্তু পৃথিবী থেকে সব বিকিরণ সহজে মহাকাশে ফিরে যেতে পারে না। ফলে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার গ্যাস গ্রিন হাউজের কাচের মতো কাজ করে। শিল্প বিপ্লবের পর বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে এবং পৃথিবী ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৫ থেকে ৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। পৃথিবীর উপকূলভাগ প্লাবিত হবে। বাংলাদেশ, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়ার মতো নিম্নাঞ্চল ডুবে যাবে। গ্রিন হাউস ইফেক্ট বৃষ্টিপাত, বায়ুমণ্ডল, মৌসুমি বায়ু, ঘূর্ণিঝড়, জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস, কৃষি পদ্ধতি, শস্য উৎপাদন, বনাঞ্চল, মৃত্তিকার অবস্থা, ভূমি ব্যবহার, মৎস্য চাষ ইত্যাদির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এ অবস্থা চলতে থাকলে পৃথিবী একদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে।

প্রতিকার : বস্তুত পরিবেশ দূষণরোধে এখনই জরুরিভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহের নির্গমন রোধ করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি এগুলো সার্বক্ষণিক পরিমাপের পদ্ধতি এবং পৃথিবীতে এর প্রতিক্রিয়া নির্ণয়ের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বস্তুত পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দরকার। এজন্য পরিবেশ দূষণ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগকে আরও শক্তিশালী করে প্রস্তাবিত পরিবেশ বিভাগের আওতায় পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাকে জোরদার করা দরকার। এ ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার মাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য একটি পরিবেশ মনিটরিং সেল ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে, গ্রহণ করা যেতে পারে একটি জাতীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাও থাকবে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবেই আমরা পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে সক্ষম হব।

বিশ্ব পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার : ২০১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি দুই সেন্টিগ্রেডের কম রাখার বিষয়টিকে সমর্থন করে। তবে দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা এক দশমিক পাঁচ সেন্টিগ্রেডের উপরে যাতে বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হয়।

উপসংহার : আশার কথা, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ববাসী ধরিত্রী সম্মেলনের মধ্য দিয়ে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য শুভ প্রতীতি ব্যক্ত করেছে এবং মতপার্থক্য থাকলেও এ ব্যাপারে যথাযথ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সকল শ্রেণির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আমরা এর সুফল পেতে শুরু করব।

৪৩ গ্রিন হাউস ইফেক্ট

অথবা, ওজন স্তরের বিপদ ও মানব সংকট

অথবা, গ্রিন হাউস ইফেক্ট ও বাংলাদেশ

উপস্থাপনা : বিশ্বায়নের এ দিনে বিশ্ব যেসব ভয়ঙ্কর সংকটের মুখোমুখি তার মধ্যে 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট' উল্লেখযোগ্য। পরিবেশ দূষণেরই একটি বৈশ্বিক প্রক্রিয়া হলো 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট', যা আজ বিশ্ববাসীকে চরম সংকটের মুখোমুখি করেছে। বিগত কয়েক বছর ধরে সারাবিশ্বে যে বিষয়টি নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বেগ ও গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে তা হলো, পৃথিবীর পরিবেশ দিন দিন তার ভারসাম্য হারাতে চলেছে। আর এজন্য পৃথিবীর মানুষই দায়ী।

গ্রিন হাউস কী : গ্রিন হাউস ইংরেজি (greenhouse) শব্দ। এর অর্থ 'সবুজ ঘর'। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে এবং মেরু অঞ্চলের তীব্র শীতপ্রবণ এলাকায় বছরের একটি দীর্ঘ সময় সূর্যের অনুপস্থিতি থাকে। ফলে এসময় মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজির সংকট দেখা দেয়। এজন্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ ধরনের কাচের ঘর উদ্ভাবন করেন। এ ঘরের ছাদ ও দেয়াল তাপ বিকিরণরোধী বিশেষ ধরনের কাচ দিয়ে তৈরি। গ্রীষ্মকালে এ ঘরে সূর্যালোক ও উত্তাপ প্রবেশ করে, কিন্তু বিকিরণ না ঘটায় তাপ বের হতে পারে না। পরে শীতকালে এ তাপকে কাজে লাগিয়ে সবজি উৎপাদন করা হয়। শীতের দেশে এ ধরনের কাচের ঘরকে বলা হয়– গ্রিন হাউস বা 'সবুজ ঘর'।

গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া কী : আবহাওয়ামণ্ডল ও ভূপ্রকৃতির বিশেষ অবস্থার প্রতীকী নাম গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া। যা শীতপ্রধান দেশে কাচের ঘরে সূর্যের উত্তাপ সঞ্চয়ের প্রতিক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। গ্রিন হাউজে সূর্যের তাপ ঢুকলেও তা বিকিরণের মাধ্যমে মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না। পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে স্বাভাবিক অবস্থার বিপন্নতার কারণে যে পরিমাণ উত্তাপ আসে, সে পরিমাণ উত্তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় ফিরে না গিয়ে কিছুটা আবহাওয়ায় সঞ্চিত হচ্ছে। এ তাপ সঞ্চয়ের ফলে পৃথিবীর ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। এ প্রতিক্রিয়াকেই বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট'।

গ্রিন হাউস ইফেক্টের কারণ : গ্রিন হাউস ইফেক্টের মূল কারণ হলো পৃথিবীর উপরিভাগের উষ্ণতা বৃদ্ধি। আর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো পরিবেশ দূষণ। অধিকহারে বনজসম্পদ ধ্বংস, অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদি এর জন্য দায়ী। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীটা পরিণত হচ্ছে গ্রিন হাউস ইফেক্টের কাচের ঘরের সবজি বাগানের মতো।

গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলাফল : গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর বিশাল বিশাল আইসল্যান্ডসহ অন্যান্য স্থানের বরফ গলে যাচ্ছে। বরফ গলা পানি সমুদ্রে এসে পড়ছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঝড় ও ঘূর্ণিঝড় তীব্র হচ্ছে। উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ অঞ্চল ডুবে গিয়ে বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ বিভিন্ন সমতল দেশসমূহের বিশাল অঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে।

বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের প্রভাব : বাংলাদেশে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে নিচে উপস্থাপন করা হলো–

ভূমি জলমগ্ন হওয়া : বাংলাদেশ একটি সমতল ভূমির দেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা খুব বেশি নয়। গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে এ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলাদেশের অন্তত সতেরোভাগ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে, ১৫% আবাদযোগ্য এবং ৩.৩০% বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি : বাংলাদেশের সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি। এ বন থেকে কাঠ, বেত, মধু, মোমসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা হয়। পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীদের অভিমত, সমুদ্রের পানির উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বা ৩.৩৩ ফুট বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০% তলিয়ে যাবে।

লবণাক্ত পানির বিস্তার : গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলস্বরূপ সমুদ্রস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের খুলনা, বাগেরহাট, ফিরোজপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, পটুয়াখালী, বরগুনা প্রভৃতি জেলার আবাদি জমিতে সহজেই লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে।

বন্যা-ঝড় বৃদ্ধি : গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পাবে। শীতকালেও অকাল বন্যা দেখা দিতে পারে, এভাবে আবহাওয়াগত চরম বিপর্যয় ঘটবে।

বায়ুর ওজন স্তর ক্ষয় ও রোগ-ব্যাধির প্রকোপ : গ্রিন হাউসের মারাত্মক প্রভাবে বায়ুর ওজন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এবং এই ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ দিয়ে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে এসে পড়ে। এই রশ্মির প্রভাবে মানুষের দেহে ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার : পরিবেশকে গ্রিন হাউস ইফেক্টের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হলে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ প্রয়োজন। এজন্য পরিবেশ দূষণনিয়ন্ত্রণ বিভাগ (DEPC)-কে আরও শক্তিশালী করা দরকার এবং প্রস্তাবিত পরিবেশ বিভাগের আওতায় পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদব্যবস্থাকে জোরদার করা দরকার। এ ব্যাপারে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার মাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে। এজন্য একটি পরিবেশ মনিটরিং ও তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে এবং গ্রহণ করা যেতে পারে একটি জাতীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিকল্পনা থাকবে। তাছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে পরিবেশ শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির কথাও বিবেচনা করা যেতে পারে। তবেই আমরা পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সক্ষম হব।

পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয় : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে পৃথিবীর অস্তিত্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব পৃথিবীর মানুষেরই। আমরা যদি পূর্ব থেকেই সচেতন না হই, তাহলে অতি শীঘ্র আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হব। অধিকহারে বৃক্ষ রোপণ, যানবাহনে ত্রুটিপূর্ণ ইঞ্জিন ব্যবহাররোধ, পরিকল্পিত উপায়ে শিল্প-কারখানা স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করলে আমরা গ্রিন হাউস ইফেক্টের বিরূপ ফলাফল থেকে বাঁচতে পারব।

সারণি : বিশ্বের নির্বাচিত দেশসমূহে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন

ক্র.	দেশ	মোট নির্গমন (CO_2) (মিলিয়ন মেট্রিক টনস)	শতকরা নির্গমন
১।	চীন	৭,৭১১	২৫.৪
২।	যুক্তরাষ্ট্র	৫,৪২৫	১৭.৮
৩।	রাশিয়া	১,৫৭২	৫.২
৪।	ভারত	১,৬০২	৫.৩
৫।	জাপান	১,০৯৮	৩.৬
৬।	জার্মানি	৭৬৬	২.৫
৭।	কানাডা	৫৪১	১.৮
৮।	যুক্তরাজ্য	৫২০	১.৭
৯।	দক্ষিণ কোরিয়া	৫২৮	১.৭
১০।	ইরান	৫২৭	১.৭

উৎস : EIA *(Environmental International Agency-2009]*

সারণিতে দেখা যায়, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারত এই চারটি দেশ বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি কার্বন নিঃসরণ করে।

বিশ্ব সম্মেলন : ২০১৫ সালের ৩০শে নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ সেন্টিগ্রেডের কম রাখার বিষয়টিকে সমর্থন করে। তবে দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা এক দশমিক পাঁচ সেন্টিগ্রেডের উপরে যাতে বৃদ্ধি না পায় সে লক্ষ্যে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হয়।

উপসংহার : গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে পৃথিবীতে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আজ ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কাজ করতে হবে সম্মিলিতভাবে। বায়ু দূষণকারী যানবাহন ও শিল্প-কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে একটু সচেতন হলেই আমরা গ্রিন হাউসের ক্ষতিকর প্রভাব রোধ করতে পারি এবং আগামী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি একটি সুন্দর পৃথিবী।

৪৪ পরিবেশ সংরক্ষণে বনায়ন [ফা. প. ২০০৪, '১২]

অথবা, বৃক্ষরোপণ অভিযান [ফা. প. ১৯৯৭]

উপস্থাপনা : বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী Peter Walliston বলেছেন,– Environmental pollution is a great threat to the existence of living beings on the earth. অর্থাৎ পরিবেশগত দূষণ বিশ্বের সকল প্রাণির অস্তিত্বের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। তাই পরিবেশকে সুন্দর ও পরিপাটি রাখতে বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমিরূপ ও আবহাওয়ার কল্যাণে বাংলাদেশ চিরসবুজের লীলাভূমি হলেও আজ বিভিন্ন কারণে বৃক্ষনিধন মারাত্মক রূপলাভ করেছে। তাই অবশ্যই এর প্রতিকার করা উচিত।

বাংলাদেশের বনভূমি : কোনো দেশের জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমির পরিমাণ সে দেশের মোট ভূমির ২৫% হতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাদেশের অনেক কম বনভূমি

রয়েছে। আমাদের বনভূমির পরিমাণ মোট ভূমির মাত্র ১৭.৬%। আর আয়তন প্রায় ২৬ লাখ হেক্টর।

বনভূমির প্রয়োজনীয়তা : বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অনেক। বনভূমির অভাবে কোনো ভূখণ্ড মরুভূমিতে রূপান্তরিত হতে পারে। অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়াও গাছ আমাদেরকে অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসাসহ নানা কাজে সহায়তা করে আসছে। কিন্তু মানুষের অজ্ঞতার কারণে বনভূমি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি। নিচে বনভূমির প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হলো :

অক্সিজেন সরবরাহ : পৃথিবীর সকল প্রাণি বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। বায়ুমণ্ডলে প্রায় ২১ ভাগ অক্সিজেন রয়েছে। এই অক্সিজেন জোগান দেয় গাছপালা। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরে গাছপালা কম থাকায় বায়ুদূষণের পরিমাণও শহরে বেশি।

সৌন্দর্য রক্ষায় বনভূমি : বলা হয়– "Forest is the symbol of devine." পরিবেশকে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও মনোরম সাজে সাজাতে বৃক্ষের তুলনা হয় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

আপনার পত্রপুষ্প ফুটে, অনন্ত যৌবনা করি,
সাজাইলে বসুন্ধরা।

ঘরবাড়ি ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের উৎস : ঘরবাড়ি আমাদের আশ্রয়স্থল। ঘরবাড়ি তৈরি করার জন্য প্রয়োজন কাঠ, বাঁশ, বেত, গোলপাতা ইত্যাদি। এ সবই বনভূমি থেকে আসে। ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরির জন্যও কাঠ দরকার। এ কাঠ আমরা বনভূমি থেকেই পেয়ে থাকি।

ওষুধ তৈরির উপকরণ : অতি প্রাচীনকালে বিভিন্ন প্রকার গাছ, লতাপাতা ইত্যাদির রস খেয়ে মানুষ আরোগ্য লাভ করতো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে এগুলোকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোধন করে তৈরি করা হয় জীবন রক্ষাকারী ওষুধ। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার সুগন্ধি, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির উপকরণ গাছগাছালি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

মোম ও মধু : সুন্দরবনে প্রচুর মৌচাক পাওয়া যায়। এসব মৌচাক থেকে মোম ও মধু সংগ্রহ করা হয়। মোম ও মধু আমাদের খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। মধু খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। তাছাড়া মধু ও মোম সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

জ্বালানি : আমাদের জ্বালানি কাঠের খুব প্রয়োজন। এসব কাঠ বনভূমি থেকে আসে। কিন্তু আমরা অসচেতনতাবশত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাঠ জ্বালিয়ে বনভূমি ধ্বংস করি। জ্বালানি চাহিদার ৬০ শতাংশই আসে বনভূমি থেকে, যা কোনোভাবেই উচিত নয়। জ্বালানি সাশ্রয় ও মজুদ রাখার ক্ষেত্রে আমাদের সুষ্ঠু নীতিমালা মেনে চলা উচিত।

বন্যা নিয়ন্ত্রণ : বনভূমি বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিরাট ভূমিকা পালন করে। বন্যার প্রকোপ থেকে ঘরবাড়ি, ফসল ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য বনভূমির প্রয়োজন অত্যধিক। প্রচুর পরিমাণে বনভূমির অভাবে বন্যার সময় মাটি ক্ষয় হয়ে যায় এবং নদী ভরাট হয়ে দুকূল প্লাবিত হয়। তাই বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বনভূমির প্রয়োজন। দেশের সব নদ-নদী খনন করে দুপাশে প্রচুর গাছ রোপন করলে বাংলাদেশ বন্যা থেকে অনেকাংশে রক্ষা পেতে পারে।

পরিবেশের ওপর বনাঞ্চলের প্রভাব : যান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে পরিবেশ তার ভারসাম্য হারাতে চলেছে। কাঠ, কয়লা, গ্যাস, তৈল ইত্যাদি জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে আমাদের পারিপার্শ্বিক জগৎ 'গ্রিন হাউস ইফেক্ট'-এর পরিণতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলেই অনাবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, তুষারপাত, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিধস প্রভৃতি নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে বনভূমি উজাড় হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এমন

ধারা চলতে থাকলে আমাদের দেশ একদিন মরুভূমিতে পরিণত হওয়া বা বঙ্গোপসাগরের অতল গভীরে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অবাস্তব কিছু নয়। তাই বৃক্ষের যথাযথ বিস্তার ও সংরক্ষণের জন্য আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে।

বনভূমি উজাড় হওয়ার কারণ :

১। সরকারি ও জাতীয়ভাবে বনায়নের যথাযথ উদ্যোগ না থাকা।

২। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে জমি আবাদ; আবাসস্থল, ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণের ফলেও বনভূমি উজাড় হচ্ছে।

৩। অবৈধ ব্যবসায়ীদের কবলে পড়েও গাছ নিধন হচ্ছে।

৪। বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটা ও বিকল্প জ্বালানির ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি।

বনভূমি রক্ষার উপায় :

১। সরকারি উদ্যোগে গ্রাম ও শহরাঞ্চলে গাছ লাগানো এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। বেসরকারি সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থাগুলোকে এ মহৎ কাজে উৎসাহিত করতে হবে।

৩। আইনের মাধ্যমে বৃক্ষনিধন বন্ধ করতে হবে।

৪। নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে এবং তার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে যত্নশীল হতে হবে।

৫। সরকারি উদ্যোগে ভালো বীজ সংগ্রহ করে জনসাধারণের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। ইট তৈরিতে কাঠের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার করতে হবে অথবা, বালু-সিমেন্ট সহযোগে ব্লক তৈরি করে দালান-কোঠা নির্মাণে উৎসাহিত করতে হবে।

৭। বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ' সপ্তাহে উপজেলা এমনকি গ্রাম পর্যায়ে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার : বৃক্ষরোপণ অভিযান সফল করা আমাদের প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য। কারণ বনায়নের ওপর নির্ভর করে সুষ্ঠু পরিবেশ, আর সেই পরিবেশেই আমরা বেঁচে থাকি। এজন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গাছ লাগাতে হবে এবং গাছের রক্ষণাবেক্ষণে গ্রাম ও শহরের সবাইকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

৪৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বাংলাদেশ

অথবা, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য

উপস্থাপনা : মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মহান আল্লাহ মানুষের বসবাসের উপযোগী করেই এ পৃথিবীকে সাজিয়েছেন। কিন্তু সৃষ্টির সেরাজীব মানুষের অদূরদর্শীতা ও স্বার্থপরতার কারণে বিশ্ব পরিবেশ আজ ধ্বংসের মুখে। তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবাধ ব্যবহার ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব এ বিশ্বকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে। এ ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য বিশ্ব পরিবেশবাদীরা পরিবেশ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। অবশেষে পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ ৫ই জুনকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

পরিবেশ দূষণ কী : 'পরিবেশ' ও 'দূষণ' শব্দ দুটির সমন্বয়ে পরিবেশ দূষণ ধারণাটি গঠিত। দূষণ হচ্ছে এমন কিছু যা স্বাভাবিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করে। আর পরিবেশ দূষণ হচ্ছে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার কোনো একটি বা একাধিক অবস্থার বিঘ্নিত রূপ। প্রাকৃতিক সমুদয় উপাদান একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে। যখন কেউ উক্ত সীমারেখা অতিক্রম করে তখন পরিবেশ দূষণ ঘটে। Natural Environmental Research council

(NERC) (১৯৭৬) এর মতে পরিবেশ দূষণ হলো– The release of harmful within the natural environment substance and energy as waste products of human activities which - result in change, usually. অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের বিবিধ কার্যক্রমের ফলে বর্জ্য হিসেবে নির্গত পদার্থ ও জ্বালানীর সারাংশ যার পরিণতি হলো দূষণ।

পরিবেশ দূষণের কারণ : পরিবেশ দূষণমুক্ত না থাকলে আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন হয়। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই পানি, বায়ু, মাটি সবই আজ দূষিত হচ্ছে। পাশাপাশি শব্দদূষণের মাত্রা শহরাঞ্চলে ব্যাপক। শিল্প-কারখানার বর্জ্য, গ্যাস, জীবাশ্ম, জ্বালানী ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া, পারমাণবিক চুল্লির বিস্ফোরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বা সামরিক মহড়া ইত্যাদি কারণে বিশ্ব পরিবেশ দিন দিন বিষাক্ত হচ্ছে। এর পরিণতিতে প্রতিবছর প্রায় ২০ কোটি টন কার্বন মনোক্সাইড বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাসের আনুপাতিক হার ক্রমশ বাড়ছে।

বায়ুদূষণের পরিণাম : বায়ু দূষণের ফলে বৃষ্টির পানিতে এসিডের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষিজমি ও ফসল, ধ্বংস হচ্ছে সবুজ বনানী। সারা বিশ্বের মোট ৮০ শতাংশ ছিল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্য। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী গড়ে প্রতি মিনিটে ২০ হেক্টর অরণ্যের ধ্বংস প্রক্রিয়া চলছে। প্রতিবছর মরু হচ্ছে ৭০ লাখ হেক্টর জমি। ২০ হেক্টর কৃষিযোগ্য জমি মানুষ ও প্রকৃতির কারণে উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। বনভূমি ধ্বংস ও বিষাক্ত গ্যাসের কারণে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন কমে গেছে। পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ উদ্ভিদ জগতের পাশাপাশি প্রাণিজগতেও ধ্বংস ডেকে এনেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মাত্র ৬০ বছরে প্রাণিজগতের ৭৬টি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটেছে। মানুষ শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য জমিতে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করছে। এতে শস্যের উৎপাদন বাড়লেও কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস এবং পানি দূষণ হচ্ছে। পরিবেশের জন্য উপকারী কীট-পতঙ্গ বিলুপ্ত হচ্ছে এবং জলজ প্রাণির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটছে মানুষের শরীরে। বলা হয়ে থাকে, পৃথিবীর ৮০ শতাংশ নতুন রোগ সৃষ্টি হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কারণে।

বিশ্ব পরিবেশ বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য : জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে– United Nations Inter Government Panel on Climate Change. জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্রোগ্রামের (UNEP) তত্ত্বাবধানে প্যানেলটি ২রা ফেব্রুয়ারি ২০০৭ তারিখে রিপোর্টটি প্রকাশ করে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.৮° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী একশ বছরের মধ্যে সমুদ্রের উচ্চতা ৮৯ সে.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে পৃথিবীর বহু জায়গা বন্যায় ভেসে যাবে বা প্রচণ্ড তুষারপাতে জমাট বেঁধে যাবে। বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে সূর্যের মারাত্মক অতি বেগুনি রশ্মি গোটা প্রাণিজগৎকে বিপন্ন করে তুলবে। এর ফলে এ পৃথিবী মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বসবাসযোগ্যতা হারাবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব : জনসাধারণকে সচেতন করার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের বাসোপযোগী অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা আজ অতি জরুরি। এক্ষেত্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কিত এ দিনটি তাই নিছক আনুষ্ঠানিকতার দিন নয়। শুধু বক্তৃতা বা আলোচনাও এর একমাত্র লক্ষ্য নয়। আমাদের উচিত, দিবসটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা, পরিবেশ দূষণমুক্তির নতুন উপায় উদ্ভাবনে ব্রতী হওয়া। আর এতে শুধু সরকারই নয়, দেশের সচেতন জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে।

স্বার্থান্বেষী পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সমগ্র প্রাণিজগতে যে ভয়াবহ বিপদের সূচনা হয়েছে, তার প্রতিকার করতে না পারলে খুব শীঘ্রই মানবসভ্যতা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রাজধানী রিও-ডি-জেনেরিওতে জাতিসংঘ ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা ধরিত্রী সম্মেলন নামে পরিচিত। এতে বিশ্বের ১৭৮টি দেশের ১০ হাজার প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং পরিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০০৫ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৪৭টি দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় 'কিয়োটা প্রটোকল', কিন্তু বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ পরিবেশ দূষণকারী যুক্তরাষ্ট্র ও চীন 'কিয়োটা প্রটোকল'-এ স্বাক্ষর করেনি। সুতরাং পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হলে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ও সুচিন্তিত কর্মসূচি গ্রহণ এবং তা কার্যকর করতে হবে। ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক, উন্নত, অনুন্নত সব দেশকেই সমবেত উদ্যোগে পরিবেশ রক্ষায় ব্রতী হতে হবে। ভয়াবহ এই পরিবেশ দূষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনের আহ্বান প্রকৃতপক্ষে, সমবেতভাবে বিশ্ববাসীকে দূষণমুক্তির কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ারই আহ্বান। আর যুদ্ধ নয় শান্তি, প্রকৃতির ধ্বংস নয় তাকে শ্যামল-সবুজ করে তোলা– এ হলো বিশ্ব পরিবেশ দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দাবির আলোকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচি : জাতিসংঘ প্রতিবছর এ দিবসটিতে পরিবেশ সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষকে জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। এ লক্ষ্যে দেশে দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, র‍্যালিসহ বিভিন্ন জনসচেতনমূলক প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অগণিত মানুষ মারা যাচ্ছে, নষ্ট হচ্ছে ফসল। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, খরা, বন্যা একের পর এক লেগেই আছে। জাতিসংঘ ঘোষিত পরিবেশ দিবসের আলোচ্যসূচিতে দুর্যোগকবলিত মানুষের জানমালের বিষয়টি যুক্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সংবাদ দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়ার ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১০১তম মার্কিন কংগ্রেসের অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক বিল হচ্ছে 'ক্লিন এয়ার বিল'। অস্ট্রেলিয়ার সরকার বিপুলসংখ্যক বৃক্ষরোপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্রিটেন পরিবেশ রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে। রোম, স্কটল্যান্ড বা লন্ডনের শহরতলীর শিল্প এলাকায় সরকার নিয়মিতভাবে বৃক্ষ রোপণ করে যাচ্ছে। গত ২৮শে জুন, ২০১৯ জাপানের ওসাকায় অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের মতো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সম্মেলনে পরিবেশ রক্ষায় জাপানের পেশ করা 'নীল সমুদ্র রূপকল্প' উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরা সমর্থন করেছে। এভাবে বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও বাংলাদেশ : বাংলাদেশেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো প্রতিবছর ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালিত হয়। পরিবেশ দূষণ রোধে বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করেছে। তারপরও অবশ্য বাংলাদেশ পরিবেশ রক্ষায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে। এখনো এদেশের মানুষের মধ্যে পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। পরিবেশ রক্ষায় এদেশের মানুষ উদাসীন। তাই অবাধে চলছে বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কাটা। যত্রতত্র কলকারখানা গড়ে উঠছে। ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে। পানিতে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। পাহাড় কাটার ফলে মাটি ধসে শত শত লোক মারা যাচ্ছে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন নিশ্চিত করতে দূষণমুক্ত পরিবেশ অত্যন্ত জরুরি। পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–

ক. বন-বনানী ধ্বংস বন্ধ করা।
খ. ভূমিক্ষয় রোধ করা।
গ. পাহাড় কাটা বন্ধ করা।
ঘ. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা।

কিন্তু বাংলাদেশে বনাঞ্চল অনেক কম থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর যে পরিমাণ বন ধ্বংস করা হচ্ছে, তার পরিবর্তে মাত্র ৫০ শতাংশ ভূমিতে নতুনভাবে বৃক্ষ রোপণের কাজ হচ্ছে। বাকি অর্ধেক পরিণত হচ্ছে বিরান ভূমিতে। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সামনে রেখে বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবেশ দূষণ রোধে বাংলাদেশে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ : বাংলাদেশে পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ইতোমধ্যে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা হলো–

১। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড আইন ২০১০ প্রবর্তন।
২। ২০১১ সালে দাতা দেশ/সংস্থাসমূহের সহায়তায় Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) গঠন।
৩। পরিবেশ রক্ষায় সরকার পহেলা জানুয়ারি, ২০০২ ঢাকা শহরে এবং পহেলা মার্চ, ২০০২ সারাদেশে পলিব্যাগ নিষিদ্ধকরণ।
৪। পরিবেশ দূষণ রোধে সিএনজি জ্বালানির ব্যবহার শুরু।
৫। কালো ধোঁয়ার মাধ্যমে বায়ুকে দূষিত করার অন্যতম উৎস টু-স্ট্রোক যানবাহন। সরকার কর্তৃক তাই টু-স্ট্রোক যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করণ।
৬। মেয়াদ উত্তীর্ণ যানবাহন নিষিদ্ধকরণ।
৭। পরিবেশ ও বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ।
৮। পরিবেশ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন।
৯। পরিবেশ আদালত স্থাপন।
১০। বুড়িগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচি গ্রহণ।
১১। রাজধানী থেকে ট্যানারি শিল্প স্থানান্তর।
১২। শহরের খাল পুনরুদ্ধার কর্মসূচি গ্রহণ।
১৩। পরিবেশ বিষয়ে গণমাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি।
১৪। পাবলিক প্লেসে ধূমপান নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি।

উপসংহার : পরিবেশগত সমস্যা পৃথিবীতে মানুষের বসবাসযোগ্যতাকে অসম্ভব করে ফেলবে। এ সমস্যা ভৌগোলিক ও প্রজন্মগত সীমারেখা অতিক্রম করে। তাই পরিবেশ ঝুঁকি মোকাবিলায় বিশ্বের সকল দেশের মানুষকে একযোগে কাজ করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্ব পরিবেশ দিবস সকলের মনে যেন এমন চেতনাই সৃষ্টি করে। তাই সকলের উচিত নিজেকে বিশ্ব পরিবেশের এ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করা।

৪৬ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য [ঢা. প. ১৯৯১, '৯৮, '১০, '১৬]
অথবা, বাংলাদেশের ষড়ঋতু
অথবা, বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য [ঢা. প. ২০১৪]

উপস্থাপনা : কবির ভাষায়– "বিশ্ব কবির সোনার বাংলা
নজরুলের বাংলাদেশ

জীবনানন্দের রূপসী বাংলা
রূপের যে তার নাইকো শেষ।"

বাংলাদেশ বিশ্বের এক বিস্ময়। এ বিস্ময়ের প্রধান কারণ ষড়ঋতুর রঙ্গালয়। ষড়ঋতু নানা রূপ, রস ও গন্ধে সাজায় এখানকার প্রকৃতিকে, তাই কবির চোখে "আমাদের দেশখানি ছবির মতন।"

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি : ভূপ্রকৃতির দিক থেকে বাংলাদেশ রূপ-বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এদেশের মাটিতে সোনাঝরা ফসল ফলে। কিছু কিছু অঞ্চল জুড়ে পার্বত্যভূমি থাকলেও দেশের অধিকাংশ অঞ্চল সমভূমি। সমতল ভূমির মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রের মতো বিখ্যাত নদী। অসংখ্য নদীনালা দেশটিকে জালের মতো ঘিরে রেখেছে। এজন্য প্রকৃতি বিজ্ঞানীরা এদেশকে নদীমাতৃক দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বাংলাদেশের জলবায়ু : বাংলাদেশের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। প্রবল উষ্ণতা কিংবা শৈত্যের প্রভাব এখানে নেই। গ্রীষ্মকালে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কালবৈশাখী ঝড় প্রবাহিত হয়। এ সময় কিছুটা সূর্যতাপের প্রখরতা লক্ষ করা যায়। অনেক সময় প্রকৃতি রুক্ষ ও শুষ্ক আকার ধারণ করে। বর্ষাকালে প্রবল বারি বর্ষণের ফলে গরমের প্রকোপ কিছুটা কমে আসে। শরৎ ও হেমন্তের জলবায়ু শান্ত প্রকৃতির। শীতের জলবায়ু কিছুটা আর্দ্র। তার পরে আসে বসন্ত। এ সময় মনোমুগ্ধকর দক্ষিণা হাওয়া এদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়।

বাংলাদেশের ঋতুবৈচিত্র্য : ষড়ঋতুর অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত এ বঙ্গভূমি। পালা বদলের খেলায় বিচিত্র রূপের বাহার নিয়ে আসে ছয়টি ঋতু। এজন্য বলা হয়– Bangladesh is the favourite playground of nature, decorated with six seasons.

ক. **গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতু :** গ্রীষ্ম ও বর্ষাকাল বাংলাদেশের দুটি বিশেষ ঋতু। এ দুটি ঋতু দেশের নৈসর্গিক দৃশ্যের অনেক পরিবর্তন ঘটায়। গ্রীষ্মের প্রখর সূর্য কিরণে বাংলার প্রকৃতি হয়ে ওঠে রুদ্রমূর্তি। এ সময় হঠাৎ কালবৈশাখীর তাণ্ডব নৃত্যে মানুষের জীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। তারপর আসে বর্ষা। বর্ষায় গ্রামবাংলার অপরূপ দৃশ্য নয়ন মুগ্ধকর। বর্ষার রিমঝিম বর্ষণে ধূলি-ধূসরিত মরুমাঠ পুলকিত শিহরণে জেগে ওঠে।

খ. **শরৎ ঋতুর পরিচয় :** কবির ভাষায়–

শরৎ রানির বীণা বাজে
কমল দলে।
ললিত রাগের সুর করে তাই
শিউলি তলে।

শাপলা, শালুক, পদ্ম, জুঁই, কেয়া আর কাশফুলের সৌরভে শরৎ রানি তার বীণার তারে সুর বাজিয়ে তোলে। সে সুরে মুখরিত হয় বাংলার আকাশ-বাতাস। তাই নতুন রূপের নতুন আবেশ চারদিকে শ্যামলিমায় সজ্জিত হয়ে আসে ভাদ্র ও আশ্বিন মাস। এ দু'মাসই শরৎকাল। বর্ষার গ্লানিটুকু মুছে দিয়ে প্রকৃতি নতুন রূপ ধারণ করে এ ঋতুতে।

গ. **হেমন্ত ঋতুর পরিচয় :** কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে হেমন্ত ঋতুর আগমন হয়। নারিকেল, তাল, বাতাবি লেবু ও পেয়ারার মতো সুস্বাদু ফলসহ নবান্নের ডালি নিয়ে হেমন্ত আসে বাংলার ঋতু বৈচিত্র্যে। মাঠঘাটে সোনার ফসল বাতাসে দোল খায় আর হেমন্তের অহংকারী আমেজ নবান্নের মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে দেয় সকলের নাকে।

প্রকৃতির রূপ : শরৎ-হেমন্তে আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে যায়। স্নিগ্ধ রৌদ্রকার মাঠঘাট সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সর্বত্রই বিরাজ করে কাশফুলের নরম ছোঁয়া। আর হেমন্তে নতুন ধানের গন্ধে কিষানের মনের আনন্দ প্রকৃতিকে করে তোলে হাস্যোজ্জ্বল

মানব মনে শরতের প্রভাব : কবির মতো আমরা সাধারণ লোকেরাও শারদ প্রভাতে স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হই। রাতভর ঘন বর্ষার অবসান ঘটিয়ে আকাশসহ চারদিক যেন আলোয় ভরপুর করে দেয় শরৎ রানি। আর হেমন্তের কথা মনে পড়লে লোভ জাগে পিঠা খাওয়ার।

ঘ. **শীতকাল :** পৌষ-মাঘের পরিসীমায় শুষ্ক-কাঠিন্য, পরিপূর্ণ রিক্ততা ও দিগন্তব্যাপী সুদূর বিষাদের প্রতিমূর্তিতে হেমন্তের পর আসে শীতের ধূসরতা। শীতের আগমনে প্রকৃতি হারাতে বসে তার সজীবতা। হিমেল হাওয়ায় ঝরে পড়ে গাছের পাতা। শীতের রবিশস্য আনে প্রাচুর্য। পৌষের পিঠা আর মাঘের খেজুরের রস ঘরে ঘরে আনে উৎসবের সমারোহ।

ঙ. **বসন্তকাল :** ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বসন্ত ঋতু আসে ঋতুরাজের রূপ নিয়ে। দক্ষিণে মৃদুমন্দ বাতাসের যাদুস্পর্শে শীতের জরাগ্রস্ত পৃথিবীর সর্বাঙ্গে লাগে অপূর্ব শিহরণ। ঋতুচক্রের শেষ অবস্থানে আগমন বসন্তের, কিন্তু তা সীমাহীন ঐশ্বর্যে মোহময়ীরূপে সবার ওপরে সমাদৃত হয়ে ওঠে। মানুষ তখন তাকে সাদর সম্ভাষণে বলে– আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।

উপসংহার : এই দেশ অপার সুন্দর নীলিমার দেশ। আর শ্যামলিমা নীলিমার মমতায় আমরা জড়িয়ে আছি প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করে। আমরা মুগ্ধ হই তার অবাক করা রূপ সৌন্দর্য দেখে। বিশেষ করে শরৎ ও হেমন্ত ঋতু আমাদের হৃদয় মনকে নাড়া দেয় সবচেয়ে বেশি। এরূপ ঋতু বৈচিত্র্যের দেশে জন্মগ্রহণ করে আমরা গর্ববোধ করি। তাই স্বভাবতই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

৪৭ শীতের সকাল

অথবা, একটি শীতের সকাল

[ফা. প. ২০১৭]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের প্রকৃতির উপভোগ্য মুহূর্তগুলোর অন্যতম হলো শীতের সকাল। চারদিকে কুয়াশার চাদর, কনকনে শীত, পূর্বাকাশে নিস্তেজ সূর্যের উঁকি দেওয়া, সকাল বেলায় পাখিদের কলকাকলি সব মিলিয়ে শীতের সকাল। প্রচণ্ড ঠান্ডা হওয়া সত্ত্বেও এরকম একটি সকাল মনকে সতেজ করে তুলতে পারে। অনুভূতিতে সুখ এনে দিতে পারে। তাই M. K. Rawlings বলেন–

The winter morning,
To me, is a great
Wonder as it enlightens
My mind, heart and soul.

কুয়াশাবৃত শীতের সকাল : প্রচণ্ড শীতের কামড় উপেক্ষা করে মসজিদ পানে ছুটে চলে ধর্মপ্রাণ মুসল্লি। সাথে অন্যদের তাড়া দিয়ে যান বিছানা ত্যাগ করার। কিন্তু কাঁথার ভেতর থেকে উঠি উঠি করেও উঠতে ইচ্ছে করে না। শিয়রে হিংস্র শীত কেশর ফুলিয়ে থাবা পেতে বসে আছে। তন্দ্রাবিজড়িত চেতনায় বনান্তরাল হতে পাখিদের কলতান শোনা যায়।

শীতের সকালের আকর্ষণ : শীতের সকালে গ্রামে বা শহরের সর্বত্র খেজুরের রস এবং রসের পায়েস খাওয়ার ধুম পড়ে যায়। ভোরের রোদে বসে দল বেঁধে মুড়ি-মুড়কি খাওয়া, পিঠা-পায়েসের স্বাদ নেওয়া অতুলনীয়। গাছি খুব সকালে খেজুর গাছ থেকে হাঁড়ি নামায়। টাটকা রসের স্বাদ শীতের সকালের অন্যতম আকর্ষণ। কবি সুফিয়া কামাল শীতের সকালে পিঠা খাওয়ার আনন্দ প্রকাশ করেন এভাবে–

"পৌষ পার্বণে পিঠা খেতে বসে খুশিতে ভীষম খেয়ে
আরও উল্লাস বাড়িয়াছে মনে মায়ের বকুনি খেয়ে।"

আলোকিত শীতের সকাল : পূর্ব দিগন্তে ধীরে ধীরে আলো ফুটতে থাকে। উত্তরে হিমেল হাওয়া একটি দীর্ঘশ্বাসের মতো বনে গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে বয়ে যায়। টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে ভোরের শিশির। ঘাসের ওপর শিশির বিন্দু ঝলমল করতে থাকে সূর্যের কিরণ পড়ে। গ্রামের মক্তবে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এক বিচিত্র সুর করে সূরা কেরাত পড়তে থাকে।

শীতের সকালের অবগুণ্ঠন উন্মোচন : পূর্ব দিগন্তে ইতোমধ্যে কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সূর্যের রথ আকাশ পরিক্রমায় বের হয়ে পড়েছে। মাঠের মাঝখানে রিক্তপত্র বাবলার ডালে রোদ পোহায় একটি নীলকণ্ঠ পাখি। একজোড়া ফিঙে মনের আনন্দে সকালের আলোয় হাবুডুবু খায়। বেলা বাড়তে থাকে। শীতের সকালও তার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে থাকে। অবশেষে সে এসে দাঁড়ায় তার পরিপূর্ণ মূর্তিতে।

ত্যাগের মূর্তি : হাতে তার বৈরাগীর একতারা। সে তার সেই একতারার নিঃসঙ্গ তারে হানে নির্মম আঘাত। ফলে বনের শুষ্ক পাতাগুলো করুণ বেদনায় একে একে ঝরে পড়ে। বনের ওপর শুষ্ক ঝরা পাতায় জীর্ণ কবর রচিত হয়। তার উপর দিয়ে উত্তরের হিমেল হাওয়া হাহাকার করে কেঁদে যায়। কোথাও আমের মুকুল ছুঁইয়ে ঝরে শিশিরের কান্না, কোথাও বাতাসের বুক চিরে আর্তনাদ করে যায় একটি নিঃসঙ্গ শঙ্খচিল। এদিকে পাকা ধান কেটে দিগন্ত প্রসারিত মাঠখানিকে কিষানেরা রিক্ত করে তোলে। মাঠে মাঠে কলাইয়ের সবুজ ঘ্রাণ, কুয়াশার গন্ধ, পাকা ধানের গন্ধ, খেজুর রসের গন্ধ যেন ধরণির মাটির পাত্রটিকে ভরে তোলে কানায় কানায়। এভাবে শীত তার বৈরাগ্য ধূসর অঙ্গ হতে শুভ্র সুষমা ত্যাগ করে ছড়িয়ে দেয় প্রকৃতির কোলে। তার সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষে উজাড় করে দিয়ে ধারণ করে এক সর্বত্যাগিণী তাপসী মূর্তি, চোখে তার এ বিষণ্ন প্রশান্তি। সে কুড়াতে জানে না, সংগ্রহ করতে জানে না, জানে শুধু উজাড় করে দিতে সর্বস্ব।

শীতের সকালে কিষান কিষানিরা : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বিশেষ করে এ দেশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। শীতকাল ফসল ফলানোর উপযুক্ত সময়। এ ঋতুতে বিভিন্ন রকমের সবুজ শাকসবজিসহ নানারকমের ফসল ফলে। কৃষকেরা ভোরে শীতের কনকনে ঠান্ডা উপেক্ষা করে ছুটে যায় ফসলের মাঠে। অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে ফলায় শস্যদানা ভূরিভূরি। এদিকে কিষানিরাও বসে নেই। খেতে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোর জন্য তারা তৈরি করেন নানা পিঠাপুলি কিংবা খেজুর রসের পায়েস।

শীতের রূপবদল প্রক্রিয়া : শীতকালে সময়ের আবর্তন ও প্রকৃতির রূপ বদল প্রক্রিয়া কিছুটা বিচিত্র ধরনের, সাধারণত সূর্য উদয়ের মধ্য দিয়ে ভোর হয়। কিন্তু শীতকালের সকালে সূর্য থাকে কুয়াশার আড়ালে মুখ লুকিয়ে। আস্তে আস্তে সূর্যের কিরণ কুয়াশাকে পর্যুদস্ত করে নিজের আগমন জানান দেয় বিশ্ববাসীকে।

কর্মচঞ্চলতা : শীতের সকালটা যেন এক পৌঢ়া কুলবধূ। তার সলজ্জ মুখখানি দিগন্ত বিস্তৃত কুজ্মটিকা অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিত। ধূসর কুয়াশার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে যে দিগন্তের গাঁ ঘেঁষে

স্থির মন্থর পায়ে চলতে থাকে। তার আপাদমস্তক কুয়াশার গাঢ় আস্তরণে ঢাকা। এরপর বেলা বাড়তে থাকে। আস্তে আস্তে কর্মচঞ্চলতায় মুখর হয়ে ওঠে চারিদিক।

শীতের সকালের সুখ-দুঃখ : গ্রামীণ জনগণের জন্য শীতের সকালটা বড়ই পীড়াদায়ক। তাদের শীত নিবারণের উপযুক্ত গরম কাপড় নেই, নেই কোনো গরম আশ্রয়স্থল। নাড়ার আগুনই তাদের একমাত্র সম্বল। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে গ্রামের মানুষ জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যায়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেন–

"শীতের সকাল
দরিদ্রের বস্ত্রের আকাল
শীতের সকাল
অসাম্যের কাল।
ধনীর সুখ আর আনন্দ
শ্রেণি সংগ্রাম এ নিয়ে চলে দ্বন্দ্ব।"

শহরে শীতের সকাল : শহরে শীতের সকালের ভিন্ন দৃশ্যপট দেখা যায়। কাক-ডাকা ভোরে শহরে শীতের সকালের ঘুম ভাঙে। সেখানেও শিশির পড়ে। তবে গ্রামের অনাবৃত দিগন্ত বিস্তীর্ণ প্রকৃতির শীতের সকাল যে সৌন্দর্য মহিমায় সেজে ওঠে, শহরের ইট-পাথরঘেরা কৃত্রিম পরিবেশে তার আভাষ নেই। নিত্যদিনের কর্মচঞ্চলতা নিয়ে জেগে ওঠে শহরবাসী। তবু কুয়াশার বুক চিরে যখন ভোরের ট্রাক কিংবা বাস দুলতে দুলতে এগিয়ে যায়, তখন সত্যিই অপূর্ব লাগে। রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান ও ভাঁপা পিঠার দোকানগুলোতে জমে ওঠে ভিড়।

মানব-মনে শীতের সকালের প্রভাব : শীতের সকাল মানব-মনে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। শীতের তীব্রতা মানুষের দেহকে ক্ষণকালের জন্য আড়ষ্ট করে ফেললেও বাড়িয়ে দেয় মনের সজীবতা। শীতের উষ্ণ সকাল কর্মে অদম্য স্পৃহা যোগায়, সারাদিন মানুষ কাজে ব্যাপৃত হতে তেমন ক্লান্তি অনুভব করে না।

উপসংহার : ঋতু বৈচিত্র্যের এ দেশে শীতের সকাল আবির্ভূত হয় তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে। উত্তরের হিমেল হাওয়ার পরশ নিয়ে আসে শীতের সকাল। নিঃশব্দে গাছের পাতা ঝরে, বৃক্ষেরা পাণ্ডুর রূপ ধরে নির্জনে দাঁড়িয়ে থাকে। ভোর হয় কুয়াশার চাদর জড়িয়ে। আর শীত যখন তীব্র হয়, আগুনের কুণ্ডলী জ্বালিয়ে আগুন পোহাতে পোহাতে মানুষ দেখে বসন্তের স্বপ্ন।

৪৮ শরতের সকাল

[ফা. প. ১৯৯৬]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। প্রতিটি ঋতুরই ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। শরৎকালে বাংলাদেশের প্রকৃতি এক চমৎকার রূপ ধারণ করে। এই জন্য এ ঋতুটি বাংলাদেশিদের খুব প্রিয় ঋতু হিসেবে আসন করে নিয়েছে। অন্যদের মতো আমার কাছেও এ ঋতুটি খুব প্রিয়। কবি সুফিয়া কামাল শরতের সৌন্দর্য উপভোগ করে বলেছেন–

"আজি এ শরতের সকালে
নয়ন শোভিত দৃশ্যের উল্লাসে,
হৃদয়ের শাণিত বল,
শিঞ্জিত হবে হরষে ভরষে।"

শরতের আগমন : কবির ভাষায়–

শরৎ রানির বীণা বাজে
কমল দলে।

ললিত রাগের সুর করে তাই
শিউলি তলে।

শাপলা, শালুক, পদ্ম, জুঁই, কেয়া, আর কাশফুলের সৌরভে শরৎ রানি তার বীণার তারে সুর বাজিয়ে আগমন করে। সেই সুরে মুখরিত হয় বাংলার আকাশ বাতাস। তাইতো নতুন রূপের নতুন আকাশে চারদিকে শ্যামলিমায় সজ্জিত হয়ে আসে ভাদ্র-আশ্বিন মাস। এ দু'মাসই শরৎকাল। বর্ষার গ্লানি মুছে দিতে প্রকৃতি নতুন সাজে সজ্জিত হয় এ ঋতুতে।

শরতের সকাল : শরতের সকালে শিশিরভেজা শিউলি ফুল অনুপম সৌন্দর্য নিয়ে ঘাসের বুকে হাসে। আকাশে-বাতাসে আর দূর্বাঘাসে শরৎরানি তার স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দেয়। নদীর তীরে কাশবনে চকাচকীর মেলা বসে। কবি ও শিল্পীর মতো সাধারণ মানুষও শরতের সকালের স্নিগ্ধতায় মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

শরতের সকালের আকাশ : শরতের সকালে মেঘমুক্ত নির্মল বিস্তীর্ণ আকাশকে দূরে মাঠের ওপর দিয়ে যেন বিশাল সামিয়ানার মতোই মনে হয়। আকাশের শরতের মেঘ যেন এক ঝাঁক উড়ন্ত শুভ্র বলাকা। সূর্যের আগমনে রূপ যেন ছবির মতো মনে হয়।

শরতের সকালে সবুজ মাঠ : শরতের সকালে অবারিত সবুজ মাঠের রূপ সবাইকে আকর্ষণ করে। চারদিকে কেবল সবুজ আর সবুজ ফসলের মাঠ। দেখে মনে হয় কোনো শিল্পী তার নিপুণ হাতে তুলির আচড়ে ছবি এঁকেছেন। সত্যিই শরতের প্রকৃতি সবাইকে মুগ্ধ করে তোলে।

শরতের সকালে ফুল ও পাখি : বাগানে রাশি রাশি ফুল ফোটে শরতের সকালে। শালিক, দোয়েল, কোয়েল ও ময়না টিয়ের সুরের ঝঙ্কারে বাগান মুখরিত হয়ে ওঠে। নদীর তীরে সাদা কাশফুলে গড়ে ওঠে মনোরম দৃশ্য। ফুলের ওপর শিশির বিন্দু পড়ে ফুলের সৌন্দর্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। কবির ভাষায়–

"শরতের ধরাতল শিশিরে ঝলমল"

শরতের আগমনে মানব-মন : শরতের সকালে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুধা পান করে মানুষ বিস্ময়াভূত হয়ে পড়ে। মানব-মনে পুলকের শিহরণ জাগে। কবি ও শিল্পীর মতো সাধারণ মানুষও আনমনে গেয়ে ওঠে–

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে,
হে মাতঃ! বঙ্গ শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে।

শরতে কৃষকের আনন্দ : কৃষকদের মাঝেও আনন্দ এনে দেয় শরতকাল। বর্ষা চলে গেলে মাঠ থেকে পানি সরে যায়। কৃষক আবার জমি চাষ করতে মাঠে যায়। হৈমন্তী ধানের বীজ বোনে, চারা রোপন করে। বুকে বাঁধে সম্ভাবনার স্বপ্ন। সবুজ ফসলের আনন্দে কৃষকেরও মন ভরে ওঠে।

শরতের সকালের বৈশিষ্ট্য : শরতের সকালে সূর্য উদিত হয়ে মাঠ ও বিলের অসংখ্য ধানের জমিতে আলোক রশ্মি ছড়িয়ে দেয়। দূর্বাঘাসের ওপর সঞ্চিত শিশির বিন্দুকে রুপালি মুক্তার বিন্দুর মতো মনে হয়। এ সময় সর্বত্র শুভ্র ও নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা বিরাজ করে। বর্ষার নিবিড় ঘনঘটা অপসারিত হয়ে আকাশ নির্মল হয়ে ওঠে। নদী বক্ষে, শস্য শীর্ষে, বৃক্ষ চূড়ায় যখন সকালের তরুণ সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন চারদিক একটা অপূর্ব সোনালি লাবণ্যে চিকচিক করতে থাকে। কবির ভাষায়–

পারে না বহিতে নদী জলভার
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাক আর

ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন প্রভাতে।

উপসংহার : শরতের সকাল শীতকালের আগমনী ঘোষণা করে। বসন্ত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সংকেত দেয়। শরৎ আশা আর বসন্ত দীর্ঘশ্বাস আনয়ন করে। ঋতুরাজ বসন্ত শরতের সকালের কাছে হার মানে। শরতের সকাল এরূপে মনে আনন্দের ফোয়ারা প্রবাহিত করে এবং আশার উৎস যোগায়।

কবি M. K. Rawlings বলেন– "The wonders of an Autumn morning, I get light for turning the motto of life. All the long, to pride."

৪৯ বাংলাদেশে শরৎ
অথবা, বাংলাদেশের শরৎকাল
অথবা, শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল [ফা. প. ১৯৯৯]

উপস্থাপনা : শরতের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি M. K. Rawlings বলেন–

The wonders of an autumn morning
I get light for turning the motto of life
All the long, to pride.

ষড় ঋতুর দেশ বাংলাদেশের অন্যতম ঋতু শরৎকাল। অন্যান্য ঋতুর মতো শরৎকালও নিজস্ব সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আগমন করে। বাংলাদেশে বর্ষার পরেই শরতের আগমন ঘটে। শরতে শিউলি ফুলের মিষ্টি আমেজে সমগ্র প্রকৃতির বুকে অসাধারণ স্বপ্নিল জগৎ সৃষ্টি করে।

শরতের আগমন : বাংলাদেশে বর্ষার পরে সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে শরৎকালের আগমন। বর্ষার বিরূপ প্রকৃতি ধীরে ধীরে শরতে প্রবিষ্ট হয়। শরৎকালে প্রকৃতি হয় শান্ত। ক্ষণিকের জন্য মাঝেমধ্যে বৃষ্টিপাত হয়। চারদিকে সবুজের সমারোহ। নদী ও বিল বা হাওড়ের স্বচ্ছ পানির বুকে শুভ্র শাপলার পাগল করা হাসি প্রেয়সীর হৃদয়কাড়া হাসির মতোই মনে হয়। সব মিলে শরৎকাল আমাদের মাঝে অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উপস্থিত হয়।

শরতের সকাল : আমাদের মাঝে শরতের সকাল এক অভূতপূর্ব আনন্দময় অনুভূতির সৃষ্টি করে। শরতের সকালে শিশির ভেজা ধান, শিউলি ফুল, কোমল রোদে পুকুরে ভাসমান শুভ্র শাপলার হাসি সব মিলে আমাদের হৃদয়কে উচ্ছ্বসিত করে। আমরা পরম তৃপ্তির সাথে শরতের সকালের এ মিষ্টি আমেজ গ্রহণ করি।

শরতের আকাশ : শরৎকাল এলেই মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের কথা মনে পড়ে। শরতের মেঘ যেন এক ঝাঁক উড়ন্ত শুভ্র বলাকা। দূরে মাঠের ওপর দিয়ে বিস্তীর্ণ আকাশকে যেন বিশাল সামিয়ানার মতোই মনে হয়। মাথার ওপরে সীমাহীন নীলাকাশ, মাঝে মাঝে উড়ন্ত সাদা মেঘ এবং সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া শালিক, ময়না, ফিঙে ও টিয়ের ঝাঁক। কী অসাধারণ সৌন্দর্যময় উপমা তা কখনো ভুলবার নয়।

শরতের সবুজ মাঠ : শরৎকালের আরেকটি অসাধারণ আকর্ষণ অবারিত সবুজ মাঠ। মাঠের পর মাঠ, যেন এর শেষ নেই। মাঠের চতুর্দিকে সবুজের প্রাচীর সদৃশ দূরের গ্রাম যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। মাঠের প্রান্তে বিশাল বটগাছটি যেন উদার আকাশের নিচে বিরাট সবুজাভ ছাতার মতো দাঁড়িয়ে আছে। এর নিচে রাখাল বালকের চিরন্তর খেলাঘর।

শরতের শিউলি ফুল : শরতের শিউলি ফুলকে নিয়ে এদেশে কাব্যের আর শেষ নেই। শরতে শিউলির উপস্থিতি ভিন্ন বাংলা কবিতার ছন্দ কোনো গতিই পায় না। শরতের সকালে

হালকা শিশিরভেজা সবুজ ঘাসের ওপর যখন শুভ্র শিউলি ফুল ছড়িয়ে পড়ে, তখন নব-দম্পতির বিছানার চাদর বলে মনে হয়। কিশোর-কিশোরীর প্রেম নিবেদনের যথার্থ সম্ভার শরতের শিউলিমালা। কাজেই শরতের শিউলির একটি আলাদা তাৎপর্য আছে আমাদের কাছে।

শরতের কাশফুল : শরৎকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন কাশফুল। আশ্বিন মাসে নদীর চরে সাদা কাশফুলের অবারিত বন যেন অজস্র শুভ্র পালকশোভিত উদ্যান। শরতের হালকা বাতাসে যখন সাদা কাশফুল ঢেউয়ের তালে তালে দুলতে থাকে তখন তা যেন বাংলার প্রতিটি মানুষকে কবি করে তোলে। মোহাবিষ্ট সবুজ ঘাস-ফড়িং টিং করে লাফ দিয়ে পড়ে কাশফুলের ডগায়। তখন মিলনের চরম তৃপ্তিতে সদা হারিয়ে যায় সবুজ ঘাস ফড়িং কাশফুলের বনে।

শরতের নদী : বর্ষার স্রোতঃস্বিনী শরতেও পূর্ণ থাকে। শরতে নির্মল পানিরাশি সাগরের সাথে মিলনের উদ্দেশে বয়ে যায়। নদীর বুকে মাঝি ভাটিয়ালি গান গেয়ে পাল তোলা নৌকা ছাড়ে মনের আনন্দে। দুকূলে সবুজ বনরাজি যেন সবুজের স্বর্গপুরী। কখনো শরতের নদী কিষানির শাড়ির আঁচল ভিজিয়ে, কখনো অবারিত সবুজ মাঠের বুক চিরে বয়ে যায় দূরে বহুদূরে।

শরতের উৎসব : শরৎ আমাদের মাঝে বিভিন্ন উৎসবের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে। এ দেশের মানুষ তখন উৎসবের আয়োজনে মেতে ওঠে। নবান্ন ধানের পিঠা, পায়েস এবং বিভিন্ন প্রকার আহার-উৎসব এ ঋতুতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের শারদীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কবিমনে শরতের প্রভাব : কবিমনে শরতের প্রভাব লক্ষণীয়। বাংলাদেশের কাব্য-কাহিনিতে বসন্ত আর শরতের সৌন্দর্য বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শরতের সকালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিমনকে উদ্বেলিত করে তোলে। কবির ভাষায়–

আজিকে তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।

উপসংহার : বাংলাদেশের শরৎ একটি মোহাবিষ্ট ঋতু। যদিও ঋতুর রাজা বসন্ত, তারপরও আমাদের ঋতু পরিক্রমায় শরতের একটা আলাদা স্থান রয়েছে। বাংলাদেশের শরৎ মূলত শান্ত, স্নিগ্ধ, উদার ও সকল সৌন্দর্যের আধার। অবশ্যই শরৎ আমাদের সকলের প্রিয় ঋতু।

৫০ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ [ফা. প. ২০০৮, '১৩, '১৯]

অথবা, বাংলাদেশের বন্যা

উপস্থাপনা : প্রকৃতির রূপ বড়ই বিচিত্র। প্রকৃতি মানুষের জন্য সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার এ প্রকৃতিই মানুষের জীবনের দুর্যোগ বয়ে নিয়ে আসে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প, খরা, মহামারি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়, অগণিত মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং সম্পদ বিনষ্ট হয়। মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। তবে পূর্ব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অধিকাংশ কমিয়ে আনতে পারে। নানা কারণে বাংলাদেশে বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ কী? : দুর্যোগ বলতে আমরা বুঝি, যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করে এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে বোঝায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক উপাদানের চরম অস্বাভাবিক অবস্থা, যাতে মানবসমাজ বিপর্যস্ত ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাই প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণ বা অবস্থা।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ : ভৌগোলিক অবস্থান ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয় তা হলো–

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ

সাল	প্রাকৃতিক দুর্যোগ	ক্ষয়ক্ষতি
২০০৭	নভেম্বর ১৫ ঘূর্ণিঝড় (সিডর) মে ১২, বন্যা (আকাশ)	৪,০০০ লোক মারা যায়। আহত হয় প্রায় ৩০,০০০ জন। ৬,০০০ মানুষ ঘরছাড়া হয়।
২০০৮	অক্টোবর ১০, ঘূর্ণিঝড় (রেশমি)	অনেক প্রাণহানি হয় এবং ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়।
২০০৯	এপ্রিল ১৬, বিজলি	বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়।
২০১২	নভেম্বর ১১, ভূমিকম্প অক্টোবর ১১, ঝড় অক্টোবর ৩, বন্যা	৬.৮ মাত্রার এ ভূমিকম্পে তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। ১৯ জন মারা যায় এবং নিখোঁজ হয় প্রায় ১৫০০ জন। বগুড়ার শেরপুর, সোনাতলা ও ধুনট উপজেলার প্রায় ১১৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়।
২০১৩	মার্চ ২৩, টর্নেডো মার্চ ১৭, ঝড় মার্চ ১৩, পাহাড় ধস	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এ টর্নেডোতে ১৪ জন মারা যায় এবং আহত হয় প্রায় ৫০০। নওগাঁ, পত্নীতলায় এ ঝড়ে ২ জন যাত্রী নিখোঁজ হয় এবং অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়। সিলেটের পাহাড় ধসে ৩ জন মারা যায়।

বন্যা : সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশের মানুষ বন্যার সঙ্গে পরিচিত এবং প্রতিনিয়ত এর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের জীবন পরিচালনা করে আসছে। যেমন– ১৯৫৪, ১৯৬১, ১৯৬৮, ১৯৭৪, ১৯৭০, ১৯৮৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪, ২০০৭ দীর্ঘতম সালের বন্যা নিকট অতীতের দীর্ঘস্থায়ী ও ভয়াবহ বন্যা। ১৯৯৮ সালের বন্যা ছিল ইতিহাসের দীর্ঘতম। তিন মাস স্থায়ী এ বন্যায় দেশের ৫৪টি জেলা প্লাবিত হয়। এছাড়া ২০০৪, ২০০৭ ও ২০১৬ সালের বন্যায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

জলোচ্ছ্বাস : জলোচ্ছ্বাস হলো বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি আতঙ্ক। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপের ফলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা, খুলনা, বাগেরহাট, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি জেলার ওপর সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সাইক্লোন আছড়ে পড়ে। সাইক্লোনের ধ্বংসযজ্ঞ বর্ণনাতীত। গত ১৮৫ বছরে ৫১ বার ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে এবং এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও অনেক। এর মধ্যে ১৯৬০, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১ ও ১৯৯৭-এর জলোচ্ছ্বাস ছিল খুবই ভয়াবহ। ২০০৭ সালের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন সিডরের আঘাতে ৪,০০০ হাজার লোক মারা যায়। আহত হয় প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক। এ ছাড়াও ২০১৬ সালের সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুর আঘাতে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয়। বহুলোক হতাহতের শিকার হয়।

নদী ভাঙন : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীর যেমন সুফল রয়েছে তেমনি নানা ধ্বংসাত্মক কার্যাবলিও হয় নদীর মাধ্যমে। জামালপুর, বগুড়া, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, পাবনা, চাঁদপুর নদী-ভাঙনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা। সর্বগ্রাসী যমুনার ভাঙনে অসংখ্য জনপদ ও গাছপালা বিলীন হয়ে গেছে। চাঁদপুরে মেঘনার ভাঙন প্রতিনিয়ত কোটি কোটি টাকার ক্ষতি করে চলেছে।

ভূমিকম্প : বাংলাদেশ বিশ্বের ভূমিকম্পসঙ্কুল দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে যে-কোনো মুহূর্তে ভূমিকম্প ঘটতে পারে। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হতে পারে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে বারবার মৃদু ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলেছেন, বাংলাদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প হওয়ারই পূর্বাভাস এগুলো। বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক গঠন খুবই নাজুক হওয়ার কারণে পাঁচ থেকে ছয় রিখটার স্কেলমাত্রার ভূমিকম্প মুহূর্তের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকাকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করতে পারে।

মৌসুমি ঝড় : বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বারবার কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে। দেখা যায়, প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে ঝড় হয়। টর্নেডো, হ্যারিকেন, কিংবা সাইক্লোনের মুহূর্তের তাণ্ডবে বাড়িঘর সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জে, ১৯৯১ সালে খুলনায়, ২০০২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ও ২০০৪ সালে নেত্রকোণা জেলায় ভয়ঙ্কর ঝড়ে বিভীষিকাময় পরিস্থিতি ঘটেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ :

১। **ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-তাত্ত্বিক গঠন :** বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-তাত্ত্বিক গঠনই এখানকার বন্যার প্রধান কারণ। এদেশ গঙ্গা, যমুনা ও মেঘনা এ প্রধান তিনটি নদীর মিলনস্থলে অবস্থিত বৃহত্তম ব-দ্বীপ, যা পৃষ্ঠদেশ থেকে মাত্র ৬–৭ মিটার উঁচু। নেপাল, ভূটান ও তিব্বত হলো উল্লিখিত তিনটি নদীর পানির উৎস। বর্ষাকালে উক্ত তিনটি নদীতে পানি বাড়লে বাংলাদেশে বন্যা শুরু হয়ে যায়।

২। **মৌসুমি বায়ুর প্রভাব :** বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাতাস দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে নদীর জলস্রোতের দক্ষিণমুখী নিঃসরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রবল বৃষ্টির ফলে বঙ্গোপসাগরের পানি সমতল থেকে ৩/৪ ফুট বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত পানি নদীপথে দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে। ফলে বন্যার সূত্রপাত হয়।

৩। **হিমালয়ের বরফগলা পানি :** পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পর্বতমালা হিমালয় আমাদের এ অঞ্চলে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে তাপে বরফ গলে কোটি কোটি কিউসেক পানি গঙ্গা, যমুনা, মেঘনা দিয়ে প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে নেপাল, ভারত, ভূটান ও তিব্বত উক্ত তিনটি নদীর পানির উৎস। তাই বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের বাইরের নদীগুলোর পানি প্রবাহের তীব্রতায় হ্রাস-বৃদ্ধি বন্যার অন্যতম কারণ।

৪। **ফারাক্কা বাঁধ :** ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের আগে ভাগিরথী নদীতে বর্ষাকালে যেখানে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৩০,০০০ ঘনফুট পানি প্রবাহিত হতো, তা বাঁধ নির্মাণের পরে দাঁড়ায় ৮০,০০০ ঘনফুটে। হ্রাসপ্রাপ্ত ৫০,০০০ ঘনফুট পানিপ্রবাহ অতিরিক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে তুলেছে। তাছাড়া ভারত প্রতি শুকনো মৌসুমে ফারাক্কার পানি আটকে রাখে এবং বর্ষা মৌসুমে সবকটি গেট একসাথে খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে পানিতে ডুবিয়ে দেয়। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশে আবাদি জমির ফসল ও মানুষের জান-মাল, বসতবাড়ি এবং অর্থনীতি। এক কথায়, ফারাক্কা বাঁধ বাংলাদেশের মানুষের জন্য মরণ ফাঁদ।

বন্যার প্রতিকার :

ক. **বাঁধ নির্মাণ :** বন্যার পানি প্রবেশের উৎসমুখ বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও তিস্তাসহ দেশের বিভিন্ন নদীর উৎসমুখে বাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

খ. **পোল্ডার নির্মাণ :** দেশের উপকূলভাগে স্থাপিত ৭শ' স্বয়ংক্রিয় জোয়ারবিরোধী গেটের মতো করে কাঠামো দ্বারা সাগরের জোয়ার অনুপ্রবেশরোধ এবং জলাবদ্ধ এলাকায় পোল্ডার নির্মাণ করে পানি পাম্প করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

গ. **প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা :** বন্যা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাক-সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ সক্ষম। এক্ষেত্রে ভূ-তাত্ত্বিক ও আঞ্চলিক পরিবাহ-এর মাধ্যমে সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে।

ঘ. **নদীভাঙন রোধ ও নদী খনন :** নদী ভাঙনের কারণে নদী ভরাট হয়ে দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা হয়। গত কয়েকশ বছরের ইতিহাসেও বাংলাদেশের নদ-নদী খননের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। জরুরিভিত্তিতে এসব নদী খনন এবং নদীর দুই তীরে ভাঙন রোধের জন্য বৃক্ষরোপণ ও বাঁধের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ. **আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ :** বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রতিটি ইউনিয়নে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে অন্তত ৩০০০ লোক ধারণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।

চ. আশ্রয়কেন্দ্রে যাতে দ্রুততম সময়ে আশ্রয় নেওয়া যায়, সেজন্য গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

ছ. **সমন্বিত ব্যবস্থা :** ভারত, নেপাল ও চীনকে সাথে নিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা নিতে হবে। দেশেও জাতীয়ভিত্তিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশ সরকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

১। বর্তমানে বলবৎ ৪১০টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সাথে দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃতির জন্য নতুনভাবে আরও ৭৫টি উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

২। বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। আরও ১৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩। উপকূলীয় এলাকায় জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭২৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করে ৭,২৪০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাস্টের আওতায় ৬,১০৫টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

৪। দুর্যোগ-পরবর্তী সতর্ককরণ কার্যক্রম হিসেবে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগ বার্তা প্রচার, আইভিআর, মোবাইল ক্ষুদ্রবার্তা প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছে।

উপসংহার : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে মানুষ অসহায়। তবু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে বন্যা সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশ সরকারও বন্যা সমস্যার সমাধানে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে চেষ্টা করে যাচ্ছে, এর প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বন্যার নিদারুণ অভিশাপ থেকে জাতিকে রক্ষা করা অনেকাংশেই সম্ভব হবে।

৫১ একটি ঝড়ের রাত্রি

উপস্থাপনা : প্রকৃতি যেমনিভাবে মানুষকে আনন্দ ও সুখ-শান্তি দিয়ে থাকে, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে তাদের কপালে দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশার চিহ্নও এঁকে দেয়। এ দেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে ঝড় অন্যতম। প্রায় প্রতিবছরই ঝড় এ দেশের মানুষের ওপর বিভীষিকাময় আক্রমণ চালায়। এমনি শত-সহস্র ঝড়ের মধ্যে আমার জীবনেও বিচিত্র এক ঝড়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। নিচে সেটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো :

ভৌগোলিক প্রভাব : ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশে ঝড়-বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাসসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়াবহরূপ ধারণ করে। প্রায় প্রতিবছরই এ কারণে ব্যাপক ধ্বংসলীলা ও প্রাণহানি ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এ দেশে নানা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সংগ্রাম করে আমাদেরকে টিকে থাকতে হয়। ঝড়-তুফান কত দম্পতির সাজানো সংসার তছনছ করে দেয়, কত প্রিয়জনকে কেড়ে নেয়, তার কোনো হিসাব নেই।

ঘটনার বিবরণ : তামিরুল মিল্লাত মাদরাসার কামিলের ছাত্র ছিলাম তখন। কয়েকজন বন্ধু মিলে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁসে জেগে ওঠা কুতুবদিয়া দ্বীপে বেড়াতে গেলাম। একটি বাড়িতে আমাদের থাকার জায়গা হলো। সমুদ্রবক্ষের তরঙ্গায়িত জলরাশি এবং অন্তহীন সমুদ্রের দিকচক্রবাল অবলোকন করে আনন্দে যেমন আমাদের সময় কাটছিল, তেমনি এক রাতের ঝড় আমাদের সব আনন্দ ম্লান করে দিয়ে স্মৃতিপটে এক দুঃসহ দৃশ্য এঁকে দিয়েছিল।

ঝড়ের পূর্বাভাস : তখন ছিল কার্তিক মাস। সকাল থেকেই আকাশটা ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে দু-এক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। সমগ্র প্রকৃতিতে কেমন একটি বিষণ্ন গাম্ভীর্য। সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেল, চারদিকে এলোমেলো বাতাস বইছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। রেডিওতে বিপদ সংকেত ঘোষণা করা হচ্ছে।

ঝড়ের আগমন : সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরেই প্রকৃতিলোকে অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা গেল। বাতাসের তীব্র গতিবেগসহ ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুতগতিতে ছুটে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম ঝড়ো হাওয়ার একটানা শোঁ শোঁ শব্দ ও ক্ষুব্ধ ঝটিকার উত্তাল গর্জন। প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎবহ্নি ঝলসিত হয়ে গোটা আকাশটাকে বিদীর্ণ করে দিতে চাইল। চারদিকে জমাটবাঁধা নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুধু কেবল ভেসে আসছিল আতঙ্কিত মানুষের চিৎকার।

ঝড়ের ভয়াবহতা : ঝড়ের প্রচণ্ড প্রকোপে আমরা ঘরে আশ্রয় নিলাম। ঝড়ের তীব্র ঝাঁপটায় জানালা-দরজা কেঁপে উঠতে লাগল। দুর্বার শক্তিতে এক বিপুলাকার দানব যেন বাড়িটার ঝুটি ধরে নাড়া দিচ্ছে। বাড়ির আশপাশের গাছগুলো শিকল বাঁধা আহত অতিকায় পাখির মতো ছটফট করছে। আকাশ, সমুদ্র, পৃথিবী অন্ধকারে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড মূর্তি ধারণ করেছে। প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে আমাদের ঘরের জানালার কপাট খুলে পড়ল। আচমকা ধাক্কায় মাথার উপর থেকে কয়েকটি টিন মুহূর্তে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। আমরা সবাই মৃত্যুর প্রহর গুণতে লাগলাম। হঠাৎ করে বাড়িটার ভৃত্যের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম। তার ডাকে কোনোরকমে একজন আরেকজনকে ধরে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম।

বজ্র, বিদ্যুৎ, বৃষ্টিধারা সবকিছু উপেক্ষা করে একটি আশ্রয় কেন্দ্রের বারান্দায় এসে উঠলাম। মুহূর্তেই দূরের বাড়িঘরে রক্তবর্ণ একটি অদ্ভুত বাতি জ্বলে উঠল। ভয়াবহ বিপদ অনুভব করলাম। আমার হৃদয়ের ভেতরে আরেকটি ঝড় উঠল, সমুদ্রের মহা প্রলয়ঙ্করী দৃশ্য দেখার সাহস, ধৈর্য সব হারিয়ে চোখ বুঝলাম।

ঝড়-পরবর্তী অবস্থা : ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবে জ্ঞান হারিয়ে আশ্রয় কেন্দ্রের বারান্দায় হিম হয়ে পড়েছিলাম। ভৃত্যের ডাকে চোখ খুলে দেখলাম, ঝড় থেমে গেছে, তবে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ গোঙানি এখনো থামেনি। আকাশে সূর্য, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ উঁকি দিচ্ছে। বাইরে বের হয়ে এলাম। বাইরে অবর্ণনীয় বীভৎস দৃশ্য। মাঠেঘাটে শত শত গরু, মেষ, ছাগলের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। তীর ঘেঁষে কতকগুলো ভাঙা নৌকা ও জেলেদের লাশ ভেসে বেড়াচ্ছে। চরের অসংখ্য মানুষ তাদের আপনজনদের সন্ধান না পেয়ে অসহায় দৃষ্টিতে সর্বগ্রাসী সমুদ্রের পানে চেয়ে আছে। কী অসহায় তাদের দৃষ্টি, কী মর্মভেদী তাদের বুকফাটা ক্রন্দন। স্বজনহারাদের আর্তচিৎকারে সেদিন কুতুবদিয়ার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল।

ঝড়ের রাত্রির অভিজ্ঞতা : প্রকৃতি কতখানি নিষ্ঠুর, কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে আগে তা জানতে পারিনি, সেই ভয়াল রাতে ঝড়ের সর্ববিধ্বংসী রূপ প্রত্যক্ষ করলাম, উপলব্ধি করলাম ঝড়ের তাণ্ডব কত মারাত্মক।

উপসংহার : বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাধ্যমে ঝড়ের তাণ্ডবলীলার কথা শুনেছি। কিন্তু কুতুবদিয়ায় গিয়ে আমি স্বয়ং ঝড়ের প্রচণ্ড তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছি। ঝড় থেমে গেছে, সমুদ্র শান্ত হয়েছে। রোদের মুখে প্রকৃতি আবার হেসে উঠেছে; কিন্তু সেই বিভীষিকাময় ঝড়ের রাতটির কথা আমার স্মৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি।

৫২ যুবসমাজের অবক্ষয় ও তার প্রতিকার

অথবা, বিক্ষুব্ধ তরুণ

অথবা, যুবসমাজের বিপথগামিতা

উপস্থাপনা : "আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে মাথা কুটে।"

আজ যারা শিশু, সময়ের আবর্তনে আগামীতে তারাই কিশোর এবং যুবকে পরিণত হবে। এ তরুণ যুবকদের সত্য, সঠিক ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মধ্যেই দেশের কল্যাণ নিহিত। যুব ও তরুণ সমাজের বিপথগামিতার অর্থ দেশের অনিবার্য বিপদ। কারণ তরুণ আর যুবকরাই পারে একটি সুস্থ ও সুন্দর দেশ গড়তে। কিন্তু আজ আমাদের সমাজ নানা সমস্যায় নিপতিত। আর এর শিকার হচ্ছে যুবসমাজ। যুবসমাজ আজ পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে যাচ্ছে। তাই আজ আমাদের সকলের দায়িত্ব এ যুবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা।

জীবনের বিভিন্ন স্তর : আমাদের জীবনকে গুণ ও বৈশিষ্ট্যের f চারে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। যেমন– শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য ইত্যাদি। মানবজীবনের এ সকল স্তর বা ভাগগুলোর মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে তারুণ্য ও যৌবন। তারুণ্যের অধিকারীকে তরুণ এবং যৌবনের অধিকারীকে যুবক বলা হয়।

১। **তারুণ্য :** তরুণ বলতে সাধারণত নবযৌবন লাভ করেছে অপরিণত বয়সের এমন ছেলেমেয়েদেরকে বোঝায়। সাধারণত বারো থেকে বিশ বছর পর্যন্ত সময়টিকে তরুণ বয়স হিসেবে ধরা হয়। এ বয়সের ছেলেদেরকে বলা হয় তরুণ বা কিশোর এবং মেয়েদেরকে বলা হয় তরুণী বা কিশোরী। এ সময়ে তরুণ-তরুণীরা কিছুটা চঞ্চল প্রকৃতির হয়ে ওঠে। বিচিত্র, ব্যতিক্রম ও নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে ওঠে। কবি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন কৈশোরের বৈশিষ্ট্য–

ওটা কৈশোর
প্রজাপতির চঞ্চল পাখা
নিষিদ্ধগলিতে লুকোচুরি খেলা।

২। **যৌবন :** তারুণ্যের পরের ধাপটি হলো যৌবন। যৌবন বলতে পরিণত বয়সকেই বোঝায়। সাধারণত আঠারো থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বয়সসীমাকে যৌবন ধরা হয়। এ বয়সের পুরুষদের বলা হয় যুবক আর মেয়েদের বলা হয় যুবতি। এ সময়ে তাদের শরীরে বইতে থাকে উষ্ণ রক্তের স্রোতধারা। তাতে তারা ভালোমন্দ কিছুই তোয়াক্কা করতে চায় না। যুবকরা ভাঙতে পারে আবার গড়তেও পারে। কবির ভাষায়–

এ-ই আমার যৌবন
ছিন্ন নাটাই, অনিয়ন্ত্রিত ঘুড়ি
ঝড়ো হাওয়ায় উড়া স্বাধীন

৩। **যুবসমাজ ও অবক্ষয় :** 'অবক্ষয়' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিনাশ বা ক্ষয়প্রাপ্তি। অর্থাৎ জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য মানবজীবনে যেসব গুণ থাকা প্রয়োজন, তা যখন লোপ পায় বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তখনই মানবজীবনে অবক্ষয় নেমে আসে। তরুণ বা যুবসমাজের অবক্ষয় বলতে সাধারণত তরুণ-তরুণী বা যুবক-যুবতিদের অধঃপতন, নৈতিক অবনতি বা বিপথগামিতাকে বোঝানো হয়।

৪। **অবক্ষয়ের কারণ :** মনস্তাত্ত্বিকগণ তরুণ বা যুবসমাজের অবক্ষয় বা বিপথগামিতার পেছনে যেসব কারণ নির্ণয় করেছেন নিচে সেসব আলোচিত হলো–

ক. বংশগত কারণ : প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বংশগতির ধারায় কতিপয় জাতক বিপথগামী হয়। বিষয়টি দুঃখজনক হলেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য। রক্তের মধ্যে আদিমতা থাকলে তাকে কোনো পরিবেশেই স্বাভাবিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা অরণ্য রোদনের মতোই। মানব প্রজন্মের এ ধারাবাহিকতায় আজ তরুণ সমাজের একাংশ অবক্ষয়ে নিমজ্জিত।

খ. পরিবেশগত কারণ : বলা হয়, 'মানুষ পরিবেশের দাস।' একটি শিশু জন্মের পর থেকে যে পরিবারে বা পরিবেশে বেড়ে ওঠে, পরবর্তী জীবনে ওই পরিবেশ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সামাজিক পরিবেশ যদি সুন্দর ও সুশীল হয়, তবে শিশুটিও বড় হয়ে নিজেকে সুন্দর ও মননশীলরূপে গড়ে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে, তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ যদি অধঃপতিত ও কলুষিত হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে তার নৈতিক অধঃপতন ঘটবে এবং একসময় সে অন্ধকার জগতের বাসিন্দা হবে।

গ. অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা : অভিভাবকদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞাই তরুণদের বিপথগামিতার অন্যতম কারণ। অনেক অভিভাবকই খোঁজ-খবর রাখেন না, তাদের সন্তানেরা ঘরের বাইরে কোথায় কীভাবে সময় কাটায়। তদুপরি, শিক্ষা বলতে তারা বোঝেন পরীক্ষায় পাস করে বড় বড় ডিগ্রি নেওয়াকে বা ভালো রেজাল্ট করাকে। কিন্তু এসব শিক্ষা বাস্তব জীবনে কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেদিকে তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। ফলে বাস্তব জীবনে এসে তরুণরা যখন সে শিক্ষাকে কোনো কাজে লাগাতে পারে না তখনি তারা বিপথগামী হয়।

ঘ. অর্থনৈতিক প্রভাব : উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ বিধায় এ দেশে অর্থনৈতিক অভাব-অনটন লেগেই আছে। অধিকাংশ যুবক যখন স্বাভাবিকভাবে এ অর্থনৈতিক চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তখন অসৎ পথে পা বাড়ায়।

ঙ **রাজনৈতিক প্রভাব :** বাংলাদেশের বর্তমান রাজনীতি যুবসমাজের অবক্ষয়ের নিয়ামকস্বরূপ। দেশের যুবসমাজ আজ রাজনীতির গেঁড়াকলে জড়িয়ে ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে। কিছু অসাধু রাজনৈতিক নেতা যুবসমাজকে তাদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

চ. **অশ্লীল চলচ্চিত্রের প্রভাব :** বর্তমানে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও শিক্ষণীয় চলচ্চিত্র নেই বললেই চলে। চলচ্চিত্রের সর্বত্রই অশ্লীলতায় ভরপুর। ছবিগুলোতে এমন সব কাহিনি ও নগ্নচিত্রের অবতারণা হচ্ছে, যার প্রভাবে যুবকদের চরিত্রের অধঃপতন হচ্ছে।

ছ. **টেলিভিশনের কুপ্রভাব :** টেলিভিশন একটি অন্যতম গণমাধ্যম। অথচ এই জনহিতকর প্রচার মাধ্যমটিতেও এমন সব নিম্নমানের এবং কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করা হচ্ছে, যা থেকে সাময়িক কিছুটা আনন্দ লাভ করা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এসব থেকে কিছু শেখার নেই। টেলিভিশনের ডিশ লাইন সংযোগের কারণে এ মাধ্যমটি যুবসমাজকে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে আরও বেশি প্রভাবিত করছে।

জ. **পত্র-পত্রিকার প্রভাব :** সভ্যতার এ যুগে সংবাদপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ গণযোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু সংবাদপত্র যুবসমাজের উন্নয়নে তেমন একটা ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাছাড়া কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত উদ্ভট কাহিনি ও নগ্ন ছবি যুবসমাজকে দিন দিন ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

ঝ. **বেকারত্ব :** মানবজীবনের জন্য একটি অভিশাপ হলো বেকারত্ব। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবে আমাদের দেশে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। বেকারদের অধিকাংশ যুবক বিপথগামী হচ্ছে। বেকারত্বের অভিশাপে দগ্ধ যুবকদের উদ্দেশ্যে কবি ব্যথিত হয়ে বলেছেন– "সার্টিফিকেট হাতে বেকার যুবকের ক্ষয়ে যাওয়া জুতোর তলায় বালি নেই।"

ঞ. **মাদকাশক্তির প্রভাব :** বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম একটি সমস্যা হলো মাদকাশক্তি, যা যুবসমাজকে ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকার নেশার জগতে। হেরোইন, ফেনসিডিল, ইয়াবা ও প্যাথেড্রিনের মতো নেশাজাতীয় দ্রব্য আজ যুবসমাজকে ধ্বংস করছে। অনেক দেরিতে হলেও বর্তমানে এ বিষয়ে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৫। **অবক্ষয় প্রতিকারের উপায় :** তরুণ ও যুবসমাজের অবক্ষয়রোধে যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে হয় তা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে আলোকিত করা এবং ইসলামি মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা।

২। যুবসমাজের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো।

৩। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে মাদকাসক্তি নিরসন করা।

৪। যুবসমাজকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা।

৫। অশ্লীল সিনেমা, ছবি ইত্যাদি প্রচার না করা এবং মোবাইল ফোনের ব্যবহার সীমিত করা।

৬। যুবসমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

৭। সরকারি-বেসরকারি গণ্যমাধ্যমে যুবকদের অংশগ্রহণে কল্যাণমুখী অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার করা।

উপসংহার : যুবকরা যেমন ভাঙতে পারে, তেমনি গড়তেও পারে। তাই দেশের যুব সমাজকে অবজ্ঞা, অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখে তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাদের ভেতর আশার আলো জাগাতে হবে, দেখাতে হবে সত্য ও সুন্দরের পথ। তাহলেই আমরা গড়তে পারব সুন্দর ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

৫৩ গ্রামোন্নয়ন ও যুবসমাজ

উপস্থাপনা : যুবসমাজ জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারাই জাতি বা দেশের কান্ডারি। দেশ গড়ার শ্রেষ্ঠ কারিগর এবং কর্মশক্তির মূল উৎস। তারাই একটি দেশকে, একটি সমাজকে, একটি জাতিকে গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের গ্রামোন্নয়নে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ, কৃষি উন্নয়নে অংশগ্রহণ, বিপদে-আপদে গ্রামবাসীর সাহায্যে এগিয়ে আসা ও পরামর্শ প্রদান ইত্যাদির মাধ্যমে যুবকরাই পারে গ্রামকে উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে।

বাংলাদেশের গ্রামের সামগ্রিক চিত্র : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এ দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৭১% বাস করে গ্রামে। এ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু আয়ও অত্যন্ত কম, যা জীবনযাপনের ন্যূনতম চাহিদাও মেটাতে পারছে না। ফলে বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ের অধিকাংশ মানুষই মানবেতর জীবনযাপন করছে। প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইলের এ ভূখণ্ডে জনসংখ্যাধিক্যজনিত সমস্যা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং একমাত্র কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা দেশকে ক্রমাগত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে দিচ্ছে। এ অবস্থায় গ্রামের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গ্রামগুলোর সামগ্রিক উন্নয়ন। এ উন্নয়ন কার্যক্রমে দেশের যুবসমাজ রাখতে পারে বিপুল অবদান।

গ্রামোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা : বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। তাই আমাদের দেশ গ্রামকেন্দ্রিক। এ গ্রামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কাজেই দেশের উন্নয়ন বলতে গ্রামের মানুষের উন্নয়নকেই বোঝায়। আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে জাতীয় জীবনের প্রধান কেন্দ্র পল্লির প্রতি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ যত্নবান হতে হবে। গ্রামোন্নয়নের এ প্রয়োজনীয়তা যুগ যুগ ধরেই অনুভূত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকার নানারকম শ্লোগান প্রবর্তন করেছে তাদের শাসনামলে। কেউ বলেছেন, গ্রামের উন্নয়ন ছাড়া জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। কেউ বলেছেন, গ্রাম পর্যায়ে সবুজ বিপ্লব করে দেশকে উন্নত করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। কেউবা বলেছেন, গ্রাম বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে। এসব স্লোগানে বাস্তবেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তবে গ্রামবহুল বাংলাদেশের গ্রামগুলোর উন্নয়নের জন্য সবার আগে যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।

এদেশের গ্রামের অবস্থা : বাংলাদেশের গ্রামগুলো এখনো অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সন্ত্রাস-হত্যা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, ব্যাধি ও দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ। হাজার সমস্যার আবর্তে নিষ্পেষিত গ্রামবাসী সুযোগ পেলেই গ্রাম ত্যাগ করে শহরের দিকে ধাবিত হয়। কেননা নানা সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের ৮৭ হাজার গ্রাম। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত অধিকাংশ গ্রামীণ মানুষ। এর প্রধান কারণ জনসংখ্যার ব্যাপক স্ফীতি, গ্রামের তুলনায় শহরের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান, কৃষকদের প্রতি অবহেলা, গ্রামমুখী কর্মপরিকল্পনার অভাব, শিক্ষার অভাব এবং গ্রামীণ বেকার সমস্যা নিরসনে সঠিক কর্মপন্থা উদ্ভাবন করতে না পারা। এসব সমস্যার কারণে গ্রামের উন্নয়ন আজ বাধাগ্রস্ত এবং শত সমস্যায় জর্জরিত।

গ্রামের উন্নয়নে যুবসমাজ : বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নে যুবসমাজ সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক সমস্যাগুলো নির্ধারণ করতে হবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে।

আমাদের দেশ যেহেতু কৃষিনির্ভর, সুতরাং দেশের কৃষি উন্নয়ন বিশেষ করে সমবায় পদ্ধতিতে উন্নত চাষাবাদের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ কাজে গ্রামের বেকার যুবকদের সংগঠিত করে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যায়। ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন স্থানীয় প্রশাসন যদি এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে এবং গ্রামের বেকার যুবকদের তালিকাভুক্ত করে মাছ চাষ প্রকল্প, কৃষি খামার, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, বিভিন্ন রকমের কুটির শিল্প স্থাপন, বৃক্ষরোপণ ও রাস্তাঘাট সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নেয়, তাহলে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বেকার যুবকদেরও কর্মসংস্থান হতে পারে।

সুষম গ্রামোন্নয়ন : কৃষি-শিক্ষা, স্বাস্থ্য-শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে গ্রামবাসীকে চিরন্তন কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আধুনিক জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেই সাথে মানুষকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তাদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন করে তুলতে হবে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান ও কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হলেই গ্রামের সুষম উন্নয়ন সাধিত হবে। গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সমবায় আন্দোলন, ক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্তি ও আত্মকর্মসংস্থানের বিষয়ে শিক্ষিত যুবসমাজ যথাযথ পথনির্দেশ করতে পারে।

শিক্ষিত যুবসমাজের করণীয় : গ্রাম পর্যায়ে বহু শিক্ষিত বেকার রয়েছে। এসব বেকার যুবককে সংগঠিত করে সরকার ও স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় গণশিক্ষা প্রবর্তন, নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে যুবসমাজকে কাজে লাগানোসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ নিরক্ষর। এ নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষিত বেকার যুবকদের দ্বারা নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা এবং বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থা নিলে বাংলাদেশের ৮৭ হাজার গ্রামে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার আলোকবর্তিকা জ্বলে উঠতে পারে। কেননা শিক্ষার বিকাশ ছাড়া সমাজের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি করা যায় না। আত্মসচেতনতা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণও করতে পারে না। এজন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার যুবকদের কিছু অর্থের বিনিময়ে এসব কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এতে গ্রামের বেকার যুবকদের শহরমুখী প্রবণতা হ্রাস পাবে।

যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা : পৃথিবীর বহুদেশে বেকার যুবকদের গ্রামপর্যায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে গ্রাম আর শহরের জীবনযাত্রার ব্যবধান কমে আসে। এশিয়ার চীন, জাপান, কোরিয়া এসব দেশের ব্যাপক উন্নয়নের কারণ সেসব দেশের যুবশক্তিকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানোর মধ্যে নিহিত। তাছাড়া উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শহর আর গ্রামের মধ্যে মাথাপিছু আয় আমাদের দেশের মতো এত অসম নয়। কেননা সেসব দেশের গ্রামগুলো আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নয়নের নানারকম স্পর্শে কর্মমুখর। কিন্তু আমাদের দেশে গ্রামোন্নয়ন ও যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের মধ্যে এতই ব্যবধান যে, উচ্চশিক্ষা শেষে সঙ্গত কারণেই কোনো তরুণ আর গ্রামে ফিরে যেতে চায় না। কারণ গ্রামগুলো উন্নয়ন বর্জিত এবং গ্রামে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। এ

লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি গ্রামকে বাছাই করে উন্নয়নের মডেল হিসেবে স্থাপন করতে হবে যাতে গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত যুবকদের গ্রামেই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সমস্যার সমাধানে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে সর্বাগ্রে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জাতির মেরুদণ্ড যুবসমাজের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ সেবা ও অক্লান্ত কর্মক্ষমতা একান্ত দরকার। এক্ষেত্রে যুব সমাজকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নিজেদের সম্পৃক্ত করে গ্রামকে সমৃদ্ধ, উন্নত ও প্রগতিশীলরূপে গড়ে তোলার আন্দোলনে এগিয়ে আসতে হবে।

৫৪ দুর্নীতি ও এর প্রতিকার : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ
অথবা, দুর্নীতি দমনে বাংলাদেশ সরকার
অথবা, দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও বাংলাদেশ সরকার

উপস্থাপনা : একটি উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায় হলো দুর্নীতি। সমাজের শিরায় শিরায় বিষবাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়া সর্বগ্রাসী দুর্নীতির ভয়াল কালো থাবায় বিপন্ন আজ মানব সভ্যতা। দুর্নীতি সমাজব্যবস্থাকে জর্জরিত করে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি, শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্যসহ সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি। দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে, তার মূলোৎপাটন করার জন্য গঠিত হয়েছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন।

দুর্নীতি : দুর্নীতি সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী একটি বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণ। এটি একটি বহুমুখী বৈচিত্র্যময় জটিল বিষয়। নৈতিক প্রেক্ষাপটে নীতিবিচ্যুত হওয়া বা কোনো গুণ বা পবিত্রতার অবমাননাই হলো দুর্নীতি। প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ, ক্ষমতা ও প্রভাবের অবৈধ স্বার্থপ্রণোদিত ব্যবহারই দুর্নীতি।

Social Work Dictionary-এর সংজ্ঞানুসারে– Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery extortion, influence rending and special treatment given to some citizens and not to others.

দুর্নীতি ও বাংলাদেশ : ২০১১ সালের পহেলা ডিসেম্বর ১৭তম দুর্নীতির ধারণা সূচক রিপোর্ট (Corruption Perceptions Index-CPI) প্রকাশ করা হয়। এতে ১৮৩টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক রিপোর্ট ২০১৪ অনুসারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪তম। ২০১৫ সালে হয়েছে ১৩তম। বিশ্বব্যাংকের 'Country Procurement Assesment' সম্পর্কিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাংলাদেশের সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না।' পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে, দুর্নীতিই যেন বাংলাদেশের প্রশাসনযন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি। সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের প্রতিটি স্তরেই দুর্নীতি দৃশ্যমান। একেবারে নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চস্তর পর্যন্ত সর্বত্রই চলছে দুর্নীতি। নিচে বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রধান কয়েকটি খাত সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

- **আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় দুর্নীতি :** বাংলাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান উপকরণ পুলিশ। কিন্তু পুলিশ সম্পর্কে জনগণের ধারণা অত্যন্ত নেতিবাচক। Transparency International Bangladesh 2013 রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা

৯২% ভাগ মানুষকে থানায় এফআইআর খুলতে গড়ে ২৪৩০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ৯১% ভাগ মানুষকে থানায় জিডি করতে গড়ে ৯৩৯ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ৮০% ভাগ মানুষকে থানা থেকে ছাড়পত্র সনদ নিতে গড়ে ৮৮১ টাকা ঘুষ দিতে হয়।

- **শিক্ষা খাতে দুর্নীতি :** শিক্ষা খাত বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম বৃহৎ খাত। মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা না থাকায় এই খাতে দুর্নীতি ব্যাপক। Transparency International Bangladesh 2013 রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ থাকলেও ৪০% ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি ফি হিসেবে গড়ে ২০৯ টাকা প্রদান করতে হয়। ২১.৭% ভাগ ছাত্র-ছাত্রীকে একই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের নিকট প্রাইভেট পড়তে হয়। ৩২.৪% ভাগ প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদেরকে সরকারি বৃত্তি পেতে গড়ে ৪০ টাকা প্রদান করতে হয়। একইভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২২% ছাত্রীদেরকে সরকারি বৃত্তি পেতে গড়ে ৪৫ টাকা প্রদান করতে হয়।
- **স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি :** বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার চিত্র অত্যন্ত নাজুক। দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার অভাবে দুর্নীতি সমগ্র স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্যসেবাকে বিঘ্নিত করছে। Transparency International Bangladesh 2013 রিপোর্ট অনুযায়ী ২৬.৪% ভাগ বহির্বিভাগের রোগীর নিকট থেকে সরকারি ডাক্তাররা গড়ে ৬০ টাকা ভিজিট নিয়ে থাকে ও ৫৭% ভাগ রোগীকে সরকারি হাসপাতালে প্যাথলজিক্যাল রিপোর্ট করার জন্য গড়ে ৪১০ টাকা ও এক্সরে রিপোর্ট করার জন্য গড়ে ৫১৬ টাকা ঘুষ দিতে হয়। এছাড়া সরকারি ডাক্তাররা হাসপাতালে রোগী না দেখে বেসরকারি বা নিজস্ব ক্লিনিকে রোগী দেখে থাকে।
- **ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতি :** Transparency International Bangladesh 2013 রিপোর্ট অনুযায়ী সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে একজন গ্রাহককে গড়ে ১০৮ দিন অপেক্ষা করতে হয়। যেটা বেসরকারি ব্যাংকে ৩০ দিনেই পাওয়া যায়। ৫৮% ভাগ মানুষকে ঋণ পেতে গড়ে ১,৯৭৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়।
- **কর প্রদানে ও পেনশন আদায়ে দুর্নীতি :** Transparency International Bangladesh 2013 রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৯% ভাগ মানুষকে আয়কর প্রদানের সময় গড়ে ৭,৪৮৭ টাকা ঘুষ দিতে হয়। ১৪% ভাগ মানুষ ট্রান্সপোর্ট কর প্রদানে ৩,১৬৬ টাকা এবং ৯% ভাগ মানুষ হোল্ডিং কর প্রদানে ১,৫৩৮ টাকা ঘুষ প্রদান করে। ৭১% ভাগ মানুষকে পেনশন আদায়ের সময় গড়ে ৮,০০০ টাকা ঘুষ প্রদান করতে হয়।
- **দুর্নীতির কারণ :** বাংলাদেশে দুর্নীতি একটি জটিল সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ সম্প্রসারিত দুর্নীতি সংঘটনের বহুবিধ কারণও রয়েছে। কখনো দারিদ্র্যের কারণে, কখনো লোভের বশবর্তী হয়ে, আবার কখনো দুর্নীতি করার সুযোগ আছে কিন্তু শাস্তির সম্ভাবনা নেই এরূপ পরিস্থিতির কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুশাসনের অভাব দুর্নীতিকে উৎসাহিত করে। তবে স্থায়ী দুর্নীতির জাল ভয়ংকরভাবে বিস্তার করে আছে প্রশাসনের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত। এখানে হাত দেওয়ার যেন কেউ নেই। শাসনব্যবস্থা উন্নত না হলে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া আইনের অনুশাসনের অনুপস্থিতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের অসততা ও দুর্বলতা দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ। দুর্নীতির নিয়ামক হিসেবে বিভিন্ন কারণ নিচে তুলে ধরা হলো :

আইনগত ও প্রশাসনিক কারণ : দেশের দুর্নীতির প্রধান কারণ আইনগত ও প্রশাসনিক দুর্বলতা। এর সাথে আবার নানা অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। যেমন–

- **জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অকার্যকারিতা :** গণতন্ত্র ও জাতীয় সততা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন : জাতীয় সংসদ, বিচার ব্যবস্থা, জনপ্রশাসন, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ইত্যাদির অন্যতম প্রধান ভূমিকা হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করা। এসব প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না হলে দেশে দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- **রাজনৈতিক প্রভাব :** বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রশাসনে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব লক্ষণীয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা নিজেদের স্বার্থে রাজনৈতিক দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জনপ্রশাসনে এর যথেচ্ছ প্রভাব থাকার কারণে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়।
- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব :** সমাজ ও রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্তরে দুর্নীতি বিস্তারের একটি অন্যতম কারণ হলো প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। বাংলাদেশের প্রশাসন ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনিক কাঠামোরই উত্তরাধিকার, যেখানে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।
- **দায়িত্বে অবহেলা :** নির্দিষ্ট দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব পালনের অবহেলাও দুর্নীতির অন্যতম কারণ। যথাসময়ে কাজ না করা, ফাইল আটকে রেখে জটিলতা সৃষ্টি করে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে।
- **তথ্যে অধিকারের অভাব :** বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত এবং রাষ্ট্রীয় তথ্যে গণমাধ্যম এবং সাধারণ জনগণের অধিকার না থাকার কারণে দুর্নীতি করার সুযোগ বেড়ে যায়।

সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতির ধরন : সরকারি পর্যায়ে দুর্নীতির ধরনগুলো হলো–

১। আত্মসাৎ।
২। ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ।
৩। প্রিয়তোষণ বা ফেভারেটিজম।
৪। স্বজনপ্রীতি বা নেপোটিজম।
৫। খাদ্যসহ বিভিন্ন পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রণ।

দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য : দুর্নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১। জনসমর্থনহীন সরকার ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করে সুবিধাবাদীদের নিজেদের দলে ঢুকিয়ে থাকে।
২। দুর্নীতি ক্ষমতাবান বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সংগঠিত হয়ে থাকে।
৩। দুর্নীতি ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, দ্রুত ধনসম্পত্তি অর্জন অথবা দারিদ্র্যের কারণে সংগঠিত হয়ে থাকে।
৪। দুর্নীতি কোনো নির্দিষ্ট স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে না, প্রতিটি স্তরে এর অশুভ ছোবল পড়ে।
৫। সমাজে উচ্চপর্যায়ের দুর্নীতি এর দ্রুত বিস্তারে সহায়তা করে।
৬। দুর্নীতি, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের লাভবান করলেও বাকি সকল লোকের জন্য ক্ষতিকারক।
৭। দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের আন্তরিকতার অভাব দুর্নীতি বিস্তারে সহায়তা করে।
৮। দুর্নীতির ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় ঘটে।
৯। দুর্নীতি দ্রুত সমাজ ও দেশকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর করে এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে।

১০। বিনিয়োগ ও উৎপাদন হ্রাস পায়।

১১। মাথাপিছু আয় কমে এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

১২। দুর্নীতি দ্রুত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করে।

১৩। দুর্নীতির ফলে কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হয়।

দুর্নীতির প্রভাব : জাতীয় জীবনে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহকে যদি আমরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামো ও মনস্তাত্ত্বিক– এ ছয়টি প্রধান ভাগে বিভক্ত করি তাহলেও এ সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রভাব নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায় :

- **সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব :** দুর্নীতি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও সংহতি বিপন্ন করে। দুর্নীতির ফলে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কল্যাণকর কার্যকারিতা লোপ পায়।
- **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব :** দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। এতে দলীয়, উপদলীয় ও অন্তর্দলীয় সংঘাত বৃদ্ধি পায় এবং নির্বাচনোত্তরকালে নির্বাচনী সন্ত্রাসের প্রভাব সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।
- **জাতীয় জীবনে প্রভাব :** দুর্নীতির কারণে জাতীয় অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়; ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটি দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। দুর্নীতির কারণে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিনিয়োগ মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়; জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জন ব্যাহত হয়; দারিদ্র্য বিমোচন সফল হয় না; সম্পদের প্রাপ্যতা হ্রাস পায়; মানবসম্পদ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং গণতন্ত্রের প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়। সর্বোপরি, দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক) মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যেমন–
- **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব :** দুর্নীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে, উন্নয়ন ব্যাহত হয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়। কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতির দরুন বছরে প্রায় ৮-১০ হাজার কোটি টাকা জাতীয় আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দুর্নীতির ফলে সমাজের নিম্ন আয়ের মানুষের আয় আরও কমে যায়, অন্যদিকে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। ফলে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ন্যায়বিচার ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। সম্প্রতি একটি গবেষণা সংস্থার (পিপিআরসি) প্রতিবেদনে (২০১৬) ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, রাজধানীর ১০ শতাংশ ধনী লোকের মাথাপিছু আয় ১১,৭৯১ মার্কিন ডলার। অথচ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশের মাথাপিছু আয় মাত্র ৩৫৯ মার্কিন ডলার। একটি জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের ৯টি খাতে ২৫টি সেবা নিতে প্রায় ৭৪ শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতে, বাংলাদেশে অবৈধ আয়ের পরিমাণই মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ।

  দুর্নীতির অবাধ বিস্তারে মানব উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় এবং সাধারণ জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারের মতো মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত হয়। দেশের সাধারণ

জনগণ, বিশেষ করে নারী, শিশু ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ন্যায় যারা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত তারাই দুর্নীতিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে।

দুর্নীতি দমনের উপায়সমূহ : দুর্নীতি দমনের জন্য কতকগুলো উপায় নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। দুর্নীতি দমনের জন্য প্রচলিত আইনের সংস্কার ও দলমত নির্বিশেষে তার বাস্তবায়ন।
২। ধর্মীয় অনুশাসন পালন।
৩। দ্রব্যমূল্য অনুযায়ী বেতন ও পারিশ্রমিক প্রদান।
৪। দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট।
৫। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতায় জবাবদিহিতা।
৬। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা।
৭। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সৎ ও আইনগত নির্দেশনা।
৮। ন্যায়পালের পদ বাস্তবায়ন।
৯। দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠন।
১০। গণমাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী অনুষ্ঠান প্রচার এবং দুর্নীতিবাজদের নাম প্রকাশ।
১১। সর্বোপরি দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে এবং মানুষকে সৎ হতে হবে।

দুর্নীতির মূলোৎপাটন ও সরকার : সরকার দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শুরু করেছে, এজন্য দেশের মানুষ খুশি। শুধু সরকারি দুর্নীতি নয় বেসরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধেও সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশব্যাপী এখন একটা আশাবাদের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন যে, জনপ্রশাসনের মতো আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও দুর্নীতি রয়েছে। রাজনৈতিক দুর্নীতির ওপরও এখন আঘাত আসায় দেশব্যাপী একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একসময় সিংহভাগ মানুষ মনে করতো যে, অসৎ ও মিথ্যাবাদী না হলে রাজনীতি করা যায় না; সৎলোক যারা ঘুষ খান না বা দেন না, অবৈধ অর্থ উপার্জন করেন না, তারা জনগণ তথা ভোটারদেরকে খাওয়াতে পারেন না। কাজেই তাদের ভোট দিয়ে লাভ নেই। দুর্নীতিবিরোধী চলমান অভিযান যদি সাধারণ মানুষের এ ধারণা এবং সমাজের বদ্ধমূল এ সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে, তাহলে এ সরকার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আসলে আজ যা বেশি দরকার, তা হলো দুর্নীতি ও আত্মসাতের উৎস বন্ধ করা এবং দুর্নীতি ও আত্মসাতের ফল ভোগকে কঠিন করে তোলা। চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই। এ একটা ব্যবস্থাও যদি আমরা করতে পারি, তাহলে অবৈধ অর্থ ভোগ করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। এরপরও আত্মসাৎ এবং তা ভোগ করার নতুন কৌশল বের হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু একে ধরার ও শাস্তি দেওয়ার কঠোর আইনী ব্যবস্থা থাকলে দুর্নীতি ও আত্মসাৎ কমবে।

উপসংহার : দুর্নীতি সমাজের দুষ্টচক্রের একটা অংশ। রাতারাতি সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি উৎপাটন সম্ভব নয়। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন। দুর্নীতিবাজদের আইনের আওতায় এনে আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সকল পর্যায়ের দুর্নীতি রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। দুর্নীতিকে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে উল্লেখ করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর জোর দিতে হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

৫৫ সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব বাহিনীর ভূমিকা [ফা. প. ২০০৫]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি আলোচিত সন্ত্রাস দমন বাহিনী হলো RAB বা 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন'। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসের বিস্তার, নাগরিক অধিকার হরণ, জানমালের নিরাপত্তাহীনতা, সর্বোপরি খুন, রাহাজানি ইত্যাদি নেতিবাচক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশ যখন অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হতে বসেছিল, তখন র‍্যাবের আবির্ভাব ঘটে। সন্ত্রাস দমনে র‍্যাবের ত্বরিত সাফল্য চমকে দেয় সবাইকে। শান্তিপ্রিয় দেশবাসী র‍্যাবের সাহসী কর্মতৎপরতায় জানমালের নিরাপত্তা লাভ করে।

RAB-এর পরিচিতি : RAB-এর পুরো নাম Rapid Action Battalion. বাংলাদেশে অব্যাহত সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, হত্যা, ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই বন্ধ করতে বি.এন.পি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে এ ব্যাটালিয়নের মাধ্যমে। ২০০৪ সালের ছাব্বিশে মার্চে গঠিত এ ব্যাটালিয়ন সন্ত্রাস দমনে ঐতিহাসিক সাফল্য লাভ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাস প্রতিরোধকল্পে গঠিত স্পেশাল বাহিনী এফ.বি.আই-এর অনুকরণে গঠিত র‍্যাবকে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বাগত জানিয়েছে।

র‍্যাব-এর সাংগঠনিক কাঠামো : RAB বা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-এর সাংগঠনিক কাঠামো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

ক. **মহাপরিচালক :** অ্যাডিশনাল আই. জি. পি পদমর্যাদার একজন পদস্থ কর্মকর্তা।

খ. **উপমহাপরিচালক :** এ পদে সেনাবাহিনীর কর্নেল পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

র‍্যাবের অপারেশন পরিচালনা : সমগ্র দেশকে সাতটি ব্যাটালিয়নের আওতায় বিভক্ত করে সুষ্ঠুভাবে অপারেশন পরিচালনা করছে র‍্যাব। প্রতিটি ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার হলেন সেনাবাহিনীর মেজর বা লে. কর্নেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা।

র‍্যাবের ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী : র‍্যাবের রয়েছে এলিট ফোর্স, কোবরা, চিতা প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন বাহিনী। বর্তমানে র‍্যাব সদস্য সংখ্যা ৫০০০-এর কিছু বেশি। এর মধ্যে রয়েছে–

- মোট ব্যাটালিয়ন ১৪টি
- পুলিশ ৪৪ শতাংশ।
- আর্মি, নেভি, এয়ার ফোর্স ৪৪ শতাংশ।
- বি.জি.বি, কোস্ট গার্ড ও আনসার ১১ শতাংশ।
- বেসামরিক প্রশাসন ১ শতাংশ।

সন্ত্রাস দমনে র‍্যাবের ভূমিকা : বাংলাদেশের জনসাধারণ সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে যখন দিশেহারা; রাস্তা, বাড়িঘর, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, বাজার সর্বত্র জনগণ যখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল, ঠিক তখন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠা। সন্ত্রাস নিধনে তাদের পক্ষপাতহীন অভিযান জনগণকে নতুন করে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। র‍্যাবের সাহসী অভিযানের মুখে দেশের চিহ্নিত চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসীদের শীর্ষস্থানীয় সিংহভাগ নিহত বা গ্রেফতার হয়। এসব খুনি সন্ত্রাসীদের অনেকেই নিহত হয়েছে ক্রসফায়ারে।

সন্ত্রাস দমনে র‍্যাবের সাফল্য : ২০০৪ সালের মার্চে প্রতিষ্ঠার পর হতে এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব যে সাফল্য অর্জন করেছে, তা ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে স্বীকৃত। র‍্যাবের তৎপরতার পর হতে দেশে অনুষ্ঠিত নববর্ষ, ঈদ, দুর্গাপূজা, ক্রিস্টমাসসহ

সকল অনুষ্ঠান নিরাপদে নির্বিঘ্নে উদযাপিত হয়েছে। র‍্যাবের তৎপরতার ফলে প্রায় দুই কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত রাজধানীর সন্ত্রাস অনেকাংশে দমন হয়েছে। সর্বহারা কবলিত কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনার ভয়াবহ সন্ত্রাস এখন লুপ্ত প্রায়। দেশের শীর্ষস্থানীয় দুই শতাধিক সন্ত্রাসী ক্রসফায়ারের মুখে জীবন হারিয়েছে। ফলে বর্তমান বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি হতে মুক্ত।

র‍্যাবের সমালোচনা : র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠার পর হতেই দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতিবিদগণের পাশাপাশি কয়েকটি পত্রিকা মানবাধিকারের প্রশ্ন তুলে র‍্যাবের সমালোচনায় মুখর হয়। সন্ত্রাসীদের মৃত্যুকে তারা নরহত্যার সাথে তুলনা করে সমালোচনা করে আসছে। বস্তুত র‍্যাব গঠনের পর শুরুর কয়েক বছর সাধারণ মহলে প্রশংসা অর্জন করলেও পরবর্তীতে এটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ কারণে ২০১২ সালের জুলাই মাসে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' সরকারের প্রতি র‍্যাব ভেঙে দিয়ে বেসামরিক বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেয়। বিশেষত ২০১৪ সালে নারায়ণগঞ্জে সাত খুনের ঘটনায় র‍্যাব সদস্যের সম্পৃক্ততার ফলে এ সমালোচনা আরও তীব্র হয়। এমনকি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও র‍্যাব বিলুপ্তির দাবিতে সোচ্চার হয়। আর এভাবেই বর্তমান সময়ে র‍্যাবের কর্মকাণ্ড সমাজে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। র‍্যাব পরিচয়ে সাদা পোশাকধারী লোকেরা মানুষ গুম-খুন করে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। এ অবস্থা থেকে র‍্যাবের ভাবমূর্তি সরকার ও র‍্যাবকেই পুনরুদ্ধার করতে হবে।

উপসংহার : র‍্যাব প্রতিষ্ঠা সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। সন্ত্রাস দমনে সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটেছে র‍্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। র‍্যাবের নিরপেক্ষ অ্যাকশন অব্যাহত থাকলে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে সরকারের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটবে বলে আশা করা যায়।

৫৬ বাংলাদেশের উৎসব [ফা. প. ২০০৮, '১৪]
অথবা, বাংলাদেশের লোকজ উৎসব [ফা. প. ২০১৮]
অথবা, উৎসব আনন্দে বাংলাদেশ

উপস্থাপনা : "একদিন ঠিক মাটিতে হারাবে তুচ্ছ জীবন-নদী,
তার আগে সখী কোনো ক্ষতি নেই উৎসব করি যদি"

গানের সুরের মতো আনন্দ উৎসবের দেশ বাংলাদেশ, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশ। ষড়ঋতুর রূপবৈচিত্র্যে এদেশ যেমন সৌন্দর্যময়, উৎসব আয়োজনেও তেমনি আকর্ষণীয়। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক নানা উৎসব আনন্দে সারাবছরই মাতোয়ারা থাকে এদেশের অধিবাসীরা।

কবির ভাষায়– "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা"

উৎসবের সংজ্ঞা : আভিধানিক দৃষ্টিকোণে উৎসব বলতে আনন্দময় অনুষ্ঠানকে বোঝায়। অর্থাৎ যে সামাজিক সাম্প্রদায়িক বা পারিবারিক সমাবেশ থেকে সুখ, আনন্দলাভ করা যায় তাকে উৎসব বলে। তাছাড়া দেশব্যাপী সংঘটিত বড় ধরনের অনুষ্ঠানকে উৎসব বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের উৎসবগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন– ধর্মীয় উৎসব, সামাজিক উৎসব, সাংস্কৃতিক উৎসব, পারিবারিক উৎসব, বরেণ্য ব্যক্তিদের স্মরণে আয়োজিত উৎসব ইত্যাদি।

১। **ধর্মীয় উৎসব :** বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসবগুলোর অন্যতম হলো– মুসলমানদের ঈদ, হিন্দুদের পূজা পার্বণ, খ্রিস্টানদের বড়দিন ইত্যাদি।

মুসলিম সম্প্রদায়ের উৎসব :

ক. **ঈদুল ফিতর :** মুসলমানদের সর্ববৃহৎ উৎসব হলো ঈদ। বছরে মোট দুটি ঈদ– ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর সমাজে শান্তির ফল্গুধারা নিয়ে আসে ঈদুল ফিতর। রহমত বরকত আর মাগফিরাতের বাণী নিয়ে আসে মাহে রমজান, রমজান শেষে আসে ঈদুল ফিতর।

খ. **ঈদুল আযহা :** ঈদুল আযহা তথা ত্যাগের মহিমা শেখাতে আমাদের মাঝে আসে ঈদুল আযহা। আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বেহেশত থেকে দুম্বা প্রেরণ করেন। সে ধারায় আজও আমরা ঈদুল আযহার দিনে মহান প্রভুর স্মরণে পশু কুরবানি করে থাকি।

গ. **অন্যান্য :** দুটি ঈদ ছাড়াও মুসলমানরা ঈদে মিলাদুন্নবি (স), শবে বরাত, শবে মেরাজ, শবে কদর, মহররম ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালন করে থাকে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসব :

পূজাপার্বণ : হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো দুর্গাপূজা। এ উৎসবের মতো আর কোনো উৎসবই এমন জাঁকজমকের সাথে পালিত হয় না। এ কারণে দুর্গাপূজাকে 'কলির অশ্বমেধ' বলা হয়। দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় কাহিনি হলো– দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় মায়ের নাম হয় দুর্গা। দুর্গম অসুরের কাজ ছিল জীবকে দুর্গতি দেওয়া। সেই দুর্গমকে বধ করে যিনি জীবজগৎকে দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করেন তিনিই মা-দুর্গা অর্থাৎ দুর্গতিনাশিনী দেবী। এছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায়ের চৈতপূজা, সরস্বতী, রথযাত্রা, কালীপূজা, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি পালিত হয়।

বুদ্ধ পূর্ণিমা : প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে আগত এক মহামানবকে কেন্দ্র করে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব শুরু হয়। বৌদ্ধ সমাজের এটি অতি পবিত্র উৎসব। মূলত এটি বৈশাখী পূর্ণিমা। তাছাড়া প্রবারণা ও কঠিন চীবরদান নামেও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি উৎসব হয়ে থাকে, সেটিও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একটি বড় উৎসব।

বড় দিন : খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো বড়দিন। এর ইংরেজি নাম ক্রিসমাস-ডে। এর মূল বিষয় হচ্ছে যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দ উপভোগ। ২৫শে ডিসেম্বর যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২। **সামাজিক উৎসব :** বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও একুশে ফেব্রুয়ারি তথা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে জাতীয় উৎসবের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস, ১৬ই ডিসেম্বরকে বিজয় দিবস হিসেবে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা হলেও একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ১৯৫২ সালের এ দিনে বাংলা ভাষার জন্য সংগ্রাম করে সালাম, বরকত, রফিক, শফিক, জব্বারসহ অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। তাদের স্মরণে বাংলা একাডেমিতে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

৩। **সাংস্কৃতিক উৎসব :**

ক. **বাংলা নববর্ষ :** বাংলা নববর্ষ বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসব। পহেলা বৈশাখ হচ্ছে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। সারা বছরের দুঃখ-বেদনা ভুলে এ দিন সবাই আনন্দে মেতে উঠে। পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। এ সময় ব্যবসায়ীদের 'হালখাতা' একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হিসেবে পালিত হয়। রমনার বটমূলে সেদিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সবাই পান্তা-ইলিশ খেয়ে নববর্ষকে স্বাগত জানায়। তাছাড়া বাংলাদেশে নবান্ন, বসন্ত, বর্ষাবরণসহ আরও অনেক উৎসব পালিত হয়।

খ. **পরিবারকেন্দ্রিক উৎসব :** মানুষের জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জন্মদিন, আকিকা, সুন্নাতে খাতনা, বিবাহ, মৃত্যুবার্ষিকীসহ পরিবারকেন্দ্রিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গ. **মনীষীদের স্মরণোৎসব :** বাংলাদেশে মনীষীদের স্মরণে উৎসব পালন করা পূর্বকাল থেকেই প্রচলিত। ধর্মীয় নেতা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, কবি সাহিত্যিকদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের বিভিন্ন দিক : বাংলাদেশের উৎসবের বিভিন্ন দিক রয়েছে। উৎসবের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মিলন ও ঐক্যের বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করা যায়। প্রত্যেক সম্প্রদায় একে অপরের উৎসবে যোগদান করে। এতে করে দেশের সকল মানুষের মাঝে সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম গড়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার নিঠুর সংঘর্ষে, নাগরিক জীবনের বহিরঙ্গ বিলাসে আজ উৎসবগুলো নিষ্প্রাণ, হিমপাণ্ডুর। তাই উৎসবের সুন্দর দিকটি যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে সকলের দৃষ্টি দিতে হবে।

উৎসবের তাৎপর্য : মানবজীবনে উৎসবের তাৎপর্য গভীর ও ব্যাপক। উৎসবের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় জাতির আত্মপরিচয়। উৎসবে থাকে না প্রাত্যহিকতার মালিন্য স্পর্শ, থাকে না প্রতিদিনের সাংসারিক সুখ-দুঃখের চিত্র। উৎসবের মধ্যে মানুষ তার প্রাণশক্তি খুঁজে পায়। বাংলাদেশকে জানতে হলে দেশের সকল উৎসবের খোঁজখবর জানা জরুরি। কেননা এতে দেশের জনজীবনের মৌলিক ঐক্যের সন্ধান মেলে।

উপসংহার : ক্লান্তিময় কোলাহলপূর্ণ জীবনে উৎসব নবপ্রাণ ও নির্মল আনন্দ সঞ্চার করে। সেজন্য উৎসবের শালীনতা ও মাহাত্ম্য রক্ষা করতে হবে। আন্তরিকতার সাথে দলমত ও জাতিভেদ নির্বিশেষে উৎসবকে করে তুলতে হবে ঐক্য ও মিলনের প্রতীক। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকের স্বাধীনতা তথা ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে। তবেই উৎসব আমাদের কাছে নির্মল আনন্দের উৎস এবং মানবীয় সম্প্রীতির উপাদান হিসেবে পরিণত হবে।

৫৭ ইসলামি অর্থনীতি

[ফা. প. ১৯৯৩]

উপস্থাপনা : মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যার আলোচনা ইসলামে নেই। সাম্য ও মুক্তির ধর্ম ইসলাম। মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য। আর তাই ইসলাম উপস্থাপন করেছে বিশ্ব মানবের স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণকর অর্থব্যবস্থা। একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থাই বিশ্বমানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে পারে। ইসলামি অর্থনীতির প্রশংসা করে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক বলেছেন– "The Muslim economic system seems to have a great merit the western world should study it. Perhaps to adopt it in a whole or a part."

ইসলামি অর্থনীতির পরিচয় : মানবজাতির কল্যাণের জন্য সম্পদের সর্বাধিক উৎপাদন, সুষ্ঠু বণ্টন ও ন্যায়সঙ্গত ভোগ ব্যবহারকে ইসলামি অর্থনীতি বলা হয়।

এছাড়া বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ক. ড. এম. এ মান্নান বলেন– "Islamic Economics is a social science which studies economic problems of the people in the light of Islam."
অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে একটি সমাজবিজ্ঞান, যা ইসলামের আলোকে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি আলোচনা করে।

খ. বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে আমরা বুঝি, আল্লাহপ্রদত্ত সত্যদ্বীন আরোপিত আদর্শিক বিশ্বাসগত নৈতিক বিধিনিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় তৎপরতায় বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।"

ইসলামি অর্থনীতির বিষয়বস্তু : সাধারণ অর্থনীতির ন্যায় ইসলামি অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ও অর্থোপার্জন ও অর্থব্যয়। তবে হালাল উপার্জনের ওপর ইসলাম সর্বাধিক জোর প্রদান করে ঘোষণা করেছে, "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র আছে তা থেকে খাও।" সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, আয়-ব্যয় প্রক্রিয়ায় ইসলাম এক ব্যতিক্রমধর্মী নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

দানের বিষয়টি সাধারণ অর্থনীতিতে উপেক্ষিত। কিন্তু এ বিষয়টি ইসলামি অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এ মর্মে আল কুরআনে বলা হয়েছে– "আমি যা প্রদান করেছি তা থেকে ব্যয় কর প্রকাশ্যে বা গোপনে এবং ব্যর্থ হবে না এমন ব্যবসায়ের আশা রাখ।"

ইসলামি অর্থনীতির বিষয়বস্তু হচ্ছে, ইসলামের নৈতিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের অবকাঠামোর অধীনে সীমিত সম্পদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। ইসলামি অর্থনীতি কেবল মানবকল্যাণের বস্তুগত কারণসমূহই আলোচনা করে না; বরং ভোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিনিষেধসমূহও আলোচনা করে।

ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য : ইসলামি অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি আকিদার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (স)-এর সন্তুষ্টি অর্জনই এ অর্থনীতির একমাত্র লক্ষ্য।
২। নৈতিক মানসম্মত এক সাবলীল কার্যপ্রণালি।
৩। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের কল্যাণ সাধনকারী।
৪। আদর্শ সমাজজীবনের পথনির্দেশদাতা।
৫। এ অর্থনীতি হালাল পদ্ধতিতে উপার্জন ও ব্যয় করার প্রশিক্ষণ দেয়।
৬। সুদ চিরতরে নিষিদ্ধ করে ব্যবসায় বৈধ করেছে।
৭। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু করেছে।
৮। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ তায়ালা।
৯। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বায়তুল মাল গঠন অপরিহার্য।
১০। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় উত্তরাধিকার আইন বিদ্যমান।

ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। তাই এ ব্যবস্থায় উৎপাদন, উপার্জন, আয়-ব্যয়, বিলি-বণ্টন ও ভোগ-ব্যবহারের সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি রয়েছে। এতে আয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন কোনো

অন্যায় ও বিধি-বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করা যায় না, তেমনি তার ভোগ-ব্যবহার ও ব্যয়-বণ্টনের ক্ষেত্রেও সকল স্বেচ্ছাচারিতা ও ভোগ-বিলাসের মাধ্যমে সম্পদ বিনষ্ট না করে প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ মানবকল্যাণে ব্যয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। সুতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় পরিবেশ বিরাজ করবে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার অবদান :

ক. যাকাত, সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ও সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থ ব্যয় করার বিধান ইসলামে রয়েছে। এতে দরিদ্রতার অবসান ঘটে।

খ. ইসলামি অর্থনীতি চালু হলে সম্পদ কতিপয় লোকের হাতে পুঞ্জীভূত থাকবে না; বরং ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক সাম্য বজায় থাকবে।

গ. যাকাতের অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন কলকারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

ঘ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা অর্থের প্রতি উদগ্র মোহ ও লালসা দূরীভূত করে অর্থকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে নয়; বরং জীবনধারণের একটি উপায় হিসেবে নির্ধারণ করে।

ঙ. ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাবতীয় অনাচার ও অবিচার দূর হয়ে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাজ গড়ে উঠবে।

ইসলামি অর্থব্যবস্থার সুফল : কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রে যদি ইসলামি অর্থনীতি চালু হয় তাহলে অবশ্যই তার সুফল নাগরিকরা ভোগ করতে পারবে। ইসলামি অর্থনীতির অবস্থান যেহেতু সুদের বিপরীতে সুতরাং সুদ যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্য সৃষ্টি করে, সেখানে ইসলামি অর্থনীতি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে। তাই দেখা যায়, সারা বিশ্বে সুদি ব্যাংকগুলো যেখানে দেওলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, সেখানে ইসলামি ব্যাংকগুলো উত্তরোত্তর সাফল্য দেখিয়ে ইতোমধ্যে চালকের আসনে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকগুলোর ঈর্ষণীয় সাফল্যের কারণে ইদানীং অনেক সুদি ব্যাংকও ইসলামের লেবেল লাগাতে শুরু করেছে। এমনকি ইসলামি অর্থনীতির সুফল উপলব্ধি করতে পেরে ইদানীং অনেক অমুসলিম দেশও ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। সম্প্রতি আমাদের পার্শ্ববর্তী ভারত সরকারও সেখানে ইসলামি ব্যাংক খোলার অনুমোদন দিয়েছে।

উপসংহার : মানবকল্যাণই ইসলামি অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সুতরাং ইসলামি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হতে পারে। কারণ সাধারণ অর্থব্যবস্থা সমাজে দারিদ্র্য, বৈষম্য, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা আর কলহের জন্ম দিয়েছে।

৫৮ বৈদেশিক ঋণ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি

উপস্থাপনা : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ নিতান্তই কম হওয়ার কারণে এদেশের শতকরা প্রায় ২২ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভীষণ নাজুক। কিন্তু একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন। আর সেক্ষেত্রে দেশের সীমিত সম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক সাহায্য বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৈদেশিক ঋণ : বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কতিপয় শর্তসাপেক্ষে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য যে ঋণ দিয়ে থাকে, তা-ই বৈদেশিক ঋণ। দরিদ্র দেশগুলো সাধারণত নিজেদের অভ্যন্তরীণ সম্পদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পুরোপুরি করতে পারে না। তখন তারা উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের

কার্যাবলি পরিচালনা করে। সুতরাং দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি বিরাট উৎস হলো বৈদেশিক ঋণ।

ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা : বিশ্বের কোনো মানুষ এবং কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। পরস্পরের প্রয়োজনে তারা একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত। কোনো দেশ তার চাহিদা পূরণের জন্য অন্য দেশ থেকে সাহায্য নিয়ে থাকে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য এ জাতীয় ঋণের প্রয়োজন রয়েছে। কোনো দেশের জাতীয় উন্নয়ন ছাড়া সে দেশ কোনোদিন উন্নত হতে পারে না। জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি খাতকে উন্নত করতে হবে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। অথচ দরিদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এ অর্থের জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তখনই নির্ভর করতে হয় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর।

যেভাবে সাহায্য পাওয়া যায় : বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার জন্য তার কাছে সুনির্দিষ্ট অর্থের প্রকল্প পেশ করতে হয়। তারপর সাহায্যদাতা ও রাষ্ট্র তা বিবেচনা করে কতিপয় শর্তসাপেক্ষে ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাহায্যদাতা রাষ্ট্রগুলো প্রধানত তিন প্রকারের বৈদেশিক ঋণ মঞ্জুর করে। যেমন– প্রথমত খাদ্যশস্য, দ্বিতীয়ত প্রকল্প সাহায্য ও তৃতীয়ত পণ্যসামগ্রী।

জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনটি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অনেক সময় দেখা যায়, খাজনার চেয়ে বাজনাই বেশি পড়ে। উন্নত দেশ কোনো ঋণই শর্ত ছাড়া মঞ্জুর করে না। এ শর্তের মধ্যে থাকে–

ক. সুদের হার।
খ. ঋণ পরিশোধের শর্তাদি।
গ. দাতা দেশ থেকে লোক নিয়োগ।
ঘ. তদারকীকরণ ইত্যাদি।

বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের সুবিধা-অসুবিধা : নিচে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের কিছু সুবিধা ও অসুবিধা উপস্থাপন করা হলো :

১। **অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব থেকে উত্তরণ :** বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। কিন্তু এদেশের উন্নয়নের পথে রয়েছে পাহাড়সম বাধা। শিক্ষার নিম্নহার, বেকারত্ব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সনাতন কৃষি ব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ নানাবিধ সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সৃষ্টি করেছে বন্ধ্যাত্ব। অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্বের এ ক্রান্তিলগ্ন থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজন সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ। প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও বণ্টন, শিল্পোন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বন্ধ্যাত্ব থেকে উত্তরণ সম্ভব।

২। **বৈদেশিক ঋণ ও বাংলাদেশের অর্থনীতি :** বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র অন্যান্য দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে কোনো অংশেই পৃথক নয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সীমিত থাকায় তার সাহায্যে বাংলাদেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ দাতা দেশগুলোর কাছে ঋণ পাওয়ার আশায় দ্বারস্থ হয়। দাতা দেশগুলো ঋণ দেয় বটে; তবে নানাবিধ কঠিন শর্তারোপ করে। বাংলাদেশকে ঋণদানকারী দেশগুলোর মধ্যে জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন ও কোরিয়া প্রধান। এসব দেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ দিয়ে চলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সিংহভাগ কার্যক্রম।

৩। **বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের ভূমিকা :** বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, ৯০% প্রবাসী তাদের উপার্জিত অর্থের প্রায় ৫০% দেশে প্রেরণ করে। এভাবে অর্জিত বৈদেশিক

অর্থ সাধারণত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে দেশে বেকার সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হয়।

৪। **অর্থনীতিতে বৈদেশিক ঋণের গুরুত্ব :** বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক ঋণের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে যত বড় বড় অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে, সবকিছুর অর্থায়নের সিংহভাগ এসেছে বৈদেশিক ঋণ থেকে। যেমন– বঙ্গবন্ধু সেতু, মেঘনা নদীর ওপর নির্মিত সেতুসহ বড় বড় সেতু নির্মিত হয়েছে বিদেশি সহযোগিতায়। মোদ্দাকথা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভরশীল। অবস্থা এমন যেন যেখানেই বড় ধরনের উন্নয়ন, সেখানেই বৈদেশিক ঋণের ছোঁয়া।

৫। **বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের অসুবিধা :** বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের নানা অসুবিধাও রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, ঋণদাতাদেশ যন্ত্রাংশ আমদানী, পরিবহন, বিশেষজ্ঞ নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কতিপয় কঠিন শর্তাদি আরোপ করে বসে। আবার কোনো কোনো দেশ বা আন্তর্জাতিক সংগঠন উচ্চহারে সুদারোপ করে থাকে। তাই ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলো নানারকম বিড়ম্বনার মুখে পড়ে এবং ঋণের বোঝা ক্রমশ ভারী হয়ে ওঠে।

উপসংহার : বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সমৃদ্ধ করতে অবশ্যই বৈদেশিক ঋণের শরণাপন্ন হতে হয়। তবে জাতীয় উন্নয়নের জন্য কঠিন শর্তাদিমুক্ত ঋণ গ্রহণ এবং বৈদেশিক ঋণের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার একান্তই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় দরিদ্র দেশগুলো ঋণভারে জর্জরিত হবে এবং আজীবন দরিদ্রই থেকে যাবে।

৫৯ বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ
অথবা, বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাংলাদেশ
অথবা, বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ : সমস্যা ও সম্ভাবনা

উপস্থাপনা : বৈদেশিক বিনিয়োগ বলতে বোঝায় একটি দেশে কোনো বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন যে বিনিয়োগ করে। যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে পণ্য ও সেবাসামগ্রী আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়। এছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানও বৃদ্ধি করা যায়। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এদেশ একটি উদার, সহায়ক ও সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও নানাবিধ কারণে এদেশে আশানুরূপ বৈদেশিক বিনিয়োগ আসছে না।

বৈদেশিক বিনিয়োগ কী : একটি দেশে কোনো বিদেশি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক যে বিনিয়োগ করা হয় তাকে বৈদেশিক বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে একটি দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা অপরিসীম।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক বিনিয়োগের ভূমিকা : বৈদেশিক বিনিয়োগের সাথে উন্নয়নের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। বৈদেশিক বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশে বৃহৎ শিল্প-কলকারখানা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদি হয়ে থাকে। এর ফলে যেসব অর্থনৈতিক খাত সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় সেগুলো হলো উৎপাদন, রপ্তানি, সঞ্চয় ও কর্মসংস্থান খাত। এসব খাতে গতিশীলতা সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক বিনিয়োগ

অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশীয় সঞ্চয় বাড়ে। যা একটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিশালী দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ : এশিয়ার অন্যান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে অনেক বেশি উদারতা প্রদর্শন করে চলেছে। তবুও বাস্তবক্ষেত্রে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ তেমন আশানুরূপ নয়। ২০০৫-২০০৬ সালে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের হার ছিল জিডিপির ২৪.২৬ শতাংশ। ২০১২ সালে বাংলাদেশে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ ছিল প্রায় ১১৪ কোটি মার্কিন ডলার। বিনিয়োগের শীর্ষে ছিল মিসর (১৫ কোটি ২৩ লাখ মার্কিন ডলার)। ২০১৩ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয় ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। তবে ২০১৪ সালে এই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৬০ কোটি মার্কিন ডলারে। ২০১৮ সালে এই বিনিয়োগের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলারে। এ সময় বিনিয়োগকারী শীর্ষদেশ ছিল চীন (১০৩ কোটি মার্কিন ডলার)। এ বছর বিদ্যুৎ খাতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয় (১০১.২ কোটি মার্কিন ডলার)।

বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী রাষ্ট্রসমূহ : বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উদারতা প্রদর্শন এবং সহায়ক ক্ষেত্র তৈরি করায় বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আসে। দেশগুলো হলো– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, জাপান, আরব আমিরাত, চীন ও হংকং।

বৈদেশিক বিনিয়োগে অন্তরায়সমূহ : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের যথেষ্ট ক্ষেত্র থাকলেও নানা সমস্যার কারণে এখানে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে না। এ সমস্যাগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে বিশৃঙ্খল ও অস্থিতিশীল করে তোলে হরতাল, অবরোধ, ধর্মঘট, ভাংচুরসহ আরও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, যা বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান অন্তরায়। বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে হরতালকে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো দেশের স্বার্থের কথা না ভেবে নিজেদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আশানুরূপ পাওয়া যাচ্ছে না।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ না হওয়ার আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি। এটি সুস্পষ্ট যে, অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সুষ্ঠুভাবে বিরাজমান থাকলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে। অথচ বাংলাদেশে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, অপহরণ ইত্যাদি আশঙ্কাজনকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিনিয়োগব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা : আমাদের দেশে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। শিল্প ও বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় অহেতুক বিলম্ব, বিধিনিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করায় বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হতে পারছে না। শিল্প, বাণিজ্য তথা বৃহৎ বিনিয়োগক্ষেত্রে বিরাজমান এসব অহেতুক বিধি-নিষেধ, নিয়ন্ত্রণ এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য উচ্ছেদ করতে না পারলে বিদেশি বিনিয়োগ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উপনীত করা সম্ভব হবে না।

বিদেশিদের নেতিবাচক ধারণা : বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অত্যন্ত নেতিবাচক এবং হতাশাব্যঞ্জক। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্সের মহাসচিব তার বক্তৃতায় বলেন, "বাংলাদেশে

বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রধান অন্তরায় হলো দুর্বল অবকাঠামো ও বিদেশে বাংলাদেশের মলিন ভাবমূর্তি।" বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ধারণা, বাংলাদেশ হলো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত একটি দেশ। বস্তুত বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের এরূপ নেতিবাচক ভাবমূর্তির কারণেই বিনিয়োগকারী দেশ ও সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে না। তবে অবস্থার আগের চেয়ে উন্নতি ঘটায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার প্রমাণ, গত ছয় বছরে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬০ কোটি মার্কিন ডলারে।

অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা : বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা। বাংলাদেশের পরিবহন ও যোগাযোগব্যবস্থা ততটা উন্নত নয়। অবশ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এখন প্রায় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা : শত সমস্যার মাঝেও বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় রাষ্ট্র। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষা রিপোর্টে বলা হয়, আগামী ২০২০ সাল নাগাদ কমপক্ষে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলারের প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা চলতি বিনিময় হারে প্রায় ৬৬ হাজার কোটি টাকার সমান। বংলাদেশে যেসব ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল সেগুলো নিম্নরূপ–

তেল ও গ্যাসক্ষেত্র : বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হলো তেল ও গ্যাসক্ষেত্র। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশে তেল ও গ্যাস খাতে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। তাদের ধারণা, বাংলাদেশে এ খাত বিপুল সম্ভাবনাময়। তাই তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানে গত তিন বছরে বাংলাদেশে মার্কিন কোম্পানিগুলোর সরাসরি বিনিয়োগ প্রায় শূন্য থেকে ৫০০ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং আরও কয়েকশ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অপেক্ষায় আছে। সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে অনাবিষ্কৃত প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ৩২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (টিএসএফ) যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

প্রযুক্তি : বর্তমানে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তি, শিল্প প্রতিষ্ঠা, অবকাঠামো উন্নয়ন, বিভিন্ন ই. পি. জেড স্থাপনে বৈদেশিক বিনিয়োগ যথেষ্ট বেড়েছে। এসবের মধ্যে মোবাইল প্রযুক্তিতে বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তিতে আরব আমিরাতের ধাবি গ্রুপের বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া ভারতের টাটা গ্রুপ, মিত্তাল গ্রুপ, সৌদি আরব ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আশা প্রকাশ করেছে।

তৈরি পোশাকশিল্প : তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। এখাত থেকেই বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের বিপুল চাহিদা রয়েছে। দেশি-বিদেশি প্রচুর বিনিয়োগকারী বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের কিছুটা মন্দাভাব বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট মহলকে এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে, যাতে বিশ্ববাজারে আমাদের তৈরি পোশাকের মন্দাভাব কাটিয়ে ওঠা যায়। কেননা, এ অবস্থা বিরাজ করলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে এবং এতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে।

পর্যটন শিল্প : পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল অবদান রাখছে। পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের ব্যাপক সম্ভাবনা লক্ষ করে বিশ্ব পর্যটন সংস্থার মহাসচিব ফ্রান্সিসকো ফ্রাংগিউলি বলেন, "বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।" এদেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বা প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন নেই; বরং দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক সম্পদ ও ভৌগোলিক সুবিধাদি দ্বারাই এ শিল্পকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব, যা বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য একটি উজ্জ্বল খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করার ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ অন্যতম একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা থাকলেও সম্ভাবনার ক্ষেত্রও কম নয়। বর্তমান সরকারের শিল্পনীতিতে কৌশলগত পরিবর্তন আনয়নের কারণে বেসরকারি বিনিয়োগের পথ আরও সহজ ও উন্মুক্ত হয়েছে। এর ফলে বৈদেশিক বিনিয়োগও ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৬০ কৃষির আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণ : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

[ফা. প. ২০০৭]

উপস্থাপনা : ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান একটি দেশ। নদীবিধৌত পললভূমি সমৃদ্ধ এ দেশকে 'বিশ্বের শস্যভাণ্ডার' বলা হতো। এ দেশের মাটির উর্বরতার কাহিনি এত বেশি প্রচলিত ছিল যে, মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখেছেন, "ধানের গাছগুলো এক রাতেই ৬ হাত পর্যন্ত বেড়ে উঠত এবং বাংলার মাটিতে বছরে তিনটি ফসল জন্মাতো।" বাংলাদেশের কৃষির খ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাংলার কৃষি ও কৃষকদের ভূয়সী প্রশংসা করে ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার ডোউ লিখেছেন, "পঞ্চদশ মিলিয়ন পরিশ্রমী লোক অধ্যুষিত বাংলাকে প্রকৃতি কৃষির জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সুবিধাজনক অঞ্চলরূপে নির্বাচিত করেছে।" বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই কৃষিকে বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক এর আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে খাদ্যসংকট মোকাবেলার পাশাপাশি এ দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা যেতে পারে।

বাংলাদেশের কৃষি : প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালির জীবিকার প্রধান উৎস। ব্রিটিশ শাসনামলে এ দেশের শিল্প বিশেষত বস্ত্রশিল্প পতনের সম্মুখীন হলে কৃষির ওপর চাপ আরও বৃদ্ধি পায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে বহু ধরনের ফসল চাষ করা হতো। এসব ফসলের মধ্যে ধান, পাট, গম, জোয়ার, যব, আখ, তামাক, তৈলবীজ, আলু, পিঁয়াজ, রসুন, আফিম, নীল, চা, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, ডাল, বিভিন্ন ফলমূল, সুগন্ধি, মসলা ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। ধান এ দেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীনতম শস্যগুলোর একটি। কৃষির অন্য তিনটি উপখাত পশুসম্পদ, মৎস্য ও বন ছিল অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন। বর্তমানে ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি পশুপালন ও মৎস্য উৎপাদনের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি খাতকে বলা হয় বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। বর্তমান বাজারমূল্যে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে তথা জিডিপিতে কৃষির অবদান ৩০%। বাজার মূল্যে শস্য উপখাত একাই মোট কৃষি সম্পদের প্রায় ৫৯% জোগান দেয়। আর অতিরিক্ত ১২% পশু সম্পদ, ১৭% মৎস্য এবং ১০% বন থেকে আসে। সাধারণ শ্রমশক্তির ৬৬% বা প্রায় ৪ কোটি নর-নারী কৃষিখাতে নিযুক্ত।

চাষাবাদ পদ্ধতি : প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে জমি চাষাবাদে বিভিন্ন ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোদাল, লাঙল, মই, মুগুর ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্রপাতির ব্যবহার এখনো রয়েছে। গরু বা মহিষ দ্বারা লাঙল টেনে জমি কর্ষণ করা হয়, অতঃপর মই দিয়ে সমান করা হয়। বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীলতা এ দেশের কৃষির আরও একটি বৈশিষ্ট্য। তবে আশির দশকের পর থেকে এ দেশের কৃষিতে আধুনিকায়নের সূত্রপাত ঘটে। এ সময় কৃষিতে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং সেচ যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়। এভাবে বাংলাদেশের কৃষি আধুনিক যুগে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশে কৃষির আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণ :

১। **জমি ব্যবস্থাপনা :** কৃষিজমির ব্যবস্থাপনা কৃষির আধুনিকায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। বাংলাদেশের মোট প্রায় ১৪.৪ মিলিয়ন হেক্টর জমির ৯.১৫ মিলিয়ন হেক্টর জমি কৃষিতে ব্যবহৃত হয়। লাখ লাখ হেক্টর জমি সারাবছর অনাবাদি থাকে। তাছাড়া এ দেশের তিনটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত জমি [যেমন– প্লাবনভূমি, সোপান ও পার্বত্য ভূমি যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে চাষাবাদ হয় না। গত তিন দশকে কৃষিজমির ব্যবহার বাড়লেও ব্যবহৃত কৃষিজমির মাত্র ১৫% তিন ফসলি, ৫৫% দুই ফসলি এবং ৩০% এক ফসলি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে কৃষির বিপুল সম্ভাবনা সত্ত্বেও তা কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না। কৃষির আধুনিকায়নে উল্লিখিত বিষয়াবলি বিবেচনায় রেখে কৃষিজমির ব্যবহারে অঞ্চলভেদে সময়, আবহাওয়া ও উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২। **কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার :** আধুনিক কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার কৃষির আধুনিকায়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহার হওয়া লাঙল, জোয়াল বা মইয়ের পরিবর্তে বর্তমানে পাওয়ার টিলার, হাইড্রোটিলার, ট্রাক্টর ইত্যাদি আধুনিক চাষযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বীজবপন, চারারোপণ ও আন্তঃচাষকার্যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে। এসবের মধ্যে সিডড্রিল, ড্রামসিডার, হস্তচালিত ধানের চারা রোপণ যন্ত্র, রোটারি উইডার, বিভিন্ন কীটনাশক স্প্রেয়ার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এসব কৃষিযন্ত্রপাতি স্বল্প সময়ে চাষ, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিক নির্ভরতা কমানোসহ কৃষির আধুনিকায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৩। **সেচ ব্যবস্থাপনা :** কৃষির আধুনিকায়নে সেচ ব্যবস্থাপনা অতীব জরুরি একটা দিক। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের কৃষি প্রাকৃতিক বৃষ্টিনির্ভর ছিল। কতিপয় সাবেকি পানি উত্তোলনযন্ত্র দ্বারা স্বল্প পরিসরে সেচ দেওয়া হতো।

এসব পানি-উত্তোলন যন্ত্রের মধ্যে সেঁউতি, দোন, দুফ লিফট ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানকালে শক্তিচালিত বিভিন্ন উন্নত পাম্প ব্যবহার করে কৃষি জমিতে পানিসেচ দেওয়া হয়। এসবের মধ্যে ডায়াফ্রাম পাম্প, ব্যতিহারী (reciprocating) পাম্প ও তারা পাম্প, ট্রেডল পাম্প বা ঢেঁকি পাম্প, রোয়ার পাম্প (Rower Pump), শক্তিচালিত বিভিন্ন পাম্প মেশিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এসব পাম্প গভীর ও অগভীর নলকূপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। পরিকল্পিত পানি সেচের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌসুমে বিশেষত শীত, গ্রীষ্ম অথবা খরা মৌসুমে ব্যাপক হারে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব।

৪। **উন্নত বীজের ব্যবহার :** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উন্নতমানের বীজ বিশেষত উচ্চ ফলনশীল (উফশি) বীজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধান, পাট, গম, ভুট্টা, আলু, ডাল, বিভিন্ন সবজির অধিক ফলন পেতে পরিকল্পিত চাষের পাশাপাশি উফশি বীজ

তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশে উন্নত বীজ উদ্ভাবনে বেশকিছু সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। তাদের উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ ধানসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

৫। **সমন্বিত চাষাবাদ :** বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সমন্বিত চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক ও উৎপাদন সহায়ক বলে প্রমাণিত হয়েছে। একই জমিতে একই সময়ে একাধিক ফসল উৎপাদন করা যেতে পারে। আবার কৃষিজমির আল বা বেষ্টনী-বাঁধের ওপর বিভিন্ন শাক-সবজি চাষ করে বাড়তি আয় করা যেতে পারে। মাছের পুকুরের চারদিকের উঁচু স্থানে হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন করে উভয়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এভাবে সমন্বিত ও বহুমুখী চাষাবাদের মাধ্যমে অধিক কৃষি উৎপাদনের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখা যেতে পারে।

৬। **উৎপাদন বহুমুখীকরণ :** শত শত বছর ধরে এ দেশের মানুষ প্রায় ৮৫ ধরনের প্রয়োজনে ১৩৬৪ প্রজাতির দেশি-বিদেশি উদ্ভিদ চাষ করে আসছে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কৃষি উৎপাদনে বহুমুখীকরণ করতে হবে। প্রচলিত ফসলাদির পাশাপাশি বিভিন্ন অর্থকরী ও ভেষজ ওষুধি উদ্ভিদ চাষ করেও বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী করতে হবে। এক জরিপ মতে, এ দেশে প্রায় ১৭৫ প্রজাতির ভেষজ উদ্ভিদ জন্মে যার অর্থনৈতিক সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। এভাবে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন উপখাতের উন্নয়ন ঘটিয়ে কৃষি উৎপাদন বহুমুখীকরণ করতে হবে।

৭। **পরিকল্পিত মৎস্য চাষ :** বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম খাত হলো মৎস্য। বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে খুবই সম্ভাবনাময় একটি দেশ। এ দেশে কমপক্ষে ৬ মাস পানির নিচে থাকে এমন ৩৪% জলাভূমি, প্রায় ১৪ লাখ পুকুর ও বিপুলসংখ্যক মৌসুমি জলাশয়, পরিকল্পিত ঘের, বিস্তীর্ণ নদী ও সমুদ্রসীমা দেশটিতে মৎস্য চাষের ব্যাপক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে মৎস্যচাষ করে এসব সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে অধিক পরিমাণ মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করা যেতে পারে।

৮। **পশুসম্পদ উপখাত :** বাংলাদেশের চিরায়ত কৃষির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পশুসম্পদ। পশুজাত পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে। গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি পালনের মাধ্যমে গোশত, দুধ ও ডিম উৎপাদন করে দেশের পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে পরিকল্পিত পশুখামার স্থাপন করা প্রয়োজন। বিদেশের বাজারে বাংলাদেশের গরু ও ছাগলের গোশতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশে বর্তমানে কিছুসংখ্যক নিবিড় ও আধা-নিবিড় পদ্ধতির অধিক উৎপাদনশীল বিদেশি জাতের পশুখামার স্থাপিত হয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এসব খামারের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার।

৯। **বন উপখাত :** বাড়িঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র, জ্বালানির সংস্থান ইত্যাদি প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রকারের কাঠ তথা বৃক্ষাদির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এসবের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাও ব্যাপক। বিদেশে বাংলাদেশের আসবাবপত্রের ব্যাপক বাজার রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য কমপক্ষে ২৫ শতাংশ বনাঞ্চল প্রয়োজন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭% (২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর) বনাঞ্চল হলেও প্রকৃত বৃক্ষাচ্ছাদন মাত্র ৯-১০% যা একান্তই অপ্রতুল। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ ও বনায়নের মাধ্যমে এ খাতের অপার সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা যেতে পারে।

১০। **কৃষির বহুমুখীকরণ :** কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদিত ফসলসমূহের বিবিধ ব্যবহার এবং ভিন্ন ভিন্ন উপযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে এ খাতের বহুমুখীকরণ করা যেতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের বহুমুখী ব্যবহার শুরু হয়েছে। যেমন বিভিন্ন খাদ্যশস্য থেকে চিপস, জ্যাম, জেলি, জুস ইত্যাদি উৎপাদিত হচ্ছে। এ খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ব্যাপক। তাছাড়াও অন্যান্য কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে দিতে পারে। এজন্য দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক হিমাগার ও প্রক্রিয়াজাতকরণ স্থাপন করা দরকার।

উপসংহার : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির অবদান সীমাহীন। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের কৃষিসম্পদসমূহ যেমন জমি, পানি, ফসলের বিভিন্ন জাত-উপজাত, পশুসম্পদ, মৎস্য, বনাঞ্চল ইত্যাদির পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে এ দেশের কৃষির আধুনিকায়ন করতে হবে। এভাবে দেশটির প্রচুর সম্ভাবনাময় কৃষিখাতের আধুনিকায়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে দেশে কৃষিবিপ্লব ঘটানো নিতান্তই সম্ভব। এর ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ হিসেবে তার ঐতিহাসিক মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পারে, যা দেশটির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

৬১ দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

উপস্থাপনা : "হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিস্টের সম্মান।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম দারিদ্র্যকে মহান ও খ্রিস্টের সম্মান প্রদান করলেও এটি বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। এটি শুধু একটি সমস্যাই নয়, আরও বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টিকারী উপায় হিসেবে কাজ করে। দারিদ্র্য জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে একটি বড় বাধা এবং এটি দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর আঘাত হানে। এজন্য মানুষ মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতেও কুণ্ঠিত হয় না। দারিদ্র্য ব্যক্তি ও সমাজজীবন উভয়কেই নিষ্প্রভ করে দেয়। জীবনে বয়ে আনে হতাশা আর ব্যর্থতার কালো ছায়া। দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশে আর্থসামাজিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। এ অভিশাপ থেকে দেশ, জাতি ও সমাজকে মুক্ত করতে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে কাজ করে।

দারিদ্র্যের সংজ্ঞার্থ : দারিদ্র্য একটি আপেক্ষিক বিষয়। দারিদ্র্য এমন একটি অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে অক্ষম। সাধারণভাবে যারা দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরির কম খাবার গ্রহণ করেন তাদেরকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছেন বলে ধরে নেওয়া হয়। ২০১৮ সালের এক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ১১.৩ শতাংশ দারিদ্র্যের দৃশ্যমান প্রতীক হচ্ছে অপুষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য, জীর্ণশীর্ণ বাসস্থান, নিরক্ষরতা এবং বেকারত্বে নিপতিত সমাজের দুর্বল মানুষ। ব্রিটিশ লেখক জর্জ এলিয়ট বলেছেন– No man can be wise on an empty stomach.

দারিদ্র্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী গিলিন বলেছেন, "যাদের জীবনযাত্রার মান তাদের সমাজ নির্ধারিত জীবনযাত্রার নিচে তারাই দরিদ্র।" দারিদ্র্যের এ সংজ্ঞার আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাব খুব বেশি।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পরিচয় : ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি স্বল্প পুঁজি গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার একটি প্রক্রিয়া। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে এ প্রক্রিয়ায় দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ প্রক্রিয়া সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়েই পরিচালিত হতে পারে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ পর্যন্ত বহুবিধ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

ক্ষুদ্রঋণের উপযোগিতা : প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থার চেয়ে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত উপযোগী। প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থায় গৃহীত ঋণ বোঝায় পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় ভর্তুকি ঋণ বিতরণ অপেক্ষা স্থানীয় দরিদ্র জনগণের সেবার জন্য টেকসই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সেবামূলক ও অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দরিদ্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অর্থলগ্নি করে। প্রচলিত ঋণ ব্যবস্থায় গ্রাহককে জমি, শিল্প, কলকারখানা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জামানত রাখতে হয়। অপরপক্ষে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থায় জামানতের প্রয়োজন হয় না বলে ক্ষুদ্রঋণ দরিদ্রের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কর্মসূচি : বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনকল্পে স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাবিধ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। নিচে এসব কর্মসূচির একটি বিবরণ তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড : সমগ্র দেশব্যাপী সমবায় ও আনুষ্ঠানিক গ্রুপ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে BRDB, বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় পল্লি দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে আসছে।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (BARD) : কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনাসহ ৮টি জেলার ৩০টি উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক ও দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ এবং আয় বৃদ্ধি ও মূলধন গঠনের জন্য ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

গৃহায়ণ তহবিল : সরকার বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে নদী ভাঙনজনিত গৃহহীনদের জন্য গৃহায়ণ তহবিল গঠন করেছে। এছাড়া গৃহায়ণ তহবিল নিম্ন আয়ের মহিলা শ্রমিকদের নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বল্প ভাড়ায় আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্পেও অর্থায়ন করে থাকে।

কর্মসংস্থান ব্যাংক : ১৯৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক যাত্রা শুরু করেছে। এ ব্যাংক দেশের বেকার যুবকদের বিভিন্ন লাভজনক ও উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করছে।

ছাগল পালন কর্মসূচি : সরকার বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'ছাগল পালন' পদ্ধতিকে উপযোগী বিবেচনা করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে ৪০০টি উপজেলায় ২৬,৪০০ জন দরিদ্র মহিলাকে ১৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

পল্লি কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) : বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করার জন্য। ঋণ প্রদান কার্যক্রমের মধ্যে ধান ভাঙ্গা, নার্সারি, বেতের কাজ, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগি পালন, রিকশা ও ভ্যান ক্রয় এবং

অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য। গোড়াপত্তনের পর থেকেই PKSF তার সহযোগী সংস্থাসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে।

গ্রামীণ ব্যাংক : বাংলাদেশের বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি ও সম্পদ গঠনের উদ্দেশ্যে এর কার্যক্রম বিস্তার লাভ করে। ২২২৬টি শাখার মাধ্যমে ৬৩টি জেলার ৭১,৩৭১টি গ্রামের প্রায় ৬৫ লাখ সদস্যের মধ্যে এই কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

পশুসম্পদ অধিদপ্তর প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি : পশুসম্পদ অধিদপ্তর দেশের দরিদ্র জনগণকে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে উৎসাহ প্রদানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ খাতে বরাদ্দকৃত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৫ দশমিক ৭২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশে প্রায় ৫০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি : মৎস্য অধিদপ্তর সমন্বিত মৎস্য কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্য চাষিদের সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক) : দারিদ্র্য বিমোচনে ব্র্যাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্র্যাকের ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারাদেশে বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র মহিলারা তাদের দারিদ্র্য নিরসনে সফল হচ্ছে।

স্বনির্ভর বাংলাদেশ : ১৯৭৫ সালে স্থাপিত এ সংস্থাটি বাংলাদেশে দারিদ্র্য নিরসনে ঋণদান কর্মসূচির পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং মাতৃশিশু পরিচর্যা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং PKSF-এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিত্তহীন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

এভাবে প্রশিকা, আশা, কারিতাসসহ অসংখ্য এনজিও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের সফলতা : স্বাধীনতার পর থেকেই প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা এ উদ্যোগ গ্রহণ করে। মূলত কারণেই ১৯৮১ সালের ৭৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচের জনগোষ্ঠীর হার ২০০৩ সালে ৩৫ শতাংশে নেমে আসে। ২০১৮ সালে এই হার আরও হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৩ শতাংশে। বর্তমানে ৪০ শতাংশ গ্রামের দরিদ্র মানুষ স্বল্প পরিমাণ ঋণ নিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। তারা পর্যায়ক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন করে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতা থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত হচ্ছে। এ উত্তরণের গতি কিছুটা মন্থর হলেও তা অধিকতর টেকসই। বাংলাদেশ সারা বিশ্বে ক্ষুদ্রঋণের জন্য মর্যাদার আসন পেয়েছে।

উপসংহার : গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও যুগোপযোগী। বাংলাদেশ দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বিগত ৪৮ বছরে এখানে মানুষের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়েছে, হ্রাস পেয়েছে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষের হার। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রগতিশীল ভূমিকার জন্যই তা সম্ভব হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশি অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ একটি বিশ্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই দারিদ্র্য বিমোচনে অধিক পরিমাণে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ অব্যাহত রাখতে হবে।

৬২ মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বাংলাদেশ [ফা. প. ২০০৫]

অথবা, মুক্তবাজার অর্থনীতি

উপস্থাপনা : মুক্তবাজার অর্থনীতি বা Free Enterprise Economy বর্তমান বিশ্বে একটি বহুল আলোচিত বিষয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অন্যতম উন্নয়নতত্ত্ব হিসেবে মুক্তবাজার অর্থনীতির উন্মেষ ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। অর্থনীতির জোয়ারে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবল স্রোত বাংলাদেশের অর্থনীতিকেও স্পর্শ করেছে। অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতির নির্দেশনায় মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়াকে আশঙ্কামুক্ত বলে মনে করছেন না। তারপরও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ এ পথে এগুচ্ছে। তবে এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে প্রয়োজন অর্থনৈতিক মেধা ও গবেষণা।

মুক্তবাজার অর্থনীতির পরিচয় : মুক্তবাজার অর্থনীতিকে ইংরেজিতে Free Enterprise Economy বলা হয়। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভের সুযোগ নেই। ক্রেতা-শোষণ এখানে অন্য যে-কোনো পদ্ধতি থেকে কম। এ পদ্ধতিতে Market Forces বা বাজারে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পণ্য সামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয়। আর এটি সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে। জনৈক অর্থনীতিবিদ মুক্তবাজার অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন–

The free enterprise economy is a market oriented economy in which the means of production and business are owned by private individuals and where there is least governmental interference in the performance of economic activity.

মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপ্তি : বাজার অর্থনীতির ব্যাপক আন্তর্জাতিক রূপ হলো মুক্তবাজার অর্থনীতি। ব্যবহারিক দিক থেকে মুক্তবাজার অর্থনীতি একটা বিশেষ ইঙ্গিতবহ শব্দ। এর মাধ্যমে বাজার অর্থনীতির আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যাকে বলা হয়– Globalization বা বিশ্বায়ন। বাজার অর্থনীতি নির্দিষ্ট সীমা তথা দেশের মধ্যে কার্যকর হলেও মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যাপ্তি ব্যাপক। বিশ্ব ব্যাংক মুক্তবাজার অর্থনীতির সংজ্ঞায় চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। যথা–

১। উদারীকরণ (Liberalization)

২। আন্তর্জাতিকায়ন (Internationalization)

৩। নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ (Deregulation)

৪। ব্যক্তি মালিকানাকরণ (Privatization)

মূলত বাণিজ্য উদারীকরণ, সরকারি বিধিনিষেধ শিথিলকরণ ও ব্যক্তি উদ্যোগকে উৎসাহ যোগান প্রভৃতি পদক্ষেপ সংবলিত ব্যবস্থাই মুক্তবাজার অর্থনীতি।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্রমবিকাশ : বাজার অর্থনীতির ধারণাটি সর্বপ্রথম ১৭৭৬ সালে অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ তার The wealth of nation গ্রন্থে প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষিতে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও এর আবশ্যকতার বিষয়টি সামনে আসে। এর ফলে সৃষ্টি হয় GATT বা General Agreement of Tariff and Trade. এরপর পুঁজির বিশ্বায়ন ও বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে গঠিত হয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা WTO (World Trade Organization). এভাবে বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি বিকাশলাভ করে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির স্বরূপ : মুক্তবাজার অর্থনীতির কার্যক্রমে উৎপাদক, ভোক্তা প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে চাহিদা ও সরবরাহের ঘাত প্রতিঘাতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়। আবার উৎপাদন কৌশল, দ্রব্যের পরিমাণ, গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয় অনেকাংশে বাজারের চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির ইতিবাচক দিক : মুক্তবাজার অর্থনীতি স্বয়ংক্রিয় মূল্যব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফলে অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক থেকে এ ধরনের অর্থনীতি কাম্য হিসেবে বিবেচিত। মুক্তবাজার অর্থনীতির ক্ষেত্র সুবিশাল, তাই এখানে ভোক্তা ও উৎপাদকের সাধারণ কাম্যতা অর্জিত হয়। এ ধরনের অর্থব্যবস্থার প্রভাবে দেশি-বিদেশি উদ্যোক্তাগণ আন্তর্জাতিক মানের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন বলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশকে রপ্তানিমুখী হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

মুক্তবাজার অর্থনীতির নেতিবাচক দিক : মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রভাবে সমাজে আয়-বৈষম্য বেড়ে যায়। এখানে মেধাবী, সম্পদশালী, চালাক, দুর্নীতিবাজ ও ধনিক শ্রেণি আরও লাভবান হয়। অপরদিকে দরিদ্রশ্রেণি আরও নিঃস্ব ও সর্বহারা হয়ে পড়ে। World Wealth Report-2015 সূত্রে বলা হয়েছে– বিশ্বের এক শতাংশ ধনীর কাছে রয়েছে বিশ্বের ৫০ শতাংশ সম্পদ। আর বিশ্বের ৫০ শতাংশ সম্পদ দরিদ্রের কাছে রয়েছে এক শতাংশ সম্পদ। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার (পিপিআরসি) গবেষণায় (২০১৬) বলা হয়েছে দেশের মোট আয়ের অর্ধেকই (৪৬.২ শতাংশ) চলে যায় মাত্র ১০ শতাংশ ধনীর পকেটে। রাজধানীর ১০ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু আয় প্রায় ১২ হাজার ডলার, আর গরিব মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ৫৫৫ ডলার। এভাবে অসম প্রতিযোগিতার ফলে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট হয়, শোষক ও শোষিত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

উপসংহার : সুষ্ঠু ব্যবস্থা ও কল্যাণকামী মনোভাব বিরাজ করলে মুক্তবাজার অর্থনীতি কল্যাণকর অর্থনীতি হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক। সরকার দেশকে মুক্তবাজার অর্থনীতি থেকে সুবিধালাভের প্রত্যাশায় বিবিধ কর্মসূচি ও দ্রুত শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ করেছে।

৬৩ বাংলাদেশের কৃষক [ফা. প. ২০০০]

অথবা, সব সাধকের বড় সাধক

অথবা, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষি সমস্যা

উপস্থাপনা : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ৮০% জন লোক কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বিশ্বের আদিমতম শিল্পী কৃষক সমাজ। কৃষকরা মাঠে কাজ করে ফসল ফলায়, সে ফসলে আমাদের অন্ন আসে। আমাদের কৃষকদের বাস্তবজীবন বড়ই বৈচিত্র্যময়। চরম কষ্ট আর ক্ষণিক আনন্দের খেলা চলে বাংলাদেশের কৃষকদের সংগ্রামী জীবনে। তাই কৃষকের সংগ্রামী জীবনকে আমাদের অবশ্যই সম্মানের চোখে দেখতে হবে।

কৃষকদের পরিচয় : যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেত-খামারে নানা শস্য ফলায় তারাই কৃষক। এদেশের কৃষকদের একশভাগ গ্রামে বাস করে। তবে শহর-বন্দরের আশেপাশে কিছু কৃষকের অবস্থান লক্ষ করা যায়। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো আড়ম্বর বা বাহুল্যতা নেই। প্রচণ্ড রোদে বৃষ্টিতেও লুঙ্গি, গামছা, গেঞ্জি বা ছোটখাটো শার্ট, পাঞ্জাবি ছাড়া

তাদের গায়ে কোনো পোশাক দেখা যায় না। পূর্ণ মৌসুমের সময় তাদের নাওয়া-খাওয়া ও পোশাকের কোনো খবর থাকে না বললেই চলে।

কৃষকের অতীত ও বর্তমান : বাংলার কৃষকদের একসময় গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ ছিল। কিন্তু তাদের বর্তমান অবস্থা বড়ই করুণ ও বেদনাদায়ক। চরম প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে তাদের জীবন কাটছে আজ।

কৃষকদের শ্রেণিবিভাগ : বাংলাদেশের কৃষক সমাজ প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) ভূমালিক কৃষক।

(খ) ভূমিহীন বর্গাচাষি কৃষক।

ভূমালিক কৃষক : এ শ্রেণির কৃষকের প্রচুর পরিমাণে জমি থাকে। তারা চাষাবাদের মাধ্যমে বিরাট মূলধনের মালিক হয়ে যায়। সাধারণ কৃষকের মনে সুখ ও শান্তি না থাকলেও এ শ্রেণির কৃষকের টাকা-পয়সা ও আরাম-আয়েশের অভাব নেই।

ভূমিহীন বর্গাচাষি : এ শ্রেণির কৃষকদের কারো সামান্য জমি আছে, আবার কারো একেবারেই নেই। তারা ভূমালিক কৃষকদের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করে। পরিশ্রমের তুলনায় তাদের প্রাপ্তির পরিমাণ খুবই কম।

কৃষকদের আর্থিক অবস্থা : বাংলাদেশের কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করলেও তাদের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কারণ পরিশ্রম করে তারা যে ফসল ফলায়, কম কৃষকই তা ভোগ করতে পারে। এদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার কারণে বেশিরভাগ সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। ফলে গ্রাম-বাংলার খেটে খাওয়া মানুষ আজ উপেক্ষিত বঞ্চিত। তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে ভালো কাপড় নেই। অনাহার, অশিক্ষা ও নানারকম রোগব্যাধিতে তারা নিত্য আক্রান্ত।

বাংলাদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কারণ : বাংলাদেশের কৃষকদের দুরবস্থার কারণগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। কৃষিঋণ শোধ করতেই সিংহভাগ ফসল বিক্রি করে দিতে হয়। তাছাড়া অসময়ে বিক্রির ফলে কম দামে বিক্রি করতে হয়।

২। জমির মালিক ও জোতদারদের শোষণের শিকার হয় নিরীহ কৃষকরা। তারা কৃষকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয় না।

৩। প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত সার ও কীটনাশক পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও অনেক সময় অধিক মূল্যে কেনা সম্ভব হয় না।

৪। অধিকাংশ কৃষকের নিজস্ব জমি নেই। তারা অন্যের জমি চাষ করে কোনোরকমে অন্নের ব্যবস্থা করে।

৫। কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে ধরা হলেও সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা করে না।

৬। একই পরিবারের জমি বহুখণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। যার ফলে উন্নত চাষ পদ্ধতি এখানে অসম্ভব।

৭। প্রয়োজনের সময় উপযুক্ত ঋণ পাওয়া যায় না বলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৮। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল গুদামজাতকরণের কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। ফলে মৌসুমে উৎপাদিত ফসল প্রচুর পরিমাণে বিনষ্ট হয় বা উৎপাদন খরচের চেয়েও কমদামে বিক্রি করতে হয়।

৯। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিতে কৃষকের ফসল বিনষ্ট হয়।

১০। কৃষি মৌসুমে সেচ ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ গভীর নলকূপ নেই। ফলে কৃষকদের ভাগ্য মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল।

১১। গভীর নলকূপের ব্যবস্থা হলে তা পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই।

১২। একই জমিতে বারবার চাষের ফলে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। ফলে উৎপাদিত হচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত ফসল।

১৩। উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা উৎপাদক কৃষকের হাতে নেই।

১৪। পুঁজির স্বল্পতার জন্য দরিদ্র বা ভূমিহীন কৃষক অবসর সময়ে অতিরিক্ত আয় করতে পারে না, ফলে তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হতে থাকে।

কৃষকদের দুরবস্থা দূরীকরণের উপায় : কৃষকদের দুরবস্থা দূরীকরণার্থে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

ক. তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

খ. শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সার এবং কীটনাশকের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. কৃষিঋণ, উন্নত সার, কীটনাশক ও লাঙ্গলসহ যাবতীয় অত্যাধুনিক ব্যবস্থার ব্যাপারে সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

ঙ. জমির খণ্ড-বিখণ্ডতা দূরীকরণের মাধ্যমে খামারভিত্তিক চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে।

চ. প্রয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ. পচনশীল কৃষি পণ্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

জ. প্রত্যন্ত অঞ্চলে পর্যাপ্ত পরিমাণে গভীর নলকূপ ও তা পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ. আধুনিক চাষ-পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঞ. কৃষকদের মাঝে সুলভে আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।

ট. কৃষকের উৎপাদিত কৃষি পণ্য সরাসরি বাজারজাত করতে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক ও প্রশাসনিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা দিতে হবে।

ঠ. মধ্যসত্ত্বভোগী ফড়িয়াদের দৌরাত্ম্য ও চাঁদাবাজদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে হবে।

ড. কৃষকদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে হবে।

ঢ. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র কৃষকদের জন্য জরুরিভিত্তিতে কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ণ. সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে যাতে অবসর সময়ে তারা অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে।

উপসংহার : কৃষকসমাজ জাতির প্রাণশক্তি। কিন্তু স্বাধীনতার পর প্রায় ৪৮বছর কেটে গেলেও কৃষকদের ভাগ্যের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে না পারলে জাতিরও উন্নতি হবে না। আর এজন্য সরকারকে সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তব ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৬৪ গ্যাস সম্পদ : জাতীয় জীবনে উন্নয়নের সোনার কাঠি

অথবা, বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ [ফা. প. ২০০২]

উপস্থাপনা : যে-কোনো দেশের উন্নতিতে সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে। পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যতীত একটি দেশ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোনার কাঠির মতো জাদুকরি ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বাংলাদেশের প্রধানতম প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস। যা এদেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

১। **বাংলাদেশে গ্যাস আবিষ্কার :** ১৯৫৫ সালে অর্থাৎ পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার হয়। সিলেটে আবিষ্কৃত এ গ্যাস সম্পদের পরিমাণ তখন জানা না গেলেও মূলত এ সময় হতে বাংলাদেশের সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে সিলেটের হরিপুর গ্যাসক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয়।

২। **প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের ব্লকসমূহ :** প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে ৮টি ব্লকে গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সাথে চুক্তি করা হয়।

৩। **গ্যাস মজুদের স্থানসমূহ :** বাংলাদেশে গ্যাস মজুদের স্থান ও গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে উপস্থাপন করা হলো–

স্থান	গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ
১। বৃহত্তর সিলেট	রশিদপুর, সিলেট, কৈলাশটিলা, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, ছাতক, হবিগঞ্জ, জালালাবাদ
২। বৃহত্তর কুমিল্লা	তিতাস, বাখরাবাদ, সালদা নদী
৩। বৃহত্তর নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, ফেনী
৪। কক্সবাজার	কুতুবদিয়া, সাঙ্গু
৫। খাগড়াছড়ি	সেমুতাং
৬। গাজীপুর	কামতা
৭। ভোলা	শাহবাজপুর
৮। নারায়ণগঞ্জ	মেঘনা (মরিচাকান্দি)
৯। নরসিংদী	বেলাবো

৪। **বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ :** বাংলাদেশকে বলা হয় প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভাসমান একটি রাষ্ট্র। অর্থাৎ এদেশ গ্যাসের উপর ভাসছে। কিন্তু এদেশের গ্যাস সম্পদের সঠিক পরিমাণ রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষজ্ঞগণ আজ পর্যন্ত এর সঠিক পরিমাণ জানাতে সক্ষম হননি।

খনিজ বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের পরিমাণ সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য ধারণা দিয়েছেন। তাদের মতে, আবিষ্কৃত ২৫টি গ্যাসক্ষেত্রে মজুদ গ্যাসের উত্তোলনযোগ্য পরিমাণ হলো ২১ দশমিক ৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুটেরও বেশি। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এর পরিমাণ আরও অনেক বেশি। নিচে গ্যাসক্ষেত্রভিত্তিক গ্যাসের পরিমাণ উপস্থাপন করা হলো–

গ্যাসক্ষেত্র	আবিষ্কার	মজুদের পরিমাণ
১। সিলেট (হরিপুর)	১৯৫৫	১০৭.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
২। রশিদপুর (হবিগঞ্জ)	১৯৬০	৩৭৭৫.৮০ বিলিয়ন ঘনফুট
৩। ছাতক (সুনামগঞ্জ)	১৯৫৯	৬৩৮৬.৫০ বিলিয়ন ঘনফুট
৪। তিতাস (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	১৯৬২	৭৪৬৬.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
৫। কৈলাশটিলা (সিলেট)	১৯৬২	২৪২০.৪০ বিলিয়ন ঘনফুট
৬। হবিগঞ্জ	১৯৬৩	১৩২৭.৬০ বিলিয়ন ঘনফুট
৭। বাখরাবাদ (কুমিল্লা)	১৯৬৯	৩৬৫.৭০ বিলিয়ন ঘনফুট
৮। সেমুতাং (খাগড়াছড়ি)	১৯৬৯	৯৮.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
৯। বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)	১৯৭৭	১৫.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১০। কুতুবদিয়া (কক্সবাজার)	১৯৭৭	৪৬৮.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১১। কামতা (গাজীপুর)	১৯৮১	১৭৩.৯০ বিলিয়ন ঘনফুট
১২। বিয়ানীবাজার (সিলেট)	১৯৮১	১৪৮৭.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৩। ফেনী	১৯৮১	৪৯৬.৮০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৪। ফেঞ্চুগঞ্জ (সিলেট)	১৯৮৮	২১০.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৫। জালালাবাদ (সিলেট)	১৯৮৯	৯০০.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৬। মেঘনা (মরিচাকান্দি), কুমিল্লা	১৯৯০	২৩২.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৭। বেলাবো (নরসিংদী)	১৯৯০	১২৬.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৮। শাহবাজপুর (ভোলা)	১৯৯৫	৩৩৩.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
১৯। সালদা নদী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)	১৯৯৬	১৪০.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
২০। সাঙ্গু (চট্টগ্রাম)	১৯৯৬	৭৯৮.০০ বিলিয়ন ঘনফুট
২১। মৌলভীবাজার	১৯৯৭	০.১৪৭ বিলিয়ন ঘনফুট
২২। বিবিয়ানা গ্যাসক্ষেত্র (হবিগঞ্জ)	১৯৯৮	২.৪ বিলিয়ন ঘনফুট
২৩। লালমাই গ্যাসক্ষেত্র (কুমিল্লা)	২০০৫	
২৪। শ্রীকাইল (কুমিল্লা)	২০০৫	
২৫। ভাঙ্গুরা (কুমিল্লা)	২০০৫	
২৬। সুন্দলপুর (নোয়াখালী)	২০১১	
২৭। সুনেত্র (সুনামগঞ্জ)	২০১১	
২৮। রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)	২০১৪	
২৯। ভোলা নর্থ (ভোলা)	২০১৭	

বর্তমানে দেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য ব্লক রয়েছে ৪৮টি, যার মধ্যে স্থলভাগে রয়েছে ২২টি এবং বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ২৬টি ব্লক।

দেশের অনেক ব্লকে এখনো গ্যাস অনুসন্ধান করা হয়নি। এসব ব্লকে অনুসন্ধান করলে দেশের গ্যাস সম্পদের মজুদের পরিমাণ নিঃসন্দেহে আরও বৃদ্ধি পাবে।

৫। **দেশে বর্তমান গ্যাসের ব্যবহার :** দেশে বর্তমানে গ্যাস সম্পদ ব্যবহার হয় মাত্র কয়েকটি খাতে। শিল্পায়ন ও উন্নয়নমূলক খাতে গ্যাসের বহুমুখী ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার এখনো শুরু হয়নি। ব্যবহৃত খাতসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন, শিল্প-

কারখানা, বাণিজ্য ও গৃহস্থালির কাজে বর্তমানে গ্যাসের ব্যবহার হয়ে থাকে। কোন খাতে কী পরিমাণ গ্যাস ব্যবহৃত হয় তা নিচে ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

ব্যবহারের খাত	ব্যবহারের হার
১। বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪৩%
২। সার কারখানা	৩৪%
৩। শিল্প কারখানা	১৬%
৪। বাণিজ্য ও গৃহস্থালি	৭%

৬। **গ্যাস রপ্তানি ও জাতীয় স্বার্থ :** বিদেশি কোম্পানিসমূহ গ্যাস উৎপাদন করে তা বিদেশে রপ্তানি করার জন্য জোর দাবি ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ অন্যান্য রাষ্ট্র এ প্রচেষ্টায় সরকারিভাবে অংশগ্রহণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ সরকার গ্যাস ব্যবহারের খাত ও তা রপ্তানি প্রশ্নে চাপের মুখে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ও প্রায় সকল রাজনৈতিক দল দেশের জন্য আগামী ৫০ বছর ব্যবহারযোগ্য গ্যাসের মজুদ নিশ্চিত করে অতিরিক্ত গ্যাস রপ্তানি করা যেতে পারে বলে মতামত প্রকাশ করেছে।

৭। **উন্নয়নের সোনার কাঠি :** গ্যাস সম্পদ জাতীয় জীবনে উন্নয়নের সোনার কাঠি। মধ্যপ্রাচ্যের ধূসর মরুভূমিসমৃদ্ধ দেশসমূহ জ্বালানি তেলের ওপর ভর করে বিশ্বের সমৃদ্ধিশালী দেশে রূপান্তরিত হয়েছে। তেমনি বাংলাদেশ তার জ্বালানি গ্যাসের মাধ্যমে উন্নয়নের শীর্ষমার্গে উন্নীত হতে পারে। বাংলাদেশ নিম্নলিখিত খাতে গ্যাসের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

ক. **বিদ্যুৎ উৎপাদন :** বর্তমানে দেশের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় গ্যাস ব্যবহার করে। বিশাল গ্যাস সম্পদ ব্যবহার করে দেশের মোট বিদ্যুতের প্রায় সবটুকু উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফলে জ্বালানি তেল ও কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

খ. **সার উৎপাদন :** প্রাচীনকাল হতে বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলাদেশের কৃষিকে উন্নত করতে হলে উন্নত প্রযুক্তির পাশাপাশি সারের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সার উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে যা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষি জমিতে সেচ যন্ত্রসমূহ গ্যাসভিত্তিক করা যেতে পারে। ফলে কৃষিখাতে সৃষ্টি হবে উন্নয়নের জোয়ার। বাংলাদেশ স্বনির্ভর হবে খাদ্যশস্যে।

গ. **গ্যাসভিত্তিক শিল্প কারখানা :** শিল্প উৎপাদনে বাংলাদেশ অনেক পেছনে রয়েছে। অথচ বাংলাদেশের গ্যাস সম্পদ এ ব্যাপারে সম্ভাবনার নব দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রায় সকল শ্রেণির শিল্প-কারখানা গ্যাসভিত্তিক করা যেতে পারে। ফলে শিল্প উৎপাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ঘ. **গ্যাসভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের পরিবহন ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণভাবে জ্বালানি তেল নির্ভর। এজন্য দেশে শত শত কোটি টাকার তেল আমদানি করা হয়। এর ফলে যেমন বিশাল অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়, তেমনি জ্বালানি তেলের দূষিত ধোঁয়ায় দেশের পরিবেশ দূষিত হয় এবং হাজার হাজার মানুষ বিভিন্ন মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। অথচ গ্যাসের ব্যবহারের ফলে প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ পাল্টে যেতে পারে। দেশ স্বনির্ভরতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হতে পারে।

ঙ. **গ্যাস রপ্তানি এক বিশাল সম্ভাবনা :** দেশের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত গ্যাস রপ্তানি করা সম্ভব হলে তা হবে দেশের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বাংলাদেশ জ্বালানি গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে রূপান্তরিত হতে পারবে। তবে এজন্য নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারে (BAPEX)-কে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের জন্য মহান আল্লাহর অনন্ত এ নেয়ামত উত্তোলন করে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এর অপচয় ও চুরি বন্ধ করতে হবে। শুধুমাত্র রান্নাবান্নায় ব্যবহার করে রসনা বিলাসের পরিবর্তে দেশের অর্থনীতিকে মজবুত ও স্বনির্ভর করার জন্য এর সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই গ্যাসসম্পদ আমাদের দেশে জাতীয় উন্নয়নে এক সোনার কাঠি হিসেবে পরিগণিত হবে।

৬৫ বাংলাদেশের নদী

[ফা. প. ২০১২]

অথবা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ

উপস্থাপনা : বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীমালা বাংলাদেশের গর্ব। এ দেশের ওপর দিয়ে ছোট-বড় প্রায় ৩১০টি নদ-নদী বয়ে গেছে। নদীমাতৃক দেশ বলে স্বভাবতই এদেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নদীর প্রভাব রয়েছে। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৪,১৪০ কিলোমিটার। নদীর কারণেই আমাদের দেশ সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামলা।

নদনদীর বৈশিষ্ট্য : বাংলাদেশে যেমন ছোট-বড় অসংখ্য নদী রয়েছে তেমনি এদের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন ভিন্ন। দেশের দীর্ঘতম নদী মেঘনা (৩৩০কিমি) ও ক্ষুদ্রতম নদী গোবরা (৪কিমি)। দেশের প্রশস্ততম ও গভীরতম নদী মেঘনা– যথাক্রমে ১৩০০০ মিটার ও ২৭মিটার। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত বা অভিন্ন নদী রয়েছে। আন্তঃসীমান্ত নদীর মধ্যে দুধকুমার নদীটি ভুটান ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমানা নির্ধারণকারী নদী হচ্ছে হাড়িয়াভাঙা।

বাংলাদেশের প্রধান নদনদী : বাংলাদেশের সবগুলো নদীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা বেশ কঠিন। ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া, আঁকাবাঁকা মৌসুমি খাড়ি, কর্দমপূর্ণ খালবিল, যথার্থ দৃষ্টিনন্দন নদ-নদী ও এদের উপনদী এবং শাখানদীর সমন্বয়ে বাংলাদেশের বিশাল নদীব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। কিছু কিছু স্থান যেমন- পটুয়াখালী, বরিশাল এবং সুন্দরবন অঞ্চলে নদীনালা এত বেশি যে সে অঞ্চলে প্রকৃতই নদীজালিকার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদীগুলো হলো– পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সাঙ্গু, ফেনী ও কর্ণফুলী। নিচে কয়েকটি প্রধান নদীর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

পদ্মা : পদ্মা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী। এটি গঙ্গার শাখা নদী। গঙ্গা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ হতে উৎপন্ন হয়েছে। এটি প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা নদীটি পদ্মা নামে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তারপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত ধারা পদ্মা নামেই দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিন নদীর মিলিত স্রোত মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি পদ্মার প্রধান শাখানদী। মহানন্দা প্রধান উপনদী। পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক, টাঙন পদ্মার উপনদী।

মেঘনা : বাংলাদেশের গভীরতম (২৭ মিটার) এবং দীর্ঘতম নদী (৩৩০ কিমি) মেঘনা। মেঘনা আসামের বরাক নদী নাগা মনিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমিরিগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুরমা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা নদী এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা ভৈরববাজারে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। গোমতি, তিতাস, মনু, বাউলাই প্রভৃতি মেঘনার উপনদী।

যমুনা : যমুনা নদীর পূর্বনাম জোনাই। নদীটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। ধরলা, তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই যমুনার উপনদী। ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বনাম লোহিত্য। এই নদী হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকট মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে তিব্বতের ওপর দিয়ে পূর্বদিকে ও পরে আসামের ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী। বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

কর্ণফুলী : বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী কর্ণফুলী। কর্ণফুলী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ।
হালদা, বোয়ালখালী ও কাসালং কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী। কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর চট্টগ্রাম এ নদীর তীরে অবস্থিত।

সাঙ্গু : সাঙ্গু নদী মায়ানমার–বাংলাদেশ সীমার আরাকানের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বান্দরবান ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। সাঙ্গুর প্রধান উপনদী ডলু।

ফেনী : ফেনী নদী পার্বত্য ত্রিপুরায় উৎপন্ন হয়ে ফেনী জেলার পূর্ব সীমানা দিয়ে সন্দীপের উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা : নদীপথে যাতায়াত সুবিধা এবং নদী উপত্যকাসমূহের পলিমাটি উৎকৃষ্ট কৃষিভূমি হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতাসমূহ নদী উপত্যকায় গড়ে উঠেছে। নাব্য নদ-নদীসমূহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নগর গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রধান শহর, নগর ও বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে, যেমন- বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা মহানগরী, শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জ শহর ও বন্দর, কর্ণফুলী নদীর তীরে চট্টগ্রাম, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ময়মনসিংহ শহর গড়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত প্রবাহ, গতিবেগ এবং নতিমাত্রাবিশিষ্ট নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী

নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। সত্যিই সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা নদীমালা বাংলাদেশের গর্ব।

নদীর উপকারিতা : সুদূর অতীত থেকেই বাংলাদেশ শস্য-শ্যামলা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন। এর মূলে রয়েছে নদ-নদীর অবদান। এ দেশের অধিকাংশ নদী দক্ষিণমুখী প্রবাহিত। চাষাবাদের জন্য পানির প্রধান উৎস এবং বাণিজ্যিক পরিবহন পথ হিসেবে নদীগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া নদীগুলো স্বাদুপানির মাছের গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ মৎস্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আবার নদী-প্রণালিগুলো দেশের কৃষিভূমিতে পলি ছড়িয়ে দিয়ে প্রাকৃতিক উর্বরতার ব্যবস্থা করে থাকে। নদীগুলো প্রতিবছর প্রায় ২.৪ বিলিয়ন টন পলি বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করে। যার ফলে সমুদ্রমুখ বরাবর গড়ে উঠছে নতুন নতুন ভূমি। মৌসুমি বায়ু প্রবাহকালে নদীগুলো সাগরে অতিরিক্ত পানি নির্গমন করে থাকে। এভাবে বিশাল নদী-প্রণালিসমূহ একই সঙ্গে দেশের আশীর্বাদ আবার বিপর্যয় সৃষ্টিকারীও বটে।

নদীর অপকারিতা : নদীগুলো এঁকেবেঁকে চলে। আঁকাবাঁকা সর্পিল নদীর তীরভাঙন ও নিয়মিত বন্যা জনগণের জন্য অপরিমেয় দুঃখ-কষ্টের সৃষ্টি করে এবং উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। বাঁক ফিরতে স্রোতের চাপ এক পাড়ে গিয়ে পড়ে। তখন সেই পাড়ে ভাঙন শুরু হয়। বর্ষাকালে নদীতে স্রোতের বেগ বেড়ে যায়। তখন নদী ভাঙন বেশি হয়। কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়, ভাঙতে ভাঙতে গ্রামের পর গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সে সকল এলাকার লোকজন ঘরবাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং দুর্ভোগের শিকার হয়।

বাংলাদেশের নদীভাঙনের চিত্র : নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি স্থানীয় ও পুনঃসংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রতিবছর নদী ভাঙনের কারণে লাখ লাখ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট প্লাবনভূমির প্রায় ৫% প্রত্যক্ষভাবে নদীভাঙনের শিকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের ৪৯২টি উপজেলার মধ্যে প্রায় ৯৪টি উপজেলায় নদীভাঙন ঘটেছে। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ এর সঙ্গে আরও ৫৬টি উপজেলার সন্ধান পেয়েছেন, যেখানে নদীভাঙনের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে প্রায় ১০০টি উপজেলায় নদীভাঙন ও বন্যার দুর্ভোগ প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ৩৫টি উপজেলা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।

নদী ভাঙনের কারণ : বাংলাদেশের ওপর দিয়ে তিন শতাধিক নদী বয়ে গেছে। প্রতিবছর পলিমাটি জমে নদীগুলো ভরাট হচ্ছে। তদুপরি নদীর দুই তীরের বনজঙ্গল প্রতিবছর উজাড় হয়ে যাচ্ছে, ফলে বাড়ছে নদীভাঙন। ক্রমশ ভরাট হয়ে যাওয়া এসব নদ-নদী গত কয়েক হাজার বছরে খনন করা হয়েছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। অথচ বন্যা প্রতিরোধের জন্য এ কাজটিই অগ্রাধিকারভিত্তিতে করা প্রয়োজন ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ৫০ বছর কেটে গেলেও নদীগুলো খনন এবং ভাঙন ঠেকাতে উভয় তীরে বৃক্ষরোপনের কর্মসূচী গ্রহণের কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে না। প্রতি বছর ভোগান্তির শিকার দেশের লাখ লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী এটাকে প্রকৃতির নিয়ম বলেই মেনে নিচ্ছে– আর তার সুযোগ নিচ্ছে এদেশের একটি স্বার্থান্বেষী মহল।

নদীভাঙনে আর্থ-সামাজিক প্রভাব : নদীভাঙনের আর্থ-সামাজিক প্রভাব মারাত্মক। অনেকে আল্লাহর গজব বলে এই দুর্যোগকে মেনে নিয়ে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিবর্তে দোয়া-মানত ইত্যাদির শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেয়। অথচ বিশ্বের অনেক দেশই নদী খনন এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বন্যার প্রকোপ কমাতে সক্ষম হয়েছে। আজ জাতীয় দারিদ্র্যের একটা বড় কারণ এই নদীভাঙন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নদীভাঙনের কারণে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং বিপদাপন্ন লোকের সংখ্যা

আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নদীভাঙনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের জমি, বসতভিটা, ফসল, গবাদি সম্পদ, গাছপালা, গৃহসামগ্রী সবকিছুই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বান্ত মানুষ ভূমিহীনের কাতারে সামিল হয়ে নতুন আশ্রয়ের খোঁজে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়।

উপসংহার : নদী বাংলাদেশের গৌরব। নদীর কারণে আমাদের দেশ হতে পেরেছে সমৃদ্ধিশালী। তবে দুঃখের বিষয় নদীগুলো এখন ক্রমান্বয়ে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীগুলোর নাব্য জলপ্রবাহ ঠিক রাখার জন্য আমাদের কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। কারণ নদী আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য।

৬৬ জনসংখ্যা ও জনশক্তি [ফা. প. ২০১০]

অথবা, জনসংখ্যা ও জনসম্পদ

অথবা, জনসংখ্যা : বোঝা নয়, সম্পদ

উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার আধিক্যকে এক বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ হার অত্যন্ত ব্যাপক। আজ থেকে দশ হাজার বছর আগে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটির মতো। দুই হাজার বছর আগেও পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটির মতো। আর বর্তমানে জনসংখ্যা ৭৬৩ কোটি (UNFPA Report-2018) অতিক্রম করেছে। এ সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে আশঙ্কাজনক হারে। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ক্ষুদ্র পরিসরের এদেশে আজ জনসংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। অথচ ১৬৫০ সালে এ ভূখণ্ডেই জনসংখ্যা ছিল মাত্র এক কোটি। তবে এ জনসংখ্যাকে সমস্যারূপে না দেখে জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে তা দেশের উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার পটভূমি : বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১০৩ জন (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭% (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৮)। বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকলে দেশের জনসংখ্যা আগামী ৫০ বছরের মধ্যেই বর্তমানের দ্বিগুণ হবে। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তখন কি আমরা এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা সরবরাহ করতে সক্ষম হব? বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক কৃষিজীবী। আমাদের দেশে চাষের জমির পরিমাণ ৮৫.৭৭লাখ হেক্টর। জনসংখ্যার অনিবার্য ক্রমবর্ধমান ফল হিসেবে এ পরিমাণ আরও হ্রাস পাবে এবং জমিগুলো আরও খণ্ডবিখণ্ড হবে। ফলে এগুলো তখন কর্ষণযোগ্যতা হারাবে। তাছাড়া জমির বারবার ব্যবহারের ফলে উর্বরতাও হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি দিয়ে তখন এসব সমস্যা সমাধান করা কি আদৌ সম্ভবপর হবে?

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ : বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বেশ কিছু কারণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন–

ক. চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলে মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহার বেড়ে গেছে;

খ. এ দেশে জন্মহার বৃদ্ধির অনুকূল ভৌগোলিক পরিবেশ ও আবহাওয়া বিদ্যমান এবং

গ. অশিক্ষা, দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অজ্ঞতা, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাব এবং নানাবিধ কুসংস্কারের ফলে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে।

জনসংখ্যা সমস্যা : বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের প্রভাব ইতোমধ্যে প্রকাশ হতে শুরু করছে। এতে বিশাল জনগোষ্ঠীর শিক্ষা-দীক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্যা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে জনজীবন অশিক্ষা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভুগছে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। অভাব-অভিযোগ, খাদ্য সংকটসহ দারিদ্র্য আজ এ দেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী হয়ে আছে। জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে দেশের লোকজনের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নয়ন দুরূহ হয়ে পড়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, দেশে প্রতি ২১৬৬ জনের জন্য মাত্র ১ জন চিকিৎসক রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গৃহসংস্থান সমস্যাও আজ প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়তি মানুষের গৃহসংস্থানের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাষযোগ্য জমির পরিমাণও কমছে প্রতিনিয়ত। মানুষের আহার্য ও বাসস্থানের পর শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শিক্ষালাভ মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষের জন্মগত এ অধিকার আদায়ে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব হয় না।

দেশের প্রায় ২২ শতাংশ লোকই দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং এদের মধ্যেই জন্মহার অনেক বেশি। ফলে গ্রামের এইসব দরিদ্র ছাত্রছাত্রীরা স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় যেতে পারে না। তাছাড়া পর্যাপ্ত স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা স্থাপন করতে যে উপকরণ ও স্থানের প্রয়োজন তা যোগাড় করাও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ফলে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে জাতি পঙ্গুত্ববরণ করে।

জনশক্তি : জনসংখ্যা আমাদের দেশে বরাবরই কেবল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে এবং এ সমস্যা উত্তরণের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু এ বিপুল জনসংখ্যাকে যে জনশক্তিতে রূপান্তর করে দেশকে স্বনির্ভর করা যায় সে চিন্তা করার মতো চিন্তাশীল লোকের বড় অভাব আমাদের দেশে। অথচ জাপান ও তাইওয়ান তাদের জনশক্তিকে দক্ষ বানিয়ে নিজেদের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে আজ উন্নতির উচ্চ মার্গে উন্নীত হয়েছে। জনবহুল দেশ চীন আজ তাদের জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বের অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং জনসংখ্যা সীমিত রেখে তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে পারলে জনসংখ্যা দেশের জন্য সমস্যা না হয়ে হবে আশীর্বাদ।

জনসংখ্যা জনশক্তিতে রূপান্তরের উপায় : মানুষ কেবল মুখ আর পেট নিয়েই জন্মগ্রহণ করে না; বরং উপার্জনের দুটি হাতও তার সাথে থাকে। তাই এ হাতগুলো কাজে লাগিয়ে দেশের এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয়ভাবে সুপরিকল্পিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ। নিচে এ সম্পর্কে সম্ভাব্য কতিপয় পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১। **সবার জন্য সুশিক্ষা :** আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষার হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও সুশিক্ষার অভাবে সুপরিকল্পিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত লোকের যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। আর অপরিকল্পিত ও লক্ষ্যহীন জীবনযাপনের ফলে এ শ্রেণির লোকেরা তাদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না।

২। **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতার কারণে দেশের অনেক মানুষ তাদের মেধা, শ্রম, দক্ষতা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিল্প-কারখানা স্থাপন করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলে এ শ্রেণির জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তর করা সম্ভব।

৩। **কারিগরি শিক্ষার প্রসার :** আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও বিশাল জনগোষ্ঠীর তুলনায় তা নিতান্তই অপ্রতুল। আর প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ আছে কারিগরি

শিক্ষার প্রতি সমাজের মানুষের আগ্রহ কম থাকায় তারও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। তাই কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৪। **প্রশিক্ষণ দান :** দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য অদক্ষ বেকারদেরকে সরকারি ও বেসরকারিভাবে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারলে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে তারা জনসম্পদে পরিণত হতে পারে।

৫। **জনশক্তি রপ্তানি :** আমাদের দেশ জনসংখ্যার ভারে ন্যুব্জ, আবার পৃথিবীর অনেক দেশ আছে জনশক্তির অভাবে যাদের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। তাই দেশের কর্মক্ষম লোকদেরকে জনশক্তির চাহিদা রয়েছে এমন দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব।

৬। **প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার :** এ দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিরাট অঙ্ক ব্যয় করা হয় তার দ্বারা অন্তত দেশের এক-চতুর্থাংশ কর্মক্ষম জনশক্তিকে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেই কুটির শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত করা যেতে পারে। আর এর জন্য সরকারি উদ্যোগে যে ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন তা বেসরকারিভাবে কোনোমতেই সম্ভব নয়।

৭। **মানসিকতার পরিবর্তন :** দেশের বিপুল জনসংখ্যা শিক্ষা, সচেতনতা ও অনুকূল পরিবেশের অভাবে তাস, দাবা, জুয়া প্রভৃতি খেলা এবং বেহুদা গল্প-গুজব, হাসি-তামাসা ও অলসতায় অনেক কর্মঘণ্টা অপচয় করে। সরকারি উদ্যোগে বিশেষত গণমাধ্যমের সাহায্যে যদি তাদের এ অনুভূতি জাগ্রত করা যায় যে, এসব অনর্থক কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষকে পয়দা করা হয়নি; বরং দেশ ও জাতির জন্য তার অনেক কাজ করার আছে। তাহলে এসব লোক নিজস্ব উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জনশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

সর্বোপরি রাজমিস্ত্রি, কাঠ মিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, প্লাম্বার (Plumber), মটর মেকানিক, মটর ড্রাইভার এবং রেফ্রিজারেটর, এয়ারকুলার, রেডিও, টিভি মেকানিক ইত্যাদিতে স্বল্প সময়ে হাজার হাজার লোককে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রতি উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের লোকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

উপসংহার : জনসংখ্যার আধিক্যকে শুধু সমস্যারূপে দেখলে এবং কৃত্রিমভাবে তা রোধ করার চেষ্টা করলে এর সমাধান হবে না। বরং এর পাশাপাশি জনগণকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ হিসেবে গড়ে তুললে তা জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে এবং বিদেশে এ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে। পাশাপাশি লাখ লাখ লোক তাদের মেধা, শ্রম, দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখতে পারবে। সুতরাং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যাদের ওপর রয়েছে তাঁরা যদি এ ব্যাপারে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তবেই দেশের জনসংখ্যা জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে।

৬৭ অধিক খাদ্য ফলাও

অথবা, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা

উপস্থাপনা : বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। সবুজ-শ্যামল এ দেশ একসময় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকলেও আজকে তা আর নেই। একসময় এ দেশের কৃষকের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে দেশের খাদ্যসমস্যা

ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এর আশু সমাধানকল্পে বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অধিক খাদ্য ফলানোর মাধ্যমে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা বর্তমান সময়ের অনিবার্য দাবি।

খাদ্য সমস্যার স্বরূপ : আয়তনের তুলনায় বাংলাদেশের লোকসংখ্যা বেশি। ফলে জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাস করছে দারিদ্র্যসীমার নিচে। বাধ্য হয়ে সরকার বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে খাদ্যশস্য আমদানি করছে। বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু এরপরও কৃষির মাধ্যমে যেটুকু খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এ কারণে বাংলাদেশকে খাদ্যঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিবছর ১৫ – ২০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

বেশি খাদ্য ফলানোর পদ্ধতি : বাংলাদেশের প্রধান সারির সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো খাদ্যসমস্যা। তাই এ সমস্যার আশু সমাধান করতে না পারলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়। আমাদেরকে অবশ্যই অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে হবে। এজন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক।

দেশের জনগণকে শিক্ষিত করা : বলা হয় Education is the backbone of a nation. তাই শিক্ষিত জাতি গঠন করে দক্ষ মানবসম্পদ বাড়াতে হবে। এ দক্ষ মানবসম্পদ দেশের উৎপাদনকে গতিশীল করতে এগিয়ে আসবে এবং খাদ্য সমস্যারও সমাধান হবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ : বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সেচব্যবস্থা, জমিতে সার প্রয়োগ এবং কীভাবে জমিতে চাষাবাদ করলে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়, সে সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। লবণাক্ততা দূর করা ও প্লাবনের হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বাঁধ নির্মাণের ধারণা কৃষকদের দিতে হবে। দেশে সারকারখানায় পূর্ণোদ্যমে উৎপাদন চললে প্রয়োজনীয় সারের অভাবও কমবে। ফলে কৃষকরা জমিতে সার দিয়ে অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে সক্ষম হবে।

উত্তম বীজ সরবরাহ : উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উত্তম বীজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নিম্নমানের বীজের জন্য ফসল অনেক কম হয়। উত্তম বীজ সরবরাহ ও সংগ্রহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গবেষণাগার স্থাপন একান্ত জরুরি।

বন্যা রোধ করা : মাঠের ফসল যাতে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও অন্যান্য বাঁধ নির্মাণ করা যেতে পারে। তাছাড়া নদীগুলোকে ড্রেজিং-এর মাধ্যমে গভীরও করা যায়। নদীভাঙন রোধে বনায়নের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে।

উন্নত সেচব্যবস্থা : অগভীর ও গভীর নলকূপের মাধ্যমে সকল জমিকে সেচ ব্যবস্থার আওতায় এনে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব।

জাপানি পদ্ধতিতে ধান উৎপাদন : আমাদের দেশে জমি গভীরভাবে চাষ করা যায় না। তাই জাপানি পদ্ধতিতে আমাদের দেশের মাটি গভীর করে চাষ করতে হবে।

শস্যাবর্তন ঘটিয়ে : একই জমিতে বার বার একই ফসল ফলালে জমির ফলন কম হয়। এজন্য পরিবর্তন করে ফসল বপন করলে অধিক ফসল ফলানো সম্ভব।

জমিতে ফসল চাষ বাড়িয়ে : বছরে একটি ফসল উৎপাদন করলে জমি অর্ধেক বছর অব্যবহৃত থাকে। ফলে উৎপাদন কম হয়। এজন্য ব্যাপক পানি সেচের মাধ্যমে একই জমিতে একসাথে একাধিক ফসল ফলানো সম্ভব।

অনাবাদি জমি চাষ : আমাদের দেশে প্রচুর অনাবাদি জমি রয়েছে। এর মধ্যে খাস জমি, বিভিন্ন সরকারি জমি, রেল লাইনের পাশে পরিত্যক্ত জমিসহ প্রচুর পরিমাণে অনাবাদি জমি পরিকল্পিতভাবে চাষ করা দরকার।

কৃষির আধুনিকীকরণ : আধুনিক সভ্যতায় কৃষির যান্ত্রিকীকরণ কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করছে। মান্ধাতা আমলের কাঠের লাঙল ও দুর্বল গরু দিয়ে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে। তাই অধিক ফসল ফলানোর জন্য কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

জমিতে সার প্রয়োগ : কৃষকেরা স্বাভাবিকভাবে যে গোবরসার অনায়াসে লাভ করে, তা প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জমিতে প্রয়োগ করে অধিক খাদ্য ফলানো সম্ভব। এ পন্থায় কম্পোস্ট সার প্রস্তুতপ্রণালি সম্পর্কে অনেক কৃষক পরিজ্ঞাত নয়। এছাড়া রাসায়নিক সার যাতে কৃষক সহজেই পেতে পারে সেদিকে সরকারের সুদৃষ্টি রাখতে হবে।

যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা : জমির খণ্ডিতকরণে ফসল অনেক কমে যায়। তাই সমবায়ভিত্তিক যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে।

দরিদ্র কৃষকদের সরকারি সহায়তা প্রদান : পুঁজির অভাবে দরিদ্র কৃষকরা কৃষিকাজে বিনিয়োগ করতে পারে না। এ বিষয়ে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসন : বন্যা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে কৃষকের ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জরুরিভিত্তিতে কৃষিঋণ প্রদান করা সম্ভব হলে কৃষিতে ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা হলেও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব।

ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ : উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়ায় অনেক কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এতে ফসলের উৎপাদন কমে যাচ্ছে। সরকারকে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

উপসংহার : খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি সম্মিলিত উদ্যোগে আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। ফলে আমরা হয়তো এমন অবস্থায় উপনীত হব, যখন বাংলাদেশে থাকবে না খাদ্য সংকট। আমাদের অর্থনীতিতে সূচিত হবে এক বিস্ময়কর অভাবনীয় পরিবর্তন।

৬৮ আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প

অথবা, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প

উপস্থাপনা : বিশ্বায়নের ফলে আধুনিক বিশ্বে শিল্পায়ন সম্পর্কিত ধারণার যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে অনেক দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক শিল্প এক নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এ সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে আমাদের বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ১৯৬০ সালে এবং এর মান বিশ্বমানের। পোশাক শিল্পের একশ ভাগই রপ্তানিমুখী। বিশ্ববাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ শিল্পের অবদান উৎসাহব্যঞ্জক। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়।

পোশাক শিল্পের অতীত অবস্থা : অতীতকাল থেকেই বিশ্ববাজারে বাংলার বস্ত্রশিল্পের ব্যাপক চাহিদা ছিল। তৎকালে বাংলার মসলিন ও জামদানি ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। পরে ব্রিটিশ বেনিয়াদের দ্বারা এর ধ্বংস সাধিত হয়। প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাকিস্তান আমলেও বাংলাদেশে পোশাক শিল্প সম্প্রসারিত হয়নি। দেশ বিভাগের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে কাপড়ের কল ছিল ১৪টি। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তা ১৪০টিতে উন্নীত হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তান) ছিল মাত্র ৪৩টি। বাংলাদেশ সাফল্যজনকভাবে কাপড় তৈরির ক্ষেত্রে এ সময় চরম বৈষম্যের শিকার হয়।

পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা : তৈরি পোশাক শিল্পের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের ইতিহাস অবশ্য বেশিদিনের কথা নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পোশাক তৈরির শিল্প গড়ে ওঠে। তখন হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। বর্তমানে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও অধিক। এসব প্রতিষ্ঠানে ৪০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৮০%। এছাড়া তাঁত শিল্প তো রয়েছেই। বাংলাদেশের অনেক স্থানেই বেশ উন্নতমানের তাঁতের কাপড় তৈরি হয়। তবে প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের পোশাক শিল্পের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বর্তমানে এ শিল্প হুমকির সম্মুখীন। নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে এ শিল্পকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে রহস্যজনকভাবে প্রায়ই গার্মেন্ট কারখানায় আগুন লেগে বহু ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে। এছাড়া কোনো এক অশুভ শক্তির ইশারায় শ্রমিক অসন্তোষের নামে প্রায়ই যেভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে এদেশের পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

তৈরি পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে বস্ত্রের চাহিদা অন্যতম। আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন মিটার কাপড়ের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের সিংহভাগই আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। যদিও পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের দ্বারা এক শ্রেণির জনগণ শোষিতও হচ্ছে, তবু সামগ্রিক বিচারে এ শিল্প আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকখানি ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে।

দেশের অর্থনীতিতে তৈরি পোশাক খাত : বাংলাদেশ থেকে প্রথম তৈরি পোশাক রপ্তানি শুরু হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করে আয় করেছিল মাত্র ১৩ লাখ ডলার। আর ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশে মোট রপ্তানি আয় ৭৬০ কোটি ডলারের মধ্যে পোশাক খাতের অংশ ছিল ৫৬৯ কোটি ডলার, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৭৬ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬,০১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৩৭ শতাংশ। জিডিপিতে তৈরি পোশাক খাতের সরাসরি অবদান ৫ শতাংশ। তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

পোশাকের বাজার : যে-কোনো শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সৃষ্টি করা। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যথেষ্ট চাহিদা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক-প্রথম রপ্তানি করা হয় ফ্রান্সে ১৯৭৭ সালে। আমাদের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকায় পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের স্থান সপ্তম এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে পঞ্চম। এছাড়াও জাপান, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ডসহ বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়ে থাকে।

তৈরি পোশাকের ধরন : বাংলাদেশের তৈরি পোশাকগুলো সাধারণত শার্ট, পাজামা, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, ল্যাবরেটরি কোট, গেঞ্জি, সোয়েটার, পুল ওভার, খেলাধুলার পোশাক, নাইট ড্রেস ইত্যাদি।

বেকার সমস্যা সমাধানে অবদান : পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বেকার সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে এ শিল্প নারীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। বর্তমানে পোশাক শিল্পে কর্মরত প্রায় ৮০ শতাংশই মহিলা শ্রমিক।

বিত্তহীন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা নারীরা তাদের শ্রম বিনিয়োগ করে এ শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখছে।

অন্যান্য অবদান : এ শিল্পের আমদানি-রপ্তানি কাজে ব্যবহারের জন্য পরিবহন খাত তার কার্যক্ষমতা প্রসারের সুযোগ লাভ করেছে। এ শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্যাংকগুলো লাভবান হচ্ছে এবং বীমা কোম্পানির প্রিমিয়াম বাড়ছে।

পোশাক শিল্পের সমস্যা : বাংলাদেশের পোশাক শিল্প যথেষ্ট সম্ভাবনা সৃষ্টি করলেও এ শিল্পকে কিছু সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এ শিল্পের জন্য বড় বাধাগুলো নিম্নরূপ–

অস্থিতিশীল রাজনীতি : দেশের অস্থিতিশীল রাজনীতি তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। হরতাল, অবরোধ ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কর্মসূচির জন্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করতে পারায় অর্ডার বাতিল হয়ে যায়। ফলে অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় পড়তে হয়।

দক্ষ শ্রমিকের অভাব : তৈরি পোশাক শিল্পের সিংহভাগই নারী শ্রমিক। নারী শ্রমিকের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব এবং পুরুষ শ্রমিকদের স্বল্পতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকায় পোশাক শিল্পের যথাযথ উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না।

কাঁচামালের অভাব : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পোশাকের কাঁচামাল বিদেশ থেকে কিনতে হয়। এতে বিরাট অঙ্কের অর্থ খরচ হয়ে যায়। অনেক সময় নিম্নমানের কাঁচামাল আমদানির ফলে তৈরি পোশাক বিক্রয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এতে বাজারের ক্ষতি হয়।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতা : পোশাক কারখানায় আগুন লেগে, পাদপিষ্ট হয়ে ও ভবন ধসে ২৩ বছরে (১৯৯০-২০১৩ সাল) ১,৫১৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে (বিজিএমইএ-র হিসাব অনুযায়ী)। তবে বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা আরও বেশি। এসব দুর্ঘটনার কারণে স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। এছাড়া নিরাপত্তার অভাবে অনেক নারী শ্রমিক এ পেশায় নিরুৎসাহিত হয়ে কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে। সরকারকে এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিকদের কম মজুরি : একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা– ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল লেবার অ্যান্ড হিউম্যান রাইট্স ২০১৩ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলেছে– বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের বেতন সবচেয়ে কম। ২৬টি দেশের পোশাক শ্রমিকেদের বেতন-কাঠামো জরিপ করে তারা এ তথ্য দিয়েছে। প্রতি ঘণ্টায় একজন মার্কিন শ্রমিক যেখানে পায় ৮-১৪ মার্কিন ডলার, সেখনে বাংলাদেশি শ্রমিক পায় মাত্র ০.২১ ডলার। চীনে এ হার ০.৯৩ ডলার, মালয়েশিয়ায় ০.৭৩ ডলার, ভারতে ০.৬৮ ডলার এবং পাকিস্তানে ০.৩৭ ডলার। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের মালিকগণ নিজেরা কম মুনাফা নিয়ে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা সহজেই বাড়াতে পারেন।

কোটা আরোপ : বিদেশি আমদানিকারকরা অনেক সময় আমদানির ওপর কোটা আরোপ করায় তৈরি পোশাক শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি দেশি-বিদেশি চক্রান্ত, হরতাল, ধর্মঘট, মিটিং-মিছিল, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, দুর্বল শিল্পনীতি ইত্যাদি কারণেও তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

সমস্যা সমাধানের উপায় : নানা প্রকার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। পোশাক শিল্পের সমস্যা সমাধানে নিম্নলিখিত উপায়গুলো বিবেচ্য হতে পারে। যেমন–

ক. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখা।

খ. নিয়মিত কাঁচামাল সরবরাহ করা।

গ. কাঁচামালের গুণগত মান সঠিক হওয়া।

ঘ. নিয়মিত বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করা।
ঙ. দ্রুত আমদানি ও রপ্তানির জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
চ. ইপিজেড-এর মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা।
ছ. দেশেই কাঁচামাল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।
জ. শ্রমিকদের জানমালের নিরাপত্তা এবং ন্যায্য বেতন-ভাতা নিশ্চিত করা।
ঝ. প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান করা।
ঞ. তৈরি পোশাকের উৎপাদন বৃদ্ধি ও চাহিদা সৃষ্টিতে সরকারের অধিকতর গুরুত্বারোপ।
ট. পোশাক শিল্পে কর্মরত নারীশ্রমিকদের কর্মস্থলে আসা-যাওয়া নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করা।

উপসংহার : পোশাক শিল্প আমাদের অর্থনীতির প্রাণ। বিশ্ববাজারে আমাদের তৈরি পোশাকের চাহিদা যথেষ্ট হারে বাড়ছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক বিশ্বে প্রচুর খ্যাতি ও প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। সুতরাং সকল ক্ষেত্রে আনুকূল্য পেলে তৈরি পোশাক শিল্প আরও সমৃদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জন্য অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে সক্ষম হবে– একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

৬৯ বাংলাদেশের কুটির শিল্প [ফা. প. ২০০৫]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের এক সময়ের সমৃদ্ধ শিল্প হলো কুটির শিল্প। শিল্পায়নে জাপানিদের একটা তত্ত্ব আছে, তা হলো Small is beautiful তথা ক্ষুদ্রই সুন্দর। জাপানের ব্যাপক শিল্পায়নে এ তত্ত্বটি খুবই কাজ দিয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন ও বিস্তারে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সর্বাধিক উপযোগী একটা ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রচলিত ছিল, এখনো আছে। এ দেশের কুটির শিল্প পণ্য মসলিন এককালে বিশ্ব বাণিজ্যের সেরা পণ্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল।

কুটির শিল্পের সংজ্ঞা : স্বল্প পুঁজি খাটিয়ে ঘরে বসে হাতের সাহায্যে যেসব দ্রব্য তৈরি বা উৎপন্ন করা হয়, তাকে কুটির শিল্প বা ক্ষুদ্র শিল্প বলা হয়। সাধারণত গ্রামের কৃষকরা অবসর সময়ে এসব কুটির শিল্প তৈরি করে।

কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য : কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–
ক. এর উৎপাদন খরচ কম।
খ. ফলে এর দামও কম থাকে।
গ. বড় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না।
ঘ. বৃহৎ শিল্পের মতো এগুলো ঝকঝকে তকতকে হয় না।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের ঐতিহ্য : বাংলাদেশের কুটিরশিল্পের খ্যাতি একসময় ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সুদূর ইউরোপেও সমাদৃত হয়েছিল। চীনের সম্রাট, বাগদাদের খলিফা, রোমের শাসকবর্গ বাংলার কুটিরশিল্পের সমাদর করতেন। ভারতবর্ষে দিল্লির বাদশাহ ও বাংলার নবাবরা ছিলেন মসলিনের সমঝদার। ঐতিহাসিক পিননীর বিবরণ থেকে জানা যায়। "রোম নগরীর অভিজাত সুন্দরীরা মসলিন পরিধান করতেন।" ব্রিটিশ শাসকরা এদেশের মসলিন শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কম মজুরি নিতে বাধ্য করতেন বলে একসময় তারা এ কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পসমূহ : বাংলাদেশে রয়েছে বিভিন্নমুখী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প। নিচে কতিপয় প্রধান প্রধান কুটির শিল্পের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো–

১। **তাঁত শিল্প :** তাঁত শিল্প বাংলাদেশে কুটির শিল্পের মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশে হস্তচালিত তাঁতশিল্পে শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, চাদর, তোয়ালে, গামছা, মশারি, প্রভৃতি

প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ হস্তচালিত তাঁত রয়েছে এবং প্রায় ১০ লাখ লোক এ শিল্পে নিয়োজিত।

বছরে এসব তাঁত শিল্প হতে প্রায় ৫০ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হয়ে থাকে। ঢাকা, টাঙ্গাইল, পাবনা, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, নরসিংদী, বাবুরহাট, ময়নামতি প্রভৃতি স্থান তাঁত শিল্পের বিশেষ কেন্দ্র।

২। **বেত ও বাঁশ শিল্প :** বাংলাদেশের সিলেট জেলায় বাঁশ ও বেতের সাহায্যে উন্নতমানের আসবাবপত্র, ঝুড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়। এছাড়া কুমিল্লার হুক্কা, নোয়াখালীর বাঁশের চাটাই ও সিলেটের শীতল পাটি বিখ্যাত।

৩। **কাঠ শিল্প :** নদীমাতৃক বাংলাদেশে বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বিভিন্ন প্রকার নৌকা হলো যাতায়াত ও পরিবহনের প্রধান উপায়। বাংলাদেশের বহুলোক নৌকা নির্মাণ কাজে নিয়োজিত। এছাড়া গৃহের আসবাবপত্র, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কুটির শিল্পের অবদান।

৪। **মৃৎশিল্প :** মৃৎশিল্প বাংলাদেশের সুপরিচিত কুটির শিল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম। কুমাররা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলস, বাসন, টব, মূর্তি, শিশুদের খেলনা, মেয়েদের বিভিন্ন রকম গহনা, চুড়ি, ইত্যাদি তৈরি করে। ঢাকার রায়ের বাজারের মৃৎশিল্প একসময় বিখ্যাত ছিল।

৫। **চামড়া শিল্প :** বাংলাদেশে বিভিন্ন অঞ্চলে জুতো তৈরির ছোট ছোট কারখানা রয়েছে। এছাড়া চামড়া হতে সুটকেস, মানিব্যাগ, হাতব্যাগ, বেল্ট ইত্যাদি তৈরি করা হয়। এ শিল্পে আমাদের দেশের বহুলোক নিয়োজিত রয়েছে।

৬। **ধাতব শিল্প :** থালা, বাসন, ট্রে, চামচ, ফুলদানি ও বিভিন্ন প্রকার গৃহস্থালি দ্রব্যাদি ধাতব শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, ফরিদপুর, ইসলামপুর বাসনপত্রের জন্য সুপরিচিত।

৭। **শঙ্খ ও ঝিনুক শিল্প :** বাংলাদেশের ঢাকা, রংপুর, যশোর প্রভৃতি স্থানে শঙ্খ, ঝিনুক, হস্তীদন্ত ও হাড় হতে বোতাম, মালা, আংটি, ছোট মূর্তি, চিরুনি, খেলনা ইত্যাদি দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এটি একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প এবং এসব শিল্পদ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

৮। **সাবান কারখানা :** কাপড় ধোয়ার সাবান বেশিরভাগই কুটির শিল্পে উৎপাদন করা হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহের কুটির শিল্পে প্রচুর সাবান প্রস্তুত করা হয়।

৯। **রেশম শিল্প :** রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা প্রভৃতি জেলায় রেশম চাষ হয়। কুমিল্লায়ও পরীক্ষামূলকভাবে রেশম চাষ শুরু হয়েছে। রেশম হতে শাড়ি, গায়ের চাদর প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

১০। **লবণ শিল্প :** বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানসমূহে সমুদ্রের লোনা পানি হতে কুটির শিল্পের মাধ্যমে লবণ তৈরি করা হয়। এদেশে বছরে প্রায় ২৫ লাখ মণ লবণ উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এছাড়া তামাক শিল্প, পাঠ শিল্প, বই বাঁধানো, অলঙ্কার তৈরি, মিষ্টি তৈরি, মধু সংগ্রহ, মাখন তৈরি, তেলের ঘানি, ধানভানা প্রভৃতি কুটির শিল্প বাংলাদেশের সর্বত্র দেখা যায়।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পের গুরুত্ব : বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। জাপানের মতো উন্নত দেশেও শতকরা ৮৫ জন শ্রমিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রের সাহায্যে শিল্পদ্রব্য তৈরি করে এবং সরকার সেগুলো ন্যায্য মূল্যে কিনে নেয়। আমাদের দেশে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে তা দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বল্প মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে কুটির শিল্পে মানসম্মত ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যের ধারক অনেক রপ্তানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। এর ফলে আত্মকর্মসংস্থান (Self employment) হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হতে পারে।

উপসংহার : স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কুটির শিল্প এক অনন্য শিল্প। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে যেমন শক্তিশালী করা সম্ভব, তেমনি বেকারত্ব হ্রাস এবং ভোক্তা শ্রেণিরও প্রভৃত কল্যাণ সাধন সম্ভব হবে। কারণ আমাদের দেশের কুটির শিল্প একদিন সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়–

বাংলার মসলিন বাগদাদ রোম চীন
কাঞ্চন তৌলেই কিনতেন একদিন।

৭০ বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প

অথবা, বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প ও সম্ভাবনা

উপস্থাপনা : মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনার নেশা মানুষের চিরন্তন। আবহমানকাল থেকেই মানুষ সুন্দরকে অবলোকন করতে দেশ-দেশান্তরে ছুটছে। সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষের এ অদম্য উৎসাহ থেকেই একদা পর্যটন শিল্পের জন্ম হয়েছিল। সেই থেকে আস্তে আস্তে পর্যটন শিল্প প্রসার লাভ করে। বাংলাদেশের বান্দরবান থেকে জৈন্তা, খাশিয়া সর্বত্রই আজ পর্যটন শিল্পের জয় জয়কার। এ পর্যটন শিল্প বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম উৎস।

পর্যটন শিল্প : পর্যটন বা ভ্রমণ আজ বিশ্বব্যাপী আলোচিত একটি শিল্পের নাম। সৌন্দর্যপিপাসু, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি এবং ব্যতিব্যস্ত ও কোলাহলমুখর দীর্ঘ কর্মজীবনে অতিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ অবসর সময়ে দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করে। ছুটে চলে বিশ্বের প্রান্তর থেকে প্রান্তরে। অবকাশ যাপন করে প্রাকৃতিক পরিবেশের নান্দনিক পরিবেশের কোলে। উপভোগ করে স্রষ্টার অনিন্দ্য সুন্দর জগতের রূপমাধুর্য। এ থেকেই গড়ে ওঠে পর্যটন শিল্প। পর্যটন শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলো এর মাধ্যমেই উপার্জন করে কোটি কোটি ডলার। উন্নয়নশীল দেশগুলোও এ শিল্পে সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য : বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপূর্ব নিকুঞ্জ। সবুজে ঘেরা বিস্তীর্ণ মাঠ, বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবন, বিশ্বসেরা সমুদ্র সৈকত, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম দৃশ্য, অতীত সভ্যতার নিদর্শন, অসংখ্য পুরাকীর্তি, স্থাপত্য, পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি বিশ্বের সৌন্দর্যপিপাসু মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। বাংলাদেশের এসব সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পর্যটন শিল্প।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প : বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশেও পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ UNWTO (United Nations World Tourism Organization)-এর সদস্যপদ লাভ করে। যার সদর দপ্তর স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত। বাংলাদেশে অসংখ্য পর্যটনের উপকরণ রয়েছে। এসব উপাদানের অবকাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করতে পারলে বাংলাদেশের পর্যটন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

বিনোদনমূলক শিল্পে পরিণত হবে এবং সারা বিশ্বের পর্যটকদের পদচারণায় এদেশ মুখরিত হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের স্থানসমূহ : বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। দিগন্তজোড়া সবুজের সমারোহ, শ্যামল-শোভন বন-বনানী, উঁচু-নিচু পাহাড়-পর্বত, সুকণ্ঠী পাখির কলকাকলী, দেশজোড়া রূপালি নদীর বিস্তার, ঋতুতে ঋতুতে রঙ-বেরঙের অপরূপ বর্ণিল শোভা– সব মিলে এ দেশ সৌন্দর্য মহিমায় অনন্য। যুগ যুগ ধরে বিদেশি পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ চির সবুজে ঘেরা এক স্বপ্নের দেশ হিসেবে পরিচিত। সপ্তম শতকে প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে এর সৌন্দর্যকে 'A sleeping beauty emerging fream mists and water.' অর্থাৎ কুয়াশা ও পানি থেকে উন্মোচিত ঘুমন্ত সৌন্দর্য হিসেবে বর্ণনা করেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি কেন্দ্র হিসেবে পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে বাংলাদেশে। বিস্তীর্ণ পাহাড়-পর্বত, বর্ণাঢ্য উপজাতি, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের অপরূপ লেক, পাল তোলা নৌকার অনুপম দৃশ্য, সবুজ-শ্যামল চা বাগান, প্রাগৈতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন প্রভৃতি এ দেশের পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ। দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীদের পর্যটন সুবিধা দিতে তাই সরকার এ দেশে গড়ে তুলেছে পর্যটন শিল্প। এ শিল্প নানা কারণে বিকশিত না হলেও এর ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান।

পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব এবং বাংলাদেশের অবস্থান : বর্তমানে পর্যটন শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিশ্বজুড়ে সাড়া জাগিয়েছে। বিশ্ববাণিজ্যের পাঁচ শতাংশ জুড়ে রয়েছে পর্যটন শিল্প। প্রতিবছর এ খাতে বিশ্বে মোট উপার্জন ১০০ মিলিয়ন ডলার। সারা বিশ্বের ১১ কোটিরও বেশি লোক এ পেশায় নিয়োজিত। এশিয়ার কয়েকটি দেশের আয়ের প্রধান উৎস পর্যটন। সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭০% আসে পর্যটন থেকে, তাইওয়ানের আসে ৬৫%, হংকং-এর ৫৫%, ফিলিপাইনের ৫০% এবং থাইল্যান্ডের ৩০%। বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে পর্যটন শিল্প ভূমিকা রাখছে। তবে তা প্রত্যাশার তুলনায় কম। এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান নড়বড়ে। ভারতে যেখানে এক বছরে ট্যুরিস্টদের সংখ্যা হয় প্রায় ২৩ লাখ, নেপালে ৪ লাখ, সেখানে বাংলাদেশে ট্যুরিস্ট আসে মাত্র দেড় লাখের মতো। এদেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে এ কর্পোরেশন তাদের কার্যালয়, হোটেল ও রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এদেশে পর্যটন শিল্প আশানুরূপ বিকাশ লাভ করছে না।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা : বাংলাদেশে পর্যটনের পর্যাপ্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও এদেশের পর্যটন শিল্পের বিকাশে নানারকম সমস্যা রয়েছে। পর্যটন শিল্পের নানারূপ সমস্যাগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো–

দুর্বল অবকাঠামো : পর্যটন শিল্পের প্রসারে আমাদের অবকাঠামোগত দুর্বলতা বাধাদান করছে। উন্নত রাস্তাঘাট ও অভিজাত হোটেলের অভাব। রাস্তাঘাট এত সংকীর্ণ ও পুরনো যে, পর্যটকরা যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। উন্নত হোটেল ও মোটেলের অভাবে এবং সেখানকার অবস্থার কারণে বিদেশি পর্যটকরা সব জায়গায় যেতে আগ্রহী হন না। বিদেশিদের প্রয়োজনকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য সরকার বা পর্যটন কর্পোরেশন তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে না।

রাজনৈতিক অস্থিরতা : বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশটির পর্যটন শিল্পের বিকাশে বাধাগ্রস্ত করছে। দেখা যায়, বছরের অনেক সময় হরতাল, ধর্মঘট, পরিবহন ধর্মঘট, ছাত্র আন্দোলন ইত্যাদি লেগেই থাকে। এ অস্থিরতাপূর্ণ পরিবেশে বিদেশিরা আসতে চায় না।

পর্যটকদের সুযোগ-সুবিধার অভাব : প্রশিক্ষিত ও সৎ জনবলের অভাবে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান ব্যাহত হচ্ছে। উন্নত ও সর্বাধুনিক হোটেল ও মোটেল এবং প্রশিক্ষিত গাইডের অভাবে তাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা হচ্ছে। সর্বোপরি আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে বিদেশি পর্যটকরা আকৃষ্ট হচ্ছে না।

নিরাপত্তার অভাব : আমাদের পর্যটন শিল্পের বড় সমস্যা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় পর্যটকদের নিরাপত্তার অভাব। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশি পর্যটকরা ছিনতাই, রাহাজানি এমনকি অপহরণ ও ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকেন। এতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় এবং বিদেশি পর্যটকরা এ দেশে আসতে ভয় পান। পার্বত্য এলাকায় ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের বিস্তার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিও বিদেশি পর্যটকদের বাংলাদেশে আসতে নিরুৎসাহিত করে।

সমস্যা সমাধানে করণীয় : বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের রয়েছে ব্যাপক সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারলে জাতীয় অর্থনীতিতে আমাদের পর্যটন শিল্প উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারবে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে আমাদের করণীয় হলো–

১। এ দেশের পর্যটন শিল্পকে বিকশিত করতে সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিতভাবে এর আধুনিকায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি অথবা যৌথ উদ্যোগে বিদ্যমান সমস্যাবলি চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি এ শিল্পের সাথে জড়িত সবাইকে উন্নত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

২। উন্নত হোটেল ও মোটেল তৈরি করতে হবে এবং সেখানে আন্তরিক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া এ শিল্পের প্রসারে প্রচার খুব জরুরি। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং দূতাবাসের মাধ্যমে আমাদের দর্শনীয় স্থান ও সেখানকার সুযোগ-সুবিধাগুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৩। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪। পর্যটকদের জন্য প্রশিক্ষিত, স্মার্ট, দোভাষী নিয়োগ, উন্নত সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের হোটেল ও রিসোর্ট গড়ে তোলা এবং পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে।

৫। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করে সেগুলো দেশি-বিদেশী পর্যটকদের কাছে নিরাপদ ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে পর্যটনের উৎকর্ষ সাধনের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে, রয়েছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, নৈসর্গিক দৃশ্য সবই পর্যটন শিল্পের অনুকূলে। এখন শুধু প্রয়োজন সুষ্ঠু বিনিয়োগ, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ এবং বাংলার নৈসর্গিক দৃশ্যগুলো বিশ্বের অনুসন্ধিৎসু পর্যটকদের গোচরীভূত করার পদক্ষেপ গ্রহণ। তবেই বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম উৎস হতে পারবে।

৭১ শ্রমের মর্যাদা
অথবা, ইসলামে শ্রমের মর্যাদা [ফা. প. ২০০৯]
অথবা, জাতীয় জীবনে শ্রমের গুরুত্ব

উপস্থাপনা : শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষী ভিরগিল বলেন– The dignity of labour makes a man self-confident and high ambitious. So, the evaluation of labour is essential.

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসেও পরিশ্রমের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। কারণ শ্রম ব্যতীত পৃথিবীতে কোনোকিছু অর্জন করা যায় না। আজকের এ সভ্যতা, বড় বড় অট্টালিকা, সেতু, কলকারখানা, রেলগাড়ি, বিমান ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের পরিশ্রমেরই ফল। তাই মানবজীবনে শ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম।

শ্রমের প্রয়োজনীয়তা : মানবজীবনে শ্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ শ্রম ব্যতীত পৃথিবীতে কোনোকিছুই অর্জন করা যায় না। শ্রম মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করে। বিশ্বে যে জাতি শ্রমকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে জাতি দ্রুত উন্নতির শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে শ্রমই একমাত্র সফলতার চাবিকাঠি।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রমের গুরুত্ব : কুরআন ও হাদিসে শ্রমের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (স) বলেছেন, "যে মানুষ যত বেশি কর্তব্যনিষ্ঠ তার সফলতা তত বেশি হয়।" মহানবি (স) শৈশবকাল থেকেই শ্রমপ্রিয় ছিলেন। তিনি শৈশবে চাচার ব্যবসায় পরিচালনার জন্য সিরিয়া যেতেন। পরে তিনি শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শ্রমের মাধ্যমে জগতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবি (স) বলেছেন– "শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকানোর আগেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"

পাশ্চাত্যে শ্রমের মর্যাদা : আমেরিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের উন্নতির মূলে রয়েছে তাদের পরিশ্রম। শ্রমকে তারা খুবই মূল্যায়ন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েও জুতা কালি করাকে তারা ছোট মনে করে না। তাদের স্লোগান হচ্ছে "পরিশ্রমের দ্বারা উন্নতি করো অথবা নিপাত যাও।"

ভাগ্য নির্মাণ ও প্রতিভা বিকাশে পরিশ্রম : মানুষ একদিকে যেমন সভ্যতার স্রষ্টা, অন্যদিকে সে আপন ভাগ্যেরও কারিগর। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই নির্মাণ করতে পারে শ্রমের মাধ্যমে। কারণ ভাগ্য নির্মাণের হাতিয়ার হলো পরিশ্রম। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে– God helps those who help themselves. অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করবে না, আল্লাহও তাকে সাহায্য করবে না। অন্যদিকে প্রত্যেক মানুষের মাঝে প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। মানুষ পরিশ্রমের মাধ্যমেই তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারে।

পরিশ্রমভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : মানুষ এ পৃথিবীতে সমাজ রচনা করেছে। সমাজের উন্নতির জন্য সবারই পরিশ্রম করা উচিত। কিন্তু সবার পক্ষে সমাজের সব কাজ করা সম্ভব নয়, তাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা পরিহার করার জন্য মানুষ সমাজের শ্রেণিবিভাগ করেছে। শ্রম সাধারণত দু'প্রকার। যথা–

ক. মানসিক শ্রম। খ. শারীরিক বা কায়িক শ্রম।

ক. **মানসিক শ্রম :** মানসিক শ্রম ব্যতীত মানসিক উন্নতি সম্ভব নয়। কথায় বলে– "অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা।" বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসাবিদ,

রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও শিল্পীর শ্রমই মূলত মানসিক শ্রম। তবে এদের এ মানসিক শ্রমকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে তারা কায়িক শ্রমও করে থাকেন।

খ. **শারীরিক শ্রম :** জগতের সকল জীবকেই বেঁচে থাকার জন্য মানসিক ও শারীরিক তথা কায়িক শ্রম করতে হয়। মানসিক শ্রম একটা কাজের সূচনা করে আর শারীরিক শ্রম তা সমাধা করে। চাষি, শ্রমিক, কুলি, মজুর এদের শ্রমই মূলত শারীরিক শ্রম।

বাংলাদেশে শ্রমের মর্যাদা : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কায়িক শ্রমের প্রতি আমাদের দেশের মানুষের এক ধরনের অবজ্ঞা ও ঘৃণা লক্ষ করা যায়। ফলে শিক্ষিত সমাজের একটা বিরাট অংশ কায়িক শ্রম থেকে দূরে সরে আছে। চরম বেকারত্ব ও আর্থিক অনটন সত্ত্বেও তারা কায়িক শ্রমবিমুখ। আর এ শ্রমবিমুখতার কারণেই আমরা আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছি।

জাতীয় জীবনে শ্রমের গুরুত্ব : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দক্ষকর্মীর হাতে পরিণত করতে পারলে তা সমস্যা না হয়ে বরং জনশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। যেমন– ১৪১ কোটি জনসংখ্যার দেশ চীন তার বিপুল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করেছে। তাই পৃথিবীর বুকে তারা আজ এত উন্নত। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন, "......a hard working street cleaner is better man than a lazy scholar. অর্থাৎ একজন পরিশ্রমী পরিচ্ছন্ন-কর্মী একজন অলস পণ্ডিতের চেয়েও ভালো। জাতীয় উন্নয়নে শ্রমের কোনো বিকল্প নেই। জাতীয় জীবনে শ্রমের গুরুত্বকে অস্বীকার করে বর্তমান প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় সভ্য ও আধুনিক মানুষ হয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

শ্রমশীল ব্যক্তির উদাহরণ : পৃথিবীর প্রখ্যাত ব্যক্তি ও মনীষীদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, তারা সকলেই পরিশ্রমী ছিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন, আইনস্টাইন-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (স) কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে সব কাজ করতেন। তিনি বলতেন, "নিজ হাতে নিজের কাজ করার মতো পবিত্র আর কিছুই নেই।"

শ্রমবিমুখতার পরিণাম : যারা অদৃষ্টবাদী, অলস ও শ্রমবিমুখ তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়। অভাব-অনটন, জরা-ব্যাধি হয় তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সম্পদ কিংবা সাফল্য এমনিতেই হস্তগত হয় না, নিরলস শ্রম আর সংগ্রাম করে অর্জন করতে হয়। যে জাতি অলস, কর্মবিমুখ তারা শিক্ষা ও সভ্যতায় অগ্রসর নয়। উন্নয়নের সোনার হরিণ তাদের কাছে কস্মিনকালেও ধরা দেয় না। বর্তমান সভ্য দুনিয়ায় যে দেশ এবং জাতি উন্নয়ন ও অগ্রগতির সোপান রচনা করেছে, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে নিরন্তর শ্রম ও সাধনার ইতিহাস। আলস্যে কালক্ষেপণ করলে তাদের ইতিহাসও রচিত হতো উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বদলে দারিদ্র্য এবং ব্যর্থতার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হয়ে।

উপসংহার : যুগের পর যুগ চলে গেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে গেছে, শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের ওপর শ্রমিক-দুনিয়ার মানুষ সভ্যতার বেদীমূলে অকাতরে তাদের শ্রম ঢেলে দিয়ে নীরবে কাজ করে এসেছে। কত রাজ্য-ভাঙাগড়া হয়ে গেছে, পৃথিবীতে ঘটেছে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন। কিন্তু বাংলাদেশের শ্রমিকরা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। আজ বিশ্বায়নের যুগে শ্রমিকদের স্বার্থ দিকে দিকে স্বীকৃতি লাভ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ কায়িক শ্রমকে আজও হীন দৃষ্টিতে দেখে। বেকার জীবনের অভিশাপে বিধ্বস্ত সম্ভাবনাময় তরুণ ও যুব সমাজ। এ অবস্থায় দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করতে হলে শ্রমের ও শ্রমিকের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে। প্রত্যেককে বিশ্বাস করতে হবে– "Man is the architect of his own fortune." অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার ভাগ্যনির্মাতা।

৭২ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

অথবা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : কারণ ও প্রতিকার [ফা. প. '০৭]

উপস্থাপনা : Henry Fayol বলেছেন– The increasing of price is a destructive sign in the constructive economy. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হলো– গঠনমূলক অর্থনীতিতে একটি ধ্বংসাত্মক প্রতীক।

বাংলাদেশের শতকরা আশি ভাগেরও বেশি লোকের জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। কারণ তাদের আয় কম। তাছাড়া দেশটি সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনসাধারণের জীবনকে করছে দুর্বিষহ। কালোবাজারি, মুনাফাখোর, মজুতদারি প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্যকলাপ সামাজিক পরিস্থিতিকে করে তুলেছে বিপর্যস্ত। আর তারই পরিণতিতে দ্রব্যমূল্য লাগামহীন ঘোড়ার মতো ছুটে চলেছে ঊর্ধ্বগতিতে। দ্রব্যমূল্যের এ লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি রোধ করার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দ্রব্যমূল্যের সাম্প্রতিক ঊর্ধ্বগতি : ২০০৩-০৪ অর্থবছরে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির যে ধারা শুরু হয়েছিল, বর্তমান সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত রয়েছে। গতকালের বাজারদরের সাথে আজকের বাজারদরের কোনো মিল পাওয়া যায় না। অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এখন দ্বিগুণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ঊর্ধ্বগতির ফলে জনজীবনে বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবনে নেমে এসেছে দুর্ভোগ। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে পড়েছে স্থবির।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ : যেসব কারণে সাধারণত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, নিচে তা আলোচনা করা হলো–

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** সারাবিশ্ব আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে ভারাক্রান্ত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সমস্যা আরও প্রকট। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্রতম দেশ। মাত্র ৫৬ হাজার বর্গমাইল আয়তনের এ দেশটিতে ১৬ কোটিরও বেশি লোকের বসবাস। আয়তনের তুলনায় এ জনসংখ্যা অনেক বেশি। প্রতিদিন মানুষ বাড়ছে, কমছে আবাদী জমির পরিমাণ। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে যে উৎপাদন হয়ে থাকে তা দিয়ে এ বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আর যোগানের চেয়ে চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় দ্রব্যমূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

২। **কৃষি উৎপাদন হ্রাস :** বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে কৃষি উৎপাদন না বেড়ে বরং হ্রাস পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আরেকটি কারণ হলো কৃষকরা সময়মতো বীজ, সার, কীটনাশকের মতো প্রয়োজনীয় সামগ্রী পায় না। তাছাড়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস করে থাকে। আর এ হ্রাসের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটতে বাধ্য। কৃষকরা অনেক সময় মৌসুমের আগে স্থানীয় সুদখোর, মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং তা ফসল তোলার সাথে সাথে পরিশোধ করতে হয়। এভাবে উৎপাদিত কৃষি ফসল সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হওয়ায় তা কৃষকের হাত থেকে মজুদদারের হাতে কুক্ষিগত হয়। যার ফলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে।

৩। **রাজনৈতিক অস্থিরতা :** অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মঘট, হরতাল, মারামারি, রাহাজানি ইত্যাদি কারণে একস্থান হতে অন্যস্থানে দ্রব্যসামগ্রী পরিবহণে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়; যা থেকে পরবর্তীতে পণ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী চাল, ডাল, শাকসবজি, মাছ, মাংস ইত্যাদির দাম বেড়ে যায়।

৪। **সামাজিক প্রতিযোগিতা :** Man is social animal. তাই সমাজে সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। মানুষের এ তাল মিলিয়ে চলার প্রবণতা থেকেই জন্ম নেয় প্রতিযোগিতা। প্রতিবেশীর ঘরে যে জিনিস আছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে তার চেয়ে বেশি দামে জিনিসপত্র ক্রয় করে বাহাদুরি দেখাবার মানসিকতা আমাদের সমাজে বিরল নয়। বিভিন্ন পারিবারিক উৎসব পাল্লা দিয়ে খরচ করার মনমানসিকতার সুযোগ ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করে থাকে। এভাবে প্রতিযোগিতার ফলে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে।

৫। **প্রশাসনিক দুর্নীতি :** বাংলাদেশে বর্তমানে প্রশাসনিক দুর্নীতি বিরল ঘটনা নয়। অবৈধ ও দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের চোখের সামনে দিয়ে অবৈধভাবে জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু প্রশাসন তা দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। তাছাড়া ঘুষ খেয়ে বা রাজনৈতিক কারণে এসব অবৈধ ব্যবসায়ীদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার নজিরও কম নয়। এভাবে নানামুখী দুর্নীতির ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

৬। **পরিবহনে চাঁদাবাজি :** এমনিতেই আমাদের দেশের অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে পরিবহন খরচ অনেক বেশি। তদুপরি ঘাটে ঘাটে সরকার ও বিরোধীদলীয় চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যের কারণে পরিবহন খরচ আরও বেশি পড়ে যায়। ফলে স্বাভাবিক কারণেই পণ্য বিক্রেতারা মূল্য বৃদ্ধি করে বাড়তি পরিবহন ব্যয় পুষিয়ে নেয়। এছাড়া শহরে ও গ্রামের হাট-বাজারে ছোটবড় সব ব্যবসায়ীকেই কমবেশি চাঁদা প্রদান করতে হয়, যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে।

৭। **আমদানি সমস্যা :** বাংলাদেশে অধিকাংশ জিনিসই দেশের চাহিদানুযায়ী উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই এসব জিনিস দেশের বাইরে থেকে আমদানি করে দেশের চাহিদা মেটানো হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝেমধ্যে এ আমদানিতে সমস্যা সৃষ্টি হলে বা আমদানি বন্ধ থাকলে জিনিসপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে যায়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিকার : আমাদের দেশের এ অনাকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আজ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। তাই শীঘ্রই এর প্রতিকার করা দরকার। প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে–

১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করে চাহিদার পরিমাণ কমাতে হবে এবং যোগান বাড়াতে হবে।

২। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্ভর করে। তাই রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে হবে।

৩। কালোবাজারি ও মজুদদারগণ বেশি লাভের আশায় দ্রব্যসামগ্রী মজুত করে রাখে এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটায়। তাদের বিরুদ্ধে সরকারিভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। দেশের যে-কোনো উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারি কর প্রদানের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থার সুযোগে অনেক সময় ব্যবসায়ী, উৎপাদক, সরবরাহকারিগণ দ্রব্যমূল্য করের তুলনায় অনেকগুণ বেশি বৃদ্ধি করে থাকে এবং বাজারে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে। এর বিরুদ্ধে সরকারিভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ দান, ভালো বীজ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় সার ও কীটনাশকের সহজপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৬। কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করে কৃষি সহায়ক উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

৭। কর ব্যবস্থা সহজীকরণ করতে হবে।

৮। চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিরোধ করতে হবে।

৯। প্রতিটি দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দ্রব্যমূল্যের তালিকা সরকারিভাবে প্রদান ও তা সংরক্ষণ এবং সে অনুসারে বেচাকেনা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দ্রব্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে প্রতিটি গ্রামে ও শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।

১১। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সরকারি উদ্যোগে ক্রয় করে সরকারি যানবাহনে শহরে সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে। এতে উৎপাদক কৃষক ও শহরের ক্রেতাশ্রেণি উভয়েই লাভবান হবে এবং এর ফলে দালাল, ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলুপ্তি ঘটবে ও দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাবে।

উপসংহার : যেসব কারণে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি ঘটে সে কারণগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে কঠোরভাবে প্রতিরোধ করতে পারলেই বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হবে এবং দ্রব্যসামগ্রী মানুষের কাঙ্ক্ষিত ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে।

৭৩ লোডশেডিং

অথবা, বিদ্যুৎ সংকট ও তার প্রতিকার

অথবা, প্রাত্যহিক জীবনে বিদ্যুতের গুরুত্ব ও লোডশেডিং

উপস্থাপনা : বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পর মাইকেল ফ্যারাডে বলেছিলেন– Electricity is itself a great power that could easily vibrate the whole universe. বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমান সভ্যতা অচল। কারণ বিদ্যুৎই আধুনিক সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে। কলকারখানা ও যানবাহন থেকে শুরু করে নিভৃত গৃহকোণ পর্যন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার বিস্তৃত। বিদ্যুৎ মানবজীবনকে সহজ, সুন্দর ও সুখময় করেছে। তাই বিদ্যুৎ না থাকলে মানবজীবনে সংকটের সৃষ্টি হয়। নিচে বিদ্যুৎ সংকট ও এর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হলো–

বিদ্যুৎ : বিদ্যুৎ একপ্রকার শক্তি। এ শক্তি যান্ত্রিক কলাকৌশলে এনে দিয়েছে সাফল্যজনক অধ্যায়। বিদ্যুৎ শক্তি হলো এ বৈজ্ঞানিক যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার। বৈজ্ঞানিক ভোল্টার বিদ্যুৎ শক্তি আবিষ্কার করে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।

লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ সংকট কী : লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ সংকট বলতে বোঝায় চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা এবং বিদ্যুৎপ্রাপ্তিতে নানামুখী অনিয়ম, হয়রানি ও দুর্নীতি। চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কম হলে দিন-রাতের কিছু সময় গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। একে বলা হয় লোডশেডিং। অন্যদিকে জরাজীর্ণ বিদ্যুৎ লাইন, দুর্ঘটনা, সংযোগপ্রাপ্তিতে হয়রানি, দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সংকট : বাংলাদেশে এক সময় বিদ্যুৎ সংকট খুব বেশি ছিল। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এ তীব্র বিদ্যুৎ ঘাটতি আমাদের জনজীবন বিপন্ন করে

তোলে। প্রাত্যহিক জীবনযাপন থেকে শুরু করে শিল্পোন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রেই মানুষ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো), ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) এবং জিসিবি–প্রতিটি সংস্থা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। ২০০৭ সালে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে সর্বোচ্চ ৩৮১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে এসব সংস্থা থেকে এবং ২০০৭-'০৮ অর্থবছরে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫২৬২ মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় এ পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল বলে লোডশেডিং আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯-এর তথ্য মতে বর্তমানে দেশের ৯৩ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিক্রিয়া : আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপন থেকে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যুৎ একটি অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষ ঘরবাড়ি আলোকিত করে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প-কারখানা পরিচালনা করে, পরিবারের গৃহস্থালি কাজকর্ম করে, কৃষকেরা জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে, শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। অপরদিকে বিদ্যুতের অভাবে শহর-নগর ভুতুড়ে পল্লিতে পরিণত হয়। অপহরণ ও ছিনতাই বৃদ্ধি পায়। লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। এতে সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

লোডশেডিং-এর কারণ : প্রধানত দুটি কারণে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকের আগমন কম এবং বিদেশি বিনিয়োগও আশানুরূপ নয়। এর প্রথমটি অস্থিতিশীল রাজনীতি, দ্বিতীয়টি হলো বিদ্যুৎ ঘাটতি। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য যেসব কারণ রয়েছে তা নিচে উপস্থাপন করা হলো–

প্রথমত, নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে মূলধন ও বিদেশি সাহায্যের অভাব। পুরনো কেন্দ্রগুলোও সময়মত মেরামত করা হয় না।

দ্বিতীয়ত, পানিবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচামালের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, সরকারের পরনির্ভরশীল মনোভাবও এর জন্য দায়ী।

চতুর্থ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও প্রশাসনিক জটিলতা।

পঞ্চমত, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ অপচয় করাও এর জন্য চরমভাবে দায়ী।

ষষ্ঠত, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের যোগসাজসে বিদ্যুৎ গ্রাহকরা কম বিল পরিশোধ করে বিধায় সরকারের এ খাতে রাজস্ব আয় কম এবং বিনিয়োগও কম।

বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে গৃহীত পদক্ষেপ : ঢাকা নগরীতে প্রথম বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো হয় ১৯০১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। তারপর শতাধিক বছর কেটে গেছে। ঢাকাসহ সারাদেশে জনসংখ্যা যেমন বেড়েছে, বিদ্যুতের চাহিদাও তেমনি বেড়েছে। এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সারা দেশে পর্যায়ক্রমে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। বাংলাদেশে গ্রিড কানেক্টেড বিদ্যুতের যাত্রা শুরু হয় ১৯১২ সালে। ১৯৩৩ সালে ডেভকো কোম্পানি ঢাকার পরিবাগে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে। এরপর ধারাবাহিকভাবে কর্ণফুলি বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৯৬২ সালে চট্টগ্রাম বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৯৮৬ সালে স্থাপন করা হয়। প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয় দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায়, হরিপুরে ২০১৩ সালে সরকারি খাতে দেশের বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দেশের বৃহত্তম সোলার বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয় সুনামগঞ্জের শাল্লা উপজেলায় ২০১৩ সালে। বেসরকারি খাতে স্থাপিত দেশের বৃহত্তম বিদ্যুকেন্দ্র মেঘনাঘাট বিদ্যুৎকেন্দ্র। দেশের প্রথম বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্পটি স্থাপিত হয় চট্টগ্রামের

মিরসরাই ও ফেনীর সোনাগাজীতে। ২০১৪ সালে চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ-চীন পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ-ভারত বিদ্যুৎ সঞ্চালন কেন্দ্র স্থাপিত হয় কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায়। ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ভারত ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। রামপালে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পূরক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ২০১৩ সালের ২০শে এপ্রিল।

বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিকার : বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক সময় উৎপাদন কেন্দ্রে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে নিয়মিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়। বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রতিকারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া প্রয়োজন :

১। নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন এবং সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করা।
২। উৎপাদিত বিদ্যুৎ যাতে অপচয় না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা।
৩। বিদ্যুৎ চুরি রোধ করা।
৪। একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দোকানপাট ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালু রাখা।
৫। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা।
৬। উৎপাদিত বিদ্যুৎ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা।
৭। দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করা।
৮। স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক মহলের কবল থেকে বিদ্যুৎ সেক্টরকে মুক্ত করা।
৯। ব্যাটারিচালিত অবৈধ রিকশা ও অটো-রিকশা নিষিদ্ধ করা ও অবৈধ সংযোগ নিয়ে হিটারে রান্নাবান্নার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা।

উপসংহার : আধুনিক সভ্যতার যুগে বিদ্যুতের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। মানবজীবনে বিদ্যুৎ দেয় সচলতা ও গতিশীলতা। আর লোডশেডিং দেয় গতিহীনতা। তাই সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কেননা বিদ্যুৎ ছাড়া উন্নত ও সভ্য জীবনের কল্পনা করা যায় না। Michael Farally বলেন– Electricity is the soul of civilization.

৭৪ যানজট [ফা. প. ১৯৯৯]

অথবা, ঢাকা শহরে যানজট

অথবা, ঢাকা শহরে যানজট ও নিরসন

উপস্থাপনা : জনবহুল দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি জনবহুল নগরী। ইতোমধ্যে ঢাকা মেগাসিটিতে পরিণত হয়েছে। জনবহুল এ নগরীতে নাগরিক জীবনের এক অস্বস্তিকর বিড়ম্বনার নাম যানজট। যানজট কথাটির অর্থ যানবাহনের জটলা বা গতিহীন গাড়ির ভীড়। এ যানজট আমাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময় কেড়ে নিয়ে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে এবং অপচয় করছে বিপুল অর্থের। নিচে যানজটের স্বরূপ, কারণ ও এর প্রতিকার উপস্থাপন করা হলো :

যানজটের স্বরূপ : নাগরিক জীবনের একটি বড় বিড়ম্বনার বিষয় হলো যানজট। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও বড় বড় কয়েকটি শহরে এ বিড়ম্বনা বেশি। বিশেষ করে ঢাকা শহর ও শহরের প্রবেশ মুখে যানজট প্রায়ই অসহনীয় হয়ে ওঠে। রাজধানীর ছোটবড় সকল রাস্তায় নানাপ্রকার যানবাহন এলোপাতাড়ি ছুটতে গিয়ে শৃঙ্খলা ঠিক রাখে না। মুহূর্তের মধ্যে চলার গতি থেমে যায়। অফিসগামীরা ঠিক সময় অফিসে পৌঁছতে পারে না।

শিক্ষার্থীরা যেতে পারে না স্কুল-কলেজ, মাদরাসায়। এমনকি মুমূর্ষু রোগীবহনকারী অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত আটকা পড়ে থাকে সিগন্যালের যানজটে। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষের প্রচুর শ্রমঘণ্টা পথেই নষ্ট হয়ে যায়। যা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

যানজটের কারণ : বাংলাদেশে যেসব কারণে যানজট সৃষ্টি হয়। তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে মেগাসিটি ঢাকায় বাস করে প্রায় দুই কোটি মানুষ। বর্ধিত মানুষের চাহিদা মেটাতে যানবাহনের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। সে তুলনায় রাস্তাঘাট খুবই অপর্যাপ্ত। তাছাড়া রাস্তাগুলো সংকীর্ণ, অনুন্নত এবং ভগ্নদশার। ফলে একই সাথে প্রচুর যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন দেখা দেয় এবং যানজটের সৃষ্টি হয়।

২। **যানবাহনের আধিক্য :** ঢাকা শহরে রাস্তার তুলনায় যানবাহন অনেক বেশি। এতবেশি যানবাহন একসাথে চলাচল করতে গিয়ে স্বাভাবিক কারণেই যানবাহনের জটলা লাগে। এছাড়া শহরগুলোতে রয়েছে অসংখ্য রিকশা যার বেশির ভাগই অবৈধ। রিকশার গতি খুবই কম। রিকশার জটলা দ্রুতগতির গাড়িকে রাস্তায় আটকে দেয়।

৩। **ভিন্নগতির যান চলাচল ব্যবস্থা :** দ্রুতগতি ও ধীরগতিসম্পন্ন যানবাহন একই সাথে রাস্তায় পাশাপাশি চলাচলের কারণে যানজট সৃষ্টি হয়।

৪। **ত্রুটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থা :** আমাদের দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। তাছাড়া ট্রাফিকরা অদক্ষ ও দায়িত্বহীন। তাদের অনেককেই রাস্তায় যান চলাচল সুষ্ঠু রাখার বদলে গল্প-গুজব ও ঘুষ আদায়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়।

৫। **রাস্তার ওপর দোকানপাট গড়ে ওঠা :** শহরের রাস্তাগুলোর দু'পাশের ফুটপাতে দেখা যায় দোকানপাট ও বাজার। পথচারীদের চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় ফুটওভারব্রীজ, ফুটপাত ও আন্ডারপাস নেই। তাই মানুষ রাস্তার মাঝখান দিয়ে পার হতে চেষ্টা করে। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

৬। **অপরিকল্পিত নগরায়ণ :** অপরিকল্পিতভাবে শহরের আবাসিক এলাকার বিস্তৃতিও যানজটের অন্যতম কারণ।

৭। **পার্কিং সুবিধার অভাব :** ঢাকা শহরে গাড়ি ও রিক্‌শা পার্কিং-এর তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই। ফলে রাস্তার পাশেই রিক্‌শা ও গাড়ি এলোপাতাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়। এতে রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে যান চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

৮। **ট্রাফিক আইন :** ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকা ও চালক কর্তৃক আইন অমান্য করার কারণে যানজট মারাত্মক আকার ধারণ করছে।

৯। **চালকদের অযৌক্তিক প্রতিযোগিতা :** রাস্তায় গাড়ি চালকদের অযৌক্তিক প্রতিযোগিতার কারণেও যানজটের সৃষ্টি হয়।

১০। **অনুন্নত রাস্তাঘাট :** শহরের রাস্তাগুলো অপ্রশস্ত ও অনুন্নত। সড়কগুলো মেরামত না করার কারণে পুরো রাস্তা জুড়ে গাড়ী চলতে পারে না। এছাড়া গাড়ির তুলনায় রাস্তা অনেক কম। এসব রাস্তা হাজার হাজার গাড়ি ধারণ করতে পারে না। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

১১। **সংস্কারমূলক কাজ :** ফ্লাইওভার নির্মাণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস-ওয়াসা ও অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজের সমন্বয় না থাকার কারণে একই রাস্তা বারবার খোঁড়া হয় এবং সেসব রাস্তা দীর্ঘ সময়েও মেরামত করা হয় না। ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়, পথচারীদেরও দুর্ভোগ বাড়ে।

১২। **ট্রাফিক নিয়ন্ত্রন :** প্রতিটি সড়কের মোড়ে অসংখ্য রিকশা ও অটো-রিকশা যাত্রীর অপেক্ষায় জটলা করে থাকে। এছাড়া বাস ও অন্যান্য যানবাহন থেকে দীর্ঘক্ষণ যাত্রী উঠানামা করে, ফলে সড়কের মোড়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

১৩। **যানবাহন চলাচলে শৃঙ্খলা আনয়ন :** স্বল্পগতি, মধ্যমগতি ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন চলাচলের জন্য সড়কে কোনো বিভাজন রেখা নেই। ফলে গাড়ির আগে রিকশা-ভ্যান ইত্যাদি সারা সড়ক জুড়ে চলাচল করে যানজটের সৃষ্টি করে।

১৪। **যানবাহন পার্কিং-এ অনিয়ম দূরীকরণ :** রাজধানীতে শত শত বাস ও প্রাইভেটকার কারো কোনো তোয়াক্কা না করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্কিং করে রাখা হয়। কিন্তু ট্রাফিকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ এদের ক্ষেত্রে রহস্যজনকভাবে নীরব ভূমিকা পালন করে থাকেন, যার ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়।

১৫। ঢাকার অনেক রাজপথ-ফুটপাতই হকারদের দখলে চলে গেছে। ফলে পথচারীরা ফুটপাতের পরিবর্তে রাজপথে চলাচল করে যানজট সৃষ্টি করে।

যানজট দূর করার উপায় : জনবহুল নগরী ঢাকাসহ বিভিন্ন নগরীর যানজট নিরসন করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া প্রয়োজন–

১। **পরিকল্পনা গ্রহণ :** ঢাকাসহ বিভিন্ন নগরীর যানজট সমস্যা দূর করার জন্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে অপরিকল্পিত ইমারত নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। রাস্তাগুলোর তালিকা তৈরি করে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাকে একমুখী চলাচল ব্যবস্থার অধীনে আনতে হবে।

২। **প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ :** রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো বেশ প্রশস্ত। কিন্তু আবাসিক এলাকার রাস্তাগুলো সংকীর্ণ। তাই যেসব রাস্তা প্রশস্ত করা সম্ভব সেগুলো প্রশস্ত করতে হবে।

৩। **যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন :** যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইন আরও কার্যকর করতে হবে। রাস্তার ধারণ ক্ষমতার অধিক যানবাহনকে চলাচলের ছাড়পত্র দেওয়া যাবে না। যানবাহনের নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া যত্রতত্র গাড়ি থামানো প্রতিহত করতে হবে। নির্দিষ্ট স্টপেজ ছাড়া যাত্রী ও মালামাল উঠানো নামানো বন্ধ করতে হবে। সিগন্যাল বাতি উপেক্ষা করে জটলা সৃষ্টিকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। **ট্রাক, লরি ও রিকশা নিয়ন্ত্রণ :** ঢাকা শহরের যানজটের অন্যতম কারণ হলো ট্রাক, লরি ও রিকশা। ট্রাক, লরি মালবহন ও খালাসের জন্য যে-কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে যানজটের সৃষ্টি করে। তাই কোনো অবস্থাতেই যেন ট্রাকগুলো রাত দশটার পূর্বে রাস্তায় চলাচল করতে না পারে তা লক্ষ রাখতে হবে। তাছাড়া লাইসেন্সবিহীন রিকশার দৌরাত্ম্য কমাতে হবে এবং পার্কিংস্থান ছাড়া যত্রতত্র যানবাহন পার্কিং বন্ধ করতে হবে।

৫। **দফতর স্থানান্তর :** যেসব সরকারি সংস্থা সরাসরি সরকারের যোগাযোগের আওতা বহির্ভূত, সেসব সংস্থাকে ঢাকার বাইরে স্থানান্তর করা হলে মানুষের চাপ কমবে এবং তা জানজট নিরসনে সহায়তা করবে।

৬। **ট্রাফিক পুলিশ :** যানবাহন নিয়ন্ত্রণকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ট্রাফিক পুলিশের অপ্রতুলতা দূর করতে হবে। ট্রাফিক পুলিশদের উন্নত প্রশিক্ষণ দান ও দায়িত্ব পালনে আরও সচেতন করে তুলতে হবে।

৭। **সমাবেশ মিছিল :** রাজনৈতিক দলগুলোর সমাবেশ মিছিলের জন্য রাজপথের পরিবর্তে স্বতন্ত্র মাঠ তৈরি করতে হবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকেও যানজট সৃষ্টি না করার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে হবে।

৮। **উড়াল পথ, ওভার ব্রীজ, পাতাল রেল ও পাতাল পথ নির্মাণ :** উন্নত বিশ্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ওভার ব্রীজ বা পাতাল পথ বা আন্ডারপাস সড়ক নির্মাণ করতে হবে।

৯। **নগরীর ফুটপাত ও রাজপথ হকারমুক্ত করা :** রাজধানীসহ বিভিন্ন শহর-নগরের রাজপথ ও ফুটপাতের বিশাল অংশ হকারদের দখলে রয়েছে। এর ফলে পথচারীরা ফুটপাত ছেড়ে রাজপথ দিয়ে হাঁটে এবং যানজটের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় সারি সারি গাড়ি ও রিকশা রাজপথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্কিং করে রাখা হয়। এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেও যানজটের সৃষ্টি হয়।

১০। **বৈষম্যপূর্ণ নীতি পরিহার :** সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ মেরামত এবং ট্রাফিক আইন বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈষম্যপূর্ণ নীতি পরিহার করতে হবে। দেখা গেছে, অভিজাত এলাকায় ও ভিআইপিদের ক্ষেত্রে এসব কাজে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

উপসংহার : কাঙ্ক্ষিত তিলোত্তমা নগরী ঢাকাকে একটি বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়তে হলে জরুরি ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক। ঢাকাসহ সকল শহরের সৌন্দর্য সংরক্ষণ এবং মানুষের দুর্গতি, কর্মঘণ্টা ও জ্বালানি সম্পদের অপচয় রোধ করার জন্য যানজট সমস্যা সমাধানের কোনো বিকল্প নেই।

৭৫ বঙ্গবন্ধু সেতু

উপস্থাপনা : বলা হয়- Bangladesh is a land of river. পদ্মা, যমুনা এদেশের দীর্ঘ স্থলপথকে বিভক্ত করেছে। বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী যমুনার ওপর নির্মিত হয়েছে এদেশের দীর্ঘতম ও বিশ্বের অন্যতম সেতু। যা 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নামে পরিচিত। এ সেতু বাস্তবায়নের ফলে দেশের পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট বলেন- The Jamuna Multifarious Bridge must go a long way to develop communication system in Bangladesh which benefits the whole world.

১। **বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ ইতিহাস :** একটি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি এবং স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন বঙ্গবন্ধু সেতু। বিশ্বের ১২তম এ সেতুটির নির্মাণের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। উন্নয়নের ভারসাম্য রক্ষা ও দেশের দু অংশের মাঝে সংযোগ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল দেশের মানুষ সেই ষাটের দশক থেকেই। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য যমুনা নদীর ওপর একটি সেতু তৈরির দাবি জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করে। ১৯৬৬ সালে এ দাবি মেনে নেয় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৬৯ সালে ব্রিটিশ পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান Freeman for and partner সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে একটি অনুকূল রিপোর্ট প্রদান করে। কিন্তু বিষয়টি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনজনিত কারণে চাপা পড়ে যায়। অতঃপর ১৯৭২ সালে জাপান সরকারের নিকট যমুনা সেতু প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং জাপানের সহযোগিতা প্রত্যাশা করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৬ সালে জাপানের Overseas Technical Co-operation Agency (OTCA)-এর কর্মকর্তা মি. ইশ হিয়ো কাওয়াসাকির নেতৃত্বে একটি সমীক্ষক দল বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণসহ একশ' কোটি ডলার ব্যয় হওয়ার সম্ভাব্যতার ওপর একটি রিপোর্ট দেয়। ১৯৮৪ সালে তদানীন্তন সরকার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮৫ সালে গঠিত হয় 'যমুনা সেতু' প্রকল্প। ১৯৮৭-৮৯ সালে ৪ লেনবিশিষ্ট সড়ক পথ এবং মিটার গেজ রেলপথসহ ৪ দশমিক ৮ কি.মি. দীর্ঘ

সেতুর অর্থনৈতিক ও কারিগরি সমীক্ষা চালানো হয় এবং চূড়ান্ত সমীক্ষায় বর্তমান নির্মাণস্থল নির্ধারণ করা হয়।

২। **সেতু নির্মাণ-ব্যয় :** বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সেতুটির নির্মাণ-ব্যয়ও সবচেয়ে বেশি। এ সেতুকে ৮টি কন্ট্রাক্টে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সর্বসাকুল্যে সেতুটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ৩৬০৩ দশমিক সাত কোটি টাকা বা ৬৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৩। **দাতাসংস্থা :** ১৯৯২ সালে একাধিক বৈঠকের পর নিম্নোক্ত দাতা সংস্থাগুলো শর্তসাপেক্ষে আর্থিক ঋণ দিতে সম্মত হয়।

1. IBRD (বিশ্বব্যাংক)– ২০০ মিলিয়ন ডলার।
2. ADB (এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক)– ২০০ মিলিয়ন ডলার।
3. OECF (জাপানের ওভারসিস ইকোনোমিক কোঅপারেশন)– ২০০ মিলিয়ন ডলার।

সর্বমোট ৬০০ মিলিয়ন ডলার। বাকি অর্থ বাংলাদেশ সরকার জোগান দিয়েছে।

৪। **দরপত্র আহ্বান ও নির্মাণ :** ১৯৯২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হয়। ১৯৯৪ সালে শুরু হয় স্বপ্নের বাস্তবায়ন। ১৯৯৪ সালের ১০ই এপ্রিল রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে সেতুর প্রকৃত নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রায় সাড়ে তিন দশক আগে যে স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল, তা ১৪০০ দিবসের কর্মসাধনায় যমুনার বুকে বাঁকা চাঁদের রূপ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বলা যায়, পাঁচটি সরকারের কৃতিত্ব মিশে আছে এর সাথে। তবে কৃতিত্বের বড় অংশ হলো সে সময়কার ১৫ কোটি বাংলাদেশির। ১৯৯৭ সালে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যমুনা সেতুর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু সেতু।' অতঃপর ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ স্বপ্নের সেতুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

৫। **এক নজরে বঙ্গবন্ধু সেতু :**

ক. সেতুর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কি. মি.
খ. সেতুর প্রস্থ ১৮.৫ মি.
গ. ভায়াডাক্টের দৈর্ঘ্য ১২৮ মি.
ঘ. স্প্যানের সংখ্যা ৪৯টি
ঙ. প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ৯৯.৩৭৫ মি.
চ. সড়ক লেনের সংখ্যা ৪টি
ছ. পূর্ব ও পশ্চিম তীরের গাইড বাঁধের দৈর্ঘ্য একই অর্থাৎ ২.২ কি. মি. করে।
পূর্ব ও পশ্চিম তীরের সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৫.৩ ও ১৪.৪ কি.মি.।
জ. সেতুর মোট প্রকল্প এলাকা ৭৮৭৯.৩৯ একর।

৬। **সেতুতে অন্যান্য ব্যবস্থাদি :**

ক. ডুয়েল গেজ রেল, খ. বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন, গ. গ্যাস সঞ্চালন লাইন, ঘ. টেলিযোগাযোগ লাইন।

৭। **অর্থনীতিতে বঙ্গবন্ধু সেতুর প্রভাব :** বঙ্গবন্ধু সেতু বাস্তবায়নে স্থায়ী যাতায়াত ব্যবস্থার ফলে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ে সুষ্ঠুভাবে যাত্রী ও মালামাল পারাপারসহ বিদ্যুৎ পরিবহন সহজতর হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তা গতি সঞ্চার করেছে।

৮। **জ্বালানির অপচয়রোধ :** বঙ্গবন্ধু সেতু একটি ভৌত অবকাঠামোমূলক প্রকল্প বিধায় শুধু যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনই আনছে না; বরং সেতু দিয়ে দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম আন্তঃসংযোগ বিদ্যুৎ লাইন ও গ্যাস সরবরাহের ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের

বিশাল এলাকায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। এতে বছরে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

৯। **পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা :** আন্তঃসংযোগ বিদ্যুৎ লাইন এবং প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের ফলে ওই সব অঞ্চলের জ্বালানি চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে, যা ব্যাপকভাবে বন উজাড় বন্ধ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কার্যকর সহায়তা করছে।

১০। **কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন :** বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। এতে করে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে বাজারজাত করা যাচ্ছে। ফলে কৃষক পাচ্ছে তার ফসলের ন্যায্য মূল্য। শিল্প মালিকগণ পাচ্ছে উৎপাদিত পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ সুবিধা।

১১। **বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি :** একটি দেশের বিনিয়োগের উপযোগী পরিবেশ বলতে বোঝায় সেখানকার রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং অবকাঠামোগত উন্নত সুযোগ-সুবিধা। অবকাঠামোগত সর্বাধিক সুবিধা নিশ্চিত করতে বঙ্গবন্ধু সেতুর বাস্তবায়ন ওই অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়নে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষিরা অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশুর খামারে বিনিয়োগ করতে উৎসাহ পাবেন। এ ছাড়া ওই অঞ্চলের মূল্যবান খনিজ সম্পদ আহরণে বিনিয়োগ বাড়বে।

১২। **স্থল বন্দরের উন্নয়ন :** উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী স্থল বন্দরগুলো বহুদিন যাবৎ চালু থাকলেও এগুলো অন্তহীন সমস্যায় জর্জরিত। যমুনা সেতু চালুর ফলে এসব বন্দরের কাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে নিঃসন্দেহে।

উপসংহার : বঙ্গবন্ধু সেতু একটি সাধারণ সংযোগ সেতুই নয়; এর সাথে জড়িয়ে আছে সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তীব্র আবেগানুভূতি। এ সেতু বহু অজানা সম্ভাবনার দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিকেও এই সেতু ত্বরান্বিত করেছে। সেতুটির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং এর যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা আমাদের সবারই দায়িত্ব।

৭৬ গণতন্ত্র চর্চা [ফা. প. ১৯৯৮]

অথবা, বাংলাদেশের গণতন্ত্র

উপস্থাপনা : বিংশ শতাব্দীর বর্তমান প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র একটি কাঙ্ক্ষিত ও জনপ্রিয় শব্দ। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে গণতন্ত্র চালু আছে। তাই এটি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় মতবাদ। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। নাম হয়েছে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'। অপ্রিয় হলেও সত্য এই যে, বাস্তবতার নিরিখে বাংলাদেশে গণতন্ত্র অদ্যাবধি পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

গণতন্ত্রের পরিচয় : গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy। এটি গ্রিক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ– জনগণ এবং Kratia অর্থ– শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy মানে জনগণের শাসন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন–

অধ্যাপক শেলী বলেন– Democracy is a government in which every one has a share.

C. F. Strong এর মতে, "শাসিতের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলে।"

গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিংকন বলেছেন– Democracy is a government of the people by the people and for the people.

গণতন্ত্রের ধরন : গণতন্ত্র সাধারণত দু'ধরনের হতে পারে। যথা– ১। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, ২। পরোক্ষ গণতন্ত্র।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র : যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমবেত ও প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। প্রাচীন গ্রিসে এ ধরনের গণতন্ত্র চালু ছিল।

পরোক্ষ গণতন্ত্র : যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করে এবং এ সকল প্রতিনিধি জনগণের পক্ষ হতে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাকে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলে। আমাদের দেশে এ ধরনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

গণতন্ত্রের গুণাবলি :

১। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ধনী, দরিদ্র, নারী, পুরুষ সবাইকে একই দৃষ্টিকোণ হতে দেখা হয়।
২। সকলের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।
৩। সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।
৪। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫। জনগণ ও সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।
৬। মানুষ হিসেবে সবাই প্রকৃত মর্যাদা লাভ করে।
৭। নাগরিকের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ বিদ্যমান থাকে।

গণতন্ত্রের ত্রুটি :

ক. জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ন হয়, তাহলে দেশ পরিচালনায় বিপত্তি দেখা দেয়।
খ. নির্বাচকমণ্ডলী ক্ষুদ্র স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠে বিত্তবান, অযোগ্য ও স্বার্থপর ব্যক্তিকে নির্বাচিত করলে গণতন্ত্র ব্যাহত হয়।
গ. অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অসচেতনতা এবং গণতন্ত্রের মর্ম উপলব্ধি না করার ফলে তাদের অধিকাংশ ভোটে অযোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
ঘ. কারচুপির নির্বাচনের মাধ্যমেও অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হয়ে গণতন্ত্র ব্যাহত করতে পারে।

গণতন্ত্রের সুফল : গণতন্ত্র এমন এক ধরনের সরকার যা জনগণের কল্যাণে জনগণ কর্তৃক পরিচালিত জনগণের জন্যই গঠিত হয়। তাই গণতন্ত্রের সুফল সুদূরপ্রসারী। গণতন্ত্রে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, দেশের সমৃদ্ধি সাধন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের সুযোগ-সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।

বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা : বাংলাদেশের মানুষ অধিকার আদায়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭৩-এর নির্বাচন, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলন এসবই গণতান্ত্রিক মানসিকতারই প্রতিফলন।

স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা শাণিত হচ্ছে। '৯০-এর দশকের স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের দিকে তাকালে গণতন্ত্রের চারাগাছ শাখা-প্রশাখায় ফুলে ফলে সুশোভিত হতে যাচ্ছে বলে আশার আলো পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ইতিহাস : ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর এদেশবাসী প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করেও তা বজায় রাখতে পারেনি। যার ফলে সৃষ্টি হয় স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। একপর্যায়ে জনগণের রায় উপেক্ষা করলে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু

হয়। কিন্তু গণতন্ত্রপ্রেমী জনগণ বসে থাকেনি। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন তারই সাক্ষী। এরপর ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালে জনগণ ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে আবার এ দেশে গণতন্ত্রের পথ চলা শুরু।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের রূপরেখা : ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু নির্ভেজাল গণতন্ত্র বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। রক্তে কেনা গণতন্ত্র মুখ থুবড়ে পড়ে। ব্যালটের পরিবর্তে বুলেট হয়ে পড়ে ক্ষমতার চাবিকাঠি। স্বাধীন মত প্রকাশের মাধ্যম ভোটব্যবস্থা হয় দারুণভাবে উপেক্ষিত। কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে না জনগণ। সুষ্ঠু নির্বাচন নির্বাসিত হয় বাংলাদেশের মাটি থেকে।

গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ : বাংলাদেশের মানুষ অধিকার আদায়ে বার বার সচেতন হয়ে উঠেছে। স্বৈরাচারী সরকারের অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত নড়ে ওঠে এ দেশের মানুষের স্লোগানে, সংগ্রামে। রাজপথে রক্ত ঝরে। সেই রক্তবীজের অঙ্কুর থেকেই গণতন্ত্রের বিজয়বৃক্ষ বেড়ে ওঠে।

বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ : বাংলাদেশের গণতন্ত্র অনেক রক্তে কেনা। কিন্তু অসংখ্য সমস্যা আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। অতীতের তিক্ত ও রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এ দেশের মানুষের অর্জিত গণতন্ত্রকে মর্যাদা দিতে হবে। যে-কোনো স্বৈরাচারী ও সুবিধাবাদী অশুভ শ্রেণির অপতৎপরতা রোধ করতে পারলে এ দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ আশাদীপ্ত।

অর্থ ও সন্ত্রাসের কবলে গণতন্ত্র : অপ্রিয় হলেও সত্য, বাংলাদেশে গণতন্ত্র আজ অর্থ ও সন্ত্রাসের কবলে জিম্মি হয়ে আছে। নির্বাচনের প্রাক্কালে অর্থের ছড়াছড়ি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, হত্যা, রাহাজানি, পেশীশক্তির দাপট, ব্যালট ডাকাতি ইত্যাদি গণতন্ত্রের বুকে ছুরিকাঘাত করে যাচ্ছে।

গণতন্ত্রের সফলতার উপায় :

প্রথমত : গণতন্ত্র সফল করতে হলে জনগণকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক মানসিকতা পোষণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত : গণতন্ত্র চর্চার জন্য জাতিকে সুশিক্ষিত করতে হবে।

তৃতীয়ত : আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি নির্বাচন সুষ্ঠু করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

চতুর্থত : জনগণসহ রাজনৈতিক দলগুলোকে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

পঞ্চমত : গঠনমূলক সমালোচনা ও পরমত সহিষ্ণুতা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য বিষয়।

উপসংহার : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার অনাবিল ও সুন্দর মাধ্যম। শুধু গণতন্ত্রের বুলি আওড়ালেই গণতন্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করা যাবে না; বরং এর জন্য চাই গণতন্ত্র চর্চা ও অনুশীলন। তাই আমাদের শাণিত উচ্চারণ হোক 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক।'

৭৭ বাংলাদেশে সন্ত্রাসী তৎপরতায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ

অথবা, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ

উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্বের আলোচিত অন্যতম একটি সমস্যা হলো সন্ত্রাসবাদ। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সন্ত্রাস একটি অতি পরিচিত পরিভাষা। নৈতিক অবক্ষয়ের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে সন্ত্রাস। এ নৈতিক অবক্ষয়ের সূত্রপাত তখনই হয়, যখন সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জোরদার হয়েছে। এর ফলে আমাদের গণতন্ত্র হয়ে পড়েছে হুমকীর সম্মুখীন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা : গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy। এ শব্দটি গ্রিক শব্দ Demos ও Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ– জনগণ। Kratia অর্থ– শাসন বা কর্তৃত্ব। সুতরাং Democracy বা গণতন্ত্রের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো জনগণের শাসন।
বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে–

ক. অধ্যাপক শেলী বলেন– Democracy is government in which every one has a share.

খ. C. F. Strong-এর মতে, "শাসিতের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলে।"

গ. গণতন্ত্র সম্পর্কে আব্রাহাম লিংকন বলেন– Democracy is a government of the people by the people and for the people.

মোটকথা, জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের নাম গণতন্ত্র। যেমন– প্রাণ ছাড়া প্রাণী হয় না, জনমত তথা জনগণের সার্বভৌমত্ব ছাড়াও তেমনি গণতন্ত্র হয় না। এটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি।

নৈতিক অবক্ষয় ও সন্ত্রাসবাদ : নৈতিক অবক্ষয় ও সন্ত্রাসবাদ একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূলত কোনো সমাজের একটি শ্রেণি যখন নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে, তখন তারা নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে নানাবিধ অন্যায় কর্মে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে। হত্যা, খুন, রাহাজানি, বোমাবাজি, এসিড নিক্ষেপ, বিমান হামলা, ছিনতাই ইত্যাদি সন্ত্রাসবাদী কাজ মূলত নৈতিক অবক্ষয়েরই ফল। মানুষের নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট হলে সে যে-কোনো অন্যায় কাজ করতে দ্বিধা করে না।

গণতন্ত্র ও সন্ত্রাসবাদ : সন্ত্রাসবাদ ও গণতন্ত্র দুটি পরস্পর বিরোধী পরিভাষা। গণতান্ত্রিক চেতনা কখনোই সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না; বরং সন্ত্রাসবাদকে ঘৃণা করে। পরধর্ম ও পরমতের প্রতি সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতিশীল মনোভাব গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসের তাণ্ডবলীলা : বর্তমানে বাংলাদেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম যেন রুটিন-ওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের এক বিরাট অংশ জুড়ে থাকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের খবর। ২০১২ সালের এক রিপোর্টে দেখা যায়, বছরের ১ম ছয় মাসে সারা দেশে ৫২৭টি গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটেছে। খুন হয়েছে দুই হাজার ৫১ জন। গড়ে প্রতিদিন খুনের ঘটনা ঘটে ১১টি। সেন্টার ফর মিডিয়া রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের (এমআরটি) ষাণ্মাসিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ছয় মাসে তিনজন সাংবাদিক নিহত ও ৮৪ জন আহত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে গুপ্তহত্যা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, সারাদেশে জানুয়ারি মাসে ৩৩৬, ফেব্রুয়ারিতে ২৭৬, মার্চে ৩৩৮, এপ্রিলে ৩২৪, মে মাসে ৩৬৮ ও জুনে ৪০৯টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। এ সময়ে খোদ রাজধানীতে খুনের ঘটনা ঘটেছে ১৬২টি। ছয় মাসে ৫২৭টি গুপ্তহত্যার মধ্যে জানুয়ারি মাসে ৩১, ফেব্রুয়ারিতে ৯০, মার্চে ৯৩, এপ্রিলে ৮৩, মে ১২৩ ও জুনে ১০৭টি গুপ্তহত্যার ঘটনা ঘটে। এমআরটি জানায়, পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যমতে গত ছয় মাসে সারা দেশে ধর্ষণের শিকার হয় ৪২৩ জন। যার মধ্যে ১৪৪ জন মহিলা ও ২৭৯ জন শিশু। তবে বাস্তবের চেয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংখ্যা অনেক কম। পুলিশের হিসাবে জানুয়ারি থেকে মে এই পাঁচ মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এক হাজার ৪৮৬ জন। এর মধ্যে জানুয়ারি মাসে ২৩৯, ফেব্রুয়ারিতে ২৬১, মার্চে ৩২৭, এপ্রিলে ৩০৪ ও মে মাসে ৩৫৫ জন। এছাড়া এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে ৫৪টি। যদিও একশ্রেণির যুবসমাজ প্রত্যক্ষভাবে এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে বলে দেখা যায়, তবে এদের পেছনে রয়েছে এক বিরাট স্বার্থান্বেষী মহল।

সন্ত্রাসের কারণ : এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের নানাবিধ কারণ রয়েছে। প্রথমত পিতামাতা তথা অভিভাবকমহলের দায়িত্বহীনতা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রভাব রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের মানসিকতা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, সর্বোপরি প্রশাসনের ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাস ও গণতন্ত্র : গণতন্ত্র মানুষকে আত্মসচেতনতা শেখায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধনী-গরিব সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত থাকে। কিন্তু সন্ত্রাস এসব মূলনীতির বিরুদ্ধে যেন এক বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলাদেশে আজ প্রতিদিনই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটছে। এ সন্ত্রাসবাদকে অচিরে না থামালে সমগ্র বাংলাদেশে অশান্তির আগুন লাগবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মা-বাবা সন্তানকে শিক্ষা অর্জনের জন্য পাঠিয়ে হত্যা-গুম আতঙ্কে দুঃস্বপ্নে দিন কাটাচ্ছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সন্ত্রাসের লীলাভূমি, দিনের পর দিন বন্ধ থাকছে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়; সেশন জটে আটকা পড়ছে শিক্ষার্থীদের মূল্যবান সময়, এসবকিছুর মূলে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীদের হাতে সাধারণ মানুষ জিম্মি, ঘর থেকে বের হলে আর ফিরতে পারবে কিনা, তা অনিশ্চিত। গণতন্ত্র চর্চার নেই কোনো অনুকূল পরিবেশ। এভাবে অব্যাহত সন্ত্রাস বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তুলেছে।

সন্ত্রাস দমন ও গণতন্ত্রের পুনর্জাগরণ : অব্যাহত সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বাংলাদেশের গণতন্ত্র হুমকির সম্মুখীন হলেও তা থেকে উত্তরণের পথ নিশ্চয় রয়েছে। সন্ত্রাসবাদের কারণ নির্ণয় করে তার মূলোৎপাটন করতে হবে। এজন্য দলমত নির্বিশেষে সবাইকে কাজ করতে হবে একযোগে। বাংলাদেশি জনগণ বীরের জাতি। সকল প্রকার সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মূলোৎপাটন করে গণতান্ত্রিক জাগরণের মানসিক শক্তি ও দৃঢ়তা তাদের রয়েছে।

উপসংহার : সন্ত্রাস বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য এক মারাত্মক হুমকি। এ হুমকি থেকে জনগণকে বাঁচাতে না পারলে সন্ত্রাসীদের হাতে দেশ জিম্মি হয়ে পড়বে এবং এ দেশের গণতন্ত্র কুঁকড়ে মরবে।

৭৮ ছাত্রসমাজ ও রাজনীতি [ফা. প. ২০০৮]

অথবা, দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা [ফা. প. ২০১০, '১৫, '১৭, '১৮]
অথবা, ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য
অথবা, জাতীয় জাগরণে ছাত্রসমাজের ভূমিকা
অথবা, ছাত্র রাজনীতি [ফা. প. ১৯৯৪, '৯৮]

উপস্থাপনা : "Student life is the important period of human life." উক্ত নীতির ভিত্তিতে একজন ছাত্র মানে একজন নাগরিক, একজন দেশপ্রেমিক, এ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। কেননা নিবিড় নিরলস জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে একজন ছাত্র তার জীবনকে তিলে তিলে গড়ে তোলে ভবিষ্যতের জন্য। দেশের ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে জাতিকে দেয় দিকনির্দেশনা। এজন্য দেশ ও জাতি গঠনে ছাত্রদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

রাজনীতির সংজ্ঞা : রাজনীতি বলতে বোঝায় দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনা বা তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক নীতি বা নীতিমালা। জাতীয় পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠার স্বার্থে রাজনীতি তার অজস্র প্রয়াস ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর এই সূত্রে ছাত্রজীবন থেকেই প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর রাজনীতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানলাভ প্রত্যাশিত ও বাঞ্ছনীয়।

ছাত্র রাজনীতির অতীত গৌরব : বাংলাদেশের গৌরবময় অতীত ছাত্র রাজনীতির উল্লেখযোগ্য প্রেক্ষাপটগুলো হলো ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬২ সালের হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ৬৬ সালের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন এবং ৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রদের ভূমিকা। বলা যায়, পরবর্তীতে ছাত্র রাজনীতির সুফলই হলো আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য : ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য হলো দেশ ও জাতি গঠন। প্রত্যেক ছাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য থাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাহিত্যিক বা সমাজকর্মী হওয়ার। তারা পরবর্তীতে লক্ষ্যে পৌঁছে দেশ ও জাতি গঠন করে থাকে। তাই ছাত্রজীবন থেকেই দেশ ও জাতি গঠনকেই ছাত্র রাজনীতির মূল লক্ষ্য নির্ধারণ করলে ছাত্র রাজনীতি দেশের জন্য সুফল বয়ে নিয়ে আসবে।

বর্তমান ছাত্রজীবন ও রাজনীতির ধারা : বাংলাদেশ তথা সারা বিশ্বের ছাত্রসমাজ আজ পঙ্কিল রাজনীতির দুষ্টবৃত্তে চোখবাঁধা কলুর বলদের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে এবং নোংরা রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে পড়ে অসংখ্য ছাত্রের জীবন-তরণী অকালে ধ্বংস হচ্ছে। ছাত্রজীবন বিদ্যার্জনের শ্রেষ্ঠ সময়। অথচ রাজনীতিবিদরা হীন স্বার্থে প্রচলিত রাজনীতির সাথে ছাত্রদের জড়িত করে অসংখ্য ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। বিদ্যার্জন ও রাজনীতি একসাথে কখনো করা যায় না। প্রতিটির জন্য পৃথক পৃথক সময় ও পরিবেশ রয়েছে। একসাথে করলেই তা ধ্বংস হবে এটাই বাস্তবতা।

ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস : রাজনৈতিক দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় আজ দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা, অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রতিনিয়ত লক্ষ করা যায়। হল দখল, টেণ্ডার, চাঁদাবাজী, প্রতিপক্ষের ওপর হামলা যেন নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতির আদর্শে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীই দেশপ্রেমিক। কিন্তু কতিপয় সন্ত্রাসী যুবকের উচ্ছৃঙ্খলতায় সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আজ জাতির বিবেককে হত্যা করছে। তাই বলা যায়–

বইয়ের বদলে অস্ত্র নিয়ে
যারা শিক্ষাঙ্গনে যায়
জাতি কি আর তাদের কাছে ভালো কিছু পায়?

ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য : বিদ্যার্জন করা ছাত্রদের প্রধানতম কর্তব্য। এছাড়াও চরিত্র গঠন, স্বাস্থ্য রক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, সময়নিষ্ঠা, গুরুভক্তি প্রভৃতি শিক্ষাও ছাত্রদের বিশেষ কর্তব্য। ছাত্রদের নৈতিক দায়িত্ব নিজেকে, নিজের পরিবারকে, দেশ ও জনগণকে সুখী-সুন্দর করে গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও ছাত্রদের অন্যান্য দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ–

ক. **সামাজিক উন্নয়ন :** সামাজিক উন্নয়নে ছাত্রসমাজের রুত্ব অপরিসীম। একজন ছাত্রের জন্য নিজেকে গঠনের পাশাপাশি তার পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখা অবশ্য কর্তব্য।

খ. **ইসলামি মূল্যবোধ :** জাতি গঠনের জন্য দেশের মানুষকে ইসলামের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অপরিহার্য। আর এ মহৎ দায়িত্ব ছাত্রসমাজই পালন করতে পারে। কেননা ছাত্রসমাজ ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও সাধারণ জনগণের মাঝে তা প্রচার করে ইসলামি মূল্যবোধ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারে।

গ. **রাজনৈতিক ক্ষেত্রে :** জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ছাত্র রাজনীতির কল্যাণমূলক ভূমিকাই আশাব্যঞ্জক। সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতিই জাতিকে সঠিক নেতৃত্ব উপহার দিতে পারে। আদর্শ ছাত্র রাজনীতি কখনো আত্মকেন্দ্রিক হয় না।

ঘ. **অর্থনৈতিক উন্নয়নে :** দেশের ভগ্ন অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধারে ছাত্রসমাজ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। পুঁজিবাদি অর্থনীতির রসাতল থেকে মুক্তির মাধ্যমেই সঠিক জাতি গঠনের স্বরূপ উন্মোচিত হতে পারে।

ঙ. **শিক্ষা বিস্তার :** নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার মহান দায়িত্ব ছাত্রদের। নিরক্ষর বয়স্ক লোক এবং বালক-বালিকাদের জন্য গ্রাম ও শহরের মহল্লায় জনগণের সহায়তায় নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে উচ্চশিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করলে দেশের নিরক্ষরতা দূর হতে পারে।

চ. **পল্লি উন্নয়ন :** পল্লি উন্নয়নে ছাত্রসমাজ বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ছুটিতে বা অবসর সময়ে তারা অশিক্ষিত কৃষকদেরকে কৃষিজ্ঞান প্রদান, স্বাস্থ্য ও অধিকার সচেতনতা ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে পল্লির উন্নয়ন করতে পারে।

ছ. **ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন :** ছাত্রসমাজকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা পরিহার করে পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্য বজায় রাখতে হবে। সংগঠন ও সমিতি স্থাপনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির ভাব গড়ে তুলতে ছাত্রদের সম্মিলিত প্রয়াস একান্ত প্রয়োজন। এতে দেশ ও জাতি শক্তিশালী হবে।

জ. **শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নতি বিধান :** ছাত্ররা পত্র-পত্রিকা, সভা-সমিতি ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে।

ঝ. **দেশসেবা :** দেশের দুরবস্থায় ছাত্রসমাজের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বন্যা, মহামারী ও দুর্ভিক্ষের সময় দেশের নিপীড়িত মানুষের সেবায় তাদের আত্মনিয়োগ করতে হবে।

ঞ. **জনসাধারণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা :** জাতি গঠনে ছাত্রসমাজের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হলো দেশবাসীকে দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগে উদ্বুদ্ধ করা। তারা দেশের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে দেশবাসীকে সম্যক ধারণা দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ছাত্রসমাজ অপরাজেয় শক্তি : ছাত্ররা তারুণ্য ও যৌবনের প্রতীক। তারুণ্য আর নবযৌবনের কাছে সকল বাধার প্রাচীর বালির বাঁধের মতো উড়ে যায়। বাংলাদেশ আজ স্বাধীন কিন্তু এই স্বাধীনতার পেছনে সেই '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান এবং '৭১-এর মুক্তি সংগ্রামে ছাত্রসমাজই সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, রক্ত দিয়েছে। '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অনন্য।

উপসংহার : উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে উন্নতি ও সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য এর সন্তানদেরকে অর্থাৎ দেশের ছাত্রসমাজকেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে। তরুণ ছাত্ররাই পারে দেশকে উন্নয়নের পথ দেখাতে এবং একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে।

৭৯ মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতা [ফা. প. ২০০৯]

উপস্থাপনা : মানুষ সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান জীব। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদি বিচার করার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই রয়েছে। মানুষ যেমন বুদ্ধির চর্চা করে গতিশীল জীবনের অধিকারী হতে পারে, তেমনি বিচার-বুদ্ধি জলাঞ্জলি দিয়ে তার চেতনাকে গহীন অন্ধকারে আবদ্ধ করতে পারে। প্রচলিত প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার বর্তমান যুগের তীক্ষ্ণ যুক্তি ও দীপ্ত জ্ঞানের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। মুক্তবুদ্ধি মানুষকে সত্যসন্ধানী করে সুন্দর জীবন গড়ার পথ দেখায়।

মুক্তবুদ্ধি : সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। মানুষের বিবেকের আবাহনই মুক্তবুদ্ধি। বিবেক যখন স্বাধীনভাবে কাজ করে, কোনো ভ্রান্ত সংস্কারকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে না, তখন মানুষ সত্যানুরাগী হয় এবং তার মধ্যে মুক্তবুদ্ধির চেতনা কাজ করে। ঐতিহ্যগতভাবে প্রাচীন সংস্কারের চলমান ধারার অচলায়তন ভেঙে যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসযোগ্য জীবনদর্শন আবিষ্কারের নামই মুক্তবুদ্ধি।

মুক্তবুদ্ধি ও সমাজ : আমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ সমাজ দ্রুত অগ্রসরমান পৃথিবীর সাথে সমান তালে গতিময় হতে পারেনি। তাই সমাজকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে হলে চাই মুক্তবুদ্ধির ব্যাপক চর্চা। কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর আমাদের সমাজের ওপর চেপে বসে আছে। এ পাথর সরাতে কিছু লোক মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে সমাজের একটি শ্রেণির কাছে মুক্তবুদ্ধির চর্চা অমার্জনীয় অপরাধ। অন্ধবিশ্বাসের ছায়ায় লালিত সমাজের অচলায়তন পার হয়ে আমরা নতুন সূর্যোদয়ে স্নাত হতে পারি না?

মুক্তবুদ্ধি ও ধর্ম : মুক্তবুদ্ধির চর্চার সাথে মাঝে মাঝে ধর্মীয় সংস্কারের চরম বিরোধ দেখা দেয়। মানুষ যখন উন্নয়নমূলক কোনো কাজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন নানারকম ধর্মীয় বিধিনিষেধ এসে তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় মানুষ যখন চাঁদে পৌঁছল, তখন এক শ্রেণির ধর্মান্ধ মানুষ এটা মেনে নিতে পারেনি। আর যারা বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে তাদেরকে ভ্রান্ত, অবিশ্বাসী বলে ঘোষণা করছে। "মানুষের জন্য ধর্ম, ধর্মের জন্য মানুষ নয়"–এ সহজ সত্যকে মেনে নিতে ধর্মান্ধ মানুষ নারাজ।

মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও লোকাচারের চোরাবালি : অন্ধবিশ্বাস আর লোকাচারের চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের চেতনার স্রোত, মুক্তবুদ্ধির ফল। আমরা ডিগ্রি অর্জন করি বুদ্ধি বিকাশের জন্য নয়, চাকরির জন্য। আমাদের চিন্তা-চেতনা ঢাকা পড়ে যায় দৈনন্দিন জীবনের চাহিদায়। ফলে আমরা যে তিমিরে আছি, যুগ যুগ ধরে সেই তিমিরেই থেকে যাচ্ছি। আচারসর্বস্ব এ সমাজের অচলায়তন ভেঙে আলোর জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারছি না।

মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রয়োজনীয়তা : আত্মার স্বকীয়তা অর্জন এবং জীবনকে গতিশীল করার জন্য মুক্তবুদ্ধির চর্চা একান্ত আবশ্যক। অন্ধ কুসংস্কারের মিথ্যা গলি থেকে মুক্ত হতে হলে, নিজ আত্মাকে স্বকীয় চিন্তা-চেতনায় সম্প্রসারিত করা দরকার। আর জাতীয় জীবনে এর অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারলেই আগামীর পথ হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।

মানসিক বৃত্তি বিকাশে মুক্তবুদ্ধির চর্চা : মুক্তবুদ্ধির চর্চা মানুষের চিন্তা-চেতনাকে সুন্দর করে, করে সমৃদ্ধ। এর বদৌলতে মানুষ সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসে। প্রেমপ্রীতি, ভালোবাসা ও করুণার পথে এসে কল্যাণের আহ্বান করে। এতে মনের দিগন্ত সম্প্রসারিত হয়, মানসিক বৃত্তি হয় বিকশিত, মানুষ পরমতসহিষ্ণু হয়।

মুক্তবুদ্ধির চর্চায় শিক্ষিত সমাজ : শিক্ষা মানুষকে আলোর পথে নিয়ে আসে। শিক্ষিত মানুষ বিবেকের চোখে সত্য ও সুন্দরকে খুঁজে নেয়। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে বর্তমানের সত্যকে অস্বীকার করার অর্থ জীবনের অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা। এজন্য শিক্ষিত সমাজকে মুক্তবুদ্ধির চর্চায় এগিয়ে আসতে হবে। যুক্তির আলোকে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার দীপ্ত প্রত্যয় নিয়ে শিক্ষিত সমাজকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে হবে।

উপসংহার : বুদ্ধিকে আবদ্ধ রেখে আত্মার আনন্দ ও মুক্তি অর্জন সম্ভব নয়। মুক্তমনের মাঝেই স্রষ্টা ও সৃষ্টিজগতের চরম সত্য এসে ধরা দেয়। সংকীর্ণ বাতায়নে বসে মনকে রুদ্ধ

করলে মনের মুক্তি ও সত্যোপলব্ধি বাধাগ্রস্ত হবে। তাই মুক্ত মন ও মুক্তবুদ্ধির ভেতর দিয়ে আমাদের দেহমনকে গড়ে তুলতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে দেশের সর্বত্রই মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও বিকাশের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৮০ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র

উপস্থাপনা : সংবাদপত্রকে বলা হয় কোনো দেশ ও সমাজের দর্পণ। কোন দেশ কতটা গণতান্ত্রিক, কতটা মানবিক, মানবাধিকার কোনো দেশ বা সমাজে কতটুকু স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত তা প্রতিফলিত হয় এ দর্পণে। সাংবাদিক ও কলামিস্টদের বলা হয় 'বিশ্বের চোখ ও কান'। বিভিন্ন দেশে একুশ শতকে এসে যারা সভ্যতার দর্পণ চূর্ণ করতে চায়, অন্ধ করতে চায় বিশ্বের চোখ, বন্ধ করতে চায় মানবজাতির কান, সহিংসতা ও হয়রানির মাধ্যমে স্তব্ধ করে দিতে চায় লেখক সাংবাদিকের কলম। তারা কে বা কারা তাও বিশ্ববাসীর অজানা নয়। তারা অতীতাশ্রয়ী ক্ষমতালোলুপ অন্ধকারের শক্তি।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সত্যের অকপট প্রকাশের স্বাধীনতা, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা, ক্ষুদ্র স্বার্থবোধের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ, জাতি, সমাজ ও মানবকল্যাণের আদর্শে লেখনী চালনার স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান স্তম্ভ।

গণতন্ত্র ও সংবাদপত্র : বর্তমান পৃথিবীতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক আদর্শের ব্যাপক প্রসার-বিস্তৃতি ঘটেছে। সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা আজ সভ্য সমাজের ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। গণতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ করার জন্য তাই প্রয়োজন সার্বিক উদ্যোগ। এ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবজনক।

সংক্ষেপে, গণদাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলীয় পর্যায়ে ঐকমত্য রচনায় সহায়তা করে, শাসন-প্রশাসনে সুষ্ঠু পরিবেশের গুরুত্ব তুলে ধরে সংবাদপত্র তার ভূমিকা পালন করতে পারে।

জনগণ ও সংবাদপত্র : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য জনগণ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বারবার পথে নেমেছে, মিছিল করেছে, উচ্চকণ্ঠে স্লোগান দিয়েছে। মিছিল আক্রান্ত হলে তারা জীবন দিয়েছে। গণতন্ত্রের আলো কিন্তু তারা দেখেনি। লাভ করেনি গণতন্ত্রের আস্বাদ। এ সমাজে গণতন্ত্র বারবার হোঁচট খেয়েছে নেতৃত্বের সংকটে, নেতৃত্বের কোন্দলে। নেতারা দল ভেঙেছেন। নতুন করে দল গড়েছেন। কেউ কেউ প্রথম সুযোগেই দলছুট হয়ে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন। আর জনগণ রাজপথে মিছিলের অগ্রভাগেই রয়ে গেলেন। জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জনগণের সাথে সাথে সংবাদপত্রও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

রাজনীতি ও সংবাদপত্র : ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত এবং যারা ক্ষমতায় যেতে চান, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃতি, প্রয়োগপদ্ধতি ব্যর্থ হলে ক্ষমতার হস্তান্তর, এমনকি ব্যর্থতার নিদর্শন সম্পর্কে তাদের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। এ ঐকমত্যই গণতান্ত্রিক সমাজের মৌল বৈশিষ্ট্য। শুধু তাই নয়, জাতীয় পর্যায়ে মৌল সমস্যা সম্পর্কে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে থাকতে হবে এক ধরনের ঐকমত্য। জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপরেখা, শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে থাকে ঐকমত্য। গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্ষেত্রে সংবাদপত্র এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি সাফল্য যেমন সংবাদপত্রে হেডলাইন রচনা করবে, সরকারের ব্যর্থতাও তেমনি সংবাদপত্রে হেডলাইন রচনা করবে। সংবাদপত্র শুধু প্রভাবশালী ব্যক্তি বা অধিপতি শ্রেণির মুখপত্র নয়; বঞ্চিত এবং অসহায়দেরও মুখপত্র। সেজন্য গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক স্বার্থের

উর্ধ্বে থাকতে হবে সংবাদপত্রের ভূমিকা। সংবাদপত্রের বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতীয় নেতৃত্বকে মনোযোগী করতে পারে ক্ষীণ স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থে কাজ করতে।

সামাজিক মূল্যবোধ সংরক্ষণে এবং সমাজে গণতান্ত্রিক কৃষ্টির বিকাশেও সংবাদপত্র বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। সামাজিক রুচিবোধ সংরক্ষণ করতে, মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করতে সাংবাদিকদের কলম অরুচির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ছড়ায়, কদর্যতা ও অপসংস্কৃতির নগ্নতা প্রকাশ করে।

রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র : আজ যারা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না, কাল হয়তো তারাই যাবে জনগণের কাছাকাছি। তাই গণতন্ত্রে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে পার্থক্য শুধু সময়ের এবং সুযোগের। বিরোধী দল তার বিকল্পনীতি ও কর্মসূচি প্রচার করে এবং সরকারের কার্যক্রমের গঠনমূলক সমালোচনা করেই জনগণের কাছাকাছি আসতে পারে। তাই সরকারের সমালোচনা গণতন্ত্রে স্বীকৃত এক পন্থা। কিন্তু সমালোচনার ভাব, ভাষা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন দলের মধ্যে থাকতে হয় এক ধরনের ঐকমত্য। ঐকমত্যের অভাবে সমালোচনার স্রোতে ভেসে যেতে পারে সামাজিক সূচিতা, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক পর্যায়ের শ্রদ্ধাবোধ। সংবাদপত্র এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সরকার ও সংবাদপত্র : সরকারি কার্যক্রমের প্রকৃতি ও সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব প্রকাশ করে সংবাদপত্র এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন আইনের শাসন। এ লক্ষ্যে তাই কোনো দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে আইনের প্রতি আনুগত্য বাড়াতে হবে। সংবাদপত্র আমাদের সমাজের এ প্রবণতা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করতে পারে।

সাংবাদিক ও সংবাদপত্র : সাংবাদিকরা তাদের ভূমিকা পালন করেন অনেক সময় লিখে, কোনো কোনো সময় না লিখে, প্রতিবাদে। দেশে সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিকদের স্বাধীনতা কতটুকু? পেশার ওপর রয়েছে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ওপর? অনেকক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান এবং কর্মকর্তাদের সম্পর্ক সম্মানজনক নয়, নেই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো যেমন বিচরণ করে এক স্বীকৃত সীমারেখার মধ্যে, সংবাদপত্রগুলোকেও চলতে হয় অনুমোদিত পন্থায়। এ দেশে সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকরা বহুবার এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। ১৯৭১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বহু পত্রিকা অফিসে হামলা হয়েছে। সাংবাদিকদের হত্যা করা হয়েছে। সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সত্য প্রকাশের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তবে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান থাকলে, শ্রদ্ধাবোধ থাকলে উভয়ের সমন্বিত প্রচেষ্টায় গণতন্ত্রের বিকাশে কার্যকর ভূমিকা রাখা সংবাদপত্রের পক্ষে সহজ হয়। টমাস জেফারসন বলেছেন, "যখন কেউ জাতীয় দায়িত্ব লাভ করে, তখন তাকে জাতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে হবে।"

সংবাদপত্র ও অপসাংবাদিকতা : সংবাদপত্র অনেক সময় দেশ-বিদেশের শত্রুদের স্বার্থ রক্ষার্থে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ও জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এসব বিষয়ে সংবাদপত্রের পাঠক, সরকার ও বিরোধী দল সর্বোপরি জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে।

উপসংহার : গণতন্ত্রের জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কোনো বিকল্প নেই। গণতন্ত্রের মূলভিত্তি হলো জনগণ। আর জনগণের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও আশার প্রতিফলন ঘটে সংবাদপত্রে। তাই গণতন্ত্রকে সুদৃঢ় ও বিকাশমান রাখতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিষয়টি সবাইকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৮১ উন্নয়নশীল বিশ্বে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

উপস্থাপনা : মুক্তবুদ্ধিচর্চা ও চিন্তার স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার। একমাত্র মানুষেরই বিচারক্ষমতা রয়েছে। কোনো মানুষ যখন এ বিচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বা কোনো সংস্কারের নিকট মাথা নত করে অথবা স্বেচ্ছাচারিতার যূপকাষ্ঠে বিবেককে বলি দেয় তখন তার চেতনা গতিহীন হয়ে পড়ে, বন্দি হয়ে কারাগারে পড়ে থাকে। মুক্তবুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতায় কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করা মানে জাতির বিবেককে ধ্বংস করা। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির চর্চা নিশ্চিত করতে চাই স্বাধীন গণমাধ্যম। কেননা গণমাধ্যমের দ্বারাই চিন্তার স্বাধীনতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয়।

উন্নয়নশীল বিশ্ব : উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত যে দেশগুলো এখনো অনুন্নত বা উন্নয়নের পথে রয়েছে সেসব দেশকে বোঝায়। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলো উন্নত বিশ্বের দেশগুলো দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল প্রভৃতি দেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত।

গণমাধ্যম : ইংরেজি 'Mass Media'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'গণমাধ্যম।' একই সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমকে গণমাধ্যম বলা হয়। গণমাধ্যমকে জনসংযোগের উপায় হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, যে মাধ্যম দ্বারা জনগণ কোনোপ্রকার সংকোচ ও দ্বিধা ছাড়াই নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারে তা-ই গণমাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে জনপ্রিয় গণমাধ্যম হলো– রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও চলচ্চিত্র। মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার-ইন্টারনেটও বর্তমানে গৌণ গণমাধ্যম হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। গণমাধ্যমের ভূমিকা এত ব্যাপক ও জোরালো যে, তা বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়সহ সকল বিষয় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে গণমাধ্যম : সমাজে গণমাধ্যমের বিভিন্ন ধারার প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। গণমানুষের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন ও জনমত গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। বর্তমান অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে (Free Flow of Information) যে কোনো দেশেই নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াসহ সকল ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছানোর জন্য দ্রুত জনমত তৈরি এবং সহজে নীতি-নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণের সহজ উপায় হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের পরিধি ব্যাপক হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত অবস্থানজনিত কারণে গণমাধ্যমে নতুন সংযোজন প্রক্রিয়ার গতি খুবই শ্লথ। সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন এ তিনটিই উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রধান গণমাধ্যম।

সংবাদপত্র : উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রধান গণমাধ্যম হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেভাবে জনমত প্রকাশ করা যায় অন্য কোনো উপায়ে তা সম্ভবপর হয় না। উন্নয়নশীল বিশ্বে সংবাদপত্র সমাজের সামগ্রিক পরিচয়ের একটি প্রাত্যহিক দলিল। সংবাদপত্রের মাধ্যমেই উন্নয়নশীল বিশ্ব উন্নত বিশ্বকে অবলোকন করে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার চর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

বেতার : বেতারকে গণমাধ্যমের 'সেতুবন্ধ' বলা হয়। বেতার উন্নয়নশীল বিশ্বের গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম। উন্নয়নশীল বিশ্বে কোনো প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা জনগণের দ্বারপ্রান্তে সহজে পৌছে দিতে বেতার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এ গণমাধ্যম তৃণমূল স্তর থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেতার

জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এ মাধ্যম জনগণের প্রায়োগিক সিদ্ধান্তকে অধিকতর সর্বজনীন করে তোলে।

টেলিভিশন : জনমত গঠনে টেলিভিশনের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। কোনো বিষয়ে জনমত গঠনের জন্য টেলিভিশনে প্রচারণা চালানো হলে তা সহজেই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উন্নয়নশীল বিশ্বে টেলিভিশন গণমাধ্যমের অন্যতম মোহনীয় দিক। এটি বিভিন্ন অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করে। উন্নয়নশীল বিশ্বে কোনো প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা জনগণের দ্বারপ্রান্তে সহজে পৌছাতে বেতারের মতো টেলিভিশনও অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশসমূহে টেলিভিশন জনমত গঠনে সর্বাত্মক সাহায্য করে।

উন্নয়নশীল বিশ্বে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা : সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন– এ তিনটিই মূলত উন্নয়নশীল বিশ্বের গণমাধ্যম। অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে গণতন্ত্রের চর্চা এখনো তেমনভাবে বিকাশলাভ করেনি। তাই সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমকে যেমন দেখা যায় ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে, তেমনি বেসরকারি গণমাধ্যমের মালিকারা নিজেদের স্বার্থে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে। প্রকৃত অর্থে এ গণমাধ্যমই উন্নয়নশীল বিশ্বের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করে। সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে উন্নয়নের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। উন্নয়নশীল বিশ্বের মানুষ এখনো পুরানো ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত। তাই তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এজন্য প্রয়োজন সেকেলে ধ্যান-ধারণা পরিহার করে গণমাধ্যমের বহুল ব্যবহার এবং স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা : সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার এক অপরিহার্য অঙ্গ। উন্নয়নশীল বিশ্বে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আশানুরূপ নয়। এখানে ক্ষমতাসীনরা স্বীয় স্বার্থে সংবাদপত্রের ওপর আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে বারবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ন করছে। সামান্য কোনো বিষয়েই সংবাদপত্রের প্রকাশনা বাতিল করার মতো নিন্দনীয় আইন এখনো উন্নয়নশীল বিশ্বে লক্ষ করা যায়। কখনো অপ-সাংবাদিকতা হলে সেক্ষেত্রে প্রচলিত আইন রয়েছে– প্রেস কাউন্সিল এক্ষেত্রে সেই সাংবাদিক বা পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু তা না করে সাংবাদিক হত্যা, নির্যাতন ও বিভিন্নভাবে তাদের হুমকি প্রদানও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। বর্তমানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারমুক্ত হতে পারেনি। তাই উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যতম গণমাধ্যম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বেতারের স্বাধীনতা : উন্নয়নশীল বিশ্বে বেতার পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারেনি। তাই বেতারের মাধ্যমে জনমত গঠন প্রক্রিয়াটি উন্নয়নশীল বিশ্বে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বর্তমানকাল পর্যন্ত উন্নয়নশীল বিশ্বে বেতার নিজস্ব পরিকল্পনা প্রয়োগ করতে পারেনি। এ প্রেক্ষাপটে, উন্নয়নশীল বিশ্বে বেতারের স্বাধীনতা তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরি।

টেলিভিশনের স্বাধীনতা : উন্নয়নশীল বিশ্বে টেলিভিশন একটি জনপ্রিয় ও শক্তিশালী গণমাধ্যম। টেলিভিশনের মাধ্যমে পৃথিবীর সকল স্থানের খবর শ্রবণ ও তথ্যচিত্র অবলোকন করা যায়। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বে এর স্বাধীনতার ক্ষেত্র যেমন সীমাবদ্ধ তেমনি দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগণের কাছে এই মাধ্যমটি এখনো সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি। সংবাদপত্রের মতো বর্তমানে উন্নয়নশীল বিশ্বে টেলিভিশনের স্বাধীনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে তা এখনো পুরোপুরি প্রভাবমুক্ত হয়নি।

উপসংহার : গণমাধ্যম হচ্ছে মানুষের পরোক্ষ শিক্ষক। গণমাধ্যম ন্যায়নিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে জাতি তথা সমাজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের পথ যেমন দেখাতে পারে, তেমনি উন্নতির জন্য যুক্তিসঙ্গত সুপারিশও করতে পারে। অর্থাৎ গণমাধ্যম সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতে পারে। সুতরাং উন্নয়নশীল বিশ্বকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

৮২ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

অথবা, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের অবদান [ফা. প. ২০০৬]

উপস্থাপনা : দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করার জন্যই ৮ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা অর্থাৎ SAARC-এর জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্বে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। আর এ প্রয়োজনীয়তা থেকেই SAARC-এর মতো আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সৃষ্টি। নিচে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো :

সার্কের নামকরণ : দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী সাতটি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত সংস্থার নাম ছিল SARC, পরবর্তীতে প্রথম সম্মেলনে নেপালের বীর বিক্রম শাহদেব SARC-এর নাম পরিবর্তন করে SAARC অর্থাৎ South Asian Association for Regional Co-operation বা দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা রাখার প্রস্তাব করেন এবং তখন থেকেই এর নাম হয় SAARC।

সার্কের সদস্য রাষ্ট্র : সার্কের ত্রয়োদশ সম্মেলন পর্যন্ত সার্ক-এর সদস্য ছিল ৭টি দেশ। কিন্তু এ সম্মেলনে আফগানিস্তানকে সার্ক-এর সদস্যপদ দেওয়ায় এর সদস্য এখন দাঁড়িয়েছে ৮টি– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। আফগানিস্তান ৩ এপ্রিল ২০০৭ সার্কের সদস্যপদ লাভ করে।

SAARC প্রতিষ্ঠার পটভূমি : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রথম SAARC গঠনের উদ্যোগ নেন। ১৯৮০ সালের মে মাসে তিনি দক্ষিণ এশিয়ার ৭টি সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানের কাছে একটি আঞ্চলিক সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেন। এ লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে ২১-২৩ এপ্রিল শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় ৭টি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে সম্মেলন হয়। ১৯৮৩ সালের আগস্টে তারা পুনরায় আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হন। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে সার্কের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

সার্কের মূলনীতি : সার্কের মূলনীতিগুলো হলো–

১। এ সংস্থার সিদ্ধান্তগুলো সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবে।
২। দ্বি-পক্ষীয় বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলো সংস্থায় তোলা যাবে না।
৩। আঞ্চলিক অখণ্ডতা, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার নীতি এবং পারস্পরিক লাভালাভের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার নীতিকে সহযোগিতা করতে হবে।
৪। এ অঞ্চলের দেশগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ রেখে SAARC ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো–

১। দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ১৭০ কোটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন।
২। এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারা ত্বরান্বিত করা।

৩। এ অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের সাধারণ স্বার্থে সহানুভূতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
৪। অন্যান্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন।

সার্কের সাংগঠনিক কাঠামো : সার্ক গঠনের প্রাক্কালে এর সনদে পাঁচ-স্তরবিশিষ্ট কাঠামোর উল্লেখ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে–

১। রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন।
২। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন।
৩। স্ট্যান্ডিং কমিটি।
৪। টেকনিক্যাল কমিটি।
৫। সার্ক সচিবালয়।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলনসমূহ : নিচে সার্কের শীর্ষ সম্মেলনসমূহ ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–

সম্মেলন	অনুষ্ঠানের তারিখ	স্থান	চেয়ারম্যান
প্রথম	৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	এইচ এম এরশাদ
দ্বিতীয়	১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৮৬	ব্যাঙ্গালোর, ভারত	রাজীব গান্ধী
তৃতীয়	২-৪ নভেম্বর ১৯৮৭	কাঠমান্ডু, নেপাল	রাজা বীরেন্দ্র বীরবিক্রম শাহ দেব
চতুর্থ	২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	বেনজির ভুট্টো
পঞ্চম	২১-২৩ নভেম্বর ১৯৯০	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম
ষষ্ঠ	২১-২২ ডিসেম্বর ১৯৯১	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা	রানাসিংহে প্রেমাদাসা
সপ্তম	১০-১১ এপ্রিল ১৯৯৩	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
অষ্টম	২-৪ মে ১৯৯৫	নয়াদিল্লি, ভারত	নরসীমা রাও
নবম	(১২-১৪) মে ১৯৯৭	মালে, মালদ্বীপ	মামুন আবদুল গাইয়ুম
দশম	(২৯-৩১) জুলাই ১৯৯৮	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা	চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা
একাদশ	(৪-৬) জানুয়ারি ২০০২	কাঠমান্ডু, নেপাল	শের বাহাদুর দেউবা
দ্বাদশ	৪-৬ জানুয়ারি ২০০৪	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	মীর জাফরুল্লাহ খান জামালি
ত্রয়োদশ	১২-১৩ নভেম্বর ২০০৫	ঢাকা, বাংলাদেশ	বেগম খালেদা জিয়া
চতুর্দশ	৩-৪ এপ্রিল ২০০৭	নয়াদিল্লি, ভারত	ড. মনমোহন সিং
পঞ্চদশ	২-৩ আগস্ট ২০০৮	কলম্বো, শ্রীলঙ্কা	মহেন্দ্র রাজা পাকসে
ষোড়শ	২৮-২৯ এপ্রিল ২০১০	থিম্পু, ভুটান	জিগমে ওয়াই থিনলে
সপ্তদশ	১০-১১ নভেম্বর ২০১১	আদ্দু সিটি, মালদ্বীপ	মোহাম্মদ ওয়াহিদ হাসান
অষ্টাদশ	২৬-২৭ নভেম্বর ২০১৪	নেপাল	সুশীল কৈরালা
উনবিংশ	নভেম্বর ২০১৬ হওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক সমস্যার কারণে তা হয়নি।	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান	

সার্কভুক্ত দেশসমূহের জ্যামিতিক ও অন্যান্য তথ্য

দেশের নাম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার%	সাক্ষরতার হার	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	গড় আয়ু	সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়
বাংলাদেশ	১৬.৩৭ কোটি	১.৩৭	৭২.৩	১,৯০৯	৭২	মুসলিম (৮৯.৮%)
শ্রীলংকা	২.১০ কোটি	*০.৫	৯১	১১,৩২৬	৭৫.৫	বৌদ্ধ (৬৯.৩%)

দেশের নাম	জনসংখ্যা	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার%	সাক্ষরতার হার	মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	গড় আয়ু	সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়
ভারত	*১৩৫.৪১ কোটি	১.২	৬৯	৬,৩৫৩	৬৮.৮	হিন্দু (৭৯.৫%)
পাকিস্তান	২০.০৮ কোটি	২.০	৫৬	৫,৩১১	৬৬.৬	
নেপাল	২.৯৬ কোটি	১.১	৬০	২,৪৭১	৭০.৬	হিন্দু (৮০.৭%)
ভুটান	৮লাখ	১.৪	৫৭	৮,০৬৫	৭০.৬	বৌদ্ধ (৭৪.৭%)
মালদ্বীপ	*৪লাখ	২.৫	*৯৮.৪	*১৩,৫৬৭	*৭৭.৬	মুসলিম (৯৮.৪%)
আফগানিস্তান	৩.৬৪ কোটি	*২.৯	*৩২	*১,৮২৪	*৬৪	*মুসলিম (৯৯.৭%)

সার্কভুক্ত দেশসমূহের মোটসংখ্যা ১৮১ কোটি ৭৬ লাখ।

* মার্ক করা সূচকসমূহ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন নির্দেশ করে।

সার্কের সাফল্য ও অবদান

১। **পারস্পরিক সহযোগিতা :** সার্কের বিবিধ অর্জনের অন্যতম হলো আন্তঃদেশীয় বিভিন্ন ব্যাপারে সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ এ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন– ১। কৃষি, ২। স্বাস্থ্য ও জনসেবা, ৩। আবহাওয়া, ৪। ডাকসেবা, ৫। মাদকদ্রব্যের পাচার ও ব্যবহার রোধ, ৬। পল্লি উন্নয়ন, ৭। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ৮। ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি, ৯। টেলি যোগাযোগ, ১০। যাতায়াত ও যানবাহন, ১১। নারী-উন্নয়ন, ১২। অডিও-ভিজ্যুয়াল বিনিময়, ১৩। সংগঠিত পর্যটন, ১৪। ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র, ১৫। ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ, ১৬। দারিদ্র্য বিমোচন, ১৭। পরিবেশ, ১৮। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, ১৯। যুব স্বেচ্ছাসেবক বিনিময়, ২০। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয় ও ২১। এনজিও বিষয়ক।

২। **শত কোটি মানুষের অভিন্ন প্লাটফর্ম :** সার্কভুক্ত দেশসমূহের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৮২ কোটি এবং তা বিশ্বের সর্বমোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশি। সার্ক এই ১৮২ কোটি মানুষের এক অভিন্ন প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের জন্য এটি সেতুবন্ধের ভূমিকা পালন করে। এর ফলে এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাইকে একে অপরের কাছাকাছি আসার সুযোগ করে দিয়েছে।

৩। **সন্ত্রাস ও মাদক নিয়ন্ত্রণে অভিন্ন কর্মপন্থা :** সার্ক সদস্য দেশসমূহ সন্ত্রাস দমন, মাদক ও চোরাচালান রোধে অভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। এটি কার্যকর হলে সদস্যভুক্ত বিভিন্ন দেশের সন্ত্রাস, মাদক ও চোরাচালান ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। ফলে দেশসমূহের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পর্যায়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৪। **আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ও সম্প্রচার বৃদ্ধি :** সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সম্প্রচার বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। SAARC Audio-Visual বিনিময় কার্যক্রমের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ নিয়ন্ত্রিতভাবে তাদের রেডিও এবং টেলিভিশন

প্রোগ্রাম বিনিময় করে আসছে। ১৯৮৯ সাল হতে বিভিন্ন স্লোগান নিয়ে সার্কবর্ষ পালিত হচ্ছে। এর ফলে রাজনৈতিক বৈরিতাপূর্ণ এ অঞ্চলে একটি সহনীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

৫। **নাগরিক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি :** SAARC-এর আরও একটি বড় অথচ অদৃশ্যমান সাফল্য হলো People to people relation-এর জন্য একটি আইনগত বা নৈতিক কাঠামো প্রদান। ত্রয়োদশ সার্ক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে ১১ নভেম্বর '০৫ সাংবাদিক ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে গঠিত হয়েছে সার্ক চেম্বার অব কমার্সসহ নানা প্রতিষ্ঠান। সার্ক আইনজীবী ফোরাম, সার্ক শিক্ষক ফোরাম ও সার্ক ইয়ুথ ফোরাম গঠিত হয়েছে। এখন ছাত্ররা নিয়মিতভাবে সার্ক ট্যুর-এ যাচ্ছে। অবাধ ভিসা প্রথা প্রবর্তিত হলে গণসম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটবে। SAARC Parliamentary Forum গঠনের কথা চলছে। এটি হলে বড় রকমের একটি কাজ হবে। তবে ইতোমধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে এরকম প্রথার বিনিময়, পেশাজীবী শ্রেণি এবং সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা শুভ সূচনার কাজ করছে।

৬। **দারিদ্র্য বিমোচনে সার্ক :** সার্কভুক্ত দেশসমূহ ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০% দারিদ্র্য বিমোচনের অভিন্ন কৌশলপত্র গ্রহণ করেছে। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত এ সিদ্ধান্তকে অনেকে উচ্চাভিলাষী বলে আখ্যায়িত করলেও সার্কভুক্ত দেশসমূহ এক্ষেত্রে আশাব্যঞ্জক সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যা ২০০৮ সালের ৪৫.৮৬%-এর তুলনায় ২০১০ সালে ৩১.৫% নেমে আসে এবং বর্তমানে (২০১৯) তা ২২%-এ নেমে এসেছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত অভিন্ন এজেন্ডাগুলো গৃহীত হয়–

ক. সার্ক আঞ্চলিক তহবিল গঠন। খ. দুর্যোগ মোকাবেলা।
গ. দারিদ্র্যমোচন কৌশল। ঘ. সন্ত্রাস দমন।
ঙ. মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৭। **অভিন্ন অর্থনৈতিক জোট :** সার্ক দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলাতন্ত্র ও সুশীল সমাজ অন্তত একটি Agenda-তে সোচ্চার। তাহলো অভিন্ন অর্থনৈতিক জোট। এক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে করণীয় হচ্ছে SAFTA-এর বাস্তবায়ন। যা সুগম করার জন্য এক বৈঠকে চারটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এগুলো হলো–

১। শুল্ক সহযোগিতা। ২। দ্বৈত কর পরিহার।
৩। বিনিময় উন্নয়ন। ৪। আরবিট্রেশন বা বিপদ-নিষ্পত্তি।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলনে একই সাথে শিল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য তথা মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্যাবলি প্রাধান্য পেয়েছে। এ লক্ষ্যে দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন তহবিল (SADF) গঠিত হয়েছে। এতে পাঁচ মিলিয়ন ডলার জমা হয়েছে। ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আরও তিনশ মিলিয়ন ডলার সংগৃহীত হয়েছে। এসব অর্থের পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ, বিস্তারিত নীতি ও কৌশল অনুমোদিত হয়েছে।

৮। **সার্কের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা :** দক্ষিণ এশিয়াভিত্তিক সংগঠন সার্ক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। সার্কের সাফল্যে পৃথিবীর অনেক উন্নত রাষ্ট্র এর সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। সার্কের সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশকারী দেশসমূহের মধ্যে চীন, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য। ইতোমধ্যে চীনকে ডায়ালগ পার্টনার করা হয়েছে।

৯। **কৃষি ও আবহাওয়া গবেষণা সহযোগিতা :** কৃষির উন্নয়ন এবং আবহাওয়া গবেষণায় তথ্য বিনিময় সহযোগিতার লক্ষ্যে সার্ক বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র বা SAARC Agricultural Information Centre (SAIC), সার্ক টিউবারকিউলোসিস সেন্টার বা SAARC Tuberculasis Centre (STC), সার্ক ডকুমেন্টশন সেন্টার বা SAARC Documentation Centre (SDC), সার্ক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র বা SAARC Meta Research Centre (SMRC) ইত্যাদি সংস্থা গঠিত হয়। এসব সংস্থার মাধ্যমে এতদঞ্চলে উল্লিখিত বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

১০। **সার্কের সীমাবদ্ধতা :** আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সার্ক অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ আন্তর্জাতিক সংগঠন হলেও এর সাফল্য খুবই সীমিত। সার্ক রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ পুরোপুরি খোলামন নিয়ে কখনো মিলিত হতে পারেননি বলে অনেকে মনে করেন। বস্তুত ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব ও উভয়ের মনস্তাত্ত্বিক লড়াই এবং ভারতের বিগ ব্রাদারসুলভ মনোভাবের কারণে সম্ভাবনাময় সার্ক বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। সার্কের সীমাবদ্ধতার আরও কতিপয় দিক হলো–

ক. সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের অবনতি।
খ. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চুক্তি বাস্তবায়নে অনীহা।
গ. SAARC Charter-এর সীমাবদ্ধতা।
ঘ. কার্যকর উদ্যোগের অভাব।

উপসংহার : বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০% বাস করে দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত সার্ক রাষ্ট্রসমূহে। তাই বিশ্বকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করতে অভিন্ন কৌশলপত্রের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত আঞ্চলিক Food Bank প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবেই দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক সার্ক বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মডেলে পরিণত হতে পারে।

৮৩ মানবাধিকার ও বর্তমান বিশ্ব

অথবা, বিশ্বে মানবাধিকার

উপস্থাপনা : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'অধিকার' একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। বিশ্বের ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের কাছে মানবাধিকার একটি সুপরিচিত বিষয়। প্রত্যেক মানুষকে মানুষ হিসেবে জীবনযাপন করতে হলে যেসব অধিকার নিয়ে বাঁচতে হয় বা জীবনযাপন করতে হয়, তাকে মানবাধিকার বলে। মানবাধিকার বিশ্বজুড়ে সর্বজনীন ঘোষণার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সভ্যতার এ চরম উৎকর্ষের যুগেও বিশ্বে লাগামহীনভাবে মানববাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশে শক্তিধর রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় যুদ্ধের স্টিম রোলারের নিচে পড়ে মানবতা আজ নীরবে নিভৃতে কাঁদছে।

মানবাধিকারের পরিচয় : সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষের যে অধিকার তা-ই মানবাধিকার। মানুষের মৌলিক অধিকার তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার অধিকার মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য বাস্তবতার আলোকে দেখা যায়, মানবাধিকার বিষয়টি আপেক্ষিক। এটি দেশ, কাল, পাত্র ইত্যাদির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক দেশের জন্য যা মানবাধিকার, অন্য দেশের জন্য তা মানবাধিকার নয়। আর এ ব্যাপারটিই মানবাধিকারের সংজ্ঞা প্রণয়নে জটিলতার সৃষ্টি করেছে।

জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার : ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। উক্ত ঘোষণায় মানুষের যেসব মৌলিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে, সেগুলো হলো-

১। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নারী, পুরুষ, ভাষা, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতবাদ, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য মর্যাদা নির্বিশেষে মৌলিক অধিকার বা স্বাধিকারে স্বত্ববান।

২। সকল মানুষের জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার সংরক্ষিত।

৩। কোনো মানুষকে নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা অমানবিক আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

৪। আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান গণ্য হবে।

৫। সকল মানুষের চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার আছে।

৬। কোনো ব্যক্তিকে তার সম্পদ, সম্পত্তির অধিকার থেকে ইচ্ছেমতো উচ্ছেদ বা বঞ্চিত করা যাবে না।

৭। প্রত্যেকেরই জাতীয়তার অধিকার বর্তমান।

মানবাধিকারের ইতিকথা : মানবাধিকারের প্রাচীনতম ধারণার পরিচয় পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব দুইহাজার বছরেরও আগে, পৃথিবীর প্রাচীনতম আইন সংকলন ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির নিয়মাবলিতে। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে মানবাধিকারের মূর্তপ্রতীক বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স) কর্তৃক প্রণীত 'মদিনা সনদ'-এ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমঅধিকারের পূর্ণ স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এছাড়াও মানবাধিকার ধারণার অভিব্যক্তি ঘটেছে রুশো, হুগো, জন লক, কার্ল মার্কস প্রমুখ মহামনীষীদের রচনায়। সাধারণত মানবাধিকারের প্রথম চার্টার বলা হয় ১২১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রণীত 'ম্যাগনাকার্টাকে'। পরবর্তীকালে ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত আমেরিকার 'স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র', ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রণীত ফরাসি বিপ্লবের মানবাধিকার সনদ এবং ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লবের বাণী মানবাধিকার আন্দোলনের একেকটি মাইলফলক। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাটিতে মোট ৩০টি ধারা রয়েছে। তন্মধ্যে ১৯টি ধারা নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত এবং ৬টি ধারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত।

ইসলামে মানবতাবাদ : বলা হয় Islam is the complete code of life. মানবতার ধর্ম ইসলাম। তাই আইয়্যামে জাহেলিয়ার অন্ধকার যুগে লুণ্ঠিত মানবতার মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছিলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি আরব ভূখণ্ডে সকল জাতির সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন, ফলে সেখানে মুসলিম-অমুসলিম সকলেরই শান্তিতে বসবাসের অধিকার নিশ্চিত ছিল। যে আদর্শে আজ বিভিন্ন দেশে ইসলামি শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই বলা যায়, ইসলাম মানবতার ধর্ম, মানবের সকল অধিকার ও ধর্ম নিশ্চিত করেছে ইসলাম।

মানবাধিকার ও বর্তমান বিশ্ব : পশ্চিমা বিশ্বই বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকারের স্বঘোষিত ধারকবাহক। আর পশ্চিমা বিশ্বের তথা গোটা বিশ্বের মানবাধিকারের ধারক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের যে-কোনো স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে মানবতা রক্ষায় সেখানে সর্বাগ্রে 'খই' ফোটায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মূলত স্বীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতেই দেশটি মানবাধিকারের বুলি আওড়ায়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী তাদের কার্যক্রমে এটা সুস্পষ্ট যে, তারা মানবাধিকারের ধারক-বাহক ও রক্ষক তো নয়ই; বরং সে নিজেই মানবাধিকারের ওপর

স্টীম রোলার চালাচ্ছে। নিচে কয়েকটি ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে মার্কিনীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি পরিষ্কার করা হলো :

ক. **ইরাকে মানবাধিকার :** তথাকথিত জীবাণু অস্ত্রের নাম করে আমেরিকা ও তার দোসররা নজিরবিহীন হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে সভ্যতার অন্যতম লীলাভূমি ইরাক দখল করে নেয় এবং সেখানে রামরাজত্ব কায়েম করে। সন্ত্রাস দমনের নামে মার্কিনীরা নিরীহ ইরাকিদের বন্দি করে তাদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালায়। এ নির্যাতনের মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌছে যে, এটি মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। এমনকি মানব সৃষ্টির পরে এ ধরনের বর্বর নির্যাতন বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল। নির্যাতনের গোপন ছবি মার্কিন এক সৈন্য তার বন্ধুকে দিলে সে ছবিগুলো পত্রিকা অফিসে দিয়ে দেয়। সারাবিশ্বে মার্কিনীদের এ ন্যাক্কারজনক কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। আবু গারিব কারাগারে মানবতার চরম লঙ্ঘন বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। মার্কিনীদের মানবাধিকারের চরম বলি ইরাকের প্রায় সাত লাখ নিরীহ নারী-পুরুষ ও নিষ্পাপ শিশু। তাই আজ গোটা বিশ্ববাসীর কাছে এটি পরিষ্কার যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের ন্যূনতম মানবতাবোধ থাকলে তারা ইরাকে এভাবে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করতে পারত না। মূলত বিশাল তেলক্ষেত্র লুণ্ঠনের নেশা তাদেরকে হিংস্র ও বর্বর করে তুলেছে।

খ. **আফগানিস্তানে মানবাধিকার :** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার' ধ্বংসের ইস্যুকে কেন্দ্র করে কোনো প্রমাণ বা তদন্তের অপেক্ষা না করে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে আফগানিস্তানে যে হামলা চালিয়েছে, তা নারকীয় তাণ্ডব ছাড়া কিছু নয়। অথচ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পেছনে আফগানিস্তানের সংশ্লিষ্টতার কোনো বাস্তব প্রমাণ তারা আজও উপস্থাপন করতে পারেনি। আমেরিকা এখনো আফগানিস্তানে একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন অজুহাতে। সেখানে তারা প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। অত্যন্ত বর্বরতার সাথে নিরীহ নারী ও শিশুদের হত্যা করে গণকবর দিচ্ছে। মানবাধিকার আজ মার্কিনীদের হাতে জিম্মি হয়ে আছে।

গ. **ফিলিস্তিনে মানবাধিকার :** আমেরিকা ও তার মিত্রদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের আর এক জাজ্বল্যমান নজির ফিলিস্তিন ইস্যু। মানবাধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ফিলিস্তিন সমস্যাকে চিরায়ত সমস্যায় পরিণত করা হয়েছে। পশ্চিমা মদদপুষ্ট হয়ে ইহুদিরা নতুন নতুন বসতি স্থাপন করছে। আর ফিলিস্তিনীরা নিজ দেশে পরবাসীর মতো জীবনযাপন করছে। ইসরাঈলি হামলায় প্রতিদিন মরছে ফিলিস্তিনি নারী, পুরুষ ও শিশু।

ঘ. **বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মানবাধিকার :** বসনিয়া হার্জেগোভিনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র খুবই দুঃখজনক, করুণ ও বেদনাদায়ক। জাতিগত দাঙ্গায় বসনিয়া হার্জেগোভিনার প্রাচীন ঐতিহ্য, সভ্যতা ও মানবতা মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হচ্ছে। সবচেয়ে লোমহর্ষক ঘটনা হচ্ছে, সার্বদের কর্তৃক গণহত্যা ও গণধর্ষণ। আর এতে করে সেখানে মানবাধিকার কতটা লঙ্ঘিত হচ্ছে তা বিবেকবান মানুষমাত্রই অনুধাবন করতে পারে।

বিশ্বের আরও যেসব দেশ বা অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে তন্মধ্যে নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, সোমালিয়া, কাশ্মীর, মায়ানমার, পেরু, ইন্দোনেশিয়া, কসোভো, ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঙ. **বাংলাদেশে মানবাধিকার :** উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অহরহ লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার। এসব দেশে জোরপূর্বক সম্পদহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের বলি, ঘুষ প্রভৃতি বিষয় সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে নারীদের ক্ষেত্রে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে। এদেশে নারী-ধর্ষণ, পাচার, হত্যা ও পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার মতো জঘন্য কাজগুলো ঘটছে। নারীদের দ্বারা পুরুষের সমান কাজ করিয়েও সমান মজুরি দেওয়া হয় না। শিল্প-কারখানাগুলোতেও শ্রম আইনকে তোয়াক্কা করে না মালিক পক্ষ। শিশুশ্রম আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের শিল্প-কারখানায় অমানবিকভাবে কাজ করানো হচ্ছে শিশুদেরকে দিয়ে। তাদের মানবিক বিকাশের পথকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। গৃহকাজে নিযুক্ত শিশু ছেলে-মেয়ে অথবা গৃহ পরিচারিকাকে নির্যাতন করা হচ্ছে অহরহ।

মানবাধিকার রক্ষায় পরাশক্তি ও জাতিসংঘ : মানবাধিকার রক্ষায় বৃহৎ শক্তি ও জাতিসংঘের কার্যকরহীন ভূমিকা বিশ্ববাসীকে চরমভাবে হতাশ করেছে। ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে পরাশক্তিগুলো নিজেরা 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির বাস্তবায়ন করছে। আর এর খেসারত দিতে হচ্ছে দুর্বল দেশগুলোকে। পরাশক্তিগুলোর চাপের কারণে জাতিসংঘ নামসর্বস্ব কার্যকরহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চলেছে। জাতিসংঘ পরাশক্তিগুলোর চাল দেওয়ার ঘুঁটিতে পরিণত হওয়ায় আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকায় মানবতা রক্ষার কিছু লোকদেখানো কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছে। বাস্তবে জাতিসংঘ আফগানিস্তান, ইরাক, ফিলিস্তিন, কাশ্মীরসহ বিভিন্ন জনপদে মানবাধিকারের ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিহত না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরাশক্তিগুলো মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বশান্তির জন্য হুমকি ভেবে ইরানের পারমাণবিক চুল্লী বন্ধের কথা বলছে, নতুবা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকার হুঙ্কার দিচ্ছে। অন্যদিকে সে নিজেই মানবসভ্যতা বিধ্বংসী পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য ১১০টি পারমাণবিক চুল্লী চালু রেখেছে। ইসরাইল, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মান, ইংল্যান্ড, চীনসহ অনেক রাষ্ট্র শত শত পারমাণবিক বোমা রিজার্ভ রেখেছে। একদিকে বিশ্বের বিশাল জনগোষ্ঠী খাদ্যের অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে, অন্যদিকে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার অপচয় করছে এবং বিপুল উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে। তাই শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকার রক্ষার পরিবর্তে তা লঙ্ঘনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছে এবং জাতিসংঘ তাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

মানবাধিকার সম্মেলন : ১৯৯৩ সালের ২৫শে জুন অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় বিশ্ব মানবাধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নয়শ এনজিও-র তিন শতাধিক কর্মী উক্ত সম্মেলনে অংশ নেয়। বিভিন্ন প্রকার ছবি দ্বারা তারা বিশ্বের যে যে প্রান্তে মানবতা লঙ্ঘিত হচ্ছে তা তুলে ধরেন। এ সম্মেলনে মানবাধিকার সংরক্ষণে ৫০ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট নানাবিধ বিষয় সংবলিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু তার বাস্তবায়ন আজও সম্ভব হয়নি।

উপসংহার : বিশ্বের সর্বত্র আজ কোনো না কোনোভাবে কমবেশি মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। বিশ্বের বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অস্ত্রের জোরে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করছে। আবার রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ধনীরা গরিবদের ওপর শোষণ-নিপীড়ণ চালাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে অবশ্যই বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত হতে হবে। শুধু মানবাধিকার নিয়ে চিৎকার করলেই চলবে না; বরং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সকলকে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘকে কোনো কোনো রাষ্ট্রের তাবেদারি না করে বিশ্ববাসীর সংস্থা হিসেবে

মানবাধিকার রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও নারী-পুরুষের মানবিক মূল্যায়ন ও অধিকার সংরক্ষণে সর্বদা তৎপর থাকতে হবে।

৮৪ যুদ্ধ নয় শান্তি / বিশ্ব শান্তি

উপস্থাপনা : যুদ্ধ ও শান্তি– পৃথিবীতে দুটি বিপরীতমুখী অবস্থা। অশান্ত বিশ্বে আজ কোথাও শান্তি নেই। যুদ্ধ একান্ত পাশবিক। অথচ পশুর চেয়ে মানুষই বেশি যুদ্ধ করে, আবার মানুষই যুদ্ধকে বেশি ঘৃণা করে। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা মানুষের মানবিক চেতনাকে করেছে জাগ্রত। তাই আজ ক্ষুদ্র সেমিনার থেকে জাতিসংঘের টেবিল পর্যন্ত সর্বত্র প্রধান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বিশ্ব শান্তি।

যুদ্ধের উৎস : হিংসা-বিদ্বেষ আর দুঃশাসনের ফলে মানুষের মধ্যে যুদ্ধের অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়। শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর অহমিকা এবং আধিপত্য স্পৃহা মানুষের মধ্যে যুদ্ধের প্রেরণা যোগায়। কোনো দেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলেই তার প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়।

যুদ্ধের কারণ : যুদ্ধ সবসময়ই অনভিপ্রেত। শান্তিকামী মানুষ কখনো যুদ্ধ চায় না। তবুও ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত করে পৃথিবীতে ঘটে গেছে অনেক যুদ্ধের ঘটনা। কিন্তু কেন? উগ্র জাতীয়তাবাদ, হিংসা, ঈর্ষা, এক রাষ্ট্রের ওপর অন্য রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার, বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্র তৈরি ও অস্ত্রবিক্রির ক্ষেত্র প্রস্তুত, তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুট ইত্যাদি মূলত যুদ্ধের মূল কারণ। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের হিংসা, লোলুপ বাসনা মানুষকে ঠেলে দেয় যুদ্ধের ভয়াবহতার দিকে। আবার রাষ্ট্রনায়কদের অদূরদর্শিতা ও লোলুপতার কারণেও যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে।

আধিপত্যবাদীদের হিংসানীতি : সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদীদের মূল নীতিই হলো প্রভুত্ব বিস্তার করা। এক দেশের ওপর অন্য দেশের প্রভুত্ব বিস্তার করা নিয়েই বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে দুটি মহাযুদ্ধ। কতিপয় আধিপত্যবাদীর উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় বিশ্ববাসীকে দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই বিশ্ববাসীর কণ্ঠে আজ এই স্লোগান, "আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই।"

যুদ্ধের ভয়াবহতা : যুদ্ধ মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। মানুষের স্বপ্নীল আশাগুলোকে হতাশা ও গ্লানির আবরণে ঢেকে দেয়। যুদ্ধের ভয়াবহতা বড় নিষ্ঠুর। যুদ্ধ কেড়ে নেয় অসংখ্য মানুষের প্রাণ। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, লাখো মানুষকে করে বিকলাঙ্গ। যুদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করে, মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধের তাণ্ডব মানুষকে শিহরিত করে তোলে। মূলত যুদ্ধ মানুষকে ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : যুদ্ধ মানুষের জীবনে কতটা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে তার প্রমাণ হলো, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সংঘটিত এ দুটি যুদ্ধে কোটি কোটি মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ১১ বছরব্যাপী সংঘটিত এ দু'টি বিশ্বযুদ্ধে প্রায় নয় কোটি ৬৪ লাখ মানুষ প্রাণ হারায়। এছাড়া ১১ কোটি মানুষ বিকলাঙ্গ হয়। সম্পদ ধ্বংস হয় ৭২০ বিলিয়ন ডলারের। পারমাণবিক বোমার আঘাতে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে, বিশ্বমানবতা তা কখনো ভুলবে না।

সমকালীন বিশ্ব ও শান্তি : বর্তমান বিশ্বের যত জায়গায় অশান্তি ও অরাজকতা রয়েছে সবকিছুর পেছনে কলকাঠি নাড়ছে ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও রাশিয়া। বিশ্ব মানচিত্রে চোখ

বুলালেই দেখতে পাই, ইসরাইল নামক এক জগদ্দল পাথর ফিলিস্তিনি জনগণ তথা গোটা আরব সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে। কাশ্মীরে চলছে নিরীহ ও স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের ওপর আধিপত্যবাদী ভারতীয় পেটুয়া বাহিনীর নির্যাতন। জায়ার, চেচনিয়া, ইরাক, ইরানসহ বিভিন্ন দেশে বেজে উঠেছে যুদ্ধের দামামা। তাই এখন মানবতার একান্ত আরাধ্য– যুদ্ধ নয়, শান্তি।

যুদ্ধ শান্তির পথে অন্তরায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ববিবেক শান্তির অন্বেষায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু জাতিসংঘ শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। তাই দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধ শান্তির পথে অন্তরায়।

শান্তির বাণী নীরবে কাঁদে : মানব মনের একান্ত চাওয়া শান্তির বাণী নীরবে কাঁদে। বিশ্বের পরাশক্তিগুলো অঢেল সম্পদ ব্যয় করে সুসজ্জিত করে রেখেছে তাদের সেনাবাহিনী, তৈরি করছে নতুন নতুন মারণাস্ত্র। যে-কোনো মুহূর্তে এরা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা : আজকের বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে বিশ্ব মানবতাকে প্রকম্পিত করে তুলছে। যে-কোনো মুহূর্তে কোনো একটি কারণে বিশ্বে তৃতীয় আরেকটি যুদ্ধ বাঁধিয়ে সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করে দিতে পারে তারা।

যুদ্ধ কেন শেষ হয় না : যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ তথা জাতিসংঘ গঠিত হয়েছে। অস্ত্র সীমিতকরণ করতে অনেক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু তারপরও বিশ্বব্যাপী অস্ত্রের প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের হাহাকার কেন? মূলত যুদ্ধের আশঙ্কা শেষ না হওয়ার কারণ হলো, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না এবং সর্বোপরি আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে অন্য দেশের সম্পদ হরণের লোভ।

বিশ্ববাসীর শান্তির প্রত্যাশা : শান্তি মানুষের চিরদিনের কাম্য। তাই মানুষ শান্তি চায়। মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে একে অপরের পাশে দাঁড়াতে চায়। পৃথিবীর শান্তিকামী ও বিবেকবান মানুষ যুদ্ধকে সমূলে উৎপাটন করে শান্তির পতাকা উড়াতে বদ্ধপরিকর।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমাদের করণীয় : বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের আরও সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য যে বিশাল অর্থ ব্যয় করা হয়, তা ব্যয় করতে হবে মানবতার কল্যাণে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই বৃহৎ শক্তিবর্গের শুভ বুদ্ধি, শান্তির পক্ষে গণসচেতনতা, অস্ত্র উৎপাদন বন্ধ ও পারমানবিক অস্ত্র ধ্বংস এবং সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা।

উপসংহার : শান্তিই বিশ্বকে সমৃদ্ধিতে ভরে দিতে পারে। যুদ্ধের ফল কখনো শুভ হতে পারে না। এজন্যই শান্তি সকলের কাম্য হওয়া উচিত। একমাত্র যুদ্ধমুক্ত বিশ্বই পারে সকল অশান্তি তথা বিভীষিকা দূর করতে। তাই যুদ্ধ বন্ধ করতে আমাদের সবাইকে আরও সচেতন হতে হবে; এক দেশের সাথে অন্য দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও বাড়াতে হবে। সর্বোপরি মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ বাড়াতে হবে। শান্তির মঙ্গল আলোকচ্ছটা বিস্তৃত হোক পৃথিবীর চারদিকে। প্রতিটি মানুষের অঙ্গীকার হোক– যুদ্ধ নয়; শান্তি চাই।

৮৫ নারীর ক্ষমতায়ন

অথবা, বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন

অথবা, নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ

[ফা. প. ২০১৩]

উপস্থাপনা : কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকেই নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ সভ্যতা বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌছেছে। বিশ্ব জনগোষ্ঠীর অর্ধেকই হচ্ছে নারী। তাই বিশ্বের উন্নয়নের জন্য আবশ্যক নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নারীর মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণ। সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ রাষ্ট্রীয়, শাসনযন্ত্রের সকল স্তরে তথা পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নারীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ।

নারীর ক্ষমতায়ন কী : 'ক্ষমতায়ন' শব্দটি দ্বারা মূলত বোঝায় স্বাধীনতা, মত প্রকাশ, সকল ক্ষেত্রে অধিকার প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা। নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সর্বজনীনতা সংরক্ষণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নারীর স্বাধীন ও সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণ। সুতরাং উন্নয়নের সাথেই নারীর ক্ষমতায়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারী-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন এ দুটি বিষয়কে সংশ্লিষ্ট করে সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ, মত প্রকাশের সুযোগ ও অধিকার নিশ্চিত করাই হলো প্রকৃত অর্থে নারীর ক্ষমতায়ন।

বিশ্ব প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশ : বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নারী-উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের পথ প্রতিনিয়ত প্রশস্ত হচ্ছে। সত্তরের দশকে নারীর মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি জাতিসংঘের নীতিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ 'বিশ্ব নারী বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করে। জাতিসংঘের সহায়তায় ১৯৭৫ সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারীরা এসব সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ দেশের সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার কথা তুলে ধরেন। বর্তমানে সিডও-র প্রধান কর্মকর্তা বাংলাদেশেরই নারী সালমা খান।

এছাড়া ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরিওতে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ ও উন্নয়ন পরিকল্পনা, ১৯৯৩ সালে ভিয়েনা মানবাধিকার ঘোষণা, ১৯৯৪ সালে কায়রোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং ১৯৯৫ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং তাদের অধিকারের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এসব সনদ ও কর্মপরিকল্পনায় বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেছে এবং এগুলো বাস্তবায়নে অঙ্গীকার প্রদান করেছে।

নারীর ক্ষমতায়নে সাংগঠনিক পদক্ষেপ : মহিলাদের উন্নয়নে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ১৯৯৪ সালে তা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নামকরণ করা হয়। এর আগে স্বাধীনতার পর পরই ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ 'নারী পুনর্বাসন বোর্ড' এবং ১৯৭৬ সালে 'জাতীয় মহিলা সংস্থা' গঠন করা হয়। পরে নারীর কল্যাণে সমন্বিত পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৮৪ সালে 'মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর' গঠন করা হয়। যার অধীনে রয়েছে– জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি, কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, নারীদের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৯৫ সালে জাতীয় মহিলা পরিষদ গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে ২০০৯ সালে জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ নামকরণ করা হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই পরিষদের সভাপতি।

বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান সীমাবদ্ধতাসমূহ : বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীর ক্ষমতায়নে যেমন বহুবিধ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম

নয়। বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে যেসব সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

সামাজিক অবস্থা : বাংলাদেশে নারী-উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়নি। এখনো নারী-নির্যাতন, যৌতুকলোভী স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা, নারী অপহরণ ও পাচার, শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ এবং স্কুল-কলেজের মেয়েদেরকে উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদি অপরাধ অনেকটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইদানিং যানবাহন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও নারী-নির্যাতনের মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ অপরাধকারীর সঠিক বিচার করতে সরকার বারবারই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। নারী অধিকার সংরক্ষণের যে আইন রয়েছে, তা কাগজ-কলমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তদন্তের যেমন নেই অগ্রগতি, তেমনি নেই আইনের কঠোর প্রয়োগ। প্রশাসনের সর্বস্তরে রয়েছে রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি। ফলে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা : পরিবারের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু নারীশিক্ষার অগ্রগতি আশানুরূপভাবে হচ্ছে না। নারীশিক্ষা বিস্তারে সরকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিলেও গ্রামে বসবাসকারী দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর নারীরা অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। তারা স্কুলে ভর্তি হলেও মূলত দারিদ্র্য ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে অধিকাংশই উচ্চশিক্ষার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না। ফলে নারীর ক্ষমতায়নে তারা কোনো অবদানও রাখতে পারছে না।

সচেতনতার অভাব : নারীর ক্ষমতায়নের একটি বড় বাধা হচ্ছে নারীদের সচেতনতার অভাব। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে তাদেরও যে অধিকার আছে, এ সত্য উপলব্ধি করতে তারা প্রায়ই ব্যর্থ হয়। পরিণত বয়সে পদার্পণের পূর্বেই পিতা-মাতারা তাদের বিয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়। তাই তারা লেখাপড়ায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

ধর্মীয় গোঁড়ামি : ধর্মীয় গোঁড়ামিও নারীর ক্ষমতায়নে একটি বড় বাধা। ইসলাম ধর্মে "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত" বলে নারীর মর্যাদাকে সর্বোচ্চ গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে। হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে, 'নারীরা শক্তির মূল আধার।' কিন্তু গোঁড়াপন্থিরা ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নারী : সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মতো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ষাটের দশক থেকে বেশ কয়েকটি দেশের সরকারপ্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত হয়েছেন নারী। যেমন– বাংলাদেশে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া, ভারতের ইন্দিরা গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী, পাকিস্তানের বেনজীর ভুট্টো, ফিলিপাইনের কোরাজন একুইনো, গ্লোরিয়া অ্যারোইয়ো, শ্রীলঙ্কার শ্রীমাভো বন্দরনায়েক ও চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা, গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ (দ্বিতীয়), ব্রিটেনের মার্গারেট থ্যাচার, আফ্রিকার এলিজাবেথ ডোমিশিয়েন, নেদারল্যান্ডের ব্রিয়েটিচ, ডেনমার্কের রানি মার্গারেট (দ্বিতীয়), বার্মার অং সান সুচি, আর্জেন্টিনার ইসাবেলা পেরন, যুক্তরাষ্ট্রের কন্ডলিৎসা রাইস, ইন্দোনেশিয়ার মেঘবতী সুকর্নপুত্রী প্রমুখ। নিচে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে নারীর

অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হলো–

দেশের নাম	মোট আসন সংখ্যা	মহিলা আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ	৩০০	৫০
ভারত (নিম্নকক্ষ)	৫৪৩	৩৯
পাকিস্তান	২১৭	৬
মালয়েশিয়া	১৯২	১৫
সিঙ্গাপুর	৮৭	৩
শ্রীলঙ্কা	২২৫	১১

উপরের সারণির দিকে তাকালে দেখা যায়, এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান আশাব্যঞ্জক। অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের নারীরা রাজনীতিতে পশ্চাৎপদ নয়; বরং অনেক অগ্রসর। তাছাড়া বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি ও বিরোধী– দুই দলেরই প্রধান নারী।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান : আমাদের দেশে প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণ ধীর গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরিতে ১০ ভাগ কোটা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ১৯৭৬ সালে পুলিশ বিভাগে নারীদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবে ক্রমে পুলিশ, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সচিব পদেও রয়েছে মহিলা। বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির পরিমাণ প্রায় ২৫ মিলিয়ন। এর মধ্যে মাত্র ১০,০০০ জন নিয়োজিত প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পেশায়। প্রায় ৭৯% নারী কাজ করে কৃষিখাতে (মৎস্য ও বনায়নসহ), ৯.৯% নারী কাজ করে ম্যানুফ্যাকচারিং ও পরিবহন খাতে। ২.২% নারী বিপণন শ্রমিক ও ০.৬% নিয়োজিত করণিক পর্যায়ের কাজে। সীমিত সংখ্যক নারী জড়িত আছেন সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্তরে।

নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের কর্তব্য : যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হতে পারে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। নারীদের শতভাগ শিক্ষিত করতে হবে। নারীশিক্ষার বর্তমান হার (৬৭.৬%) বৃদ্ধি করতে হবে উল্লেখযোগ্যভাবে।

২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে নারীর আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক তথ্য সংযুক্ত করতে হবে।

৩। সকল স্তরের নারীদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত ও সম্প্রসারিত করতে হবে।

৪। আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীদের জন্য মর্যাদাহানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ করতে হবে।

৫। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নারীদের ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধিত করতে হবে এবং তাদের ব্যাপারে হতে হবে সচেতন।

৬। নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নারী-উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তা প্রচার ও চর্চার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। সরকারি-বেসরকারি গণমাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে নারী-অধিকার বিষয়ক অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে প্রচার করতে হবে।

৮। নারীকে ব্যবহার করে পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল চলচ্চিত্র, মডেলিং ইত্যাদির মাধ্যমে এক শ্রেণির অসৎ ব্যবসায়ীর অর্থ উপার্জনের পথকে আইনিভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন : নারী ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারীর জন্য 'লেটারেল এন্ট্রি' বা সরাসরি প্রবেশের সুযোগ থাকতে হবে। বাংলাদেশের দূতাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে অথবা পরিকল্পনা কমিশনে বা বিচার বিভাগের উচ্চতর পদে যোগ্য নারীদের প্রবেশের সুযোগ থাকতে হবে। প্রয়োজনে চাকরির কোটা বৃদ্ধি করতে হবে।

রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন : রাজনীতিতে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণ এবং সংসদীয় ও অন্যান্য নির্বাচনে কোটাভিত্তিক ও সাধারণভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদে প্রয়োজনে অধিক সংখ্যক নারী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীর ক্ষমতায়নে প্রতিবন্ধকতা : নারীর ক্ষমতায়নে বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়। এসব প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ও রোধ করতে হবে। যেমন–

১। প্রচলিত রীতি-নীতি ও সামাজিক প্রথা দূর করতে হবে।

২। নিয়ম ও আচার দ্বারা নারীকে প্রবোধ ও বাধা দেওয়া থেকে সংশ্লিষ্টদের রোধ করতে হবে।

৩। পুরুষদের একক কর্তৃত্ব সমঝোতার মাধ্যমে দূর করতে হবে।

৪। বিয়ে, বিয়ে-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের প্রতি একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারের পুরুষালি কর্তৃত্ব খর্ব করতে হবে।

৫। অন্ধ কুসংস্কার দূর করে নারীদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৬। নারী অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের বিধিবিধান প্রচার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

উপসংহার : নারী-পুরুষের ক্ষমতার সুসম বণ্টন ছাড়া দেশের তথা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সামাজিক উন্নয়ন হবে তখন সোনার হরিণ। তাই দেশ, সমাজ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন নারীর মুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন; জেন্ডার বৈষম্য দূর করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, তাদের অধিকার সংরক্ষণসহ সাংবিধানিকভাবে তাদের সকল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি প্রদান।

৮৬ জাতি গঠনে নারীসমাজের ভূমিকা [ফা. প. ২০১২]

উপস্থাপনা : দেশ ও জাতিগঠনমূলক সর্ববিধ কাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন–

কোন কালে একা হয়নি ক জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে বিজয়ী লক্ষ্মী নারী।

দেশের তথা বিশ্বের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। সুতরাং এ নারীসমাজকে দেশ গঠনের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা-দীক্ষায় তাদেরকে যথার্থই যোগ্য নাগরিক হিসেবে তৈরি করতে হবে। তবেই জাতি গঠনে তারা স্মরণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

জাতি গঠনে নারীসমাজ

সন্তানের চরিত্র গঠনে : মায়ের কাছ থেকে সন্তান যে শিক্ষা লাভ করে তা-ই পরবর্তী জীবনে তার চরিত্র এবং জাতি গঠনে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করে। একজন মা শিক্ষিতা

হওয়া মানে একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া। একটি পরিবার শিক্ষিত হওয়া মানে একটি সমাজ শিক্ষিত হওয়া। একটি সমাজ শিক্ষিত হওয়া মানে একটি দেশ উন্নত হওয়া। সুতরাং সন্তানের চরিত্র গঠনের মাধ্যমে নারীসমাজ জাতি গঠনে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখতে পারে।

পারিবারিক জীবনে : নারী পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি বয়ে আনে এবং পুরুষের জীবন সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। এতে পুরুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় জীবনে উন্নতির পথও প্রশস্ত হয়। পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমাদের নারীসমাজ দেশ ও জাতি গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

পৃথিবীর তসবীর রঙ্গীন করেছে নারী,
জীবন চিত্তের উষ্ণতা তারই সেতারের ধ্বনি।

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষাক্ষেত্রে নারীসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা পুরুষের চেয়ে অধিক দক্ষতা ও যত্নসহকারে শিশুদের মন-মানসের বিকাশ ঘটিয়ে ভবিষ্যতে জাতির পরিচালক হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

রাজনীতিতে নারীর ভূমিকা : রাজনীতিতে মহিলারা সক্রিয় ভূমিকা পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে অবদান রাখছে।

সিভিল সার্ভিসে নারীদের ভূমিকা : এক পরিসংখ্যান মতে, আগে ৪% গেজেটেড ও ৬.১% ননগেজেটেড অফিসার মহিলা ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৭.৫ এবং ৮.৪। ১৯৯২-তে সরকারি অফিসে সর্বমোট মহিলা চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল ৭৮০৩৭ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা দেশ সেবার মাধ্যমে জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে : বর্তমান বিশ্বে ৫০%-এর অধিক মহিলা দক্ষ শ্রমিক রয়েছে যারা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থেকে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। এজন্য বিশ্বব্যাংক মন্তব্য করেছে, শিল্প ও ব্যবসার চেয়েও নারীদের কল্যাণের জন্য বিনিয়োগ বেশি লাভজনক।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারীর ভূমিকা : বিশ্বব্যাংক পরামর্শ দিয়েছে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। ILO-এর এক হিসাব মতে, বিশ্বে ৯৯৭ মিলিয়ন মহিলা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কৃষিক্ষেত্রে : কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অবদান অপরিসীম। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বব্যাংকের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, যদি আমরা কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে কৃষি উৎপাদন ২৪% বৃদ্ধি পাবে।

সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিনির্মাণে : সন্তানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে তার মায়ের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। মা-ই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষক। তাই মায়ের এ ভূমিকা লক্ষ করে নেপোলিয়ন বলেছেন– The future destiny of the child is always the work of the mother.

পদক্ষেপ গ্রহণ : জাতি গঠনে নারীসমাজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে–

ক. নারীশিক্ষার হার বাড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ. অনগ্রসরতা ও কুসংস্কার দূর করতে হবে।

গ. স্থানীয়ভাবে নারীর কর্মসংস্থান এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

ঘ. প্রতিটি নারীকে কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে।

ঙ. মাতৃত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে।

চ. কর্মক্ষেত্রে নারীর ৫০ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ছ. সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

জ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলাচলের পথে কর্মস্থলসহ সর্বক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঝ. বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ. পৈতৃক সম্পদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ত. নারী নির্যাতন রোধে প্রচলিত আইনের সংস্কার করে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার : উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়ন করা হলে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের নারীসমাজ জাতি গঠনে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

৮৭ মানবসম্পদ উন্নয়নে নারীশিক্ষার গুরুত্ব [ফা. প. ২০০৮, '১৭]

অথবা, দেশ ও জাতি গঠনে নারীশিক্ষার গুরুত্ব

উত্তর॥ উপস্থাপনা : আজ নবযুগে নবীন প্রভাতে দিকে দিকে নারী প্রগতির জয়ধ্বনি বিঘোষিত হচ্ছে। নারী এতকাল ছিল পুরুষের ভাগ্যের ওপর নির্ভরশীল, নারীর কোনো স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত ছিল না। সর্বত্রই ছিল তার নিঃসহায় গলগ্রহতার প্রকটিত রূপ। অথচ সমাজের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী। কাজেই মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশ ও জাতি গঠন করতে হলে নারীকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়। সমাজ ও জাতি গঠনে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান ভূমিকা রয়েছে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীশিক্ষারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ সম্পর্কে কবি নজরুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন–

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

নারীশিক্ষার গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা : জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, সেহেতু দেশের উন্নতির জন্য নারীকে শিক্ষিত করে তুলে, অনগ্রসরতার অভিশাপ থেকে তাদের উদ্ধার করে পুরুষের পাশাপাশি পথ চলার অধিকার ও সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর প্রভাব : একজন সুশিক্ষিত মাতা তার সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে নিজ আদর্শে গড়ে তুলতে পারে। কারণ ছেলে-মেয়েদের ওপর মায়েদের প্রভাবই বেশি পড়ে। মায়ের কাছ থেকে তারা আচার-আচরণ, আদব-কায়দা ইত্যাদি সুশিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের প্রভাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নেপোলিয়ন বলেছিলেন, "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদিগকে একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" তাই নারীদের শিক্ষা গ্রহণ শতভাগ নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

স্বাবলম্বিতা অর্জন : স্বাবলম্বিতা অর্জনের ক্ষেত্রে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীনকালে নারীরা সবকিছুর জন্য তাদের স্বামীদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারা ছিল অবহেলিত ও নির্যাতিত। গৃহের মধ্যেই তাদের কার্যাদি সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিকা, পুলিশ অফিসার, পাইলট এমনকি আমাদের

দেশের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীও নারী। সুতরাং আজ আর নারীকে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়–

"সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিল নাক,
নারীরা আছিল দাসী।"

গৃহস্থালি কাজে নারী : গৃহস্থালি কাজের দিকে তাকালেও দেখা যায়, নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষিত নারী পুত্র-কন্যাদের অসুখ-বিসুখে যেভাবে স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী সেবা-শুশ্রূষা ও সংসারের প্রাত্যহিক আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করতে পারে, অশিক্ষিত নারীরা সেভাবে করতে পারে না। শিক্ষিত নারী তার শিক্ষা, মেধা ও মননের সহায়তায় সংসারে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে পারে। তাই জ্ঞান সাধনা ও বুদ্ধির বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীকে সুযোগ করে দিতে হবে।

দেশ গঠনে নারী : অতীতে দেশ গঠনে নারীদের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। বর্তমানেও দেশ গঠনে নারীরা যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যতটি আন্দোলন হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে নারীদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। আর এ অবদান রেখেছে শুধু শিক্ষিত নারীরাই। তাই দেশ গঠনে নারীশিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে নারীশিক্ষা : বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটি জনবহুল দেশ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এদেশের প্রধান সমস্যা। আর এ সমস্যার পেছনে একটি বড় কারণ হলো নারীশিক্ষার অভাব। নারীশিক্ষার অভাবে এদেশের গ্রামবাংলার ১২/১৩ বছরের বালিকারা বিয়ের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়। অল্প বয়সে সন্তান জন্মদান মা ও শিশু উভয়ের জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এতে মায়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং সন্তানও দুর্বল রোগাক্রান্ত ও মেধাহীন হয়। নারী শিক্ষিত হলে উপযুক্ত বয়সে বিয়ে করবে, সীমিত সংখ্যক সন্তান গ্রহণ করবে এবং নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারবে; তদুপরি আয়-উপার্জনমূলক কাজেও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

নারীশিক্ষার অন্তরায় : বাংলাদেশসহ অনুন্নত দেশগুলোতে নারীশিক্ষার অন্তরায় হচ্ছে কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোঁড়ামি। এছাড়া নারীশিক্ষার একটা বিশেষ বাধা হচ্ছে দারিদ্র্য ও নিরাপত্তার অভাব। নিরাপত্তার অভাবে অনেক অভিভাবকই তাদের কন্যাসন্তানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে ভয় পান। আর এতে করে ব্যাহত হচ্ছে নারীশিক্ষার অগ্রযাত্রা। সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহলের অসচেতনতাও নারীশিক্ষার অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে।

নারীশিক্ষা বিস্তারের উপায় : নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কতিপয় কর্মসূচি গ্রহণ করা জরুরি। যেমন–

১। দেশে নারী শিক্ষার্থীর অনুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

২। মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার না হয়। প্রয়োজনে বিশেষ পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা।

৩। বয়স্ক নারীদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪। শিক্ষা গ্রহণে নারীকে উদ্যোগী ও উৎসাহী করার লক্ষ্যে সরকার যে উপবৃত্তি চালু করে তা যেন যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয় সেজন্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা।

৫। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা, নারীশিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা, সরকার ও সংশ্লিষ্ট মহলের উদারনীতি গ্রহণ ইত্যাদি।

৬। সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষার প্রতি নারীর আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

৭। গ্রামের স্কুল-কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের জন্য স্থানীয়ভাবে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, যাতে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

নারীশিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ : "যে হাত দোলনা দোলায়, সেই হাত বিশ্ব শাসন করে"– কথাটি একেবারে সত্যি। আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। নারীশিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক গৃহীত পদক্ষেপ অনেকটা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। নারীশিক্ষা প্রসারে মেয়েদের বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ ও স্কুল পর্যায়ে উপবৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এ উপবৃত্তির ব্যবস্থা কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রক্রিয়াও চালু রয়েছে। তাছাড়া মেয়েদের স্নাতক পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক পদে মেয়েদের ৬০% কোটা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যময় ক্রমবিকাশের জন্য এখন দেশে স্বতন্ত্র নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়া বয়স্ক নারীদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বয়স্ক নারীশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি মহলও নারীশিক্ষা প্রসারে নানাভাবে অবদান রাখছে।

উপসংহার : আমাদের সমাজে আমরা চাই আদর্শ জননী, আদর্শ গৃহিণী, আদর্শ কন্যা। আদর্শ জীবন ও সমাজ গঠনে চাই উপযুক্ত নারীশিক্ষা। নারীরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক জন্ম দেয় এবং তাদের পরিচর্যা করে মানবসম্পদরূপে গড়ে তোলে। অনাগত শিশুর মা যদি শিক্ষিত না হয় তবে শিশুর সুনাগরিক হওয়ার পথই রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই নারীকে অবহেলা না করে তার শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এসে দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধন করার সুযোগ দিতে হবে।

৮৮ নারী-নির্যাতন ও তার প্রতিকার

অথবা, যৌতুক প্রথা ও তার প্রতিকার [ফা. প. '৯৭, '০৫]

উপস্থাপনা : বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়লে দেখা যায়, তার একটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে নারী-নির্যাতনের খবর। এসিড নিক্ষেপের ঘটনায় নারী দগ্ধ হচ্ছে। মর্মান্তিক সব ঘটনার নেপথ্যে যৌতুকের বিষয়টি অনেকাংশে লক্ষণীয়। অথচ মানব সভ্যতার যাবতীয় অর্জনের পেছনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কবি নজরুল ইসলাম তাই বলেছেন–

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি, চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।

নারী-নির্যাতনের স্বরূপ : স্মরণাতীত কাল থেকে নারী পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে নির্যাতিত হয়ে আসছে। সাধারণত নারী-নির্যাতন বলতে আমরা নারীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনকে বুঝি। যৌতুকের কারণে, মিথ্যা অপবাদের কারণে, অথবা স্বামীর দাম্পট্যের কারণে নারীকে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অনেক সময় শারীরিক নির্যাতনের কারণে নারীর অকাল মৃত্যুও ঘটে। ধর্ষণ ও নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপ নারী-নির্যাতনের সর্বোচ্চ পর্যায়।

যৌতুক : বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে প্রণীত যৌতুক নিরোধ আইনে অনেক উপাদানের সমন্বয়ে যৌতুকের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। উক্ত আইনের সংজ্ঞানুযায়ী, বিয়ের পক্ষগণের (বর ও কনে পক্ষ) বিয়ের যে সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত দিতে হবে বা দেওয়ার সম্মতি প্রদান করতে হবে তাই যৌতুক। যৌতুক বলতে যে-কোনো সম্পত্তি বা

মূল্যবান জামানত হতে হবে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিয়ের পক্ষগণের দিতে হবে। তবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী প্রদেয় দেনমোহর যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না।

যৌতুকের ইতিহাস : মানুষের অন্ধ লালসা থেকে যৌতুক প্রথার সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্য বা আর্থিক দুরবস্থাও যৌতুক প্রথা সম্প্রসারিত হওয়ার কারণ। এ প্রথা আজকের নয়, সুদূর প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। আর্য-অনার্যদের রাজপরিবারের মধ্যে এ পণপ্রথা চালু ছিল শুল্কস্বরূপ। আধুনিক সভ্যতার বিংশ শতাব্দীতেও যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক নিয়মে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় সমাজে বিস্তার করে আছে।

যৌতুক প্রথার কারণ : নিচে যৌতুক প্রথার কারণগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১। যৌতুক প্রথার অন্যতম কারণ হলো ব্যাপক দারিদ্র্য।

২। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা ও নারীদের প্রতি ঋণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিও যৌতুকের অন্যতম কারণ।

৩। যৌতুকের টাকায় আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষাও রয়েছে অনেকের।

৪। নারীদের পরনির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার অভাবও এর জন্য দায়ী।

৫। উচ্চ ও সম্পদশালীদের যৌতুক প্রদানের প্রবণতার অনুকরণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মাঝেও যৌতুকের দাবি সম্প্রসারিত হয়েছে।

৬। কনের চেহারার সৌন্দর্যের অভাব।

৭। কনেপক্ষের টাকায় প্রতিষ্ঠালাভের মনোভাব।

৮। ইসলাম ধর্ম বা সামাজিক বিধানমতে প্রাপ্য পৈতৃক সম্পদ থেকে নারীকে বঞ্চিত করা।

৯। যৌতুক প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ না করা।

যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতা : যৌতুকে মোটা অঙ্কের টাকা ছাড়াও দাবি করা হয় স্বর্ণালঙ্কার, মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী, টেলিভিশন, ভি.সি.আর, রেফ্রিজারেটর, ফ্ল্যাট বাড়ি অথবা উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গমনের খরচ ইত্যাদি। এতসবের বিনিময়েও কন্যাকে বরের বাড়িতে পাঠিয়ে অভিভাবকেরা দায়মুক্ত হতে পারছে না। বারবার চাপ আসতে থাকে নতুন বাজেট পূরণের জন্য।

নারী-নির্যাতনে যৌতুকের প্রভাব : নারী-নির্যাতনে যৌতুকের কুপ্রভাব সবচেয়ে বেশি। যৌতুক দেওয়ার মাধ্যমে নারীকে নগণ্য প্রাণী এবং পণ্যে পরিণত করা হয়। বিয়ের মতো অবশ্য কর্তব্য ও পবিত্র দায়িত্ব পালনে পুরুষের কোনো দায় নেই, অথচ নারীকে এর বিনিময়ে অর্থ প্রদান করতে হবে, এটি একটি সামাজিক অবিচার। এ অবিচারে কত তাজা প্রাণ বাসর ঘরের ফুল ঝরার আগেই যে ঝরে গেছে, তার হিসাব রাখা দুরূহ।

যুগে যুগে সাহিত্যের দৃষ্টিতে যৌতুক : যৌতুক সামাজিক জীবনে একটি নিন্দনীয় প্রথা। এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুগে যুগে কবি সাহিত্যিকরাও প্রতিবাদমুখর হয়েছেন তাদের লেখনীতে। আধুনিক যুগের অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেন– "অর্থের বিনিময়ে যারা একজন নারীকে বিয়ে করতে সম্মত হয়, সে পুরুষ কোনোদিন তার স্ত্রীকে ভালোবাসে না।" পাত্রীর অভিভাবকদের এ কথাটা বোঝা উচিত।

যৌতুকের নৃশংসতা : যৌতুক প্রথার নিষ্ঠুরতা, নৃশংসতা ও নারী-নির্যাতন আজকাল সর্বজনবিদিত। 'যৌতুক' হিসেবে দাবিকৃত অর্থসম্পদ পরিশোধ করতে না পারলে শুরু হয় স্ত্রীর ওপর নির্যাতন। আর এ নির্যাতনকারীর ভূমিকায় স্ত্রীর স্বামী একা থাকে না। সাথে থাকে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ, দেবর সকলেই। এ নির্যাতনেরও বিভিন্ন কৌশল আছে। যেমন– শারীরিক নির্যাতন, হত্যার পর সিলিং ফ্যানে ঝুলিয়ে রাখা, গলায় বিষ ঢেলে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কন্যার পিতা যদি থানায় অভিযোগ করতে

চায়, তবে তার জীবননাশের হুমকি দেওয়া হয়। এভাবে ন্যায়বিচার তলিয়ে যায় অন্যায়ের কালো হাতের মুঠিতে। এ হলো যৌতুক প্রথার বিষময় পরিণতি।

যৌতুক প্রথা বিলোপে সরকারি উদ্যোগ : নিষ্ঠুর যৌতুক প্রথা বিলোপ যেমন সমাজের দাবি, তেমনি সরকারেরও। এ ব্যাপারে সরকারি সালিসি বোর্ডসহ বিভিন্ন সংস্থার ডজনখানেক সেল কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সরকারি উদ্যোগ নেওয়ার পরও যেন নারী-নির্যাতন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তার কোনো কমতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে সরকারিভাবে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের দরকার। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে সমাজ-সংসারে আরও অশান্তি বাড়বে ও দেশ ক্রমশ পিছিয়ে যাবে।

যৌতুক প্রথা বিলোপে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ : আধুনিক যুগের শুরু থেকেই বেগম রোকেয়া, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে যৌতুক প্রথা মূলোৎপাটনের চেষ্টা করেন। তাদের এসব উদ্যোগের কথা স্মরণে রেখেই যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে নারী-নির্যাতন ও যৌতুক প্রথার বিলোপ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে, যা নিম্নরূপ–

ক. দেশের নারী-পুরুষ উভয়কেই পণপ্রথার বিলোপ সাধনে সজাগ হতে হবে।
খ. এ প্রথার ঘৃণ্যতম দিক সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে।
গ. এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
ঘ. নারীসমাজকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে।
ঙ. দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে।
চ. যুব সমাজের মাঝে আত্মসম্মানবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে এবং স্বাবলম্বী না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।।
ছ. শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষের মাঝে মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।
জ. যৌতুকহীন বিয়েকে সামাজিক মর্যাদায় ভূষিত করতে হবে।
ঝ. জনগণের মাঝে ইসলামি মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নারীর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
ঞ. নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
ট. নারীকে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মানুসারে পৈতৃক সম্পদের ন্যায্য হিসসা প্রদান করতে হবে।
ঠ. ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় নিয়মিতভাবে যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার ও আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : যৌতুক একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর অভিশাপ থেকে নারীসমাজকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারের কার্যকর আইন প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সব ধরনের শোষণ ও বৈষম্য থেকে নারীর মুক্তি এবং নারীর প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের মাধ্যমেই এ সামাজিক ব্যাধির অবসান ঘটতে পারে।

৮৯ খাদ্যে ভেজাল ও জনস্বাস্থ্য [ফা. প. ২০১৪, '১৬]

অথবা, খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার [ফা. প. ২০১৯]

উপস্থাপনা : ভেজাল মানব সমাজের একটি মারাত্মক সমস্যা। আবহমান কাল থেকে মানুষ এ সমস্যায় জর্জরিত। খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধসহ মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে ভেজালের বিস্তার ঘটেনি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে ভেজালযুক্ত পণ্যদ্রব্য মানবজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। এখানে ভেজালের পরিমাণ এত বেশি যে, সাধারণ

মানুষ খাঁটি বস্তুটিকেও ভেজাল বলে ভুল করে। খাবারে ভেজালের কারণে আজ বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের জীবন হুমকির মুখে।

খাদ্যে ভেজাল : খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বলতে বোঝায় খাদ্যে নিম্নমানের ক্ষতিকর ও কৃত্রিম দ্রব্য মেশানো। প্রকৃতি ও গুণগতভাবে মানসম্মত না হলে যে-কোনো খাদ্যই ভেজালযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মূলত খাদ্যের মান যাচাই বা নিয়ন্ত্রণ না করে অধিক লাভের আশায় অখাদ্য কুখাদ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করাকেই খাদ্যে ভেজাল বলা হয়ে থাকে। এটি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। তাই এর প্রতিকার করা উচিত।

খাদ্যে ভেজালের কারণ : মূলত অর্থলিপ্সাই খাদ্যে ভেজাল মেশানোর মূল কারণ। খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করার জন্য আজকাল মানুষ হন্যে হয়ে ছুটছে। অসৎ ও অর্থলোলুপ ব্যবসায়ীরা এ অনৈতিক কাজ করে আসছে অবাধে। দেশের কোটি কোটি মানুষ এ ভেজাল খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এ অসাধু ব্যবসায়ীরা এ কাজ হতে বিরত হয় না। টাকার লোভ তাদেরকে বিবেকহীন অন্ধ মানুষে পরিণত করেছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যে ভেজাল : নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে ভেজালের কারণে মানুষ আজ দিশেহারা। এ ভেজালের গতিপ্রকৃতি বড়ই বিচিত্র ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অসাধু ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভেজাল বা নিম্নমানের দ্রব্য প্রয়োগ করে থাকে। যেমন- ওজন বৃদ্ধির জন্য বালি বা কাঁকর, ভালো শস্যের সঙ্গে কীটপতঙ্গ আক্রান্ত বা খারাপ শস্য মেশানো ইত্যাদি। অনেক সময় মজুদ খাদ্যশস্যের ওজন বাড়ানোর জন্য কেউ কেউ তাতে পানি মেশায়। মাছের সাথে বিষাক্ত ফরমালিন মিশিয়ে তাকে দীর্ঘক্ষণ তাজা দেখানো হয়। ঘি-এর সঙ্গে পশু চর্বি দিয়ে ভেজাল করা হয়। তিল বা নারিকেল তেলের সাথে বাদাম তেল বা তুলা বীজের তেল মেশানো হয়। সরিষার সঙ্গে প্রায়ই শিয়ালকাঁটার বীজ একত্রে মিশিয়ে তেল উৎপাদন করা হয়। সয়াবিন তেলের সাথে পাম তেলের ভেজাল মেশানো হয়। দুধের মাখন তুলে নিয়ে অথবা দুধে পানি মিশিয়ে ভেজাল দুধ বিক্রি করা হয়। গুঁড়া দুধে ময়দা, সুজি ও অন্যান্য দ্রব্য মেশানো হয়ে থাকে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বেশ কয়েকটি কোম্পানীর দুধে বিষাক্ত মেলামিন পাওয়া গেছে। ব্যবহৃত চা-পাতায়ও কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে চায়ে ভেজাল করা হয়। মশলার মধ্যে মরিচ বা হলুদ গুঁড়োতে সীসাজাতীয় রঞ্জক পদার্থ মিশিয়ে রঙের উজ্জ্বলতা বাড়ানো হয়। কোমল পানীয় তৈরিতে তরল গ্লুকোজ বা চিনির সিরাপের পরিবর্তে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় কর্বোক্সিমিথাইল সেলুলোজ। বিভিন্ন ফলের রসের নামে কৃত্রিম ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে নকল রস তৈরি করা হয়। ফল পাকাতে ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ব্যবহার ও পচন রোধের জন্য ফরমালিনের ব্যবহার নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধুনা মিনারেল ওয়াটারের নামে বাজারে যে পানির ব্যবসা চলছে, তাতে গুণ ও মানের নিশ্চয়তা অতি সামান্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই ও দুর্নীতি দমন কমিশন বিদ্যমান থাকলেও সেসব প্রতিষ্ঠানও ভেজালে পরিপূর্ণ। এদের কার্যক্রম একরকম স্থবিরই বলা যায়। ভেজাল দূরীকরণের পরিবর্তে এসব প্রতিষ্ঠান উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকারান্তরে ভেজাল প্রয়োগে ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে।

খাদ্যে ভেজালের প্রভাব : আমাদের দেশের বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ে লাভই বড় হিসেবে বিবেচিত হয়। ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা নীতিবোধের কোনো পরোয়া করে না। শিশুখাদ্য মুহূর্তের মধ্যে বাজার থেকে উধাও করে দিয়েও এ ব্যবসায়ী শ্রেণি নিজেদের মুনাফা বাড়াতে পিছপা হয় না। নীতিজ্ঞানহীন ব্যবসায়ীরা রোগীর ওষুধে ভেজাল দিয়ে

রোগীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় প্রতিনিয়ত। ভেজালযুক্ত খাদ্য খেয়ে অহরহই এ দেশের মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে বা তিলে তিলে ভুগে মরে, কিন্তু তাতে কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে না। ভেজাল খাদ্যের ভয়ানক পরিণাম হিসেবে অনেকেই চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। এ দেশের সাধারণ গোয়াল থেকে শুরু করে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীরাও শিশুর দুধে ভেজাল মেশাতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের অবিবেচনাপ্রসূত কাজের ফলে নিমিষেই থেমে যায় শিশুর হাসি। এমনকি যিনি খাদ্যে ভেজাল মিশিয়ে কারো কাছে বিক্রয় করছেন তিনিই আবার অন্য কারো হতে ভেজাল খাদ্য কিনে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। শুধু মানুষের খাদ্যেই নয়, পশুরূপী এসব ব্যবসায়ীরা পশু-পাখির খাদ্যেও ভেজাল মেশাচ্ছে। এসব পশুপাখির মাংস, দুধ, ডিম খেয়েও মানুষ অসুস্থ হচ্ছে। এভাবে ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনে ভেজাল এক বিরাট হুমকিস্বরূপ হয়ে পড়েছে। এর ফলে জাতীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে বাধ্য। কারণ একটি অসুস্থ জাতি কোনোদিন প্রতিযোগিতার এই বিশ্বে টিকে থাকতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যকে ভেজালের রাহু থেকে মুক্ত করতে দেশের সরকার ও সচেতন নাগরিক সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের এখনই প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। এটা সময়ের দাবি।

ভেজালের ভয়াবহ পরিণতি : মানবজীবনে ভেজালের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করছে বিষাক্ত কেমিক্যাল, যা আহার্য হিসেবে গ্রহণ করলে মরণব্যাধি ক্যান্সারসহ কিডনী ও লিভার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শুধু তাই নয়, এসব কেমিক্যাল হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, গলগণ্ড, পেটের পীড়া, টাইফয়েড প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিরও বিস্তার ঘটায়। সম্প্রতি ব্লুমার নামক একজন বিজ্ঞানী উল্লেখ করেন যে, "ফসফরাস সমৃদ্ধ কীটনাশক শুধু যে মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তাই নয়, এটি মানবজাতির জন্য বিরাট অভিশাপ। কারণ এসব কীটনাশক জাতীয় বিষ খাদ্যচক্র ও পরিবেশের মাধ্যমে মানবদেহে প্রবেশ করে মানুষের স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করছে, তাদের প্রজনন ক্ষমতাকে করছে বিনষ্ট।"

ভেজাল প্রতিকারে করণীয় : ভেজালের কুফল মারাত্মক, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি ভয়াবহ। ভেজালের বিষক্রিয়া এ দেশের জনগণকে নানাভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষ নির্বিচারে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য খেয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। এর কারণে যে-কোনো সময় বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। তাই ভেজাল প্রতিরোধে প্রত্যেক সচেতন ব্যক্তি এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষকে এখনই এগিয়ে আসা দরকার।

ভেজালবিরোধী অভিযান : সম্প্রতি ভেজাল প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বিভিন্ন অভিযান শুরু করেছে এবং এ অভিযান আশানুরূপ সফলতাও পেয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে ভেজালবিরোধী অভিযানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাদ্য বিক্রেতাকে জরিমানা ও শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। তবে এ অভিযান অব্যাহত না থাকায় ভেজালের পরিধি বেড়েই চলেছে, একে প্রতিরোধ করা যেন দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সমাজ তথা জাতিকে বাঁচাতে হলে এর প্রতিকার আবশ্যক। প্রয়োজনে ভেজাল প্রতিকারের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রামে ও মহল্লায় ক্রেতাস্বার্থ আন্দোলন গড়ে তোলা যেতে পারে। প্রশাসনের ওপর এমনভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যেন প্রশাসন ভেজাল-নিরোধক আইন আরও দৃঢ়ভাবে কার্যকর করতে বাধ্য হয়।

উপসংহার : মানুষের সৎ ইচ্ছা, সৎ প্রবৃত্তির জাগরণ না ঘটলে ভেজাল বিলোপ সম্ভব নয়। নিজের স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করার মানসিকতা দূর করতে না পারলে ভেজালের অস্তিত্ব বিনষ্ট হবে না। ভেজালের প্রসারতা রোধ করা সম্ভব না হলে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য মারাত্মক হুমকির মুখে পতিত হবে। অনেক মূল্যবান জীবন হয়তো অকালেই বিনষ্ট হবে। দেশের মানুষের নৈতিক আদর্শের অধঃপতনের ফলেই দেশজুড়ে চলছে ভেজালের দৌরাত্ম্য, জাল বস্তুর প্রতিপত্তি। সুতরাং এর কবল হতে দেশ ও জাতিকে রক্ষার্থে সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

৯০ জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থা

[ফা. প. ২০০৬]

উপস্থাপনা : বলা হয়– "স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল"। তাই সুস্থ, সুন্দর ও পরিপাটি জীবনযাপনের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি। নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ, পয়ঃজল ও মানবসৃষ্ট বর্জ্যের যথাযথ নিষ্কাশনসহ সকল প্রকার বর্জ্য দ্রুত অপসারণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি সম্পর্কিত অধ্যয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিচ্ছন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আধুনিক সভ্যতায় বিশেষত নগর সভ্যতায় স্বাস্থ্যনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো স্যানিটেশন (Sanitation) ব্যবস্থা। জাতীয় স্যানিটেশন বিষয়ে নিচে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো।

স্যানিটেশন ব্যবস্থা কী : ইংরেজি Sanitation শব্দের অর্থ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিধিব্যবস্থা। বিশেষত দক্ষতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বিধিবিধান স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতাধীন বিষয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (World Health Organization) সংজ্ঞা অনুসারে খাদ্য বিধি, বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন, কঠিন বর্জ্যের অপসারণ এবং বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ রোধ এসবই স্যানিটেশন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। আধুনিক নগর সভ্যতার যুগে স্যানিটেশন ব্যবস্থা হলো নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃজল ও মানবসৃষ্ট যাবতীয় বর্জ্যের নিষ্কাশন ও দ্রুত অপসারণ এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

স্যানিটেশন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য : স্যানিটেশন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো জনস্বাস্থ্য ঠিক রাখা, তার উন্নয়ন ঘটানো এবং পরিবেশগত দূষণসমূহ হ্রাস করা। বিভিন্ন রোগবাহী মাধ্যম যেমন– দূষিত খাবার ও পানি গ্রহণ, অস্বাস্থ্যকর পয়োব্যবস্থা, দূষিত মাটির সংস্পর্শে আসা, মানবসৃষ্ট বিবিধ বর্জ্য এবং জীবাণুপোষক ও ব্যাকটেরিয়াবাহী পোকামাকড়ের মাধ্যমে সুস্থ মানুষের দেহ সংক্রামক রোগ-জীবাণু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে স্যানিটেশন ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্যানিটেশন কার্যক্রমের পরিধি : আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থার কার্যক্রমগত ব্যাপ্তি ও পরিধি অনেক। একটি সুপ্রতিষ্ঠিত স্যানিটেশন ব্যবস্থা মানবসৃষ্ট যাবতীয় বর্জ্য ও অন্যান্য বিবিধ বর্জ্যের নিঃসারণ ও জমাকরণ, সংগ্রহ, শোধন ও নিরাপদ উপায়ে প্রকৃতিতে নিঃশেষ করায় কার্যক্রম গ্রহণ করে। অতএব মানবীয় ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে স্যানিটেশন ব্যবস্থায় অবশ্যই বর্জ্যের নিঃসরণ ও জমাকরণ, সংগ্রহ ও পরিবহন, শোধন ও ধ্বংস সাধন অথবা পরিবর্তন কর্মকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

বাংলাদেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

১। **মানবসৃষ্ট বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা :** বাংলাদেশে স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান সমস্যা হলো মানবসৃষ্ট বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা। বর্তমানে দেশে ৭৫ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার করছে। তবে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার তুলনামূলকভাবে

কম। দেশে প্রায় ১২ কোটি গ্রামীণ জনসংখ্যার মাত্র ১৬ ভাগ স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে। অপর ২২ ভাগ লোক নিজেদের তৈরি চাকতি পায়খানা ব্যবহার করে। অবশিষ্ট ৬২ ভাগ জনগোষ্ঠী অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে পায়খানা করে থাকে– উন্মুক্ত স্থান, রাস্তার পাশে, খোলা জায়গায় এবং ঝুলন্ত পায়খানায়, যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

পক্ষান্তরে শহরাঞ্চলের প্রায় পাঁচ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৪২ ভাগ স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতাভুক্ত। প্রথাগত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঢাকা মহানগরীর কিছু কিছু অংশে কার্যকর হয়েছে। তবে ব্যাপকসংখ্যক নগরবাসী আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

২। **বস্তিসমূহের অবস্থা :** নগরাঞ্চলে গড়ে ওঠা বস্তিসমূহের স্যানিটেশন ব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ বস্তিবাসীর কার্যত কোনো পায়খানা নেই। তারা কাঁচা, খোলা ও ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার করে। অনেক সময় তারা নগরীর রাস্তাঘাট ও মুক্ত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করে। ফলে নগরী অস্বাস্থ্যকর হয়ে পড়ে। পেটের পীড়াসহ নানাবিধ সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাবও ঘটে। এছাড়াও বস্তিসমূহ পানীয়জলসহ সাধারণ পানি সরবরাহ সুবিধা পায় না। বস্তিবাসীরা নানাবিধ উৎস থেকে প্রাপ্ত পানি ব্যবহার করে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

৩। **অনুন্নত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা :** পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্যানিটেশনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। বাংলাদেশে শুধুমাত্র ঢাকা মহানগরীর কিছু অংশে আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের ব্যয়বহুল আধুনিক পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা সর্বত্র না থাকার কারণে নগর কেন্দ্রসমূহ এবং প্রধান প্রধান শহরে ব্যাপকভাবে সেপটিক ট্যাংক এবং পানিস্রোত ফ্লাশ করার মাধ্যমে সম্পন্ন পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার হয়ে থাকে। তা সত্ত্বেও সেপটিক ট্যাংকের বর্জ্য ধ্বংস প্রক্রিয়া সাধারণভাবে খুবই নিম্নপ্রকৃতির। শহরগুলোর সেপটিক ট্যাংকগুলোর বর্জ্যসমূহ পরিবেশের ওপর কী ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা বিবেচনা না করেই উন্মুক্ত ডোবাসমূহে নির্গত করা হয়ে থাকে। এ পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরে।

৪। **গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্যানিটেশন সমস্যা :** গ্রামীণ অধিবাসিগণ প্রধানত তিন ধরনের স্যানিটেশন সমস্যার সম্মুখীন হয়। যথা–

ক. স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাব।

খ. বন্যাপ্রবণ অথবা পানির উচ্চস্তরবিশিষ্ট অঞ্চলসমূহে টেকসই ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার নকশাগত সমস্যা।

গ. নিরাপদ পানীয়জলের সমস্যা।

আমাদের প্রায় ১২ কোটি গ্রামীণ অধিবাসীর প্রায় ৬২ ভাগ লোক অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে অনেকাংশে আদিম পদ্ধতিতে মলমূত্র ত্যাগ করে থাকে। এছাড়াও যারা স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার করে তাদের ল্যাট্রিনের বর্জ্যও বন্যা এবং উচ্চ পানিস্তরগত কারণে পুকুর ও খালবিলের পানির সাথে একাকার হয়ে যায়। ফলে একদিকে পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হয় অপরদিকে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি ছড়ায়।

৫। **পানি সরবরাহ ব্যবস্থা :** পরিবেশগত স্বাস্থ্যবিধির একটি প্রধান দিক হলো বিশুদ্ধ পানীয়জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা। ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থার দায়িত্ব পালন করে জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর (Department of Public Health and Engineering)। এ যাবৎকাল পর্যন্ত

মোট ৬১টি জেলা শহর এবং প্রায় ২০টি থানা সদরে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়েছে। যার আওতায় সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের প্রায় ৪৫ শতাংশ অধিবাসী উপকৃত হচ্ছে। বাদবাকি ৫৫ শতাংশ লোক হস্তচালিত নলকূপসহ বিবিধ উৎস থেকে পানি সরবরাহ পেয়ে আসছে। ঢাকাসহ এসব শহরের পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত ও যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। পাইপলাইনের ছিদ্র, অনুন্নত ড্রেনেজসহ নানাবিধ কারণে সরবরাহকৃত পানির সাথে ময়লা ও দূষিত বর্জ্যের মিশ্রণ ঘটে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৬। **স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে উদ্যোগ :** জাতীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণ যাতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিট্যারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করে সেজন্য ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচারাভিযান চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি স্যানিট্যারি ল্যাট্রিন সুলভ ও স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ করা হয়েছে। গ্রামপর্যায়ে নিরাপদ পানীয়জল সরবরাহের বিভিন্ন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। স্বাস্থ্যসম্মত ও আর্সেনিকমুক্ত নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানির ব্যবহার এবং সংরক্ষণকৌশল ও প্রশিক্ষণ, পুকুরের আর্সেনিকমুক্ত পানি ফিল্টার পদ্ধতিতে পান উপযোগী করা। বরেন্দ্র এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন ও পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ– এসবই স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক উদ্যোগের প্রমাণ বহন করে। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (NGO) ব্যাপক অবদান রাখছে।

উপসংহার : স্যানিটেশন ব্যবস্থা কোনো দেশের উন্নয়নের প্রমাণ বহন করে থাকে। জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, জনগণের গড় আয়ু বৃদ্ধি ইত্যাদি সূচকের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সরাসরি ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে পশ্চাৎপদ থাকলেও বর্তমানে এ গতিধারায় পরিবর্তন এসেছে। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এখন স্বাস্থ্যসচেতন। তারা স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারে ব্যাপক উৎসাহ দেখাচ্ছে।

৯১ ধূমপানে বিষপান [ফা. প. ২০০১]

অথবা, ধূমপানের অপকারিতা

অথবা, ধূমপানের কুফল

উপস্থাপনা : ধূমপানের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরতে গিয়ে জনৈক প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী বলেছেন, "Drink poison but leave smoking." পৃথিবীতে সর্বাধিক প্রচলিত একটি নেশা হলো ধূমপান। এটা সর্বজনবিদিত যে, ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আজ ধূমপানের ফলে মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। তাই ধূমপায়ীদেরকে অবশ্যই ধূমপান পরিত্যাগ করা উচিত।

ধূমপানের ইতিহাস : রেড ইন্ডিয়ানরা সর্বপ্রথম বিশ্বে ধূমপানের প্রবর্তন করে। ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যযুগে মোগল রাজদরবারে যে বিলাসবহুল পরিবেশে তামাক সেবন করা হতো তার সাক্ষ্য বহন করছে মোগল চিত্রকলা। কিউবার রাজধানী হাভানায় ১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম সিগারেট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারণা করা হয়, পর্তুগিজ বণিকদের আগমনের পর থেকেই আমাদের দেশে ধূমপানের অভ্যাস শুরু হয়।

ধূমপান অভ্যাসের কারণ : ধূমপান একটি বদভ্যাস। এ বদভ্যাসে আসক্ত হওয়ার কারণগুলো নিম্নরূপ–

ক. অল্প বয়সী কিশোর-কিশোরীরা প্রথমত কৌতূহলী হয়ে অথবা কুসঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে ধূমপান আরম্ভ করে।

খ. বংশানুক্রমিকভাবেও অনেকে ধূমপান করে।

গ. 'ধূমপানে ক্লান্তি দূর হয়'– 'ধূমপান করলে স্মার্ট মনে হয়' অনেকে এসব ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ধূমপানের অভ্যাস গড়ে তোলে।

ধূমপানের উপকরণ : ধূমপানের উপকরণ দুটি। যথা–

ক. তামাক খ. গাঁজা পাতা

তামাক পাতা শুকিয়ে তা প্রক্রিয়াজাত করে তা থেকে সিগারেট তৈরি করা হয়।

ধূমপানের ফলে সৃষ্ট রাসায়নিক উপাদানসমূহ : ধূমপানের ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া থেকে চার হাজারের মতো রাসায়নিক যৌগ এ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্যাসীয় উপাদানসমূহের মধ্যে যেগুলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে সেগুলো হলো–

ক. কার্বন মনোক্সাইড
খ. কার্বন- ডাই অক্সাইড
গ. নাইট্রোজেন অক্সাইড
ঘ. অ্যামোনিয়া
ঙ. উদ্বায়ী নাইট্রোসায়ামিন
চ. অ্যালড্রোজেন সায়ানাইড
ছ. উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন
জ. অ্যালকোহল
ঝ. অ্যালডিহাইড
ঞ. কিটোন ইত্যাদি।

ধূমপান যেভাবে দেহের ক্ষতি করে : স্বাস্থ্য বিজ্ঞানিগণ গবেষণা করে মন্তব্য করেছেন– "One pulp of cigarette smoke contains fifteen billion particles of matter." তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামক একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ আছে, সেটিই ধূমপায়ীদের স্বাস্থ্যে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কারণ। ধূমপানের ফলে ধোঁয়ার সঙ্গে এ বিষ মানুষের শ্বাসনালি দিয়ে প্রথমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। পরে তা রক্তের সাথে মিশে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং কিছু অংশ পুনরায় বের করে দেওয়া ধোঁয়ার সাথে বের হয়ে আসে। এর ফলে নিয়মিত ধূমপায়ীদের ফুসফুসের ভেতর খুব ধীরে ধীরে মৌচাকের মতো নিকোটিন জমতে থাকে। এই বিষ ফুসফুসকে আস্তে আস্তে পঙ্গু করে দেয়।

ধূমপানের কারণে যেসব রোগ হয় : ধূমপানের কারণে বিভিন্ন জটিল ও মারাত্মক ব্যাধি হয়ে থাকে। ধূমপানের ফলে যেসব রোগব্যাধি বিস্তার লাভ করে নিচে তা উপস্থাপন করা হলো–

ক. **ক্যান্সার :** তামাকের ধোঁয়ায় কোকার সিনোজেন নামক কিছু উপাদান থাকে, সেগুলো সরাসরি ক্যান্সার সৃষ্টি করে না; কিন্তু ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থের সাথে ক্রিয়া করে ক্যান্সার সৃষ্টিকে বেগবান করে।

খ. **ক্রোনিক ব্রঙ্কাইটিস :** ধূমপানের ধোঁয়া মানুষের শ্বাসনালীর ঝিল্লিগুলোতে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ধূমপানের মাত্রা অত্যধিক হলে একপর্যায়ে ফুসফুস বিকল হয়ে যায়।

গ. **অন্যান্য রোগ :** ধূমপানের ফলে দন্তক্ষয়, দাঁতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাওয়া, মাড়ির রোগ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, হৃদরোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগ হয়। ধূমপান দৃষ্টিশক্তিরও ক্ষতিসাধন করে। মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের অন্যতম প্রধান কারণ ধূমপান। এটা হৃৎপিণ্ডে রক্তসঞ্চালনেও বাধা সৃষ্টি করে। ধূমপান উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধিতে সাহায্য

করে। গর্ভবতী মহিলার পাশে প্রতিনিয়ত ধূমপান করলে গর্ভস্থ সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। ধূমপায়ী মহিলাদের মধ্যে মৃত ও কম ওজনের শিশু জন্মদানের ঘটনা বেশি। এমনকি তাদের গর্ভজাত সন্তানও নানারকম ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারে।

ব্যক্তিজীবনে ধূমপানের অপকারিতা : ধূমপান ব্যক্তিজীবনে নানাভাবে ক্ষতিসাধন করে। কেননা ধূমপানের কোনো উপকারী দিক নেই। এর শতকরা ১০০ ভাগই অপকারী। নিচে এর অপকারিতা বর্ণনা করা হলো–

ক. অর্থের অপচয় হয়, খ. ক্যান্সারের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, গ. ধূমপানকারী নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করতে থাকে, ঘ. সিগারেটের খণ্ডাংশ যেখানে সেখানে না নিভিয়ে ফেলার কারণে অনেক সময় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়।

ধূমপানে সমাজ ও পরিবেশের দূষণ : ধূমপানকে এক ধরনের সামাজিক অপরাধ বলা চলে। ধূমপানের ফলে পরিবেশও দূষিত হয়। ধূমপানের ফলে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব উপলব্ধি করে আজ বিভিন্ন রকম Anti smoking movement গড়ে উঠেছে। তাদের মূলমন্ত্র হলো– "ধূমপান ছেড়ে দিন, ফুলের সুবাস নিন।"

জাতীয় জীবনে ধূমপানের অপকারিতা : অত্যধিকহারে ধূমপান জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকিস্বরূপ। অবিবেচক ধূম্রাসক্ত জনগণ রাস্তাঘাট, অফিস-আদালতে, যানবাহনে সর্বক্ষেত্রে ধূমপান করে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত করে, অন্যদিকে তা অধূমপায়ীদের জন্যও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির কারণ হয়। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য জনবল নিয়োগ করতে হয় এবং বিদেশ থেকে ঔষধ আমদানীর জন্য বিপুল বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয়। খালি সিগারেটের প্যাকেট, পোড়া সিগারেটের অংশ, দেয়াশলাইয়ের কাঠি ইত্যাদি যত্রতত্র ফেলে নাগরিক দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়। সিগারেটের আগুনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা অহরহ ঘটে। ধূমপান এভাবে বিপুল অর্থ ও জনশক্তির অপচয় ঘটিয়ে জাতিগঠন এবং সভ্যতা বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সতর্কীকরণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা : বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে ধূমপানের করাল ছোবল থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো সফলভাবে বাস্তবায়িত হলেই ধূমপান ধীরে ধীরে কমে আসবে।

ক. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো ব্যাপকভিত্তিতে তুলে ধরতে হবে।
খ. তামাক উৎপাদন ও আমদানির ওপর কঠোরতা আরোপ করতে হবে।
গ. সামাজিকভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে Anti smoking movement গড়ে তুলতে হবে।
ঘ. ধর্মীয় প্রভাব সৃষ্টি করে ধূমপান বন্ধ করতে হবে।
ঙ. পত্রপত্রিকাসহ সকল প্রচার মাধ্যমে তামাকজাত পণ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করতে হবে।
চ. নতুন মুখে যাতে সিগারেট না ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
ছ. সর্বোপরি মানুষকে ধূমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আরও সচেতন করতে হবে।
জ. সিগারেটের বিক্রয় ও বিপনণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
ঝ. প্রকাশ্যে ধূমপান করার শাস্তি নগদ অর্থ ৫০ টাকা জরিমানা করার বিধান কার্যকর করা।

উপসংহার : ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর জেনেও সরকার দেশে তামাক উৎপাদন এবং সিগারেটের বিক্রয় ও বিপনণ বন্ধ করছে না। ধূমপায়ীরাও সহজে এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারছে না। তার অন্যতম কারণ সমাজে এর অবাধ সরবরাহ। তামাক চাষ অথবা সিগারেট ফ্যাক্টরির সাথে জড়িত লাখ লাখ কৃষক-শ্রমিকের জীবিকার বিকল্প পথ আবিষ্কৃত না হলে শুধু উপদেশ দিয়ে এর মূলোৎপাটন করা সম্ভব নয়।

৯২ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

অথবা, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

উপস্থাপনা : বলা হয়– Islam is the complete code of life. মানব জীবনের সকল দিক নিয়ে ইসলাম আলোচনা করেছে। মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে ইসলামে আলোচনা নেই। তেমনি মানুষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়েও ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। মহানবি (স) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ'। কারণ নামাজ, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির জন্য পবিত্রতা আবশ্যকীয়।

পরিচ্ছন্নতার সংজ্ঞা : আরবি اَلنَّظَافَةُ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ 'পরিচ্ছন্নতা'। এর অর্থ হলো পরিষ্কার হওয়া, পাকসাফ হওয়া। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় কতিপয় নির্ধারিত নিয়মে পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে সুনিয়ন্ত্রিত কার্য সম্পাদন করাকে পরিচ্ছন্নতা বলে।

পরিচ্ছন্নতার প্রকারভেদ : পরিচ্ছন্নতা দুই প্রকার। যথা–

ক. বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা
খ. অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা

বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা : বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা বলতে বোঝায় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট উপায়ে কিছু কার্য সম্পাদন করা। যেমন– অজু গোসল।

অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা : অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতা হলো মনের কুটিলতা দূর করে মনকে কলুষমুক্ত রাখা। কারণ আল্লাহর দরবারে ইবাদত কবুল হতে হলে মনের নিষ্ঠা ও পবিত্রতা আবশ্যক।

পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে আল কুরআন : পবিত্র কুরআনে পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যারা পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে, তারা তার প্রিয় বান্দা। যারা পাক সাফ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।" (সূরা তওবা– ১০৮) আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেন, 'যারা বার বার তওবা করে এবং পাক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ভালোবাসেন। (সূরা বাকারা– ২২)

পরিচ্ছন্নতা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মানুষকে সবরকমের মন্দ কাজ ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। মনের দিক থেকে পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি কখনো খারাপ ও অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত হতে পারে না।

পরিচ্ছন্নতা সঠিক পথে পরিচালিত করে : একজন পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে। আর তাই আল্লাহ তায়ালাও তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তাকে সবধরনের বালা মুসিবত থেকে মুক্ত রাখেন। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণমূলক কাজে আল্লাহ তাকে পরিচালিত করেন।

নবি-রাসুলদের জীবনে পরিচ্ছন্নতা : নবি-রাসুল ও অলি-আউলিয়াদের জীবনের সর্বোত্তম ভূষণ ছিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। তাঁদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাঁরা সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। ফলে তাঁরা সফলকাম হয়েছেন।

পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করেন : অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে কেউ পছন্দ করেন না। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করেন এবং তার গা ঘেষে বসতেও ইতস্তত করেন না; বরং ভালো লাগে।

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ : ব্যক্তিজীবনে পরিচ্ছন্নতার অপরিসীম তাৎপর্য উপলব্ধি করে মহানবি (স) ঘোষণা করেন, "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।" ইসলামে পবিত্রতা বা

পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব এত বেশি যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন মাজিদ স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন।

পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয়পাত্র : মহান রাব্বুল আলামীন নিজে পবিত্র, তাই তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। যে ব্যক্তি তার প্রতিটি কাজকর্মে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা রক্ষা করে, সে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়-পাত্র। আল্লাহর প্রিয় মানুষ যেমন নবি-রাসুল, অলি-আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ ও হাক্কানী আলেম সবাই ছিলেন পূতপবিত্র। তাদের প্রতিটি কাজকর্মই ছিল স্বচ্ছ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের ভূষণ : পরিচ্ছন্নতা ঈমানের একমাত্র দাবি। পরিচ্ছন্নতা ব্যতীত ঈমান রক্ষা করা কঠিন। অপরিচ্ছন্ন ও অপবিত্র ব্যক্তিকে শয়তান সহজেই ধোঁকা দিতে পারে। যে ব্যক্তি তার কাজকর্মে যতটুকু পবিত্রতা রক্ষা করতে পারল, তার ঈমানের স্বচ্ছতা ও পরিপূর্ণতাও ততটুকু। মহানবি (স) পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধেক ঘোষণা করে সুস্পষ্টভাবেই তা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

পরিচ্ছন্নতার সুফল : পরিচ্ছন্নতা শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ইবাদতের প্রয়োজনেই অত্যাবশ্যকীয় নয়; বরং স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং চিত্তকে সজীব ও প্রফুল্ল রাখার লক্ষ্যে পরিচ্ছন্নতা অর্জন একান্ত কর্তব্য। দেহ ও মনের শক্তি, সুস্থতা ও তৃপ্তি পূর্ণভাবে লাভ করতে হলে ঘরে-বাইরে, কর্মক্ষেত্রে সর্বত্র পরিচ্ছন্নতাকে আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। একজন মুসলমানের ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা তখনি আসে, যখন সে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। পরিচ্ছন্নতা ছাড়া আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থায়ী হতে পারে না। তাই দেহ ও মনের শক্তি পূর্ণভাবে লাভ করে আল্লাহর ইবাদত করতে হলে, পরিচ্ছন্নতাকে জীবনের সাথে একীভূত করে নিতে হবে।

৯৩ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় [ফা. প. ২০১৬, '১৮]

উপস্থাপনা : ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা ও ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নে সূচিত হয়েছে ঐতিহাসিক মাইলফলক। এর ফলে এদেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও ইসলামপ্রিয় মানুষের দীর্ঘ বছরের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত অ্যাফিলিয়েটিং (অধিভুক্ত) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। নতুন অনুমোদিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন থেকে মাদরাসা শিক্ষাধারার ফাজিল/স্নাতক ও কামিল/স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি প্রদান করা হচ্ছে।

পটভূমি : দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং ইসলামপ্রিয় মানুষ এদেশে ইসলামি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। মাদরাসা শিক্ষকদের সর্ববৃহৎ সংগঠন জমিয়াতুল মোদাররেছীন বহু বছর যাবৎ মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক একটি অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়ে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়নের ঘোষণা দেয়। শিক্ষানীতিতে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে দ্রুত এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি জানান জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের দাবির প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেন। গত ২০১১ সালের ২০শে এপ্রিল বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছীনের এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জমিয়াতুল মোদাররেছীনের নেতৃবৃন্দসহ উপস্থিত আলেম-ওলামাদের সাথে আলোচনার পর এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ঘোষণা

দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন। অতঃপর ৬ই আগস্ট 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১২'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা কমিটি। মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর অবশেষে আলেম-ওলামাদের দীর্ঘ স্বপ্ন-সাধনার বাস্তবায়ন হলো।

বিল উত্থাপন : ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের আগে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, এদেশে সুদীর্ঘকাল ধরে আলেম-ওলামাগণ আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করে আসছিলেন। ব্রিটিশ সরকার, পাকিস্তান সরকার এমনকি বিগত দিনে বাংলাদেশের কোনো সরকারও তাদের এই দাবি বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু কিছুদিন আগে এদেশের শীর্ষ আলেমগণ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাদের দাবি উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে কথা বলে তা গ্রহণ করে আইন প্রণয়ন করার কথা বলেন। অবশেষে এই বিলটি জাতীয় সংসদে উত্থাপনের মাধ্যমে দীর্ঘ বছর পরে হলেও এদেশের আলেম-ওলামাদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন থেকে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, ফাজিল/স্নাতক, কামিল/স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম/পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, নতুন প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হবে জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে শুধু মাদরাসা শিক্ষার জন্য পৃথক একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। যেটি হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অনুমোদনকারী বা অ্যাফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। স্বতন্ত্র ইসলামিক আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ফাজিল/স্নাতক ও কামিল/স্নাতকোত্তর পর্যায়ের সব ডিগ্রি এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া হবে। দেশে এ ধরনের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় এটাই প্রথম। বিশ্ববিদ্যালয়টির কাজ হবে ফাজিল এবং কামিল পর্যায়ের মাদরাসাগুলোর অনুমোদন দেওয়া, অনুমোদন বাতিল করা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা গ্রহণ, ডিগ্রি প্রদান করা। তবে সরকারি কারিকুলাম অনুযায়ী না চলার কারণে দেশের কওমী মাদরাসাগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত হবে না। দেশে কামিল এবং ফাযিল পর্যায়ের এক হাজার নয় শ' মাদরাসা রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো : এ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ভিসি, একজন প্রো-ভিসি ও একজন ট্রেজারার থাকবেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির সমান যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হবেন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পদ হবে ভিসি। বিলে বলা হয়, এই বিধান অনুযায়ী সরকার নির্ধারিত স্থানে একটি পৃথক ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবে। বিশ্ববিদ্যালয় এর উপযুক্ত বিবেচনায় দেশের জন্য যে-কোনো বিভাগীয় শহরে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করতে পারবে। বিলে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার এবং সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য সমন্বয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পরিগণিত হবে। বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা, দায়িত্ব, শিক্ষাদান, মঞ্জুরি কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা, চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাদরাসা পরিদর্শক, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্র, অর্থ কমিটি, পরিকল্পনা উন্নয়ন কমিটি, অধিভুক্ত কমিটি, নির্বাচনি বোর্ডের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলিসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে। এছাড়া

বিলে বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব পরিদর্শক ও পরিদর্শন, মাদরাসায় শিক্ষাদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসার মধ্যে সহযোগিতা, মাদরাসা সংক্রান্ত সাধারণ বিধান, বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম, ভর্তি, পরীক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় বিধি প্রণয়ন, প্রবিধান, শিক্ষার মাধ্যমসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিধান করা হয়েছে।

মাদরাসায় অনার্স কোর্স কার্যক্রম : ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকা, সরকারি আলিয়া মাদরাসা সিলেট, সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া কামিল মাদরাসা বগুড়াসহ দেশের অর্ধশতাধিক কামিল মাদরাসায় ফাযিল অনার্স (চার বছর মেয়াদি) কোর্স চালু করা হয়েছে। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছে। পর্যায়ক্রমে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও অনেক মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উপসংহার : দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে ২০১৩ সালে 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়। অতঃপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় সংসদ এ বিল পাস করে। এভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাদরাসা শিক্ষক-শিক্ষার্থী, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ ও দেশের জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে এদেশে ইসলামি শিক্ষার মান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করবে।

৯৪ বার্ড ফ্লু

অথবা, বার্ড ফ্লু আতঙ্ক ও বাংলাদেশ

অথবা, বর্তমান বিশ্বে বার্ড ফ্লু আতঙ্ক

উপস্থাপনা : বার্ড ফ্লু বর্তমান বিশ্বে প্রাণঘাতি ভাইরাসসমূহের অন্যতম। ইতোমধ্যে এ ভাইরাসটি মানুষের মনে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। বার্ড ফ্লু ভাইরাসের নাম 'অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' বা H5Ni। ১৮৭৮ সালে প্রথম বার্ড ফ্লু রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ১৯১৮ সালে স্পেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি মহামারি আকারে দেখা দেয় এবং এতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বের ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। ১৯৯৭ সালে হংকং-এ মানুষের দেহে H5Ni ভাইরাস ধরা পড়ে। এরপর ধীরে ধীরে ভাইরাসটি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বার্ড ফ্লু : বার্ড ফ্লু একটি পাখিবাহিত ভাইরাসঘটিত রোগ। আর্থোমিক্সিবাইরিডি গোত্রের এ ভাইরাস রোগের সাথে মানুষের প্রথম পরিচয় হয় ১৮৭৮ সালে। ১৯৫৫ সালে ইতালিতে এ রোগ 'ফাউল প্লেগ' নামে পরিচিত হয়, যা আজ বার্ড ফ্লু বা অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা নামে পরিচিত। এটি অতি দ্রুত এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে ছড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হচ্ছে, এ ভাইরাসটি বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। এটি সার্স ভাইরাসের চেয়েও বিপজ্জনক। এশিয়া মহাদেশে বর্তমানে H5Ni নামের যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসটি হাঁস-মুরগিকে আক্রমণ করছে, মানবদেহে তার প্রথম লক্ষণ পাওয়া যায় হংকং-এ ১৯৯৭ সালে। ১৯৯৮ সালে চীনে এ রোগ সনাক্ত করা হয়। ২০০৪ সালে মহামারি আকারে বার্ড ফ্লু দেখা দেয় ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে।

বার্ড ফ্লুর লক্ষণ ও প্রতিকার : বার্ড ফ্লু রোগের উপসর্গ হিসেবে দেখা দেয় সর্দি, হাঁচি, জ্বর, গলাব্যথা এমনকি সারা গায়েও ব্যথা হয়। এর ফলে চোখে ইনফেকশন ও মারাত্মক

নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। ধীরে ধীরে রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। তীব্র শ্বাসকষ্টের এক পর্যায়ে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

বার্ড ফ্লুর ভাইরাস প্রতিরোধে এমানটাডিন ও রাইমানটাডিন ঔষধ কার্যকর বনে প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া সেলটানিডর ও জ্যানাডাভির ঔষধও বেশ কার্যক্রম বনে প্রমাণিত হয়েছে।

বার্ড ফ্লু ও এশিয়া : এ পর্যন্ত এশিয়ার ১১টি দেশে বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। দেশগুলো হলো চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম, জাপান, তাইওয়ান, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, পাকিস্তান ও ভারত। ২০০৮ সালে বাংলাদেশেও বার্ড ফ্লু রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা WHO হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, এশিয়ায় বার্ড ফ্লু যেভাবে সংক্রমিত হচ্ছে, তাতে এটি সার্স ভাইরাসের মতোই মহামারী আকার ধারণ করার আশঙ্কা রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, সার্স ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ২০০৩ সালে বিশ্বজুড়ে প্রায় ৮০০ লোকের মৃত্যু হয় এবং আক্রান্ত হয় প্রায় ৮,০০০ জন। ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় ও হোচিমিন সিটির আশেপাশে অধিকাংশ পোলট্রি খামারেই এ ভাইরাস সনাক্ত করা হয়। ফলে দেশটিতে প্রায় ২ কোটি মুরগি নিধন করা হয় এবং এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জনের মৃত্যুও হয়। সমসাময়িক কালে থাইল্যান্ডে ১ কোটিরও বেশি মুরগি নিধন করা হয় এবং ৭৬টি প্রদেশের মধ্যে কমপক্ষে ৩৫টি প্রদেশে বার্ড ফ্লু ছড়িয়ে পড়ে। থাই সরকার বার্ড ফ্লু আক্রান্ত ফার্মের ৩ মাইলের মধ্যে সব মুরগি হত্যা এবং বেচাকেনা বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। অবশেষে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে ডেঞ্জার জোন (Danger zone) ঘোষণা এবং এর ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে পোলট্রি সামগ্রী চলাচলও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় ৫০ লাখ মুরগি মারা যায়। সে সময় তাইওয়ানের ৮টি ফার্মে H5Ni সনাক্ত করা হয় এবং প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার মুরগি মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। জাপান সরকার আক্রান্ত ফার্মের ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে মুরগি ব্যবসায় বন্ধ করে দেয় এবং প্রায় ৪০ হাজার মুরগি নিধন করা হয়। বার্ড ফ্লুতে কম্বোডিয়াতে প্রায় ৪ হাজার এবং লাওসে বার্ড ফ্লুতে কয়েক হাজার মুরগি মারা যায়। চীনে প্রায় ৬ হাজার মুরগি মেরে ফেলা হয়। ভিয়েতনামে শূকরের দেহেও H5Ni ভাইরাসের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। ২০০৬ সালে ভারতেও ৫০ হাজার পাখির মধ্যে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়।

বার্ড ফ্লু ও বিশ্ব : বিশ্বে যে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের বিস্তার ঘটেছে, তা মূলত এশিয়া মহাদেশকে কেন্দ্র করেই। সম্প্রতি এশিয়ার দেশগুলো পেরিয়ে বার্ড ফ্লু পশ্চিমা দেশগুলোতে হানা দিয়েছে। ২০০৬ সালের শুরুর দিকে প্রথমে তুরস্ক পরে গ্রিস, হাঙ্গেরি হয়ে মধ্য ইউরোপের পোল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি ও ডেনমার্কে বার্ড ফ্লু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বের বৃহৎ পোলট্রি উৎপাদনকারী দেশ ফ্রান্সে একটি হাঁস H5Ni ভাইরাসে মারা গেছে বলে সে দেশের সরকার নিশ্চিত হয়। নাইজেরিয়ায় প্রায় ৪০ থেকে ৫০ লাখ মুরগি বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় সরকার এ মুরগিগুলোকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেয় এবং ফার্ম মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করে।

ব্যবসায়িক মন্দাবস্থা : বার্ড ফ্লু ভাইরাসের সংক্রমণ ও বিস্তার এশিয়ার পোলট্রি ও খাদ্য শিল্পের জন্য একটি আতঙ্কস্বরূপ। বার্ড ফ্লু আক্রান্ত দেশের মানুষ বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে হাঁস-মুরগির মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, "বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস-মুরগির মাংস উত্তমরূপে সিদ্ধ করলে তা বার্ড ফ্লু থেকে মুক্ত হয়।" তবু বিভিন্ন দেশ বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত দেশ থেকে হাঁস-মুরগি আমদানি নিষিদ্ধ করে দেয়।

ফলে মুরগির মাংস রপ্তানিকারী দেশগুলো অর্থনৈতিক সংকটাবস্থায় পতিত হয়। বিশ্ববাজারে জাপান সবচেয়ে বড় পোলট্রি আমদানিকারক দেশ। আর এশিয়ার বৃহত্তম পোলট্রি রপ্তানিকারক দেশ হলো থাইল্যান্ড। এশিয়া মহাদেশে বার্ড ফ্লু মহামারি আকারে দেখা দিলে এসব দেশের পোলট্রি ব্যবসায় মুখথুবড়ে পড়ে এবং বিনিয়োগকারীরা মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বার্ড ফ্লুর কারণে বিশ্ব পোলট্রি ব্যবসায় এক মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু : প্রাকৃতিকভাবেই বাংলাদেশের অবস্থান বার্ড ফ্লু বলয়ের মধ্যে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যে কয়টি দেশে প্রায় প্রতিবছরই বার্ড ফ্লু মারাত্মক আকারে বিস্তারলাভ করে, বাংলাদেশ সেসব দেশের মধ্যে অন্যতম। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশে এ রোগ বিস্তারের ঝুঁকি সর্বাধিক। আর সম্ভবত এ কারণেই ২০০৮ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ড ফ্লু ভয়াবহ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামের পোলট্রি শিল্প অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়। লাখ লাখ ব্রয়লার, লেয়ার মুরগি ও বাচ্চা ধ্বংস করতে হয় এ রোগ প্রতিরোধের জন্য। উজাড় হয়ে যায় শত শত পোলট্রি ফার্ম, বেকার ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে হাজার হাজার পোলট্রি মালিক ও শ্রমিক।

বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে আমাদের করণীয় : ভবিষ্যতে আমাদের দেশে বার্ড ফ্লু ভাইরাস প্রতিরোধকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে :

ক. দেশের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে বার্ড ফ্লু সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

খ. দেশের যেসব অঞ্চলে বার্ড ফ্লু ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেসব অঞ্চল থেকে পোলট্রি সামগ্রী, ডিম ও মুরগির বাচ্চা অন্যত্র বহন ও বিক্রি সাময়িকভাবে বন্ধ করতে হবে।

গ. জনগণকে অতিথি পাখির মাংস খাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। কারণ অতিথি পাখির মাধ্যমেও বার্ড ফ্লু বিস্তারলাভ করতে পারে।

ঘ. বার্ড ফ্লু প্রতিরোধের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে চিকিৎসা সেল গঠন করতে হবে, যাতে তারা সারাক্ষণ বার্ড ফ্লুর ওপর গবেষণা করতে পারেন এবং কোনো এলাকায় বার্ড ফ্লু সংক্রমণের খবর পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।

ঙ. বার্ড ফ্লু-সংক্রমিত দেশ থেকে যারা আগমন করে, তাদেরকে বিমানবন্দরেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত।

চ. দেশের সকল পর্যায়ের পোলট্রি ফার্মগুলোতে বার্ড ফ্লুর অস্তিত্ব আছে কিনা, তা খুঁজে বের করার জন্য গবেষক ও চিকিৎসক দল গঠন করতে হবে।

ছ. বার্ড ফ্লু-আক্রান্ত বা সন্দেহজনক কাক, হাঁস, মুরগি কিংবা পাখি কোথাও মরে থাকতে দেখলে তা দ্রুত মাটিতে পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

জ. মাস্ক ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেনে সেগুলো মেনে চলতে হবে।

উপসংহার : বর্তমান বিশ্বে বার্ড ফ্লু এক ভয়াবহ আতঙ্কের নাম হলেও আমাদের দেশে তা কখনো মহামারি আকারে বিস্তার লাভ করেনি। তবে এতে আমাদের আনন্দিত হওয়ারও কিছু নেই। কারণ বাংলাদেশ যেসব দেশ থেকে পোলট্রি সামগ্রী আমদানি করে, সেসব দেশ থেকে যে-কোনো সময় এ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে মহামারি আকারে বিস্তারের আশঙ্কা রয়েছে। তাই বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু-এর ভয়াবহ পরিণতি হওয়ার আগেই সরকারি ও বেসরকারিভাবে এটি প্রতিরোধের জন্য এখনই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৯৫ আদর্শ মানব হযরত মুহাম্মদ (স)
অথবা, আমার প্রিয় মহাপুরুষ/ মহামানব
অথবা, সমাজসংস্কারক হযরত মুহাম্মদ (স) [ফা. প. ১৯৯৬]

উপস্থাপনা : সমগ্র বিশ্ব যখন অজ্ঞানতা, অনাচার, কুসংস্কার ও পাপপঙ্কিলতার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত, যখন পৃথিবীর সর্বত্র মানবতা ভূলুণ্ঠিত, তখন মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স)। এ মহামানব মানবতার মুক্তি ও শান্তির যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তার তুলনা সত্যিই বিরল। তিনি ইতিহাসে অতুলনীয়, অসাধারণ ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : হযরত মুহাম্মদ (স) ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট মোতাবেক ১২ই রবিউল আউয়াল, মতান্তরে ৫৭১ সালের ২০শে এপ্রিল, মোতাবেক ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা।

আল আমিন উপাধি লাভ : Morning shows the day. তেমনি বাল্যকালেই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (স) একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ হিসেবে মানবতাকে আলোকিত করবেন। সত্যবাদিতা, কর্মনিষ্ঠা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কারণে বাল্যকালেই অধঃপতিত আরববাসীদের নিকট থেকে তিনি 'আল আমীন' উপাধি লাভ করেন।

হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ : কিশোর মুহাম্মদ (স) পনেরো বছর বয়সে নিজের জাতিকে শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত দেখে হারবুল ফুজ্জারে তাঁর চাচাদের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তবে তিনি কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেননি।

'হিলফুল ফুযুল' গঠন : হারবুল ফুজ্জারের ঘটনা কিশোর মুহাম্মদ (স)-এর কোমল মনকে নাড়া দেয়। তাই তিনি আরবের বুকে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'হিলফুল ফুযুল' নামে একটি শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

নবুয়ত লাভ : ৬১০ খ্রিস্টাব্দে চল্লিশ বছর বয়সে হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর দূত হযরত জিবরাঈল (আ) মারফত অহীপ্রাপ্ত হন। আল্লাহর বিধান উচ্চকিত করার মহান দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর কাঁধে।

ইসলাম প্রচার ও কুরাইশদের নির্যাতন : নবুয়ত প্রাপ্তির পর মহানবি (স) সর্বপ্রথম গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাঁর নিকটাত্মীয় কয়েকজন ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন। এরপর তিনি প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজ শুরু করেন। এ কারণে তাঁর ও নওমুসলিমদের ওপর শুরু হয় অত্যাচারের স্টিমরোলার।

মদিনায় হিজরত : কুরাইশদের অত্যাচারের মাত্রা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে, তখন মহানবি (স) আল্লাহর নির্দেশে স্বদেশ ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেন। ফলে ইসলাম প্রচারে যোগ হয় নতুন মাত্রা। শুরু হয় মহানবি (স)-এর মাদানি জীবন।

রাজনীতিবিদ : হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন একজন অতুলনীয় বিচক্ষণ, প্রজ্ঞাবান ও অনন্য আদর্শ রাজনীতিবিদ। মদিনা সনদ, হোদায়বিয়ার সন্ধি, বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে।

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা : মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। ইসলাম নির্দেশিত মানবাধিকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে বিশ্বের ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা : মানবতার মহান আদর্শ, নারী অধিকারের স্থাপক মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) পরিবার ও সমাজজীবনে নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিক পালন করেন। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ- لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ-

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের একের ওপর অপরের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।

রাসুল (স) ঘোষণা করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করে।" সূরা নিসা-৩২

অর্থনৈতিক সংস্কার : মহানবি (স)-এর আবির্ভাবকালে আরব উপদ্বীপে কোনো সুষ্ঠ অর্থনীতি ছিল না। সমাজের কমসংখ্যক লোকই ছিল বিত্তশালী। মদ, জুয়া, প্রতারণা, লুটতরাজ ছিল অর্থোপার্জনের প্রধান উপায়। তাই মহানবি (স) সুষ্ঠু অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার সাধন করেন। তাঁর প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থায় আয়ের উৎস ছিল মালে গনীমাহ, ফাই, যাকাত, জিযিয়া ও খারাজ। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব রকমের বিপন্ন লোকদের জন্য বায়তুলমাল থেকে স্থায়ীভাবে সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। 'মিতব্যয়িতা ও শস্য ফলাও' নীতি ছিল মহানবি (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারের অন্যতম দিক।

দাস প্রথার উচ্ছেদ : মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স) আরবসমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসা দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধনে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে মানবতার মর্যাদাকে সমুন্নত করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "দাসকে মুক্তিদানের চেয়ে সর্বোত্তম কাজ আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।"

সামাজিক বৈষম্যের অবসান : রাসুল (স) আরবসমাজে বিদ্যমান ধনী-গরিব, উঁচু-নীচু, সাদা-কালোর ব্যবধান ও বৈষম্যের অবসান ঘটান। তিনি "হাবশি গোলাম আর কুরাইশদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই বলে ঘোষণা করেন।"

জীবন, সম্পত্তি ও বিধর্মীদের নিরাপত্তা বিধান : মহানবি (স) সাধারণ মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করেন। তিনি দুনিয়ার সকল ধর্মানুসারীদের সমমর্যাদা প্রদান করেন।

শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার : শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের প্রতি মহানবি (স) সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেন। কেননা মানব সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি জীবনীশক্তি। তিনি ঘোষণা করেন, "প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর জ্ঞানার্জন করা ফরজ।"

শ্রেষ্ঠ আদর্শবান : রাসুল (স) ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন, "রাসুল (স)-এর জীবনেই রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।"

শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক : মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ, পরকালে একমাত্র সুপারিশকারী ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর মতো দক্ষ, সুযোগ্য, বিচক্ষণ ও সফল রাষ্ট্রনায়ক তাঁর আগেও ছিল না, ভবিষ্যতেও হবে না।

সামরিক সংস্কার : সামরিক ক্ষেত্রেও মহানবি (স)-এর সংস্কার লক্ষণীয়। একজন দক্ষ রণকুশলী হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। যুদ্ধ ও সংগ্রামে নেতৃত্ব দান করেই তিনি দ্বীনকে বিজয়ী শক্তির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। খোদাদ্রোহী ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি ইঞ্চি ভূমি রক্ষার জন্য তিনি নিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।

উপসংহার : সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স) পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের নজির স্থাপন করেছেন। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাই তিনি আমার সর্বাধিক প্রিয় মহাপুরুষ। Encyclopedia Britanica-তে স্পষ্টতই বলা হয়েছে- Of all the religious personalities Hazrat Muhammad (sm) was the most successful.

৯৬ তোমার প্রিয় কবি

অথবা, আমার প্রিয় কবি

অথবা, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম

উপস্থাপনা : বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যাকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, মানবতার কবি, তারুণ্যের কবি এবং আমাদের জাতীয় কবি। তার কাব্যে অনুরণিত হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী চির যৌবনের জয়ধ্বনি, অগ্নিবীণার সুর, নিপীড়িত, শোষিত আর নির্যাতিত মানুষের বেদনাবিধূর বাণী। তাই মানবতাবাদী, যৌবন আর তারুণ্যের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমার প্রিয় কবি।

প্রিয় কবি হওয়ার কারণ : কবি নজরুল ইসলাম ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নিয়েও তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন হয়েছেন। তার সে অনন্য গুণাবলির কারণে তিনি আমার প্রিয় কবি।

কবির প্রাথমিক জীবন : ২৫শে মে ১৮৯৯ সালে কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাকে সবাই তখন দুখু মিয়া ডাকত। অর্থনৈতিক কারণে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। তিনি রুটির দোকানে কাজ করেন এবং দশম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজলে তিনি ১৯১৭ সালে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে সৈনিক জীবন শুরু করেন।

কবি প্রতিভার বিকাশ : নজরুল ছোটবেলায় লেটো গানের দলে যোগ দিয়ে গান বাঁধা ও গান গাওয়ায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে কবি প্রতিভার অধিকারী। করাচি সেনানিবাসে অবস্থানকালে তিনি অবসরে কবিতা লিখতেন। ১৯২২ সালে 'অগ্নিবীণা' কাব্য প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা কাব্য ও বাঙালির জীবনকে তূর্যনিনাদে কাঁপিয়ে নজরুল তার আগমনী বার্তা ঘোষণা করেন।

কবির রচনাবলি : কাজী নজরুল ইসলাম ৪৩ বছর বয়সে বাকশক্তি হারানোর পূর্বে ২৩ বছরের কবিজীবনে বিপুলসংখ্যক কাব্য, গান, উপন্যাস ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেন। তার রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নিবীণা, দোলনচাঁপা, বিষের বাঁশি, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা, সিন্ধু-হিন্দোল, সর্বহারা, জিঞ্জির ইত্যাদি।

গানের গ্রন্থ : বুলবুল, চোখের চাতক, বনগীতি, গানের মালা, চন্দ্রবিন্দু ইত্যাদি।

শিশুতোষ : ঝিঙেফুল, সাত ভাই চম্পা, নতুন চাঁদ।

উপন্যাস : বাঁধনহারা, কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা।

গল্পগ্রন্থ : ব্যথার দান রিক্তের বেদন, শিউলিমালা।

নাটক : ঝিলিমিলি, আলেয়া, মধুমালা।

প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগবাণী, রাজবন্দীর জবানবন্দী, দুর্দিনের যাত্রী, রুদ্রমঙ্গল।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত গ্রন্থাবলী : অগ্নীবীণা বিশের বাঁশি, ভাঙার গান প্রলয়-শিখা, যুগবাণী ও চন্দ্রবিন্দু।

আদর্শবাদী কবি : কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান, কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি আমার খুব ভালো লাগে। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক এবং ইসলামি আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী। যে আদর্শের ছাপ তার লেখা অসংখ্য দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা, ইসলামি গান ও গজলের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যেমন তিনি রাসুলুল্লাহ (স) সম্পর্কে গজল রচনা করেছেন, "তৌহিদেরই মুর্শিদ আমার মুহাম্মদের নাম।"

সচেতনতা সৃষ্টিতে নজরুল : নিদ্রামগ্ন জাতিকে জাগ্রত করার জন্য নজরুল অগ্নিস্রাবী ভাষায় কবিতা রচনা করেছেন। সে কবিতা বঙ্গবাসীর বহুশতাব্দীর মোহনিদ্রা ভেঙে দিয়েছে। যারা সর্বহারা, রিক্ত, তারা একদিন বিশ্বজয়ী হবে; এ বিশ্বাস নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেন। তাই তার কাব্য ও সংগীত এদেশের শোষিত ও বঞ্চিত কুলি মজুরদের জীবনের অন্ধকারেও আলোর গান গেয়েছে।

বিদ্রোহী নজরুল : দুঃখ, দুর্দশা ও দারিদ্র্যপীড়িত চাষি ও হতভাগ্য মজুরদেরকে অত্যাচার, অবিচার, উৎপীড়ন ও অপমানের হাত হতে বাঁচানোর জন্য তিনি বিদ্রোহের বাণী শুনিয়েছেন এভাবে–

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

সাম্যবাদী কবি : তিনি সাম্যবাদী আদর্শে গভীর বিশ্বাসী, মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান, কুসংস্কার, অন্ধ গোঁড়ামি, অলসতা ও জড়তাকে নির্মমভাবে আঘাত হেনেছেন। তাই তিনি মানুষের মাঝে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য 'মানুষ' কবিতায় গেয়ে উঠেছেন–

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নয়, নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি।

এ কবিতা দ্বারা তিনি যে সত্যিই সাম্যবাদী কবি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বহুমুখী প্রতিভা : কবি চিরদিনই তার কর্ম ও চিন্তায় দাসত্বের বন্ধনমুক্ত, প্রাচীন সংস্কারের শৃঙ্খল ভঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত ছিলেন। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরকার, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, গায়ক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। তার এসব বহুমুখী প্রতিভার জন্যও আমি তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপন করি।

প্রতিবাদী কবি : তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচার জগদ্দল পাথরের ন্যায় মানুষের বুকে চেপে রয়েছে। মজলুম মানুষের অশ্রুতে আকাশ-বাতাস সিক্ত হয়ে উঠেছে। তাই জালেমের বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে সমাজে সুখ-শান্তি আসবে না। অতএব তিনি বলেছেন–

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট।

প্রগতির কবি : আমার প্রিয় কবি একান্তভাবে প্রগতির কবি। তাই দেশের যুব শক্তিকে তিনি দুর্গম পথের অভিযাত্রী হওয়ার আহ্বান জানান। জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে উদ্বেল তরুণ শক্তিকে তিনি পরাধীনতার গ্লানি ও গোলামির জিঞ্জির ছিন্ন করে দেশকে উদ্ধারকল্পে উদ্বুদ্ধ করেন।

কাব্য প্রতিভা : কবির অগ্নিবীণা এজন্য আমাকে মুগ্ধ করে যে, পরাধীনতার জিঞ্জিরে আবদ্ধ হয়ে আমাদের জাতীয় জীবন যখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল, তখন তিনি এর মাধ্যমে 'বল বীর চির উন্নত মম শির' বলে জাতীয় জীবনে চেতনার সৃষ্টি করেন। কবির দোলনচাঁপা, বুলবুল, ছায়ানট প্রভৃতিতে মানুষের মনের কথা অপরূপ ছন্দে ও সুরে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

মর্দে মুমিন নজরুল : কবির আরেক অবিস্মরণীয় কীর্তি হলো, তিনি ইসলামি ভাবধারাকে তার সংগীত ও গজলে অতুলনীয়ভাবে রূপদান করেছেন। মুসলিম ঐতিহ্য, গৌরব ও অবদানের ওপর ভিত্তি করে তিনি যে অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করেছেন, তাতে ইসলামের গৌরব মহিমা প্রদীপ্ত হয়েছে। তার ওমর ফারুক, খালিদ, আনোয়ার পাশা, বিদ্রোহী, কামাল পাশা প্রভৃতি কবিতা এবং অসংখ্য ইসলামি গজল ও সংগীত মুসলমান পাঠকের হৃদয় জয় করেছে। যেমন–

শোন শোন ইয়া ইলাহি আমার মোনাজাত
শোন আমার মোনাজাত।

উপসংহার : কবি চিরদিনই তার কর্মে ও চিন্তায় স্বাধীন, দাসত্বের বাঁধনমুক্ত ও প্রাচীন কুসংস্কারের শৃঙ্খল ভঙ্গ করার আকাঙ্ক্ষায় উন্মাদ। তিনি একাধারে শ্রেষ্ঠ কবি, সুরকার, শিল্পী, সংগীতজ্ঞ, গায়ক, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। সর্বোপরি তিনি যৌবনের কবি, জীবনের কবি, জাতীয় জীবনে প্রেরণার কবি। বর্তমান বৈষম্যপূর্ণ সমাজে তার মতো প্রতিভাবান কবির প্রয়োজন খুব বেশি অনুভূত হয়। এজন্য কবি নজরুল ইসলাম আমার প্রিয় কবি।

৯৭ আমার প্রিয় নাট্যকার

অথবা, তোমার প্রিয় নাট্যকার [ফা. প. ১৯৯৯]

উপস্থাপনা : মুনীর চৌধুরী আমার প্রিয় নাট্যকারদের অন্যতম। একটি ফুলের পরিচয় যেমন তার পাঁপড়ি ও সুগন্ধে, তেমনি একটি জাতির যথার্থ পরিচয় তার সাহিত্যে। সাহিত্যের উপজীব্য মানবজীবন ও প্রকৃতি। নাটক সাহিত্যের এমন একটি বিশেষ অঙ্গ যার মাধ্যমে আমরা সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখের চিত্র হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। নাটক রঙ্গমঞ্চে মানবজীবনের কাহিনি রক্তমাংসের অভিনয়ে মূর্ত করে তোলে। মুনীর চৌধুরীর নাটকে এ সত্যই প্রতিফলিত হয়।

জন্ম ও বংশ পরিচয় : মুনীর চৌধুরীর পৈতৃক নিবাস লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জে। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর পিতার কর্মস্থল ঢাকার মানিকগঞ্জ শহরে এক অভিজাত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পুরো নাম আবু নায়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী। তার পিতার নাম আবদুল হালিম চৌধুরী। তিনি ছিলেন ইংরেজ আমলের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা। পাকিস্তান আমলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার চৌদ্দজন সন্তানের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ছিলেন দ্বিতীয়। তার মা ছিলেন একজন আদর্শ গৃহিণী।

ছাত্রজীবন : শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হিসেবে অল্প বয়সেই মুনীর চৌধুরী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ক্লাসের পরীক্ষায় অত্যন্ত মেধার পরিচয় দিয়ে ১৯৪১ সালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপর আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে আইএসসি পাস করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি ইংরেজিতে অনার্স এবং ১৯৪৭ সালে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর ১৯৫৪ সালে একই

বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বাংলায় এমএ পাস করেন। তারপর ১৯৫৮ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভাষাতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

রাজনীতিতে যোগদান : ছাত্রজীবন থেকেই মুনীর চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত প্রগতিশীল। ১৯৪৩ সালে ছাত্রাবস্থায় যোগ দিয়েছিলেন ফ্যাসিবাদবিরোধী বিপ্লবী গল্পকার সোমেন চন্দের স্মৃতি সভায়। ১৯৪৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মেলনে যোগদান করেন। একই বছর তিনি প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ভাষা আন্দোলনে যোগদান : ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ তার জীবনের এক গৌরবময় অধ্যায়। ভাষা আন্দোলনে বিপ্লবী ভূমিকার জন্য তিনি সরকারের রোষানলে পতিত হন।

কারাবরণ : ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে থাকাকালীন তিনি প্রথমবার কারাবরণ করেন। পরবর্তীতে ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি শেখ মুজিবুর রহমান ও মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ প্রমুখ নেতার সাথে কারারুদ্ধ ছিলেন।

কর্মজীবন : দৌলতপুর কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবনে পদার্পণ করেন। অতঃপর ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে কারাভোগের পর পূর্বতন কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে যোগ দেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন।

সাহিত্যিক ও নাট্যকার হিসেবে কৃতিত্ব : সাহিত্যে মুনীর চৌধুরীর আবির্ভাব চল্লিশের দশকে। তিনি কখনো কবিতা, কখনো গল্প এবং কখনো নাটক লিখতেন। তবে তার সৃষ্টিশীল প্রতিভার উপযুক্ত প্রকাশ ও বিকাশের পথ পেয়েছিল নাটকে। সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরীর পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা মূলত নাট্যকার হিসেবে। মৌলিক নাটক রচনায় তিনি যেমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি অনুবাদের মাধ্যমে শেক্সপিয়র, বার্নার্ড শ ও বিশ্বের কালজয়ী প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক বাংলায় অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' রচনার জন্য তিনি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

তার উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম : মুনীর চৌধুরীর মৌলিক ও অনুবাদ দু'ধরনের নাটক রয়েছে।

ক. **মৌলিক নাটক :** মানুষ, নষ্ট ছেলে, কবর, রক্তাক্ত প্রান্তর, দণ্ডকারণ্য, দণ্ড, দণ্ডধর, চিঠি, পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য ইত্যাদি।

খ. **অনুবাদ নাটক :** মুখরা রমণী বশীকরণ, রূপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না, ওথেলো (অসমাপ্ত) ইত্যাদি।

গ. **প্রবন্ধ গ্রন্থ :** তুলনামূলক সমালোচনা বাংলা গদ্যরীতি মীরমানস।

আমার প্রিয় হওয়ার কারণ : মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের নাট্য সাহিত্যের এক অবিস্মরণীয় নাম। সামাজিক জীবনের নিতান্ত সুখ-দুঃখ তার নাটকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। প্রগাঢ় কৌতুকের সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিবাদ, সমাজ বাস্তবের সাথে সাবলীল কল্পনা, ইতিহাসের সাথে আধুনিক জীবনবোধ যুক্ত হয়েছে তার নাটকে। ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে তিনি ইতিহাসের অনুগত ছিলেন না। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' নাটকটি একটি সার্থক ট্র্যাজেডির দৃষ্টান্ত। এতে তিনি হিন্দু-মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে রচিত 'কবর'

নাটকটি বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও পরিচিত নাটক। তিনি ঐতিহাসিক নাটক রচনার ন্যায় সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। যুদ্ধবিরোধী নাটক রচনা করাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। নাটকের ন্যায় একাঙ্কিকা রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। অনুবাদ নাটকের মাধ্যমেও তিনি বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এজন্য মুনীর চৌধুরী আমার প্রিয় নাট্যকার।

তার মৃত্যু : ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দুদিন আগে হানাদার ও আলবদর বাহিনী তাকে অপহরণ করে হত্যা করে।

উপসংহার : মুনীর চৌধুরী বাংলাদেশের একজন কালজয়ী নাট্যকার। নাটকে তিনি সমকালীন জীবনের বাস্তবচিত্র অঙ্কন করেছেন। আধুনিক চিন্তার সমন্বয়ে নাটক রচনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই তিনি আমার মনে প্রিয় নাট্যকারের আসনে সমাসীন। নাট্যজগতে নতুন ধারার প্রবর্তক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

৯৮ নিবিড় অরণ্যে একাকী
অথবা, গভীর অরণ্যে একাকী
অথবা, একাকী নির্জন বনে

[ফা. প. ২০০০, '০৩]

উপস্থাপনা : উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তাঁর, 'Under the Greenwood Tree' কবিতায়, গাছপালা বন-বনানীর সঙ্গ নেওয়ার মাধ্যমে মর্তজ্বালা নিবারণের কথা বলেছেন। বিস্তীর্ণ বনভূমিতে হরেক রকম বৃক্ষরাজির সংস্পর্শে আসা একজন মানুষের জন্য সত্যিকার অর্থেই আনন্দদায়ক, ভাববিলাসের সহায়ক। প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য উপভোগ করার উদ্দেশ্যে নিবিড় অরণ্যে একাকী পরিভ্রমণের বিচিত্র উপভোগ্য সময়ের কথা নিচে উপস্থাপন করা হলো।

অরণ্যে গমন : সুন্দরবন বাংলাদেশের বনজ নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। এমনকি সারা বিশ্বের ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট-এর মধ্যেও অন্যতম অসাধারণ। এটা দেশের সর্ববৃহৎ বনভূমি। তাই সুন্দরবন দেখার স্বাদ সবার মনেই জাগে। ২০১২ সালের কথা, আমি ফাযিল শ্রেণির ছাত্র। আমাদের মাদরাসা থেকে সিদ্ধান্ত হলো শিক্ষা সফরে যাওয়া হবে। স্থান ঠিক হলো সুন্দরবন। এভাবেই আমার সুন্দরবন নামক গভীর অরণ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

অরণ্যের পথে যাত্রা : খুলনা থেকে রূপসা নদী দিয়ে অশান্ত সন্ধ্যাক্ষণের আনন্দমুখর কোলাহলের মধ্যদিয়ে পানির পক্ষিরাজ ছুটে চলল সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে। ওদিকে আকাশে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে তারকারাজির মিটমিট আলোর মধ্যদিয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম নীলিমার সৌন্দর্য। এভাবে সারারাত অতিক্রান্ত করে প্রভাতে দেখি সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে ভেসে উঠেছে রক্তিম সূর্য গোলাপ মধুমালা নিয়ে।

অরণ্যের নৈসর্গিক শোভা : প্রকৃতপক্ষে সুন্দরবন খুবই সুন্দর। গাছগুলো সব একই রকম উঁচু। মহান শিল্পী আল্লাহ যেন তাঁর সুন্দর শিল্পশৈলী প্রয়োগ করে এ অরণ্য সৃষ্টি করেছেন। আমার সামনে, ডানে, বামে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, শুধু লম্বা সবুজ গাছের সারি। উঁচু উঁচু গাছগুলো যেন দূর আকাশের কোল ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। মহান আল্লাহ আপন খেয়ালখুশি মতো নানা প্রকার গাছপালা, লতাগুল্ম ও তৃণ শস্য, ফুল ফল দিয়ে এ অরণ্যকে সাজিয়েছেন। বনের মাঝ দিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য নদীনালা জালের মতো বিস্তৃত হয়ে গোটা সুন্দরবন যেন প্রাকৃতিক উদ্যানে পরিণত হয়েছে। সত্যিই সুন্দরবনের অরণ্যের রূপে আছে এক নৈসর্গিক শোভা।

সুন্দরবনের পশুপাখি : অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি সুন্দরবন তার উদার বক্ষে ধারণ করেছে অসংখ্য পশুপাখি। গাছের মাথায় মাথায় বানরেরা লাফালাফি করছে। হরিণেরা দলে দলে ছুটাছুটি করছে। বাঘ ও সিংহ আকাশ কাঁপানো হুঙ্কার দিচ্ছে। দু'একটা হনুমান গাছের ডালে ঝুলে পড়ছে। সাপ ব্যাঙ শিকার করছে। আর ব্যাঙ তার জীবন রক্ষার জন্য সংগ্রাম করছে। বনের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে বিচিত্র রঙের পাখি। এগুলোর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। এসব দেখে ধারণা হয়েছে বনের ভেতরে হয়তো আরও হাজার রকমের পশুপাখি আছে।

নিবিড় অরণ্যে একাকী : হিরণ পয়েন্টে পৌছে জাহাজ থেকে নেমে সকালে কখন যে আমি বন্ধুদের ছেড়ে গভীর অরণ্যে ঢুকে পড়েছি, তা খেয়ালই নেই। হঠাৎ এদিক ওদিক চেয়ে দেখি কেউ নেই। শুধু গাছ আর গাছ। মাঝে মাঝে অন্ধকার। ভয়ে আমার সারা শরীর কাঁপছে। এরই মধ্যে সহসা হিংস্র বাঘের গর্জন শুনতে পেলাম। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। আমি প্রাণ বাঁচানোর জন্য পেছন দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। সেই সাথে 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুরু করে দিলাম। আমার চিৎকার বন্ধুদের কানে গিয়েছিল। ওরাও আমার নাম ধরে 'এদিকে আস', 'এদিকে আস' বলে চিৎকার করছিল। আমি দৌড়াতে দৌড়াতে বনের এক প্রান্তে এসে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। দীর্ঘক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, বন্ধুরা সবাই আমার পাশে বসে আছে, আমার গায়ের জামা ছিঁড়ে গেছে। পায়ের জুতা কোথায় হারিয়ে গেছে। শরীর থেকে রক্ত ঝরছে, কেউ আমার ক্ষতস্থানগুলোতে ওষুধ লাগাচ্ছে। কিছু স্বস্তি ফিরে পাওয়ার পর আমি ওদের হাত ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম।

মানসিক অবস্থা : সুন্দরবনের বিচিত্র শোভা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। বনের অপরূপ সৌন্দর্যে আমি অভিভূত হয়েছিলাম। মনে পড়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সে চরণ ক'টি–

অন্ধকার গর্ভ হতে শুনেছিলাম সূর্যের আহ্বান।
প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ
ঊর্ধ্ব শিরে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দহীন পাষাণের বক্ষ পরে।

সাথে সাথে মনে জাগল বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' গল্পের নব কুমারের কথা। নবকুমার বনে কাঠ সংগ্রহ করতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এসব ভাবনার মধ্যে বাঘের গর্জন কানে আসতেই আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তাড়া করছে।

উপসংহার : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কোল ঘেষে বঙ্গোপসাগরের কূলে সুন্দরবন যেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এর সৌন্দর্য এ দেশের সবুজ শ্যামল প্রকৃতিকে আরও সমৃদ্ধিশালী করেছে। প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য উপভোগ করতে হলে নির্জন অরণ্যে একাকী দাঁড়িয়ে বিমুগ্ধ নয়নে তাকালে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। আমার এ ভ্রমণ বা নির্জন অরণ্যে একাকা গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা একদিকে যেমন আনন্দদায়ক অন্যদিকে ভয়েরও। নিজ চোখে সুন্দরবনের গাছপালা ও পশুপাখি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। আর বাঘের খপ্পরে পড়াটা নিঃসন্দেহে ভয়ের ব্যাপার। সব মিলে নির্জন অরণ্যে এ ভ্রমণ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। কারণ এরূপ পরিবেশেই বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করা যায়।

৯৯ একটি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রি [ফা. প. ২০০৯]

অথবা, একটি জ্যোৎস্না রাতের গল্প [ফা. প. ২০০৪]

অথবা, একটি চাঁদনী রাত

অথবা, জ্যোৎস্না রাতে একাকী

উপস্থাপনা : জ্যোৎস্না রাত প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় এক উপহার। ভরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদ তার আলোর পসরা নিয়ে উদার আকাশে নিয়ে আসে অপার সৌন্দর্য। রাতের অন্ধকারে জ্যোৎস্নার অপরূপ সৌন্দর্য গ্রামীণ পরিবেশে আরও মনোমুগ্ধকর হয়ে ওঠে। এরকম একটা জ্যোৎস্না রাত উপভোগ করার সুযোগ আমার হয়েছিল। কবি Edward Fitzgerald এর ছন্দে আমার মন গেয়ে উঠল–

Ah, Moon of my delight who know'st no wane
The Moon of Heav'n rising once again.

জ্যোৎস্না রাতের গল্প

জ্যোৎস্না রূপের স্রষ্টা : জ্যোৎস্না রাতে এরূপ সৌন্দর্য চাঁদ পেল কোথায়। কোন সে মহান সত্তা চাঁদকে এত সুন্দর করে সৃষ্টি করে পুরো জগতে তার আভা ছড়িয়ে দেন। তিনিই বা কত সুন্দর। এ অপূর্ব সৌন্দর্যের স্রষ্টা মহান শিল্পী আল্লাহ, যিনি সমগ্র বিশ্বজাহানকে অপরূপ সৌন্দর্যে সৃষ্টি করেছেন।

সময় বয়ে যায় : How time does fly অর্থাৎ সময় দ্রুত চলে যায়। রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। আমার চোখে ঘুম নেই। মনে হচ্ছে অনন্তকাল বসে রাতের এ স্নিগ্ধ আলোক সুধা পান করি। চাঁদ উঠেছে। মাথার ওপর বিশাল আকাশ। জ্যোৎস্নার আলোতে পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেছে।

আমার মন আনন্দে নেচে উঠল : জ্যোৎস্না রাতের মাদকতায় আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। গান জানি না, তবু গুনগুন করে গানের কলির সুর টানতে লাগলাম। এক অদম্য সম্মোহনী শক্তি আমাকে গ্রাস করতে লাগল। আমি যেন ডুবে যাচ্ছি আলোর মধ্যে। শুধু আলো আর আলো। গ্যেটে মৃত্যুর পূর্বে Light, light, more light বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তার অর্থ যেন আজ কিছুটা খুঁজে পাচ্ছি।

শুধু আমিই জেগে আছি : চারিদিকে নিস্তব্ধ, গভীর রজনি। কোথাও কারো কোনো সাড়া-শব্দ নেই। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে-মধ্যে শিয়ালের চিৎকার শোনা যায়। নিথর রাতের বুকে যেন আমিই শুধু জেগে আছি। দূরের নদীতে কলকল ধ্বনিতে স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোতে আমার চোখ যেন ক্লান্ত হয়ে আসছে। আমি বসে আছি, যেন অনন্তকাল ধরে বসে আছি চন্দ্রালোকের সর্বগ্রাসী মোহে।

আমি যদি শিল্পী হতাম : একবার মনে হলো আমি যদি শিল্পী হতাম, তাহলে এ গাছপালা, নদীনালা অনন্ত আকাশের নিচে জ্যোৎস্নাস্নাত রাতের অপরূপ একটি ছবি আঁকতাম, তাহলে হয়তো জ্যোৎস্নাস্নাত পরিপূর্ণ আকাশের মুক্তি ঘটত। কিন্তু আমি তো শিল্পী নই। তাই আমার মনের মাঝে জ্যোৎস্নার ছবি। হৃদয়ের ক্যানভাসে সে ছবি শুধু আমিই দেখি। আর চোখ বন্ধ করে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের মতো অনুভব করি :

"How sweet the moonlight sleeps upon this bank! Here will we sit, and let sounds of music. Creep in our ears, soft stillness and the night. Become the touches of sweet harmony."

সে অনুভূতির তুলনা নেই : আলোয় আলোয় ভরা এ পৃথিবী। চাঁদের আলোয় ঝলমল করা বিশাল পৃথিবীর সৌন্দর্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর, অনাস্বাদিত ও আনন্দদায়ক। আমার ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি শক্তি যেন এর সৌন্দর্যের পূর্ণতা অনুভব করতে পারছে না। বাতায়নে আম গাছের ফাঁক দিয়ে সলজ্জ বধূর মতো আকাশ থেকে নেমে আসা চাঁদের আলো যে মনোহর দৃশ্যের অবতারণা করছিল, তার যেন তুলনা হয় না।

জ্যোৎস্না রাতে গ্রামের দৃশ্য : জ্যোৎস্না রাতে গ্রামগুলো অপরূপ সাজে সাজে, চাঁদের আলোর বন্যা যেন ভাসিয়ে নিয়ে যায় গ্রামগুলোকে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো-আঁধারি খেলা এর সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি করে। ঠিক এ সময় আমার মনে পড়ে রবি ঠাকুরের কবিতা–

অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমো তব পদধূলি
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি।

জ্যোৎস্না রাতে নদীর দৃশ্য : জ্যোৎস্না রাতে নদীর দিকে তাকালে দেখা যায়, নদীর অপার সৌন্দর্যলীলার সাথে চাঁদের মিতালি।

কাশবনে জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য : জ্যোৎস্না রাতে কাশবনের সৌন্দর্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। দেখি, সুন্দর সাদা শাড়ি পড়ে শরৎ রানি শুয়ে শুয়ে মিটিমিটি হাসছে আর শরতের এ জ্যোৎস্না রাতে তার সৌরভ বিলাচ্ছে এবং মানুষদের কাছে ডাকছে, এসো চাঁদের সাথে মিতালি গড়ি।

সৌন্দর্যপ্রিয় হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে আজ : আমার অনুভূতি, সৌন্দর্যের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ একান্তই অনুভবগ্রাহ্য। তারায় তারায় ভরা আকাশের নিচে পৃথিবীর বুকে বৃক্ষলতা। ফল-ফুল কাননসহ যেখানে যতটুকু সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে, তার সবটুকুই যেন উপলব্ধি করতে চায় আমার মন। আমার মনের গোপন কুঠিরে যে সৌন্দর্যরসিক মন লুকিয়ে আছে, তার যেন প্রকাশ ঘটেছে আজ।

কমে এল চাঁদের আলো : ক্রমেই রাত তার সমাপনীলগ্নে উপনীত হলো। কমে এল চাঁদের আলো। মুয়াযযিন আযান দিল–'ঘুম হতে নামাজ উত্তম।' আমার মন সাড়া দিল সে আহ্বানে। একটু পরেই ভোর হবে। উঠবে রক্তমাখা সূর্য। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আত্মসমর্পণ করলাম আল্লাহর দরবারে। ইমাম সাহেব তেলাওয়াত করলেন– "সূর্য তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে। আমরা চাঁদকে তার মনযিলসমূহে আবর্তন ঘটাই, এভাবে ধীরে ধীরে সে খর্জুর পুচ্ছের ন্যায় হয়ে যায়। সূর্যের সাধ্য নেই চাঁদকে অতিক্রম করার ....।"

উপসংহার : চাঁদ অকৃপণভাবে যেমন তার আলো বিলিয়ে দেয় পৃথিবীব্যাপী, আমাদেরকেও শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে সে আলো বিলিয়ে দিতে হবে সবার মাঝে। অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অমানিশা দূর করে দিতে হবে শিক্ষার আলোক শিখায়। জ্যোৎস্নাস্নাত আলোকিত রাত থেকে আমার হৃদয় মন এ শিক্ষাই গ্রহণ করেছিল সে রাতে।

১০০ নির্জন সন্ধ্যায় একাকী

অথবা, একদা সন্ধ্যায় একাকী

অথবা, একদা নির্জনে নদীর তীরে

উপস্থাপনা : William Wordsworth সন্ধ্যা বেলায় প্রকৃতির নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন–

The world sleeps romantically
on the eve of eventual time,

There is rhyme
for the world,
When it is embellished
with natural beauties.

দিনের শেষে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ডুবে যায়, সে সময়টাকে আমরা সন্ধ্যা বলি। তখন প্রকৃতি সাজে নতুন রূপে। এটি দিনও নয় আবার রাতও নয়– দু'য়ের মাঝখানের স্বল্প সময়ের একটি মুহূর্ত। এর স্থায়ীত্ব খুব কম হলেও এর রূপ-মাধুরী আমার চিত্তকে আকর্ষণ করে।

সন্ধ্যার আগমন : দিনের শেষে সূর্য পশ্চিম আকাশে ডুবতে থাকে। কর্মক্লান্ত মানুষ ঘরে আর পাখিরা নীড়ে ফিরে যায়। রাখাল ছেলে গরুর পাল নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেয়। রাত যেন ধূসর চাদর বিছিয়ে দেয় ধরণীর বুকে। মসজিদ থেকে মুয়াযযিনের সুললিত কণ্ঠে আযান ভেসে আসে। এ সবকিছুই সন্ধ্যার আগমনী বার্তা জানিয়ে দেয়।

সন্ধ্যার রহস্যময়তা : সন্ধ্যাকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায় না, কিংবা বেশিক্ষণ ধরেও রাখা যায় না। এজন্য সন্ধ্যাবেলায় চারপাশের প্রকৃতিকে খুবই রহস্যময় মনে হয়। নদীর মন- মাতানো ঢেউয়ের সাথে সন্ধ্যার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আরও বেশি আকর্ষিত হয়।

নদীর তীরে সন্ধ্যা : নদীর ধারে পানির ছোট ছোট ঢেউ আছড়ে পড়ে। মনে হয় যেন বালি আর পানি মিতালি পাতিয়েছে। নদীর তীরে বসে সূর্যাস্তের অপূর্ব মন-মাতানো শোভা আর ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আগমন দেখতে দেখতে মন হারিয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলায় নদীতে পানি নিতে আসা গৃহবধূর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন–

"বধূটি দাঁড়ায় ঘাটে।
করুণ কান্নার মতো, সন্ধ্যা নামে গ্রামে;
দীপ জ্বলে ঘরে ঘরে, পথিকেরা দ্রুত হাঁটে।
এদিকে যে শান্ত নদী আর্শি ধরে।"

সন্ধ্যার প্রকৃতি : সন্ধ্যার আগমনের সাথে সাথে ধীর পদক্ষেপে সবাই ঘরে ফিরে আসে। দিনের সমস্ত কর্মব্যস্ততার পর্দা টেনে সন্ধ্যার আবির্ভাব; নাকি সন্ধ্যাই কর্মবহুল দিনের যবনিকা টেনে দেয়, তা বলা কঠিন। চারদিকে রং বদলায়, গাছের মাথায় অস্তরত সূর্যের আলো অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে সোনা রোদ চুপিসারে মৃদু ছোঁয়া দিয়ে যায়।

সায়াহ্নের সূর্য ও নদীর দৃশ্য : সারাদিনের কর্মক্লান্ত সূর্য সায়াহ্নের প্রান্তে এসে নিস্তেজ হয়ে যায়। অস্তায়মান সূর্যরশ্মি যেন সারা প্রকৃতিকে সোনালি রঙে রাঙিয়ে তোলে। বহুদূর বিস্তৃত নদীর পানি ঝলমল করতে থাকে। নীল আকাশে সূর্য ধীরে ধীরে অস্তরেখায় এসে দাঁড়ায়। আমাদের চোখে সূর্য তখন সোনালি বর্ণের একটি থালা হিসেবে ধরা দেয়। রক্তিম সূর্য সোনালি রশ্মি ছড়ায়। সে রশ্মি নদীর জলে প্রতিবিম্ব হয়ে আকাশে আলোর মিতালি পাতায়।

নদীর জলের অপরূপ খেলা : সূর্য যখন ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে আবির রাঙা শরীরে দিগন্ত রেখায় দেহ রাখে, তখন তার প্রতিবিম্ব নদীর জলে সোনালি সোহাগে খেলা করতে থাকে। দূরে বহুদূরে দিগন্ত রেখায় সূর্যকে মনে হয় যেন নদীর জলে ডুবে যাচ্ছে। সায়াহ্নে সূর্যের সাথে নদীর জলের এ লুকোচুরি সত্যিই অপরূপ ও মনোমুগ্ধকর। খালি চোখে না দেখলে এ সৌন্দর্যের মহিমা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

সন্ধ্যার কর্মকোলাহল : সন্ধ্যার সময় পাখিরা নীড়ে ফিরে। সোনালি সূর্যের আলো পড়ে পাখির ডানা কনক আভায় মণ্ডিত হয়। ছোট ছোট নৌকাগুলোকে পাল নামাতে দেখা যায়। গাঁয়ের বধূরা আসে রাঙা বিকেলের শেষ রশ্মিতে পায়ে হেঁটে নদীর ঘাটে জল ভরতে। শোভাময়ী ধরণীর সোনালি সন্ধ্যায় কলসি কাঁখে তারা দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে যায়। কী এক গভীর নীরবতায় সন্ধ্যা নেমে আসে, কবির ভাষায়– 'সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে।'

মানবমনে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের প্রভাব : সন্ধ্যায় নদীর তীরের সূর্যাস্ত মানুষের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। মানুষ নিজের জীবন ও তার পরিধি নিয়ে ভাবতে শেখে। তখন সে মহৎ কিছু করার প্রেরণা পায়। নব চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। সূর্যাস্তের সময় মানুষের মনে এক অব্যক্ত অনুভূতি একটা অজানা বেদনার উপলব্ধি জাগে। মনে হয়–

দিনের শেষে ঘুমের দেশের ঘোমটা পরা ঐ ছায়া
ভুলালোরে ভুলালো মোর সব।

নদীর তীরে সূর্যাস্তের শোভা এরকম সব ভুলানোর গান শুনিয়ে যায়। মনে পড়ে মানব জীবনের অন্তিম দিনের কথা।

সন্ধ্যায় গ্রামীণ পরিবেশ : সন্ধ্যায় গ্রামের ছোট ছোট ঘরগুলোতে কেরোসিনের প্রদীপ জ্বলে ওঠে। গ্রামের ছোট নদীর বুকে সন্ধ্যাপ্রদীপকে মনে হয় জোনাকি আলো জ্বেলে নদীর পারে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গ্রামের বাঁশবনে জোনাকির আলো, রূপালি চাঁদ জ্যোৎস্নার ফুলঝুরি নিয়ে স্তব্ধ পায়ে দাঁড়ায়।

সন্ধ্যায় শহরের পরিবেশ : আধুনিক শহরগুলো যান্ত্রিক সভ্যতার আশীর্বাদপুষ্ট। এখানে ইট-পাথরের গাঁথা বিশাল অট্টালিকা থেকে সন্ধ্যার অপরূপ সৌন্দর্য বোঝা যায় না। সন্ধ্যার আগমনে রাস্তায় জ্বলে ওঠে হরেক রকমের বৈদ্যুতিক বাতি। একসাথে অনেক মসজিদ থেকে আযানের ধ্বনি ভেসে আসে। এখানে চাঁদের হাসি জ্যোৎস্না ছড়ায় না। তবে অনেকের মধ্যে বাসায় ফেরার ব্যস্ততা দেখা যায়।

বাড়ি ফেরা : সন্ধ্যার আলো-আঁধারী ভাব কেটে রাতের তারার হাসি চতুর্দিক বেষ্টন শুরু করেছে। আমি নির্জনতা প্রিয়, তাই এ নির্জনতার মধ্যে ছিলাম। কিন্তু তারাগুলোর খিল খিল হাসি আর নদীর স্রোতের কলতান আমার নির্জনতা ভেঙে দেয়। আমি তারাগুলোর সেই সৌরভ-সাগরে স্নান করতে করতে বাড়ি ফিরলাম।

উপসংহার : সন্ধ্যার অপরূপ সৌন্দর্য ও রহস্যময়তা মানব মনে এক আনন্দময় প্রশান্তি এনে দেয়। নদীর তীরে একাকী বসে সন্ধ্যার এ দৃশ্য নয়নে তৃপ্তি আনে। সূর্যাস্তের বিচিত্র শোভা মানুষের মনকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "যে নদী তীরের সূর্যাস্তের শোভা দেখেনি, সে পৃথিবীর কিছুই দেখেনি।"

১০১ নতুন সম্ভাবনার বাংলাদেশ

অথবা, বাংলাদেশের সম্ভাবনা

উপস্থাপনা : প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর বাংলার রূপ মাধুরীতে বিমোহিত হয়ে স্বর্গরাজ্য বাংলার প্রাচুর্যের আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন অনেক রাজা বাদশাহ আর হাজারো বণিক। এ প্রাচুর্যই দেশটির জন্য ডেকে আনল দুঃস্বপ্নের কাল রাত। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করার মাধ্যমে সম্পদশালী এ জাতিটিকে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়া হয়। ভেঙে দেওয়া হয় তার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। পরবর্তীকালে

পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের যাতাকলে পিষ্ট বাংলার অদম্য মানুষ আবারও জেগে ওঠে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ছিনিয়ে আনে স্বপ্নের স্বাধীনতা, শুরু হয় আরেকটি সংগ্রাম, স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রাম। ধীরে নিঃশব্দে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ আবারও বিশ্বের বুকে স্বমহিমায় জ্বলে ওঠে। ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি তারই পূর্বাভাস দিয়ে যাচ্ছে।

বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান : বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ায় এর গুরুত্ব আমাদের অনেকেরই অজানা। বিশেষ করে এশিয়ার সাথে ইউরোপ এবং এশিয়ার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবেই স্বীকৃত ও প্রমাণিত। এসব কারণেই আমেরিকা, চীন ও জাপানের মতো পরাশক্তিগুলো এ বন্দরে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা, চীন ও ভারতের মধ্যে যে ত্রিমুখী লড়াই চলছে তার কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তাদের প্রত্যেকেরই বাংলাদেশের সমর্থন খুবই প্রয়োজন। তাই আমেরিকা ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের পরিবর্তিত ভূ-রাজনৈতিক ও কৌশলগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এ অবস্থায় বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকরা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পরাশক্তিগুলোর কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে অনেক সুবিধা।

বাংলাদেশের মানবসম্পদ : মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ বাংলাদেশে এসে এ দেশের জনসংখ্যাকে বোঝা নয়; বরং সম্পদ হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। এ দেশের ১৬ কোটিরও বেশি মানুষকে যদি দক্ষ করে গড়ে তোলা যায় তবে ৩২ কোটি হাতই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বাজারে ক্রমেই বাংলাদেশি জনশক্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মালয়েশিয়া এ দেশ থেকে তাদের চাহিদার ৫০ শতাংশ শ্রমিক নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। কারণ এদেশের মানুষ পরিশ্রমী। তাই এ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে যেমন দেশে কাজে লাগানো যেতে পারে তেমনি পাঠানো যেতে পারে বিদেশেও।

বাংলাদেশ মূলত ১৯৭৬ সাল থেকে জনশক্তি রপ্তানি শুরু করে। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রায় ৩৭ লাখ বাংলাদেশি রয়েছে। ২০০৫-'০৬ সালে বাংলাদেশ রেমিট্যান্স থেকে আয় করেছে ৩২ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। যা ২০০৪-'০৫ সালের চেয়ে ৩৬ শতাংশ বেশি। রেমিট্যান্স দ্রুত বৃদ্ধির কারণেই ১৬ই ডিসেম্বর ২০০৬ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৭২ কোটি ডলার। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬৪২ কোটি ডলারে। যা অতীতের যে-কোনো সময়ের চাইতে বেশি। বিশ্বের রেমিট্যান্স প্রবাহে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে ৭১১ কিলোমিটার উপকূল রেখা রয়েছে। এ উপকূলভাগ সামুদ্রিক সম্পদে পরিপূর্ণ। মৎস্য সম্পদ ছাড়াও এখানে পাওয়া যাচ্ছে আণবিক খনিজ সম্পদ জিরকন, সোনাজাইট, ইলামনাইট, মেঘনেপাইট, প্রবাল ইত্যাদি; যা এ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাই এসব সম্পদকে বলা হয় বাংলাদেশের 'ব্ল্যাক গোল্ড'। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, বঙ্গোপসাগরের তলদেশে রয়েছে সম্পদের আরেক মহারাজ্য; তাই চলছে ব্যাপক অনুসন্ধান। সম্পদের আরও একটি রাজ্য হচ্ছে সুন্দরবন, যা পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন হিসেবে পরিচিত। সুন্দরবনে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির গাছসহ অফুরন্ত কাঁচামাল। আর একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এশিয়ার বৃহৎ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ অনেকগুলো কারখানা।

কৃষি ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ : কৃষি অনুকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ভরপুর বাংলাদেশ। তাই এ দেশের অনুকূল আবহাওয়া ও উর্বর মাটি কৃষির জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে বাংলাদেশের যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা ভবিষ্যৎ সুসম্ভাবনার নির্দেশ দেয়। ধান, পাট, চা, মৎস্য, পশু ইত্যাদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন স্বনির্ভর ও রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জিডিপিতে ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে কৃষির সমন্বিত অবদান ১৪ দশমিক ২৩ শতাংশ। বর্তমানে সম্ভাবনাময়ী এ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে তা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যেতে পারে। তবে এ খাতে সরকারি সহযোগিতা অবশ্যই সময়ের দাবি।

বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ : এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, বর্তমানে রপ্তানি আয়ের ছয় শতাংশ আসে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য থেকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মৎস্য রপ্তানি হচ্ছে– এর মধ্যে গলদা ও বাগদা চিংড়ি সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আনছে। তাই চিংড়িকে বাংলাদেশের 'হোয়াইট গোল্ড' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ এ চিংড়ি উৎপাদনে তেমন কোনো সরকারি সহায়তা নেই। যদি সরকারি সহায়তা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা নেওয়া যায়, তাহলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য সম্পদের অবদান হতে পারে সুদূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী।

শিল্পের অনন্ত সম্ভাবনা : বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ থেকে ক্রমেই শিল্পনির্ভর দেশে পরিণত হচ্ছে। ১৯৮০-'৮১ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল ১৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২০১৭-'১৮ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ দশমিক ৬৬ শতাংশে। দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ছাড়াও গড়ে উঠেছে অসংখ্য বৃহৎ শিল্প।

গার্মেন্টস শিল্প : বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্প বড় ধরনের হুমকির সম্মুখীন হবে বলে অনুমান করা হলেও খুব সহজেই তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। বিকাশমান এ শিল্পটি যখন দ্রুতই সারা পৃথিবীতে বাজার তৈরি করে নিচ্ছিল তখন একটি মহলের ষড়যন্ত্রে তার গতিপথ আবার বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এখন আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয়। বর্তমানে (২০১৮) পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

রপ্তানি পণ্য হিসেবে ওষুধ : সবার অগোচরেই বিশ্ব মার্কেটে পোশাক শিল্পের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় সম্ভাবনাময়ী খাত হয়ে উঠেছে ওষুধ শিল্প। এ শিল্প বর্তমানে দেশের চাহিদার ৯৭ শতাংশ নিজেরাই পূরণ করে। ওষুধ ও ওষুধের কাঁচামাল ব্রিটেন ও আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় ৬৭টি দেশে রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। এক্ষেত্রে ১৮২ ব্র্যান্ডের বিভিন্ন ধরনের ওষুধ বিদেশে রপ্তানি করছে দেশের ২৭টি কোম্পানি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন : বিশ্বব্যাংক Least developed দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে সাম্প্রতিক সময়ের অত্যন্ত দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০০৬-'০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের বিগত তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছয় দশমিক ৫১ শতাংশ প্রাক্কলিত হয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮২ মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০১ সালের এক হাজার ৩০৭ মিলিয়ন ডলার থেকে ৩০শে এপ্রিল ২০১৯ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২.১২ বিলিয়ন ডলারে ধীরগতিতে হলেও দারিদ্র্য বিমোচনও হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ মতে, ২০০০ সালে দারিদ্র্যের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ যা ২০০৫ সালে কমে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশে। বর্তমানে (২০১৯) এ হার ২১.৮ শতাংশ।

তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কে বাংলাদেশ : আইটি সেক্টরেও বাংলাদেশ ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিচ্ছে। এ খাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে বিখ্যাত কোম্পানি মাইক্রোসফট। তাছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবলস তথ্য আন্তর্জাতিক তথ্য মহাসড়কের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে SEA-ME-WE-4 নামক কনসোর্টিয়ামের সদস্য হয়েছে। যার কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০০৬ সালের মে মাসে। ফলে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তিতে ঘটছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বৃদ্ধি পাচ্ছে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার। এ খাতে বাংলাদেশ একদিন হয়ে উঠবে সফল রপ্তানিকারক দেশ।

উপসংহার : জন্মলগ্নেই 'তলাবিহীন ঝুড়ি' আখ্যা দিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ প্রমাণ করার প্রয়াসে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বাস্তবায়ন করতে থাকে একটি মহল। একদিকে দুর্নীতি দারিদ্র্য ও রাজনৈতিক হানাহানি, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাঝেও বাংলাদেশের অগ্রগতির চাকা এগিয়ে চলেছে স্বগতিতেই। সন্ত্রাস দমন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, মা ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস ও দুর্নীতি দমননীতিসহ বাংলাদেশের অনেক সফলতাই বিশ্বে এখন সমাদৃত হয়েছে। তাই বাংলাদেশকে ব্যর্থ কিংবা অকার্যকর রাষ্ট্র বলার কোনো সুযোগ নেই। আমরা যদি ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশ মাতৃকাকে ভালোবাসতে পারি তবেই বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে একটি সফল রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হবে এবং উন্নতি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির সংস্পর্শে একটি উদীয়মান উন্নয়নশীল রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশে সক্ষম হবে।

১০২ একুশ শতকের প্রত্যাশা

অথবা, একবিংশ শতাব্দীর প্রস্তুতি

উপস্থাপনা : কাল বা সময় নিরবধি, এর কোনো আদি-অন্ত নেই। সময় কবে শুরু হয়েছিল তা যেমন কেউ বলতে পারে না; তেমনি কেউ বলতে পারে না কবে এর শেষ হবে। কিন্তু যখন একটা বছর কিংবা শতাব্দী পেরিয়ে আরেকটি বছর বা শতাব্দী আসে, তখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে নানা হিসাব-নিকাশ। সারা পৃথিবীব্যাপী জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে একুশ শতক নিয়ে। এই নতুন শতাব্দীতে কেমন হবে পৃথিবীর রূপ? মানবসমাজের অবস্থাই বা কেমন হবে? মানুষের প্রত্যাশাই বা কী এই শতাব্দী থেকে?

বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ও একুশ শতক : একুশ শতক নিয়ে মানুষের এ কৌতূহলের জবাব পাওয়া যাবে বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। এ পর্যন্ত বিজ্ঞান যা উদ্ভাবন করেছে, তাকে চূড়ান্ত বলেই মনে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে চূড়ান্ত বলে কিছু নেই। সুতরাং একুশ শতকে বিজ্ঞান হয়তো মানবজাতিকে অন্য কোনো গ্রহলোকেও বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারে। মহাকাশ গবেষণা যেভাবে এগুচ্ছে তাতে এরকম ধারণা অযৌক্তিক নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান : চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের উন্নতি আমাদের বিস্মিত না করে পারে না। কিন্তু এখনো পৃথিবীতে ডেঙ্গু ও চিকুন গুনিয়াসহ এমন কিছু জটিল ব্যাধি রয়েছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান যার এখনো কোনো প্রতিকার আবিষ্কার করতে পারেনি। একুশ শতকে হয়তো এসব জটিল রোগের ওষুধ বা চিকিৎসাব্যবস্থা আবিষ্কৃত হবে। মানুষ তখন আর এসব রোগের কথা শুনে আতঙ্কগ্রস্ত হবে না।

সামরিক আতঙ্ক ও একুশ শতক : মানুষের মধ্যে কি সামরিক আতঙ্কের অবসান হবে, একুশ শতকের পৃথিবীতে অথবা কোনো কালেই? ক্ষমতামত্ত শক্তিসমূহের সমরায়োজন যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় না যে, একুশ শতকে কোনো অলৌকিক উপায়ে তাদের মধ্যে গুরুতর পরিবর্তন ঘটবে। সমগ্র পৃথিবীতে সামরিক খাতে যে পরিমাণ অর্থ

ব্যয় হয়, তা কমানো গেলে পৃথিবীর অসংখ্য বনী আদমের দুঃখ লাঘব হতো। নতুন শতকের ক্ষমতাশালীদের মনে শুভ চেতনার উদয় হোক– এ কামনা সকলের।

পরিবেশ দূষণের আতঙ্ক : যুদ্ধের আতঙ্ক ছাড়াও বিশ্ববাসী আরেকটি আতঙ্কে ভুগছে। তা হলো পরিবেশ দূষণের আতঙ্ক। সারা বিশ্বের মাত্র কয়েকটি শিল্পসমৃদ্ধ দেশ বিশ্ব পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী। আমাদের দেশেও কতিপয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীর জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপসহ নানা কারণে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হচ্ছে, যেভাবে গাছপালা কেটে উজাড় করা হচ্ছে, তার ফলে ঘটছে 'গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া'। তবে আশার কথা এই যে, 'গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া' থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তা-ভাবনা করছেন। হয়তো একুশ শতকেই আমরা তাদের কাছে শুনতে পাব আশার বাণী।

খাদ্য ঘাটতি ও একুশ শতক : খাদ্যের সাথে জীবের অস্তিত্বের সম্পর্ক সরাসরি জড়িত। পৃথিবীতে অনেক দরিদ্র দেশ খাদ্যের অভাব মোকাবেলা করতে হিমশিম খাচ্ছে। ধনী দেশগুলোতে কৃষি বিপ্লব ঘটলেও গরিব দেশগুলো অধিক খাদ্য ফলাতে পারছে না। উন্নয়নশীল দেশসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। এর সাথে পাল্লা দিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না। তাই একুশ শতকে বিজ্ঞান আরও অধিক খাদ্য উৎপাদনের নতুন পরিকল্পনা বিশ্ববাসীকে উপহার দেবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

একুশ শতকে মুসলিম জাতির দায়িত্ব : একুশ শতক মুসলিম জাতির জাগরণের শতক। ইহুদি-খ্রিস্টান চক্রের হাতে আজ যেভাবে মুসলমানরা চেচনিয়া, বসনিয়া, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক ও ফিলিস্তিনে মার খাচ্ছে, তাতে তাদের নতুন করে ভাবার ও নিজেকে জানার সময় এসেছে। মুসলমানরা তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলবে, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ান হবে। বর্তমান তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ঘটাবে মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদের অবসান ঘটাবে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে– এটাই তাদের কাছে একুশ শতকের প্রত্যাশা। আর তাহলেই একুশ শতক হবে ইসলামের শতক।

বিশ্ববাসীর কর্তব্য : একুশ শতকের পৃথিবীকে অধিকতর সম্ভাবনাময় করে তুলতে পারলেই বিগত শতকের অর্জন নিয়ে বিশ্ববাসীকে সগৌরবে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকলে এর কল্যাণকর দিকটি মানুষের জন্য কাজে লাগাতে হবে। সেজন্য মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতার অবসান ঘটাতে হবে। অবসান ঘটাতে হবে পারমাণবিক শক্তিধর জাতির হিংস্রতার। বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যায় শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগের লক্ষ্যে 'বিশ্ব মানবের' মাঝে আন্তরিকতার পূর্ণ সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে হবে। জাতিগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'– এই বাণীকে সামনে রেখে– মানব জাতিকে ঐক্যের মহান মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জনশক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বৈষম্য কমিয়ে আনতে হবে। জাতিগত স্বার্থের যেমন অবলুপ্তি ঘটানো বাঞ্ছনীয়, তেমনি প্রয়োজন উন্নয়ন ও সহযোগিতার সম্মিলিত প্রয়াস। বিশ্ব পরিবেশ জীবনের উপযোগী রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সর্বজনীন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রবাহ সকলের জন্য কল্যাণপ্রদ করার পদক্ষেপও নিতে হবে।

একুশ শতকে বাংলাদেশের প্রত্যাশা : বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ। ক্ষুধা, ব্যাপক বৈষম্য ও দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের নিত্যসঙ্গী। একুশ শতকে বাংলাদেশকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে একটি উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে নীতি-নির্ধারকরা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করবেন– এটাই জাতির প্রত্যাশা।

উপসংহার : একুশ শতকের পৃথিবী উজ্জ্বল সম্ভাবনার এক নতুন পৃথিবী। প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা সর্বক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল জাতি উন্নতি লাভ করবে। বাংলাদেশের জনগণ আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে। মজলুম মুসলিম জাতি পাবে সঠিক পথের দিশা, সারা বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে– এগুলোই একুশ শতকের প্রত্যাশা। আমরা আশা করব, এ বিশ্বের মানুষের শুভবুদ্ধির জয় একদিন হবেই। আর তাহলেই একুশ শতক আত্মহননের না হয়ে সৃজনশীল ও মানবতার কল্যাণে এগিয়ে যাবে।

১০৩ বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম

অথবা, বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি

উপস্থাপনা : সাহিত্য মানবজীবনের প্রতিচ্ছবি। সাহিত্য জীবনের দর্পণস্বরূপ। সাহিত্যের মধ্য দিয়েই কোনো দেশের উন্নতি, অবনতি ও সে দেশের সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। সাহিত্য মানুষকে আত্মোপলব্ধি ও দেশপ্রেমে জাগ্রত করে তোলে। আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতি অন্যতম উপকরণ। আধুনিক যুগের শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্য বাঙালি জাতিকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং স্বীয় অধিকার আদায়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে।

সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ বা প্রকৃতি : স্বদেশপ্রেম মানুষের একটি স্বভাবজাত গুণ। যে দেশের আলো-বাতাসে পুষ্ট তার শরীর সে দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকা তার একটি সহজাত টান বা প্রবৃত্তি। প্রত্যেক জ্ঞানবান সুস্থ ব্যক্তির হৃদয়েই স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা বিদ্যমান। সে ভালোবাসা বা প্রীতি কখনো সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কখনো কোনোকিছুর প্রভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে। আর এ প্রভাবের অন্যতম মাধ্যম হলো সাহিত্য। আমাদের বাংলা সাহিত্যও বাঙালি জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে, যার ফলে এদেশের লাখ লাখ লোক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেমের সূচনা : ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের ভেতর দিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়। উদ্ভব ঘটে পশ্চিমা ইউরোপীয় ইংরেজ শাসনের। ইংরেজরা এদেশে শাসনের নামে শোষণ শুরু করে। তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে গোটা দেশবাসী। তাদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশপ্রেমিকগণ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কবি সাহিত্যিকগণ তাদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা', সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' এর উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলা কবিতায় দেশপ্রেম : ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পাকিস্তানিরা এদেশের জনগণের ওপর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে। শুরু হয় বাঙালিদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। ৫২-র ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে এদেশের স্বাধিকার চেতনা ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রায় তিনশ বছর আগেই বাঙালি কবির মনে এই ভাষা ও দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল, বাঙালি জাতিকে উজ্জীবিত করেছিল স্বদেশপ্রেম। সপ্তদশ শতকের কবি আবদুল হাকিমের কবিতায় মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি গভীর মমত্ববোধের পরিচয় মেলে। তার 'নূরনামা' কাব্যগ্রন্থের 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি' কবিতাটি স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার মূর্ত প্রতীক। বাংলাদেশে

জন্মগ্রহণ করে যারা বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করেন তারা কেন এদেশ ত্যাগ করেছেন না- এ প্রশ্ন তিনি করেছেন তার এ কবিতায়-

যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।
দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।।

মধ্যযুগের শেষ এবং আধুনিক যুগের উদ্ভব তথা যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিভিন্ন কবিতায় স্বদেশপ্রেমের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর 'বাঙালির মেয়ে', 'আনারস', 'পৌষ-পার্বণে' প্রভৃতি কবিতায় স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন-

মিছা মণি-মুক্তা হেম
স্বদেশের প্রিয়-প্রেম
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।

তিনি অন্যত্র বলেছেন-

কতরূপ স্নেহ করি
দেশি কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আধুনিক যুগের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতায় স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন 'কপোতাক্ষ নদ' কবিতায় তিনি বলেন-

বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

তাঁর 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্যেও স্বদেশপ্রেমের গভীর প্রভাব ব্যক্ত হয়েছে। যেমন-

জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে,
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর 'দেশপ্রেম' কবিতায় লিখেছেন-

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান ও কবিতায় দেশপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন-

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের অসংখ্য গান ও কবিতায় স্বদেশপ্রেমের অগ্নিঝরা বাণী রয়েছে। তিনি গেয়েছেন-

সোনা সোনা সোনা
লোকে বলে সোনা
সোনা নয় তত খাঁটি,
বল যত খাঁটি, তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি রে
আমার জন্মভূমির মাটি।

স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস লিখেছেন–

হেরিলাম কত দেশ কত সৌধমালা
কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দগ্ধ নয়ন,
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিশিবে আবার।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন–

মধুর চেয়েও আছে মধুর
সে আমার দেশের মাটি।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'ধনধান্য পুষ্পভরা' কবিতায় লিখেছেন–

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে– আমার জন্মভূমি।

কবি কায়কোবাদ ধর্ম-বর্ণভেদে ভারতবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন–

এসো ভাই হিন্দু এসো মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত সন্তান।
এসো আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গে মায়ের চরণ দুটি।

কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন–

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি,
তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর।

বর্তমান সময়ের আধুনিক কবিদের অসংখ্য কবিতায় স্বদেশপ্রেম বাঙ্ময় হয়ে ফুঠে উঠেছে। সেক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কবি শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ আলী আহসান।

বাংলা নাটকে দেশপ্রেম : কবিতার ন্যায় নাটকেও স্বদেশপ্রেমের প্রভাব পড়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ', মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পতন', জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতি', সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' এবং মুনীর চৌধুরীর 'কবর' প্রভৃতি নাটকে দেশপ্রেমের প্রভাব পড়েছে। তবে দেশ-প্রেমমূলক নাটকের মধ্যে গিরীশচন্দ্রের 'সিরাজ-উদ-দৌলা' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম : কবিতা ও নাটকেই নয়; বাংলা উপন্যাসেও স্বদেশপ্রেমের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দ মঠ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা', শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত' ও 'পথের দাবী' প্রভৃতি উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের ছাপ রয়েছে। এছাড়া নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত এবং চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ গীতিকারের গীতে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

উপসংহার : সর্বকালে সকল দেশেই সাহিত্যিকদের রচনাবলিতে স্বদেশপ্রেম গভীরভাবে স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিকদের স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটে তাদের সাহিত্যকর্মে। তাঁরা ভাবুক হৃদয়ে স্বদেশের সুখ-দুঃখ অনুভব করে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেক শাখাতেই স্বদেশপ্রেমের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে এবং তা আমাদেরকে ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছে। এভাবে দেশ প্রেমমূলক সাহিত্য রচনা অব্যাহত থাকলে বাংলা সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

১০৪ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

অথবা, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

উপস্থাপনা : বিশ্বের গোটা মানবগোষ্ঠী ধারা পরম্পরায় এক আদম ও হাওয়া (আ) হতে জন্মলাভ এবং প্রতিটি মানবসন্তান অভিন্ন উপাদানে অস্তিত্ব লাভ করলেও সবাই এক সম্প্রদায়ভুক্ত নয়। চিন্তা-বিশ্বাস, নীতি-আদর্শ, স্বভাব-প্রকৃতি এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মানুষ বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা জন্মলাভ করে। সাম্প্রদায়িকতা বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির পথে এক মারাত্মক প্রতিবন্ধক। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, মুসলমানরা কখনোই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে মানব সমাজে অনাসৃষ্টি করেনি বরং বিদেশি শাসক ও বিধর্মীরাই সংকীর্ণ স্বার্থে যুগে যুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশ সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে বহুবার রঞ্জিত হলেও বাংলাদেশ অদ্যাবধি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে মানুষে প্রীতি ও মৈত্রীর শান্তিময় বন্ধন হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। সামাজিক প্রশান্তি লাভের জন্য সকল অসাম্প্রদায়িকতা দূর করে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা আবশ্যক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের চোখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার এবং প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারী– এ সাংবিধানিক নীতিই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রক্ষাকবচ। এছাড়া ইসলামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বিশেষ তাগিদ রয়েছে। মহানবি (স) বলেছেন–

اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ اِنْتَقَصَهُ اَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ اَوْ اَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا ...... فَاَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

এখানে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে কারো প্রতি জুলুম বা অন্যায় না করার নির্দেশ দিয়ে সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রায় সকল দেশেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লক্ষণীয়। প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার এ ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আবহমানকাল ধরে। হাজার বছরের ইতিহাসে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ মিলেমিশে এদেশে গড়ে তুলেছে এক সৌহার্দপূর্ণ ও সহনশীল সমাজ। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বিভিন্ন ধর্ম ও জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ পারস্পরিক নির্ভরশীলতায় একে অপরের জন্য অপরিহার্যরূপে পাশাপাশি অবস্থান করে একান্ত আপনজনের মতো। এখনো পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ স্থান।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ : চিরশান্তি ও সম্প্রীতির এ দেশে সম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষটি রোপিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসনামলে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এ উপমহাদেশে তাদের শাসন-শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য যে Divide and Rule Policy (বিভেদ ও শাসননীতি) গ্রহণ করেছিল তাতেই সম্প্রীতির ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়। সুকৌশলে তারা হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক আস্থা বিনষ্ট করে দেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় হিন্দু-মুসলমান দু'মেরুতে অবস্থান নেয়। পরবর্তীতে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে সম্প্রদায়গত দূরত্ব আরও বৃদ্ধি

পায় এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে সংঘটিত হয় মারাত্মক দাঙ্গা, যাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায়। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কোলকাতায় মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ সভায় হিন্দুদের আক্রমণে উভয়পক্ষে বহু হতাহত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এ সাম্প্রদায়িকতা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কোনো ঘটনা পরিলক্ষিত হয়নি। এমনকি ১৯৯২ সালে ভারতের কট্টরপন্থি হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ভেঙে ফেললেও বাংলাদেশের মুসলমানরা চরম সহিষ্ণুতা ও উদারতা প্রদর্শন করে। সম্প্রতি অতি উৎসাহী ও আবেগপ্রবণ কিছু লোক দেশে বিদ্যমান সম্প্রীতি বিনষ্টের পাঁয়তারা করলেও এ দেশের আলেম-ওলামা, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনতা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে।

সাম্প্রদায়িকতার কুফল : গোটা দুনিয়া আজ সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে জর্জরিত। রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধানো হয়। পৃথিবীতে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হানাহানি এবং ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে তার অনেকাংশের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। গুজরাট, কাশ্মীর, বসনিয়া, চেচনিয়া, ইসরাইল, ফিলিস্তিন প্রভৃতি স্থানে যে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চলছে তার মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িকতা। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের খ্রিস্টান সম্প্রদায় আফগানিস্তানসহ কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তা সাম্প্রদায়িকতারই ভয়াবহ প্রভাব। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এ যাবৎ সতেরো'শ-র অধিকবার হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। গুজরাট, আহমদাবাদ, কাশ্মীরসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হাজার হাজার মানুষকে বলি হতে হয়েছে এসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। নিজ ধর্মকে রক্ষা করতে এ সভ্য যুগেও মানুষকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে। অথচ মানুষ এ পৃথিবীতে এসেছে ধর্মের আগে, ধর্ম এসেছে মানুষের কল্যাণের জন্য– মানুষে মানুষে সংঘর্ষের জন্য নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুষ্ঠু বিকাশের মাধ্যমে মানুষ হতে পারে মানুষের পরম আপনজন।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা : বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলার মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। 'আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক' গ্রন্থে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন, "সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সাহিত্যরস উপভোগের বিঘ্নস্বরূপ– একথা অনুভব করেও বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' রচনায় নিষ্কম্পচিত্ত ছিলেন।" আধুনিক বাংলা কাহিনি কাব্যের ধারায় রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবি হিন্দু বীরের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য মুসলমানকে প্রতিপক্ষরূপে ও হীন বর্ণে চিত্রিত করেন। এই পরিবেশে মুসলমান কবি কায়কোবাদই প্রথম কাহিনি কাব্যকার যিনি সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রবুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন।

হিন্দুরা যখন 'স্বরাজ', 'স্বরাজ' করে জোর আন্দোলন করছিল এবং কলকাতা ও ঢাকা নগরীতে মুসলমানদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করে তাদের খুন-জখম ও হত্যা করছিল, ঠিক এমন সময়ে কবি কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলিমের মিলনাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

এসো ভাই হিন্দু এসো মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত সন্তান।
এসো আজি সবে হয়ে এক প্রাণ
সেবি গে মায়ের চরণ দুটি।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় লিখেছেন–

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তিপণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

উপসংহার : সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংঘাতমুক্ত সুন্দর পৃথিবী গড়ার এক অপরিহার্য প্রত্যয়, যার গুণে মানুষ আপন-পর ভেদাভেদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের উচিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ বন্ধনকে মজবুত করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলার আলো-বাতাস আমরা যেভাবে ভোগ করছি তেমনিভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে ভুলে দেশের উন্নয়নে সবাইকে মনোনিবেশ করতে হবে। তাই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ টমাস পাইলের সাথে সুর মিলিয়ে বলতে চাই, "পৃথিবীটা আমার দেশ, সমস্ত মানবজাতি আমার ভাই এবং সবার ভালো করাই আমার ধর্ম।"

১০৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ

উপস্থাপনা : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জয়যাত্রা বিশ্বব্যাপী। মানবজাতির জীবনযাত্রাকে ব্যাপক বদলে দিয়েছে প্রযুক্তি। বিজ্ঞানের এক একটি আবিষ্কার আমাদেরকে সভ্যতার পথে এক এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। কম্পিউটার আবিষ্কার ও তার ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা সভ্যতার চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছি। ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ের সর্বত্র কম্পিউটার জ্ঞান ও কম্পিউটারজাত উপায়-উপকরণের ব্যবহারের নতুন ও নান্দনিক এক প্রত্যয় হচ্ছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। মূলত কম্পিউটার আবিষ্কারের ফলে তথ্য প্রযুক্তির নজিরবিহীন উন্নতি ও অগ্রগতিকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করে বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে উন্নতি ও সমৃদ্ধির এক মডেলরূপে প্রতিস্থাপনের এক রূপকল্পের নাম 'ডিজিটাল বাংলাদেশ।'

ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা : ২০০৬ সালের ২১শে মে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক কক্সবাজারে ল্যান্ডিং স্টেশন উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যুক্ত হয় ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বা তথ্য প্রযুক্তির মহাসড়কে। এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা আসে ২০০৮ সালে। নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ১২ই ডিসেম্বর ২০০৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরে অর্থাৎ ২০২১ সালে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হবে। একটি উন্নত দেশ, একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল সমাজ, একটি ডিজিটাল যুগের জনগোষ্ঠী, রূপান্তরিত উৎপাদন ব্যবস্থা, নতুন ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি সবমিলিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজগঠন এ স্বপ্নটাই দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর আওয়ামী লীগ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য : কম্পিউটারের কর্মপ্রবাহের এককসমূহ ডিজিটাল বা দশমিকভিত্তিক। মূলত এটি তথ্যভিত্তিক একটি কর্ম প্রক্রিয়া। তথ্যযুগ বা ডিজিটাল যুগ যে নামেই আমরা ডাকি না কেন, কৃষি ও শিল্প যুগের পর মানব সভ্যতার জন্য আসা এ যুগের সার্বিক অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের জীবনযাত্রার মান সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এটি বাংলাদেশের জনগণের উন্নত জীবনের প্রত্যাশা,

স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা এবং মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর প্রকৃষ্ট পন্থা। এটি বাংলাদেশের জন্য স্বল্পোন্নত বা দরিদ্র দেশ থেকে সমৃদ্ধ ও ধনী দেশে রূপান্তরের জন্য মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয় বাড়ানোর অঙ্গীকার, এবং বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সোপান।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য : ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা একটি রাজনৈতিক স্লোগান হলেও এর মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব। লক্ষ্যগুলোকে খুব সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

ক. **মৌলিক চাহিদা পূরণ :** ডিজিটাল বাংলাদেশে রাষ্ট্রকে জনগণের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ, অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা ও চিকিৎসার ন্যূনতম দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জনগণ যাতে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করার মতো উপার্জন করতে সক্ষম হয় তার জন্য তাকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার শেখাতে হবে এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রকেই প্রযুক্তি জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে হবে।

খ. **জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :** বাংলাদেশকে জনগণের জন্য একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই হবে ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্য। এই রাষ্ট্রটি হবে প্রকৃতপক্ষেই জনগণের। এ রাষ্ট্রে ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের উন্নত জীবনযাপনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পাশাপাশি মৌলিক-মানবিক অধিকার সংরক্ষণসহ সকল সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা থাকবে।

গ. **রাজনীতির ডিজিটাল ধারা :** ডিজিটাল বাংলাদেশের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সরকার ও জাতীয় সংসদসহ সকল রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ব্যবস্থা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত করা এবং রাজনীতির প্রচার প্রপাগান্ডা, ভোট গ্রহণ ও বক্তৃতা বিবৃতিতে ডিজিটাল ধারা প্রতিষ্ঠা করা।

ডিজিটাল বাংলাদেশের কর্মসূচি : কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপান্তর করে বিদ্যমান আর্থিক কাঠামোকে জ্ঞানভিত্তিক মেধাকেন্দ্রিক সৃজনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা ডিজিটাল বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার তা হলো ডিজিটাল-বান্ধব সরকার প্রতিষ্ঠা করে সরকারের কাজ করার পদ্ধতি ডিজিটাল করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় সরকারের সেবা পৌছানো। এর মাঝে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ডিজিটাল নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ সরকারের সকল কাজকে এর আওতাভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিকে ডিজিটালে রূপান্তর করা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর প্রত্যাশা ও বাস্তবতা : একটি দেশকে ডিজিটালে রূপান্তরের অর্থ হলো দেশটির শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি পরিচালনায় কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, ই-লার্নিং, ই-গভর্নেন্স ইত্যাদির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অন্যতম অবদান হলো ইন্টারনেট। দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও গ্রামে তথ্যপ্রযুক্তির মহাপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এজন্য ছড়িয়ে দিতে হবে কম্পিউটারের সঙ্গে অনলাইন বা ইন্টারনেট। নেটওয়ার্ক সুবিধার জন্য প্রয়োজন চট্টগ্রামে এসে থেমে থাকা ফাইবার অপটিকস ক্যাবলকে দেশের সর্বত্র অর্থাৎ জেলা, উপজেলা ও গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া। আর এটা সম্ভব ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে। ২০২১ সালে

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হলে সেখানে অর্থ ও শারীরিক শক্তির বদলে মেধা ও জ্ঞানের শক্তির প্রাধান্য থাকবে। কৃষিভিত্তিক একটি সমাজ থেকে বাংলাদেশ একটি সৃজনশীল ও মেধাভিত্তিক শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়ে মানবসভ্যতার ডিজিটাল যুগে নেতৃত্ব দেবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক সতর্কতা : দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সারা দুনিয়াতেই ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারের ফলে ডিজিটাল ডিভাইড তৈরি ও সম্প্রসারিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এর প্রভাব হিসেবে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড আরও সম্প্রসারিত হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগে সুবিধাভোগী, শোষকগোষ্ঠী, ধনী বা বিশেষ সম্প্রদায়-শ্রেণী-গোষ্ঠীর জন্য সম্পদ ও ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে আরও বেশি সহায়ক হতে পারে। এমনকি জ্ঞানভিত্তিক সমাজে জ্ঞানহীন বা জ্ঞানী হওয়ার সুযোগহীন মানুষের জীবনযাপন আরও কষ্টকর হতে পারে। সেজন্যই ডিজিটাল ডিভাইড না রাখাটা ডিজিটাল বাংলাদেশের একটি লক্ষ্য হতে হবে।

উপসংহার : একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, তথ্যপ্রযুক্তিই বর্তমান বিশ্বে সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। বর্তমানে যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি দক্ষ, তাদের সার্বিক অবস্থাও তত বেশি উন্নত। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হচ্ছে কম্পিউটারাইজড তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ও উন্নত হওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় নিজেদের গৌরবময় আসন প্রতিষ্ঠার এক সুদূরপ্রসারী মহৎ পরিকল্পনা। বিজ্ঞান ভালোমন্দ ব্যবহারের তারতম্যের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা করেছে শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ না রেখে ২০২১ সালে স্বাধীনতার 'সুবর্ণ জয়ন্তী' পালনের আগেই এর প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের জন্য হোক এক আশীর্বাদ। এ আশীর্বাদকে ফলপ্রসূ ও স্থায়ী করতে প্রয়োজন কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তি। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সবাইকে আরও তৎপর হতে হবে।

১০৬ বৈশ্বিক জলবায়ু ও বাংলাদেশ

অথবা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব পরিস্থিতি

অথবা, জলবায়ু পরিবর্তন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

উপস্থাপনা : বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত বিশ্বের অযাচিত কাজের ফসল জলবায়ুর পরিবর্তন, যার কারণে আজ জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীর এই তাপমাত্রা বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আর বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ একটি সময়ের দাবি। কেননা সুন্দরবনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক চিত্র : ২০০৭ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনে জাতিসংঘের শতাধিক সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সামনে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয় সেখানে উল্লেখ রয়েছে, বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ দূষণের ফলে বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে তাতে আগামী ২০৮০ সালের মধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার ৩০০ কোটি মানুষ ভয়াবহ পানি ও খাদ্য সংকটে পড়বে। এছাড়া ২০ থেকে ৩০ শতাংশ গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে সর্বোচ্চ হুমকির মুখে, যারা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, বিশ্বের তাপমাত্রা এক দশমিক পাঁচ থেকে দুই দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে, তাতে ২০ থেকে ৩০ শতাংশ গাছপালা ও পশুপাখির জীবনের ওপর ভয়াবহ ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত "ফোর্থ ন্যাশনাল ক্লাইমেট অ্যাসেসমেন্থ-ভলিউম-২" অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় ১০০০ কোটি ডলার, যা জিডিপির ১০%-এর বেশি। এর ফলে ফসল উৎপাদন ২১০০সাল নাগাদ ৭৫% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : পৃথিবীতে একদিকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গমন ক্রমাগত বাড়ছে, অন্যদিকে 'উন্নয়নের' নামে বনাঞ্চল উজাড় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ফলে পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলে আরও বেশি পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বনসহ আরও কিছু মারাত্মক ক্ষতিকর গ্যাস মজুত হয়ে গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টি করছে। ফলে সূর্যের তাপ যে পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে, তার সবটা বের হতে পারছে না। তাছাড়া এসব গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের বাইরের দিকে যে ওজন গ্যাসের আবরণ আছে, তা ক্রমেই ক্ষয় হচ্ছে। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর উপরিভাগের ওজন আবরণে ইতোমধ্যে বড় ফাটল সৃষ্টি হয়ে তা ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। একইসাথে এই বৃদ্ধির গতিও বাড়ছে। ফলে পরিবর্তন হচ্ছে বৈশ্বিক জলবায়ুর।

জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক ক্রমধারা : ১৭১২ সালে প্রথম বাষ্পচালিত ইঞ্জিন (স্টিম ইঞ্জিন) আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে শিল্প বিপ্লবের পথ সুগম হয়। এতে কয়লা পোড়ানোর মধ্য দিয়ে প্রকৃতিতে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ শুরু হয়। বিগত শতাব্দী হতে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু তথ্য নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১৯০০ : সুইডেনের এক রসায়নবিদ আবিষ্কার করেন, আবহাওয়ামণ্ডলে কার্বন-ডাইঅক্সাইড অবলোহিত বর্ণচ্ছটার কিছু অংশ জোরালোভাবে শোষণ করে নেয়। তবে এ গ্যাস বিশ্বকে উষ্ণ করে দিচ্ছে বলে তিনি বুঝতে পারেননি।

১৯৩৮ : বিশ্বের ১৪৭টি আবহাওয়া কেন্দ্রের রেকর্ড থেকে দেখা যায়, বিশ্বের তাপমাত্রা আগের শতাব্দী থেকে বেড়েছে।

১৯৫৭ : মার্কিন বিশেষজ্ঞরা দেখতে পান, বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন-ডাইঅক্সাইড সাগরের পানি শোষণ করতে পারছে না।

১৯৭২ : স্টকহোমে প্রথম জাতিসংঘ পরিবেশ বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৮৮ : জলবায়ু পরিবর্তন মূল্যায়ন করতে ইন্টার-গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) গঠিত হয়।

১৯৯০ : আইপিসিসি-র প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বের তাপমাত্রা গত শতকের তুলনায় দশমিক তিন থেকে বেড়ে দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়েছে।

১৯৯৭ : কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। এতে উন্নত দেশগুলো ২০০৮-২০১২ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ৫ শতাংশ কমাতে সম্মত হয়।

২০০১ : কিয়োটো চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে যায়।

২০০৭ : আইপিসিসি-র চতুর্থ রিপোর্টে দেখা যায়, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ৯০ শতাংশেরও বেশি দায়ী মানবসৃষ্ট গ্রিন হাউস গ্যাস।

২০০৯ : যুক্তরাষ্ট্রকে টপকে চীন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। এ প্রেক্ষিতে কোপেনহেগেনে বিশ্বের ১৯২টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং প্রতিনিধিরা জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলনে বসেন।

২০১৮ সালে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০১৪-২০১৬ পর্যন্ত স্থির থাকার পর ২০১৭ সালে কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে ১.২%।

জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলন : গত ৭-১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৯৩টি দেশ থেকে ১০,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। শুরুতে সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন কুনি হেডেগার্ড।

তবে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে আরও কার্যকর আলোচনার জন্য তিনি সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন-এর হাতে সভাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাসমুসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনের শেষের দিকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। কার্যকর কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে সকলেই ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার প্রচেষ্টায় UNFCCC একটি সমঝোতাকে 'নোট' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এ সমঝোতাস্মারকে বাধ্যতামূলক আইন চুক্তি, দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থ সংস্থান, বন সংরক্ষণ, বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ২-১৪ই ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পোলান্ডের কাতোভিচ শহরে জাতিসংঘের ২৪তম বার্ষিক পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২০১৫ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত Cop-21 এ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলায় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার বাস্তবায়নে একটি অভিন্ন নির্দেশনা তৈরি করা হয়। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, একুশ শতকে বৈশ্বিক উষ্ণতা দুই ডিগ্রির মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, দেশটি ৪০০ মিলিয়ন ডলারের নিজস্ব তহবিল গঠন করে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের অবস্থা : সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ' সাময়িকীতে প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ১২০ বছরে বাস্তুচ্যুত হবে প্রায় দুই লাখ কৃষক, মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে ৪০% কৃষিজমি এবং জলবায়ুর প্রভাবে অভিবাসন বেড়ে যাবে ২৫%। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ঘনঘন ঝড়ঝঞ্ঝার কারণে দেশটি প্রতিবছর ১০-১৮ মিলিমিটারেরও বেশি পানিতে তলিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ প্রভাব আমাদের দেশে পড়তে শুরু করেছে। কেননা বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভূ-খণ্ডের তুলনায় বনভূমি নিতান্তই অপ্রতুল, মাত্র ১৭% বনভূমি রয়েছে। এককালে এখানে ছিল ফলবান বৃক্ষের বাগান, অরণ্যে ছিল বিপুল বৃক্ষরাজি। কিন্তু আধুনিক জীবন ও সভ্যতার গ্রাসে সবুজবাংলার সেই শ্যামল সুন্দর রূপ আজ তিরোহিত। যার কারণে দেখা দিচ্ছে এমন জলবায়ু পরিবর্তন।

প্রতি বছরই বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ-কবলিত হয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, কালবৈশাখী, বন্যা, সিডর, নারগিস, আইলা, রোয়ানু, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি দুর্যোগ এ জনপদে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস উত্তাপ বাড়লেই বাংলাদেশের প্রায় ১৭% ভূমি সমুদ্রে তলিয়ে যাবে বলে অনেক গবেষক আশঙ্কা করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণা মতে, মৌসুমী বায়ুর গতি পরিবর্তন, অনিয়মিত খরা, বন্যা, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও জোয়ারের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সাড়ে তিন কোটি মানুষ গৃহহারা হয়ে যেতে পারে। এছাড়া সুন্দরবন ও হাওড় অঞ্চলের জীববৈচিত্রেও বিপর্যয়ের মুখে পড়বে। সার্বিকভাবে জলবায়ুর প্রভাবে আগামীতে এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি।

বিশ্বব্যাংকের জলবায়ু প্রতিবেদন ২০১৮ অনুসারে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা বাড়বে ১-১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস জলবায়ু ঝুঁকিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ১৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষ। এর ফলে দেশটির আর্থিক ক্ষতি হবে প্রায় ১৪ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকা।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় জাতীয় আইন : ১৯৯২ সালে জীববৈচিত্র্য কনভেনশনে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করার পর জাতীয় সংরক্ষণ কৌশল (NCS : National Conservation Strategy) এবং জাতীয় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্ম পরিকল্পনা (NEMAP : National Environment Management Action Programme) তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং ইউএনডিপি'র সহায়তায় টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (SEMP : Sustainable Environment Management Plan) এর অধীনে বেশকিছু জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমি বনায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়, যা এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তনরোধে করণীয় : বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনরোধে যুগোপযোগী কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন–

১। অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণ ও দেশের আয়তনের ভারসাম্য রক্ষা করে বনভূমি সংরক্ষণ।
২। দেশের জলবায়ু পরিবর্তনরোধে বাধ্যতামূলক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
৩। কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি মোকাবেলা করার জন্য বাঁধ নির্মাণ।
৫। তেল, কয়লা ও গ্যাসজাতীয় জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস।
৬। গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনা যা Clean Development Mechanism (CDM) এর মাধ্যমে অর্জিত হয়।
৭। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যেসব শিল্পসমৃদ্ধ দেশ দায়ী তাদেরকে এ বিষয়ে বিরত করার জন্য জাতিসংঘকে পদক্ষেপ নিতে হবে।
৮। ওজন আবরণে যে ক্ষয় হয়েছে তার বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।
৯। পরিবেশ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কাজ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন দেশের বিশেষত বাংলাদেশের মতো সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া।
১০। সর্বোপরি পার্শ্ববর্তী ইউরেনিয়ামসমৃদ্ধ দেশসমূহের সাথে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি পরিহার করে আন্তর্জাতিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে সুষ্ঠু সমাধানের চেষ্টা করা।

উপসংহার : জলবায়ু পরিবর্তন রোধ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষার জন্য সর্বাগ্রে বিপজ্জনক জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হবে। আর জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করতে হলে এর জন্য দায়ী পুঁজিবাদী বিশ্বের বর্তমান শিল্প নীতিমালা পরিবর্তন করতে হবে।

১০৭ ভূমিকম্প ও বাংলাদেশ

অথবা, ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

অথবা, বাংলাদেশে ভূমিকম্পের আশঙ্কা ও করণীয়

উপস্থাপনা : ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের জন্য একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এদেশে প্রতি বছরই কোনো না কোনো দুর্যোগে মানুষের জীবনযাত্রা

বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বারবার সংঘটিত বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, খরা, নদীভাঙ্গন, ভূমিধসের পাশাপাশি যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদেরকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে সেটি হলো ভূমিকম্প। বিগত কয়েক বছর ধরে বারবার মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প এদেশে আঘাত হেনেছে। প্রশমনের উপযুক্ত পন্থা না থাকায় বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হলে সকলের পরিণতি নিয়ে সম্প্রতি আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ভূমিকম্পের ভয়াবহ বিপর্যয় এড়াতে জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত না হলে এ দুর্যোগের বিরাট ঝুঁকি নিয়েই আমাদের বাস করতে হবে।

ভূমিকম্প কী : পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের কিছু অংশ কখনো কখনো স্বল্প সময়ের জন্য হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠে, একেই ভূমিকম্প বলে। সাধারণত এরূপ কম্পন মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয় আবার কখনো কিছু সময় পরপর সংঘটিত হয়। কম্পনের মাত্রা কখনো মৃদু আবার কখনো অত্যন্ত প্রবল হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তা কেন্দ্র নামে অভিহিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূকম্পনের এই কেন্দ্র ১৬ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করে। আর কেন্দ্রের ঠিক উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। উপকেন্দ্র কেন্দ্রের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত বলে সেখানে কম্পনের বেগ সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়। এটি এমন একটি শক্তি যা ভূপৃষ্ঠকে প্রবল ঝাঁকুনি দ্বারা আকস্মিক বা দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে। ভূমিকম্প নিজে কোনো প্রাণহানি বা জখমের কারণ হয় না। তবে পরোক্ষভাবে পড়ন্ত ভারী বস্তু বা দেয়ালধসের মাধ্যমে জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করে।

ভূমিকম্প কেন হয় : সম্প্রতি আমাদের দেশে পুনঃপুন মৃদু-মাঝারি ভূকম্পন এবং ইন্দোনেশিয়া, হাইতি প্রভৃতি দেশে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতি অবলোকনে এর কারণ সম্পর্কে সকলেরই কৌতূহল বাড়ছে। ভূমিকম্পের কারণ অনুসন্ধানে ভূতত্ত্ববিদগণ লক্ষ করেন, শিলাচ্যুতি, তাপ বিকিরণ, অগ্ন্যুদগম, পানি বাষ্পীভবন, ভূমিধস প্রভৃতি কারণে ভূ-ত্বকের নিচে আন্দোলিত হয় এবং ভূকম্পন সংঘটিত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুযায়ী পৃথিবীর একপ্রান্তে অবস্থিত ভূকম্পনকেন্দ্র থেকে সৃষ্ট তরঙ্গমালা অপরপ্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। তবে কেন্দ্র থেকে তরঙ্গগুলো যত দূরে অগ্রসর হবে এর তীব্রতা তত হ্রাস পাবে। মৃদু কিংবা প্রবল ভূমিকম্প মাপার এককের নাম রিখটার স্কেল। পৃথিবীর সব অংশে কমবেশি ভূমিকম্প অনুভূত হলেও ভঙ্গিল পর্বত ও ভূগঠন প্লেটসমূহের সীমান্ত অঞ্চলে এর তীব্রতা বেশি হয়।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকির কারণ : অতি সম্প্রতি বাংলাদেশকে ভূমিকম্পের ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেশের বগুড়া, তানোর, ত্রিপুরা, সীতাকুণ্ড, টেকনাফ, হালুয়াঘাট, ধুবরি, চট্টগ্রাম, শাহীবাজার, রাঙামাটি এই মোট ১০টি ভূচ্যুতি এলাকার জন্য ভূমিকম্পের ঝুঁকি অত্যন্ত বেশি। এছাড়া বাংলাদেশের অবস্থান ভারত, ইউরেশিয়া, বার্মা, টেকটোনিক প্লেটের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। এই টেকটোনিক প্লেট হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বন্ধ হয়ে আছে এবং শক্তি সঞ্চয় করছে। আর এই শক্তির প্রবলতার কারণে যখন টেকটোনিক প্লেট খুলে যাবে তখন বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা দেখা দেবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) প্রস্তুতকৃত ম্যাপ অনুযায়ী এদেশের ৪৩ শতাংশ এলাকা অতি ঝুঁকিপূর্ণ, ৪১ শতাংশ মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ ও ১৬ শতাংশ মৃদু ঝুঁকিপূর্ণ। জানুয়ারি ২০০৬ ও ডিসেম্বর ২০০৯-এর রেকর্ড অনুযায়ী দেখা গেছে, এ সময়ে চার রিখটার স্কেলের উপরের মাত্রার ১১১৭টি ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। তাছাড়া এদেশের বেশিরভাগ শহরের দালান-কোঠার প্রায় ৬৫% স্থাপনাই প্রকৌশল বর্জিত এবং কারিগরি দক্ষতাবিহীনভাবে গড়ে

ওঠা অত্যন্ত নিম্নমানসম্পন্ন। আর আমাদের দেশের বেশিরভাগ এলাকার মাটি দোআঁশ, ফলে এখানে ভূমিকম্পের ঝুঁকি অনেকটা বেশি। তাই স্বাভাবিকভাবেই ভূমিকম্পের জন্য এগুলোকে মোটেও নিরাপদ হিসেবে গণ্য করা হয় না। আর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরে চারটি ভূমিকম্পের উৎস সক্রিয় থাকায় এ অঞ্চলগুলোতে সুনামি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্প : ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে দেখা যায়, এ পৃথিবীতে অতীতে বড় বড় ভূমিকম্পে বহু জনপদ, সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। বড় বড় শহর-নগর মাটির নিচে তলিয়ে গেছে কিংবা সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। শত শত বছর পূর্বে সংঘটিত এসব ভূমিকম্পের পূর্ণাঙ্গ তথ্য না পেলেও যেটুকু পাওয়া যায় তাতে ব্যাপক ধ্বংসলীলার পরিচয় পাওয়া যায়। সম্প্রতি (২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে) নেপালে অনুষ্ঠিত ভূমিকম্পে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত কয়েক দশকে চীন, মেক্সিকো, ইরান, ও ভারতের গুজরাটে বড় ধরনের ভূমিকম্পে লাখ লাখ লোকের প্রাণহানী ঘটেছে। আরও আগের ইতিহাসে চোখ রাখলে দেখা যায়, ৪১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবল ভূমিকম্পে সিরিয়ার প্যালেস্টাইন প্রদেশের বহু নগর বিনষ্ট হয়। ৪৮০খ্রিষ্টাব্দে প্রায় চল্লিশ দিনব্যাপী ভূমিকম্পে কনস্টান্টিনোপল নগর বিধ্বস্ত হয়। ১৬৫৬ সালে ভূমিকম্পে পর্তুগালের লিসবন নগর বিধ্বস্ত হয়। ১৭৩২ সালে প্রবল ভূমিকম্পে গুজরাটের উত্তরস্থ ভুভাগ ধসে সাগরজলে নিমজ্জিত হয়। ১৭৯৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডর রাজ্যের রিওবাম্বা নগর বিধ্বস্ত হয়।

এমনিভাবে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার অনেক তথ্যই উল্লেখ করা যায়। ভূ-তাত্ত্বিকগণ এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের বিভিন্ন নমূনা সংগ্রহ করে ইতিহাসের অনেক না-জানা তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। তবে প্রকৃতির এই ধ্বংসযজ্ঞের অনেককিছুই অতীতের মতো ভবিষ্যতেও অজানা থেকে যাবে বলে ধরা যায়।

এদেশের কতিপয় ভয়াবহ ভূমিকম্প : বাংলাদেশের অতীত রেকর্ড থেকে জানা যায়, ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালে তৎকালীন বঙ্গদেশে প্রচণ্ড বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া ১৯০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত শতাধিক মাঝারি ও শক্তিশালী ভূমিকম্প বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী এলাকায় আঘাত হেনেছে। তবে ভূমিকম্প সংক্রান্ত ডাটা থেকে এটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এদেশে ভূমিকম্পের পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভূমিকম্পে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ : ভূমিকম্পে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে তা অনুমান করা যায় মাত্র। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ভূমিকম্প সম্বন্ধে তেমন কোনো পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। ফলে মানুষ সতর্কতামূলক কোনো পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে না। তাছাড়া ভূমিকম্পের সময় এবং পরপরই কী করণীয় এ বিষয়ে আমাদের দেশের মানুষের জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। দালানকোঠা, বহুতল ভবন নির্মাণের সময় ভূমিকম্প প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা গ্রহণেও রয়েছে প্রচণ্ড অনীহা। যার ফলে এদেশে বড় ধরনের ভূমিকম্প সংঘটিত হলে ভবনগুলো বাসিন্দাদের প্রাণহানি ঘটিয়ে ধসে পড়বে বা দেয়াল চাপায় লোকজন আটকা পড়ে থাকবে। কাঁচা ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, ব্রীজ উৎপাটিত হবে এবং জীবজন্তু মারা পড়বে। আর ভূমিকম্প-পরবর্তী দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ; বৈদ্যুতিক তারের বিচ্যুতি, গ্যাস-পাইপে ফাটল প্রভৃতির মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত ঘটে, যাতে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে বিলম্ব

ঘটায়। তাছাড়া জীবনধারণের অতিপ্রয়োজনীয় উপায়গুলো বিদ্যুৎ, গ্যাস, রাস্তা, সেতু, টেলিফোন, পানি, পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থার বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। এমনিতেই বাংলাদেশ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত একটি দরিদ্র দেশ, তার ওপর সম্পদের স্বল্পতা, আধুনিক প্রযুক্তির অভাব, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বড় ধরনের ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সার্বিক পরিস্থিতিতে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

ভূমিকম্প প্রশমনে আমাদের করণীয় : পূর্ব-সতর্কতা অবলম্বন করলে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা হ্রাস করা যায়। ভূমিকম্প এমন এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার পূর্বাভাস দেওয়ার মতো কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়নি। এ কারণে ভূমিকম্প প্রশমনের লক্ষ্যে সবাইকে আরও অধিক বিস্তৃতমুখী পদ্ধতি গ্রহণ করা আবশ্যক। এ পদ্ধতি কাঠামোগত ও অ-কাঠামোগত দুরকমই হতে পারে। কাঠামোগত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে– স্থাপনার দৃঢ়তা নিশ্চিত করার মতো সঠিক নির্মাণপদ্ধতি অনুসরণ ও ভূমিকম্প সংক্রান্ত উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার। অ-কাঠামোগত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পূর্বপ্রস্তুতি শক্তিশালীকরণ, ভূমি-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও সরকারি আইন প্রয়োগ। ভূমিকম্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে কর্মশালা, সভা, বিশেষজ্ঞের মতামত, পোস্টার, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কার্যক্রম, পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্তি প্রভৃতি কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাই সরকার, জনগণ, বিভিন্ন দাতাসংস্থা ও এনজিও'র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও আশু প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরি।

ভূমিকম্প মোকাবেলায় করণীয় : ভূমিকম্পের মতো ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক দুর্যোগের মোকাবেলায় অর্থাৎ প্রশমন, পুনরুদ্ধার ও প্রস্তুতিসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে বড়ই নাজুক। বিশেষজ্ঞদের মতে, ৭-৮ তীব্রতার একটি ভূমিকম্প ঢাকা শহরেই ৮৬,০০০ মানুষের প্রাণহানি ও ৭২,০০০ ভবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই দুর্যোগজনিত পরিস্থিতির সফল মোকাবেলার লক্ষ্যে এদেশে স্থানীয় ও জাতীয় উভয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি নীতি গৃহীত হয়েছে এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহবাবদ ২০১০ সালে সরকার ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। এছাড়া ৬০ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মসূচির কালানুক্রমিক বহনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নেটওয়ার্কিং পদ্ধতিতে পৃষ্ঠপোষকতার উন্নয়ন এবং অর্থের প্রাপ্তব্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের প্রস্তুতির অপ্রতুলতার জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণার অভাব, রাজউকের উদাসীনতা ও বুয়েটের বিশেষজ্ঞদের জোরদার কর্মসূচির অপর্যাপ্ততা বহুলাংশে দায়ী।

উপসংহার : জীবন ও সম্পদ বিনষ্টকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে ভূমিকম্প অন্যতম। আর দুর্ভাগ্যবশত পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলোর মধ্যেই বাংলাদেশের অবস্থান। তাই অপ্রত্যাশিত হলেও সত্য যে, বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে থাকার কারণে ব্যাপক জানমালের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। অথচ শক্তিশালী ভূমিকম্পের বিপর্যয় রোধে যথেষ্ট প্রস্তুতি ও সামর্থ্য বাংলাদেশের নেই। তাই কত প্রাণ, সম্পদ, লোকালয় ভূমিকম্পের কারণে চাপা পড়ে ইতিহাসে পরিণত হবে আমাদের নিকট তার কোনো সদুত্তর নেই। কাজেই ভূমিকম্পের প্রতিকার কৌশল নির্ধারণে সরকার, জনগণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ এর রোধ ও বিপর্যয় মোকাবেলায় ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।



ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৫

বাংলা (আবশ্যিক)

বিষয় কোড : 1 0 4

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর যৌবন-বন্দনার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ৩৮ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য নিরূপণ কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৩, পৃষ্ঠা নং ৬৫ দ্রষ্টব্য।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো **একটি**) : ৫

(ক) মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ১১৫ দ্রষ্টব্য।

(খ) আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ১১৯ দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁই মাচা' গল্পটি সন্তান বাৎসল্যের একখানা প্রামাণ্য দলিল।"– উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ১৮২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে, তা আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ২০৩ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো **একটি**) : ৫

(ক) দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

(খ) আকাশে যখন সন্ধ্যাতারা বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো তখন ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত-শীতল প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৭৩, পৃষ্ঠা নং ২৭১ দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) "লালন শাহের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' কবিতাটি একই সঙ্গে মরমী রসব্যঞ্জনা ও শিল্পগুণে সমৃদ্ধ"– উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ২৮৭ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান স্বদেশের স্বাধীনতার যে বন্দনা করেছেন, তা নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর্ আজি?

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৫৮ দ্রষ্টব্য।

(খ) আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সর্বত্রগামী।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৩৬৪ দ্রষ্টব্য।

৭। যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ দ্রষ্টব্য।

(খ) ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান বলতে কী বোঝ? ষ-ত্ব বিধানের তিনটি নিয়ম লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৪০০ দ্রষ্টব্য।

(গ) অর্থগত দিক থেকে বাংলা শব্দসমূহকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৪৫৭ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :
ভাবুক, ভক্তি, বক্তব্য, সাপুড়ে, ঢাকাই।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৯, পৃষ্ঠা নং ৪৬৮-৪৮৪ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :
গননা, অনুসঙ্গ, বীনাপানি, পাষান, ন্যাস্ত।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯ ও ৩০, পৃষ্ঠা নং ৪০৯-৪২২ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর (যে কোনো একটি) : ৫

(ক) Early rising is benificial to health. The boy who rises early enjoy the fine air of the morning. He can take a walk by the riverside or in the open field. He can enjoy the sweet songs of the birds and see beautiful sight of the sunrise. All these make him healthy and cheerful.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৩২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) Bangladesh declared independence on 26 March, 1971. It became free from Pakistan on 16 December 1971 after a great liberation war. It is a democratic country with many kinds of people. Bangladesh is also a beautiful country with many resources. It has rich deposit of oil, gas and coal. It can utilize these resources and become prosperous.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৯, পৃষ্ঠা নং ৫৫০ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রবন্ধ লেখ (যে-কোনো একটি) : ২০

(ক) ইসলাম ও শান্তি;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫৭১ দ্রষ্টব্য।

(খ) নারীর অধিকার;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

(গ) দূষিত পরিবেশ ও বিপন্ন পৃথিবী;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৬৫৯ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৭৪৪ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) বই পড়ার আনন্দ।

উত্তরসংকেত : রচনা নং ২০, পৃষ্ঠা নং ৬১০ দ্রষ্টব্য।

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৬

বাংলা (আবশ্যিক)

বিষয় কোড : 104

সময়– ৩ ঘণ্টা   পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ৬১ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা নং ২১ দ্রষ্টব্য।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) 'বিষয় অনুসারেই ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।'

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ১০১ দ্রষ্টব্য।

(খ) 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা।'

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৩, পৃষ্ঠা নং ১৪৮ দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৭৭ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'পথ জানা নাই' গল্পের আলোকে গহুরালীর চরিত্র অংকন কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ২২২ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) এই নিস্তব্ধতার নিপীড়ন স্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৬৯, পৃষ্ঠা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

(খ) দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৮৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) 'মোহররম' কবিতায় যে হৃদয়বিদারক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৩, পৃষ্ঠা নং ৩১৫ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'বঙ্গভাষা' কবিতা অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দাও।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা নং ২৯৬ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৯, পৃষ্ঠা নং ৩৫৫ দ্রষ্টব্য।

(খ) কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ৩৬৮ দ্রষ্টব্য।

৭। যে কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ৫১৬ দ্রষ্টব্য।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ৪৩০ দ্রষ্টব্য।

(গ) শব্দ কাকে বলে? গঠন অনুযায়ী বাংলা শব্দের শ্রেণিবিভাগ কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৪৫৬ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **পাঁচটি**) :

অতিথি, বর্তমান, পার্থিব, গন্তব্য, আত্মীয়, পানীয়, লাজুক।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৪৬৭-৪৮৪ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) নিচের **শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :**

ইতিমধ্যে, প্রতিযোগীতা, শীততাপ, সমস্তছাত্রগণ, অধ্যায়ন।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮ ও ২৯, পৃষ্ঠা নং ৪০৮-৪২১ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর : ৫

(ক) We all are peace loving people. We must maintain peace among us. We have many duties and responsibilities to our society. We all are dependent on each other. We all should keep our world peaceful.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৫৪১ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) A patriot always loves his country. The patriots love their country more than their lives. They are prepare to die for the welfare of their country. Everybody honours them. We always keep them on our mind.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৫৪১ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রবন্ধ লেখ (যে-কোনো **একটি**) : ২০

(ক) ইসলামে মানবাধিকার;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৫৭৬ দ্রষ্টব্য।

(খ) খাদ্যে ভেজাল ও জনস্বাস্থ্য;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৮৯, পৃষ্ঠা নং ৭৭১ দ্রষ্টব্য।

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৪৬, পৃষ্ঠা নং ৬৬৯ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৬২২ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৯৩, পৃষ্ঠা নং ৭৮০ দ্রষ্টব্য।

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৭

বাংলা (আবশ্যিক)

বিষয় কোড : 1 0 4

সময়- ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান- ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮, পৃষ্ঠা নং ১৫ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য নিরূপণ কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৩, পৃষ্ঠা নং ৬৫ দ্রষ্টব্য।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ১১১ দ্রষ্টব্য।

(খ) কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে, এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ১৫৮ দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত 'পাদটীকা' গল্প অনুসরণে পণ্ডিত মশাইয়ের চরিত্র আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২২, পৃষ্ঠা নং ২০৯ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) আবুল মনসুর আহমদের 'হুযুর কেবলা' গল্পে সমকালীন সমাজ-বাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে সে বিষয়ে আলোকপাত কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ২০৩ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) সে মনে মনে বুঝিল, কলি যুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ২৫০ দ্রষ্টব্য।

(খ) তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩৩, পৃষ্ঠা নং ২৪৭ দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) 'ঐকতান' কবিতার মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লেখ। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬, পৃষ্ঠা নং ৩০২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি স্বদেশের যে বন্দনা করেছেন তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪০, পৃষ্ঠা নং ৩৪৬ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো একটি) : ৫

(ক) ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্সিয়া ক্রন্দন চাহি না।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ৩৭০ দ্রষ্টব্য।

(খ) "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ৩৭১ দ্রষ্টব্য।

৭। যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) ণত্ব ও ষত্ব-বিধান বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ ষত্ব-বিধানের তিনটি নিয়ম আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১, পৃষ্ঠা নং ৪০০ দ্রষ্টব্য।

(খ) উপসর্গের সংজ্ঞা দাও। বাংলা শব্দগঠনে উপসর্গের ভূমিকা আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ৪৬১ দ্রষ্টব্য।

(গ) বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর :

আমরা, বহুব্রীহি, উপকূল, গায়ে-হলুদ, ঘর-জামাই।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৪৮৮-৫০৭ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :

মুহূর্ত, আকাংখা, প্রাণীবিদ্যা, মুমর্ষ, গীতাঞ্জলী।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৮ ও ২৯, পৃষ্ঠা নং ৪০৮-৪২১ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর : ৫

(ক) The life of a student is a time of preparation for the struggle of life. To make him well balanced for struggle education is necessary. Student of today will lead the nation tomorrow. But if they do not complete their education would they be able to lead the country to peace and prosperity?

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৮, পৃষ্ঠা নং ৫৫০ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) It was the 16th December, 1971. On that day the Pakistani soldiers surrendered their arms. It will go down in history as a memorable day. The man who deserves the greatest credit for this is Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯০, পৃষ্ঠা নং ৫৫০ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রবন্ধ লেখ (যে-কোনো **একটি**) : ২০

(ক) দেশগঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৭৪৪ দ্রষ্টব্য।

(খ) মানবসম্পদ উন্নয়নে নারীশিক্ষার গুরুত্ব;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৮৭, পৃষ্ঠা নং ৭৬৭ দ্রষ্টব্য।

(গ) ইসলাম : একটি শাশ্বত জীবনব্যবস্থা;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ১, পৃষ্ঠা নং ৫৭১ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৩৯, পৃষ্ঠা নং ৬৫১ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) একটি শীতের সকাল।

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৪৭, পৃষ্ঠা নং ৬৭১ দ্রষ্টব্য।

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৮

বাংলা (আবশ্যিক)

বিষয় কোড : 104

সময়– ৩ ঘণ্টা পূর্ণমান– ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশে উল্লিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ অবলম্বনে প্রমথ চৌধুরীর যৌবন-বন্দনার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ৩৮ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) বিদায় হজের ভাষণে ইসলামের যে মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ৬১ দ্রষ্টব্য।

২। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো **একটি**) : ৫

(ক) মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৫, পৃষ্ঠা নং ১১৫ দ্রষ্টব্য।

(খ) সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ১১১ দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'একরাত্রি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১৭৭ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'পুঁই মাচা' গল্পটি সন্তান বাৎসল্যের প্রামাণ্য দলিল– আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯, পৃষ্ঠা নং ১৮২ দ্রষ্টব্য।

৪। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে কোনো **একটি**) : ৫

(ক) দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৬৮, পৃষ্ঠা নং ২৬৯ দ্রষ্টব্য।

(খ) দাম চড়িল সব জিনিসের, কমিল কেবল জীবনের।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৮৪, পৃষ্ঠা নং ২৭৭ দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) 'বঙ্গভাষা' কবিতা অবলম্বনে মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দাও। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা নং ২৯৬ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ফররুখ আহমদের ইসলামি ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের স্বপ্ন আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৪, পৃষ্ঠা নং ৩৩৫ দ্রষ্টব্য।

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর (যে-কোনো **একটি**) : ৫

(ক) ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি?

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ৩৫৮ দ্রষ্টব্য।

(খ) স্বাধীনতা তুমি,
বাগানের ঘর, কোকিলের গান, বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৭৪, পৃষ্ঠা নং ৩৯০ দ্রষ্টব্য।

৭। যে-কোনো **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রধান পাঁচটি পার্থক্য লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ৪৩০ দ্রষ্টব্য।

(খ) পদ কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা দাও।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ৫১৬ দ্রষ্টব্য।

(গ) "উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।"– বিশ্লেষণ কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫১, পৃষ্ঠা নং ৪৬২ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (যে-কোনো **পাঁচটি**) :

ঢাকাই, মানব, ভাবুক, পানীয়, নাজুক, রান্না।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৪৬৭-৪৮৪ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) নিচের শব্দগুলোর শুদ্ধরূপ লেখ :

প্রতিযোগীতা, গননা, পাষান, শীততাপ, অধ্যায়ন।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৯, পৃষ্ঠা নং ৪১৩-৪২১ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর : ৫

(ক) Bangladesh is a small South-Asian country. It's area is 1,47,570 sq. km. It got its independence on 16 December, 1971. The climate of the country is hot and humid. The main occupation of the people in general is agriculture. There are some other professions too, such as service, technical and industrial work. The main attraction of the country is its natural beauty.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৬৯, পৃষ্ঠা নং ৫৭০ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) Education is not confined within the schools, colleges and universities only. We get education from family, society and everything in the world. The education that we derive from our practical life is more important than that we get from schools and colleges. The whole world is place of learning for us. Always we are learning something.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৩১, পৃষ্ঠা নং ৫৫৯ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রবন্ধ লেখ (যে-কোনো **একটি**) : ২০

(ক) বাংলাদেশের লোকজ উৎসব;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং ৬৯২ দ্রষ্টব্য।

(খ) দেশ গঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৭৮, পৃষ্ঠা নং ৭৪৪ দ্রষ্টব্য।

(গ) নারীর অধিকার;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৮, পৃষ্ঠা নং ৫৮৬ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ৬২২ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৯৩, পৃষ্ঠা নং ৭৮০ দ্রষ্টব্য।

ফাযিল স্নাতক প্রথম বর্ষ পরীক্ষা ২০১৯

বাংলা (আবশ্যিক)

বিষয় কোড : 104

সময়- ৩ ঘণ্টা | পূর্ণমান- ১০০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১। (ক) বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষা প্রয়োগের ব্যাপারে কীভাবে সকলের মতের ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করেছেন 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অনুসারে আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশপ্রেমের যে ছবি ফুটে উঠেছে, তা লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪১, পৃষ্ঠা নং ৮১ দ্রষ্টব্য।

২। ব্যাখ্যা কর (**একটি**) : ৫

(ক) বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৮, পৃষ্ঠা নং ১২৩ দ্রষ্টব্য।

(খ) সকলেই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সকলের মুখে একই লাব্বাইক ধ্বনি।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬০, পৃষ্ঠা নং ১৩০ দ্রষ্টব্য।

৩। (ক) 'পথ জানা নাই' গল্পের আলোকে গহুরালির চরিত্র বিশ্লেষণ কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ২২২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' গল্পে সমকালীন সমাজবাস্তবতার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৫, পৃষ্ঠা নং ২১৪ দ্রষ্টব্য।

৪। ব্যাখ্যা কর (**একটি**) : ৫

(ক) আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ১৯, পৃষ্ঠা নং ২৩৯ দ্রষ্টব্য।

(খ) সে মনে মনে বুঝিল, কলিযুগেও দুনিয়ায় ধর্ম আছে।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ২৫০ দ্রষ্টব্য।

৫। (ক) 'ঐকতান' কবিতা অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎ ও জীবনবোধের স্বরূপ আলোচনা কর। ১৫

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২১, পৃষ্ঠা নং ৩১২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) "কবি জীবনানন্দ দাশ 'বনলতা সেন' কবিতায় নারীর সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় দিয়েছেন।"– বিশ্লেষণ কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৩২২ দ্রষ্টব্য।

৬। ব্যাখ্যা কর (**একটি**) : ৫

(ক) এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৩৮২ দ্রষ্টব্য।

(খ) এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।

উত্তরসংকেত : ব্যাখ্যা নং ৪৯, পৃষ্ঠা নং ৩৭৮ দ্রষ্টব্য।

৭। যে-কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫ × ৩ = ১৫

(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩, পৃষ্ঠা নং ৩৯৪ দ্রষ্টব্য।

(খ) অর্থানুসারে শব্দ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৫, পৃষ্ঠা নং ৪৫৭ দ্রষ্টব্য।

(গ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর (পাঁচটি) :

বহুব্রীহি, আমরা, চৌরাস্তা, রাজপথ, ছেলেধরা, উপনদী, রান্নাঘর, মনমাঝি।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬৪, পৃষ্ঠা নং ৪৮৮-৫০৭ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) প্রত্যয়ের নামসহ প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয় কর (পাঁচটি) :

কর্তব্য, ধার্মিক, গন্তব্য, মেয়েলি, হলদে, ঐতিহাসিক, নাচুক, কান্না।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৮, পৃষ্ঠা নং ৪৬৭-৪৮৪ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) সাধু ও চলিত রীতি বলতে কী বোঝ? সাধু ও চলিত রীতির দুটি করে বৈশিষ্ট্য লেখ।

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩২, পৃষ্ঠা নং ৪৩২ দ্রষ্টব্য।

৮। বাংলায় অনুবাদ কর : ৫

(ক) Man is the architect of his own life. If he makes proper division of his time and does his duties accordingly, he is sure to prosper in life. But, if he does otherwise he is sure to repent, when it is too late and he will have to drag a miserable existence from day to day.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৫৩২ দ্রষ্টব্য।

অথবা, (খ) A patriot always loves his country. The patriots love their country more than their lives. They are always ready to die for the welfare of the country. Everybody honours them.

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪৪, পৃষ্ঠা নং ৫৪১ দ্রষ্টব্য।

৯। প্রবন্ধ লেখ (যে-কোনো একটি) : ২০

(ক) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ২৭, পৃষ্ঠা নং ৬২৬ দ্রষ্টব্য।

(খ) আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৩৮, পৃষ্ঠা নং ৬৪৮ দ্রষ্টব্য।

(গ) বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৫০, পৃষ্ঠা নং ৬৭৬ দ্রষ্টব্য।

(ঘ) ইসলামে মানবতাবোধ;

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৫৭৮ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) খাদ্যে ভেজাল ও তার প্রতিকার।

উত্তরসংকেত : রচনা নং ৮৯, পৃষ্ঠা নং ৭৭১ দ্রষ্টব্য।